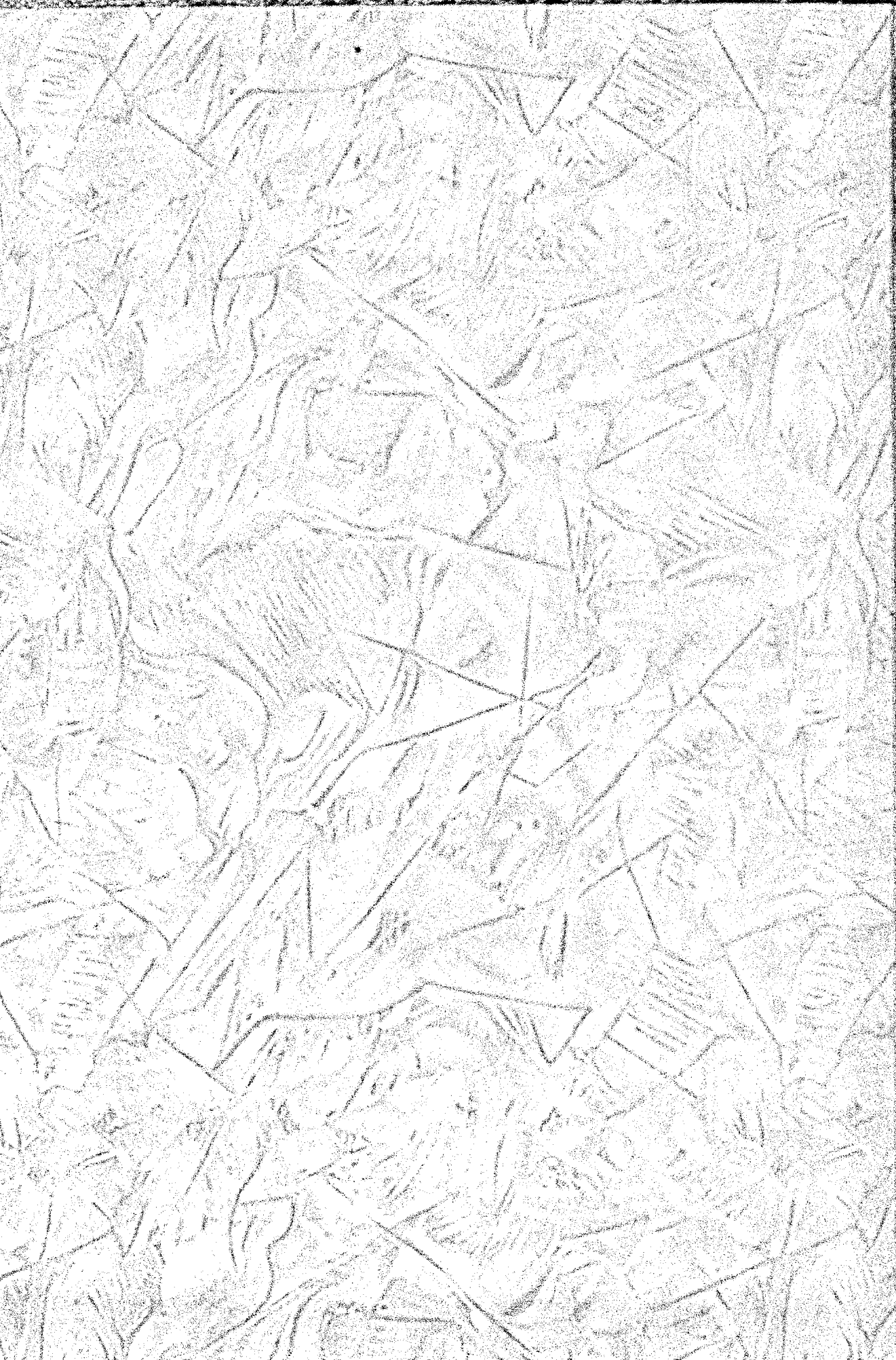
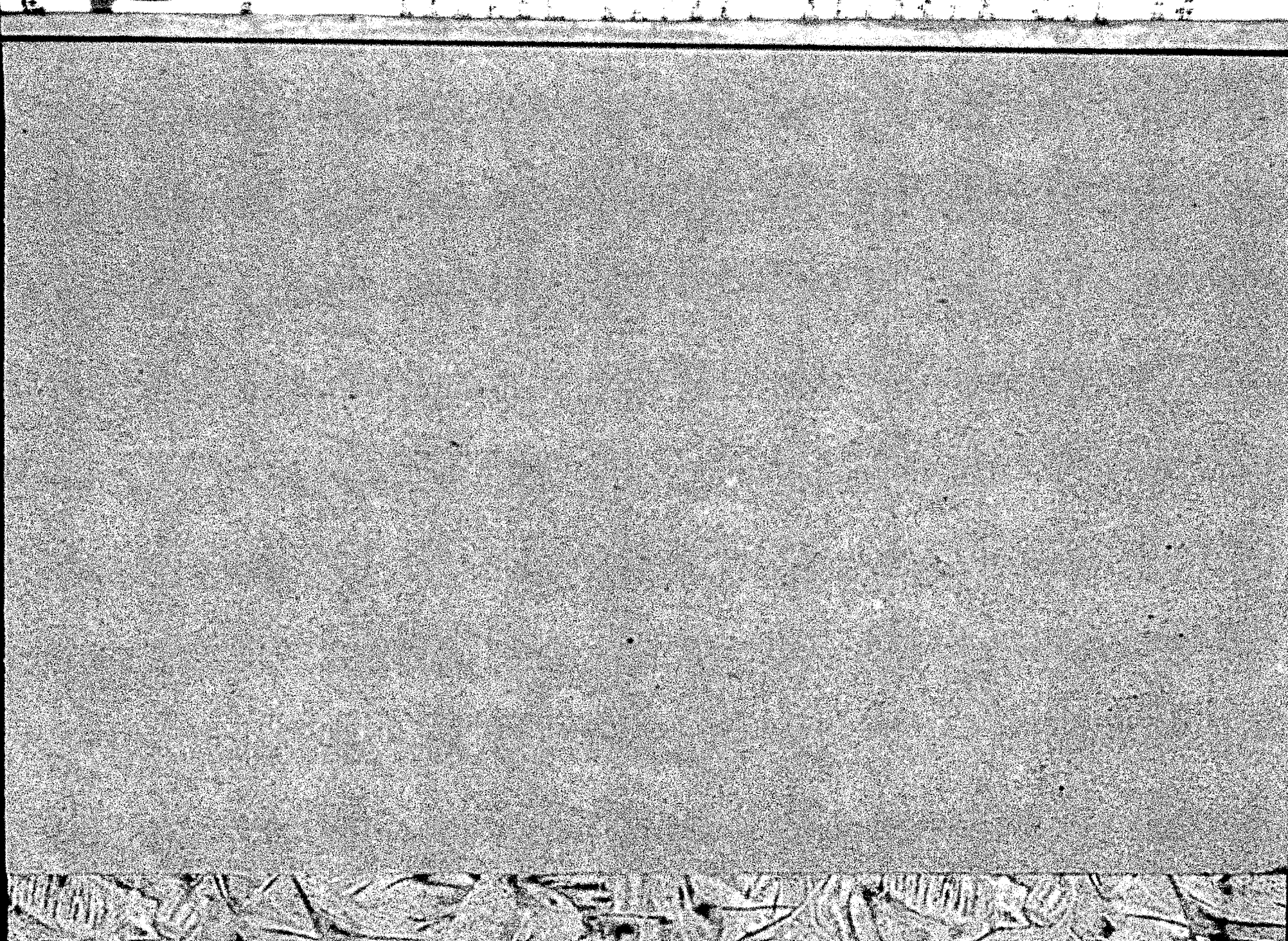


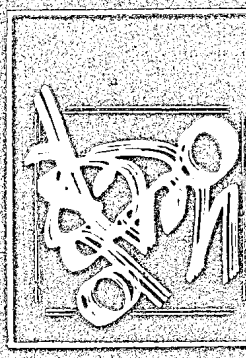




হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ সপ্তম সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮৮



জন্মশতবর্ষে "জওহরলাল নেহরুকে স্মরণ প্রসঙ্গে" বিশেষ করে দেশভাগের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক অকথিত ক্ষোভ এবং বেদনা অভিব্যক্তি পেয়েছে প্রবাদপ্রতিম প্রাক্তন পার্লামেন্টারিয়ান অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আলোচনায়।

অকটোবর বিপ্লবের ৭১ বছর পরে বিপর্যস্ত সোভিয়েত অর্থনীতি এবং আদর্শগত সংকট থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত পেরেস্ত্রৈকা আর গ্লাসনস্তের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অজিত রায়।

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে ময়মনসিংহের শেরপুর অঞ্চলে সংগঠিত "পাগলপন্থী" আন্দোলন কিভাবে ধর্মীয় সংস্কার এবং জমিদারি-শোষণ-বিরোধিতার গণ্ডী পেরিয়ে ব্রিটিশবিরোধী রূপ নিয়েছিল ধারাবাহিক নিবন্ধে সেই ইতিহাস বর্ণনা করেছেন অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী।

দুটি জীবনীগ্রন্থকে উপলক্ষ করে মওলানা আজাদ আর জিন্নাহ্ সম্পর্কে অবজেকটিভ আলোচনা করেছেন পুলকনারায়ণ ধর এবং খাজিম আহমেদ।

এই সংখ্যায় "বিষয় ঃ ব্রহ্মদেশ"-এর আলোচ্য বিষয় বর্মী সংগীতকলা।

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-Irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economical.

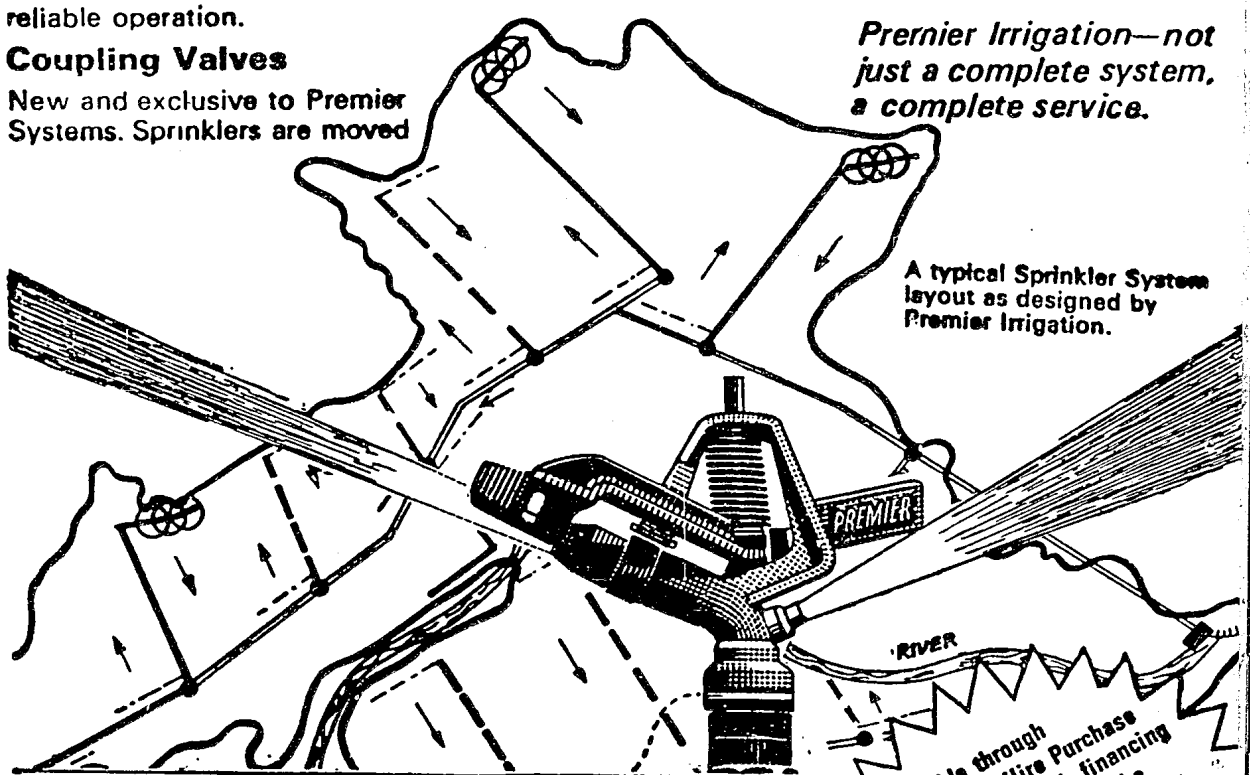
Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Prernier Irrigation—not just a complete system, a complete service.

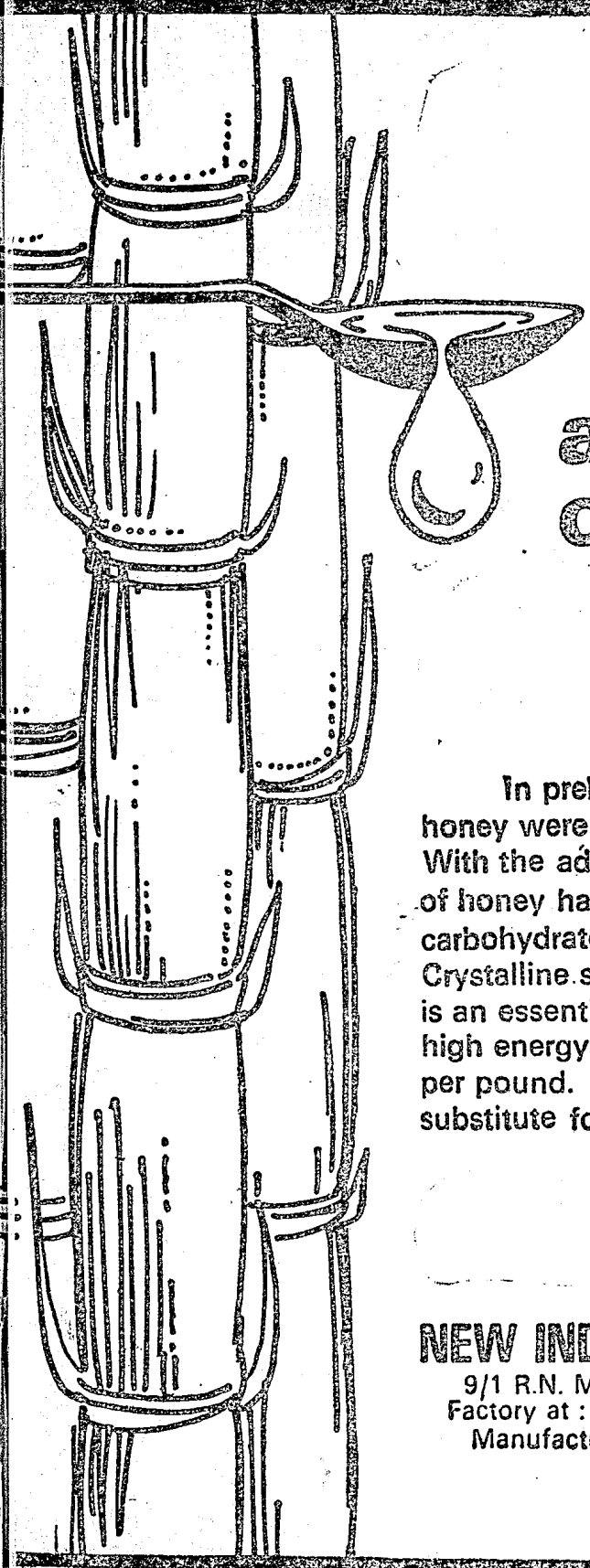


A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities. In addition to the normal annual I.T. depreciation deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302



a taste of honey...

In prehistoric times, some fruits and honey were the common sweet foods. With the advance of science, the sweetness of honey has been transferred into a major carbohydrate food made from sugar-cane. Crystalline sucrose, or everyday sugar, is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 Kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar.

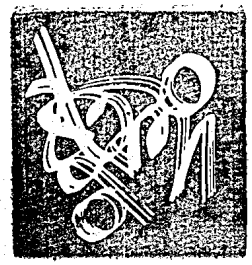
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.

9/1 R.N. Mukherjee Road, Calcutta 700 001
Factory at : Hasanpur, Dist. Samastipur, Bihar.
Manufacturers of Pure Crystal Cane Sugar.

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থ,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা





বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ৭
নভেমবর ১৯৮৮
কার্তিক ১৩৯৫

জওয়াহরলাল নেহরুকে স্মরণ প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৭১
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৫৮২
পেরেসত্রোইকা এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা অজিত রায় ৬০৬
বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৬২১

এরিয়েল রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭৭
দৈত্য মরলে বেলাল মোহাম্মদ ৫৭৮
একান্তে পরিমল চক্রবর্তী ৫৮০
সাক্ষাৎকার কিরণশঙ্কর রায় ৫৮১

শ্রীপতি ডোমের স্বদেশচিন্তা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০০

গ্রন্থসমালোচনা ৬৩৩
পুলকনারায়ণ ধর, খাজিম আহ্‌মদ, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

মতামত ৬৫১
বন্দিরাম চক্রবর্তী, সুনীল সেন, অশোক মৈত্র

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

নতুন প্রকাশিত

ভারতীয় নৃত্যদর্শন ও তত্ত্ব

গুরু খগেন্দ্রনাথ বর্মণ

[১০০ টাকা]

ভারতীয় নৃত্যের নান্দনিক গুণ, তার ক্রমবিবর্তন, গতিময়তা এবং ভরতনাট্যম নৃত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বেঁধে রাখা হয়েছে অসাধারণভাবে। ভারতীয় নৃত্য যা বিশ্ববাসীর চোখ কেড়ে নিয়ে অসাধারণ অব্যক্ত ছন্দে অন্য জগতের সন্ধান দিয়েছে—তার সন্ধান দেবার প্রয়াস করেছেন লেখক।

সম্পূর্ণ আর্ট কাগজে ছাপা। অসংখ্য ছবি ও ফটোগ্রাফ। সুন্দর বাঁধাই। রঙীন প্রচ্ছদ।

ব্যবসায়ে ফল ও ফুল

মন্টু ঘোষাল

[১৮ টাকা]

॥ ফলে ফুলে সুধা নিরবধি ॥ গাছের কাটিং, গাছের অষুধপত্র, যন্ত্রপাতি কোথায় পাওয়া যায় তার ঠিকানা আছে। নতুন জীবিকার সন্ধান, লন তৈরী করা, ঘর বারান্দা সাজান, বনসাই বানানোর সুলুক সন্ধান দেওয়া আছে। প্রত্যেক ফল-ফুল ব্যবসায়ীদের হাতের কাছে রাখার বই। অজস্র রঙীন ছবি।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ড. বিমলেন্দু মিত্র



শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৯

আমাদের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ও জীবনধারণের মান-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে—

আমাদের জীবনে বিদ্যুৎ এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আজ বিদ্যুতের যা চাহিদা এবং গুরুত্ব, ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে। আমাদের প্রতিটি উৎপাদনকেন্দ্রে, বহুবিস্তৃত বণ্টন ও সঞ্চালন ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি শহর এবং গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে চলছে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই কর্মযজ্ঞ হয়েছে সুদূরপ্রসারী। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সাড়ে ন' লক্ষ গ্রাহকের স্বার্থে প্রতিটি উৎপাদনকেন্দ্রে আমরা এনেছি সর্বাধুনিক কারিগরির প্রয়োগ, প্রতিটি গ্রাহকের স্বার্থে আজ আমাদের সেবা হয়েছে আরো নির্ভরযোগ্য। আমাদের কর্মোদ্যম পশ্চিমবাংলার প্রায় প্রতিটি এলাকায় আজ বিস্তৃত। আমাদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট এবং সেই লক্ষ্যে সত্বর পৌঁছবার জন্য আমরা আমাদের কাজ ত্বরান্বিত করেছি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

পশ্চিমবাংলার জীবনের অংশীদার

'গ্রামীণ'
এনেছে অপরূপ
রুচিসম্মত বস্ত্রসম্ভার

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৮৮ হইতে
—বিশেষ রিবেট—

সূতি খাদি—৩৫%
রিল্ড সিল্ক—২০%
স্পান সিল্ক—৩০%
পলিবস্ত্র—৪০%

আদি ও অকৃত্রিম বালুচরী, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ি, আধুনিক পলিবস্ত্র এবং
ঐতিহ্যপূর্ণ সূতি, রেশম ও পশম খাদির রঙ, রুচি ও
ডিজাইনের মনোরম পসরা।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)
২, মুজাফ্‌ফর আহমেদ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬
প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত।

While purchasing Hessian, Sacking, Yearn and Decorative Furnishing Fabrics & other Jute Products, plcase insist on quality product.

We are always ready to meet the exact type of your requirement.

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.

(*UNIT :* AUCKLAND JUTE MILLS)

"KANKARIA ESTATE"
6, Little Russell Street
Calcutta-700 071

Telephones : 29-2621
29-2623
29-7199
29-7698
29-7710

Cable : SWANAUCK, CALCUTTA
Telex : 21-2396 AUCK IN
Codes : BENTLEY'S SECOND

REGISTERED OFFICE & JUTE MILL AT **JAGATDAL**
24-PARGANAS, PHONES : BHATPARA 2757, 2758 & 2038

KEMRUB PRIVATE LIMITED

Regd. Office & Factory :
15, Stark Road, Liluah
Howrah-711 204
Phone : 66-3317/5395
Gram : "KEMRUB" Liluah

Administrative Office ;
86, J. N. Mukherjee Road
Salkia, Howrah-711 106
Phone : 66-2820

"HARTEX CYCLE & RICKSHAW TYRES & TUBES"
"KNOWN THROUGHOUT INDIA FOR ITS QUALITY & DURABILITY"

New Books :

ANDREW ROBINSON
Foreword by
SATYAJIT RAY
THE ART OF RABINDRANATH TAGORE
£ 50/- Rs. 1325/-
Special Indian Price Rs. 750.00

M. J. AKBAR
NEHRU : THE MAKING OF INDIA
£ 17 95=Rs. 475.68
Special Indian Price £ 12.95=Rs. 343.18

INDIA : THE SIEGE WITHIN
£ 4.99=Rs. 132 24
Special Indian Price £ 2.99= Rs. 79.24

BENOZIR BHUTTO
DAUGHTER OF THE EAST
AN AUTOBIOGRAPHY
£ 12.95=Rs. 343 18
Special Indian Price £ 10/- Rs. 265.00

TOM OWEN EDMUNDS
BHUTAN : LAND OF THUNDER DRAGON
£ 25/- Rs. 662.50
Special Indian Price £ 20/- Rs. 530.00

Rupa & Co

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৬০ টাকা
ষান্মাসিক ৩২ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির ঊর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

•

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

জওয়াহরলাল নেহরুকে স্মরণ প্রসঙ্গে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বহুকাল পরে "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় লিখছি। মনে পড়ছে যে "চতুরঙ্গ"-র প্রতিষ্ঠাতা আর প্রাণপুরুষ, আমার বন্ধু হুমায়ুন কবির-এর অনুরোধে আর হুমায়ুনেরই ক্লান্তিহীন সহকারী আতাউর রহমান-এর সদাসৌজন্যময় অথচ নাছোড়বান্দা আগ্রহে কার্ল মার্কস-কৃত "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের প্রধান ঐতিহাসিক পরিচ্ছেদ "ধনিকের আবির্ভাব" ইংরিজি থেকে তরজমা করে দিয়েছিলাম। মাঝে অনেক কাল "চতুরঙ্গ"-র খবর রাখতে পারি নি। সম্প্রতি যোগাযোগ ঘটেছে আর সম্পাদক মহাশয়ের সাদর নির্বন্ধে লিখতে বসেছি। নানা প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও সানন্দে লিখছি, কারণ "চতুরঙ্গ"-র যে কটি সংখ্যা দেখেছি তা রীতিমতো ভালো লেগেছে। প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সাগ্রহে পড়তে ইচ্ছা করে এমন পত্রিকা হল "চতুরঙ্গ"। একথা বলা যায় যেসব পত্রিকা বিষয়ে, তাদের সংখ্যা আজ একান্ত বিরল।

আমি পুলকিত বোধ করি যে বাংলাদেশের সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে "চতুরঙ্গ" এক সহজ শোভন এবং স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে। খুবই খুশি হয়েছি দেখে যে আহ্‌মদ্ শরীফ্-এর মতো যে সুদুর্লভ মনস্বী, সাহসিক চিন্তায় যিনি অগ্রণী আর বাঙলা সাহিত্যের জনজীবনসম্পর্ক বিষয়ে যাঁর জ্ঞানের গভীরতা প্রায় তুলনাহীন, তাঁর রচনা সম্প্রতি "চতুরঙ্গ"-এ প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম থেকে সার্ধ-শতাব্দী-পূর্তি উপলক্ষে তাঁর মতো চিন্তাশীল মানুষকে কলকাতার কোনো প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান আহ্বান করে আনার কথা ভেবেছিল কিনা জানি না। "চতুরঙ্গ" অন্তত দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার মতো তাঁর একটি রচনা ছাপিয়ে আমার মতো ব্যক্তিকে সুখী করেছে।

বেশকিছু কাল কার্যত কলকাতা থেকে প্রবাসী অবস্থায় ছিলাম বলে কেমন যেন আমার মনে লাগে যে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম বাঙলার যোগাযোগ কেন আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছে না। রাজনৈতিক দিক থেকে বাধা কাটাবার তেমন প্রয়াস উভয়পক্ষ থেকে হয় নি ; অর্থনৈতিক যে সম্পর্ক শুধু স্বাভাবিক নয় একান্ত প্রয়োজন, তারও চেষ্টা তেমন হয় নি ; আমাদের ভাষা এক, আর 'আ-মরি বাঙলাভাষা' বিষয়ে বাংলাদেশের প্রাণের টান আমাদের চেয়ে যখন ঢের বেশি, তখন অন্তত এক্ষেত্রে সহযোগিতা কেন যে যথেষ্টের থেকে অনেক কম, তা সহজ বুদ্ধিতে আসে না।

কাউকে কটাক্ষ করছি না। কিন্তু আমার মতো অনেকে নিশ্চয় আছেন

যাঁদের মনে একটা আশার সঞ্চার হয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে এবং তার অব্যবহিত পরে, যে-আশার পিছনে ছিল বাঙালি হিসাবে একটা গর্ব, একটা আনন্দ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে-দুর্বলতা ও গ্লানির ফলস্বরূপ দেশবিভাগের মতো এক যন্ত্রণার ফাঁদে এই উপমহাদেশকে পড়তে হয়েছে, সেই দুর্বলতা ও গ্লানির বোঝা থেকে একটু যেন নিস্তার পেয়েছিলাম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে। ঘটনা-চক্রে সে-আশা অনেকটা বিলীন হয়ে পড়েছে; উভয় দেশেই গণ-আন্দোলনের বহু মূলগত দৌর্বল্যের ফলে ভারত তার সমুচিত এবং আকাঙ্ক্ষিত পথে চলতে পারে নি। বাংলাদেশের যে-অভ্যুত্থান আমাদের নির্বীর্য জীবনধনদৈন্যকে অপসৃত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তা-ও ঝিমিয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের যে-মানুষ তাদের নেতাকে "মুজিব ভাই" বলে ডেকেছিল, তাদেরই আশাভঙ্গের মাশুল আজও তাদের সবাইকে দিতে হচ্ছে। মাঝে-মাঝে দুই বাঙলার সাহিত্য-শিল্পে ব্যাপৃত যারা তাদের সাময়িক একটা মিলনক্ষেত্রে বানানো হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্য এবং ভারতরাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিম বাঙলার অবস্থিতিকে আপাতত অকাট্য জেনেই আমাদের মধ্যে যে সুসম্পর্ক বিবিধ ক্ষেত্রে গড়ে উঠতে পারত, তার লক্ষণ দেখতে পাই না। হয়তো আমার কথায় একটু বাহুল্য রয়েছে। কিন্তু আমার হিসাব একেবারে ভুল প্রমাণিত হলে খুবই খুশি হব।

এতটা একটানা লিখে ফেলে মনে পড়ছে যে সম্পাদক মহাশয় আমাকে জওয়াহরলাল নেহরু সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছেন, কারণ শীঘ্রই জওয়াহরলালের জন্ম থেকে শতাব্দপূর্তি হতে চলেছে, আর ভারতীয় সংসদ-সদস্য বহুকাল ধরে ছিলাম বলে জওয়াহরলাল বিষয়ে আমার কাছ থেকে জানতে চাওয়া একেবারে অসঙ্গত নয়। আমার মুশকিল হল এই যে, নানা কারণে সংক্ষেপে জওয়াহরলাল বিষয়ে কিছু লিখতে অসুবিধা বোধ করি, যদিও নানা পত্র-পত্রিকায় দুটো ভাষায় লিখবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাও সহজ নয়, আর তা পারছি-ও না। "চতুরঙ্গ"-এ লিখতে গিয়ে কেবলই মনে আসছে দেশবিভাগের কথা। যে-দেশবিভাগ জওয়াহরলালের মতো সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শলেশশূন্য মানুষের পক্ষে ঠেকাবার কাজে সাফল্য সম্ভব হয় নি। অবশ্য এ-ব্যর্থতার দায়িত্ব দেশের সকলের—গান্ধী থেকে শুরু করে বাম-পন্থী-সমেত আমাদের সকলের। মুসলিম লীগ আর জিন্নার নিন্দা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতিকে শুধু আক্রমণ করে কে তুষ্টি পায় জানি না, কিন্তু আমাদের গোটা দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনেই ছিল এমন গলদ যাতে দেশবিভাগের কলঙ্কিত মূল্যের প্রতিদানে "ক্ষমতার হস্তান্তর" ঘটল ব্রিটেনের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই রাষ্ট্রে।

১৯৩০ সালে লনডনে প্রথম গোলটেবিল সম্মেলনে মওলানা মুহম্মদ আলি একক ভূমিকায় উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন অনেক দুঃখে—'We divide and you rule'। ইংরেজ "divide and rule" করছে বলে পার পাওয়া যায় না, নিজের ক্লৈব্যকে ঢাকা যায় না। সারাদেশের সবাই মিলে চাইলে মনস্কামনাপূরণে বাধা দেয় কে? 'এ আমার, এ তোমার পাপ'—মনে পড়ে যায় সেদিনের কথা ভাবতে গেলে। গান্ধী অন্তত কিছুতেই দেশবিভাগকে মেনে নিতে পারেন নি; শেষদিকে এমনও বলেছিলেন যে পারে যদি কেউ তো "বিপ্লব" ঘটাবার চেষ্টা হোক। কিন্তু তিনি ক্লান্ত, সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে আর কিছু করার। এমনও বলেছিলেন যে জিন্নাকেই দেশের কর্তার পদে বসানো হোক, বিবদমান পক্ষের দশজন করে প্রতিনিধি একটি কুটিরে একসঙ্গে বসে সমঝোতার চেষ্টা করুন। এ অবশ্য নৈরাশ্যেরই কথা, কিন্তু নেহরুর মতো লোক কেন সর্দার পটেলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মানলেন দেশবিভাগকে? তখন দেশ জুড়ে যে অশান্তি আর হানাহানি, অমানুষিকতার যে বিভীষিকা চলছিল,

তাতে পর্যুদস্ত বোধ করে কেন হার মানলেন—'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ'—চাণক্যের এই কূটবুদ্ধি কেন আমাদের দেশাভিমানকে পরাস্ত করল? জওয়াহরলালের নামে কেউ সাম্প্রদায়িকতার নালিশ আনবে না, কিন্তু কেন আত্মজীবনীতে যে-সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে তিনি লেখেন যে দেশের বিপদ কম্যুনিজম থেকে নয় বরঞ্চ শব্দটি একটু বদলে কম্যু-নালিজম থেকে, জাতীয় জীবন থেকে সেই বিষোৎ-পাটনে তাঁর ব্যর্থতা কেন দেখা গেল?

হয়তো অবান্তর মনে হবে, কিন্তু মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত কে. পি. এস. মেনন যখন ১৯৫৩ মার্চে স্টালিনের মৃত্যুর কিছু পূর্বে দেখা করেন, তখন স্টালিন বলেছিলেন যে শুধু ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র ব্যাপারটা "আদিম" (primitive) বটে, কিন্তু ভারতের কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে আলগা-ধরনের হলেও পাকিস্তানকে নিয়ে সংযুক্তরাষ্ট্র গঠন বিষয়ে? এদিকে এদেশের চিন্তা একেবারে এগোয় নি। গান্ধী বেঁচে থাকলে কিংবা জওয়াহরলাল সংকোচবিহ্বলতা পরিহার করে এবং ক্ষুদ্রচেতা সহ-যোগীদের আপত্তি অতিক্রম করার সাহস এবং কৌশল দেখাতে পারলে হয়তো একেবারে অসম্ভব ছিল না এদিকে কিছুটা অগ্রসর হওয়া। জানি পরি-স্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল, আর পশ্চিমী নয়া-সাম্রাজ্য-বাদের শক্তি ছিল অপরিসীম আর কৌশল ছিল অফুরন্ত। পাকিস্তানকে পরিকল্পিতভাবেই একটা 'টাইম বোমা' হিসাবে পোঁতা হয়েছিল যাতে দরকার পড়লেই তাকে কাজে লাগানো যায় ভারতের বিপক্ষে। দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতরাষ্ট্রকে নিয়েই নয়া-সাম্রাজ্য-বাদের যা কিছু দুশ্চিন্তা। কারণ বাকি দেশগুলোকে মোটামুটি কবজা করে রাখা পশ্চিমের সমরশক্তি ও ধনৈশ্বর্যের পক্ষে ছিল সহজ। এরই মধ্যে হাজার মুশকিলের মোকাবিলা করে চলা ভারতের সাধ্যে ঠিক যে কুলায় নি, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর সেজন্যই জওয়াহরলালকে দায়ী খাড়া করা উচিতও হবে না। কিন্তু দুঃখ তো হয় যে কিছুতেই এই উপ-মহাদেশে বহু ব্যবধান বৈচিত্র্য ও বিবাদসম্ভাবনা সত্ত্বেও সংহতি না হলেও নৈকট্য, আত্মীয়তা না হলেও পরস্পরস্বার্থেই বৈরিতাবর্জন একটা অসাধ্য ঘটনা ছিল না।

আজও যে পাকিস্তান দূরে থাক, বাংলাদেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক ব্যাপারে রাজনীতিমহলে কোথাও কোনো শিরঃপীড়া নেই, তা জানতে দেরি হয় না। নানাদিক থেকে আমাদের অবনতিই যে ঘটে চলেছে। সতেজ সচেতন সমাজবাদী-সাম্যবাদী মনোবৃত্তি দূরে থাক, গান্ধী-জওয়াহরলাল প্রমুখের চিন্তাও বহুবিধ মধ্যযুগীয়তায় আচ্ছন্ন। তা নইলে স্বাধীনতার চল্লিশ বৎসরেরও বেশি কেটে যাওয়ার পরও সাম্প্রদায়িক অমানুষিকতা ঘটতে থাকে প্রায় অবলীলাক্রমে, হিন্দু-সমাজেই যারা দলিত তাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ে বই কমে না, বাবরি মস্‌জেদ-রামজন্মভূমি নিয়ে মূর্খের কাজিয়ার মতো কেলেঙ্কারির সুরাহা হয় না, শিবসেনা আর বিশ্বহিন্দুপরিষদ আর তুলনীয় মুসলিম জমায়েৎ নোংরা রাজনীতির বাজার জমিয়ে রাখে?

অনেক সময় ভাবি, যদি মুসলমান ঘরে জন্মাতাম বা দলিত "অস্পৃশ্য" পরিবারে, তা হলে আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জীবনটাকে কেমন-ভাবে দেখতাম? গান্ধী একবার বলেছিলেন যে, কোনো প্রস্তাব নিয়ে মনস্থির করার আগে ভাবা উচিত সেই মানুষটির কথা, যে হল সবচেয়ে বঞ্চিত আর তার কোনো উপকার ঘটছে কি না তা যাচাই করা। এজন্যই ১৯২৮ সালে গান্ধী একবার তখন প্রায়-সোসালিস্ট জওয়াহরলালকে লেখেন: 'আমি তোমারই মতো মনে করি যে ধনী আর বাক্যবাগীশ শিক্ষিত শ্রেণীকে বাদ দিয়ে লড়াই হল দরকার কিন্তু তার উপযুক্ত সময় আসে নি।' উভয়ের হিসেবে সে-সময় কখনও যে এল না, এটা দেশের দুর্গতির একটা কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু চাইলেই যে মনোমত সামাজিক পরিবেশ আর বিপ্লবসম্ভাবনা পাওয়া যাবে,

তা নয়। এদিক থেকেই জওয়াহরলাল এবং সর্ববিধ বামপন্থী-সমেত আমাদের যে ব্যর্থতা প্রকট, তা জওয়াহরলালের কথা ভেবে কেবল মনে আসে।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিম জনতা যোগ দিয়েছিলেন যে-উদ্দীপনা নিয়ে, তা আমাদের মতো কেউ-কেউ কিছুটা চাক্ষুষ করেছি এবং কখনও ভুলতে পারব না। আন্দোলনে যখন ভাঁটা পড়ে গেছে, তখনই ১৯২৩ সালে "বেঙ্গল প্যাক্ট"-এর মাধ্যমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙালি মুসলমানের চিত্তজয় করেন, স্বরাজ্য পার্টির শক্তিবৃদ্ধি ঘটান। কিন্তু কংগ্রেসের তৎকালীন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব তাতে বাধা দেয়, গোটা দেশে তার প্রভাব ছড়ানো যায় নি। ক্রমশ বাঙলা-পনজাবের মতো মুসলিমপ্রধান প্রদেশগুলিতে স্বাধীনতাপ্রয়াস থেকে মুসলিম জনতার দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, চাষীর স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়নে কংগ্রেসিদের সহায়তা এই দূরত্বকে ঘনীভূত করতে থাকে। ১৯২৬ সালে ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাকালে দুই প্রধান ছিলেন মওলানা হসরৎ মোহানি আর মওলানা আজাদ সুভানি। অবশ্য বেশিদিন টিকতে পারেন নি, কিন্তু তা হল ভিন্ন প্রসঙ্গ। একদা-উপহসিত যে-ধারণা ১৯৪০ সালে পাকিস্তান রূপ পরিগ্রহ করে ভারতরাজনীতিতে ভূমিকম্প ঘটাল, তার মোকাবিলায় মুসলিমদের মধ্য থেকেই অগণিত মানুষকে টেনে আনার সম্ভাবনাকে অনেকটা হেলায় হারিয়ে ফেলা যে হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সময় সর্বদল-সম্মেলনে দেখা গেল, হিন্দু-মুসলিম বিতর্ক প্রধানত চারটি বিষয় নিয়ে। (১) সিন্ধুপ্রদেশের স্বাতন্ত্র্য; (২) বাঙলা ও পনজাবে মুসলিম সংখ্যাপ্রাধান্য আইন সভায় স্থায়িভাবে স্বীকৃতি; (৩) কেন্দ্রশাসন-ব্যবস্থায় শতকরা ৩৩ ভাগ মুসলিম আসন নির্দেশ; (৪) স্বাধীন ভারতের সংবিধানে লিপিবদ্ধ নয় এমন ক্ষমতা ('residuary powers') কেন্দ্রের পরিবর্তে রাজ্যগুলিকে অর্পণ। এখন মনে হয়, এ তো সামান্য বস্তু যা নিয়ে ঝগড়া মেটানো সহজ, কিন্তু তা মেটে নি। মুহম্মদ আলি বিরক্ত হয়ে বলেন, 'ইংরেজের সঙ্গে তোমরা মিটমাট করছ। পূর্ণ স্বাধীনতার বদলে 'ডোমিনিয়ন'-এর মর্যাদায় তুষ্ট হচ্ছ। আর মুসলমানকে শতকরা ৩৩-এর বদলে ২৫ করতে চাইছ। তোমরা ইহুদি, তোমরা বেনিয়া।' আশ্চর্য হতে হয় কত তুচ্ছ কারণে—যেমন জিন্নার ১৪ কিংবা ১১ 'পয়েণ্ট' নিয়ে বিতর্কে বিবাদ মিটানো সম্ভব হয় নি। গান্ধী একবার বললেন, স্বদেশী কালিকলম নিয়ে সাদা 'চেক' দিতে তিনি তৈরি—স্বভাবতই রুষ্ট হয়ে জিন্না বললেন, এসব রহস্যে তিনি নেই! ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় দুজন লীগনেতাকে নিলে ঝগড়া না পেকে মিটবার সম্ভাবনা ছিল বলেছেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ-এর মতো বিরাট পুরুষ। কথাটা নিয়ে অনেক বিতণ্ডা ঘটেছে, স্থির সিদ্ধান্ত এখনও কঠিন। কিন্তু সন্দেহ তো নেই যে নেহরু-সমেত কংগ্রেস নেতৃত্ব এমন বহু সুযোগ স্রেফ অবজ্ঞার ফলে নষ্ট করেছেন।

১৯৩৮ নাগাদ সময় কাশীতে ভারতমাতামন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। গান্ধী উদ্বোধন করেন। ছবি দেখেছি কাগজে সীমান্ত গান্ধী একটু যেন অস্বস্তি নিয়েই উদ্বোধনে উপবিষ্ট হয়ে রয়েছেন। পরে স্বচক্ষে দেখেছি যে যদিও মন্দিরে ভারতমাতার কোনো মূর্তির বদলে দেশের মানচিত্র আছে, সঙ্গে-সঙ্গে দেশের সবকটি প্রচলিত ভাষার লিপি খোদিত রয়েছে। বাদ শুধু উর্দু। কারণ জানতে গিয়ে শুনলাম যে, উর্দুর হরফ বিদেশ থেকে এসেছে বলে তা বরবাদ। ব্যাপারটি অত সোজা মানতে পারি না। ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী থেকে শুরু করে কোন্ লিপির উদ্ভব কোথায়, তা নিয়ে বিদ্বানেরা বিতর্ক করুন। কিন্তু উর্দু তো মুসলমান আর হিন্দুর উভয়ের হাতে আর মুখে গড়া একটা ভাষা যা বিশেষ কারণে মুসলমানের কাছে প্রিয়। মুসলমান নই, কিন্তু আমারও বুকে ধক করে ঘা

লেগেছিল এই কাণ্ড দেখে। ভাবলাম গান্ধী জওয়াহরলাল প্রমুখ সবাই কেমন করে এ-কাজে সায় দিলেন। অথচ ঠিক তখনই মুসলিম লীগ প্রচার করছিল যে রাজ্যে-রাজ্যে কংগ্রেসি শাসনে মুসলমানকে প্রপীড়িত করা হচ্ছে—বন্দেমাতরম্ গাওয়া হচ্ছে সব স্কুলে। কংগ্রেসের নিশান উড়ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ যেন সুপরিকল্পিত কায়দায় মুসলমান মানসিকতাকে আঘাত দেওয়ার একটা আয়োজন।

পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত (১৯৪০) হওয়ার আগেই জওয়াহরলাল একবার নিজের দল নিয়ে গর্ব আর আস্থার প্রাবল্যে বলে বসলেন যে দেশে আছে মাত্র দুটো পক্ষ। কংগ্রেস লড়ছে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। তাই বাকি যারা আছে (লীগ ও অন্যান্য) মনস্থির করুক কোন্ পক্ষে তারা ভিড়বে! কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় জওয়াহরলালের ছিল (পূর্বে তাঁর পিতা মোতিলালের মতোই) এক অদ্ভুত অনীহা। ১৯৪২ সালে যখন মুশকিল আরও ঘনিয়ে উঠেছে তখন কংগ্রেসের প্রতিভূ না হয়েও রাজাগোপালাচারির মতো বিচক্ষণ মানুষ কংগ্রেস-লীগ মিলনের যে সূত্র দিয়েছিলেন, তাতে মুসলিম মহলে রীতিমতো অনুকূল আবহাওয়া দেখা গিয়েছিল। কিন্তু হয়তো এজন্যই দেখা গেল ১৯৪৪ সালে রোজনাম্চায় লেখা জওয়াহরলালের মন্তব্য: 'রাজাগোপালাচারির মতো বিপজ্জনক মানুষ আজ আর কেউ আছে?' অবশ্য হঠাৎ-বলা কথা থেকে সিদ্ধান্ত অনুচিত; নেহরুই তো রাজাজীকে বড়োলাট বানাতে কুণ্ঠিত হন নি পরে। কিন্তু কংগ্রেস-লীগ সমঝোতার সম্ভাবনা যাঁরাই তখন বাড়াতে চেষ্টা করেন—যেমন ভুলাভাই দেসাই—তাঁরাই নিন্দিত হয়েছেন, বিপন্ন হয়েছেন। শোনা তো গিয়েছিল যে গান্ধীর সম্মতি নিয়েই দেসাই এবং লিয়াকৎ আলি খান-এর অনেকটা মিটমাটের দিকে এগোবার সম্ভাবনা ছিল। সবকিছু ভেস্তে যাবার ফলে যে-নৈরাশ্য তাই ভুলাভাইয়ের আকস্মিক হৃদ্‌যন্ত্র স্তব্ধ হয়ে পড়ার একটি কারণ বলে শোনা গিয়েছিল।

জওয়াহরলাল ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্ধ্বে। সর্দার পটেল তো ঠাট্টা করে বলতেন যে "কংগ্রেসি মুসলিম" একমাত্র হলেন নেহরু! স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরে যে বীভৎস হানাহানি অমানুষিকতার পর্যায়ে চলে যায়, তাকে প্রতিহত করতে জওয়াহরলালের অসমসাহসী মনোভাব তাঁর চারিত্র্যেরই প্রকাশ। দেশের দুর্ভাগ্য যে তাঁর মতো অমিতপ্রতিভা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানপ্রয়াসে যথাসময়ে এবং যথোপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হল না। শুধু জওয়াহরলালকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ বাতুলতা, কিন্তু দুঃখ হয় বই কি যে দেশের ক্লেদাচ্ছন্ন পরিস্থিতির কাছে তাঁকে হার মানতে হল। চিন্তাশক্তির প্রসার এবং অপরের মনের বেদনা বুঝবার মতো হৃদয়বত্তা সত্ত্বেও এবং একটা মূল সমস্যার সামাজিক শিকড় আর তাকে উৎপাটিত করার উপায় সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হলেও তিনিই পরিস্থিতির চাপে পরাস্ত হলেন। মনে পড়ছে, হঠাৎ জওয়াহরলালের চিতাপার্শ্বে শিশুর মতো কেঁদেছিলেন কাশ্মীরনায়ক শেখ আবদুল্লা। আবুল কালাম আজাদের মতো স্থিতধী কেন যে আজীবন সহযোগী আর সঙ্গে-সঙ্গে পরম বন্ধুর বিভ্রম বিষয়ে নীরব থাকতে পারেন নি, তা বোঝার চেষ্টা প্রয়োজন।

হলফ করে বলা যায় না, কিন্তু ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় হঠাৎ কয়েকদিন হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ জওয়াহরলালকে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছিল। ফেবরুয়ারি মাসে অল ইনডিয়া কংগ্রেস কমিটির ভুবনেশ্বর অধিবেশনে বলতে গিয়ে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার এটাও সম্ভবত ছিল একটা কারণ। তখনকার কথা বিশেষ করে মনে আছে, কারণ লোকসভায় বলে ফেলেছিলাম মনের দুঃখে যে, ক-টা দিন কলকাতা যেন ছিল 'নরকেরই আর-এক নাম' ('euphemism for hell'), যা বুঝি পাকিস্তান রেডিও ফলাও করে প্রচার করার ফলে আর কলকাতার এক কাগজে দেখি যে আইয়ুব খান আর

আমার 'কুশপুত্তলিকা' দাহ করা হয় এক সভাতে। এই সময়টাতেই জওয়াহরলাল কেবলই বলতেন যে কত কাজ বাকি রয়ে গেল, তাড়াহুড়ো করতেই হবে, অনেক প্রতিশ্রুতিই যে পালন করতে হবে আর বহুদূর যাওয়া রইল বাকি।

দীর্ঘকাল রাজনীতি করেছেন জওয়াহরলাল। আর আদর্শ এবং নিষ্ঠা বিষয়ে যতই যত্নবান থাকুন না কেন, তার কলুষ মাঝে-মাঝে স্পর্শ তো তাঁকে করত-ই। এখানে খুঁটিনাটি খবরের উল্লেখ প্রয়োজন নয়—তবু মনে পড়ে যাচ্ছে, ১৯৫৯-৬১ সালের কেরালা সরকারকে (যা ছিল ইতিহাসে প্রথম ভোটে নির্বাচিত কম্যুনিস্ট সরকার) অন্যায় উপায়ে ফেলে দেবার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা মার্জনীয় নয়। একটু যেন লজ্জাবোধ করে, তখন নিজেকে পিছনে রেখেছিলেন। গোবিন্দবল্লভ পন্ত ছিলেন সংসদে এই কম্যুনিস্ট-নিধন অভিযানের সেনাপতি। কিন্তু দায়িত্ব যে মূলত তাঁরই, এটা অস্বীকার করা যায় না। নিজেই মাঝে-মাঝে বলেছেন যে যাদের সঙ্গে রাজনীতি করছেন তাদের নীতির তেমন বালাই নেই—বিরোধী দলে থাকলে আমি নিজেই আমার সরকারের বিরোধিতা করতাম—এমন কথাও বলেছেন, দেশবাসীর কাছে, মার্জনা চাইতেও কুণ্ঠিত হন নি। আমাকে একবার লেখেন, যে তিনি যে-সংস্থায় রয়েছেন তাকে ছেড়ে কিংবা তারই মধ্যে ভারতীয় কায়দায় নিজস্ব 'সম্প্রদায়' গঠন করবেন কেন, যখন তাতেই যে সুফল ঘটবে তার নিশ্চিতি নেই। একবার ১৯৫৯ সালে লেখেন যে জয়প্রকাশনারায়ণকে তিনি পছন্দ করেন। জয়প্রকাশও শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু কেমন করে তিনি জয়প্রকাশকে সহযোগী করে নেবেন, যখন তাঁর আন্তর্জাতিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতি জয়প্রকাশের কাছে একেবারে অগ্রাহ্য। কিছুটা আন্দাজ পাই তাঁর মনের, যখন একাধিকবার আমাকে বলেছেন এবং লিখেছেন যে আমার মতো 'sensitive' ('স্পর্শ-কাতর' ঠিক এর তরজমা নয়) ব্যক্তির জীবনে রাজনীতি-সংসর্গ বহুবিধ যন্ত্রণারই কারণ হবে। নেহাত ভুল বলেছিলেন মনে হয় না।

অসামান্য শক্তিধর হয়েও সেই অসামান্য শক্তি কঠোরভাবে ব্যবহার করে দেশের চেহারা বদলে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। হয়তো বা প্রবৃত্তিও ছিল না। "আত্মজীবনী"তে একটা ঘটনার কথা রয়েছে—শিকারে গেছেন একবার, কিন্তু যখন আহত এক হরিণশিশু ছুটে এসে পড়ল পায়ের কাছে আর তার চোখ বেয়ে জল, তখন শিকারের বাসনা চিরতরে অন্তর্হিত হল। এহেন ব্যক্তি বিপ্লবের মূল্য দিয়ে, দেশবাসীর বিপুল দুঃখকষ্টের বিনিময়ে সমাজপরিবর্তনে কেমন করে প্রস্তুত হতে পারেন? যে-সংসদীয় ব্যবস্থায় অজস্র গলদ রয়েছে বলে তার ব্যাপক পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন স্বীকার করেও সে-কাজে নামবার সংকল্পেও তিনি অটল হতে পারলেন না। ইতিহাসের কাছে জওয়াহরলালের ঋণ রয়ে গেল। কিন্তু আমাদের মতো যারা নিকট থেকে তাঁকে জেনেছি, তারা সহজে তাঁর সম্বন্ধে কঠোর হতে পারি না। তা ছাড়া, দেশ এবং আমাদের গোটা যুগ তাঁর কাছ থেকে যা পেয়েছে, তারও পরিমাণ এবং গুণ তো একেবারেই সামান্য নয়। তাঁর মৃত্যুকালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় মরক্কো-র প্রতিনিধি যা বলেন, তা মনে পড়ে যাচ্ছে: 'জওয়াহরলাল ছিলেন জগতের যে-ভূখণ্ডে আমরা বাস করি তাদের সর্ববিধ সুনীতির স্থপতি'।

'স্বদেশে প্রবাসী'-অনুভূতি নিয়ে যাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ, তিনিই আবিষ্কার করলেন ভারতবর্ষ এবং তার মানুষের সঙ্গে পরিপূর্ণ সহমর্মিতা। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সর্বদেশের মানুষের মুক্তি, শোষণরহিত সমসুযোগের সমাজ স্থাপন, সবাই মিলে নবযুগ নির্মাণের কাজে লিপ্ত থাকা, এই ছিল যাঁর কাম্য, তাঁকে শুধু এদেশ নয়, ইতিহাস সহজে ভুলবে না। মৃত্যুকালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি জাকির হুসাইন যাঁকে 'হিন্দোস্তান-কে-মেহ্‌বূব' ('দেশের দুলাল') বলে অভিহিত করেছিলেন, আজ তাঁর স্মৃতি ম্লান হয়ে এলেও বহুকাল ধরে মানুষের মন থেকে তা বিলীন হয়ে যাবে না।

এরিয়েল

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

এই কি আমার গান? না কি এও সেই
জাহাজডুবির পরে যে-বছর তারা
আশ্রয় করেছে দ্বীপ, বনশৃঙ্খলেই
যারা চিনেছে নিজের আত্মা, সেই যারা
একবার সমুদ্রঘণ্টার শব্দ শুনে
বুঝেছিল ডুবোপাহাড়ের ঘাই আছে
সামনে, আর যে-নৌকার মাল্লা সব খুনে,
সীমানা পেরিয়ে কিছু দস্যুতার আঁচে
ভাসমান দড়ি কেটে আগুন পোহায়—
এই কি তাদের গান—হাড়ের গুঞ্জন?
না কি আমারই শরীর থেকে ত্রিস্রোতায়
সে-গান মিশেছে! আমি কী ক'রে নির্জন
তার নিজের গভীরে এনে বলে যাব—'আছে,
তোমার সমস্ত গান এরিয়েল, আছে!'

দৈত্য মরলে

বেলাল মোহাম্মদ

দাদি বুড়ি ভূরি-ভূরি গপ্পো বলেন
মিথ্যামিথ্যি—
দৈত্য মরলে রক্তফোঁটায় দৈত্য গজায়
লক্ষ কোটি।
দাদি বুড়ি গপ্পো বলেন ভয়াল ভয়াল,
গা ছমছম চমকে উঠি।
রাজার গপ্পো,
প্রজার গপ্পো,
দৈত্যদানোপরীর গপ্পো—
শেষ হলেও রেশ কাটে না,
ঘুমের চোখে ঘুম আসে না,
এমন ভয়াল আজব গপ্পো।
রাজার মনে হাজার খেয়াল
যেমন ইচ্ছা শাসন চালান
কথায় কথায় বেজায় দাপট
প্রজার সামান লোপাট করেন।
এক সময়ে প্রজার ঘরে
জন্মাল এক দৈত্য ছেলে—
হাঁক ছেড়ে সে দাঁড়িয়ে গেল
টান করে বুক,
তাই তো দেখি, এমন সাহস।
তেড়ে এল রাজার সৈন্য—
পেছন থেকে মারল ছুরি—
বইয়ে দিল রক্তগঙ্গা।
কিন্তু এ কী, দৈত্য ছেলের
ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত থেকে
গজিয়ে গেল হাজার দৈত্য—
ওরা এখন রাজার আসন
করবে ঘেরাও।
কী যে বলেন দাদি বুড়ি
মিথ্যামিথ্যি।
রাজার গপ্পো, প্রজার গপ্পো
দৈত্যদানোর আজব গপ্পো,—
হোক সে যতোই মজার গপ্পো,

এ কখনো সত্য কি হয় ?

হতেই পারে, এই যে-রকম
বীজের থেকে বৃক্ষ গজায়,
ধ্বনির থেকে প্রতিধ্বনি—
বেনজামিনের মরণ থেকে
লক্ষকণ্ঠ কবির জন্ম ॥*

বাংলাদেশ

* কবি-শহীদ বেনজামিন মলোইশ। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকারের বিচারে এই কবির ফাঁসি হয়।

একান্তে

পরিমল চক্রবর্তী

বুড়ো বটগাছটার স্বদেশী ছায়ার নীচে
অন্তহীনতার রহস্য নিয়ে সাদা এক নদী
একলা বইছে, বইছে কালো বাতাস ;
হৃদয়তা তার সর্বাঙ্গে—রোদের স্নেহের মতো।
কার ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর শুনে-শুনে
স্মৃতি দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে
হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তার প্রত্যাশার সর্বস্বতা নিয়ে ?
আর, বটগাছটার পাতায়-পাতায়
একটানা গভীর মর্মর
করুণায় প্রতিমূর্ত যেন।
আর, অন্যদিকে এক চিরকিশোরের
রূপমগ্ন দুটি শান্ত অপরূপ চোখ
ওই বুড়ো বটগাছটার নিবিড় ছায়াকে ভালোবেসে
সব-কিছু ভুলে গেছে ;
তাই পড়ে আছে নদীকূলে,
পড়ে আছে একান্তে ॥…

সাক্ষাৎকার

কিরণশঙ্কর রায়

চোখের তারায় চুপ করে আছে আষাঢ়ের দিন
সাক্ষাৎকারে আজো কি নবীন
দেখব তোমাকে এবং তোমার স্বভাবতরুণী কিছু ডালপালা ?

আমি শুধু ভাবি মাটি থেকে বীজ এই যে নিরালা
উড়িয়ে এনেছে একজোড়া মেঘ,
জলের সহজ শব্দে কি তার
পেছনের সব বিদ্যুৎ-সাঁকো উড়িয়ে যাবার
কথা রেখে যাবে—
তাকে কি দেখাবে
স্বর্গ-পাতাল-ভেদ-করা ভুরু, ভ্রূ-মণ্ডলের গূঢ় উদ্বেগ
অথবা শেখাবে জলের স্খলন, সহজ স্খলন বা এক গভীর
সুখে হাওয়ার মুঠো খুলে-খুলে ধীরে নেমে আসা,
পাতার মতন—আমি শুধু ভাবি আমাদের সেই ভাগ্যের পাশা
পাতবে কি আজো জলের শব্দ, শরীরে বিজন নদীর দুতীর ?

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৬.৬

নীলকর-সাহেব-বিরোধী কোনো ফরাজি আন্দোলনও নীলচাষপ্রথার বিরুদ্ধে আগের বা পরের আন্দোলনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। যেখানে নীল-প্রতিরোধ আন্দোলন ব্যাপকভাবে হয় নি (যেমন ১৮৫৯-৬০ সালে হয়েছিল), সেখানেও এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন—চাষীরা একজোট হয়ে নীলকরের দাদন নেয় নি; নিলেও অত্যন্ত অযত্নে, অবহেলায় নীলচাষ করেছে; কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বোনা নীলকে গোপনে উপড়ে ফেলে দিয়েছে; নীলকরের লোকেরা জোর করে নীল বুনতে গেলে চাষীরা তাদের বাধা দিয়েছে; নীলকুঠির দিশী আমলাদের নানাভাবে হেনস্তা করেছে এবং উত্তেজনা চরমে পৌঁছলে নীলকুঠিও পুড়িয়ে দিয়েছে। ১৮৪০-এর দশকে বিদ্রোহী ফরাজিদের কর্মসূচিতে এসব বড়ো একটা দেখা যায় না। কারণ, নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, কোনো-কোনো নীলকরসাহেব বা তাদের প্রভাবশালী আমলা, গোমস্তা, যারা ফরাজিদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত করেছে, তাদের জব্দ করা। কাঞ্জিলালের মতো আমলাকে তারা নির্মমভাবে খুনও করেছে।

ফরাজিদের প্রধান নীলকর-শত্রু জাঁদরেল ডানলপ সাহেবের সঙ্গে তাদের দীর্ঘকালস্থায়ী বিরোধের কারণ বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।

দুদু মিঞার বিচারের সময় (১৮৪৭-৪৮) ডানলপের সাক্ষ্য (৩রা অগস্ট, ১৮৪৭) থেকেই এ কারণ অনুমান করা যায়। ডানলপ বলে—প্রায় ন বছর আগে দুদু এবং ফরাজিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নানা খবর যোগায়। 'সে সময় থেকেই তারা আমার উপর কড়া নজর রেখেছে'।[৭৯] তা ছাড়া দুদুর নানা 'উৎপীড়ন' বন্ধের চেষ্টাও সে মাঝে-মধ্যে করেছে। দুদুর সঙ্গে তার তিক্ত সম্পর্কের আর-একটা বিশেষ কারণও সে উল্লেখ করে: 'আমি কোনোদিন তাকে আমার সমান মনে করি নি;

আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমি কখনও তাকে চেয়ারে বসতে বলি নি ; আমার মনে হয়, এসব কারণে সে আমার উপর তিক্ত-বিরক্ত হয়' ।[৮০]

নীলচাষ নিয়ে কি এমন কিছু ঘটেছিল, যার জন্য এ সংঘর্ষ ? ডানলপের উত্তর : 'নীলের ফসল তোলার সময় গত বছর নানা সময় তুতু আমার লোককে বাধা দেয়' ।[৮১] ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাই সে সাহায্যও চায় । এ প্রসঙ্গে তার সর্বশেষ মন্তব্য : 'এর বেশি অন্য কিছু আমি মনে করতে পারছি না' ।

তাহলে এ সংঘর্ষের কারণ কী ? ডানলপ আর তার লোকদের সাক্ষ্য থেকেই বোঝা যায়, এটা মূলত দুই প্রবল গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই । তুতুর ক্রমবর্ধমান প্রভাব জমিদার আর নীলকরদের সমানভাবে বিব্রত করে । সরকারের পক্ষে যে তুতুর বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে সে এভাবেই ডানলপের তীব্র ফরাজি-বিদ্বেষ ব্যাখ্যা করে । তুতুর কড়া নির্দেশ ছিল, বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তির জন্য ফরাজিরা যেন কোনোরকম আইন-আদালতের আশ্রয় না নেয় ; কারণ তার বিচারই চূড়ান্ত । এ বিষয়ে স্থানীয় জমিদারের কাছে কোনো নালিশ সে বরদাস্ত করত না । তার হুকুম অমান্য করার জন্য শাস্তি ছিল কঠোর । সে বলে—তুতু এবং তার বাবা 'এতদিন সার্বভৌম রাজার মতো শিষ্যদের আর্জি ও আবেদনপত্র নিয়েছে ; তাদের জরিমানা করেছে ; তাদের নানা বিবাদের বিচার ও নিষ্পত্তি করেছে' ।[৮২] নিজের এলাকায় ডানলপ এ ধরনের প্রবল প্রতি-পক্ষের প্রতাপ সহ্য করে নি । নানা ধরনের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তুতুকে তাই সে বিব্রত করতে চাইল । এক মিথ্যা অভিযোগে তুতুকে গ্রেপ্তারও করা হয় । বিচারের সময় এর তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় : 'এতে [তুতু] মিঞা ও তার গোটা শিষ্য-সম্প্রদায়কে হেয় করা হল ; প্রকাশ্য এ অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ঠিক করল, এমন কিছু তারা করবে, যাতে ডানলপ আর 'বাবুরা' ব্যাপারটা ভালো বুঝতে পারবে ।'[৮৩]

৬.৭

ফরাজি সংগঠনে ও মানসিকতায় আস্তে-আস্তে গুরুত্ব-পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে । এর মধ্যে দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

ব্রিটিশরাজবিরোধিতা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে । তুতুর মৃত্যুর (১৮৬২) আগেই এ দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয় । সরকারের কাছে এক আর্জিতে[৮৪] তুতু নিজেই তার মনোভাবের কথা জানায় । সে বলে—জমিদার আর নীলকরের বিরুদ্ধেই ফরাজিদের সংগ্রাম ; স্থানীয় প্রশাসনের ফরাজিবিরোধী, পক্ষপাতদুষ্ট নানা ব্যবস্থা সত্ত্বেও ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের কোনো বিদ্বেষ নেই । তুতু এমনও বলে, স্থানীয় প্রশাসনে তাকেও কিছু দায়িত্ব দেওয়া হোক । তার উত্তরপুরুষদের যে ইতিহাস মুইনুদ্দীন খাঁ লিখেছেন, তা থেকে ব্রিটিশ রাজের প্রতি তাদের ক্রমবর্ধমান আনুগত্যের প্রমাণ মেলে ।

দ্বিতীয়ত, ফরাজিদের ভাবাদর্শে এবং কর্মসূচীতে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে । আমরা আগেই বলেছি, গোড়াকার ফরাজি আন্দোলনে হিন্দু-জমিদার-বিরোধিতা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে কোনো বিদ্বেষ থেকে উদ্ভূত নয় । কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায় ও হিন্দু-ধর্ম সম্পর্কে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা পরবর্তী কালে বাড়তে থাকে । স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল ; কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনা গোষ্ঠী-চেতনাকে ক্রমেই আচ্ছন্ন করে । যেমন, মুসলমান সমাজে ইসলাম-পরিপন্থী জীবনচর্যার প্রসারের কারণ হিসেবে তারা প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের প্রভাবকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে । সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিস্তারের ফলেও তাদের সম্প্রদায়গত আনুগত্যবোধ বাড়ে । স্বদেশী আন্দোলনের সময় এ বোধ আরো প্রকট হয় ।

৭

ওহাবি-ফরাজি আন্দোলনের মতো ময়মনসিংহ জেলার

শেরপুর অঞ্চলের পাগলপন্থী আন্দোলনও বহুলাংশে এক ধর্মীয়-গোষ্ঠী-নির্দেশিত। এ গোষ্ঠীর উদ্ভবও হয়েছিল আন্দোলনের মাত্র কয়েক দশক আগে। এখানেও আন্দোলনের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কার। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তা কৃষকদের প্রতিরোধ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

পাগলপন্থীদের ধর্ম ও রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য আমরা কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব: (ক) ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে 'পাগলপন্থা'র প্রভাব কিভাবে বিভিন্ন উপজাতি- ধর্ম ও অন্যান্য গোষ্ঠী-ভুক্ত[৮৫] কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে? (খ) এ আন্দোলন কেমন করে কৃষকদের জমিদার-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ে? (গ) কিভাবে প্রধানত জমিদারবিরোধী এ আন্দোলন এক বিশেষ সময়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষমতা-লাভের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়? (ঘ) আন্দোলন পরিচালনায় পাগলপন্থী গোষ্ঠীর ভূমিকা কী ছিল?

৭.১

ওই বিশেষ সময়কার পাগলপন্থীদের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুশাসন, আচার, রাজনীতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। এ সম্পর্কে একমাত্র সমসাময়িক বিবরণ বিদ্রোহের উপর মরিসন-লিখিত সরকারি প্রতিবেদন।[৮৬] স্পষ্টত, বিদ্রোহীদের সম্পর্কে মরিসনের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সংস্কৃতিকে বোঝার জন্য শুধু বৈজ্ঞানিকের নিরাসক্ত দৃষ্টিই যথেষ্ট নয়; সে সংস্কৃতিভুক্ত মানুষগুলির সম্পর্কে এক গভীর সহমর্মিতাবোধ না থাকলে তাদের বিশ্বাসের অন্তরঙ্গ জগতে পৌঁছনো সম্ভব নয়। রাজপ্রতিনিধি মরিসনের কোনোটাই ছিল না।

তবুও এ বিবরণ থেকে কিছু-কিছু তথ্য আর ইঙ্গিত মেলে। "পাগলপন্থা"র প্রবর্তক এক মুসলমান ফকির—করিম। এর প্রবর্তন বিদ্রোহের মাত্র পাঁচ দশক আগে, প্রধানত ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস হিসেবে। শেরপুর আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের ধর্মীয় আর নৈতিক জীবনে বিকৃতি আর উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ করে তিনি এ সংস্কারের কাজে ব্রতী হন। তাঁর নূতন ধর্ম এক ধরনের দ্বৈতবাদী ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে স্থানীয় অধিবাসীদের উপযোগী করে তিনি তাঁর ধর্মাদর্শ প্রচার করেন। কিন্তু তাঁর অনুগামীদের জীবনচর্যা প্রচলিত রীতিনীতি থেকে এতই ভিন্ন ছিল যে, অন্যরা তাদের 'পাগল' বলে ডাকত। স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে তাদের সংহতিবোধের উৎস—প্রীতি এবং সৌভ্রাত্রবোধ; পরস্পরকে তারা 'ভাই' বলে ডাকত; আর গুরুর প্রতি ছিল অবিচল শ্রদ্ধা। করিমের ব্যাপক প্রভাবের দুটি প্রধান কারণ: তাঁর পূতচরিত্র, ধর্মনিষ্ঠা; এবং অলৌকিক ক্ষমতা, 'জাদুবিদ্যা'-কুশলতা। সুসঙ-জমিদার নিজেই তাঁর জমিদারির অন্তর্গত লাটেরকান্দী গ্রামে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করেন। শিষ্যদের দানেই করিম পরিবারের ভরণপোষণ চলত।

পুত্র টিপুকেই করিম ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব দেন। প্রধানত তার উদ্যোগেই শিষ্য-সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। সরকারি প্রতিবেদন-মতে, করিমের মৃত্যুর (আনুমানিক ১৮১৩) পর পাগলপন্থা ও সংগঠনে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সংগঠন পরিচালনার ভার পড়ে তাঁর স্ত্রী আর পুত্রের উপর। শিষ্যরা বিশ্বাস করত, গুরুপত্নীও অলৌকিকক্ষমতাসম্পন্না। কিন্তু মরিসনের ধারণায়, টিপুর না ছিল পিতার আদর্শনিষ্ঠা, না ছিল কোনো বিদ্যা-বুদ্ধি[৮৭]; স্থানীয় জনসাধারণের নৈতিক জীবন-শুদ্ধির কোন প্রয়াস তার ছিল না। শুধু তাই নয়, তার জীবনে তাদের 'কুসংস্কারের' প্রভাব বাড়তে থাকে; তাদের অন্ধ বিশ্বাসের তাগিদেই জাদুবিদ্যার নানা কারুকলা দেখানোর দিকে তার প্রবণতা বাড়ে। এভাবেই শিষ্যদের উপর তার বিপুল প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

করিমের প্রতি মরিসন শ্রদ্ধাবান; কিন্তু টিপুর চরিত্রে প্রশংসা করার মতো তিনি কিছুই দেখেন নি।

রাজবিরোধী বিদ্রোহের নেতা টিপুর চরিত্র-চিত্রণে রাজপ্রতিনিধির দৃষ্টিতে আবিলতা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাঁর বিবরণের কয়েকটা দিক কিন্তু লক্ষণীয়: যেমন, শেরপুর অঞ্চলে নানা ধর্ম ও উপজাতিগোষ্ঠীর সহাবস্থান; "পাগলপন্থা"র সাম্প্রতিকতা; "পাগল-পন্থা"র প্রবর্তক করিম শা'র ফকির হিসেবে পরিচিতি করিম-অনুগামীদের "পাগল" আখ্যা; করিমের বিপুল প্রভাব; এর একটা কারণ হিসেবে করিমের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে শিষ্যদের বিশ্বাসের উল্লেখ, এবং টিপুর আমলে পাগল-সংগঠনে দ্রুত পরিবর্তন।

মুসলমান ফকির হিসেবে করিমের পরিচিতি। কিন্তু ইসলাম ধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রূপ কী? স্টিফেন ফুক্স্ পাগলপন্থাকে "ইসলাম পুনরুজ্জীবন" আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন। ওহাবি-ফরাজি আন্দোলনের সঙ্গে এ বৃহত্তর পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের যে প্রত্যক্ষ যোগ, পাগলপন্থার ক্ষেত্রে তা মোটেই ছিল কিনা বলা শক্ত।

এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ওহাবি-ফরাজি গুরুর প্রচার ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল—ভ্রান্ত বিশ্বাস আর আচার থেকে মুসলমানদের ইসলামের আদি অনাবিল ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়ে আনা। পাগলপন্থার প্রচার আর আকর্ষণ মোটেই এ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা ধর্মসম্প্রদায়ের লোক করিমের শিষ্য হয়েছে। বস্তুত পাগলপন্থায় দীক্ষার জন্য কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ ছেড়ে আসার প্রয়োজন সম্ভবত ছিল না।

দ্বিতীয়ত, ইসলামের নির্দেশ করিম সচেতনভাবে লঙ্ঘন না করলেও, তাঁর সাধনপদ্ধতির বিশিষ্ট একটা ধারা ছিল। ইসলামীয় দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেও সে ধারা এত ভিন্ন যে এর অনুগামীদের মুসলমান সমাজে স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী হিসেবে গণ্য করা যায়। বস্তুত এ পদ্ধতির এমন কিছু ধর্মীয় এবং সামাজিক তাৎপর্য ছিল, যার জন্য বহুক্ষেত্রে এরা ইসলামবিরোধী বলে নিন্দিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, ইসলামের আদি আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী ওহাবি-ফরাজি নেতাদের তীব্রতম সমালোচনার একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল এরা।[৮৮]

সাধনার এ বিশিষ্ট ধারার নাম সূফীবাদ। মরমিয়া সাধনপদ্ধতির এটা একটা রূপ। বিধিবদ্ধ বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ভূমিকা এখানে একান্তই গৌণ। অন্তর্মুখী সাধনার মধ্য দিয়ে সাধক ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধি করে; এর ফল সাধকের চেতনার সমুন্নতি; তার অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে অনির্বচনীয় আনন্দের প্রকাশ। সাধনপদ্ধতির নানা রূপ—ভক্তি, তন্ময় ধ্যান ইত্যাদি। এ রূপ যাই হোক, সাধনার মূল লক্ষ্য অহং-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসত্তার বিলোপের মধ্য দিয়ে ভগবানের সান্নিধ্য উপলব্ধি।

এ উপলব্ধি একান্ত ব্যক্তিগত, অন্তরঙ্গ। বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরতা তাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এ সাধনপদ্ধতি গুরুর নির্দেশ ছাড়া সম্ভব নয়। যিনি নিজে ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন, নির্দেশ দেবার অধিকার শুধু তাঁরই। তাঁর নির্দেশেই সাধক সাধনার জটিল ও দুর্গম পথ পেরিয়ে এ বোধের অধিকারী হতে পারে। গুরুর উপর অবিচল আস্থা এ সাধনপদ্ধতির এক প্রধান বৈশিষ্ট্য।[৮৯] ওহাবি-ফরাজিরা এ গুরুবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে চেয়েছিল। ব্যক্তিসত্তার বিনাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরোপলব্ধি এ সাধনার এক অনিবার্য ফল। জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধি বিষয়ে ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য; এমন কী সংসারত্যাগ। করিমের 'ফকির' আখ্যার মধ্যে এ বৈরাগ্য আর ত্যাগের ব্যঞ্জনা আছে। ইসলাম ধর্মে কিন্তু সংসার-ত্যাগের বিধান নেই।[৯০]

তাই, মরমিয়া সূফীবাদ ইসলাম-ধর্মতত্ত্বের কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠলেও এ ধর্মতত্ত্বের অপরিহার্য কোনো অঙ্গ নয়। বস্তুত, অন্যান্য অনেক ধর্মের মধ্যেও এ মরমিয়া সাধনপদ্ধতি বিকাশ লাভ করেছে। সম্ভবত, সূফীসাধনার যে ধারার সঙ্গে করিম শাহ

যুক্ত, তার উপর একটা প্রভাব বাউল-সাধনা। উল্লেখযোগ্য এই যে, বাউলরা "পাগল" নামেও পরিচিত ছিলেন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ভগবৎ-উপলব্ধির গভীর আনন্দে তাঁরা চেতনার এমন এক স্তরে বিহার করতেন যে, দৈনন্দিন জীবনের অভ্যস্ত রীতিকে তাঁরা একরকম উপেক্ষাই করতেন। করিম-অনুগামীদের 'পাগল' আখ্যার সঙ্গে বাউলদের এ প্রচলিত অ্যাখ্যার যোগ থাকলেও থাকতে পারে। বাউল-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ দেহতত্ত্বও কি ওই অঞ্চলের সূফীদের প্রভাবিত করেছিল? এ সিদ্ধান্ত গবেষণা-সাপেক্ষ। পাগলপন্থীদের উপর সাম্প্রতিক এক মনোজ্ঞ আলোচনা[৯১] থেকে আমরা জানতে পারি, ওখানকার সূফী সাধনায় হিন্দু হঠযোগপদ্ধতির প্রভাব ছিল। অবশ্য বাউল-দেহতত্ত্ব হঠযোগীদের দেহকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া থেকে ভিন্ন।

বলাই বাহুল্য, করিম শাহের বিপুল প্রভাবের কারণ সূফী সাধনপদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন নয়। সূফী বা বাউল-সাধনার কঠিন পথ যে অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় ছিল না, তা ধরেই নেওয়া যায়। টিপুর আমলে পাগলপন্থার জনপ্রিয়তার একটা কারণ, পাগল-সম্প্রদায় জমিদার-বিরোধী আন্দোলনে আস্তে আস্তে যুক্ত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু গোড়ার দিকে এ যোগ প্রত্যক্ষ ছিল বলে মনে হয় না।

তাহলে শেরপুরের গ্রামীণ সমাজে করিম কি-ভাবে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরে-ছিলেন? পূতচরিত্র ধর্মনিষ্ঠ সিদ্ধ ফকির হিসেবে করিমের প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধার কথা বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের সময় মরিসন জানতে পেরেছিলেন, একথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু পাগলপন্থার দ্রুত বিস্তারে করিমের প্রচারিত আদর্শের ভূমিকা সন্দেহাতীত। মরিসন খোঁজ নিয়ে জেনে-ছিলেন, সাধারণ মানুষের উপযোগী করে করিম নিজের ধর্মাদর্শ প্রচার করেন। কিন্তু সে আদর্শ সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদনে বিশেষ কিছু বলা হয় নি। শুধু প্রীতি আর সৌভ্রাত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্রোহের প্রায় একশ বছর পরে লিখিত এক বইয়ের[৯২] ভিত্তিতে করিমের নৈতিক আদর্শ এবং সামাজিক দর্শন নিয়ে সম্প্রতি এক আলোচনা[৯৩] হয়েছে। বিদ্রোহ শুরু হবার আরো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে করিমের প্রচারের যথাযথ বিবরণের জন্য এ বই নির্ভরযোগ্য কি-না, তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে[৯৪]। তবুও লেখক পাগলপন্থী বলে, এবং নানা ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে পাগল-পন্থার আদি রূপ জানা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল বলে, তাঁর বিবরণ আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি।

নৈতিক বিধানগুলি[৯৫] সহজ, সরল। ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যবাদিতা, ক্রোধজয়, পরনিন্দাপরিহার—লেখকের মতে পাগলগুরু এসব চারিত্রিক গুণের উপর বিশেষ জোর দিতেন। কতগুলি বিধান সম্ভবত স্বল্পসংখ্যক অনুগামীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যেমন কঠোর শৃঙ্খলায় রোজা পালন করা। 'পাগলরা দিন ও রাত ধরেই উপবাস করত। সন্ধ্যার পরে রোজার মত উপবাস ভাঙত না।' সবার পক্ষে এ নিয়ম মানা অসম্ভব ছিল। করিমের সামাজিক দর্শনও ছিল সহজবোধ্য, যেমন ঋণের জন্য সুদ দাবি না করা, পণ না নেওয়া, ভগবান ছাড়া কারো অধীনতা স্বীকার না করা, ভগবানের রাজ্যে কাকেও 'সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত না করা' ইত্যাদি। প্রেম আর ভ্রাতৃত্ব-বোধের আদর্শ আগেই উল্লেখ করেছি।

এ সামাজিক দর্শনে মৌলিকত্ব হয়তো বিশেষ ছিল না; কিন্তু জমিদারি-অপশাসন-ক্লিষ্ট কৃষককুলের কাছে এ প্রচারের মূল্য ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে এ প্রচার একেবারে সাম্প্রতিক। বিশেষ এক পরিবেশে, বিশেষ এক ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় অতি পরিচিত কথাও প্রাণময়, গভীর-অর্থবহ হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে করিমের ব্যাপক প্রভাবের একটা প্রধান কারণ, তাঁর আদর্শ ও বাণী কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল

না। আগেই বলেছি, ইসলাম ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে এর কোনো অসংগতি ছিল না ; কিন্তু এমন নয় যে, অন্য কোনো ধর্মীয় দর্শনের সঙ্গে এর অসংগতি ছিল। ওহাবি-ফরাজি গুরুরা চেয়েছিলেন, তাঁদের অনুগামীরা সত্যিকারের ইসলামপন্থী হবে। করিমের প্রচারে এ ধরনের সম্প্রদায়গত কোনো ঝোঁক ছিল না। অন্তত কিছু-কিছু ক্ষেত্রে ওহাবি-ফরাজিরা জোর করে নিজেদের মত চাপাতে চেষ্টা করেছে। ভিন্ন ধর্মমত এবং আচার সম্পর্কে করিমের ঔদার্য অনেক বেশি। সেজন্য বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর কৃষকের কাছে করিমের আদর্শের একটা সহজ আকর্ষণ ছিল। তা ছাড়া, যাদের মধ্যে করিম নূতন আদর্শ প্রচার করেন, তাদের ধর্মবিশ্বাস আর নীতিও এমন কোনো অনড় কাঠামোতে ক্লিষ্ট হয় নি, যা অতিক্রম করে এ আদর্শে সাড়া দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। এ অঞ্চলে নূতন আবাদযোগ্য জমিলাভের আশায় নানা উপজাতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত কৃষকেরা ক্রমান্বয়ে বসতি স্থাপন করে। নানা উপজাতির মিশ্রণের ফলে তাদের আদি সমাজ-সংগঠন, ধর্মবিশ্বাসও অনেকখানি পালটে যায়। উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে যে ধরনের যৌথ সমাজব্যবস্থা দেখা যায়, এখানে তা অনেক দুর্বল হয়ে পড়ে।

করিম-পুত্র টিপু সম্পর্কে মরিসনের একটা মন্তব্য পাগলপন্থার জনপ্রিয়তা বুঝতে সাহায্য করে। টিপু-বিরোধী ঝাঁজ এখানে সুস্পষ্ট। কিন্তু এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, আদি পাগলপন্থা কিভাবে স্থানীয় লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। মরিসনের মতে[৯৬] বিদ্যাবুদ্ধি, পড়াশুনো বলতে টিপু পাগলের কিছুই ছিল না। তাই বিকৃত-রুচির পাহাড়িয়া, এবং হাজং, ডালু, বোনাও, ছত্রি, বংশী ও ডাই জাতিভুক্ত সর্ব-নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান শিষ্যদের যাবতীয় বদগুণ আস্তে-আস্তে তার চরিত্রে ঢোকে। তার বাবার সব সৎশিক্ষা সে অচিরে ভুলে যায়···সাধারণ এ মানুষগুলোর কুসংস্কারময়তার জন্য জাদুবিদ্যার নানা কসরত দেখিয়ে সে নিজেকে এক নামী ফকির হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

পাগলপন্থায় বিশিষ্ট ধর্মীয় এবং নৈতিক আদর্শ অবশ্যই ছিল ; কিন্তু উপজাতি ও অন্যান্য কৃষকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের বহু যৌথ বিশ্বাস ধীরে-ধীরে তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, পরিবর্তন-প্রয়াসী কৃষকসমাজ বহু ক্ষেত্রেই নূতন সাংস্কৃতিক প্রভাবকে নিজেদের অভ্যস্ত জীবনচর্যার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। পাগলপন্থীদের ক্ষেত্রে এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন জীবন-যাপন সংক্রান্ত ব্যাপারে করিম তাঁর শিষ্যদের কোনো কঠোর, অনমনীয় অনুশাসনে আবদ্ধ করতে চান নি।

অব্যাহত প্রাচীন বিশ্বাসগুলির অন্যতম প্রধান ছিল জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস। টিপুর 'জাদুবিদ্যার কসরত' দেখানো সম্পর্কে মরিসনের মূল সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। তার ধারণা, সাধারণ মানুষের 'কুসংস্কার' ভাঙিয়ে টিপু ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রভাব কায়েম করতে চেয়েছিল। জাদুবিদ্যার সামাজিক তাৎপর্য এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের দুটি প্রধান দিক : জাদু-শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি থেকে ভিন্ন ; বস্তুত, প্রাকৃতিক শক্তির উপর প্রভুত্ব অর্জনের একটা প্রধান উপায় জাদুশক্তি ; দ্বিতীয়ত, জাদুশক্তির যথাযথ প্রয়োগ বিশেষ কোনো ব্যক্তির অনন্যসাধারণ ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ; এ প্রয়োগ বহুক্ষেত্রে সমগ্র গোষ্ঠীর স্বার্থে। এ প্রয়োগের সামাজিক কল্যাণের জন্যই জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসের সঙ্গে পাগল-পন্থার অনুসরণে কোনো অসঙ্গতি ছিল না। প্রকৃতির শক্তি নিয়ন্ত্রণে মানুষের সীমিত ক্ষমতার জন্যই সচরাচর জাদুবিশ্বাসের জন্ম। কিন্তু এ ক্ষমতার উল্লেখ-যোগ্য বৃদ্ধি ঘটলেই যে এ বিশ্বাস দূর হয়ে যাবে, তা মোটেই নয়।

শ্রীভদ্র দেখিয়েছেন,[৯৭] এ ধরনের মিশ্রণ এ

অঞ্চলের পীর-ঐতিহ্যের একটা লক্ষণীয় দিক। তত্ত্বগত-ভাবে সূফীবাদের সঙ্গে এ বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ যোগ নেই। কিন্তু জাদুবিদ্যা-প্রয়োগের বিশেষ ক্ষমতা পীরের উপর আরোপিত হয়। এর একটা কারণ, সূফী-সাধনায় গুরুর বিশিষ্ট ভূমিকা, যার উল্লেখ আগেই করেছি। গুরুকেন্দ্রিক এ সাধনার একটা পর্যায়ে ভগবানের বিভূতি ভগবৎসাধনার পথনির্দেশক গুরুর উপর আরোপিত হতে থাকে।

কিন্তু ঐতিহ্যের প্রভাব এমনই প্রবল ছিল যে একেবারে গোড়া থেকেই শিষ্যরা গুরু করিম, গুরুপত্নী ও গুরুপুত্র টিপুকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। কথিত আছে, করিমের বিপুল জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ, দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ে তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে শিষ্যদের বিশ্বাস। পাগলপন্থী ঐতিহ্যানুযায়ী করিম নিজেই এ ক্ষমতার অধিকার দাবি করতেন। নিজে তিনি দাবি করুন বা নাই করুন, তাঁর এ ক্ষমতায় শিষ্যদের অবিচল আস্থাই যথেষ্ট ছিল।

পীর-সাধনার স্থানীয় ঐতিহ্য যে এ বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এ ঐতিহ্য না থাকলে এ ধরনের বিশ্বাসের জন্ম হত না, এ ধারণা অমূলক। বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী উপজাতিদের অন্য তিনটি আন্দোলনে এ বিশ্বাস বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।

উৎস যাই হোক, অলৌকিক জাদুক্ষমতা প্রয়োগের নানা রূপ; কিন্তু তারাও নির্দিষ্ট নয়। বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণ নূতন রূপে এ প্রয়োগ দেখা যেতে পারে। সাধারণভাবে, দৈনন্দিন জীবনের নানা বিপদ-আপদের ক্ষেত্র এ প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকে—যেমন কঠিন কোনো রোগ-নিরাময় বা আকস্মিক কোনো দুর্বিপাকের অবসান। কিন্তু পাগলপন্থী আন্দোলনে ক্ষেত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেটা বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দুর্দশা দূর করার উপায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। নেতার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী সুসংবদ্ধ এক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পাগলপন্থী আন্দোলনের লক্ষ্যে এ মৌলিক রূপান্তরের কারণ শুধু জমিদারি স্বৈরাচারের আকস্মিক তীব্রতা বৃদ্ধি নয়; এ বিশ্বাস ছাড়া এ রূপান্তর ঘটত না।

৭.২

এটা অনস্বীকার্য যে জমিদারবিরোধী সংঘর্ষে পাগল নেতাদের ভূমিকা না থাকলে পাগলপন্থার প্রভাব এত বিস্তীর্ণ হতে পারত না।

এ সংঘর্ষের কারণ-বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। তবে এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন।

(ক) জমিদারদের প্রজাপীড়ন তখনকার বাঙলা-দেশে অতি সাধারণ ঘটনা। তবে শেরপুর-জমিদারদের নানা বেআইনি কাজকে এ ধরনের প্রজা-পীড়নের সমগোত্রীয় মনে করা সমীচীন মনে হবে না। এ অঞ্চলের জমিদার-প্রজার তিক্ত সম্পর্কের এমন কতগুলো কারণ ছিল, যা বাঙলার সব অঞ্চল সম্পর্কে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

(খ) এ অঞ্চলের উপর মোঘল শাসনযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল অপ্রত্যক্ষ এবং একেবারেই সীমিত। প্রাক্-মোঘল যুগের সামন্তরা জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি পেল; কিন্তু জমিদারদের আনুগত্য সম্পর্কে সংশয় না থাকলে মোঘলরাজপ্রতিনিধি কদাচিৎ জমিদারি পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করত। প্রজাদের খাজনার হার ও পরিমাণ নির্ধারণে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকাই ছিল না।

(গ) গোড়ার দিকে ব্রিটিশরাজশক্তিও জমিদারের এ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের বিশেষ চেষ্টা করে নি, যদিও নানা কারণে মাঝেমধ্যে কোম্পানি এ অঞ্চলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। একটা বিশেষ ব্যতিক্রম ছিল। গারো পাহাড়ের অধিবাসীদের উপর তুলো এবং অন্যান্য সামগ্রীর সওদায় জমিদারেরা

যে জুলুম চালাত, সরকার তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। তাতে এ জুলুম খানিকটা কমে; কিন্তু সমতলের কৃষকদের উপর জমিদারের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত থেকে যায়।

(ঘ) প্রধানত শরিকি-বিবাদের ফলেই, ১৭৭০-এর দশক থেকে জমিদার-প্রজা সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর চাষবাসের দ্রুত প্রসারের ফলে এবং অন্যান্য কারণে এ বিবাদ আরো বাড়ে। বিভিন্ন জমিদারগোষ্ঠীর অন্তর্বিবাদ কোনো-কোনো অবস্থায় কৃষকদের পক্ষে মঙ্গলজনকও হতে পারে, কারণ জমিদারি প্রশাসন এতে দুর্বল হয়; খাজনা (ও আবওয়াব) আদায়ের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত আমলাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যাহত হয়। কৃষকেরা এর সুযোগ নিতে পারে, প্রধানত বিচ্ছিন্নভাবে জমিদারি অনুশাসনকে উপেক্ষা করে।

শেরপুরের শরিকি বিবাদ ভিন্ন ধরনের। তা শুধুমাত্র আইন-আদালত মারফত বিতর্কিত অধিকার প্রতিষ্ঠার উপায় নয়; প্রায়শ তা ছিল সহিংস, রক্তক্ষয়ী,—বিবদমান গোষ্ঠীর লাঠিয়ালদের মধ্যে সংঘর্ষ। সদর দেওয়ানি আদালত বিবাদ-মীমাংসার উপায় হিসেবে বাটোয়ারার বিধান দেয়; কিন্তু বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী এ নির্দেশ উপেক্ষা করে। তাই আবার সংঘর্ষ ঘটে। এ সংঘর্ষ মাঝে-মাঝে এমন পর্যায়ে পৌঁছাত যে প্রশাসনকে সৈন্যবাহিনী তলব করতে হত—যেমন ১৮০৩ ও ১৮০৮ সালে। ১৮০৮ সালে আটাত্তর গ্রাম এভাবে সর্বস্বান্ত হয়।

(ঙ) তা ছাড়া, এ ধরনের সংঘর্ষের ফলে জমিদারদের অতিরিক্ত অর্থের যোগাড় করতে হত। তাই অনিয়মিত আবওয়াব আদায় করা ছাড়া তাদের অন্য উপায় ছিল না।

(চ) শরিকি-সংঘর্ষ যখন চরমে উঠত, সরকার সাময়িকভাবে নিজের মনোনীত ব্যক্তির উপর জমিদারি পরিচালনার ভার দিত। ধারণা ছিল, এতে শরিকি কোন্দল কমবে। কিন্তু ফল অনেক সময় বিপরীত হত। এর প্রধান কারণ সরকারি প্রতিনিধির অসততা। অবৈধ আবওয়াব আদায় বন্ধ করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপেও হিতে বিপরীত হত। সরকার ভাবল; হুকুম জারি করে দীর্ঘদিনের এ জমিদারি রেওয়াজ বন্ধ করা যাবে। ১৮১৬ এবং ১৮১৮ সালে সরকার নির্দেশ দিল, আলাদাভাবে আবওয়াব আদায় করা চলবে না, একটা নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করতে হবে। এ আদেশ জমিদার মানে নি। ১৮২১ সালে কানুনগো পদ পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সরকারি চেষ্টায় জমিদারেরা প্রমাদ গুনল। তাদের আশঙ্কা ছিল, এবার বেআইনি আবওয়াবের কথা সব ফাঁস হয়ে যাবে; এমনকী সরকার আইন করে ওগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ করেও দিতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের জন্য তারা আগে থেকেই খাজনার হার আর পরিমাণ বাড়িয়ে দিল।

(ছ) এ ধরনের জমিদারি স্বৈরাচার হামেশাই ঘটছিল। এর একটা প্রধান কারণ, সরকারি প্রশাসনের শিথিলতা, বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা।

৭.৩

জমিদারবিরোধী বিক্ষোভ তাই ক্রমেই বাড়তে থাকে। সরকারি নথিপত্র থেকে প্রতিবাদী কৃষকদের সঙ্গে পাগল নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান সংযোগ অনুমান করা যায়।

করিমের মৃত্যুর (১৮১৩) পর থেকে পাগলপন্থী সংগঠনে পরিবর্তন ঘটে। অন্তত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, টিপুর আমলেই পাগলপন্থীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। মরিসন জানতে পারেন, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই শেরপুরে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে টিপু নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম করে। পাগল-দলের কোনো-কোনো কাজকে মরিসন স্রেফ ডাকাতি বলেছেন।[৯৮] এ কাজের বিস্তারিত বিবরণ নেই। তবে জমিদার-কৃষক সম্পর্কে তিক্ততা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে 'ডাকাতি' হয়তো জমিদার-বিরোধী সংঘর্ষের কোনো ঘটনা ছিল। সরকারি আইনে সংঘবদ্ধ

কৃষক-প্রতিরোধকে বর্ণনা করার অন্য কোনো ভাষা নেই। অন্য একটা দৃষ্টান্ত থেকেও এটা স্পষ্ট হবে। মরিসনের প্রতিবেদন অনুযায়ী,[৯৯] টিপুর রাজদ্রোহ-মূলক এক ঘোষণার উপলক্ষ নাকি, এক সাধারণ সিঁদেল চুরির ঘটনা (১৮২৪)। টিপু তখন তার সহগামীদের বলে—কোম্পানি রাজ শেষ হতে চলেছে ; সেই হবে শেরপুর পরগনার সর্বেসর্বা ইত্যাদি। সিঁদেল চুরিতে সহগামীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য কোম্পানিরাজ অবসানের আসন্নতা সম্পর্কে বৈপ্লবিক ঘোষণার কোনো প্রয়োজন ছিল কি ?

পাগলপন্থী কৃষক বিক্ষোভের সবচাইতে উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন নিজেদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ সংগ্রামের সিদ্ধান্ত।

১৮২৩-২৪ সাল পর্যন্ত পাগল-আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল সীমিত—জমিদারের বেআইনি কাজে বাধা দেওয়া ; অবৈধ আবওয়াব আদায়ের চেষ্টা প্রতিরোধ করা। কোথাও তারা এ কথা বলে নি যে জমিদারি কর্তৃত্বের অবসান হোক। সহিংস প্রতিরোধ কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল ; কিন্তু আন্দোলনের প্রধান রূপ ছিল, সম্মিলিতভাবে আদালতে জমিদারদের দাবিকে বেআইনি প্রমাণ করা। আদালতে গিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছিল না বলে তারা ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিল। আইনমাফিক প্রতিরোধের ভঙ্গিও মোটেই গতানুগতিক ছিল না। সাধারণত বাদী ও বিবাদী পক্ষ নিজেদের বক্তব্যের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য উকিল ইত্যাদি মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করে। পাগলপন্থীরা শুধু এতেই নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। দল বেঁধে আদালতের কাছে জমায়েত হত।

৭·৪

১৮২৪ সালের শেষের দিকে এ আন্দোলনে মৌলিক, পরিবর্তন ঘটতে থাকে।[১০০] আন্দোলনের লক্ষ্য তখন শুধুমাত্র জমিদারি স্বৈরাচারের প্রতিরোধ নয়—জমিদারতন্ত্র ও কোম্পানিরাজের অবসান ; স্বাধীন পাগলরাজের প্রতিষ্ঠা। তাদের বিশ্বাস ছিল, শুধুমাত্র এতেই তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটবে। তাদের আরো বিশ্বাস ছিল, এ লক্ষ্য দুঃসাধ্য কিছু নয় ; কারণ তাদের নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতার জন্য তাদের প্রতিরোধ দুর্জয় হবে।

আন্দোলনের এ মৌলিক পরিবর্তনের পটভূমিকা হিসেবে দুটো প্রধান ঘটনাকে চিহ্নিত করা যায়। ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে (১৮২৪-২৬) নানাভাবে জমিদারদের প্রজাপীড়নের তীব্রতা হঠাৎ বেড়ে যায়। দ্বিতীয় ঘটনা—বিদ্রোহীদের মানসিকতায় গুরুত্বপূর্ণ এক পরিবর্তন ; তাদের এক দৃঢ় প্রত্যয় যে ব্রিটিশরাজ জমিদার-বিরোধী কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেবে না।

আসলে, বিদ্রোহীদের এ নূতন উপলব্ধিই আন্দোলনে এ মৌলিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ। স্বর্ণযুগ আবির্ভাবের নিশ্চিত সম্ভাবনায় বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত সব কৃষক-বিদ্রোহেই এ উপলব্ধির প্রধান ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এ ধরনের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের মধ্য দিয়ে শোষক-শ্রেণীর প্রভুত্বের অবসান ঘটানো। স্বভাবতই যদ্দিন এ বিশ্বাস থাকে যে তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থা শোষকগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে, কৃষকদের ন্যায্য দাবিকে সহানুভূতি নিয়ে বিচার করবে, অর্থাৎ রাজশক্তি প্রকাশ্যে জমিদার বা অন্য প্রবল শ্রেণীর পক্ষ নেবে না—তত দিন বিকল্প রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের প্রশ্ন আসে না। এ বিশ্বাস ভেঙে গেলেই এ ভিন্ন মানসিকতার জন্ম হয়। এমন নয়, কৃষকদের বিচার সবক্ষেত্রেই অভ্রান্ত। যে ধারণার উপর এ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, সে ধারণা ভুল হতে পারে ; কিন্তু এখানে যা প্রাসঙ্গিক, তা হল কৃষকদের এ বিশেষ মানসিকতা বোঝা। ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরার সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। সচরাচর এ উপলব্ধি আসে আকস্মিক কোনো অভিঘাতের জন্য। এ আকস্মিকতার জন্যই মানসিকতায় এত দ্রুত

পরিবর্তন আসে। এমন নয় যে রাজশক্তির ন্যায়-পরায়ণতা সম্পর্কে কৃষকদের আগে কখনও অবিশ্বাস বা সন্দেহ জন্মায় নি। কিন্তু নানা কারণে সে সন্দেহ এক নিশ্চিত প্রত্যয়ে রূপান্তরিত হয় নি। তা ছাড়া, এ নূতন ধরনের আন্দোলন শুরু করার আগে কৃষক-দের নানা দিক বিচার-বিবেচনা করতে হয়; কারণ এতে ঝুঁকি অনেক; পরাজয় শোষকশ্রেণীর ক্ষমতা আরও মজবুত করবে, এটাও তারা জানত। তাই সংকল্পকে কার্যকর করার আগে কৃষকদের মনে আসে নানা সতর্ক বিচার, দ্বিধা, সংশয়। এ নূতন আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নিতে বহুদিন সময় লেগেছিল। ঝোঁকের মাথায় বিদ্রোহীরা কিছু করে নি।

রাজশক্তি সম্পর্কে এ নূতন ধারণার কারণও ভিন্ন। ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের পূর্বেকার অবিশ্বাস-এর কারণ, জমিদারের নানা বেআইনি কাজ বন্ধ করার জন্য সরকারি তৎপরতার অভাব। তা ছাড়া, অসহিষ্ণু কৃষকেরা নিজেরা সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নিলে, সরকার সঙ্গে-সঙ্গে পালটা ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে 'উত্তেজনা' না বাড়ে। কিন্তু নূতন আন্দোলনের আগে যে ঘটনাগুলি কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তার প্রায় সবগুলির সঙ্গে সরকারের ছিল প্রত্যক্ষ যোগ। এ ঘটনাগুলির তাৎপর্য শুধু আগেকার মতো অতিরিক্ত খাজনা বা আবওয়াবের দাবি নয়। সমগ্র আঞ্চলিক কৃষি-অর্থনীতির উপর এতে এক গুরু বোঝা চাপে। শুধু তাই নয়। আগে সংঘবদ্ধ কৃষকেরা নানাভাবে অতিরিক্ত খাজনার দাবি বেশ কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারত। এখন তার কোনো উপায় থাকল না।

নূতন ঘটনাগুলি ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত। সামরিক প্রয়োজন বলেই এ সম্পর্কিত সরকারি সব নির্দেশ অতি দ্রুত কার্যকর করতে হত। অথচ এ প্রয়োজন মেটানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার নিজে করতে পারত না। জমিদারের উপর নির্ভরতা তাই অপরিহার্য ছিল। আর এ জরুরি অবস্থায় সরকারের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রজাপীড়ন প্রায় অনিবার্য উঠেছিল।[১০১]

দূর বার্মা সীমান্তে যুদ্ধের প্রয়োজনে সৈন্যচলাচল এবং সামরিক উপকরণ পাঠানোর জন্য সবচাইতে জরুরি ছিল এক দীর্ঘ নূতন রাস্তা—শেরপুরের পাশ দিয়েই এ রাস্তা গিয়েছিল। এ অঞ্চলের কৃষি-অর্থ-নীতি এমন ছিল না যে, অনেক শ্রম উদ্‌বৃত্ত থাকত। কৃষিতে নিয়োজিত প্রযুক্তিতে এমন কোনো উন্নতি হয় নি যার ফলে জমির উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে যেতে পারত এবং চাষবাসের কাজ অপেক্ষাকৃত কম শ্রম দিয়ে চালানো যেত যার ফলে চাষবাসের জন্য আগের মতো শ্রমের দরকার হত না। অন্যান্য অনেক অনুন্নত কৃষিব্যবস্থার মতো, এখানেও শ্রম উদ্‌বৃত্ত থাকত, বছরের কোনো-কোনো সময়। যখন চাষের কাজ বিশেষ কিছু থাকত না। কিন্তু জমি চাষ শুরু হওয়ার সময় থেকে ফসল তোলার সময় পর্যন্ত উদ্‌বৃত্ত শ্রম তো থাকতই না, প্রয়োজনীয় শ্রমে টান পড়ত। এর জন্য গ্রামে-গ্রামে কৃষকেরা বিশেষ ব্যবস্থা করত, বা ফসল কাটার সময় অনেক জায়গায় বাইরে থেকে মজুর আনতে হত। মোটামুটিভাবে বছরের পাঁচ-ছয় মাস শ্রমের এ টান চলত। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য যে, শেরপুরে নূতন রাস্তা বানানোর বেশির ভাগ কাজ করতে হয়েছিল ১৮২৪ সালের জুন থেকে নভেমবর পর্যন্ত—এবং নভেমবরেই সংঘবদ্ধ প্রতি-রোধের সূচনা। শ্রমের প্রয়োজন তো শুধু রাস্তা বানানোর জন্য নয়, সামরিক নানা কাজের জন্যই তো শ্রমের দরকার—বিশেষ করে বিরাট সৈন্যবাহিনী যখন সীমান্তের দিকে এগুচ্ছিল।

বিপুলপরিমাণ এ শ্রমের যোগান দেওয়া জমিদারের পক্ষে সহজ ছিল না। যেখানে চাষবাসের জন্য বড়ো ধরনের সেচ-ব্যবস্থা চালু ছিল, সেখানে গ্রামীণ প্রথা অনুযায়ী জমিদার এ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রম গ্রাম থেকে বিনামূল্যে চাইতে পারত। সাধারণত সেচব্যবস্থায় কোনো বড়ো ধরনের মেরামতি দরকার হলে গ্রামবাসীরা বেগার শ্রম বিনা

প্রতিবাদেই দিত। অন্যত্র গ্রামের শ্রমের উপর জমিদারের কোনো অধিকার ছিল না।

তাই সামরিক কারণে প্রয়োজনীয় বিপুল-পরিমাণ শ্রমের যোগান দেওয়ার জন্য জমিদারের পেয়াদা বা আমলাদের জোরজুলুম করতে হত। সরকারের চাহিদার অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতা ছাড়াও দুটো কারণে এ কাজ জমিদারের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল। জমিদার মজুরদের যথোচিত মূল্যও দিচ্ছিল না বা দিতে পারছিল না। তারা হয়তো ভেবেছিল, জমিদারের হুকুম মেনে চলা প্রজার অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব; ঠিক-ঠিক মজুরি দিতে না পারলেও প্রজাদের প্রতিবাদ দস্তুরসম্মত হবে না। (বাঙলায় এবং বিহারে শ্রমিকদের বাজারদর থেকে অনেক কম মজুরি দেওয়া সম্পর্কে অভিযোগ য়ুরাপীয় নীলকরেরা এভাবে খণ্ডন করতে চেষ্টা করত।) কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একসঙ্গে অত মজুরি যোগানো জমিদারের পক্ষে সহজও ছিল না। আইন-অনুযায়ী সরকার জমিদারদের প্রয়োজনীয় এ অর্থ দিতে বাধ্য ছিল। শেরপুরের জমিদারেরা অভিযোগ, সরকার থেকে তাদের প্রাপ্যের অতি সামান্য অংশই নির্দিষ্ট সময়ে তারা পেয়েছে। এ অভিযোগ পরের সরকারি অনুসন্ধানে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সরকারি নির্দেশ পালনে জমিদারের অসুবিধের আর-একটা কারণ, প্রকাশ্য রাস্তায় দিনমজুর হিসেবে খাটতে অনেক কৃষকের তীব্র আপত্তি ছিল। তাদের অভিযোগ, এ ধরনের দিনমজুরিতে তাদের জাত যাবে।[১০২] এমনিতে দিনমজুরি খাটার প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। জাত খোয়া যাবে—এ অভিযোগে তারা অন্যের জমিতে মজুরি নিয়ে কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিল, এমন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। অনুমান করা যায়, জমিদারের ঠিকাদারের কৃষকদের এমনভাবে খাটাত, যাতে এ ধরনের কাজে তাদের খুব আপত্তি ছিল।

এসব কারণে প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান জমিদারেরা স্বাভাবিক উপায়ে দিতে পারত না। তাই জোরজুলুমের আশ্রয় নেওয়া তাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

একই ভাবে, গ্রাম থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন সামরিক উপকরণের জন্যও কৃষক বা অন্যান্যরা ঠিক-ঠিক দাম পেত না। সরকারি বিবরণে এ অভিযোগের সত্যতাও স্বীকৃত হয়েছে।

শুধু যে শ্রম এবং সামরিক উপকরণের যথাযথ মূল্য থেকে কৃষকেরা বঞ্চিত হয়েছিল, তাই নয়। এসব উপকরণ যোগানোর জন্য জমিদারকে অতিরিক্ত খরচ করতে হচ্ছে, এ অজুহাতে তারা প্রজাদের উপর নূতন এক আবওয়াব বসাল—খরচা রসিদি পলটন: অর্থাৎ সৈন্যদের রসদ যোগানোর খরচ হিসেবে কৃষকদের এটা দিতে হবে।

কৃষকদের ক্ষতির এখানেই শেষ নয়। যেখানে সামরিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাস্তা যথেষ্ট ছিল না, জলপথ ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। সরকার প্রয়োজনীয় নৌকা সরবরাহের জন্যও জমিদারদের ভার দিল। কৃষক এবং অন্যান্যদের অভিযোগ, এর জন্য দেওয়া মূল্য পর্যাপ্ত ছিল না। তা ছাড়া, যাদের জীবিকা নৌকা-ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত ছিল—যেমন মৎস্যজীবী বা খুদে ব্যবসায়ী, তাদের ক্ষতিই ছিল বেশি। কৃষকেরাও বহুক্ষেত্রে গঞ্জে বা শহরে নৌকায় সওদা বিকিকিনি করত। এমনও ঘটেছে, শত্রু যাতে নৌকা-ব্যবহারের সুযোগ না পায়, সরকার সেজন্য হুকুমনামা জারি করে বলেছে: সব নৌকা যেন বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়।

ব্রহ্মযুদ্ধের থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি তাই আগের থেকে গুণগতভাবে পৃথক। অতিরিক্ত খাজনা আবওয়াব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত জমিদারি স্বৈরতন্ত্রের যা চেহারা, নূতন পরিস্থিতিতে তা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। তা ছাড়া, জমিদার এবং রাজশক্তির স্বার্থের অভিন্নতা কৃষকদের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

বিকল্প রাজনৈতিক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠাই সমগ্র

কৃষকসমাজের কাছে এ গভীর সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে হল। তার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন বর্তমান রাজশক্তির বিভিন্ন হাতিয়ারকে ধ্বংস করা বা পঙ্গু করা। এর জন্য দরকার সংঘবদ্ধ হিংসা। কৃষকদের কাছে বর্তমান রাজশক্তির একমাত্র প্রতীক ছিল স্থানীয় পুলিস, আদালত। সামরিক বাহিনীর স্থানীয় রূপ হয়তো কিছু ছিল না; কিন্তু কৃষকেরা মাঝে-মাঝে এর পরাক্রমের সঙ্গেও পরিচিত হয়েছে। আর ধ্বংস করতে হবে জমিদারি আমলার কর্তৃত্ব; বহু বিস্তীর্ণ এর এলাকা, এর কার্যকারিতাও অনেক বেশি প্রত্যক্ষ।

এ সহিংস প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র ক্ষণিক আক্রোশের ফল নয়। হিংসার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে নানাভাবে শত্রুর ক্ষতিসাধন—সম্পত্তির ক্ষতি, জমিদারের ঘরদোর, খামারবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া, সুযোগ পেলে শত্রুর প্রাণসংহারও। বিদ্রোহী কৃষকদের এও বিশ্বাস ছিল, শত্রু এতে দুর্বল হবে; হিংসা-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখে কৃষকদের সঙ্গে ব্যবহারে শত্রু আগের মতো ঔদ্ধত্য দেখাবে না, অনেক বেশি সতর্ক হবে। নূতন পরিকল্পিত আন্দোলনে হিংসাপ্রয়োগের লক্ষ্য অনেক বেশি ব্যাপক—শত্রুর দৃঢ়মূল কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলা। অনেক কঠিন এ সংকল্পের রূপায়ণ। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্কতার প্রয়োজন।

সরকারি নথিপত্র থেকে অনুমান করা যায়, বেশ কিছুদিন ধরে তাদের প্রস্তুতি চলছিল। শুধুমাত্র এটাই যথেষ্ট নয়। দরকার ছিল শত্রুর অনিবার্য পরাজয় সম্পর্কে এক নিশ্চিত প্রত্যয়ের। মনে হয়, বিক্ষুব্ধ কৃষকদের কেউ-কেউ এ বিষয়ে করিমের পত্নী, (যাকে শিষ্যরা 'মা-সাহেবা' বলে ডাকত), আর পুত্র টিপুর সঙ্গে পরামর্শ করেছিল ('They consulted soothsayers')। তাঁরাই আশ্বাস দেন যে, শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে তাদের জয় সুনিশ্চিত। টিপুর আমল থেকেই পাগল-সংগঠনের দ্রুত পরিবর্তনের কথা আগে উল্লেখ করেছি। তাই তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছিল। কোনো-কোনো জায়গায় দেখা গেছে, বিদ্রোহী কৃষকেরা নেতা খুঁজে বেড়িয়েছে। এখানে তেমনটি হয় নি। টিপুকে ধর্মীয় গুরু হিসেবে তারা আগেই মেনে নিয়েছে; এটা সহজেই অনুমেয়, জমিদারের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বৈরিতায় তারা টিপুর নানা নির্দেশও পেয়েছে। টিপুর এবং তাঁর মার অতিপ্রাকৃত, দৈবী শক্তিতে বিশ্বাস তাদের অনেকদিন ধরেই ছিল। এ অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগের রূপটাই শুধু এখন পালটাল। এখন তারা বিশ্বাস করল, সামরিক সাজসরনজামের দিক থেকে আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য তাদের হীনম্মন্যতার কোনো কারণ নেই; কারণ টিপুর আর তার মার দেবীশক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে তারা অপরাজেয় হবে।

বিদ্রোহীরা তাই নেতা বানায় নি; নেতৃত্ব আগে থেকেই ছিল; তার ভূমিকার রূপান্তর মাত্র।

নেতার আশ্বাসবাণীর কথা অতিদ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। শিষ্যরা এখন বিশ্বাস করল: নেতারা যাই ইচ্ছা করবেন, তাই করতে পারেন, এমন-কী তাদের মন্ত্রপূত কাঠের বন্দুক আর তলোয়ার সত্যিকারের বন্দুক আর তলোয়ারের মতোই কার্যকর; তবে সে কাঠ যোগাড় করতে হবে এক বিশেষ গাছ থেকে; ব্রিটিশদের কামান পাগলদের দৈহিক কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; কারণ নেতার অলৌকিক শক্তি অদৃশ্য দুর্ভেদ্য বর্মের মতো কাজ করবে; মা-সাহেবা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে শুধুমাত্র কাপড় ঝেড়েই লুকোনো সৈন্যদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির করতে পারেন।[১০৩] আগেই উল্লেখ করেছি, নূতন ধর্মমতের ব্যাপক প্রসারেও পাগলদের জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস দুর্বল হয় নি। বিদ্রোহের মুহূর্তে এ বিশ্বাস তাদের মানসিকতায় রূপান্তর ঘটায়।

৭.৫

বিকল্প সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আসন্ন আবির্ভাব সম্পর্কে পাগলদের সব বিশ্বাস টিপুকে

কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এটা উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটিশরাজের বিকল্প হিসেবেই শিষ্যরা টিপুর সার্বভৌমত্ব কল্পনা করেছিল। সরকারি নথিপত্র থেকে এ বিশ্বাসের কয়েকটা দিক সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।[১০৪] সর্বাত্মক প্রতিরোধ শুরু হবার কিছু আগে বা পরে পাগলদের মধ্যে এ বিশ্বাস বিশাল এলাকায় পরিব্যাপ্ত ছিল। পাগলরা বলত, টিপু এবং তার মার মুখ থেকেই সরাসরি সব ঘোষণা এসেছে।

প্রতিরোধের শুরুতে টিপুর এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে: খুব শীগগির এক নূতন শক্তির আবির্ভাব ঘটবে; ফলে তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে; ব্রিটিশরাজের অবসান আসন্ন; তার বদলে আসবে পাগল-রাজার ('Paugal Patriarch') নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব; ফকির টিপু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করবে; জমিদারদের স্বেচ্ছাচার চিরকালের মতো লুপ্ত হবে; আবওয়াব, বেগার ইত্যাদির অস্তিত্বই থাকবে না; প্রতি-'কুর' চাষের জমির খাজনা ধার্য হবে মাত্র চার আনা; নূতন জমির জন্য প্রথম তিন বছর কোনো কিছুই দিতে হবে না।

এসব ভবিষ্যদ্বাণী কৃষকদের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এ ধরনের বাণী কৃষকসমাজে কী বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তা একটা ঘটনা থেকে বোঝা যায়। খ্যাতির মোহে কেউ-কেউ টিপুর বাণী আর ভঙ্গিকে অনুকরণ করে "ভবিষ্যদ্বক্তা"রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করল। যেমন তুর্কশাহ নামে এক ফকির বলে বেড়াচ্ছিল—কোম্পানিরাজের অবসানের পর সেই হবে সর্বেসর্বা, টিপু নয়; কোম্পানির লোকজন হবে তার আজ্ঞাবাহী 'ভৃত্যে'র মতো। তুর্কশাহের কিছু অনুগামী যে জোটে নি তা নয়; কিন্তু টিপুর কর্তৃত্ব ছিল অপ্রতিহত; এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর তুর্কশাহের কোনো প্রভাব ছিল বলে মনে হয় না। এ ঘটনা এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ যে এর থেকে বিদ্রোহী কৃষকদের মানসিকতা বোঝা যায়। পরিবর্তিত সমাজ-ব্যবস্থার জন্য তাদের তীব্র ব্যাকুলতার জন্যই তারা এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস করেছিল। কৃষকদের চিত্ত জয় করার জন্য তুর্কশাহকেও বলতে হয়েছিল—কোম্পানির রাজত্ব শেষ হতে চলেছে।

আসলে বিদ্রোহী কৃষকদের চেতনার রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদের দীর্ঘদিনের আন্দোলন প্রধানত জমিদারি স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে। নূতন আন্দোলনে সে লক্ষণ অবশ্যই ছিল; কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে পাগলদের স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের স্বপ্ন। জমিদার-বিরোধী ঘোষণায় অনিবার্যভাবে অবৈধ খাজনা আর আবওয়াব আদায়ের কথা এসেছে; কিন্তু সেখানেও দেখি সম্পূর্ণ নূতন এক ঘোষণা: তারা জমিদারের কর্তৃত্বই স্বীকার করে না—কারণ, একমাত্র নিয়মসম্মত কর্তৃত্ব তাদের নেতা টিপুর। টিপুর সার্বভৌমত্বে অন্য সব কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন।

অন্য কর্তৃত্বকে অস্বীকার বা অমান্য করার জন্য প্রথম থেকেই সহিংস প্রতিরোধের কোনো দরকার ছিল না। যদি অমান্য করার জন্য শাসকশ্রেণী বা জমিদার তাদের উপর পীড়নের নীতি গ্রহণ করে, তাহলেই শুধুমাত্র হিংসার পন্থা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবেই পাগলপন্থী আন্দোলন সহিংস আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

আন্দোলনের গোড়ার দিকে পাগলরা বার-বার বলত, সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য নির্মীয়মাণ রাস্তায় তারা জমিদারের হুকুমমত মজুর হিসেবে কাজ করবে না। কারণ এ ধরনের কাজের নির্দেশ তো টিপুর থেকে আসে নি; তারা টিপুকেই একমাত্র বৈধ কর্তৃত্ব বলে মানে। পুলিশ প্রথম-প্রথম কোনো জোরজুলুম করে নি। তবে হুকুমনামা জারি করে। বলেছে, পাগলরা যেন দল বেঁধে জমিদারের আজ্ঞা অমান্য না করে। এর উত্তরে পাগলরা বলল, এ ধরনের মেহনতে তাদের জাত যাবে; সৈন্যদের ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটাও তাদের ইজ্জতের পক্ষে হানিকর। সরকারি দলিলে এর ফল হিসেবে লেখা হল: পুলিশের কোনো কথাই ওরা

শুনছে না ; অমান্য করছে জমিদারের কর্তৃত্বকে ; রাস্তা তৈরির কাজ একদম বন্ধ।[১০৫]

১৮২৫ সালের শুরু থেকে পাগলপন্থী আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। টিপুর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সব ব্যবস্থাই তখন হয়ে গেছে। 'টিপু পাগলের রাজ-দরবার' স্থাপিত হল শংকরপুর-নামক জায়গায়, তাঁর নিজের বাসস্থানে। ঠিক কোন্ সময় এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল, সরকারি বিবরণে তার উল্লেখ নেই। সম্ভবত ফেবরুয়ারির গোড়ায় 'কোষাগার এবং রাজস্ববিভাগের অধ্যক্ষ' হিসেবে 'টিপু ভাই সাহেবে'র নাম ঘোষণা করল 'গোটা পাগল সম্প্রদায়'। কয়েকজন পাগলকে পুলিশ জেল থেকে ছেড়ে দিলে তারা বলে বেড়াল, টিপুর দৈবীশক্তির জোরেই তাদের গা থেকে শেকল খুলে পড়েছে, আপনা থেকেই। সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থাও হল। জোরজুলুম করে টিপুর সাগরেদরা অর্থ আদায় করছে—সরকারি মহলের এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। আসলে কৃষকেরা জমিদারকে খাজনা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে তাদের পাগল রাজাকেই দিচ্ছিল। গ্রামে-গ্রামে ঘুরে নেতারা কৃষকদের নির্দেশ দিল, জমিদারদের খাজনা দেওয়া চলবে না। জমিদারের পেয়াদাদের সতর্ক করে দেওয়া হল : খাজনা আদায়ের জন্য তারা যেন গ্রামে না ঢোকে। পুলিশের লোক কী করবে ঠাহর করতে পারছিল না, কারণ 'হাঙ্গামাকারীদের ভয়ে কেউ গ্রামে ঢুকতে সাহস করছিল না।'[১০৬]

টিপু নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেছে ; প্রশাসনের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে তার অনুগামীদের নিযুক্ত করা হয়েছে ; রাস্তা তৈরির কাজ প্রায় বন্ধ ; জমিদারকে খাজনা না দেওয়ার জন্য নেতারা কৃষকদের 'প্ররোচিত' করছে ; তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেই যাচ্ছে —পুলিশ হোক বা জমিদারের আমলা-পেয়াদা হোক, হুমকি, শাসানি দেওয়া হচ্ছে—সারা শেরপুর জুড়ে মার্চের গোড়াতেও এ অবস্থা। পাগলপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য পাঠানো হল ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ড্যাম্পিয়ারকে। তাঁর মন্তব্য : শেরপুরের অবস্থাকে 'প্রায় বিদ্রোহ' বলা চলে।[১০৬ক]

হতে পারে, সন্ত্রস্ত প্রশাসনের বিবরণে খানিকটা অতিরঞ্জন আছে। তবে বিদ্রোহের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এমনিতে সরকারি বিবরণেও 'শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ' 'অরাজকতা' সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো ঘটনার বিশেষ উল্লেখ নেই। আছে ভাসাভাসা অভিযোগ। কিন্তু পাগলরা প্রকাশ্যে ব্রিটিশরাজকে উপেক্ষা করছে, তার বদলে নিজেদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলেছে—প্রশাসনের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

সমগ্র আন্দোলনকে ব্রিটিশ সরকার তাই "রাজদ্রোহ" বলে গণ্য করল। শুধুমাত্র পুলিশ দিয়ে এদের দমানো সম্ভব হল না। সৈন্য নামানো হল পুলিশকে সাহায্যের জন্য। নির্দেশ দেওয়া হল, প্রথম সারির নেতাদের কোনো দয়া দেখানো হবে না ; তাদের বাড়িঘর চুরমার করে দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে ; যেসব ক্ষেত্রে কৃষকেরা 'হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য বদ্ধপরিকর', পুলিশ বা সেনাবাহিনী সেখানে বিশেষ ব্যবস্থা নেবে।

এভাবে আন্দোলনকে দমন করা হল। সরকার কিন্তু স্থানীয় জমিদারি-পরিচালনার গলদ স্বীকার করে নিল। কিছু সময়ের জন্য জমিদারদের সরিয়ে দেওয়া হল। পরিচালনার ভার সরকারি লোককে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য, খাজনার হার, পরিমাণ এবং আবওয়াব আদায় ইত্যাদি ব্যাপারে যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা এদ্দিন কৃষকদের বিক্ষুব্ধ করে তুলছিল, তা দূর করা।

কোনো-কোনো অযৌক্তিক আবওয়াব বাতিল করা হল। কিন্তু খাজনার হার ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি পুরানো ব্যবস্থাই বহাল থাকল।[১০৭] কৃষকেরা বারবার অভিযোগ করেছে, খাজনার হার নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি একেবারেই দায়সারাভাবে করা হচ্ছে ; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জমিদারি আমলার সাক্ষ্যকেই ধ্রুবসত্য বলে মানা

হয়েছে; প্রতিবাদ করেও কোনো সুরাহা হয় নি; বরং তাদের কপালে জুটেছে 'বর্বরোচিত ব্যবহার'; তাদের পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে, জমিদারের কর্তৃত্ব তাদের মানতেই হবে; এবং প্রচলিত দস্তুর তারা ভাঙতে পারবে না। ঢাকাবিভাগের কমিশনার গোড়ায় কৃষকদের কিছু-কিছু অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন; কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, শেষে তিনিও তাঁর মত পালটালেন। এমনও বললেন, কৃষক-বিক্ষোভের আসল কারণ 'দু-তিনজন দাঙ্গাবাজ প্রকৃতির নেতার' উশকানি; আন্দোলন জিইয়ে রাখলে তাদেরই লাভ।

প্রতিরোধ তাই আবার অনিবার্য হয়ে উঠল। কিন্তু প্রথম আন্দোলনের প্রায় আট বছর পরে (১৮৩৩) এটা সম্ভব হল। প্রথম পরাজয়ের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে নিতে স্বভাবতই অনেক সময় লেগেছে। কৃষকেরা অনেক মূল্য দিয়ে এটা বুঝতে পেরেছে, জমিদার আর ব্রিটিশরাজের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা অত সহজ ব্যাপার না। তাই অনেক ব্যাপক প্রস্তুতির পর তারা লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত করল। তা ছাড়া, কৃষকেরা ভেবেছিল, সরকারি হস্তক্ষেপের ফলে খাজনা ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের দীর্ঘদিনের অসন্তোষের কারণ দূর হবে। বিশেষ করে, কিছু সময়ের জন্য হলেও জমিদারদের অপসারণ তাদের খানিকটা আশ্বস্ত করেছিল।

আশাভঙ্গ যখন হল, কৃষকেরা আবার বড়ো সংঘর্ষের জন্য নিজেদের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হল। এবারকার আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য দিক, নেতাদের দৈবীশক্তির উপর নির্ভরতা আগের মতো ছিল না। এ শক্তি গতবারের সংঘর্ষে ব্রিটিশ সৈন্যের কার্যকারিতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি—এ রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের মোহভঙ্গের একটা কারণ হতে পারে! অবশ্য আমাদের অনুমানের একমাত্র ভিত্তি, সরকারি বিবরণে নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস সম্পর্কে অনুল্লেখ। এমনও হতে পারে, সরকার এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে পারে নি, বা জানলেও তাকে গুরুত্ব দেয় নি। কারণ, সরকারি রিপোর্টে প্রধান জোর বিদ্রোহীদের সামরিক প্রস্তুতির উপর।

গতবারের তুলনায়, এ প্রস্তুতি যে ছিল অনেক উন্নত ধরনের, এতে সন্দেহ নেই।[১০৮] এর কয়েকটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ি গারোদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ স্থাপন করল। কারণ সম্ভবত দুটি। নূতন অঞ্চলে সংগঠনের বিস্তার বিদ্রোহীদের শক্তি-বৃদ্ধি করবে। সমতলের জমিদারদের সঙ্গে পাহাড়ি গারোদের দীর্ঘদিনের তিক্ত সম্পর্কের কথা মনে রেখেই হয়তো বিদ্রোহীরা এ ধরনের চেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয়ত, সংঘর্ষ যদি পাহাড়ি অঞ্চলেও ছড়ায়, তাহলে পাহাড়ের ভৌগোলিক প্রকৃতি সম্পর্কে গারো-দের জ্ঞান বিশেষ কাজে আসবে। সরকারি বিবরণে এও বলা হয়েছে, পাগল সৈন্যদলে "আসামের ভাড়াটে সৈন্যরা"ও আছে। খুব সম্ভবত গারো পাহাড়-সংলগ্ন আসামের কোনো-কোনো অঞ্চল থেকে পাগলরা বেশ খানিকটা সমর্থন পেয়েছিল। তা ছাড়া, তারা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্যও আগের থেকে অনেক বেশি প্রস্তুত ছিল। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী, তিনশ বা চারশ জনের নানা দল বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিল; মূল বাহিনীতে ছিল প্রায় তিন হাজারের মতো পাগল; জোনাকি পাত্র তার অধিনায়ক; অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে অবশ্য নূতনত্ব নেই—বর্শা, ধনু, বিষমেশানো তীর, এবং কয়েকটা মাত্র বন্দুক। প্রয়োজন হলে অবশ্যই তারা রণকৌশল পরিবর্তন করত। যেমন, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে চাইলে, তারা গারো পাহাড়ের নানা অঞ্চলে সরে পড়ত। পাহাড়ি গারোদের সঙ্গে যোগাযোগ তখন খুবই কাজে এসেছিল।

উন্নততর প্রস্তুতি এবং নিপুণ সংগঠনের জন্যই বিদ্রোহীরা বড়ো অঞ্চল জুড়ে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। প্রথম বারের মতো, এবারও তাদের মূল লক্ষ্য নিজেদের রাজ-

নৈতিক ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা।

বিদ্রোহীদের এ সংগঠিত শক্তি স্থানীয় প্রশাসন অকপটে স্বীকার করেছে।[১০৯] 'শেরপুর এবং গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল সম্পূর্ণ টাই তাদের দখলে। অধিনায়ক জোনাকি পাত্রের ঘোষণা, শেরপুরে শুধু-মাত্র তার কর্তৃত্বই মানা হবে; তার স্পর্ধা এতদূর গেছে যে, সে দূত মারফত এ অঞ্চলের এক প্রধান জমিদারকে হুকুম করেছে, যেন তাকে অর্থ পাঠানো হয়; যেন জমিদার একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার সামনে হাজির হয়; অন্যথা, তাকে শাস্তিভোগ করতে হবে; তার সম্পত্তি, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হবে।'[১০৯ক]

বস্তুত নূতন হারে খাজনা আদায় বহুদিন জমি-দারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। জমিদারের পেয়াদাদের বিদ্রোহীরা পিটিয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিত। পেয়াদাদের রক্ষার জন্য শেরপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পাঠান। বিদ্রোহীরা তাঁকে এবং তাঁর দলবলকে তোয়াক্কাই করে নি। এ রাজ-পুরুষের প্রতিবেদন: পাগলদের এমনই দুঃসাহস যে, আমার তাঁবুর পাশের গ্রামের এক তালুকদার ও তার ছয় পেয়াদাকে তারা ধরে নিয়ে গেছে, প্রায় পক্ষকাল তাদের পাহাড়ে আটকে রাখার পর। এক পেয়াদাসহ তালুকদারকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে; অন্যদের কোনো খোঁজ এখনও নেই।[১১০] প্রায় বছর খানেক ধরে জমিদারের লোক গ্রামে ঢুকতেই পারছে না। তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ পাঠিয়েও কোনো লাভ হয় না, অবস্থা বুঝে তারা সব সম্পত্তি নিয়ে পরিবারসহ পাহাড়ে পালিয়ে যায়। এক রাজকর্মচারী বেশ কয়েকটা 'বর্ধিষ্ণু গ্রাম' ঘুরে দেখেন, সেখানে উল্লেখ-যোগ্য কোনো সম্পত্তিই নেই; কারণ খাজনা আদায়ের জন্য পুলিশি ব্যবস্থা এড়ানোর জন্য তারা অন্যত্র সরে পড়েছে; ক্রোক করার মতো কোনো কিছুই সেখানে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু যেই না রাজকর্মচারী গ্রাম ছাড়লেন, অমনি আবার তারা 'স্ত্রী, সন্তান, গবাদিপশু ও জিনিসপত্র' নিয়ে ফিরে এল।

কিন্তু আগের বারের মতোই দীর্ঘদিন ব্রিটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে তারা পেরে ওঠে নি। [ক্রমশ

সূত্র-নির্দেশ ও টীকা

৭৯. *"Translation of the Proceedings in two cases tried in 1847 before the Sessions Judge of Dacca in which Doodoo Miyan and 63 of his followers belonging to the Sect of Hajees or Ferazees were charged with wounding, plunder, Arson" etc.* (Calcutta 1848). Appendix P. I Dunlop বলে: 'From that time I became a marked man amongst them.'

৮০. একই।

৮১. একই; ডানলপের সাক্ষ্য (৩ অগস্ট ১৮৪৭)।

৮২. একই; পৃ ৩ [of the 'proceedings'] Petition of Bharut Chunder Roy, Mohurir of the Faujdaree Court of Furreedpore। রায় বলেন: 'Should any victim of their [Faraji's] tyranny, with a view to secure his property, seeks refuge with a Zemindar or any other influential man, they do not feel any scruple to injure the party who thus opposes them.....Mr. Dunlop and the Baboos, having resisted the introduction of the doctrines of the prisoner [Doodoo Meah] among the ryots, have been brought into collision with the prisoner.'

৮৩. একই; পৃ ৩১১; Fatwa of the Law Officer.

৮৪. Bengal Judicial Progs., 23 Jan. 1850, No. 61. Petition of 1 Jan., 1850.

৮৫. মরিসন (যিনি পাগলপন্থী আন্দোলনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন) নিম্নলিখিত গোষ্ঠীগুলির উল্লেখ করেছেন; গারো, হাজং, হাত্রি, ডালু, বোনাও (বানাই), বংশী এবং দাই। [Bengal Judicial Criminal Prog., 5 Jan., 1826, No. 39. মরিসন রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ১১।

৮৬. একই।

৮৭. একই। 'ignorant and unlettered man'; Para 11.

৮৮. Q. Ahmad, *The Wahabi Movement in India* (Calcutta, 1966). পৃ ৫-৯; Muin-ud din Ahmad Khan, পূর্বোল্লেখিত; পৃ lxxix-lxxxii.

৮৯. (…'মুরিদদের কাছে নিঃসীম আনুগত্যের দাবি… গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতার অন্যতম প্রকাশ মাত্র'—গৌতম ভদ্রের এ মত বিচারসাপেক্ষ (শারদীয়া সংখ্যা "অনুষ্টুপ", ১৯৮৬, " 'পাগলাই ধূম' : ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ". পৃ প্র ৫৩)।

৯০. গিরীন্দ্রনাথ দাস, "বাংলা পীর সাহিত্যের কথা" (বারাসত, ১৯৭৬), পৃ ২।

৯১. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লেখিত (পাদটীকা ৮৯ দ্রষ্টব্য), পৃ প্র ৫৫।

৯২. মোহম্মদ জয়েন উদ্দীন, "করিম শাহ ও টিপু শাহ" (জালালপুর, ময়মনসিংহ, ১৩৩২, প্রথম সংস্করণ)।

৯৩. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লেখিত; [পাদটীকা ৮৯ দ্রষ্টব্য]।

৯৪. ভদ্র নিজেও স্বীকার করেছেন, 'সমসাময়িক সাক্ষ্যের মূল্য গ্রন্থটির নেই' [পৃ প্র ৫৪]। পাগলপন্থী ঐতিহ্যের সামগ্রিক ইতিহাস হিসেবে এ বইয়ের মূল্য অপরিসীম। 'পাগলপন্থীদের ধর্মজগৎ ও তাদের অতীত বিদ্রোহের ঐতিহ্যকে তারা কি করে তাদের স্মৃতিতে ধরে রেখেছে', এ প্রসঙ্গেই গ্রন্থটির মূল্য। কিন্তু বহু আগের এক বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের রূপ বোঝার জন্য এ "স্মৃতি" নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। এ স্মৃতি 'যৌথচেতনার ভাণ্ডার'; কিন্তু 'যৌথচেতনা' এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ; কোন্ কোন্ নূতন উপাদান এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তার নিপুণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

৯৫. একই; পৃ প্র ৫৬-৫৭।

৯৬. মরিসনের রিপোর্ট, পূর্বোল্লেখিত, [পাদটীকা ৮৫ দ্রষ্টব্য], Para 11.

৯৭. গৌতম ভদ্র, পূর্বোল্লেখিত, পৃ প্র ৫৬।

৯৮. মরিসন রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ১১।

৯৯. একই।

১০০. নানাভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হলেও মরিসনের দীর্ঘ রিপোর্ট এবং তাঁর সংগৃহীত অন্যান্য দলিলও পরিবর্তন বোঝার জন্য অপরিহার্য। কারণ বিদ্রোহের সমসাময়িক অন্য কোনো বিবরণ নেই। এসব উপকরণ পাওয়া যাবে Bengal Judicial Criminal Progs. 5 Jan., 1820; No. 5. 39-41. অন্যান্য চিঠিপত্র পরে উল্লেখ করব।

১০১. একই; মরিসন রিপোর্ট, অনুচ্ছেদ ৩৬-৬৪।

১০২. একই অনুচ্ছেদ : ৯ জানুয়ারি, ১৮২৫-এর এক পুলিশ রিপোর্ট মতে : 'The people refused to work for the Zamindar and say their caste is disgraced by working on the road and cutting grass for the horses'.

১০৩. একই : মরিসন রিপোর্ট; অনুচ্ছেদ ১২; বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সত্যিকারের কাঠের বন্দুক আদালতে দেখানো হয়েছিল; যেসব বিদ্রোহীর বাড়ি থেকে পুলিশ এসব বন্দুক উদ্ধার করে, তাদের কিন্তু সবারই বর্শা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র ছিল।

১০৪. একই; অনুচ্ছেদ ৩৩।

১০৫. একই; অনুচ্ছেদ ৩৪।

১০৬. Bengal Judicial Criminal Progs., 1 April 1825; No. 87; W. Dampier, Mymensingh Magistrate to Dacca Court of Circuit. 31 March 1825 বিদ্রোহীদের মুখে শুধু একটাই কথা—টিপু ছাড়া কারো শাসন তারা মানবে না। মার্চের (১৮২৫) মাঝামাঝি Dampier এসে এক হুকুমনামা জারি করে বলেন, কৃষকেরা যেন তাদের অভাব-অভিযোগ পেশ করে: সাদা কাগজে করলেও চলবে; বিদ্রোহীরা এর কোনো তোয়াক্কাই করল না। এক পুলিশ বরকন্দাজ, থানার তিন পেয়াদা, আর জমিদারের ছয় পেয়াদাকে আটকে রেখে দিল। বিদ্রোহীরা গ্রামে গ্রামে নির্দেশ পাঠাল : "none should pay revenue excepting to Tipoo Pagle whom they proclaimed their chief, and where any opposition or unwillingness was shown they proceeded indiscriminately to plunder." [অনুচ্ছেদ ২]।

১০৬(ক). একই; 'I considered that this position of the district was almost in a state of rebellion.' [অনুচ্ছেদ ২]।

১০৭. Bengal Board of Revenue Progs., 20

Aug., 1830 ; No. 33 ; Petition of some ryots of Pergunnah Sherpur and Alap Singh (no date).

১০৮. Bengal Judicial Criminal Progs., 13 May, 1833 ; Nos. 15-16.

১০৯. একই ; Proceeding No. 16 : ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট Dunbar লিখছেন (১ মে ১৮৩৩) : "they have taken possession of the whole country between Sherpore and the Garrow Hills, and compel the ryots to pay contributions, made in the name of Jonakoo Parters who may be considered as their chief leader". [Para 2]

১০৯(ক). একই।

১১০. Bengal Judicial Criminal Progs., 22 Feb. 1833, No. 34, Dunbar to Dacca Commissioner, 8 Feb., 1833. Para 2.

শ্রীপতি ডোমের স্বদেশচিন্তা

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীপতি ডোম—ভালো নাম শ্রীপতি কালিন্দী ('জাতে ডম গ—আমরা বলি কালিন্দী')—আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর বয়স কম করে সত্তর। শুকনো খটখটে বেলের মতো মাথাটায় চুলের একটা রোঁয়াও নেই, অথচ সারা মুখে হুলের মতো সাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ে একখানা কালো তুষের চাদর—চাদরখানা সাপটে জড়িয়ে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন মানুষটি। কাঁপুনি দিচ্ছে থেকে-থেকে—বোধহয় জ্বর আসছে। বিকেল পড়ে আসছে। মরা, মিয়োনো আলো। সবেদাগাছের পাতা কাঁপিয়ে ঝিরঝিরে বাতাস। চাদরখানা আরও ভালো করে জড়িয়ে শ্রীপতি ডোম বসলেন একেবারে হাঁটুদুটো পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে।

—শুনেছি, আপনি নাকি স্বদেশীর গান গাইতেন? এখনও পারেন?

—টুকু পারি বটে।

শ্রীপতি ডোমের কাষ্ঠল মাথাটা দুলে উঠল একবার; এমনভাবে দুলল যেন সরু ডিগডিগে গলার ওপর স্প্রিঙ দিয়ে বসানো একটা বল নড়ে উঠল একবার। খেয়াল হল, মাথাটা দুলছে, আর হুঁ-হুঁ করে একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে। ওটা যে গান নয়, জ্বর আসার আগের এক বিশিষ্ট গোঙানি, বুঝে নেওয়ার পর মনে হল, আর কথা বলানো উচিত হবে না লোকটিকে এ অবস্থায়। অগত্যা উঠে পড়ার কথাই ভাবতে হয়। ঘাড় তুলে সবেদাগাছটা একবার দেখি, তারপর বলি—আসি তাহলে আজ।

—দুস! কথা ত শুরুই হল না গ।—শ্রীপতি ডোম সখেদে হেসে উঠলেন, তারপর লম্বা হাতটা হাপরের মতো একবার তুলে এমনভাবে নামিয়ে রাখলেন, যার অর্থ: বোসো—বসে পড়ো।

দূর দিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা শামুকখোল। খুব গলা ছেড়ে গান ধরেছে এক বাগাল ছোঁড়া। এত দূর থেকেও শোনা যায়, আর চারপাশে অন্য কোনো শব্দ নেই বলে ওটাই এখন এ মুহূর্তের একমাত্র ধ্বনি হয়ে

যায়।

তাকিয়ে দেখি, শ্রীপতি ডোম মাথাটি তেমনি নীচু করে রেখে থেকে-থেকে গোঙিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর দুটো হাতই চাদরের মধ্যে ঢোকানো। পাদুটো সেঁধিয়ে আছে পেটের মধ্যে।

—একটা গান যদি শোনাতেন!

আবার মাথা দুলে উঠল। হুঁ-হুঁ শব্দটা ফিরে এল আবার। চোখদুটো বোজা রেখে শ্রীপতি ডোম টেনে-টেনে বললেন, কী হবে—কী হবে উসব শুনে?

শ্রীপতি ডোম মাথা নাড়িয়ে যাচ্ছেন। শুকনো চামড়ার তলা দিয়ে ভেতরের শিরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এক লহমার জন্যে সত্যি-সত্যিই বোবা হয়ে যাই তাঁর প্রশ্নে! কী হবে? পঞ্চাশ বছর আগে কোন্ গাঁয়ে কোন্ ডোম স্বদেশীর গান গাইত, তা কার কী কাজে লাগবে আজ? স্বদেশীর গানে এখন আর প্রাণিত হয় না কেউ। সেই গান শুনে আজ কেউ ন্যায়ের দণ্ড নেমে আসছে বলে অত্যাচারীকে সাবধান করে দেবে, কি জগৎজনের শ্রবণ জুড়িয়ে মা বলে ডেকে উঠবে একবার—ভাবাই যায় না। আর শ্রীপতি ডোমের গানের খুব মহৎ সাহিত্যগুণ আছে, এমন সম্ভাবনাও কম। সুতরাং কী মূল্য থাকতে পারে তাঁর গানের?

বসেই পড়লাম। চারপাশে বাচ্চারা অসীম কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। অস্বস্তি লাগে। নতুন করে কথা শুরু করার ভঙ্গিতে বলি, মল্লিকবাবু তো আপনাদের গ্রামেই থাকতেন?

শ্রীপতি ডোম ঘাড় নাড়লেন। অর্থ: হ্যাঁ। এটা অবশ্য কোনো নতুন তথ্য নয় আমার কাছে। এইসব জেনেশুনে নিয়েই আমি এই মানুষটির কাছে এসেছি। আসার পথে চৌকো একটা মাটির ঢিবির দিকে আঙুল দেখিয়ে গ্রামের একটি যুবক বলে দিয়েছিল—মল্লিকবাবুর নামে ইটা আমরা বনায়েছি। উয়ার জন্মদিনে ইখানে মেলা হয়—গান হয়—পিদিম দি আমরা—পোস মাসে—আসবেন একবার—

মল্লিকবাবু সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা নেই আমার। কিন্তু মাটির ঢিবির ওই স্মৃতিচিহ্নটির দিকে চেয়ে মনে হয়েছিল, এই যেন যথার্থ স্মারক হয়েছে মানুষটির। এমন এক গ্রামে শ্রীপতি ডোমের মতো লোককে স্বদেশীতে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন যে-মানুষটি, তাঁর স্মৃতিচিহ্ন যেন এমনই হবার কথা। ফি-বছর পোষ মাসে এই মাটির ঢিবিটি গাঁদাফুলে সাজিয়ে দেওয়া হয়, তার মাঝে জ্বলজ্বল করে কয়েকটি স্মৃতির প্রদীপ আর সত্তর বছরের বুড়ো শ্রীপতি ডোম ঢোল বাজিয়ে গায়—কী গায় আমার জানা নেই—তবে ধরে নিতে পারি সে গান স্বদেশীরই—পঞ্চাশ বছরের ঘাসমাটি ঝেড়ে মাটির বুকের ভেতর থেকে তুলে আনা কোনো গান—এরকমই তো হবার কথা।

আমি আবার শ্রীপতি ডোমের দিকেই ফিরি, আর পুরনো কথাটাই আর-একবার বলি—আপনার একটা গান শোনার ইচ্ছে ছিল।

শ্রীপতি ডোম এবার হু-হু করে হেসে ওঠেন—উসব গান আর মনে লাই, বাপ—ভুলা গেছি সব।

এতক্ষণের মধ্যে তাঁর এই হাসি আর ক্ষণেকের জন্যে গাল-ফুলে-ওঠা মুখটার দিকে চেয়ে খুব আশকারা পেয়ে যাই; ওঁকে থামতে না দিয়েই বলি—আপনি কি ছোটোবেলা থেকেই গান গাইতেন?

—গাওয়া হত। লাচ-ও হত।

—নাচ!

—হ্যাঁ গ! ঝুমুর—দাঁড়সাল ঝুমুর—বুঝ?

খুব একটা বোঝা না থাকলেও এখন আমাকে দারুণ একজন সমঝদারের ভাণ করতে হয়। হাঁ-হাঁ করে বলি নিশ্চয়ই—তারপর—

—মল্লিকবাবু শীতলপুরের মেলায় লাচ দেখল। রাতভর লাচ। দেখে বুললে—তু স্বদেশীর গান কর ছিপতি—তুর মধ্যে একটা আগুনের পারা ভাব আছে—উটাকে জাগাতে হবেক।

প্রায় খিলখিল করেই হঠাৎ হেসে উঠলেন শ্রীপতি ডোম এই জায়গাটায়। বুঝতে পারছি না এর মধ্যে

কোথায় হাসির উপাদান লুকোনো আছে। বুড়ো দাদুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে কয়েকটি বাচ্চাও এখন হাসতে শুরু করে দিয়েছে। হাসি থামলে বলি—কী গান গাইতেন?

—মল্লিকবাবুই লিখা করত। বড় ভাল গান বাঁধা করত উ লক।

—সে-সব গান কিছু মনে নেই এখন?

—লাই গ বাপধন—লাই।

মনে হল, হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে গেলেন শ্রীপতি ডোম। মাথাটা ঝুঁকে এসে প্রায় হাঁটুর ওপর ঠেকেছে। পাতলা একটা ধাতুর পাতকে এলোপাতাড়ি পিটে গেলে যেমন হয়, ঠিক সেরকম দেখাচ্ছে তাঁর মাথার তালুটা। সন্ধে নেমে গেছে। খুব কালো-ধোঁয়াওলা একটা কুপি বসিয়ে দিয়ে গেল একটি মেয়ে। শ্রীপতি চোখ ফাঁক করে একবার দেখলেন, তারপর চাদরের ভেতর থেকে হাতদুটো বের করে জোড়া করলেন—কোন্ দেবতার উদ্দেশে জানি না।

হুঁ-হুঁ শব্দটা জোর হয়ে উঠেছে আবার। ঠিক মনে হচ্ছে, শ্রীপতি ডোম যেন মনে-মনে একটা সুর ভেঁজে নিচ্ছেন। এক্ষুনি যেন শুরু করবেন 'শুন' বলে। সে গানের ভাষা কী হবে আমি ভাবতে পারছি না। খুব উদ্ভট শোনাচ্ছে জেনেও বলি, স্বদেশী ব্যাপারটা বুঝতেন?

—ওই মল্লিকবাবুই বুঝাতেন।

—কী বলতেন?

—কত কী বুলতেন। —শ্রীপতি ডোম শুরু করেও থেমে গেলেন হঠাৎ। এইবার স্থিরনিশ্চয় হয়ে গেছি, তিনি মনে-মনে কিছু বলছেন। মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে বলি, কিছু বলছেন?

—বুলছি ত!

—হ্যাঁ বলুন—মল্লিকবাবু কী বলতেন?

—বুলতেন গাঁধিজী বুলেছেন—আর তুদের কেউ ডোম বুলে ছুটো করবেক লাইরে, ছিপতি।

—আর কী বলতেন?

—সুবাসবাবুর কথা বুলতেন। কত বড় লেতা ছেলান তিনি। খুদিরামের কথাও বুলতেন। বড় ভালো গান লিখা করাছিলেন খুদিরামের নামে। দমে গাওয়া হত বটে।

শ্রীপতি ডোম এখন সমানে বিড়বিড় করে কিছু বলে যান নিজের মনে। মাঝে-মাঝে একটা-দুটো কথা আমি শুনতে পাই। সেগুলো মোটামুটি জোরে, যেন আমাকে শোনানোর জন্যেই। আর যখন তিনি নিজের মনে কথা বলছেন—প্রায় দুর্বোধ্য সে স্বর—শ্রীপতি যেন চাইছেন না আমি তাঁর সেই আত্মমগ্ন কথনের মধ্যে প্রবেশ করি। মনে হয়, পঞ্চাশ বছরের পুরনো ইতিহাসটিকে তিনি যেন জড়ানো পটের মতো একটু-একটু করে ভাঁজ খুলে নিচ্ছেন আর মাঝে-মাঝে একটা করে ছবি মেলে ধরছেন আমার সামনে…

মল্লিকবাবু ক্ষুদিরামের কথা বলতেন, গান্ধিজীর কথা বলতেন, সুভাষচন্দ্রের কথাও বলতেন। গান্ধিজী বলেছেন হরিজনেরা মন্দিরে ঢুকবে, পুকুরের জল নেবে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন—তোমরা দেশের জন্যে রক্ত দাও; আর দুর্জয় সাহসী ক্ষুদিরাম—সায়েবরা উয়াকে হিলাতে লারল—উয়ার ফাঁসি দিল…শ্রীপতি ডোম হয়তো এইরকমই কোনো এক সন্ধ্যায় ধোঁয়া-ওঠা কুপির আলোয় বসে মল্লিকবাবুর মুখে শুনে থাকবেন এসব কথা। মল্লিকবাবু মাস্টার ছিলেন। পড়াশোনা করতেন কত। শহরে গেলে কাগজ নিয়ে আসতেন, তারপর সকলকে ডেকে পড়ে শোনাতেন কাগজের খবর আর বলতেন—কী বলতেন?

—বুলতেন, দেশের লকের মধ্যে কোন একতা ভাব লাই, ছিপতি—ভায়ে-ভায়ে হানাহানি করে।

শ্রীপতি ডোম বলতে-বলতে ভাবনায় তলিয়ে যান। আমি মনে-মনে ইতিহাসটাকে একটু সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করি। মল্লিকবাবু এইসব কথা বলতেন বোধহয় তিরিশের দশকের গোড়ায়। পৃথক নির্বাচন-মণ্ডলীর দাবি নিয়ে তখন কংগ্রেসে-লীগে দারুণ মনকষাকষি। সেই সাম্প্রদায়িক মনান্তর নিশ্চয়ই

ব্যথিত করেছিল মল্লিকবাবুকে। তাঁর অন্তরের সেই ব্যথার কথাই তিনি শুনিয়েছিলেন শ্রীপতিকে। কিন্তু তারপর—তারপর কী হল?

—সুবাসবাবুকে দেখলম গ!

—দেখলেন? কোথায়?

—শ্রীপতি এ কথায় মিটিমিটি হাসেন, আর বলেন, সিটি বড় মজার কথা গ।

মজার কথাই বটে। সুভাষচন্দ্রকে দেখতে ন মাইল পথ ঠেঙিয়ে শ্রীপতি ডোম হাজির হয়েছিলেন স্টেশনে। শোনা গিয়েছিল, ওই ট্রেনে সুভাষচন্দ্র আছেন। ট্রেন এল, দাঁড়াল না; শুধু একটি কামরায় পতাকা বাঁধা ছিল—অন্য অনেকের মতো শ্রীপতি ডোমও সেই পতাকাটির দিকে চেয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন সুভাষবাবুর। সেসব কতদিনের কথা! শ্রীপতি ডোম চঞ্চল হয়ে ওঠেন হঠাৎ, তারপরই শুকনো মাথাটা নাড়িয়ে হায় হায় করে ওঠেন—মল্লিকবাবু বুললে, সব্‌বোনাশ হয়্যা গেছে ছিপতি, সুবাসবাবু চল্যা গেছে—কুথা গেছে—কুনো ঠিক লাই—

ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়ে গেছে। যতীন দাস না খেয়ে জেলের মধ্যে মরেছে—তার শবদেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতায় পৌঁছলেন সে কী দৃশ্য—মল্লিকবাবু কাগজে পড়েছেন সে কথা; সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানে বিহ্বল মানুষটি এখন তাঁর মনের সব দুঃখ উজাড় করে দিচ্ছেন শ্রীপতি ডোমের কাছে।

ইতিহাসের ছিন্ন, অবিন্যস্ত সূত্রগুলো কেমন আপনা হতেই গ্রথিত হয়ে যায়। মল্লিকবাবু গান্ধিজীর ভক্ত; আবার সুভাষচন্দ্রও তাঁর নেতা; অন্যদিকে ক্ষুদিরাম-যতীন দাসের জন্যেও হাহাকার করেন তিনি। হয়তো এরকমই হয়ে থাকে। ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ে নরম আর চরম ভাগ দুটো যেরকম কাটা-কাটা করে দেখানো হয়ে থাকে, জীবনে—মল্লিকবাবুদের মতো মানুষের বেলায় বোধহয় ঠিক সেরকমটা ঘটে না।

ভাবতে-ভাবতে এতক্ষণে খেয়াল হয়, শ্রীপতি ডোম ঢুলছেন। হয়তো ঘুম আসছে। কিংবা হয়তো জাঁকিয়ে জ্বর এসে গেছে এতক্ষণে। আর উচিত হবে না লোকটিকে বসিয়ে রাখা। উঠে পড়ব ভেবেও হঠাৎ বলি—এসব কথা শুনে কী মনে হত আপনার?

—কী কথা?

—এই দেশের এত দুর্দিন—এইসব—

—মনে বড় আকতা হত—প্রাণটা দুখাত—মনে হত—বড় অভাগা বটে আমরা—লিজের দেশটি বিকাইন দিলম—ধিক রে—ধিক রে···শ্রীপতি ঘন-ঘন মাথা নাড়াতে-নাড়াতে কিছু বলতে লাগলেন। তাঁর গলার স্বরটা ক্রমশ নেমে আসছে। আমি ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না; কিন্তু বেশ বুঝতে পারি—তিনি কিছু বলছেন—কানটা প্রায় তাঁর মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি আর শুনতে পাই—ধিক্ রে—ধিক্ রে—

···ধিক্ রে বাঙ্-আ-ল-ই-ই—তর মুখে কালি—লিজের স্বদেশ—তুই পরের হাতে দিলি-ই-ই···

শ্রীপতি ডোম গান গাইছেন। পাতুটো পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে কুঁজো হয়ে বসে থাকা, ন্যাড়ামাথা ওই লোকটিকে দেখে বোঝার উপায় নেই; কিন্তু আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাঁর গান। অর্ধ শতাব্দীর গহ্বর থেকে ঘাসমাটি-শেকড়বাকড়ের গন্ধসমেত উঠে আসছে সেই গান: ধিক্ রে বাঙালি—তোর মুখে কালি···

ঝিঁঝিতে ঝমঝম করে ঘুঙুর বাজায়। অন্ধকারে লক্ষ জোনাক জ্বলে। শ্রীপতি ডোমের মাথাটি ঝুঁকে এসে তাঁর দুই হাঁটুর জোড়ের ওপর ঠেকে।

২

—স্বাধীনতার দিনটার কথা মনে পড়ে আপনার?

—লাই গ!

—কিছু মনে নেই?

—টুকু আছে বটে। গাঁধিজীকে গুলি করা মারল। মল্লিকবাবু কানতে-কানতে বুললে, সাপ রে ছিপতি—

কালসাপে ওংশাইছে গাঁধিজীকে।

বুঝতে পারি, শ্রীপতি ডোমের স্মৃতিবিভ্রম ঘটে যাচ্ছে। পরের ঘটনা আগে এসে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও আমি তাঁর মুখ থেকে সাতচল্লিশের সেই দিনটির কথা বের করে আনতে পারি না। শ্রীপতি কখনও সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের কথা বলেন, কখনও গান্ধীজীর মৃত্যুর কথা বলেন, কখনও বা দাঙ্গার কথা শোনান।

—মল্লিকবাবু বুললে কলকাতায় ভায়ে-ভায়ে কাটাকাটি হচ্ছে—বড় কঠিন দিন আইসছে ছিপতি—ভাই ভায়ের রক্ত ফেলাছে—

—সুবাসবাবু কী কইরছেন?

—ওঁয়ার কথা কেউ জানে না, বাপ। তিনি চলা গেছেন।

—গাঁধিজী কী কইরছেন?

—তিনি উপাস দিছেন। বুলছেন—ইসব হানা-হানি চইলবেক ত আমি না খায়ে মইরবেক।

শ্রীপতি ডোমের মাথা ঘুরে যায়। সাহেবরা চলে গেল। ইস্কুলবাড়িতে মাস্টারমশাই পতাকা তুললেন। ছেলেরা কত গান করল। আর এদিকে মল্লিকবাবু বলছেন, কলকাতায় ভায়ে-ভায়ে কাটাকাটি করছে—ইসব কি হইচ্ছে বটে?

শ্রীপতি ডোম কঠিন সমস্যায় পড়ে যায়। নানা-রকম কথা শোনা যাচ্ছে। কেউ বলে, জমিদারি উঠে যাচ্ছে—এখন জমি যাবে চাষাদের হাতে। আর-একজন বলে, হুস, তেভাগা চেয়েছিল বলে সব রক্তগঙ্গা করে দিয়েছে। কেউ শোনায়, কলকাতায় চাল নেই, তেল নেই—কয়লার অভাবে হাঁড়ি চড়ছে না বাবুদের ঘরে। খুব মুরুব্বি গোছের কেউ-কেউ আবার বলে—সব ছারখার হয়ে যাবে—জাপানি বোম এই পড়ল বলে···। শ্রীপতি ডোমের সব গোলমাল হয়ে যেতে থাকে। সে তখনও একলা পথে তার বড়ো প্রিয় গানটি 'ধিক্‌রে বাঙালি' গাইতে থাকে আর খেয়াল করতে পারে, দিনকাল বদলে যাচ্ছে। হালদারবাবু—উয়ার পারা হারাম হুটা দেখি লাই—সেই হালদারবাবু কিনা নেতা হয়ে গেলেন। মাথায় সাদা টুপি পরে ভাষণ দেন এখন।

শ্রীপতি ডোমের মনে পড়ে, শেষের দিকে মল্লিক-বাবু কেমন পাগলের পারা হয়ে গিয়েছিলেন। কেউ কিছু বলতে গেলেই তাড়া দিয়ে বলতেন—হালদার-বাবুটিরে বুল কেনে—উনি এখন তমাদের লেতা বটে।

—উয়ারে আমি চিনি লাই, বাপ। তুমার কথা বল।

মল্লিকবাবু তাই শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন—আমি হত্তু কি—আমি হত্তু কি রে ছিপতি—হালদার-বাবুটিরে ছাখ কেনে—উ লোক পাকা আঁবটি হয়াছে বটে।

মল্লিকবাবুর শেষ দিনগুলি বড়ো দুঃখে কেটেছিল। মেদিনীপুরে না কোথায় যেন যে-দারোগা মেয়েদের ওপর অত্যাচার করেছে—তারই কিনা প্রমোশন হয়েছে স্বাধীন ভারতে—তাই শুনে মল্লিকবাবু যে-রকম লাফঝাঁপ করেছিলেন আর 'ঝুট ঝুট' বলে চিৎকার করেছিলেন, তাতে অনেকেই জেনে গিয়েছিল—লোকটি পাগল হয়াছে বটে। এইরকম আধপাগল অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীপতি ডোমের মুখে এইসব কথা আমি শুনি তাঁরই ঘরে বসে, দু-কান-জোড়া ঝিঁঝিঁর ঝমঝম নিয়ে, আর গ্রামের যে পরিবারটিতে আমি অতিথি হয়েছি, রাতে তাদের কাছে জানতে পারি, শ্রীপতি ডোমকেও সকলে আধপাগল বলেই জানে। তার একটি ছেলে কিছুকাল আগে হঠাৎ মারা গেছে। আর-একটি মুনিষ—মজুরি খাটে। আর শ্রীপতি গাঁয়ের বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষে করে। বছর কুড়ির এক সাক্ষর যুবক আমাকে কথাটি বুঝিয়ে দেয় এইভাবে: গাঁয়ে তো ভিখিরি বলে কিছু নেই—তা উনি স্বভাবে করে। আমরাও দি যা পারি। ও লোকের মাথাটি খারাপ হয়া গেছে।

শ্রীপতি ডোমের মতো মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়; ফলে ছেলেটির কথায় অবিশ্বাস

করার মতো কিছু পাই না। বাস থেকে নেমে এই গ্রামে পৌঁছনোর পথে শীর্ণ একটা নদীর ধারা দেখে এসেছিলাম। চারপাশে কালো, বাদামি নুড়ি-পাথরের টুকরো, আর তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু একটা জলের রেখা। ওটা যে নদী, বলে না দিলে জানবে না কেউ। মনে হবে, বহুকাল ধরে অনেক নুড়ি-পাথর জড়ো করেও আটকানো যায় নি ধারাটাকে।

রাতে শুয়ে বারবার সেই নদীটার কথাই মনে পড়ে।

৩

ভেবে রেখেছিলাম, পরের দিন ফিরে যাবার আগে শ্রীপতি ডোমের সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। কে জানে, হয়তো জ্বরের তাড়সে কাতর হয়ে আছেন মানুষটি। আধঘণ্টা সময় হাতে রেখেই বেরোই আর শিম-শশা-শাঁখালুর খেত পেরিয়ে সরু যে পথটা চলে গেছে শ্রীপতি ডোমের ঘরের দিকে, সেই পথের মুখেই দেখা হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে। গায়ে সেই কালো তুষের চাদরটি জড়ানো; মাথা অব্দি মুড়ি দেওয়া এখন। আশ্চর্য হয়ে দেখি, জ্বরের কোনো লক্ষণ আজ তাঁর দেহে নেই; কিন্তু অদ্ভুত ঘোলা দেখাচ্ছে চোখ-দুটো আর হাঁ-মুখটা এমনভাবে ফাঁক হয়ে আছে যে, মনে হয়, তিনি হাসছেন।

শ্রীপতি ডোম গুটিগুটি হেঁটে যাচ্ছেন। ঠিক হাঁটছেন না, যেন নাচছেন, নিজেরই পা ফেলার তালে-তালে; আর স্পষ্ট শুনি গুনগুন করে গাইছেন সেই গান: ধিক রে বাঙালি-ই···

দুটো হাত জোড় করে বলি—আসি।

শ্রীপতি ঘোলা চোখে একবার আমার দিকে তাকান। আমি ওঁর একটা হাত চেপে ধরে বলি—শরীর ভালো আছে তো?

এই সময় দূরে খুব জোরে মৃদঙ্গ বেজে ওঠে। প্রভাতী দিতে বেরিয়েছেন গ্রামের একমাত্র বৈষ্ণব মানুষটি। সে গানের শব্দও ভেসে আসে। শ্রীপতি ডোম হা-হা করে হাসেন আর মাথা নাড়িয়ে-নাড়িয়ে বলেন, ভিখ মাঙছি—দুটা আগড়া ধান ভিখ মাঙছি—বুঝ? ধিক্ রে বাংগালি—বাংগালি লয় গ—কাংগালি—ধিক্ রে কাংগালি-ই···

মৃদঙ্গের শব্দ তাঁর গানের ওপর আছড়ে পড়ে। সারা মুখের কুঞ্চিত বলিরেখায় এক মিথ্যা হাসির মায়া জাগিয়ে রেখে শ্রীপতি ডোম নাচতে-নাচতে আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যান—একবারও ফিরে তাকান না।

পেরেসত্রোইকা
এবং
সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা

অজিত রায়

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে মুদ্রিত রচনাটি লেখকের একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের কিছুটা সংক্ষেপিত রূপ। প্রবন্ধটি লেখক নয়া দিল্লির ইনসটিটিউট অব সোস্যাল সায়েনসেস-কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনাসভায় উত্থাপন করেন এই বছরের ১৭ সেপটেমবর তারিখে।

রচনাটির ভূমিকায় লেখক যা বলেছেন, পাঠকদের সুবিধার জন্য তার কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উত্থাপন করা হল।

আশির দশকের শুরু থেকে সোভিয়েত অর্থনীতি কঠিন সংকটের মধ্যে পড়েছে। গোরবাচেভ বলেছেন, 'ধাতু, জ্বালানি, সিমেন্ট, যন্ত্রপাতি, ভোগ্যপণ্য —সব-কিছুরই ঘাটতি ছিল এবং আছে।' তার সঙ্গে যোগ হয়েছে লোকবলের স্থায়ী ঘাটতি। 'সবচেয়ে আশঙ্কাজনক ব্যাপার হল, আমরা বৈজ্ঞানিক-প্রাযুক্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছি। .....তেল এবং কাঁচামাল রপ্তানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, অর্থনীতিকে আধুনিক করে তোলার পরিবর্তে তা প্রধানত চলতি সমস্যার সমাধান করতেই ব্যয় হয়ে যায়।'

এই আর্থনীতিক সংকটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোভিয়েত দেশের মানুষের নৈতিক সংকট বা জীবনাদর্শের সংকট। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজস্বের একটি বড়ো উৎস অ্যালকোহলিক পানীয়ের উপর বসানো কর। এই ঘটনা কেবল অর্থ-নৈতিক নয়—রাজনৈতিক দুর্বলতারও সূচক। জনসমাজের একটি বড়ো অংশের প্রচণ্ড মদ্যাসক্তির অর্থ—তারা বিচ্ছিন্নতাবোধে আচ্ছন্ন। ধর্মবিশ্বাসের তাৎপর্য সম্বন্ধে মার্কসের অভিমত যদি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত না হয়, তবে বুঝতে হবে—সোভিয়েত দেশে কী কারণে ধর্মাচরণ বেড়ে যাচ্ছে। এক সোভিয়েত পত্রিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৬৬ সালে ১০,২৬১ জন স্কুলে পড়ার বয়সের ছেলেমেয়ের ধর্মদীক্ষা (ব্যাপটিজম) হয়েছিল ; ১৯৮৬ সালে সেই সংখ্যা ৪০,৪৬৯ (কুড়ি বছরে চারগুণ বৃদ্ধি)। এই কুড়ি বছরেই গির্জায় গিয়ে বিবাহের সংখ্যা ৬০,৫১৫ থেকে বেড়েছে ৭৯,৮৪০-এ ; ধর্মসম্মত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সংখ্যা ৮,৪৮,৫০৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১,৭৯,০৫১।

এই সর্বব্যাপক গভীর আর্থনীতিক এবং নৈতিক সংকট থেকে সোভিয়েত দেশকে তথা সোভিয়েত মানুষকে উদ্ধার করার লক্ষ্যেই পেরেসত্রোইকার কর্মসূচি নিয়োজিত। পেরেসত্রোইকা আর্থব্যবসার পুনর্বিন্যাস চায়, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস চায়, মানুষের ভাবজগৎ এবং নৈতিক জীবনেরও সমুন্নতি চায়।

—সম্পাদক

১

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক সংস্কারে ব্যক্তিক স্তরে উৎসাহদান এবং ব্যক্তির বৈষয়িক অর্জনের উপর বেশি করে জোর দেওয়া হয়েছে; এবং মুনাফা, বাজার, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কতকগুলি মূলধনতান্ত্রিক উপাঙ্গ বা ক্যাটিগরির প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে আমরা দোষ দেখি না। কেবল মূলধনতান্ত্রিক উপাঙ্গই নয়, এমন-কী মূলধনতান্ত্রিক সম্পর্কের কিছু-কিছু প্রবর্তনও তত্ত্বের দিক থেকে অননুমোদনীয় বিচ্যুতি নয়। তার কারণ, প্রথমত, মার্কসেরই নিজের কথায়, সমাজতান্ত্রিক পর্ব হল মূলধনতন্ত্র থেকে সাম্যতন্ত্রে উত্তরণের কাল—এই পর্বে দুটি পরস্পর-বিরোধী সমাজবিন্যাসের উপাদানগুলিই সহ-অবস্থান করে, এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে (কার্ল মার্কস, "ক্রিটিক অব দ্য গঠা প্রোগ্রাম")। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিকভাবে এই ঘটনা লক্ষ করা গেছে—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে, বিকাশের বর্তমান স্তরে—অর্থাৎ, বৈষয়িক সমৃদ্ধির এই মাঝারি ধরনের উন্নতির পর্বে, এবং সামাজিক চেতনার বিদ্যমান অবস্থায়—যথোপযুক্ত বৈষয়িক উৎসাহদানের অভাব শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির ক্রমোন্নতির পথে কার্যত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পটভূমিতে, বাস্তবত নির্ধারক, চূড়ান্ত কর্তব্য হল—এক দিকে মূলধনতন্ত্রের বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য উপাদানগুলি এবং অন্য দিকে সাম্যতন্ত্রের উদীয়মান উপাদানগুলির মধ্যেকার বিরোধগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তীব্রতর করে তোলা—যাতে সাম্যতন্ত্র দ্বারা শেষ পর্যন্ত মূলধনতন্ত্রের স্থান গ্রহণ করার ভিত্তি রচিত হতে পারে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আর্থনীতিক নীতির ব্যাখ্যানে এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যের উপলব্ধি সর্বাংশে নেই। যেমন, ১৯৮৭ সালের ২৫-২৬ জুনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে আর্থনীতিক পুনর্বিন্যাসের রিপোর্টে গোরবাচেভ বলেছেন,

> উৎসাহদানের সম্ভাবনা নাটকীয়ভাবে বিস্তার লাভ করছে। কিন্তু, প্রত্যেক শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি শেষ-ফলে তাঁর ব্যক্তিগত শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হবে, এবং এক্ষেত্রে কোনো সীমারেখা টানা হবে না—এই বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব বহন করছে। ন্যায়বিচারের একটিমাত্র নিরিখ থাকবে: আয় সৎভাবে উপার্জিত হয়েছে কিনা। ("পার্টির কর্তব্য প্রসঙ্গে", পৃ ৫৯, ফাঁকা অক্ষরবিন্যাস লেখকের।)

সীমাহীন ব্যক্তিগত অর্জনের এই প্রতিশ্রুতি কতকটা একপেশে—'নিজেকে ধনী করে তোলো': বুখারিনের সেই পুরনো স্লোগানের প্রতিধ্বনির মতো শোনায়। একটি মৌলিক সত্য হল এই যে, উৎপাদক শ্রমে একজন সোভিয়েত বা অন্য কোনো নাগরিক যে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রয়োগ করে, যে ব্যক্তিগত প্রতিভার প্রকাশ ঘটায়, সেসব সামাজিক কাঠামোরই ফল, সামাজিক কাঠামোই তার ভিত্তি। এই মৌলিক সত্যটিকে বিচারে আনা হয় নি। সুতরাং, তার নৈপুণ্য, সংকীর্ণ অর্থে, প্রাকৃতিক বা তার ব্যক্তিগত-ভাবে আয়ত্ত গুণ নয়। (দ্রষ্টব্য: কার্ল মার্কসের "রবিন-সনেড"-এর সমালোচনা—অর্থাৎ, রবিনসন ক্রুশোর প্রাক্তন সামাজিক জীবনে অর্জিত জ্ঞান এবং নৈপুণ্যের কথা চিন্তা না করে, জনবসতিহীন ভূখণ্ডে তার কৃতিত্বের যে প্রশংসা করা হয়, তার সমালোচনা। *Grundrisse*, পেলিক্যান, ১৯৭৩, পৃ. ৮৩-৪)।

তা ছাড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান আর্থ-নীতিক সংস্কার পেরেসত্রোইকার সঙ্গে আঙ্গিকভাবে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে; আর পেরেসত্রোইকা তো সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে আরও গভীর, আরও সমৃদ্ধ করে তোলার কর্মসূচি—শ্রমজীবী মানুষের সমাজপরিচালনায় গণতান্ত্রিক যোগদানের বিস্তার-সাধনের উপরই এই কর্মসূচির রূপদান সম্ভব। ব্যক্তি-গত অর্জনের লোভ যদি শ্রমজীবী মানুষকে উৎপাদক শ্রমে দীর্ঘ সময় বেঁধে রাখে—চুক্তিবদ্ধ গৃহস্থ এবং

সমবায় সমিতিগুলির ক্ষেত্রে এইরকম হওয়ারই সম্ভাবনা—তাহলে, এইসব ক্ষেত্রে জনসাধারণের যে অংশ কাজ করবেন, তাঁদের পক্ষে সমাজের সাধারণ প্রশাসন-কাজে যোগ দেওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। আনদ্রোপভ এই বিপদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> ···দেখা গেছে, যে মানুষকে কঠিনশ্রমসাধ্য, কঠোর দৈহিক শ্রম করতে হয় না, তিনিই তাঁর নির্দিষ্ট কাজের প্রতি অনেক বেশি উদ্যোগী এবং দায়িত্বশীল মনোভাব দেখান। তিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে, উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় যোগদানের অতিরিক্ত সুযোগ পান। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শ্রমজীবী মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে—তাঁদের সমাজের, তাঁদের রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকার—সেই রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক অধিকার তিনি আরো পরিপূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। (ওয়াই. ভি. আনদ্রোপভ, "স্পীচেস আর্টিকল্‌স্, ইনটারভিউজ", অ্যালায়েড পাবলিশার্স, নয়া দিল্লি, ১৯৮৪, পৃ. ২০৩।)

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একসপ্ততিতম বছরে, কিছু-কিছু বৈষয়িক উৎসাহদানের সঙ্গে-সঙ্গে সোভিয়েত নাগরিককে সব সময় তাঁর রাজনৈতিক তথা সামাজিক দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে গোরবাচেভ নিজেই তাঁর বক্তৃতায় যেসব উদাহরণ দিয়েছেন, সেগুলির থেকেই বোঝা যায় যে, এটা সম্ভব। তিনি ওম্‌স্‌ক্‌ অ্যামালগ্যামেশনস-এর কথা বলেন। তাদের উৎপন্ন 'অত্যন্ত উচ্চ মানের এবং অন্যদের তুলনায় অন্তত ৫০% বেশি লম্বা।' গত ২০ বছর ধরে অ্যামালগ্যামেশনস যোগানের একটি চুক্তিও ভাঙে নি, 'এবং অন্যদের তুলনায় মজুরি-বৃদ্ধি বা সামাজিক ক্ষেত্রে কোনো সুযোগবৃদ্ধি ছাড়াই এরা এটা করেছে।'

দ্বিতীয়ত, বৈষয়িক সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে জীবন-যাপনের মানের উন্নত উপলব্ধির দ্বারা সংশ্লেষিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রেও, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের তুলনায় আনদ্রোপভ সমস্যাটির উন্নত এবং অনেকটা সুসমঞ্জস উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> 'জীবনযাত্রার মান-উন্নয়ন' কথাটি আমাদের দেশে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কখনো-কখনো কথাটাকে সাদামাটাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তখন চিন্তায় থাকে কেবল জনসাধারণের আয়বৃদ্ধি এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন। বস্তুত, জীবনযাত্রার মানের ধারণাটি আরো ব্যাপক, আরো সমৃদ্ধ। এই ধারণাটির মধ্যে আসে জনসাধারণের চেতনা এবং সাংস্কৃতিক মানের সুস্থির বিকাশ। প্রাত্যহিক জীবনের সাংস্কৃতিক আদর্শ, আচার-আচরণ, এবং আমি যাকে বলতে চাই, যুক্তিসঙ্গত ভোগ—সেসব এর অন্তর্ভুক্ত। ···নীতিগত এবং সৌন্দর্যগত বিচারে অবসর সময় যথাযথ ব্যবহারও এর মধ্যে পড়ে। এক কথায়, সেই সমস্ত-কিছুর সমাহার যা সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সুসভ্য বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১২-১৩)

তৃতীয়ত, এবং সবশেষে, "নেপ"-পর্বে লেনিন যে-সমস্ত সতর্কবাণী এবং উপদেশ দিয়েছিলেন, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সোভিয়েত সমাজের অগ্রণী অংশ শ্রমিকশ্রেণীকে সেই-সমস্ত কথা অনবরত মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। কেননা, "নেপ"-পর্বের সঙ্গে কিছু-কিছু বিষয়ে গোরবাচেভের সংস্কারের মিল আছে। সেটি হল এই প্রশ্ন: সমাজতান্ত্রিক আর মূলধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির মধ্যে সংগ্রামে "কে জিতবে?" এবং "কে কাকে হারাবে?" কতকগুলি বাস্তব বাধ্যবাধকতার দরুন এই-যে সংস্কারগুলিতে হাত দিতে হয়েছে, সেগুলি অবশ্যই বিশেষভাবে সোভিয়েত অর্থনীতিতে এবং সমগ্রভাবে সোভিয়েত সমাজে মূলধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির জন্ম দেবে এবং তাদের শক্তিবৃদ্ধি করবে। সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী অংশকে সতর্ক করে দিতে হবে এবং তাঁদের এভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যাতে তাঁরা এই মূলধনতান্ত্রিক উপাদানগুলিকে আটকে রাখতে পারেন, এবং পরাস্ত করতে পারেন।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিচার অনুযায়ী, নির্ধারক সমস্যাটি হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কারসাধন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এবং সরকার এই মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করেছেন। যেমন, গণতন্ত্রকে বিস্তৃত, গভীর এবং রক্ষা করার জন্য কতকগুলি নীতি। নিঃসন্দেহে, এগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু, যত গুরুত্বই এদের থাকুক, মোটের উপর, এগুলি রোগলক্ষণের চিকিৎসা ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। এগুলির সঙ্গে, সোভিয়েত সমাজের বিপ্লবোত্তর বিবর্তন, তার বিশেষ দুর্বলতা আর ঘাটতি এবং তাদের ঐতিহাসিক উৎসের গভীরতর উপলব্ধি যদি যুক্ত না হয়, সোভিয়েত সমাজ এবং রাষ্ট্রবিন্যাসের মূল রোগটিকে সারানো যাবে না।

সোভিয়েত সমাজের মূল সমস্যা, এবং স্তালিনীয় বিকার-বিকৃতির রূপে তার যে বৃদ্ধি, তার মূল নিহিত নিম্নবর্ণিত দুটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারে :

(১) গত ছয় দশকে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত বিকাশের ফলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও, আপেক্ষিকভাবে উৎপাদিকা শক্তির স্তর নিম্ন হওয়ার দরুন, উন্নত সমাজতন্ত্রের যথোপযুক্ত ভিত্তি তৈরি হয়ে ওঠে নি।

(২) এমন একটি সুপরিণত, আত্মনির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণীর অভাব, যে শ্রেণী বাস্তব জীবনে বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত এবং সুদৃঢ় হয়ে উঠেছেন, এবং তারই ফলে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ এবং বিকাশে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করার শক্তি অর্জন করেছেন।

মার্কস উন্নত সমাজতন্ত্রকে বলেছেন, 'স্বাধীনতার জগৎ', ('দ্য রেল্‌ম্ অব ফ্রীডম্')। বাইরের আবশ্যক সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য [মানুষকে] একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই বাধ্য হয়ে শ্রম করতে হয়। এই [বাধ্যবাধকতার] সীমা অতিক্রম করার আগে এই স্বাধীনতার জগৎ শুরু হয় না। ·· সমাজীভূত [সোস্যালাইজড] মানুষ, তার সহযোগী উৎপাদকদের সঙ্গে একযোগে যখন প্রকৃতির সঙ্গে যুক্তিসংগতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে, কোনো অন্ধ শক্তির দ্বারা শাসিত হওয়ার পরিবর্তে সেই সম্পর্ককে সামূহিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসে···তখন, শক্তির সর্বনিম্ন প্রয়োগে এবং মানব-স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশে তার লক্ষ্য অর্জন করে।' (কার্ল মার্কস, "ক্যাপি-টাল", ৩য় খণ্ড, সরস্বতী প্রেস, কলকাতা, ১৯৪৬, পৃ ৬৫১-৫২)

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বলশেভিক বিপ্লবের এই একসপ্ততিতম বৎসরেও উৎপাদিকা শক্তির বর্তমান স্তর এত নীচু যে, আবশ্যক সামগ্রী আর "বিলাস"-সামগ্রী—দুইয়ের জন্যই দোকানের সামনে লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে যায়। বস্তুত, বিকাশের মূলধনতান্ত্রিক স্তরের অসমাপ্ত কর্তব্যগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের যথোচিত বাস্তব ভিত্তি সৃষ্টি করার জন্য, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আজ সোভিয়েত দেশে মূলধনতান্ত্রিক প্রবণতাকে সীমিত সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

এইসব কনসেশন দেওয়ার পিছনে যে অনিবার্য বাধ্যবাধকতা আছে, তার তাৎপর্য আমাদের খোলা-খুলি বুঝে নিতে হবে। তাৎপর্যটি এই যে, পশ্চিম ইউরোপের উন্নত মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লব না হওয়া পর্যন্ত সোভিয়েত দেশে পূর্ণ-বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা সত্যই সম্ভব নয়। (সম্পদের বৃহৎ একটি অংশ সামাজিক ভোগের পরিবর্তে প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয় করতে হওয়া ; সমাজতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষের উপর উন্নত মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলির সম্ভোগসর্বস্ব সংস্কৃতির প্রভাব —এই দুটি কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যথার্থ সুবিকশিত সমাজতান্ত্রিক স্তরে উত্তরণের জন্য

প্রয়োজনীয় বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করে।)

অনতিক্রমণীয় বাধাগুলিকে স্বীকার করার পরিবর্তে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি এবং ভবিষ্যৎ রূপরেখা এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সোভিয়েত দেশ অনেক আগেই উন্নত সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌঁছে গেছে। এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত একাধিক ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত, একটি প্রাজ্ঞ, বিচারমনস্ক, সচেতন, আত্মনির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণী না-থাকা। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, বলশেভিক পার্টির অল্পসংখ্যক শ্রমিক-ক্যাডাররা গৃহযুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সময় বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রধানত ধ্বংস হয়ে যায়। একথাও ভালোমতো জানা আছে যে, প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত যে শ্রমিকশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল, দেশের বিপুল কৃষক-জনগণের তুলনায় তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, এবং সে সময়ে জ্বালানি আর কাঁচামালের অভাবে তীব্র আর্থ-নীতিক বিপর্যয়ে কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য তারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে লেনিনের কোনো মোহও ছিল না, এবং সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি কোনো লুকোচুরিও করেন নি। ১৯১৯ সালে তিনি লিখলেন, 'সোভিয়েতগুলি তাদের কর্মসূচি অনুসারে হল শ্রমিকদের দ্বারা প্রশাসনের সংস্থা, কিন্তু বাস্তবে সেগুলি হল—শ্রমিকদের দ্বারা নয়, শ্রমিকদের তরফে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃস্থানীয় অংশের দ্বারা প্রশাসনের সংস্থা।' (লেনিন, সংকলিত রচনাবলী, মস্কো, ২৪শ খণ্ড, পৃ ১৪৫)

পরে, বলশেভিক পার্টির ১০ম নিখিল-রুশ সম্মেলনে তিনি আরও তীব্র ভাষায় বলেন, 'শ্রেণীচ্যুত (declassed) প্রোলেতারিয়েত' চুরি আর মুনাফা-বাজিতে লিপ্ত হচ্ছে। 'সোভিয়েত ক্ষমতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করার পক্ষে এইটাই প্রধান বিপদ।' (সংকলিত রচনাবলী, ৩২শ খণ্ড, পৃ ৪১১-১২)

এর কিছু পরেই লেনিন বলেন, 'বর্তমানে পার্টির প্রলেতারীয় পলিসি তার সদস্যদের চারিত্রের দ্বারা নির্ধারিত হয় না—নির্ধারিত হয় একটি ছোটো গ্রুপের দ্বারা যাঁদের বলা যেতে পার্টির ওলড গার্ড; তাঁরা বিপুল, অখণ্ড সম্মান ভোগ করেন।' (সংকলিত রচনাবলী, ৩৩ খণ্ড, পৃ ২৫৭)

উপদলীয় কোঁদল আর স্তালিনের সন্ত্রাসবাদী কার্যধারার ফলে পার্টির ওলড গার্ড ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল; আর হট হাউসে গাছ গজানোর কায়দায় নতুন একটি শ্রমিকশ্রেণী তৈরি করা হয়েছিল, যারা দীর্ঘ দিন ধরে বিচারমনস্ক প্রলেতারীয় চেতনা অর্জন করতে পারে নি। আইজাক ডয়েটৎসার ঠিকই বলেছিলেন,

> ১৯৩০-এর কালসীমায় প্রায় কুড়ি লক্ষ কৃষককে শহরে নিয়ে আসা হয়েছিল। বেদনা আর বিহ্বলতার মধ্য দিয়ে তাদের শহর-জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়েছিল। বহু দিন ধরে তারা থেকে গিয়েছিল বাস্তুচ্যুত গ্রামের মানুষ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে শহরবাসী, মরিয়া, উচ্ছৃঙ্খল, অসহায়। কারখানায় কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল না, কঠোর শৃঙ্খলায় তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হত। "আনফিনিশড রেভলিউশন", অকসফোর্ড পেপারব্যাক, ১৯৬৯, পৃ ৪৭-৮)

মার্কস আর এঙ্গেলস তাঁদের তত্ত্বের একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ের ব্যাখ্যানে বলেছিলেন—বিপ্লবী শ্রেণী বৈপ্লবিক শিক্ষা ছাড়া নতুন সমাজে শাসন করার ক্ষমতা অর্জন করে না।

১৯৩০-এর সেই আধা-ভূমিদাস শ্রমিকদের পৌত্র-প্রপৌত্ররা আজ নগর-জীবনে অভ্যস্ত হয়েছে—সোভিয়েত সামাজিক জীবনে এখন তারা প্রধান সামাজিক শক্তি। ইতিমধ্যেই তারা ক্লাস-ইন-ইট-সেলফ অর্থাৎ সমস্বার্থবোধসম্পন্ন সামাজিক শ্রেণী হয়ে উঠেছে; কিন্তু নেতৃত্বের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সচেতন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তাদের ক্লাস-ফর-ইটসেলফ অর্থাৎ সমাজপরিবর্তনের দায়িত্ব-প্রাপ্ত সচেতন শ্রেণী হয়ে উঠতে হবে। সোভিয়েত

কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃত্বের সামাজিক-রাজনৈতিক সংস্কারের যে কর্মসূচি, শ্রমিকশ্রেণী এই ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য উঠে এলেই তার বস্তুগত-সামাজিক ভিত তৈরি হবে। সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীর বিষয়িগত পরিপক্কতাই এই প্রক্রিয়ার সাফল্য নিয়ে আসবে।

এই অবস্থায়, পূর্বে-উল্লিখিত দুটি বাধা সত্ত্বেও রুশ বলশেভিকদের বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করে সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার ঐতিহাসিক উদ্যোগকে প্রবলভাবে সমর্থন করেও লেনিন তাঁর শেষ লেখা "বেটার ফিউয়ার বাট বেটার"-এ বলেছিলেন, 'কিন্তু আরো উন্নত দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে এগিয়ে চলা সহজ নয়।' (সংকলিত রচনাবলী, ৩৩শ খণ্ড, পৃ ৪৯৮)

তিনি আরও বলেন, '...বর্তমানে আমরা এই প্রশ্নের সম্মুখীন—পশ্চিম-ইউরোপীয় মূলধনতান্ত্রিক দেশগুলি সমাজতন্ত্রে তাদের বিকাশ সম্পন্ন না করা পর্যন্ত, আমাদের ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র কৃষক-অর্থনীতি নিয়ে, আমাদের এই ধ্বংসের অবস্থায়, আমরা [এই বিজয়] ধরে রাখতে পারব কি?' (সংকলিত রচনাবলী, ৩৩শ খণ্ড, পৃ ৪৯৯)

লেনিন বলেছিলেন, 'সরাসরি সমাজতন্ত্রে পৌঁছে যাওয়ার রাজনৈতিক উপাদান আমাদের থাকলেও, আমাদের যথেষ্ট সভ্যতা [সিভিলাইজেশন]-র অভাব আছে।' (স. র., ৩৩শ খণ্ড, পৃ ৫০১)

এই অবস্থায়, কৃষকসমাজের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সহযোগিতা নিয়ে, এবং শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক মান ক্রমে-ক্রমে উন্নত করে, ধীরে-ধীরে সতর্কভাবে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে এগোনোর উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমরা এমন একটি রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করব যেখানে শ্রমিকরা কৃষকদের উপর নেতৃত্ব বজায় রাখবে, যেখানে শ্রমিকদের উপর কৃষকদের আস্থা বজায় থাকবে, এবং সর্বাধিক মিতব্যয়িতা অনুসরণ করে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক থেকে ব্যয়বাহুল্যের সমস্ত চিহ্ন দূর করা হবে।'

এমন-কী ১৯২৪ সালের এপ্রিলেও স্তালিন 'এক-দেশে সমাজতন্ত্র'র সঙ্গে পূর্ণবিকশিত বা সম্পূর্ণ সমাজ-তন্ত্রকে এক করে দেখেন নি। তিনি ৩০ এপ্রিল, ১৯২৪-এ বলেন, 'একদেশে প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষমতাকে উৎখাত করার অর্থ এই নয় যে, সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিজয় হয়েছে। সমাজতন্ত্রের যেটি প্রধান কাজ—সামাজিক উৎপাদনের সংগঠন—সে কাজ এখনও করা হয় নি। কয়েকটি অগ্রসর দেশের প্রলেতারিয়ানদের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া একদেশে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় কি সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়।' (সূত্র : ই. এইচ. কার, "দি ইন-টেরেগনাম", ১৯২৩-২৪, পেলিক্যান, ১৯৬৯, পৃ ৩৬৫। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য দ্র. স্তালিনের সংকলিত রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ১১০-১১)

বাস্তবিক, ই. এইচ কার যেমন বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে আন্তঃ-পার্টি বিতর্কের প্রথম পর্বে, 'একদেশে সমাজতন্ত্র'র প্রবক্তা আর তাঁদের বিরোধীদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল না। তিনি বলছেন :

> তত্ত্বগতভাবে, দুই মতের পার্থক্য যুক্তির চাপে প্রায় বিলীন হয়ে যাওয়ার মতো হয়েছিল। একদেশে সমাজ-তন্ত্রর সমর্থকরা এই পর্বে এমন দাবি করেন নি যে একটি পিছিয়ে-থাকা দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ সফল হতে পারে; তাঁরা নির্মাণ-প্রক্রিয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। বিরোধীরা একথা অস্বীকার করেন নি যে কিছুটা অগ্রগতি সম্ভব; তবে তাঁরা এই কথার উপর জোর দিয়েছিলেন যে কাজটি কাজটি হবে অসম্পূর্ণ, এবং তাকে সম্পূর্ণ করা হবে অসম্ভব। (ই. এইচ. কার, "সোস্যালিজম ইন ওয়ান কানট্রি", ১৯২৪-২৬, ২য় খণ্ড, পেঙ্গুইন, ১৯৭০, পৃ ৬০)

বলশেভিক পার্টির পলিট-ব্যুরোর নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই যত তীব্র হতে লাগল, স্তালিনবিরোধীদের মত উত্তরোত্তর এই বলে নিন্দিত

হতে থাকল যে, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রসর বৈপ্লবিক ঘাঁটিকে শত্রুর হাতে সঁপে দিয়ে বিপ্লবকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে, আর স্তালিনের নিজের মত ক্রমে-ক্রমে এই অবস্থানে এসে দাঁড়াল যে, স্থিরপদে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। ১৯৩৬-এর নভেম্বরে, অর্থাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝামাঝি সময়ে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের 'খশড়া সংবিধান'-এর রিপোর্টে স্তালিন দাবি করলেন যে, 'আমাদের সোভিয়েত সমাজ ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মূলত সফল হয়েছে : এই সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলেছে, অর্থাৎ, মার্কসবাদীরা যাকে বলে থাকেন কমিউনিজমের প্রথম, বা নিম্নতর, পর্যায়—সেই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অতএব, মূলত, আমরা কমিউনিজমের প্রথম পর্যায় অর্জন করেছি···সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে।' ("লেনিনবাদের সমস্যা", মস্কো, ১৯৪৭, পৃ ৫৪৮)

এন. এস. ক্রুশ্চভ স্তালিনের 'ব্যক্তিপূজা' এবং তাঁর কিছু তাত্ত্বিক মতের সমালোচনা করলেও, তিনিও কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে চলার ভবিষ্যদৃষ্টি আঁকড়ে থাকলেন। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসে রিপোর্টে তিনি বললেন :

> বিংশ কংগ্রেসের পর থেকে আমাদের পার্টির কাজকর্মের প্রধান ধারাটি ছিল পূর্ণাঙ্গ কমিউনিস্ট নির্মাণ-পর্বের মৌলিক কর্তব্যগুলি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়াস চালানো। ·· আমরা ক্রমশই আমাদের মহৎ লক্ষ্যের নিকটবর্তী হচ্ছি, এবং এখন স্পষ্টভাবে সেই উজ্জ্বল চূড়াটি দেখতে পাচ্ছি যেখানে সোভিয়েত জনসাধারণ নিকট ভবিষ্যতে কমিউনিজমের পতাকা উড়িয়ে দেবে। (তুমুল হর্ষধ্বনি) ["রোড টু কমিউনিজম", মস্কো, ১৯৬১, পৃ ৫৮]

একথা মনে রাখা দরকার যে, সমাজতন্ত্রের বিকাশ এবং কমিউনিজমের অভিমুখে অগ্রগতি সম্বন্ধে কথাবার্তা বলা হচ্ছিল বৈষয়িক ক্ষেত্রে কতকগুলি উন্নতির ভিত্তিতে—যেগুলি পরে অতিরঞ্জিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর অন্য দিকটি—নৈতিক দিকটি—প্রধানত উপেক্ষিত হয়েছে। মার্কস গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন, প্রলেতারিয়েতের 'তার রুটির চেয়েও বেশি প্রয়োজন সাহস, আত্মবিশ্বাস আর স্বাধীনতার বোধ।' (মার্কস-এঙ্গেলস সংকলিত রচনাবলী, মস্কো ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ ২৩১)

মার্কস কমিউনিজম বলতে কল্পনা করেছিলেন, 'মানুষের সা মা জি ক (অর্থাৎ মানবিক) জীব হিসাবে আবার সম্পূর্ণভাবে নিজের কাছে প্রত্যাবর্তন—পূর্ববর্তী বিকাশের সমগ্র ঐশ্বর্যকে নিয়ে সচেতন প্রত্যাবর্তন।' ("ইকনমিক অ্যানড ফিলসফিক্যাল মানুসক্রিপটস", মস্কো, পৃ ১০২)

একথা আজ আর অজানা নয় যে স্তালিনের আমলে সোভিয়েত দেশের শ্রমিক আত্মবিশ্বাস আর স্বাধীনতার বোধ অর্জন, এবং বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে নিজের কাছে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন তো করেনই নি, বরং তাঁরা প্রধানত রাষ্ট্রের আর পার্টির আমলাতন্ত্রের হাতে ব্যবস্থাপনার বস্তু হয়ে থেকেছেন। ক্রুশ্চভ বড়ো জোর এই অবস্থার কিছু প্রান্তিক সংশোধনের চেষ্টা করছিলেন। তাই, পূর্ণাঙ্গ কমিউনিজমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা একেবারেই গ্রাহ্য হওয়ার মতো ছিল না।

বহু তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক ভ্রান্ত এবং নানা অপরাধ ছাড়াও, প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সম্বন্ধে স্তালিনের সমগ্র ধারণাটি ছিল উপর-মহল থেকে সামাজিক ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আচ্ছন্ন। যেমন, ১৯২০ সালে তিনি বলেছিলেন, 'তিন বছর আগে পেত্রোগ্রাদ সোভিয়েতের অঙ্গুলিমেয় কয়েক জন বলশেভিক সদস্য মিলিত হয়ে কেরেনস্কির প্রাসাদ ঘেরাও করার, তাঁর হতোদ্যম সেনাবাহিনীকে বন্দী করার এবং সোভিয়েতের দ্বিতীয় কংগ্রেসে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।' ("সংকলিত রচনাবলী", ৪র্থ খণ্ড, মস্কো, পৃ. ৩৯৬)

এই বক্তৃতারই কিছু পরে তিনি আবার বলেন, 'আমরা, এই ছোটো দল, বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিনিধিদের ক্ষমতাচ্যুত করি এবং ক্ষমতা দ্বিতীয় কংগ্রেসে ফিরিয়ে দিই।' ("সংকলিত রচনাবলী",

৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৪)

স্তালিনের ওই দুটি উদ্‌ধৃতির সঙ্গে, ওই একই বিষয়ে লেনিনের উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যান যদি তুলনা করে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে—যথার্থ মার্কসবাদী উপলব্ধি থেকে স্তালিন কিভাবে সরে গিয়েছিলেন। ১৯১৭-র ফেবরুয়ারিতে লেনিন বলেছিলেন, 'রুশ প্রলেতারিয়েত, কৃষকসমাজের একাংশের সঙ্গে ...এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গেও যুক্ত হয়ে রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে। ১৯১৭-র ২১শে এপ্রিল প্রলেতারিয়েত সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর একচ্ছত্র শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে, বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে আপোসে ইচ্ছুক পেটি-বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে। ৩রা জুলাই শহরের প্রলেতারিয়েত স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আপোসপন্থীদের সরকারকে এক প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। ২৫শে অকটোবর তারা ওই সরকারকে উচ্ছেদ করে প্রলেতারিয়েত এবং গরিব কৃষকদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।' ("সংকলিত রচনাবলী", ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৬২)

সোভিয়েত সমাজে গণতন্ত্র এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজে সত্য-সত্যই এগোতে হলে, স্তালিনের তথাকথিত ব্যক্তিপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত প্রচণ্ড বিকার-বিকৃতির সংশোধন করলেই হবে না; স্তালিনের সময়ে এবং স্তালিনের পরবর্তী কালে সামাজিক-রাজনৈতিক বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়াটির গভীর পুনর্বিবেচনা করতে হবে—যাতে সোভিয়েত জীবনে এখনো বিদ্যমান ওই প্রবণতাগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।

এই কাজে হাত না দিয়ে, গোরবাচেভ এখনও স্তালিনের ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে অযৌক্তিক গৌরবায়ন করে চলেছেন।

মার্কস যখন তাঁর প্রগতিশীল বৌদ্ধিক জীবন শুরু করেন, তখন তিনি 'যে-সমস্ত সম্পর্ক মানুষকে হৃতমান, শৃঙ্খলিত, পরিত্যক্ত, ঘৃণাস্পদ জীব করে তোলে, সেই-সমস্ত সম্পর্কের উচ্ছেদের নিঃশর্ত নৈতিক আবশ্যকতা স্বীকার করেন। স্তালিন সমগ্র সোভিয়েত জনসমাজকে কেবল যে সন্ত্রাসতাড়িত বন্দীতে পরিণত করেন তাই নয়, তিনি সারা দেশ জুড়ে আক্ষরিক অর্থেই অসংখ্য 'গুলাগ আরকিপেলেগো' তৈরি করেন যেখানে সৎ বিপ্লবীদের প্রতি প্রাচীন কালের ক্রীতদাসদের চেয়েও নির্মম আচরণ করা হয়েছিল।

স্তালিনের কুখ্যাত নীতি এবং আচরণের বিশদ সমালোচনার স্থান এটি নয়, তার উপযুক্ত অবকাশও এখানে নেই। কিন্তু পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনস্তকে যদি সার্থক করে তুলতে হয়, তাহলে স্তালিন-প্রশ্নে গোরবাচেভ নেতৃত্বের দ্বিধা, দ্বিচারিতা আর পল্লবগ্রাহিতা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে হবে—যাতে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি সত্য-সত্যই নতুন সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে। পরের পরিচ্ছেদ সেই বিষয়ে আলোচনার সীমাবদ্ধ প্রয়াস।

৬

প্রথম কথা, স্তালিনের ঐতিহাসিক ভূমিকার নেতিবাচক দিকগুলি সম্বন্ধে গোরবাচেভের সমালোচনা অত্যন্ত মৃদু। তিনি অভিযোগ করেছেন, স্তালিন 'পার্টি এবং সরকারের নেতৃত্বে একটি প্রশাসনিক-হুকুমশাহির ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেন। কিন্তু আসলে যা উঠে আসে তা হল এক ব্যক্তির সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র। তিনি 'কৃষকসমাজের প্রতি লেনিনের নীতি থেকে সরে আসা'র কথা বলেছেন; স্তালিন কিন্তু এই ক্ষেত্রে আসলে লেনিনের নীতি উলটে দিয়েছেন, তাঁর নির্দেশকে লঙ্ঘন করেছেন। তার ফলে কৃষকসমাজের অগণিত মানুষ আর তাদের খামারের পশু নিহত হয়েছে।

স্তালিনের অপরাধগুলিকে গোরবাচেভ কিভাবে বিচার করেছেন তা বোঝা যায় এই বিবৃতি থেকে:

তাঁর আমলে 'পার্টির ভিতরে আর বাইরে হাজার-হাজার মানুষ সার্বিকভাবে নির্যাতন ভোগ করেছেন।' আসল ঘটনা এই, নির্যাতনের সংখ্যা হাজার-হাজার নয়, লক্ষ-লক্ষ।

আরও গুরুত্ববহ কথা হল—স্তালিনের ভূমিকা এবং নেতৃত্বের সামগ্রিক চারিত্র সম্বন্ধে গোরবাচেভের বিচার অতিমাত্রায় সদর্থক। তিনি বলছেন : 'সংক্ষেপে, স্তালিনের পরিচালনায় পার্টির নেতৃত্বদায়ী মূলগোষ্ঠী মতাদর্শগত সংগ্রামে লেনিনবাদকে রক্ষা করেছে।'

পূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি, তাতে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, স্তালিন যদি সত্যিই লেনিন-বাদকে রক্ষা করে থাকেন, তবে তা করেছেন তার প্রকৃত মর্মবস্তুকে ধ্বংস করার জন্য! যে মার্কসবাদীরা 'একদেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজে স্তালিনের ঐতিহাসিক কৃতিত্বে'র প্রশংসা করে থাকেন, তাঁরা সমাজবিবর্তনের ধারাকে নির্বিকল্প এবং অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিতে বিচারের অপরাধে অপরাধী—সেই বিচারে প্রকৃত জীবনের বাস্তব বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে উপেক্ষিত। সোভিয়েত দেশে শ্রমিকশ্রেণীর শাসনের প্রথম দুর্গটিকে রক্ষা করার নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে স্তালিন এই কাজটি করতে এগিয়েছিলেন, তাতে মার্কসবাদের একান্ত মর্মবস্তুটিই লঙ্ঘিত হয়েছিল, এবং রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার যে পথনির্দেশ লেনিন দিয়েছিলেন, তাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

স্তালিনের এই-সমস্ত সমালোচনার অর্থ এই নয় যে, ট্রটস্কিকে, অথবা লেনিনের সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা তাঁর পরেও বেঁচে ছিলেন তাঁদের কাউকে, পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হচ্ছে। এই প্রশ্নে লুকাচের সঙ্গে সর্বান্তঃ-করণে একমত হওয়া যায় :

'এ কথা না বললেও চলে যে, তিরিশের যুগে আর তার পরে যাঁরা স্তালিনের দ্বারা অন্যায়ভাবে নিপীড়িত, ধিক্কৃত এবং নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ (গুপ্তচরবৃত্তি, সাবোতাজ ইত্যাদি) থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিতে হবে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তিও···'পুনর্বাসনে'র বিষয় হবে।' তিনি আরও বলেন, 'স্তালিন-আমলকে আমরা স্বৈরাচারী এবং অগণতান্ত্রিক বলি, ট্রটস্কির মৌলিক ভাবনার সঙ্গে তার একটা নিকট নীতিগত সম্পর্ক আছে। ট্রটস্কির অধীনে কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ, অন্তত স্তালিনের অধীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের মতোই, অগণতান্ত্রিক হত।' (জর্জি লুকাস, "রিফ্লেক-শনস অন দ্য কাল্ট্ অব স্তালিন", "সারভে—এ জারনাল অব সোভিয়েত অ্যানড ঈস্ট ইউরোপীয়ান স্টাডিজ", সংখ্যা ৪৭, এপ্রিল ১৯৬৩, পৃ ৬০-১)

বাস্তবিক, উত্তর-লেনিন রাশিয়ার সমস্ত বিকাশ-প্রক্রিয়া এই অবস্থার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়ে-ছিল যে, বলশেভিক পার্টিতে এমন একজন নেতাও ছিলেন না, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে কঠিন যাত্রাপথে পার্টির কর্মীরা যাঁর পাশে সমবেত হতে পারেন। চার্লস বেটেলহাইম যথার্থই বলেছেন, ফেবরুয়ারি ১৯১৭ থেকে জুন ১৯১৮—এই নির্ধারক কালসীমায় কেন্দ্রীয় কমিটিতে এমন একদল নেতার আবির্ভাব ঘটল না 'যাঁরা দৃঢ়ভাবে এবং পূর্বপর-সমভাবে লেনিনের সঙ্গে সহমত—অন্তত তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ অন্যদের তুলনায় অনেক সহজে বা অনেক তাড়াতাড়ি লেনিনের পাশে এসে দাঁড়ালেন না। লেনিনের মৃত্যুর পর কী ঘটবে সেটা বুঝতে এই ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ।' (চার্লস বেটেলহাইম, "ক্লাস স্ট্রাগলস ইন দি ইউ. এস. এস. আর—ফার্স্ট পীরিয়ড", ১৯১৭-১৯২৩, দ্য হারভেস্টার প্রেস, ১৯৭৬, পৃ ৩৭৮)

এখানে যে বিষয়টি বলবার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটি এই যে, পেরেসত্রোইকা যদি তার ঘোষিত লক্ষ্য পুনর্বিন্যাস অর্জন করতে চায়, তাহলে গ্লাসনস্তকে তার যুক্তিসঙ্গত সীমা পর্যন্ত অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ, গোরবাচেভ তাঁর ১৯৮৬-র খাবারোভ্স্ক্ বক্তৃতায় যে 'সামাজিক বিপ্লব'-কে আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তাকে

যদি সত্যই সার্থক করে তুলতে হয়, তাহলে কোনো মানসিক প্রতিবন্ধ ছাড়াই স্তালিন-প্রশ্নকে বিচার করতে হবে। এই কাজটি গোরবাচেভ নেতৃত্ব এখনো করেন নি।

কথাটি হল, ভবিষ্যৎকে রূপ দিতে হলে অতীতকে সমালোচনা আর আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে বুঝতে হবে।

সমস্ত সাক্ষ্য থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, সোভিয়েত দেশে পুনরুজ্জীবনের বিষয়গত এবং বিষয়িগত দু ধরনের শক্তিই একে অন্যের উপর ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া করছে। সেই শক্তি দুটি হল, একদিকে, একটি বিশাল, নগরায়িত, শিক্ষিত (লেনিনের ভাষায়, সভ্য) এবং উত্তরোত্তর আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী শ্রমিকশ্রেণী; অন্যদিকে বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সমাজের বিবর্তন সম্বন্ধে প্রচণ্ড পরিমাণে বিচারশীল মূল্যায়ন। পেরেসত্রোইকার আসল কাজ হল, সোভিয়েত সমাজের অভ্যন্তরে যে ইচ্ছা-আবেগ জন্ম নিচ্ছে, তাকে ভাষা দেওয়া, পরিচালনা করা। গোরবাচেভ আর তাঁর কমরেডরা এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ পর্যন্ত-তাঁরা যা করেছেন, তার চেয়েও আরো অনেক বেশি তাঁদের করতে হবে।

৪

পেরেসত্রোইকার দীর্ঘমেয়াদি পরিপ্রেক্ষিত বিশদ করে বলতে গিয়ে, আন্তর্জাতিক পরিসরে এই নীতির নতুন গতির অভিমুখ আর ধ্রুবক (প্যারামিটার) নির্ধারণের উদ্দেশ্যে গোরবাচেভ কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এগুলিকে বিশ্লেষক দৃষ্টিতে দেখা প্রয়োজন। যেসব প্রশ্ন তিনি তুলেছেন, সেসব নিম্নলিখিত বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত:

(১) সাম্রাজ্যবাদের চারিত্রের পুনর্বিবেচনা; (২) আজকের দিনে মূলধনতন্ত্র এবং সমরবাদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক; (৩) মূলধনতন্ত্র এবং নয়া-উপনিবেশবাদের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক; (৪) মূলধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক জগতের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক মূল্যমানের সহ-অবস্থানের সম্ভাবনা। ("অকটোবর অ্যানড পেরেসত্রোইকা", পৃ ৬২-৫)

গোরবাচেভের নীতিনির্দেশ এবং ইঙ্গিত অনুসরণ করে সোভিয়েত বিদ্বজ্জন এবং তাত্ত্বিকরা বহু ধারণা আর অবস্থান উদ্‌ভাবন করছেন। সেসবের কিছু-কিছু বর্তমান লেখকের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। যেমন, তথাকথিত 'নতুন চিন্তা'র একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়েছে:

> নতুন চিন্তার প্রয়োগের সীমা এবং তার ক্ষেত্র সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে বেশ-কিছু মতভেদ আছে। এঁদের কেউ-কেউ মনে করেন, শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব, এবং সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য প্রগতির বাস্তবোচিত এবং আপোসমূলক পথ নির্বাচন পর্যন্ত এই চিন্তাকে প্রসারিত করতে হবে। অপর পক্ষে, অন্যেরা মনে করেন, নতুন চিন্তা কেবল যুদ্ধ আর শান্তির সমস্যার সঙ্গেই সম্পর্কিত হবে, অন্য ক্ষেত্রে এর প্রসারণ অনুমোদন করা যায় না; নিউক্লীয় বিপদের আশঙ্কায় আমরা কখনোই বিমূঢ় হয়ে থাকব না……
>
> (আর-একজন পণ্ডিত বলেন)…একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শ্রেণীসম্পর্ক আর রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক—এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই সংকীর্ণ হয়ে আসছে, কারণ আজ যে-কোনো স্থানীয় সংঘাত আঞ্চলিক, এমন-কী সর্বজাগতিক যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। নিউক্লীয় যুগে সংগ্রামের রূপ নির্বাচনে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, এবং বৈপ্লবিক শক্তিগুলির সভ্য, আপোসমূলক সংগ্রামের রূপ উদ্‌ভাবন এবং প্রয়োগ করা উচিত। (এল. মিত্রোখিন, "নিউ থিঙ্কিঙ অ্যানড সোস্যাল প্রোগ্রেস", "সোভিয়েত রিভিউ", নতুন দিল্লি, সংখ্যা ৭, ১৯৮৮, পৃ ৩০)

শেষে বর্ণিত মতের প্রবক্তারা অবশ্য বলেন, 'এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, মার্কসবাদের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য থেকে সরে আসা হচ্ছে: এর প্রবক্তারা নিশ্চিতভাবে বলেছেন যে, সংগ্রামের রূপ বাস্তব

অবস্থার উপর নির্ভরশীল—যার আজ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে।' (একই সূত্র)

দেখা যাচ্ছে, এই 'নতুন চিন্তা'র প্রবক্তারা অবশ্যই বিচারের বহু নতুন উপাদান আর মানদণ্ড নিয়ে এসেছেন যা নিঃসন্দেহে মার্কসবাদের ক্ষেত্রে নতুন! আর, বড়ো কথা এই, এঁরা কেউই অজ্ঞাতকুল বুদ্ধিজীবী নন। এঁরা যে গোরবাচেভের মতেরই প্রতিধ্বনি তুলছেন, তা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত ঊনবিংশ সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনে গোরবাচেভের বক্তৃতার এই উদ্‌ধৃতি থেকে দেখা যাবে :

> এখনই বিদ্যমান বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ এই অনুমানকে যুক্তিদান করে যে, এই বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে শক্তিসংরক্ষণ আর নির্মাণ যদি সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে এই শতাব্দীর শেষে পৃথিবী নিম্নলিখিত প্রবণতাগুলির দ্বারা রূপগ্রহণ করবে :
>
> —স্বার্থান্ধ উচ্চাশা আর অন্ধ সংস্কারের পরিবর্তে যুক্তি, জ্ঞান এবং নৈতিক মূল্যমানের প্রভাবে ক্রমে-ক্রমে নিরস্ত্রীকরণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মানবিকীকরণ ;……
>
> —প্রধানত জাতিসংঘের ভূমিকার উদ্‌বর্তনের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার এক সর্বজনীন ব্যবস্থা রূপগ্রহণ করবে ;
>
> —সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক সুপ্তশক্তির বিপুল বিকাশ আরও সভ্য পদ্ধতিতে জাগতিক সমস্যার যুক্তভাবে সমাধানের জন্য ব্যবহার করা হবে ;……

এর পর গোরবাচেভ বলছেন : 'এখানে কি কোনো ভ্রান্ত মোহ আছে? আগ্রাসন আর যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী উৎস কি উবে গেছে? না। সাম্রাজ্য-বাদী সমরবাদের পক্ষ থেকে শান্তিভঙ্গের কথা আমরা ভুলে যাই নি। আমরা মনে করি—যে ইতিবাচক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, তাকে উলটে না-দেওয়ার মতো নিশ্চয়তা এখনো তৈরি হয় নি। বস্তুত, নতুন রাজ-নৈতিক চিন্তা আমাদের অতীতের তুলনায় আরো ব্যাপক রাজনৈতিক পরিসরে শক্তিপ্রয়োগের নীতিকে প্রতিরোধ করার নতুন সুযোগগুলিকে খুঁজে দেখতে সাহায্য করে। আমাদের শতাব্দীর শেষার্ধে এমন কিছু বাস্তব উপাদানের সৃষ্টি হয়েছে যাতে এইসব সুযোগ শক্তিলাভ করেছে।' ("ডকুমেন্ট্‌স্ অ্যানড মেটিরিয়ালস", পৃ ৩৫-৬)

নতুন সুযোগের প্রসঙ্গে কেউ অবশ্য গোরবাচেভ-এর সঙ্গে বিবাদ করবেন না। নিকট অতীতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং শান্তির জন্য ব্যাপক সংগ্রামে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে এই নতুন সুযোগকে উপেক্ষা করার একটা ঝোঁক ছিল, যেজন্য সারা পৃথিবীতে বহুসংখ্যক স্বাধীন মার্কসবাদী আর শান্তিকর্মী সমালোচনা করেছিলেন। গোরবাচেভের আত্মসমীক্ষা-মূলক পর্যালোচনা এই সমালোচনার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করছে। কিন্তু গোরবাচেভ যখন বলেন,

> শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এবং সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি একেবারে গোড়া থেকেই মার্কসবাদের অঙ্গীভূত হয়ে আছে। আমরা এ ব্যাপারে গভীরতর উপলব্ধিতে পৌঁছতে চেষ্টা করেছি। এ উপলব্ধি আমাদের এই সিদ্ধান্তে নিয়ে এসেছে যে আমাদের এই যুগে সাধারণ মানবিক মূল্যমানই অগ্রাধিকার পারে। নতুন রাজনৈতিক চিন্তার এই-ই হল সারবস্তু।
>
> নতুন রাজনৈতিক চিন্তা আমাদের আরো গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জাতি যেসব নৈতিক মূল্যমান গড়ে তুলেছে, এবং মহৎ মনস্বারা যা উচ্চারণ করে গেছেন, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেসব কী প্রবল গুরুত্ব বহন করে। (একই সূত্র, পৃ ৩২)

তখন তিনি আজকের এবং ভবিষ্যতের বিশ্ব-পরি-স্থিতির বাস্তবোচিত পর্যালোচনা আর মৌলিক মার্কসীয় নীতিসমূহ—দুয়েরই সীমা অতিক্রম করে অনেক দূর চলে যান।

গোরবাচেভ আর তাঁর সমভাবুকরা যেভাবে সর্বমানবের স্বার্থ আর শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে পরস্পরের

প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাচ্ছেন, সেটা নিতান্তই অধ্যাত্মবাদী বিমূর্তনের প্রয়াস। কারণ, দুয়ের মধ্যে প্রকৃত কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" বলছে, 'প্রলেতারীয় আন্দোলন বিশাল গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের স্বার্থে বিশাল গরিষ্ঠ-সংখ্যক মানুষের আত্মসচেতন, স্বাধীন আন্দোলন' ছাড়া আর-কিছু নয়। (মার্কস-এঙ্গেলস, নির্বাচিত রচনাবলী, দু-খণ্ড সংস্করণের ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫০, পৃ ৪২)

এই আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বর্তমান বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে মানবসমাজের মুক্তিসাধন, যাতে 'প্রাকৃতিক শক্তির উপরে—তথাকথিত প্রকৃতি এবং মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি—দুয়েরই উপরে, মানুষের কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়।'

এই যখন প্রলেতারীয় শ্রেণীসংগ্রামের মৌলিক গতিমুখ, তখন প্রলেতারিয়েতের স্বার্থের সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের কোনো সংঘাত থাকতে পারে না।

বিভিন্ন জাতির দ্বারা বহু শতাব্দী ধরে বিবর্তিত যে নৈতিক মূল্যমানের কথা গোরবাচেভ বলেছেন, তাও ভাববাদী চিন্তার প্রয়াস, বাস্তবের দ্বারা তা সমর্থিত নয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতার জন্য মানুষের যে প্রয়াস, তার ফলে হাজার হাজার বছর ধরে মানবিক মূল্যমানের কতকগুলি সাধারণ নীতি বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি সীমিত, এবং শ্রেণীভেদের দরুন ব্যর্থ।

এ কথা সত্য যে, জাতিসংঘের আবির্ভাব আর তার দ্বারা কতকগুলি নীতির স্বীকৃতি প্রগতির পরিচয়চিহ্ন। কিন্তু সেগুলিকে কার্যকর করার মতো যথেষ্ট শক্তি না থাকায়, জাতিসংঘের জাতিগত এবং বর্ণগত সমতা, আর মানবিক অধিকারের নীতিগুলি মূলত এখনো সদিচ্ছার ঘোষণা হয়েই আছে।

সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি যে পরিমাণে মূল-ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের ভূমিকাকে ছোটো করে দেখবে, সেই পরিমাণে তাকে কার্যকর করে তোলার শক্তি দুর্বল হবে।

এ ছাড়া, উন্নত আর উন্নতিশীল দেশগুলির অর্থ-নীতি এবং রাজনীতির উপর দু-শ ট্রান্সন্যাশনাল করপোরেশনের প্রচণ্ড ক্ষমতাবৃদ্ধির ফলে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অবদান, এবং সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উৎপাদিকা শক্তির প্রভূত বিকাশকে যুক্তি-সংগতভাবে বণ্টনের জন্য একটি নতুন আর্থনীতিক ব্যবস্থার সমস্ত পরিকল্পনা অলস স্বপ্ন হয়ে থাকবে।

মূলত, সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েত নেতৃত্বের নতুন চিন্তার ভিত্তি—আজকের মূলধনতন্ত্রের আর্থনীতিক এবং রাজনৈতিক শক্তির বিচারে অতিরঞ্জন, অর্থাৎ, মূলধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের গভীরতাকে ছোটো করে দেখা। সংক্ষেপে বললে, মূলধনতন্ত্র আজ সংকটের এমন গভীরতায় নিমজ্জিত যেখানে

(১) উৎপাদক সম্পদের এক বৃহদংশ অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন এবং মহাশূন্যাভিযান (যা তার সামরিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত) ইত্যাদি সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় খাতে নিয়োগ করেই মাত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে;

(২) মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স্ এবং রোবোটীকরণ কয়লা, ইস্পাতের মতো মূলশিল্পকে ক্রমশই বন্ধ করে দিচ্ছে—যার দরুন উন্নত দেশগুলিতে লক্ষ-লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের জীবনে নিয়ে আসছে বেকারির সম্ভাবনা;

(৩) এর পরিণতিতে, ধনী আর অতিধনী দেশ-গুলিতে দারিদ্র্য প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে;

(৪) সবশেষে, বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে বাতাস, জল আর মাটির পারিবেশিক ভারসাম্যচ্যুতি আর দূষণ মানবসমাজ আর পশুজগতের সামনে নিয়ে আসছে সমূহ ধ্বংসের আশঙ্কা।

বেশ কয়েক দশক ধরে উন্নত দেশগুলির জন-

সমাজের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অংশ—তাঁদের মধ্যে আছেন বুদ্ধিজীবী, ধর্মসম্প্রদায়, উদারনৈতিক-মানবতাবাদী মানুষ—বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু মূলধনতন্ত্রের বিকল্প একটি সামাজিক-রাজনীতিক ব্যবস্থার সন্ধান করে ফিরছেন। সেই একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প হল সমাজতন্ত্র। কিন্তু সমাজতন্ত্র দীর্ঘদিন স্তালিনীয় বিকার-বিকৃতির দ্বারা চিহ্নিত, আর তারই সমতুল বলে বিবেচিত হওয়ার দরুন, জনসমাজের এই অংশ তাঁদের সন্ধানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এখন, সোভিয়েত ইউনিয়নে পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনস্তের অগ্রগতির ফলে, সারা দুনিয়ার এগিয়ে যাওয়ার পথের বাধা ক্রমশ সরে যাচ্ছে। এখন, যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়ে মানুষের মনে আস্থা উৎপাদনের মতো করে, সমাজ-তন্ত্রকে বিকল্প হিসাবে তুলে ধরা সম্ভব, এবং তা করা প্রয়োজনও।

এ কথার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, মরিয়া হয়ে এগিয়ে যেতে হবে, বা, আনাড়ির মতো সংঘর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। এ কথার অর্থ এই যে, মূলধন-তান্ত্রিক দেশগুলির সামাজিক-রাজনীতিক পুনর্বিন্যাস, এবং মূলধনতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যেকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্ন দুটিকে শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন না করে—শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্র করে তুলতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে নিপুণ-ভাবে, নমনীয়ভাবে, যথাযথভাবে।

৫

সোভিয়েত ইউনিয়ন বহুদিন আগেই বিকশিত সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌঁছে গেছে—সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির এই সিদ্ধান্তের কথা আগে উল্লেখ করেছি। বলেছি—এই সিদ্ধান্তে অনেকগুলি ভুল ইঙ্গিত আছে। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের আলোচনা করার চেষ্টা এখন করব।

এই সিদ্ধান্তের গভীর বিচারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, মার্কসের মতে, সমাজতন্ত্রের বিকাশের পরিমাণ এবং স্তর নির্ধারণের মূল নিরিখ হল—"বাইরের প্রয়োজন" সংগ্রহ করার বাধ্যবাধকতা থেকে শ্রম কী পরিমাণ মুক্তি পেয়েছে, আর তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, মানবিক সম্ভাবনার সামগ্রিক স্ফুরণের জন্য কতখানি স্ব-আয়ত্ত সময় পাওয়া যাচ্ছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির "বিকশিত সমাজতন্ত্র"র সিদ্ধান্ত, এবং তার থেকে উৎপন্ন কতকগুলি অনুসিদ্ধান্তের তাৎপর্যকে আমরা বিচার করে দেখতে চেষ্টা করব।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মতে, সোভিয়েত সমাজ বিকশিত সমাজতন্ত্রের স্তরে পৌঁছে যাওয়ার ফলে, বৈর শ্রেণীসম্পর্ক অপসারিত হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে প্রলেতারীয় একাধিপত্যের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র এখন 'জনগণের রাষ্ট্র' এবং 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র'। পার্টির 'জনগণের রাষ্ট্র'-র ধারণা, একদিকে জনসাধারণকে 'আত্ম-নিয়মন এবং আত্ম-শাসন'-এর মধ্যে টেনে আনার প্রয়োজন, অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে নির্মমভাবে খর্ব করে আনার প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই চিন্তা সর্বাংশে সঠিক এবং অনুমোদনীয়।

কিন্তু, 'সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র'-র অন্য ধারণাটির কয়েকটি বিপজ্জনক তাৎপর্য আছে। গোরবাচেভ বলছেন,

> সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্ম হয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের হাতিয়ার হিসাবে, এবং সমাজবিকাশের পরবর্তী এক স্তরে, তা সমগ্র জনগণের রাষ্ট্রে বিবর্তিত হয়…
> সমস্ত শ্রেণী আর সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং ইচ্ছাকে গণতান্ত্রিক রীতিতে চিহ্নিত এবং রূপায়িত করার নির্বিঘ্নে-গতিশীল যন্ত্র হিসাবে, সেগুলিকে একটি সুশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসার এবং সোভিয়েত আভ্যন্তরিক আর বৈদেশিক নীতির কাঠামোর মধ্যে সেই স্বার্থ এবং ইচ্ছাগুলিকে সার্থক করে তোলার যন্ত্র হিসাবে। ("ডকুমেন্টস অ্যানড মেটিরিয়ালস",

পৃ ১৩০)।

বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী আর সামাজিক স্বার্থকে ভাষা দেবার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকাকে বাতিল করে দেবার মধ্যে বিপদ আছে—বিশেষ করে এখন যখন ব্যক্তিগত অর্জনের ব্যাপক সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে সামাজিক স্তরভেদ বৃদ্ধি পাবে। বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক উন্নতির দ্রুতগতিও মানসিক আর কায়িক শ্রম, দক্ষ আর অদক্ষ শ্রমের মধ্যে ব্যবধানকে প্রশস্ত করে তুলবে।

অর্থনীতি আর প্রযুক্তির উন্নতির প্রয়োজনে এসব যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেওয়া হলেও, এসবের সামাজিক রাজনৈতিক তাৎপর্যকে মনে রাখা প্রয়োজন।

সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি এই সমস্যা সম্বন্ধে খুব স্পষ্টভাবে সচেতন নয় বলে মনে হয়। সেই কারণে, পার্টি নিজের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু, পার্টি শ্রেণীগতভাবে নিজের পরিচয় দিচ্ছে না—এটি একটি স্বাধীন সামাজিক শক্তি; মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে তার প্রজ্ঞা আর অন্তর্দৃষ্টি আহরণ করে। এ উক্তির অর্থ কী, তা গোরবাচেভ বলেছেন :

> আমরা আজকের অবস্থায়, পার্টি সমাজের অগ্রবাহিনী—এই প্রত্যয়টিকে পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করব। এই অগ্রবাহিনী, মার্কসবাদী লেনিনবাদী শিক্ষার দ্বারা চালিত হয়ে, দেশের বিকাশের সবচেয়ে গুরুতর বিষয়গুলির বিচার করে, পেরেসত্রোইকার মতাদর্শ সূত্রায়িত করে, এবং জনসাধারণের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে তাঁদের অনুপ্রাণিত আর উৎসাহিত ক'রে, আমাদের বহুজাতিক সমাজকে অগ্রগতির সঠিক, সমাজতান্ত্রিক পথের নির্দেশ দেয়। ("ডকুমেন্ট্স্ অ্যানড মেটিরিয়ালস", পৃ ১২৭)

গোরবাচেভ এখানে অন্তত তিনটি ভুল করেছেন।

প্রথমত, তিনি প্রলেতারীয় একাধিপত্যের দুটি কর্তব্যের পার্থক্য নির্দেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রামসির ভাষায়, একটি হল, নেতৃত্বদায়ক (হেগিমনিসটিক), অন্যটি হল শাসনকারক (ডমিনেটিঙ)। এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, পুরনো সমাজের শোষক শ্রেণীগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদের পর, অন্তত অর্ধশতাব্দী জুড়ে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসার এবং তার আনুষঙ্গিক পরিবর্তনের পর, সোভিয়েত দেশে আর বৈর শ্রেণীবিরোধ নেই, অতএব, সেদেশে প্রলেতারীয় একাধিপত্যের শাসনকারক বা দমনমূলক কাজের প্রয়োজন আর নেই। কিন্তু তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, সোভিয়েত জনসাধারণের সকল অংশের সামাজিক চেতনার স্তরে সমমনস্কতা এসে গেছে—অতএব, প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বদায়ক কাজের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত, নেপ-ধরনের সুযোগের ফলে, ব্যাপক ক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিভেদ এবং তার ফলে, মূলধনতান্ত্রিক প্রবণতার বিকাশের সম্ভাবনা থাকায়, এবং, প্রযুক্তির উচ্চতর স্তরে যে অতিদক্ষ শ্রম এবং অর্থনীতির ভিত্তিমূলে যে প্রধানত কায়িক শ্রম—এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, পুরনো ধ্রুপদী অর্থে শিল্পশ্রমিকদের সচেতন সজাগ নেতৃত্বের, তাঁদের জীবনযাপন থেকে আহরিত সামূহিক চেতনার প্রয়োজন আজ অনেক বেশি করে জরুরি হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়ত, এমন একটি কমিউনিস্ট পার্টির ধারণা, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যার কোনো আঙ্গিক বন্ধন নেই, সেই পার্টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বাইবেল থেকে আহরিত জ্ঞানে প্রজ্ঞাবান—এই ধারণাটাই সম্পূর্ণভাবে অ-মার্কসবাদী। মিখাইল গোরবাচেভ 'সমাজের অগ্রবাহিনী হিসাবে লেনিনবাদী প্রত্যয়ের পার্টি'র কথা বলেছেন। কিন্তু লেনিন একান্তভাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে 'শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসাবে' আখ্যায়িত করেছেন (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, ৪২শ খণ্ড, পৃ ৩৮২; ৩১শ খণ্ড, পৃ ২৪-৫, পৃ ১৮৭; ৩২শ খণ্ড, পৃ ৫০)। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যবর্তিতা ছাড়াই কমিউনিস্ট পার্টি সমাজের অগ্রবাহিনী—এই প্রত্যয়টি কেবল অবাস্তবই নয়, এর

মধ্যে স্তালিনীয় বিকার-বিকৃতির বীজ এবং স্বৈরাচারী বিচ্যুতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

৬

সোভিয়েত দেশ এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নানা বিষয়ে সমালোচনা থাকলেও, সোভিয়েত রাষ্ট্র বা পার্টিকে হতমান করা যে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য নয়, তা না বললেও চলে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐতিহাসিকভাবে যে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে, তাকে স্বীকার করতে লেখকের কোনো দ্বিধা নেই। এই দেশ অনেক প্রচণ্ড দুঃখ আর আত্মত্যাগের মূল্যে সর্বপ্রথম একটি সুস্থির, বিকাশশীল সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলেছে; আবারো সোভিয়েত জনসাধারণের প্রচণ্ড দুঃখের মূল্যে নাৎসি-ফাসিস্ট ধ্বংস থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করেছে; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক-শৈল্পিক জোটের নিউক্লীয় একাধিপত্যকে ভেঙে পৃথিবীকে সাম্রাজ্যবাদী ভীতিপ্রদর্শন থেকে বাঁচিয়েছে। শুধু এই নয়—লেনিনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রথম দিকে তাঁর দ্বারা শিক্ষিত পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, নীতি এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘাটতি সত্ত্বেও, আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রগতিমুখী করার কাজে একটি শক্তিমান উপাদান হিসাবে কাজ করেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শান্তি এবং জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষা করেছে।

মুষ্টিমেয় কিন্তু প্রচণ্ডশক্তিধর ট্রান্সন্যাশনাল করপোরেশনগুলি তাদের বিশাল অস্ত্রসম্ভার এবং নিউক্লীয় শিল্পের বলে পৃথিবীকে সব সময়ে নিউক্লীয় মহাবিনাশের পথে ঠেলে দিয়েছে। যে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক উৎপাদনের মৌলিক উপকরণগুলি সামাজিক সম্পত্তি, সেই সোভিয়েত ইউনিয়নই বর্তমান জাগতিক সমাজবিন্যাসকে উত্তীর্ণ করে একটি বিকল্প তুলে ধরেছে।

যে সমালোচনা করা হল, তার একমাত্র উদ্দেশ্য: সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বৈপ্লবিক ভূমিকাকে শক্তিশালী করার জন্য যে কঠিন প্রয়াস চলেছে, সেই প্রয়াসে সামান্য একটু সহায়তা দেওয়া।

এই প্রবন্ধের শিরোনাম ভুল ছাপা হয়েছে। শুদ্ধরূপ:
"পেরেসত্রোইকা এবং সমাজতান্ত্রিক পুনর্নবায়নের সমস্যা"

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মদেশীয় সংগীত

(১০৫২-১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ)

সংগীত মানুষের প্রাণের ভাষা। ভাবাবিষ্ট হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উপহৃতি (গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় 'উপহৃতি' শব্দ দ্বারা ইংরেজি ইমোশন শব্দের অনুবাদ বুঝিয়াছেন) প্রকাশ করিতে সংগীতই প্রকৃষ্ট অবলম্বন। সুতরাং সকল দেশেই আদিম কাল হইতে সংগীতের অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের বেদগান যেমন আর্যাবর্তের প্রথম সংগীত, মিশর, পারস্য, মেক্সিকো এমন-কী বর্তমান ইওরোপীয় সংগীতের আদি জন্ম-ভূমিতে তেমনি আদিম কাল হইতে তদনুরূপ সংগীতের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত বিধিতে সংগীতের চর্চা সকল দেশে, সকল সময়ে, সমানভাবে আরব্ধ ও আচরিত হয় নাই। সভ্যতার প্রগতি ও শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গেই সংগীতাদি কলাবিদ্যার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

অন্যান্য পুরাতন দেশের ন্যায় প্রাচীন ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসী পিউলানের মধ্যেও (পিউদেশ ব্রহ্মদেশের পুরাতন নাম। পিউগণ ব্রহ্মদেশের আদিম নিবাসী ছিল) সংগীতের সমাদর ও চর্চা ছিল। কিন্তু প্রায় ৭০০ বৎসর হইল পিউজাতি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতীয়, মঙ্গোলীয় ও শান-দিগের উপনিবেশের আর অনুপ্রবেশের ফলে পিউ-জাতির স্বজাতীয় শিল্প ও কলাবিদ্যারও এখন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। পিউদিগের রচিত গান ও সুরেরও অস্তিত্ব এখন নাই।

হারভীসাহেবের রচিত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের চতুর্দশ পৃষ্ঠায় পো-চুই-ই লিখিত চীনদেশীয় গ্রন্থ হইতে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পিউদেশের রাজপুত্র শুনান্ট-অ চীনসম্রাটের আনুগত্য গ্রহণ করিবার জন্য, রাজধানী হি-আন্-ফু নগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার পিউ অনুচর-

গণ চীনরাজসভায় সংস্কৃতভাষায় রচিত গান ও মনোমুগ্ধকর নৃত্য করে। চীনসম্রাট ওই সংগীতে ও নৃত্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাজকুমার শুনাণ্ট-অ ও তাঁহার পিতা পিউরাজকে চীনরাজ্যের এক উচ্চ-উপাধি প্রদান করেন।

ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসী বিলুপ্ত। প্রাচীন পিউদিগের মুখে সংস্কৃতভাষায় রচিত গানের উল্লেখে পিউদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে কিরূপ নিকট সম্পর্ক ছিল তৎসম্বন্ধে মনে স্বভাবতই নানাপ্রকার প্রশ্ন উত্থিত হইবে। ১০৪৪-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ অনরথ পাগানের রাজা ছিলেন। হারভী তাঁহার 'হিস্টরি অভ বার্মা'র ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: Bricks bearing his 'seal', a Sanskrit text, have been found as far apart as Pungling in Mimbu district and Yawanti, West of Rangoon। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রহেলিকাপূর্ণ প্রশ্নসমূহের বিচার বর্জন করিয়া, আমরা নির্বিঘ্নে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে খ্রীষ্টপূর্ব অন্তত তৃতীয় শতাব্দী হইতে ভারতীয় ভাষা, কৃষ্টি ও সভ্যতা প্রাচীন ব্রহ্মদেশের পিউদিগকে এত অধিক পরিমাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল যে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও তাহাদের সংগীতে সংস্কৃতভাষায় রচিত গান এমন-কী রাজগৃহে পর্যন্ত সমাদৃত হইতেছিল।

চীন ও ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত হইবে। সকলেই অবগত আছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয়গণ ব্রহ্মদেশের দক্ষিণ উপকূলে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কাম্বোজ, তক্কালা, তটোন্, প্রোম ও পিগু প্রদেশে তাঁহারা পরাক্রান্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীতাদি, কলাবিদ্যা তাঁহারাই ব্রহ্মদেশে আনয়ন করিয়া পিউদেশের সভ্যতা গঠিত ও পরিপুষ্টিত হইতে সাহায্য করিয়াছিলেন। পিউদেশে বহুদিন অবস্থানের ফলে এবং বাণিজ্যব্যপদেশে পিউদিগের সহিত এইসকল ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সংমিশ্রণবশত ভারতীয় কৃষ্টি ও ভারতীয় সংগীতপদ্ধতি দ্বারা ব্রহ্মদেশীয় সংগীতপদ্ধতিও যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বর্তমান ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে অদ্যাপি তালাইও-তান্ নামক এক মধুর রাগিণী বিদ্যমান আছে। উহা পিউদেশের ঔপনিবেশিক তালাংদিগেরই গানের সুর আর তান ব্রহ্মদেশীয় শব্দ। ইহার অর্থ শব্দ, সুর বা স্বর। সংস্কৃত তান অর্থাৎ স্বরের বিস্তার-শব্দ ব্রহ্মদেশীয়গণ গ্রহণ করিয়াছে।

ধর্মসংগীত ও ঐতিহাসিক সংগীত

পূর্বোক্ত এই তিমিরাচ্ছন্ন যুগের পর খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আমরা ব্রহ্মদেশে যে সংগীতের সন্ধান পাই, তাহা প্রধানত ব্রহ্মভাষায় রচিত ধর্মসংগীত ও ঐতিহাসিক সংগীত। ১০৪৪-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পাগানের মহারাজ অনরথের রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশীয় ভাষা সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয়। তাহার পর, তাঁহার পরবর্তী রাজন্যগণের রাজত্বকালে বহুবিধ পালিগ্রন্থ ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হইতে থাকে। এই সময় হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় রচিত বহুপ্রকার কবিতা এবং টে-মী, নে-মী জানাকা, ওয়েতান ডাইয়া প্রভৃতি বহু নাট্যগ্রন্থ ও বহুবিধ নাট্যসংগীতের পরিচয় পাই। অল্প অনুসন্ধান করিলেই ওই সময়ের রচিত অন্যান্য সংগীতে বা গীতিকবিতায় ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন ইতিহাসের তদানীন্তন রাজা ও প্রজাদিগের সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশীয় কবিগণ তখন রাজ্যের কোনো সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা বা ব্রহ্মদেশীয় রাজাদিগের কীর্তিকাহিনী বা সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরাদির নির্মাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত গল্পাদি অবলম্বন করিয়া সংগীত রচনা করিলেন। পূর্বকালে বঙ্গদেশের ভাটগণ যেমন বাঙালির কোনও প্রসিদ্ধ

ঘটনা (যথা বর্গীর হাঙ্গামা) অথবা কোনও ধনী বা সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনও অসাধারণ আচরণ অবলম্বন করিতেন। যেমন,

(ছিলেন ললিতবাবু / হলেন কাবু, /দারুণ গুপ্তির বিষে ইত্যাদি বাঙলার ভাটগান) রচনা করিয়া অর্থ উপার্জন করিতেন, ব্রহ্মদেশের সংগীতরচয়িতাগণও সেইরূপ তালাং ও ব্রহ্মদেশীয় রাজাদিগের কীর্তি-কাহিনী এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের পারিবারিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া, সংগীত রচনা করিতেন। আনেইন ও জাট গায়কদিগের কণ্ঠে এইসকল সংগীত ব্রহ্মদেশের নগরে-নগরে গীত হইত। দেশের লোকেরাও এইসকল সংগীতের আদর করিত। রাজারা এইসকল সংগীত দ্বারা স্বরাজ্যে বা পররাজ্যে নিন্দিত হইবার ভয়ে কুকার্য করিতে সাহসী হইতেন না। বাঙলার মালদহ জিলার গম্ভীরা গান তথাকার জনগণের হস্তে এইরূপ একটি অস্ত্র। ব্রহ্মের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১৪২৭-৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নব্রহ্মে মোহ্‌নীন্-তাডো নামক এক রাজা ছিলেন। জ্যোতির্বিদদিগের পরামর্শে তিনি তদানীন্তন ব্রহ্মদেশীয় পঞ্জিকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন। পুরাতনপন্থী ভিক্ষুগণ এই পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন এবং রাজাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, পঞ্জিকা পরিবর্তন করিলে ঐ পরিবর্তনের ফলে শীঘ্রই রাজার মৃত্যু সংঘটিত হইবে। রাজা মোহ্‌নীন-তাডো এই ভয়প্রদর্শনে ভীত না হইয়া উত্তর দেন—যদি মৃত্যু হয় হইবে। কিন্তু মৃত্যু-ভয়ে আমি কর্তব্যকার্য করি নাই, এই অপবাদ দেশের সংগীতে স্থান দেওয়াইতে আমি ইচ্ছা করি না। মোহ্‌নীন্-তাডো পঞ্জিকার পরিবর্তন করেন এবং উহার কয়েকমাস পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজপুত্র তিহাতু চীনসৈন্য-দিগকে পরাজিত করিয়া ব্রহ্মদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ব্রহ্মদেশে এই উপলক্ষে এক বৃহৎ জয়োৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজকুমার তিহাতু চীনঅভিযান সম্বন্ধে সংগীত রচনা করিয়া স্বয়ং এই উৎসবে ওই সংগীত গান করেন। এই গানে চীনদেশীয়দিগের ব্রহ্মদেশ আক্রমণের এক সুন্দর ঐতিহাসিক বর্ণনা আছে।

ট অউ লাদি লা দি
ইয়াইঙ্ ইয়াইঙ ল ইয়াইঙ্ ইয়াইঙ্।
মিয়া মো ইওয়াদি
ফিয়াইঙ্ ফিয়াইঙ্ ল ফিয়াইঙ্ ফিয়াইঙ্॥
ইত্যাদি

(এই গানের প্রতি ছত্রের শেষের শব্দের সহিত একান্তরিত অন্য ছত্রের শেষের যে মিল আছে তাহা লক্ষ করিবেন।)

আরাকানের রাজা হয়ক্রর রাজত্বকালে (১৪৫৫-১৪৬৯ খ্রী) আডু-মিন্ উ নিও এইরূপ ঐতিহাসিক সংগীত রচনায় আরাকানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'ইয়াখাইঙ-মিনতাম্বি-এ জীন্' নামক সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সংগীত অদ্যাপি ব্রহ্মদেশবাসীর মনোরঞ্জন করিতেছে।

নওয়া ডেজী (১৫৫০-১৫৯৯ খ্রীঃ) নামক এক নির্বাসিত রাজকর্মচারী তাউঙ্-ডাট্ বিদ্রোহের বর্ণনা করিয়া অতিসুন্দর এক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ওই সংগীতে রাজসৈন্যের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায় যে সুর সংযোজিত হইয়াছিল, তাহা খুবই উদ্দীপনাপূর্ণ। নওয়া ডেজীর রচিত 'আউড়িয়া মিন্-তাম্বি-এজীন্' নামক গানও বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। ঐ সংগীতে শ্যামকুমারীর বিলাপসংগীতগুলি অত্যন্তই শ্রুতিমধুর ও করুণরসপূর্ণ।

সুপ্রসিদ্ধ মিয়াওডী মিন্‌জী উছা ব্রহ্মদেশের সংগীতবিশারদগণের মধ্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন। মিন্ গৌন্ মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে উছা 'কৌন বৌন পড়মী' নামক প্রসিদ্ধ সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ঐ গানে উছার অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া ব্রহ্মসম্রাট তাঁহাকে মিয়াওডী-মিন্‌জী উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার রচিত "ঠুমাচ্ছানা তচ্ছিন" (উপাসনাসংগীত), "বউঙ ছাউঙ" শীর্ষক রাজকীয় নৌযাত্রার গান (কাউঙ লা জ্যো), "জয়া মিও"

শীর্ষক রাজকীয় নৌ-চালনার গান (কাউঙ-দিন-জ্যো) এবং 'ছেইন লে-লে পিয়া' শীর্ষক রাজতরী তীরসংলগ্ন করিবার গান (কাউঙ্ ছাই জ্যো) স্বরমাধুর্যে ও বর্ণনাগৌরবে ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

ব্রহ্মদেশের রাজধানী আভা নগরে মাউঙ চ্যাউক লৌন নামক এক সংগীতপারদর্শী কবি ছিলেন। তাঁহার সংগীতে আভার এক রাজরানী তাঁহার প্রতি এত আসক্ত হইয়াছিলেন যে মাউঙ চ্যাউক লৌন্ প্রাণদণ্ডের ভয়ে আভা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন। রেঙ্গুনে বাস করিবার সময়ে তিনি পা-পিঙ সুরে কয়েকটি বিরহ-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় গায়কেরা ব্রহ্মের রাজধানী আভাতে ঐসকল সংগীত গান করে। বিরহবিধুরা রানী ঐ গান শুনিবামাত্র উহা মাউঙ চ্যাউ লৌন্-এর রচিত সংগীত বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং প্রিয়বিরহে আত্মহারা হইয়া বিষপানে স্বীয় জীবনলীলা অবসান করেন।

মহারাজ বাজিড্ ফায়ার পুত্র কুমার পিন্‌জী মিন্‌তা সংগীতে এবং ঐতিহাসিক সংগীত রচনায় অত্যন্ত সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত সুরগুলি বিশেষত তাঁহার আয়ুড়িয়া সংগীতগুলি, ব্রহ্মদেশের সংগীতে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের সংগীতসমাজে তিনিও অমর হইয়া রহিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি সকল সংগীতরচয়িতার কীর্তি ও তাঁহাদের রচিত সংগীতের আলোচনা করিতে অসমর্থ। মহারাজ অনরথের রাজত্বকাল হইতে আলা উঙ্ ফায়া বংশের শেষ রাজা মহারাজ তিব'র রাজত্বকাল পর্যন্ত অনেক সংগীতরচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও গায়িকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সংগীত ও সুর ব্রহ্মদেশে যেরূপ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল, বঙ্গদেশের গায়কগায়িকাদিগের অদৃষ্টে সেরূপ সুখ্যাতি ও সৌভাগ্য লাভ হয় নাই।

ব্রহ্মদেশীয়গণের সংগীতপ্রিয়তা

ব্রহ্মবাসিগণ অত্যন্তই সংগীতপ্রিয়। তাহাদিগের প্রত্যেক উৎসবে গানবাদ্যের প্রচুর বন্দোবস্ত থাকে। তাহাদিগের শোভাযাত্রায়, পর্বানুষ্ঠানে, পুত্রকন্যার জন্ম-কর্ণবেধন ও বিবাহ উপলক্ষে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনায়, ধান্যরোপণে, নৌচালনায়, এমনকী ভিক্ষুকের ভিক্ষায় পর্যন্ত তানলয়যুক্ত গানবাদ্যের ব্যবস্থা হয়। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্ত্যভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ সপ্তশত বৎসরে ব্রহ্মদেশীয়গণ নানাপ্রকার রাষ্ট্রবিপ্লবে যথেষ্ট অশান্তি ও দুঃখভোগ করিয়াছে; কিন্তু তথাপি এই অরাজকতা ও অশান্তির মধ্যেও তাহাদিগের সংগীপ্রিয়তা ও সংগীতবিদ্যার চর্চা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন সাইম্‌স্ ইংরেজের দূত হইয়া ব্রহ্মদেশে আগমন করিয়াছিলেন। ও সময়ে রেঙ্গুনে ও অমরাপুরা নগরে তিনি ব্রহ্মদেশীয় নাট্যগীতি ও আনেইন সংগীত শুনিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন:

The Burmans are extremely fond both of poetry and music. They have epics as well as religious poems of high celibrity and they are fond of reciting heroic numbers of exploits of their Kings and Generals.

Music is a science held in high estimation throughout the Burman Empire, and is cultivated at the present day more generally than in India. The Royal Library of Amarapure is said to contain many valuable treatises on the art. Some of the musicians display considerable skill and execution and the softer airs are pleasing even to the ears unaccustomed to such melody.

মেমিও শহরের খিন্ খিন্‌জী বলেন: সাইম্‌স্ সাহেবের এই উক্তি অনেক পরিমাণ সত্য। ভারতীয় বা ইওরোপীয় সংগীতের সুর তদ্দেশীয় লোকের নিকট

যতই উৎকৃষ্ট বা শ্রুতিমধুর হউক না কেন, ব্রহ্মদেশীয় সংগীত ব্রহ্মদেশের অধিবাসিগণের প্রকৃতি, সংস্কার ও মনোবৃত্তির পক্ষে যত উপযোগী, বিদেশীয় সংগীত কখনই সেরূপ উপযোগী হইবার স্পর্ধা করিতে পারে না।

ব্রহ্মদেশের গানবাদ্যে যেমন সংগীতকলাকুশল ব্যক্তির অভাব ছিল না, শ্রোতাদিগের মধ্যেও তেমনি সমঝদার লোকেরও অভাব ছিল না, এখনও নাই। গান ও বাদ্যে ব্রহ্মদেশীয়রা সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে। রঙ্গমঞ্চে বিলাপসংগীত শুনিয়া স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অশ্রুপাত করে। আবার আনন্দসংগীতের সুরস্পন্দনেও তাহারা অসামান্যভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। ইহাদের জাতীয়সংগীত বা national anthem, রণসংগীত ও দেশপ্রেমসূচক সংগীতগুলি গম্ভীর ও উত্তেজক। ঘুষি ও কুস্তিখেলায় উত্তরব্রহ্মে কখনো-কখনো রণবাদ্য বাদিত হয়। ওই বাদ্য শুনিয়া খেলোয়াড়েরা তাল ঠুকিয়া বেপরোয়াভাবে যুদ্ধপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের মুখ, চক্ষু ও শরীরের মাংস-পেশীগুলি পর্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠে।

ব্রহ্মদেশের প্রেমসংগীত ও বিরহসংগীতগুলি অত্যন্তই মধুর এবং হৃদয়স্পর্শী। এইসকল গান অতি কোমল ও সুললিত ভাষায় রচিত হয় এবং সুকরুণ সুরের সহিত ওইসকল সংগীতের রচনাভঙ্গির অতিস্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। ব্রহ্মদেশীয় নাট্যমঞ্চে এইসকল গানের যথেষ্ট আদর আছে এবং গায়ক ও গায়িকারা সুকণ্ঠ হইলে শ্রোতারা বিমুগ্ধ-হৃদয়ে ও বিনিদ্রনয়নে সমস্ত রাত্রি পোয়ে-প্রাঙ্গণে বসিয়া থাকে—বিরক্তি বোধ করে না।

ব্রহ্মদেশীয় ধর্মসংগীতগুলিও ওইরূপ চিত্তাকর্ষক। সুগায়কের কণ্ঠে পালিশব্দমিশ্রিত এইসকল ধর্মসংগীত শুনিয়া শ্রোতাগণ মুহুর্মুহু অশ্রুপাত করিয়া থাকে। মিয়াওডী মিন্‌জী রচিত "ঠুমাচ্ছা না তচ্ছিন্" ইহার এক দৃষ্টান্ত।

এতদ্দেশীয় ঙ্গে জ্যিন বা বিলাপসংগীতগুলি বিদেশীদিগের নিকট প্রথমত অতিদীর্ঘ ও অসম্পৃক্ত মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়দিগের নিকট এইসকল বিলাপসংগীতই সর্বাপেক্ষা প্রিয় সংগীত। রোদনের ভঙ্গি ও ক্রন্দনকালে ব্যবহৃত শোকপ্রকাশের শব্দাদি (আ মা লে বা মান্দ্রাজী ইয়ো ইয়ো প্রভৃতি শব্দ) সকল দেশেই বিভিন্ন। বিদেশীয়গণ ব্রহ্মদেশীয় বিলাপ-সংগীতের আম্মালে বা হিক্কাযুক্ত রোদনধ্বনি শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। পূর্বে বঙ্গদেশীয় যাত্রায় রোরুদ্যমানা অভিনেত্রীগণের রোদনভঙ্গিকে সভ্যতাগর্বিত ইওরোপীয়গণ যেমন উপহাস করিতেন, ব্রহ্মনাট্যমন্দিরের রোরুদ্যমানা গায়িকার রোদনেও তাঁহারা তদ্রূপই উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু এবিষয়ে বিদেশীগণের উপহাস ও কর্কশ সমালোচনা ব্রহ্মদেশীয় অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ সম্পূর্ণই উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের জাতি, শ্রেণী ও রূপ

রাগরাগিণী বিচার না করিয়া বাঙলার গানগুলিকে যেমন ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, কীর্তন, বাউলিয়া প্রভৃতি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, ব্রহ্মদেশীয় সংগীত-গুলিকেও সেইরূপ মোটামুটি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম—জাট্ বা আট্টসংগীত

দ্বিতীয়—আনেইন সংগীত

তৃতীয়—ইয়েন সংগীত

চতুর্থ—যুদ্ধসংগীত, শোভাযাত্রা-সংগীত, নৌ-সংগীত প্রভৃতি বিশুদ্ধ দেশী সুরে গীত খাঁটি দেশী সংগীত। ঘুমপাড়ানি গানগুলিকেও এই শ্রেণীর সংগীতের সহিত রাখা যায়।

প্রথমোক্ত নাট্যসংগীতের ছন্দ, ভঙ্গি, ভাষা ও স্বরূপ অন্যান্য সংগীত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। নাট্যক্রীড়া সুসম্পন্ন করিবার জন্য এবং অভিনেতাদিগের মনোভাব প্রকট করিবার জন্য এইসকল গানে চরিত্রোপযোগী

সুর ও গতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নাট্যবস্তু ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য জাট্‌সংগীতে পা পিয়া তান্, আয়ুড়িয়া-তান্, ডেইন্-তান্ বা তালাইঙ-তান্ প্রভৃতি বিশিষ্ট-বিশিষ্ট প্রকৃতির সুর সংযোগ না করিলে সে-গান চিত্তাকর্ষক হয় না। এক সংগীতের সহিত অন্য সংগীতের ভাবসম্বন্ধও অবিচ্ছিন্ন রাখিতে হয়।

কিন্তু দ্বিতীয়াখ্য আনেইন্ সংগীতে এরূপ সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রয়োজন হয় না। আনেইন গানগুলিকে আমাদের দেশের বৈঠকি গানের ন্যায় পারিপার্শ্বিক-ঘটনা-নিরপেক্ষ সম্পর্কবিহীন সংগীত। জাটসংগীতগুলিকে আদি, বীর, করুণ ও হাস্যরস সমাপ্লুত করিবার তদুপযোগী সুর ও ভাষা নির্বাচন করিতে হয়; কিন্তু আনেইন্ পোয়েতে বীর ও করুণ-রসের সংগীত গাওয়া অশোভন। অনাবিল আনন্দ-জনক হাস্যরস ও চিত্তপ্রসন্নকারক শান্ত রসই আনেইন সংগীতের মূল ও স্থায়ী ভাব। বর্তমানের আনেইন সংগীতে স্বদেশী সংগীত বা "শোয়েপ্যীজী" সংগীতগুলিও আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধজয়জনিত আনন্দ-সংগীত, সামাজিক আচার-ব্যবহারের সমালোচনাযুক্ত শ্লেষাত্মক পদ্য, হাসরস-পরিপূর্ণ গ্রাম্য সংগীত এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রশংসা ও কীর্তি-কাহিনীপূর্ণ বিবৃতিই আনেইন সংগীতের প্রধান উপাদান ছিল। শোকসংগীত আনেইন পোয়েতে কখনও গাওয়া হয় না।

পুতুলনাচের সংগীত জাট সংগীতেরই অনুরূপ। উপযুক্ত রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও সাজসরঞ্জামের অভাবে যে নাটকীয় দৃশ্য পূর্বে জাট পোয়েতে দেখানো যাইত না, পুতুলনাচে পুতুলের সাহায্যে তাহা প্রদর্শন করা যাইত বলিয়াই পূর্বে পুতুলনাচের আদর ছিল। দৈত্য, বিলু, নাগ, ড্রাগন প্রভৃতির অদ্ভুত মূর্তি রঙ্গমঞ্চে আনিয়া, দর্শকগণের মনে ভীতি, অদ্ভুত ও বীভৎস রসের সঞ্চার করিবার জন্য, পুতুলনাচের গানগুলি উপযুক্ত ভাষায় রচিত হয় ও তদুপযোগী সুরে প্রদত্ত হয়। এখন আর পুতুলনাচের আদর নাই; সুতরাং ঐ পুতুলনাচের সংগীতগুলিও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

তৃতীয় ইয়েন সংগীত। ইয়েন পোয়েতে এইসকল সংগীত গীত হয় বলিয়া, ইহাকে ইয়েন সংগীত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশের জাট ও আনেইন সংগীতগুলি সাধারণত গায়ক-গায়িকারা একা-একাই গাহিয়া থাকে; কিন্তু ইয়েন সংগীত সেরূপ নহে। বারো জন, ষোল জন বা আঠারো জন গায়ক-গায়িকা এক হইয়া সমস্বরে এইসকল গান গাহিয়া থাকে। এই গানের সুর ও ছন্দ জাট্ আনেইন সংগীতের সুর ও ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও প্লুতস্বর সমন্বিত, বীর ও গম্ভীর অথবা দ্রুত ও স্বাভাবিক গতিসম্পন্ন, ঐক্য-তানবিশিষ্ট এই গায়কসংঘের গান, সুসংযত অঙ্গ-সঞ্চালনসমন্বিত নৃত্যের সহিত, অত্যন্তই মনোরম হইয়া থাকে।

কোন বিশিষ্ট বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অভ্যর্থনায় এইসকল সংগীত সাধারণত গাওয়া হয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাহাদিগের বাৎসরিক উৎসবেও এখন ইয়েন সংগীত গাহিয়া থাকে। সমরূপ, সমবয়স্ক, সমপরিচ্ছদ ও সমনৃত্যসম্পন্ন তরুণতরুণীদিগের সম-তানবিশিষ্ট ইয়েন সংগীত এখন ব্রহ্মদেশের সর্বত্রই দর্শক ও শ্রোতাদিগের হৃদয়গ্রাহী হইতেছে।

চতুর্থ শ্রেণীর সংগীতের মধ্যে মৌসংগীত, গ্রাম্য সংগীত ও জয়োৎসব সংগীতগুলিই চিত্তাকর্ষক।

নৌসংগীতের মধ্যে বঙ্গদেশের ভাটিয়ালি গানের অনুরূপ দেশীয় সুর ও দেশীয় ছন্দবিশিষ্ট গানগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে বিস্তৃত নদীবক্ষে চন্দ্রকিরণ-লাঞ্ছিত ঊর্মিমালার লীলায়িত নৃত্যরসে ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের হ্লেতান্ বা নৌসংগীতের জন্ম হইয়াছিল, তাহার অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে এবং প্রত্যেক চরণভঙ্গিতে সেই জ্যোৎস্নামণ্ডিত ঊর্মিচঞ্চল গতি ও সৌন্দর্য মূর্ত হইয়া হ্লেতান-সংগীতের বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে (হ্লে=নৌকা; তান=সুর সংগীত, হ্লেতান=নৌসংগীত বা

নৌবাহিনী)। নাবিক জীবনের শতসহস্র দিবাস্বপ্নে রণযানবিক্ষুব্ধ ইরাবতীর শতসহস্র যুদ্ধচিত্রে, এবং সিংহাসনচ্যুত হতভাগ্য রাজাদিগের উষ্ণশ্বাসের সাহচর্যে যে হ্লেতান বর্ধিত হইয়াছিল সেই স্বপ্ন, চিত্র ও সন্তাপই ব্রহ্মদেশীয় নৌসংগীতের বৈশিষ্ট্য।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন সাইম্‌স্‌ অমরাপুরায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তথাকার হ্লেতান সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :

The people in our neighbourhood were farmers and gardeners who cultivate pulses, greens, onions, and such vegetables as Burmese use. These articles they transport at an early hour across the lake to the city, and bring home the products at night. The business is performed mostly by females. One man—commonly a person in years—accompanies each boat. He acts as steerman while the women, usually from 10 to 14 in number, sitting with their legs across, row short oars. When they set out in the morning, they proceed in silence, but returning at night they join in chorus and time the stroke of their oars to the bars of their song. We were serenaded every evening from dusk till 10 o'clock by successive parties of these joyous females whose strains, though unpolished, were always melodious and pleasing.

সাইম্‌স্‌ যাহা শুনিয়াছিল তাহা অশিক্ষিত গ্রাম্য নৌসংগীত। সুশিক্ষিত গায়কগায়িকাদিগের কণ্ঠে এই সকল হ্লেতান মনোমুগ্ধকর।

জাতি

ব্রহ্মদেশীয় বর্মিগণ বিমিশ্র ইন্দোনেশীয় জাতি। সুতরাং তাহাদের গানের সুরগুলিও মিশ্রসুর। তালাং, কাম্বোডিয়া, আয়ুড়িয়া (শ্যাম), [১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বিয়ানাউঙ অযোধ্যা (শ্যামদেশ) জয় করিয়া শ্যামদেশীয় অভিনেতা অভিনেত্রী ও গায়কদিগকে বন্দী করিয়া ব্রহ্মদেশে লইয়া আসেন। তাঁহারাই এদেশে ইয়োড়ীয়া বা আয়ুড়িয়া সুরের প্রবর্তন করেন —(হার্‌ভীর ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পৃ ১৬৮] পিৎজী (চীন) ও ব্রহ্মদেশীয় নানাপ্রকার সুরের সংমিশ্রণে তাহাদিগের গানের সুর তৈয়ারি হইয়াছে। কোন কোন সংগীত এখনো অমিশ্র দেশীয় সুরে গাওয়া হয় বটে কিন্তু এরূপ বিশুদ্ধ সুরের সংখ্যা নিতান্তই কম।

রূপ

বাঙলার সারেগামা প্রভৃতি সুরসপ্তকের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও সুরসপ্তক ব্যবহৃত হয়। তাহারা সারেগামা প্রভৃতিকে হ্নিন্‌-লৌন্‌ প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। যথা :

সা=হ্নিন্‌লৌন্‌ ; ঋ=আউপিয়ান ; গা=পে-লে ; মা=ম্যিন্‌ম্যাইন ; পা=ডুল্‌কা দোয়ে ; ধা=চ্ছাউ-তোয়ে-নিও ; নি=পী-ড-পিয়ান্‌ ॥

সা (হ্নিন্‌লৌন্‌) স্বরকে বেসিক নোট (মূলস্বর) করিয়া তাহারা ঢ্যো, বোয়ে ও তচ্ছিম-গাম প্রভৃতি রাগিণীর গান করে। রে (আউ-পিয়ান) স্বরে খরজ করিয়া পাপিও, নাটতান্‌ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ রাগিণীর গান গাহিতে হয়। গা (পে-লে) স্বরে আয়ুড়িয়া তান্‌, ডেইগা তান্‌, ডইন্‌ তান্‌ প্রভৃতি সংগীত গাওয়া হয়। সান মান ম্যিনজাইন স্বরে তালাইং তান্‌, টে-ডে তান্‌, শী-ছে-বো-তান্‌ প্রভৃতি সংগীত গীত হয়। ব্রহ্মদেশীয় সংগীতগুরু বলেন, পা (ডুলকা ডোয়ে), ধা (চ্ছাউ-তোয়ে-নিও) এবং নি (পী-ড-পিয়ান) এই তিনটি স্বার গেয় রাগিণী এখন ব্রহ্মদেশে নাই। লুপ্ত বা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

বাঙলা ভাষায় রাগরাগিণী বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ব্রহ্মদেশীয় সুরগুলিকে সেরূপ রাগরাগিণীতে

বিভক্ত করা হিন্দু সংগীতশাস্ত্রের ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ হইবে। তথাপি আমি অল্প পূর্বেই এইসকল সুরকে পাপিও রাগিণী, নাটরাগ, ডেইগা রাগিণী প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মদেশীয় গানে ভারতীয় হিন্দু সংগীতের ন্যায় পুরুষ ও স্ত্রীভাবশিষ্ট কোন রাগিণী বা রাগিণীর শ্রেণী-বিভাগ নাই। আদি, বীর, করুণ প্রভৃতি রসভেদে ব্রহ্মদেশীয় গায়কেরা তাহাদিগের গানে বিভিন্ন জাতীয় সুর সংযোজন করিয়া রসপ্রকাশের সুবিধা করিয়া থাকে। 'বাদী' 'সংবাদী' ও 'বিবাদী' প্রভৃতি বিধি-নির্দিষ্ট স্বরের মিলন বা বর্জনের বিচার ইহারা করে না। স্বাভাবিক বা instinctive সুরজ্ঞানই তাহা-দিগের সুর-মনোনয়নের একমাত্র নায়ক।

মতান্তরে, ব্রহ্মদেশীয়গণ বলেন যে পূর্বোক্ত কায়া-তান্, পাপিও তান্, ডেইপা তান্ প্রভৃতি সুরের ভাব ও স্বরূপ পরস্পর হইতে এত বিভিন্ন যে শুনিবা-মাত্রই তাহাদিগের জাতিভেদ পরিষ্কাররূপে প্রকটিত হয়। ওইসকল সুরের প্রত্যেক সুরের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা গাহিবার সময়ে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়। অন্য সুরের সহিত মিশ্রিত করিলে পূর্বোক্ত সুরের বিশুদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া এক জারজ সুরের উৎপত্তি হয়। সুতরাং ওইপ্রকার বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সুরগুলিকে বাঙলাভাষায় ব্রহ্মদেশীয় রাগ ও রাগিণী বলিলে দোষ হয় না। বরং বিচার করিতে গেলে স্বীকার করিতে হইবে যে হিন্দুসংগীতশাস্ত্রে যেমন কোনো বিশিষ্ট ভাব ও রসকে সংগীতে অধিষ্ঠিত করিবার জন্য সুরের পারম্পর্য গঠিত করিবার নিয়ম ও প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, ব্রহ্মদেশীয় সংগীতেও সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কোনো-কোনো বিশিষ্ট সুরে বিশিষ্ট প্রকার স্বরপরম্পরার সংযোজন করিবার নিয়ম আছে। বিশিষ্ট-বিশিষ্ট ভাব ও রসের সৃষ্টির জন্য স্বরপরম্পরার সম্মিলন হিন্দুসংগীতশাস্ত্রে রাগ বা রাগিণী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মদেশীয় ওই সুরগুলিকে হিন্দুসংগীতশাস্ত্র অনুসারেও রাগ ও রাগিণী বলা দূষণীয় হইবে না।

তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের সুরগুলিকে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত রাগরাগিণীতে বিভাগ না করা গেলেই যে সেই সুরগুলি ত্রিভুবনের অস্পৃশ্য, এরূপ মত পোষণ করা ভারতবাসীদিগের পক্ষে অনুচিত।

ইহার উত্তরে হিন্দুসংগীতশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন— যদি হিন্দু সংগীতের সহিত ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের কোনও অঙ্গাঙ্গিত্ব বা পিতৃ-সন্তান সম্বন্ধ না থাকিত, তবে আমরা ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত সংগীত বিষয়ে কোন তুলনামূলক আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না। ঐরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এই আলোচনায় হিন্দু সংগীতশাস্ত্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে। তাহাদিগের পুরাতন শ্রেষ্ঠ সুরগুলি, ভারতীয় ধ্রুপদেরই সন্তানসন্ততি।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি প্রণিধানযোগ্য কথা আছে। শুদ্ধ কাব্যশাস্ত্রোক্ত রস ও ভাব সৃষ্টি করিবার জন্যই হিন্দুসংগীতের রাগরাগিণী সংগঠিত হয় নাই। তাহা অতিশয় তুচ্ছ বিষয়। কারণ ঐরূপ সুরসংগঠন কেবলমাত্র মানুষের চিত্তরঞ্জনের জন্যই গঠিত হয়। কিন্তু হিন্দু সংগীতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই অন্য-রূপ। সংগীতের সহযোগেই ভগবানের সহিত গায়কের চিত্তবৃত্তির পরম লয় সাধন করিয়া এক শাশ্বত ঘন-আনন্দ লাভ করাই হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সংগীতের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন যে নাদব্রহ্মের ধ্যানে হিন্দুর রাগ-রাগিণীর উদ্ভব এবং নাদব্রহ্মের সহিত চিত্তের নিবিড় লয় বা সমাধিতেই তাহার পরিণতি। ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে হিন্দু সংগীতের এই মহৎ উদ্দেশ্য হারাইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মদেশীয়গণ হিন্দু সংগীতজ্ঞদিগের মুখে সংগীতের এই দম্ভপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। তাহারা বলে, "তোমরা গত দুই হাজার বৎসর যাবৎ লোককে ঐ আধ্যাত্মিকতা ও ও মিসটিসিজম দ্বারা ঠকাইয়াছ। তোমরা নিবৃত্ত হও। তোমাদের ধাপ্পাবাজি এখন প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।'

এ কলহ এখন এই পর্যন্তই শেষ করা হইল।

বিভিন্ন সুরের মিশ্রণ সকল দেশেই স্বাভাবিক। পূর্বে আউড়িয়া বা তালাং বা কাম্বোডীয় সুর যেমন স্বচ্ছন্দে ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন ইওরোপীয় সুরগুলিও সেইরূপ ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে অবাধে এবং অতি দ্রুতবেগে প্রবেশ করিতেছে। শ্যাম, চীন ও তালাংদিগের সংগীতের সহিত ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের একটি জাতিসম্বন্ধ ছিল; সুতরাং তাহাদিগের সম্মিলনে কোনও রাক্ষসভাবাপন্ন সুরের উৎপত্তি হয় নাই। বিজাতীয়, অপরিসীম বৈষম্যযুক্ত ও বিসদৃশ প্রকৃতিবিশিষ্ট ইওরোপীয় সংগীতের সংমিশ্রণে ব্রহ্মদেশের এখন সেই রাক্ষসী সুরেরই উদ্ভব হইতেছে। ব্রহ্মদেশীয় যুবক-যুবতীরা এখনও ইওরোপীয় ইন্দ্রজালের অপূর্ব কুহকে মুগ্ধ; ঐ কুহকে ভুলিয়া যে রাক্ষসকে তাহারা এখন স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে, সেই রাক্ষস একদিন ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের আভিজাত্য ও বংশবৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি ব্রহ্মদেশীয় সুরগুলিকে নির্দিষ্ট নিয়মে গাহিতে হয়। সংগীত রচনার জন্যও বহুবিধ নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মদেশীয় সংগীতশাস্ত্রেরও পুঁথি আছে এবং তাহাতে ঐসকল নিয়ম সূক্ষ্মভাবে লিখিত আছে। এইসকল নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, বিশিষ্ট সমাজে গান গাওয়া অতি বিগর্হিত কার্য বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজপ্রাসাদে সংগীতবিদ্যাকুশল সংগীত-অমাত্য নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গায়কদিগের গানের ভাষা ও সুরের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া, অনুমতি প্রদান করিলে পর ঐ গায়ক বা গায়িকাদিগকে রাজপ্রাসাদে গান গাহিবার অধিকার দেওয়া হইত। সুতরাং বিজাতীয় সুর মিশ্রণ করিয়া ব্রহ্মদেশীয়গানের আভিজাত্য হরণ করা, ব্রহ্মদেশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে সম্ভবপর ছিল না। এখন সে রাজাও নাই, সংগীতের সে অভিভাবকও নাই। সুতরাং স্বেচ্ছাচারী গায়কেরও এখন অভাব নাই।

বঙ্গদেশের গানের সহিত ব্রহ্মদেশীয় গানের তুলনা করা কঠিন। তথাপি এ সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলিয়া ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের 'রূপ' দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমত ব্রহ্মদেশীয় গানগুলি বাঙলাদেশের গানের মতো মোনোটোনাস নহে। বাঙালির কানে অবোধ্য হিন্দুস্থানি গজলগুলির সুর যেমন একঘেয়ে লাগে, বর্মীদের কানেও বাঙলা গানগুলি সেইরকম একঘেয়ে শোনায়। প্রতি অন্তরায় একই রকম সুরের পুনঃপুন আবির্ভাবে বর্মীরা বাঙলা গান শুনিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে—নূতন বস্তু খুঁজিয়া পায় না। বর্মীদের গানগুলি সাধারণত সেরূপ নহে। তাহাদিগের গানের প্রত্যেক চরণে নূতন সুর সংযোজিত হয় এবং শেষ চরণেও নূতন সুর রাখিয়া উহার শেষের ভাগ প্রথম চরণের অন্তরভাগের সুরের সহিত মিল করাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ সুরসংযোজনের নিয়ম থাকাতে ব্রহ্মদেশীয় গ্রামগুলি বেশ সজীব ও শ্রুতিমধুর হয়, একঘেয়ে হয় না।

দ্বিতীয়ত ব্রহ্মদেশীয় গানে বঙ্গদেশীয় গানের মতো 'বাদী-সংবাদী'র পরীক্ষা ও রাগরাগিণীর বিচার না থাকাতে, সংগীতের সুর সুমধুর করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় গায়করা অন্যান্য জ্ঞাতিসম্বন্ধযুক্ত 'সুরের টুকরা' বা সুরাংশ গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত সংগীতে সংযোজিত করে। ভারতবর্ষীয় ওস্তাদরা এইসকল মিশ্রসুরকে "জংলা" পদবীতে বিশেষিত করিবেন। কিন্তু সে হিসাবে ইওরোপীয় সংগীতগুলিও 'জংলা'; তথাপি সমস্ত পৃথিবীতে তাহাদের অতুল সম্মান।

ব্রহ্মদেশের বাদ্যযন্ত্রে সাধারণত তিন সপ্তক রাখা হয়; কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় গায়কগণ নিম্নসপ্তক বা উদারাতে গান করা পছন্দ করে না। Bass বা baritone শ্রোতাদিগেরও হৃদয়গ্রাহী হয় না। বঙ্গদেশের ওস্তাদেরা যেমন গানের কোনো-কোনো অংশ 'খাদে' গাহিয়া সংগীতের মাধুর্য বৃদ্ধি করেন, ইওরোপীয়গণ যেমন মূল সংগীতের প্রসাধনের জন্য বাদ্যযন্ত্রে বা সহকারী গায়কের কণ্ঠে নিম্নসপ্তকের

grace note দিয়া সুরসঙ্গতি প্রদান করেন, ব্রহ্মদেশীয় গায়কেরা তাঁহাদিগের গানে সেরূপ সুরসঙ্গতি বা হারমনি, অর্থাৎ স্বরসমবায়ের ব্যবস্থা রাখেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের গানের আনুষঙ্গিক বাদ্যে কখনো-কখনো এই বন্দোবস্ত থাকে।

প্রায় ২৯ বৎসর পূর্বে যখন প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ ব্রহ্মদেশ দেখিতে আসেন, তখন মি. মেরিয়ানো নামক একজন সংগীতজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মদেশের সংগীত সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে 'A naturel(ধা) সাধারণতঃ বর্মীপুরুষ গায়কদিগের মৌলিক pitch note'।

এই উক্তি সর্বাংশ শুদ্ধ নহে। পুরুষেরা সাধারণত উচ্চস্বরে গান গাহিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যে রাগিণী যে ঘাট হইতে গাহিবার নিয়ম আছে, সে রাগিণী তাহারা সেই ঘাট হইতেই গান করে—নিয়ম লঙ্ঘন করে না। শ্রোতারাও উচ্চস্বরে গান গাওয়া পছন্দ করে। সুরের দৌড় যত উচ্চে উপনীত হয়, ততই শ্রোতার নিকট তাহা প্রশংসনীয় হয়। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গায়কদিগের স্বর প্রায়শই তারা গ্রামের contralto পর্যন্ত পৌঁছে। উদারাতে বা মুদারার নিম্নস্বরে গান করা ব্রহ্মদেশীয় গায়কদিকের পক্ষে সুখ্যাতিজনক নহে। সম্ভবত জনসমাকীর্ণ উন্মুক্ত স্থানে গান গাহিতে হয় বলিয়াই তাহারা এত উচ্চস্বরে গান গাহিতে অভ্যাস করে। বৈঠকি গানে বা যে স্থানে শ্রোতাগণ গোলমাল না করিয়া শান্তভাবে গান শোনে, সে স্থানে অত উচ্চ গ্রামের সংগীত নিশ্চয়ই তীব্র ও শ্রুতিকঠোর বলিয়া নিন্দিত হইবে।

ব্রহ্মদেশীয় গায়িকারা মুদারার ঋ অথবা মা স্বরকে basic note বা মূলস্বর রাখিয়া ও তদনুরূপ খরজ করিয়া গান গাহিতে অভ্যাস করে। তাহাতে তাহাদের কণ্ঠে পা-পিও প্রভৃতি রাগিণীর বিলাপসংগীত ও বিরহগানগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক হয়।

ব্রহ্মদেশীয় গানে বাঙলা বা মান্দ্রাজী গানের ন্যায় 'কম্পন' ও 'মূর্ছনা' নাই। গানের শেষ চরণে কদাচিৎ কখনো মূর্ছনা প্রয়োগ করা হয় বটে, কিন্তু বর্মি শ্রোতারা ঐরূপ মূর্ছনাকে অসঙ্গত কসরত বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা আছে যে ব্রহ্মদেশীয় গানে 'কোমল' সুরের ব্যবহার নাই। এ-ধারণা ভুল। বর্মি গানে 'গমক'ও আছে, কিন্তু কম। 'মীড়' ও 'কম্পনে'র ভাগও খুব কম। 'আশ' যথেষ্ট ব্যবহৃত হয় কিন্তু 'কর্তব' একেবারেই নাই। হিন্দুস্থানি ও বাঙলা গানের 'কর্তব' শুনিয়া বর্মিরা হাসিয়া খুন হয়।

'উপজ' কখনো-কখনো ব্যবহৃত হয়। ছোটো-খাটো 'দম' তাহারা ব্যবহার করে। 'খম' বা বিশ্রাম দেওয়ারও পদ্ধতি আছে। গান বন্ধ করিয়া ওই 'বিশ্রামের' সময়ে গায়ক ও গায়িকারা নৃত্য করিয়া থাকে।

বর্মিগানে বাঙলা বা হিন্দুস্থানি গানের মতো 'সরগম গান' নাই। 'তেলেনা', 'চতুরঙ্গ', 'ত্রিবট' প্রভৃতি ওস্তাদি গান ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে মোটেই নাই। বর্মিরা ইহা পছন্দ করে না। যতদূর আমার অভিজ্ঞতা আছে, ভারতীয় গায়ক ভিন্ন অন্য কোনও দেশের গায়করা এইরূপ 'সরগম গান' বা 'তেলেনা' প্রভৃতি অর্থহীন-শব্দমণ্ডিত গান গায় না। অথচ তেলেনা প্রভৃতি গানের পদ, সুর ও বাদ্যের বোলের সহিত সমধ্বনিযুক্ত থাকাতে শুনিতে বেশ মধুর হয়।

ব্রহ্মের শেষ রাজা মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে মান্দালয়ের গবেষকগণ—১৮৮৫

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরেজের শাসনাধীনে আসে। স্বাধীন ব্রহ্মের অধিপতি মহারাজ তিব'কে ধৃত করিয়া রত্নগিরিতে প্রেরণ করা হয়। এই সময় হইতেই ইওরোপীয় কৃষ্টি ব্রহ্মদেশের সংগীতে অবাধে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দকে আমরা ব্রহ্মদেশীয় সংগীতের ইতিহাসের একটি সীমা-

রেখা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে স্বাধীন ব্রহ্মের রাজধানী ছিল মান্দালয় নগরে। শত্রুপরিবেষ্টিত ঐ ক্ষুদ্ররাজ্যের রাজা, মহারাজ তিব' তখন অল্পবয়স্ক যুবক। বৈদেশিকগণের কূটরাজনীতিজালে জড়িত হইয়া ব্রহ্মরাজসরকারের মহামন্ত্রিগণ তখন কর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতেছিলেন। নানাপ্রকার রাজনৈতিক দুর্ঘটনায় ব্রহ্মদেশীয় সভ্যতার কেন্দ্রস্থান মান্দালয় ও উচ্চ ব্রহ্মদেশ তখন অত্যন্তই অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজ্যের এই দুঃসময়ে কোনো উচ্চ সাহিত্যিক, কবি বা প্রতিভাবান সংগীত-রচয়িতা উচ্চব্রহ্মদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তথাপি সেই অরাজক ও অশান্তিপূর্ণ সময়েও মান্দালয় নগরে সুগায়কের অভাব ছিল না। চ্যাউছে ও মিটিলার শ্যামল শস্যক্ষেত্রের নীরব প্রান্তর, ইরাবতীর বিস্তৃত জলধারার প্রান্তদেশ, ও ব্রহ্মরাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ হইতে সংগীতনিপুণ গায়কগায়িকা যশাকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয় নগরে আগমন করিতেছিল। এইসকল গায়ক ও গায়িকাদিগের বিচিত্র জীবনচরিতে অতিশয় কৌতূহলজনক গল্প আছে। তাহাদিগের এক অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

সর্বাগ্রে মাণ্ডানে-প্রদীপ, ঈন্-ড' মালের নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি মহারাজ মিন্‌ডনের রাজত্বকালে মান্দালয়ের রাজপ্রাসাদে গান গাহিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। দৈহিক সৌষ্ঠব, বর্ণগৌরব ও সংগীতকুশলতায় তিনি তদানীন্তন নাট্যসমাজে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে 'মাণ্ডানে-দীপ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৩২ বৎসর। যুবতীসুলভ অঙ্গ-সঞ্চালনক্ষমতা ও নমনীয়-দেহ-সাপেক্ষ নৃত্যশক্তি তখন তাঁহার ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় সংগীতে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তখন পরিপক্ক হইয়াছিল। যদিও অন্যান্য যুবতী গায়িকাগণ তখন লোকসমাজে যথেষ্টই আদৃত হইতেছিলেন, তথাপি মাণ্ডানে-দীপ ঈন্ ড' মালের সুখ্যাতি মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে সম্পূর্ণই অক্ষুণ্ণ ছিল।

অতঃপর সিন্-খো-মালের নাম উল্লেখযোগ্য। দৈহিক সৌন্দর্যে সিন্-খো-মালের ন্যায় গায়িকা সম্ভবত ব্রহ্মদেশের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন নাই। তাঁহার রূপে যে দাহিকাশক্তি ছিল, তাহাতে কত যে ধনী ও উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি বিদগ্ধ বা বিমোহিত হইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

চ্যাউছে নগরে এক পর্বোৎসবে সিন্-খো-মালের গান হয়। শান্ রাজ্যের এক সামন্ত, মালের রূপে বিমুগ্ধ হইয়া মালেকে রঙ্গমঞ্চ হইতে বলপূর্বক অপহরণ করে এবং তাহাকে হস্তিপৃষ্ঠে উঠাইয়া শানরাজ্য-অভিমুখে যাত্রা করে। চ্যাউছের শাসনকর্তা এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে শান্-সামন্তের পশ্চাদনুসরণ করেন এবং মালেকে উদ্ধার করিয়া চ্যাউছে নগরে লইয়া আসেন। এই সময় হইতে এই মালে সিন্-খো-মালে অর্থাৎ হস্তিকর্তৃক অপহৃতা মালে নামে আখ্যাত হন।

সিন্-খো-মালের সংগীত উচ্চব্রহ্মদেশে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পুরাতন ক্লাসিক সংগীতেই সিন্-খো-মালের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল।

এতদ্ভিন্ন কো গৌন্ মালে, মা-ঠোয়ে-মালে, মা-মাচ্ছো প্রভৃতি সমসাময়িক গায়িকাগণের নামও উচ্চ-ব্রহ্মে অমর হইয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ মান্দালয়বাসীদিগের মুখে ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সুখ্যাতি শুনা যায়।

গায়কদিগের মধ্যে মাউঙ-তা-বিয় ও ছয়া টু তদানীন্তন সংগীতবিদ্যাবিশারদগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মং-তা-বিয় অসাধারণ সংগীত-কলাবিৎ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত গান ও অভিনয়পটুতা ব্রহ্মদেশের গৃহে-গৃহে প্রশংসিত হইত। মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে ইনি জীবিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার রচিত গান ও অভিনয়পদ্ধতি তাঁহার

শিষ্যগণ সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন।

রাজপ্রাসাদে উ-কোনিয়া ও উ-কের রচিত গানের অত্যন্ত আদর ছিল। সুর ও শব্দগৌরবে ইঁহাদিগের রচিত সংগীত এখনও অতুল সুখ্যাতি-সহকারে ব্রহ্মের রঙ্গমঞ্চে আদৃত হইতেছে।

এ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়ের বিবৃতি নির্ভুল বা নির্দোষ হইয়াছে এরূপ দম্ভ করিবার সাহস আমার নাই। সহৃদয় পাঠকগণ ইহার ভ্রমপ্রমাদ মার্জনা করিয়া গ্রহণ করিলে অনুগৃহীত হইব।

* * *

ব্রহ্মদেশীয় গানের বিভিন্ন-বিভিন্ন সুর নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত সুরগুলি প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ এবং পরস্পর হইতে এত বিভিন্ন যে একের সহিত অন্যের পার্থক্য সহজেই ধরিতে পারা যায়। ব্রহ্মদেশীয় গানের আরো একটি বিশেষত্ব আছে। যে সুরে গাহিতে হয় তাহার গঠন ও ছন্দপ্রণালীও ঐ সুর অনুসারে বিভিন্ন থাকে। কবিতার ছন্দ দেখিয়াই পরিপক্ক গায়কেরা বুঝিতে পারে যে ঐ কবিতা কোন্ সুরে গাহিতে হইবে:

১. চ্যো, ২. চ্যাবয়, ৩. কা-ছিন্, ৪. আইন্-ছিল্, ৫. তিচ্ছিন্-খান্, (উচ্চারণ তহিন্-পান) ৬. তা-ছিন্, ৭. এঃ (নাটতাল ও ১২ রকমের রাতি-এঃ), ৮. নাট ইয়াইঙ্ (নাটতাল), ৯. ইয়া-কান্, ১০. পা-পিয়ো, ১১. টেঃ বোয়ে, ১২. ইয়ো-ডাইয়া (শ্যাম-দেশীয়), ১৩. টলাইঙ্-তান, ১৪. করিন অ-তান, ১৫. তেইপা-তান, ১৬. তা-কিয়ান, ১৭. টেঙঠাডো, ১৮. ছাউঙ-দ্বিন, ১৯. পৌংজি-তান, ২০. ছী-ড-তান, (জয়ঢাকের বাদ্য সহিত গান) ২১. হ্লে-ড' তান, ২২. লৌন-ছ্যিন, ২৩. ঠোন-জ্যিন, ২৪. লেঃ জ্যো জীঃ, ২৫. হ্মা-টান, ২৬. বেইবঅঃ হ্লোয়েজিন, ২৭. হান্ ছ্যিন্, ২৮. সি-হে-পো, ২৯. কাউঙটৌন তান, ৩০. তৌন্-ঠা-তান্, ৩১. ণ-বে-তান্, ৩২. তান্ ছান্, ৩৩. ঙ্গো ছ্যিন্, ৩৪. বো লেঃ, ৩৫. তকিয়ান বো-লেঃ, ৩৬. তান্ জ্যো লেঃ জ্যোঃ, ৩৭. লাই-তান্, ৩৮. ঢ-ওয়ৈ-ডেইন তান্, (সাধারণত ডেইন্-তান্ বলা হয়) ৩৯. কালা তান্, ৪০. ট অউ-পীজি তান্, ৪১. ইয়োডিয়া নান্ তেইন্, ৪২. খইয়া তান্ (যিওন্), ৪৩. শোয়ে এঃ তান্।

দুটি ঘুমপাড়ানি গান

(১)

খো কান্ লো পেঃ
খো ফিউ খো পিয়া নের্ব্কা
কান্ খে হ্লাতেঃ।
পায়রা ধরে দে
শ্বেত পায়রা আর নীল পায়রা ওই (ওড়ে)
তাদের ধরা বড়োই কঠিন হে॥
পায়রা ধরে দে।

(২)

লুগলে ইয়ে এই বা ছো
ঢ্যাউং ও পে হেঃ
কাই হ্লে বা লেঃ
শোয়ে হ্মাই কিউ
পিনিয়া সী রে
মোয়ে ও খাল দি হ্মা সীরে
কাই হ্লে, বা লেঃ
ঢাউংজি ইয়ে মি টান্ টো
আছি-পো দ্বাঃ বা লো
আতাঃ গো হ্লি ও
কাই হ্লে বা গো

ঘুমাও জাদুমণি
বুড়ো বিড়াল ঝিমোচ্ছে বসে
কামড়াও এসে খোকাকে।
ওহে পণ্ডিত চটক পাখি
আছে ছোটো কুকুরটি
কামড়াও এসে খোকাকে।
লেজ-ছোটো ওই মস্ত বিড়াল
চর্বি গিলছে মাংসের
কামড়াও এসে খোকাকে।

রচনাকাল : ২৬ নভেমবর ১৯৩৬

আবুল কালাম আজাদ : মনন ও ধর্ম

পুলকনারায়ণ ধর

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একশ বছর পূর্ণ হল ১৯৮৮ সালের ১১ই নভেমবর। তাঁর জন্মশতবর্ষ তাঁকে নতুন করে জানবার আর ভাববার সুযোগ আমাদের কাছে উপস্থিত করল। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রথম শ্রেণীর কাণ্ডারী এবং বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহরুর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে বড়ো একজন পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা ভারতীয়রা মৌলানা আজাদকে তেমন যত্ন করে স্মরণ করি না। তাঁর রচিত "ইনডিয়া উইনস ফ্রীডম"-এর অপ্রকাশিত তিরিশটি পৃষ্ঠার রহস্যের জন্য কিঞ্চিৎ আলোড়ন উঠেছে। সেই আলোড়নের ঢেউ তাঁকে আমাদের কাছে আবার নতুন করে নিয়ে এসেছে।

একথা বলার কারণ, তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পরও তাঁর কোনো প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ কোনো ভারতীয় পণ্ডিত বা ঐতিহাসিক রচনা করেন নি। রাষ্ট্র বা কোনো প্রতিষ্ঠানও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন নি। এ শুধু আমাদের লজ্জা নয়, এ আমাদের ঋণস্বীকারের দীনতাও বটে।

উর্দু আর আর ব ভাষায় রচিত তাঁর বিপুল সাহিত্য-সম্ভার যদি ভাষান্তরিত হয়ে আমাদের কাছে পৌছত, তবে আমরা আবিষ্কার করতাম অন্য এক মৌলানা আজাদকে, যিনি শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়—সাহিত্য, কাব্য, দর্শন এবং জীবনের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে তাঁর কীর্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন; তাঁর বোধের গভীরতা আর চিন্তার ব্যাপ্তি আমাদের চমকিত করত। ভারতীয় রাজনীতির অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ককে তাঁর প্রতিভা এবং দেশপ্রেমের আলোয় ম্লান বলেই মনে হবে। হয়তো এই কারণেই মৌলানা আজাদকে দুঃখজনক নীরবতার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে।

বিদেশী পণ্ডিত আয়ান হেনডারসন ডগলাস আবুল কালাম আজাদের জীবনীগ্রন্থটি উপহার দিয়ে আমাদের বিরাট অভাব দূর করেছেন। প্রায় পঁচিশ বছর ভারত আর পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-ভাবে বাস করেছেন ডগলাস। সমকালীন ইসলাম আর তার সমস্যাকে তিনি বোঝবার চেষ্টা করেছেন এই উপমহাদেশের রাজনীতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে। আবুল কালাম আজাদের জীবনের আর চিন্তার নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং অগ্রগতির তরঙ্গের মধ্যে তিনি আধুনিক ভারতীয় ঐসলামিক সমস্যাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন।

ডগলাসের গ্রন্থটি একটি উচ্চতর গবেষণার ফল। ১৯৬৯ সালে লেখক "দ্য লাইফ অ্যানড রিলিজিয়স থট অব আবুল কালাম আজাদ" নামে অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণাপত্র জমা দেন। ১৯৭৫ সালে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর গেইল মিনঅলট এবং খ্রীস্টিয়ান ট্রল-এর সুদক্ষ, সুচারু সম্পাদনায় গবেষণাপত্রটি "আবুল কালাম আজাদ—অ্যান ইনটেলেকচুয়াল অ্যানড রিলিজিয়স বায়োগ্রাফি" নামে গ্রন্থাকারে রূপান্তরিত হয়ে ১৯৮৮ সালে আমাদের হাতে পৌছয়।

ভারতীয় ধর্মীয় সমস্যার বিশ্লেষণে ট্রল (Troll) একজন নামজাদা পণ্ডিত। তেমনি ভারতীয় রাজনীতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে "খিলাফৎ আন্দোলন" খ্যাত মিন্‌অলট একজন পরিচিত ঐতিহাসিক। ডগলাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর গ্রন্থ সম্পাদনার বিরাট দায়িত্ব এই দুজন বিশেষজ্ঞ পালন করতে গিয়ে প্রথম গবেষণাপত্রটির ভূমিকা সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখেছেন। ভারতীয় মুসলমান আর আধুনিক ইসলাম সম্পর্কে যে-সমস্ত গ্রন্থ অধুনা প্রকাশিত হয়েছে এবং যা ডগলাস দেখে যাবার সুযোগ পান নি, মিন্‌অলট আর ট্রল সেই-সমস্ত গ্রন্থ আর দলিল বিশ্লেষণ করে ডগলাসের গ্রন্থটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

ভূমিকা এবং সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত ছাড়াও গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে ডগলাস আজাদের জীবনের ১৮৮৮ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত প্রস্তুতিপর্ব হিসাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই

Abul Kalam Azad: An Intellectual and Religious Biography—Ian Henderson Douglas. Ed. Gail Minault, Christian W. Troll. Oxford University Press, 1988. Rs. 190.

পর্বে আজাদের বংশ এবং পারিবারিক পরিমণ্ডলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আজাদের মানসিক গঠনের নির্মাণপ্রক্রিয়া এতে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১৯১০-১৯২২) আজাদের রাজনীতিক রূপান্তরের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কোরান এবং ইসলামের ব্যাখ্যাপর্ব। এই অধ্যায়ে আজাদের বিশ্বাসের পুনর্জন্ম এবং রাজনীতিক পরিসমাপ্তিপর্ব আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে লেখক আজাদের সমগ্র জীবনের সংগ্রাম এবং তাৎপর্য অন্বেষণ করার এবং 'মানুষ' আজাদকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন।

১৮৮৮ সালের নভেমবরে মক্কায় এক গোঁড়া মুসলিম পরিবারে জন্ম হয় মহিউদ্দিন আহমেদ-এর। পিতা খৈরুদ্দিন দিহলাই পুত্রকে সুফী পীরের সাবেকি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের এবং ইংরেজি শিক্ষার সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করে তিনি প্রায় গৃহবন্দী পুত্রকে গোঁড়া ঐসলামিক শিক্ষায় গড়ে তুলেছিলেন। পিতা-পুত্রের সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ঐসলামিক আদর্শে। পরিবারের একনায়কতান্ত্রিক নেতা হিসাবে ও পীর হিসেবে খৈরুদ্দিনকে তাঁর পুত্রকন্যারা সম্বোধন করতেন 'হজরত' (ইয়োর অনর) বলে। মাত্র ১১ বছর বয়সে মাতৃহারা মহিউদ্দিন তাঁর পিতার কঠিন শাসনের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তিনি লিখছেন, 'My late father's awesomeness overshadowed his affection. We were mentally so overawed that his very voice made us tremble.' মাতৃহীন পরিবারে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়াল গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। একদিকে কঠোর ঐসলামিক শিক্ষা এবং আরেকদিকে পিতৃতান্ত্রিক নিয়মের হৃদয়হীন শৃঙ্খলা পুত্র মহিউদ্দিনকে ভেতরে-ভেতরে করে তুলল অস্থির, বিদ্রোহী।

যে-সমস্ত পুস্তক আর বিষয় খৈরুদ্দিন মনে করতেন ইসলামবিরোধী, তার প্রতি পুত্রের ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। গভীর রাত্রে বন্ধ ঘরে লুকিয়ে-লুকিয়ে মহিউদ্দিন সে-সমস্ত 'নিষিদ্ধ' পুস্তক অধ্যয়ন করতেন। পিতার সদাজাগ্রত চক্ষু যখন মুদ্রিত, তখন জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবাধ্য পুত্রের চলত গোপন অভিসার। এমনিভাবেই একটু-একটু করে পিতার অগোচরে বাইরের জানালা দিয়ে খোলা আকাশকে তিনি দেখেছেন। পিতার শিক্ষা আর ঐসলামিক আদর্শ এবং নতুন জগৎ আর মুক্ত শিক্ষার দ্বন্দ্বে তাঁর মনে সৃষ্টি হল গভীর সংঘাত।

অষ্টাদশ শতকের সংস্কারক ও চিন্তাবিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তাঁর পরবর্তী আবদুল হক দিহলাইর চিন্তাভাবনা এবং 'তখ্‌লিদে'র (Taqlid) বিরোধিতা খৈরুদ্দিনকে বিচলিত করলেও পুত্র মহিউদ্দিনকে দিয়েছিল অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান। 'ওয়াহাব' আন্দোলনও তাঁকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে পিতৃতান্ত্রিক নিয়মশৃঙ্খলা এবং চিন্তার জগৎ থেকে তিনি মানসিকভাবে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। নতুন নাম গ্রহণ করে মহিউদ্দিন পরিণত হলেন আবুল কালাম আজাদে। স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

আজাদের জীবনে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ খান। তাঁরই চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আজাদ ইংরেজি আর বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা শুরু করেন। সৈয়দের প্রভাবেই আজাদ তাঁর পারিবারিক ধর্মীয় বন্ধন এবং মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। আরবি ভাষায় প্রকাশিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই পড়ে তিনি এক নতুন ধর্মীয় বোধে উদ্দীপ্ত হলেন। সংশয়ের দোলায় দুলতে-দুলতে শেষ পর্যন্ত তিনি এসে পৌঁছলেন তাঁর নিজস্ব যুক্তিবাদের জগতে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে যুক্তিবাদকে আজাদ গ্রহণ করতে পারেন নি। বিপুল বিশ্বচরাচরে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস, চিন্তা আর যুক্তি নিয়ে তিনি অনুভব করতেন গভীর একাকিত্ব। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকেই অবলম্বন করে তিনি বাঁচতে চাইলেন। ইসলামি কাঠামোতেই নতুন সমন্বয়ী ধর্মের সন্ধান করতে লাগলেন। এই পর্বে আজাদের মানসিক দ্বন্দ্বের তীব্রতা আর ভয়ংকর একাকিত্ববোধ নিপুণ শিল্পীর মতন এঁকেছেন ডগলাস।

আজাদের মানসিক দ্বন্দ্বের পর্বে মৌলানা শিবলির (Shibli) সাহচর্য আর নেতৃত্ব তাঁকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছিল। তাঁর জীবনে শিবলির প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য। ডগলাস অবশ্য এই ধারণাকে সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন নি। যদিও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আর সাহিত্যিক সাহচর্যকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ডগলাস আজাদের রাজনীতি ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনাতে শিবলির প্রভাবকে খুব বড়ো বলে মেনে নেবার পক্ষে তেমন কারণ দেখেন নি। ডগলাস মনে করেন, একবার তাঁর পিতার ও আরেকবার স্যার সৈয়দের 'তখলিদ' থেকে মুক্ত হয়ে অন্য কারো বন্ধনে আবার আজাদ বাঁধা পড়তে পারেন না। কিন্তু আজাদ তাঁর লেখায় শিবলির

জীবনচর্যার যে শ্রদ্ধাশীল বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় আজাদের জীবনের অন্তঃস্থলে কোথাও না কোথাও শিবলির প্রভাব ছিল অমোঘ, যদিও আজাদ নিজে মৌলানা নামের অধিকারী হয়েও প্রায়োগিক মুসলমান ছিলেন না।

ঈশ্বরের প্রতি আজাদের আস্থা ছিল অবিচল। গান্ধীর মতন তিনিও মনে করতেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁকে অনেক মহৎ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। ঈশ্বরনির্দেশিত হয়েই আজাদ ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ধর্মচেতনায় এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিখ্যাত "আল হিলালে"র ও "আল্ বালাগে"র সম্পাদনা-কালে আজাদ এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মুসলমান সমাজে "আল হিলাল্" বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। আজাদ চেয়েছিলেন ভারতের মুসলমান সমাজকে গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করতে। মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকাকে তিনি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষীয় মুসলমান সমাজের 'ইমাম্' হতে। "হিস্‌বুল্লা"র (পার্টি অব গড) প্রধান হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন।

অবশ্য এই চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়েছিল ১৯২৩ সালে জেল থেকে মুক্তিলাভের পর। 'খিলাফৎ' আন্দোলনের ঢেউ থেমে যাবার পর 'মুসলিম পুনর্জাগরণে'র পরিবর্তে 'হিন্দু-মুসলিম' ঐক্যের মূলভাবনার স্রোতে আজাদের চিন্তা প্রবাহিত হল। ডগলাস আজাদের চিন্তাভাবনার এই পরিবর্তনকেও তাঁর মূল ধর্মীয় চেতনা বা বোধ থেকে পৃথক করেন নি। ধর্মসমন্বয় ও হিন্দু-মুসলিমচিন্তা আজাদের আদি ধর্মচিন্তা ও বৌদ্ধিক অবস্থানেরই প্রসারিত অংশ বলেই তিনি মনে করেন। আমরা জানি যে, আজাদের চিন্তা ও বক্তব্য অনেক সময়ই স্ববিরোধিতায় আক্রান্ত। ডগলাস এই অবস্থাকে ব্যাখ্যা করেছেন আজাদের মানসিক গঠনের প্রকৃতি বিচার করে। ডগলাসের মতে : 'Azad's mind was capable of making use of various elements in his intellectual store in accordance with the demands of the time.'

গান্ধীকে যেমন মূল ধর্মীয় চেতনা থেকে পৃথক করা যায় না, মৌলানা আজাদের ধর্মকেও তাঁর রাজনীতির জগৎ থেকে নির্বাসন দেওয়া যায় না। আজাদ ধর্ম এবং রাজনীতির বিচ্ছিন্নতাতেও বিশ্বাসী ছিলেন না। আজাদের ভাষায় : 'We have learned even our political thoughts from religion. They are not just coloured by religion. They are born of religion. How can we separate them from religion ?'

কোরানের আদর্শের ভিত্তিতেই মৌলানা আজাদ মুসলমানদের রাজনীতিক চেতনায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। আজাদের ধারণা ছিল, কোরানই মানুষকে সৎ জীবনের, মুক্তির পথ দেখাতে পারে। "আল-হিলালে"র প্রতি ছত্রেই তাই কোরানের আদর্শ প্রতিফলিত। আজাদ সমকালীন রাজনীতি এবং জীবনের সঙ্গে কোরানকে মেলাতে চেয়েছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের কাছে কোরানের বাণীর সহজ ব্যাখ্যা পৌঁছে দেবার জন্য আজাদ রচনা করেছিলেন তরজুমান আল্ কোরান (Tarjuman al Quran)। হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে আজাদ ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়েই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে কোরান সম্বন্ধীয় কাজ সম্পূর্ণ করার তাগিদ অনুভব করেন নি।

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনের চিন্তায় আর কাজে আজাদ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। বৃহৎ মুসলমান সমাজের কাছে আজাদ ক্রমশই হয়ে উঠছিলেন ব্যাখ্যাতীত। তাদের কাছ থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছিলেন। মুসলমান সমাজের ইমামপদের জন্য আজাদ এক সময় নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি হতে চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজের নেতা। পরবর্তী কালে রাজনীতিক ঘটনাস্রোত তাঁকে ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয় নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতার পরিবর্তে সর্বভারতীয় কংগ্রেসি নেতায় নিজেকে রূপান্তরিত করলেন আজাদ। এই রূপান্তর বা উত্তরণ সাধারণ মুসলিমরা উদারভাবে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁকে তাই নিন্দিত হতে হয়েছিল হিন্দুর চর বা মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে (Mercenary agent of the Hindus, dishonest traitor to Islam)। মুসলমানদের ওপর আজাদের প্রভাব স্বভাবতই হ্রাস পেল, বিশেষত ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পরে মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তানের দাবিদারেরা কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি আক্রমণ শানিত করে আজাদের বিরুদ্ধে। অথচ মুসলমান সমাজকে ও ইসলামকে তিনি কখনোই পরিত্যাগ করেন নি। মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন মুসলমান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ভাবিত।

আজাদের চিন্তাভাবনার বিভিন্ন উত্তরণপর্বে যে স্ব-

বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয় ডগলাস তা নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু মুসলমান সমাজ থেকে তাঁর ক্রমনির্বাসনের ফলে আজাদের মানসিক দ্বন্দ্ব তথা প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ডগলাস বিশেষ আলোকপাত করেন নি। লেখক মূলত আজাদের জীবনের ধর্মীয় এবং বৌদ্ধিক বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন। রাজনীতিক আজাদের চেয়ে মানুষ আজাদকেই তিনি বেশি করে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। আজাদের গভীর ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনা তাঁকে তাঁর সমকালীন রাজনীতিবিদদের তুলনায় বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র করে তুলেছে। ডগলাসের গ্রন্থটিতে আজাদের এই পরিচয়ই বিধৃত আছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবনীকার আজাদের 'egotism' বা অহংবোধের প্রশ্ন তুলে অবিচারও করেছেন বলে মনে হয়। যেমন, কারাবাসকালে তাঁর মুমূর্ষু স্ত্রীকে ইংরেজ সরকার দর্শন করার অনুমতি দিলেও ইংরেজের সেই বদান্যতা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এমন-কী তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও তিনি ইংরেজের অনুমতিক্রমে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে নিজেকে বিরত রেখেছিলেন। ডগলাসের ধারণা, আজাদ তাঁর সুকঠিন ব্যক্তিত্বের একটা 'ইমেজ' রক্ষা করার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে আজাদের স্ত্রীর নামে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব আজাদ নাকচ করে দিয়েছিলেন এই যুক্তিতে যে তাঁর স্ত্রী রাজনীতি বা দেশের কোনো কাজেই নিজের জীবন উৎসর্গ করেন নি। এ সমস্তই ডগলাস আজাদের 'ইমেজ' রক্ষাকল্পে সুচিন্তিত পদক্ষেপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সততার প্রশ্ন এখানে গৌণ হয়ে গেছে। এখানে ডগলাসের ব্যাখ্যা শুধু ভ্রান্তই নয়, নির্দয়ও বটে।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও আজাদ তাঁর সমকক্ষ বা অন্য কোনো উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন। দেশের সংকটময় মুহূর্তে ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসের সভাপতির পদে তাঁর পরিবর্তে নেহরুকে মনোনীত করা হয়। আজাদ কি তা সহজভাবে মন থেকে মেনে নিয়েছিলেন? ডগলাস এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানান নি। ১৯৪৬ সালে নেহরুর হাতে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ছেড়ে দিয়ে আজাদ ভুল করেছিলেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। আজাদ নিজেও তা পরবর্তী কালে মনে করেছেন। কিন্তু, সৎ এবং সাহসী হলেও, আজাদ খুব শক্ত চরিত্রের মানুষ ছিলেন বলে ওয়াভেল বা মস্‌লের মতন ব্যক্তিরা মনে করেন নি। ডগলাস অবশ্য আজাদের অহংবোধ বা egotismকেই তাঁর প্রধান শত্রু ও স্ববিরোধিতার উৎস বলে চিহ্নিত করেছেন।

দেশবিভাগ গান্ধী বা আজাদ কেউ ঠেকাতে পারেন নি। আজাদও গান্ধীর মতো ভগ্নহৃদয়ে দেশভাগ মেনে নিয়েছিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রয়োজনের কথা গান্ধীজীকে বোঝাতে। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি তেমন সাড়া পান নি। মুসলমানদের জন্য তাঁর এই চিন্তা হয়তো কোনো-কোনো ঐতিহাসিকের কাছে আজাদকে অন্যভাবে উপস্থিত করেছে। প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস সভাপতি থাকার সময়ই তিনি মুসলিমদের প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে চেষ্টা করেছিলেন। ব্যর্থ হয়েছিলেন। সিমলা কনফারেনসও ব্যর্থ হল। এ-সমস্ত ঘটনা কংগ্রেসের ভেতরে হিন্দু রাজনীতিবিদ্‌রা কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা আমাদের খুব একটা অজানা নয়। কিন্তু আজাদের ওপর এর প্রতিক্রিয়া কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তা জানার কৌতূহল ডগলাস নিবৃত্ত করেন নি।

দেশবিভাগের পরও আজাদের আশা ছিল যে, দেশভাগ হলেও হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক বন্ধন অটুট থাকবে। স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আজাদ হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। সরকারি নীতি এবং আমলাতন্ত্র তাঁর পথে বাধা হয়েছিল। সমস্ত বিষয়েই তাঁর শেষ পর্যন্ত মোহভঙ্গ হয়েছিল। এক ভগ্নহৃদয় ও নিঃসঙ্গ মানুষ অপরিমিত মদ্যপানে নিজেকে একটু-একটু করে নিঃশেষ করে ফেলেছিলেন। ডগলাসের বর্ণনা এ পর্বে সুন্দর।

"ইনডিয়া উইনস ফ্রীডম" গ্রন্থে আমরা আজাদের যে-পরিচয় পাই, ডগলাস সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নন। হয়তো আমরা অনেকেই নই। আজাদ এই বইটি ছাড়াও আরও দুটি আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন। প্রথমটি "তাজ্‌কিরা"। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অন্তরীণ থাকার সময় উর্দুতে তিনি এটি রচনা করেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে তিনি এই গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেন। দ্বিতীয়টিতে আবদুল রজ্জাক মালিহাবাদী নামে তাঁর এক শিষ্যকে ১৯২০ সালে জেলখানায় তিনি মুখে-মুখে নিজের কথা বলে গিয়েছিলেন। "আজাদ্ কি কহানি খুদ্ আজাদ্ কি জবানি"—এই দুটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের সঙ্গে ইংরেজি বইটিকে মিলিয়ে নিতে হবে। ডগলাসের ধারণা, "ইনডিয়া উইনস ফ্রীডম" গ্রন্থের

অপ্রকাশিত ত্রিশ পৃষ্ঠায় হয়তো আজাদ তাঁর পিতৃপুরুষদের সম্বন্ধে এমন কিছু লিখেছেন যা এযাবৎকাল তাঁর সম্বন্ধে আমরা যা জেনে এসেছি তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কিন্তু কেন? জীবনীকারের যুক্তি অনুসরণ করলে আজাদকে একজন উচ্চাভিলাসী ও অহংকারী মানুষ বলে মনে হয়। ধমনীতে তাঁর আরবি রক্ত প্রবাহিত। মুঘল দরবারে আকবর বাদশার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করার মতন সাহস তাঁর পূর্বপুরুষ দেখিয়েছিলেন। এ সমস্তই খুব বড়ো করে দেখাবার প্রয়োজন হয়তো আজাদের হয়েছিল ভারতীয় মুসলিমদের "ঈমাম" হবার অভিলাষ থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে পাকাপোক্ত অভিজাত আসন দখল করবার প্রয়োজনে। আজীবন তিনি তাঁর 'ইমেজ' নিয়ে ভাবিত ছিলেন। এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ কথা বলবে।

এই গ্রন্থ রচনাকালে আজাদকে লেখকের তত বড়ো বলে মনে হয় নি, যত বড়ো মনে হয়েছিল আজাদের কিংবদন্তী। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকীর হুসেনকে আজাদ সম্পর্কে লেখক তাঁর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করলে রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন, 'Go on with your study. Speak the truth but be charitable.'

"মানুষ" আজাদকে তিনি তাঁর সমস্ত দোষ-গুণ নিয়েই খুব স্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করেছেন। সংশয় আর কঠিন সমালোচনা থাকলেও কোনো অশ্রদ্ধা তাঁর লেখায় প্রকাশ পায় নি। এই উপমহাদেশে বিরাট হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্যের জন্য সংগ্রাম ক'রে যে-মানুষটি শেষ জীবনে সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে ডগলাসের শেষ কথা: 'He was a sadly misunderstood man' এবং 'His life may yet hold lessons for his nation.'

ডগলাস আবুল কালাম আজাদকে কোথাও 'মৌলানা' বলে উল্লেখ করেন নি। হয়তো তাঁর ধারণা, আবুল কালাম আজাদ সত্যিকারের বা প্রচলিত অর্থে "মৌলানা" ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে আজাদের ধর্মবোধ এবং ধর্মীয় বৌদ্ধিক বিবর্তনের ইতিহাসই ডগলাস আলোচনা করেছেন। রাজনীতি ডগলাসের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে নি। আজাদের রাজনীতি তিনি আলোচনা করেছেন, তাঁর ধর্ম এবং চিন্তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে। ডগলাসের কাছে আজাদের জীবনের মূল প্রাঙ্গণে রাজনীতি পোষ্যপুত্রের স্থান পেয়েছে। তাই এই গ্রন্থটিকে আজাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বলে মনে করা যায় না। ইতিহাসগ্রন্থ তো নয়ই। কিন্তু আজাদের রাজনীতিক জীবনী রচনার ক্ষেত্রে ডগলাসের গ্রন্থটি অবশ্য-পাঠ্য। আজাদের জীবনের মূল ভিত্তিটাকে তিনি ধরবার চেষ্টা করেছেন। মানুষ আজাদকে না জানলে রাজনীতিক আজাদও আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবেন। এই বিচারে ডগলাসের গ্রন্থটির অপরিহার্যতা যে-কোনো পাঠকের বা গবেষকের কাছে নিঃসন্দেহে অনুভূত হবে।

পরিশেষে, যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামের আর-এক বিরাট মুসলিম নেতা খান আবদুল গফফর খানের সঙ্গে আজাদের একটি চিত্র বইটিতে স্থান পেয়েছে, আবদুল গফফরের সঙ্গে আজাদের কোনো সম্পর্ক বা চিন্তাভাবনার সাযুজ্য নিয়ে লেখক একটি কথাও বলেন নি। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ডগলাস দেন নি।

জিন্নাহ্ চর্চা : নয়া ভাবনা

খাজিম আহ্মেদ

ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ বিতর্কিত নাম। সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসে জিন্নাহ্র মতো বহুনিন্দিত আর একজনই আছেন—তিনি আওরঙ্গজেব। পাকিস্তানে জিন্নাহ্ 'কায়েদ-ই-আজম' রূপে বন্দিত। ভারতবাসী তাঁকে এই শতাব্দীতে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবলতম প্রবক্তা আর ভারতবিভাজনের কারণ মনে করেন। রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণের অধিকারী জিন্নাহ্ এই দেশের ইতিহাসের গতিপথ পালটে দিয়েছিলেন। সৃষ্টি করেছিলেন একটি রাষ্ট্রের। জাতীয়তাবাদের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তিনি ইতিহাসনির্মাতা।

অথচ জিন্নাহ্ রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন (১৮৯৬) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির একজন দেশপ্রেমিক বিশিষ্ট নেতা হিসেবে। উচ্চশিক্ষিত উদার-মতাবলম্বী সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানুষ। মুসলিম নেতা হিসেবে তিনি কখনো পরিচিত ছিলেন না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকালে আদর্শগত কারণে তাতে যোগ দেন নি। এক সময়ে মুসলিম লীগ তাঁকে দলে টানার চেষ্টা করেছেন।

জিন্না : পাকিস্তান—নতুন ভাবনা—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩। পঞ্চাশ টাকা।

জিন্নাহ্‌ অবজ্ঞায় তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন, তিনি কোনো ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা নন—তিনি সর্বভারতীয় নেতা। সরোজিনী নাইডু তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করার সময় গোখলের বিখ্যাত উক্তির পুনরুদ্ধৃতি দেন—'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজদূত'। জীবনের শেষ পর্যায়ে সেই মানুষের রূপান্তর বিস্ময়কর। কিন্তু জিন্নাহ্‌ কেন মুসলিম লীগের সর্বময় কর্তা হয়ে পাকিস্তানের প্রবক্তা হয়ে উঠলেন? মাত্র সাত বৎসরের কুশলী রাজনীতিক পদক্ষেপ আর ধৈর্যের দ্বারা তিনি একেবারে শব্দার্থে অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের গোঁড়ামিমুক্ত জিন্নাহ্‌ কি সত্য-সত্যই ভারতভাগ করে পাকিস্তান চেয়েছিলেন? সেই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক জীবনের বিবর্তনের ধারাবাহিক অনুপুঙ্খ বিবরণ আর তথ্য-সমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পেশ করেছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশবিভাগের চল্লিশ বছর বাদে জিন্নাহ্‌ সম্বন্ধে সহৃদয়ভাবে বিচার করার ভার নিয়েছেন শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি স্বয়ং একজন গান্ধীবাদী। একজন গান্ধীপন্থীর পক্ষে নির্মোহ মূল্যায়ন সহজ বিষয় নয়।

তিনি কেন এম. এ. জিন্নাহ্‌র সম্বন্ধে আলোচনা করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, তার কৈফিয়ত দিয়েছেন। দেশ-বিভাজনের প্রাক্কালে তাঁর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, জিন্নাহ্‌ 'আদ্যন্ত সাম্প্রদায়িক', 'দেশদ্রোহী' এবং 'খলনায়ক' (পৃ ১)। কিন্তু তাঁর 'মনের বদ্ধ' অর্গলে প্রথম আঘাত পড়ল 'পঞ্চাশের দশকে।' (পৃ ২) পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্যদের সামনে প্রদত্ত জিন্নাহ্‌র প্রথম বক্তৃতার (১১ অগস্ট, ১৯৪৭) অংশ-বিশেষ, একটি প্রবন্ধে পড়ার পর, তিনি যেন জিন্নাহ্‌কে নতুন করে আবিষ্কার করেন। জিন্নাহ্‌ এই বক্তৃতাটিতে আশা প্রকাশ করেছিলেন যে হিন্দু মুসলমান—এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায় একদিন তাদের নিছক ধর্মীয় পরিচয় থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হবে। (বক্তৃতার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি, পৃ ২)। গ্রন্থকার দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছন, এ তো কোনো সাম্প্রদায়িকতাবাদীর উক্তি হতে পারে না। অতঃপর ১৯৬৯ সালে "দ্য স্টেটসম্যান" পত্রিকায় প্রবীণ সাংবাদিক বি. শিবরাও-এর একটি প্রবন্ধ পড়ার পর থেকেই 'জিন্নাহ্‌ সম্বন্ধে অধ্যয়ন আমার প্রায় একটা বাতিকে পরিণত হয়' (পৃ ৭)। তার ফল হল, ৩০৩ পাতার এই বিশাল গ্রন্থটি।

জিন্নাহ্‌র ধারাবাহিক জীবনী অবলম্বন করে গ্রন্থকার প্রথমে অগ্রসর হয়েছেন।

১৮৯২-এর ৩০শে জানুয়ারি (কোনো-কোনো গবেষকের মতে ১৮৯৩) ইংল্যানডের পথে রওনা হন জিন্নাহ্‌ এবং ১৮৯৫ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। বিলেতে থাকার সময় ব্রিটিশ পার্লামেনট-ভবনে দর্শকের আসনে মুগ্ধচিত্তে আইরিশ হোমরুল এবং নারীমুক্তি সম্বন্ধে দাদাভাই নৌরজীর (তিনি তখন পার্লামেনটের সদস্য) বক্তৃতা শুনছেন। 'গ্র্যাণ্ড ওল্ড-ম্যান' দাদাভাইকে মনে-মনে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন। ইচ্ছা ভারতে গিয়ে তিনি গুরুর মতোই লিবারাল এবং সংবিধান অনুসারী পার্লামেনটারিয়ান হবেন। (পৃ ৯)।

১৯০০ থেকে তিনি পুরোপুরি রাজনীতিতে মন দিলেন। ১৯০৫ সালে মে মাসে অসুস্থ স্যার ফিরোজশাহ মেটার স্থলাভিষিক্ত হয়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে তিনি গোখলের সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সেখানে জনমত সৃষ্টি করা। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত হলেন ত্রিশ বছরের যুবক জিন্নাহ্‌। তিনি তখন পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আগ্রহী। ওই বছরেই প্রতিষ্ঠিত নিখিল-ভারত মুসলিম লীগে তিনি যোগ দেন নি। আগা খাঁ মন্তব্য করেছিলেন যে জিন্নাহ্‌ ১৯০৬ সালে তাঁদের কঠোরতম বিরোধী ছিলেন। জিন্নাহ্‌ বলেছিলেন যে পৃথক নির্বাচন-নীতি জাতিকে খণ্ড বিখণ্ড করবে (পৃ ১০)। ১৯০৭ এ জিন্নাহ্‌ সুরাট কংগ্রেসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন কংগ্রেসের প্রথম ভাঙন। অতঃপর বোম্বাই হাইকোর্টে তিলকের কারামুক্তির দাবি করেন। ১৯১০-এ বড়োলাটের কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন। এই বছরেই এলাহাবাদের ২৫তম কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থার নিন্দা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ওই সময়ে এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করতে বুকের পাটার দরকার ছিল (পৃ ১৮)। ১৯১১-তে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯১০ থেকে শুরু করে ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তিনি কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের সদস্য ছিলেন। গোখলে-উত্থিত নানা বিল আর প্রস্তাবের সমর্থন করে বক্তৃতা দিয়েছেন জিন্নাহ্‌। তাঁর ইচ্ছে ছিল গোখলের পদচিহ্ন অনুসরণ করা (পৃ ১৮)। সুরেন ব্যানার্জিকে নেতা হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। ১৯১৩-তে মুসলিম লীগের

তদানীন্তন সম্পাদক সৈয়দ ওয়াজির হাসানকে জিন্নাহ্ এক পত্রে লেখেন যে, হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ছাত্ররা যাতে পরস্পরের সঙ্গে অধিক মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হয় তার জন্য একই স্কুলে উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রদের স্থান দিতে হবে (পৃ ১৯)।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র মুসলিম লীগে যোগদান প্রসঙ্গে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, কংগ্রেস এবং লীগকে কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য ১০ অকটোবর ১৯১৩ সালে তিনি বিধিবদ্ধভাবে মুসলিম লীগের সভ্য হয়েছিলেন। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে সরোজিনী নাইডুর একটি লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'নিজের উদাহরণ দ্বারা জিন্নাহ্ যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত করার জন্য ইতিমধ্যে এত করেছিলেন, অবশেষে তাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেন। ·· তাঁর নাম সুপারিশকারী দুইজনকে এই মর্মে আগাম পবিত্র প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছিল যে, তাঁর মুসলিম লীগ ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি আনুগত্য কোনো ক্রমেই বা কোনো সময়েই, যে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের সাধনে তাঁর জীবন উৎসর্গীকৃত, তার পথে বিন্দুমাত্র বাধক হতে পারবে না' (পৃ ২০)। গ্রন্থকার মন্তব্য করছেন, 'জাতীয়তাবাদী মানসিকতার কোন্ উচ্চস্তরে জিন্নাহ্ উঠেছিলেন, তার নিদর্শন পাওয়া যায় এই উদ্ধৃতিতে। এই প্রসঙ্গে নেহরুর মন্তব্যটিও স্মরণযোগ্য। তিনি জিন্নাহ্ সম্পর্কে লিখেছেন, 'অতীতে মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনার কৃতিত্ব ছিল তাঁরই।' (An Autobiography, পৃ ৬৭)। মুসলিম লীগের সভ্যপদ গ্রহণ করলেও কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দৃঢ় সম্পর্ক বজায় ছিল। এর পরেও তিনি মাদ্রাজ অধিবেশনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৫-র নভেম্বরে মুসলিম নেতা এবং জনসাধারণের কাছে এই আবেদন রাখলেন, তাঁরা যেন 'হিন্দু বন্ধুদের' সঙ্গে একসঙ্গে চলার উদ্দেশ্যে এবং এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ার জন্য নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হন (পৃ ২২)। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য জিন্নাহর ঐকান্তিক চেষ্টা আর নিরন্তর প্রয়াসের অজস্র তথ্য পেশ করেছেন লেখক।

১৯১৬ সালে লখনৌতে অনুষ্ঠিত হল প্রথমে কংগ্রেসের (২৫-২৮ ডিসেমবর) ও পরে (৩০-৩১ ডিসেমবর) লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশন। এখানেই লীগ-কংগ্রেস তথা মুসলিম-হিন্দু ঐক্যের ফরমূলা লখনৌ চুক্তি অনুমোদিত হল। এই চুক্তিতে সই করেছিলেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বি. জি. তিলক এবং লীগের পক্ষ থেকে এম. এ. জিন্নাহ্। লখনৌ চুক্তির প্রস্তাব ছিল, 'বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী' দ্বারা মুসলিম সদস্যরা নির্বাচিত হবেন। এই ব্যবস্থায় মুসলমান সংখ্যালঘুদের জন্য আসনবণ্টন হল নিম্ন হারে: 'পাঞ্জাবে নির্বাচিত সদস্যদের অর্ধেক, সংযুক্ত প্রদেশে শতকরা ৩০ ভাগ, বাংলায় শতকরা ৪০ ভাগ, বিহারে শতকরা ২৫ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে শতকরা ১৫ ভাগ, মাদ্রাজে শতকরা ১৫ ভাগ এবং বোম্বাই প্রদেশে তিন ভাগের এক ভাগ। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের...নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ হবেন মুসলমান' (পৃ ২৪-২৫)। এই চুক্তিটি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। লখনৌ চুক্তির পর জিন্নাহ্ ভারতীয় রাজনীতিতে প্রায় মহানায়কের স্থান দখল করেন। লখনৌতে লীগের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, 'হিন্দুদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে শুভেচ্ছা এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন' (পৃ ২৫)।

১৯১৭-তে হোমরুল লীগে যোগ দিয়ে তিনি বোম্বাই শাখার সভাপতি হন এবং অ্যানি বেসান্তকে পাঠানো এক চিঠিতে লেখেন: 'মুসলমানদের প্রতি আমার নিবেদন হল এই যে, তাঁরা যেন তাঁদের হিন্দুভাইদের সাথে হাত মেলান। হিন্দুদের প্রতি আমার নিবেদন হল—আপনাদের অনগ্রসর ভাইদের উত্থানের সহায়ক হোন। এই আদর্শ নিয়েই যেন হোমরুল লীগের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং তাহলে আমাদের আর ভয়ের কারণ থাকবে না' (পৃ ২৭)। ওই বৎসরই কলকাতায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে সহকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনাদের শত্রুদের প্ররোচনায় আতঙ্কিত হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবেন না। কারণ স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্তির জন্য এই সহযোগিতা অপরিহার্য' (পৃ ২২)।

১৯১৯-২০ সালে গান্ধী যখন উদীয়মান নেতা তখন অ্যানি বেসান্তের পদত্যাগের পর এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হিসেবে জিন্নাহ্ গান্ধীর নাম সভাপতি হিসেবে প্রস্তাব করেন। হোমরুল লীগের সভাপতি হবার পর গান্ধী এই প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে রাখলেন 'স্বরাজ্য সভা' এবং এর মূল নীতিরও পরিবর্তন করলেন। এমন-কী, সংবিধানও পালটে দিলেন। সমস্ত রকমের আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন গান্ধী। স্বভাবতই জিন্নাহ্ প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে পদত্যাগ

করেন। হোমরুল লীগ সংক্রান্ত এই পরিবর্তনকে জয়াকর, যমুনা দাস দ্বারকা দাস, মঙ্গল দাস পাকবাসা ও কানহাইয়ালাল মুন্সী প্রমুখ প্রবীণ নেতারাও সমর্থন করেন নি (পৃ ৩৯)।

রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ জিন্নাহ্ পছন্দ করতেন না। কিন্তু ১৯১৯ সালে রাওলাট আইন প্রবর্তিত হলে তার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। জিন্নাহ্ বলেন, 'বিচার বিভাগের ক্ষমতা প্রশাসকদের হাতে দিলে প্রচণ্ড রকমে ক্ষমতার অপব্যবহারের পথ প্রশস্ত হবে।' (পৃ ৩২)। দেশ জুড়ে জিন্নাহ্র জয়জয়কার। কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হয়ে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন, এমন সময়ে ঘটল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। মুহূর্তে রাজনৈতিক পটভূমির আমূল পরিবর্তন, গান্ধী নেতৃত্বের উদ্ভব। কংগ্রেসের নেতৃত্বে এসেই গান্ধী খিলাফত রক্ষার আন্দোলনকে সমর্থন করলেন। সংবিধাননিষ্ঠ এবং অসাম্প্রদায়িক জিন্নাহ্ খিলাফত নিয়ে আন্দোলন এবং অসহযোগের বিরোধিতা করেছেন। ১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে (৪-৯ সেপ্টেমবর) অসহযোগের প্রস্তাব স্বীকৃত হলেও সেই প্রবাহে তিনি গা ভাসান নি। বিষয়-নির্বাচনী সভার তাবৎ মুসলমান সদস্যদের মধ্যে একমাত্র জিন্নাহ্ই ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের বিরোধী। জিন্নাহ্র সংবিধাননিষ্ঠ চরিত্র এবং প্যান-ইসলামিক মানসিকতার প্রতি তাঁর দৃষ্টিকোণ বোঝার জন্য এই বিষয়টির গুরুত্ব আছে (পৃ ৩০ এবং ৩৫)। অ্যানি বেসান্ত, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, দেশবন্ধু এবং বিপিনচন্দ্র পাল জিন্নাহ্র সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলেন। পরে দেশবন্ধু গান্ধীর প্রভাব-বলয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

এর তিন মাস পরে (২৮ ডিসেমবর) নাগপুর কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল। এই কংগ্রেস ভারতবর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে জিন্নাহ্র রাজনৈতিক জীবনেও এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নাগপুর কংগ্রেসে জিন্নাহ্ সাহস করে এককভাবে অসহযোগ এবং খিলাফত আন্দোলন-প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। সেই বিরোধিতা অনেক তীব্র, তীক্ষ্ণতায় কুলিশ-কঠোর। কলকাতা কংগ্রেসে জিন্নাহ্ গান্ধীকে 'মহাত্মা' অভিধায় সম্বোধন করেছিলেন, কিন্তু এবার তাঁকে কেবল 'মিঃ গান্ধী' বলে অভিহিত করলেন, মহম্মদ আলির নামের পূর্বে 'মৌলানা' যোগ করলেন না। 'মহাত্মা' এবং 'মৌলানা' ব্যবহারের জন্য প্রতিনিধিরা পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু জিন্নাহ্ অবিচল। সৌকত আলি জিন্নাহ্র প্রতি কটূক্তি করতে-করতে ঘুঁসি পাকিয়ে ছুটে গেলেন জিন্নাহ্র দিকে। অন্যেরা তাঁকে ধরে ফেললেন। জিন্নাহ্ প্রত্যক্ষত অপমানিত হলেন। কংগ্রেসের অসহিষ্ণু প্রতিনিধিদের অপমানজনক এবং অগণতান্ত্রিক আচরণে ক্ষুব্ধ দুঃখিত জিন্নাহ্ অধিবেশন বর্জন করে সেই রাতেই চলে গেলেন। প্রতিনিধিদের উপেক্ষাকে অগ্রাহ্য করে তাঁর বিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন—'আমার পথই যথার্থ—সাংবিধানিক পথই যথার্থ।' সঙ্গে-সঙ্গে জিন্নাহ্র রাজনৈতিক জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের অবসান ঘটল (পৃ ৩৭)। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে জিন্নাহ্ হয়ে পড়েন এক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব। গান্ধীর সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাত, আদর্শগত মতভেদ, প্যান ইসলামবাদীদের প্রতি গান্ধীর পক্ষপাত, এমন-কী তাঁর ইংরিজি-কেতাদুরস্ত জীবনযাত্রার প্রতি গান্ধীর বিরূপতা, জিন্নাহ্কে বিরক্ত করে তুলেছিল। উপরন্তু 'পাক্কা সাহেব' জিন্নাহ্র যুক্তিবাদী মন গান্ধীর 'মিস্টিক' কার্যকলাপ আর কুসংস্কারকে সমর্থন করতে পারে নি (পৃ ৩৭) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৫ সালের গুর্জর সভায় এবং ১৯১৮তে দিল্লীর "যুদ্ধ সম্মেলনে" গান্ধী এবং জিন্নাহ্র ব্যক্তিত্বের সংঘাত ঘটেছিল।

এ সত্ত্বেও জিন্নাহ্ যথার্থ অর্থে শিভলরাস ভদ্রলোক। ১৯২৪ সালে লীগের লাহোর অধিবেশনে গান্ধীর সঙ্গে তীব্র মতভেদ থাকলেও, গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, 'যেদিন হিন্দু ও মুসলমান মিলিত হবে, সেই দিনই ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন পাবে' (পৃ ৪৪)। ১৯২৭-এ জিন্নাহ্র সভাপতিত্বে দিল্লী মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হল। লখনৌ চুক্তির বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী'র স্থলে 'জয়েন্ট ইলেকটরেট' বা 'হিন্দু-মুসলমান সংযুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী' মেনে নিতে মুসলিম নেতৃবর্গ রাজি হলেন। এই সিদ্ধান্ত ঐক্যের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। এটি জিন্নাহ্র কৃতিত্ব। দিল্লীর মুসলিম প্রস্তাবের বাকি বিষয়গুলো ছিল লখনৌ চুক্তির প্রায় অনুরূপ। এই প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯২৮-এ নেহরু কমিটির রিপোর্ট ঐক্যের আশাকে রুদ্ধ করে দেয়। (রিপোর্টের সুপারিশ ছিল খুবই বিতর্কমূলক—পৃ ৫১)। মুসলিম লীগ তীব্র প্রতিবাদ করে। ১৯২৮-এ সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনে ২২শে ডিসেমবর জিন্নাহ্ কতকগুলো প্রস্তাব রাখলেন এবং এই মন্তব্য করলেন যে, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রত্যক্ষ করার চেয়ে আর কিছু তাঁকে তেমন সুখী করতে পারবে না। গভীর রাত্রি পর্যন্ত আলোচনার পরও জিন্নাহ্র একটি প্রস্তাবও গৃহীত হল না। উপরন্তু কংগ্রেসি সদস্যদের একাংশ তাঁর সঙ্গে

সদ্ব্যবহার করেন নি। কী মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মধ্যে জিন্নাহ্‌কে তাঁর ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে, তাও তাঁরা অনুধাবন করেন নি। আহত-হৃদয়ে জিন্নাহ্‌ সম্মেলন থেকে বিদায় নিলেন। ঘটনার পরের দিন, দিল্লী যাত্রার পূর্বে তাঁর জনৈক পার্শী বন্ধুকে সজল চক্ষে বলেছিলেন, 'জামশেদ, এবার আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল।' (শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, প্রকাশ্যে জিন্নাহ্‌র চোখে জল আসার যে বিরল ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়, এ তার একটি (পৃ ৫৭))। ১৯২৯ সালে মুসলিম স্বার্থ রক্ষাকল্পে পেশ করলেন চোদ্দ-দফা দাবি। জিন্নাহ্‌ ফিরে গেলেন "সেপারেট ইলেকটরেট" বা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিতে, একদা যে দাবিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন না দিলে কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বাধীনতার' দাবি জানাবে—এই বিষয়টিকে জিন্নাহ্‌ "রাজনৈতিক হিস্টিরিয়া" আখ্যা দিয়ে গান্ধীর প্রতি তীব্র আক্রমণ করেন। মুসলমান সমাজের কাছে এই আন্দোলন ছিল 'হিন্দুদের সংগ্রাম' (পৃ ৬৯)। এমন-কী, কংগ্রেসের মহম্মদ আলি পর্যন্ত মন্তব্য করেন, 'শ্রীযুক্ত গান্ধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু মহাসভাপন্থীদের প্রভাবে কাজ করছেন। তিনি হিন্দুধর্মের প্রভুত্ব এবং মুসলমানদের আত্মসমর্পণের জন্য কাজ করেছেন' (পৃ ৬৯)। ১৯৩০-এর ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় পরিষদে জিন্নাহ্‌ বললেন, 'হিন্দুরা আমাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করুন বা নাই করুন, আমরা এগিয়ে যেতে চাই এবং আমরা এদেশে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্য যথেষ্ট রক্ষাকবচ ব্যবস্থাযুক্ত দায়িত্বশীল সরকার চাই' (পৃ ৭০)। ক্রমেই সন্দেহ, অবিশ্বাস, আর দেশের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়াতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠল। ১৯৩০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত লীগের অধিবেশনে সভাপতি ড. মহম্মদ ইকবাল এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে বা বাইরে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন (পৃ ৭৩)।

ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত, উদার, অসাম্প্রদায়িক জিন্নাহ্‌র ব্যাপক পরিচয় তুলে ধরেছেন আলোচ্য গ্রন্থের গান্ধীবাদী লেখক শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কিছু নজির এখানে উল্লেখ করা হল: ১৯২৫ সালে মাহমুদাবাদের রাজাকে বলেছিলেন, তিনি প্রথমে ভারতবাসী, পরে নিজেকে মুসলমান বিবেচনা করেন (পৃ ৪)। ১৯৩১ এ পর্যন্ত একই উক্তি করেন (পৃ ৬৪)। স্মর্তব্য, নাগপুর কংগ্রেসের পর তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। 'জিন্নাহ্‌ এই পরিমাণ ধর্মীয় গোঁড়ামিবর্জিত ছিলেন যে ১৯২৪ সালে একবার দিল্লীতে···তেজবাহাদুর সপ্রুকে···বলেছিলেন, '···আপনারা আপনাদের গোঁড়া পুরোহিতশ্রেণীকে উৎসাদন করুন এবং আমরাও আমাদের মোল্লাদের ধ্বংস করি—তাহলে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে' (পৃ ৫)। (এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন, 'এমন-কী ১৯৪৬ সালেও কট্টর ইসলাম-অনুসারীদের কী পরিমাণ বিরোধী ছিলেন তাঁর বিবরণ এক সাম্প্রতিক গ্রন্থে [ড. আফজল ইকবাল; Islamisation of Pakistan] পাওয়া গেছে।' বিষয়টি উলেমাসমাজ সংক্রান্ত, দেখুন পাদটীকা, অধ্যায় ১, নং ১২, পৃ ২)। তাঁর ব্যক্তিজীবনেও মুসলিম অভিজ্ঞানের প্রকাশ ব্যাপক লক্ষ করা যায় না। মানসিকতার দিক দিয়ে ছিলেন প্রায় ব্রিটিশ। হিন্দু-মুসলিম মতভেদকে সাম্প্রদায়িক নয়, জাতীয় সমস্যা হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন তিনি (পৃ ৬৬)। গ্রন্থকার স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন, 'অন্ততঃ ত্রিশের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি যে জাতীয়তাবাদী ছিলেন একথা তাঁর সমালোচকের পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়।' তিনি আরও লিখেছেন যে বহু গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন জিন্নাহ্‌র বক্তৃতা শুনে। এই বক্তৃতাগুলো মাদ্রাজের নটেশন কোমপানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করে (পৃ ৪)। এমন একজন মানুষ ধর্মাভিত্তিক রাষ্ট্রের জনক হবেন—এ যেন ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়জনক রহস্য।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জিন্নাহ্‌ এতই হতাশ হয়েছিলেন যে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক সমাপ্ত হবার পর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নি। হ্যাম্পস্টেডে একটি বাড়ি কিনে গুছিয়ে বসেছিলেন। ভগ্নী ফতিমা ও কন্যা দীনাকে সঙ্গে রেখেছিলেন। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে জিন্নাহ্‌ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলেন। মাঝে-মাঝেই লনডনে ফিরে গেছেন। বোম্বেতে স্থায়ী হলেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে তার মাধ্যমে মুসলিম রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণের জন্য জিন্নাহ্‌র কাছে যেসব নেতা আগ্রহ প্রকাশ করতেন তার মধ্যে তাঁর গুণগ্রাহী এবং অনুগামী সস্ত্রীক লিয়াকৎ আলী খাঁ, আসামের আব্দুল মতিন চৌধুরী, খলিকুজ্জমাঁ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশে ফিরে জিন্নাহ্‌ রাজনীতিতে প্রবলভাবে যোগ দিলেন। এর আগেই ১৯৩২ সালের ২রা মার্চ আব্দুল মতিন চৌধুরীকে

এক গোপনীয় ও ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছিলেন, 'মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। ···হাতের তাস কিভাবে খেলতে হয় তা যদি মুসলমান নেতারা জানেন তাহলে নিঃসন্দেহে সম্প্রদায় যা চান তা পাবেন।' অন্য একটি পত্রে, ১৯৩২-এর ১লা ডিসেমবর আব্দুল মতিন চৌধুরীকে লেখেন, 'জনসাধারণই যখন বিভক্ত তখন আর কি আশা করা যেতে পারে? এ ভারতবর্ষের বিধিলিপি' (পৃ ৭৯)। 'হিন্দু নেতৃত্বের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়ে জিন্নাহ্ ক্রমশঃ নিছক মুসলমান নেতায় পর্যবসিত হচ্ছেন' (পৃ ৭৯)। কংগ্রেস ও গান্ধীর কঠোর সমালোচনা করছেন। ১৯৩৩ এর ৩০শে মার্চ জনাব মতিনকে লেখেন, 'হিন্দুরা সঠিক অবস্থা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য কিছু করার উপায় নেই' (পৃ ঐ)। এরই মধ্যে ১৯৩৫-এ নিজের বিশ্বাসের পুনরুক্তি করে বলেছিলেন, 'হিন্দু ও মুসলমানরা যত দিন না ঐক্যবদ্ধ হয় ততদিন ভারতবর্ষের আশার কিছু নেই' (পৃ ৮৪)।

১৯৩৫ থেকেই জিন্নাহ্ দাবি করতে থাকেন যে মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। ১৯৩৭-এর জানুয়ারির নির্বাচনের পর থেকেই জিন্নাহ্ লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে নিয়ে যেতে পরিস্থিতিগত কারণে বাধ্য হন। ড. ইকবাল এই সময় থেকেই একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে প্রভাবিত করতে থাকেন (পৃ ১০০)।

খ্রী ১৯৩৭-১৯৪৭—এই দশ বছর হল পাকিস্তান আন্দোলনের ইতিহাস। কিভাবে একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হল তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। ১৯৩৭-এ বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভাকে মুসলিমবিরোধীরূপে চিহ্নিত করছেন। বলছেন, এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেস 'হিন্দু প্রতিষ্ঠান।' 'আদর্শ শাসনব্যবস্থাকে গান্ধী কর্তৃক "রামরাজ্য" আখ্যা দেওয়াও মুসলমানদের মধ্যে কম বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ হয় নি' (পৃ ১১৯)। জিন্নাহ্ এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। 'ইসলাম বিপন্ন, একমাত্র দীনই (ধর্ম) বিবেচ্য—এই অতঃপর হয়ে উঠল মুসলিম লীগের একমেব ভূমিকা' (পৃ ১০৫)। তিনি জেহাদি মানসিকতা সৃষ্টি করলেন (১১৮ পৃ) এবং মুসলিম শক্তিকে লীগের ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসতে প্রয়াসী হলেন। (পৃ ১২৩, ১৩৩)। 'হঠাৎ জিন্নাহ্ এত জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন কেন'? এই প্রশ্ন তুলে গ্রন্থকার শৈলেশকুমার মন্তব্য করছেন, 'এ হল হিন্দু মহাসভার সমকালীন রাজনীতি, যা হিন্দু-সংস্কৃতি ও হিন্দুর স্বাধিকার রক্ষার নামে প্রত্যুত এই ভূমিকাকেই পুষ্ট করেছিল' (পৃ ১৩৪)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৭ সালে সাভারকার ঘোষণা করলেন, 'এদেশে প্রধানত দুটি জাতি হিন্দু ও মুসলমান' (পৃ ঐ)। সাভারকারের 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রচার মুসলমানদের শঙ্কিত করে তোলে। গান্ধীও চাইছিলেন 'রাজনীতির অধ্যাত্মীকরণ' (পৃ ১৩৬ এবং ২৯৫)। অদ্বিতীয় রণকৌশল-নির্ধারক ব্যক্তিত্ব জিন্নাহ্ এই সুযোগে নিজেকে 'ইসলামের সেবক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। অপ্রতিরোধ্য করে তোলেন নিজেকে। (পৃ ১৩৭, ১৪৮)। ইকবালকে লিখিত একটি পত্রে জিন্নাহ্ পরিষ্কার করে বলেন, '···আমাদের স্বধর্মীয়রা (People) রাজনৈতিক দৃষ্টিতে অসংগঠিত, শিক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর এবং আর্থিক ক্ষেত্রে কুত্রাপি তাদের স্থান নেই।' সুতরাং, 'আমি ধাপে-ধাপে তাদের টেনে তুলতে চাই এবং তাদের দৌড়াতে বলার আগে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাই যে তারা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে সক্ষম' (পৃ ১৩৮)। কোনো দ্বিধা না রেখে তিনি ঘোষণা করলেন, 'মুসলিম ভারত এমন কোনো সংবিধান স্বীকার করতে পারে না যার পরিণতি স্বতঃই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার'। তিনি দাবি করলেন, 'জাতি (Nation) শব্দের যে-কোনো পরিভাষা অনুসারে মুসলমানের একটি জাতি এবং তাদের নিজের বাসভূমি, এলাকা এবং রাষ্ট্র চাই' (পৃ ১৫০)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, 'জিন্নাহ্ কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব বা মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রথম প্রবক্তা নন' (পৃ ১৫১)।

১৯৩৯-এ আটটি প্রদেশের কংগ্রেস সরকার পদত্যাগ করল। এই উপলক্ষে 'মুক্তিদিবস' পালনের জন্য জিন্নাহ্ মুসলমানদের আহ্বান করলেন। দ্রাবিড় কাজাঘম্ দলের তরফ থেকে রামস্বামী নাইকার, ড. আম্বেদকারের নেতৃত্বাধীন তফশিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন এবং ভারতীয় খ্রীষ্টানদের একাংশ এই কংগ্রেসবিরোধী জেহাদে লীগের সঙ্গে যুক্ত হল। শৈলেশকুমার মন্তব্য করেছেন, 'জিন্নাহ্ মুসলমান ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে মিলিতভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করছেন এবং এটা তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার দ্যোতক এবং প্রশংসনীয়' (পৃ ১৪৭)।

১৯৪০-এ লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাবে "পাকিস্তান" শব্দটি কোনোভাবেই উচ্চারিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে জিন্নাহ্র এককালের একান্ত সচিব পীরজাদা জিন্নাহ্র নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, 'পাকিস্তান শব্দ আমরা চালু করি নি, হিন্দুরাই এই শব্দটি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

লাহোর প্রস্তাব তীব্রভাবে সমালোচনা করতে গিয়ে হিন্দুরা পাকিস্তান প্রস্তাব রূপে এর উল্লেখ করেন। তার ফলেই এই শব্দের প্রচলন হয়' (পৃ ১৬৯)। লাহোর প্রস্তাব মুসলমানদের মধ্যে শুধু আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিই নয়, তাঁদের প্রচ্ছন্ন অহমিকা-বোধকেও উদ্দীপ্ত করেছিল (পৃ ১৮৭)। 'হিন্দু মহাসভাও হিন্দু অধিকার রক্ষার আন্দোলনের নামে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে সংহত করার সুযোগ দেয়' (পৃ ১৯০)।

ক্রিপস্ ১৯৪২-এর ২৩শে মার্চ দিল্লীতে এসে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। আলোচনার সময় জিন্নাহ্ ঘোষণা করলেন, 'সব দল যদি মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি বা দেশবিভাগ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেয় এবং তার খুঁটিনাটি যদি যুদ্ধশেষে স্থির হবে বলে নির্ধারিত হয় তাহলে বর্তমান সম্বন্ধে আমরা কোনো যুক্তিযুক্ত বোঝাপড়ায় আসতে প্রস্তুত' (পৃ ১৮১)। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনকে জিন্নাহ্ সমর্থন করেন নি। তিনি কঠোর মন্তব্য করেন, ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেলে 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কংগ্রেস রাজের করুণার উপর মুসলমান ও অপরাপর সংখ্যালঘুদের নির্ভর করতে হবে। তাঁর মতে এই আন্দোলন ছিল 'মুসলিম স্বার্থের উপর মৃত্যু-কল্প আঘাত হানা' (পৃ ১৮২, ১৮৪)।

১৯৪৫-এ সিমলা কনফারেনস ভেঙে গেল। ১৯৪৬-এ নির্বাচনের প্রাক্কালে গান্ধী এবং কংগ্রেস ও তার 'সবর্ণ হিন্দু নেতৃত্বের' প্রতি জিন্নাহ্‌র আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। তিনি কংগ্রেস দলকে কেবল বর্ণহিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করতেন (পৃ ২০৪)। গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে উলপার্টের একটি বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'নাগপুরের প্রকাশ্য অসম্মানের সিকি শতাব্দীর পর তিনি তাঁর যশোহানির ধূলিশয্যা ছেড়ে মৃত্যুর দ্বারদেশে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন জগতের কাছে যেন এই কথা ঘোষণা করতে যে মিঃ গান্ধী মিঃ জিন্নাহ্‌র তুলনায় কোনো অংশেই শ্রেয় নন' (পৃ ২০৬)। গান্ধীর পরই যাঁর সঙ্গে জিন্নাহ্‌র ভিন্ন মানসিকতাজনিত বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যাঁর কারণে তিনি ক্রমশ আরও আপোসবিহীন সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেন তিনি হলেন নেহরু। নেহরু জিন্নাহ্‌র মানসিকতাকে "মধ্যযুগীয় ও সেকেলে" আখ্যা দিয়েছিলেন। জিন্নাহ্ নেহরুকে "পিটারপ্যান" হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন (পৃ ১০৪, ১০৫)। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'কুশল মনোবিজ্ঞানী জিন্নাহ্ ভারতীয় মুসলিম মানসিকতার দুটি দিক—হিন্দু প্রভুত্বের ভীতি এবং ইসলামী অহমিকাবোধকে তাঁর ১৯৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনী বক্তৃতায় পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগালেন' (পৃ ২০৮)। তিনি এই সময় পুনঃপুন বলছেন, আমরা এমন কোনো ব্যবস্থায় রাজি হতে পারি না যা হিন্দুদের স্বাধীনতা দিয়ে 'হিন্দুরাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে-সঙ্গে মুসলমানদের পক্ষে দাসত্বতুল্য হয়। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি .....ততদিন মুসলমানদের কোনোমতেই আমি হিন্দুদের ক্রীতদাসে পরিণত হতে দিতে পারি না' (পৃ ২০৮)। নির্বাচনযুদ্ধে মুসলিম লীগের বিপুল সাফল্য মুসলিম জনমানসকে উদ্দীপ্ত করে। "অবিশ্বাস্য স্নায়ু-শক্তিসম্পন্ন" জিন্নাহ্ এক বক্তৃতায় বললেন, ভারতবর্ষের মুসলমানরা পাকিস্তান অর্জনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তাঁরা পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং তা পাবেনও। নির্বাচনে হিন্দুমহাসভার মুসলমানবিরোধী সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রকারান্তরে লীগের পাকিস্তান দাবিকেই শক্তিশালী করে—এই মত পোষণ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক (পৃ ২১১)। সাধারণ নির্বাচনের পর এটি প্রমাণিত হয়ে গেল যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কোন্ পথে যাবে, ১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকেই তা নির্ধারিত হয়ে গেল।

১৯৪৬-এ ক্যাবিনেট মিশন তার ঘোষণাতেই সার্বভৌম পাকিস্তানের দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। জিন্নাহ্ 'খণ্ডিত ও কীটদষ্ট' পাকিস্তান যেমন চান নি, তেমনি গণ-পরিষদে মুসলিম আসনের সংখ্যার অধিকতর সুবিধা (weightage) পাবার সম্ভাবনা না থাকার কারণে ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। তিনি বললেন, পাকিস্তান অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। পাকিস্তান হবেই, কেননা এটি অপ্রতিরোধ্য বিষয়। এই সালেই ১৬ অগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ফলস্বরূপ কলকাতার দাঙ্গা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ২রা সেপটেমবর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। ২রা অকটোবর পর্যন্ত জিন্নাহ্‌র সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পর বড়লাট লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে রাজি করালেন। লীগের প্রতিনিধিদের অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সব মিলিয়ে ভারতবিভাগের পথকে প্রশস্ত করল। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মন্তব্য করেছেন, লর্ড মাউনটব্যাটেন ৪০ কোটি মানুষের দেশে ক্ষমতাহস্তান্তরের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে প্রায় "গেলাম, দেখলাম, জয় করলাম"-এর মত

মানসিকতা দ্বারা চালিত হয়ে দেশবিভাগকে অপরিহার্য ও অশোভনভাবে ত্বরান্বিত করেন যার ফলে হাজার-হাজার নর-নারী শিশুর-মৃত্যু ও মৃত্যুযন্ত্রণা এবং লক্ষ-লক্ষ মানুষের সহস্রবিধ দুর্দশা ঘটেছিল। অবশ্য মাউনটব্যাটেন ভারত-বিভাজনের জন্য মন তৈরি করে বড়লাটের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নি (পৃ ২৬৮)। মাউনটব্যাটেন ভারতে পদার্পণ করার পূর্বেই নেহরুর বিশ্বাসভাজন ও ব্যক্তিগত দূততুল্য কৃষ্ণ মেনন লনডনে তাঁর কাছে এই তদ্বির করে এলেন যে তদানীন্তন পরিস্থিতির সমাধান হল দেশের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে দুটি 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা জরুরি। জওহরলালের অভিমতের প্রবক্তা হিসেবে একাধিকবার কৃষ্ণ মেনন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। এমন কী শ্রীমেনন এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে কলকাতার বদলে পূর্ব পাকিস্তানের যে বন্দরের প্রয়োজন তার জন্য যত ব্যয়ই হোক, চট্টগ্রামকে উন্নত করে পাকিস্তানের হাতে দেওয়া উচিত (পৃ ২৬৯)।

ভারতবিভাজনের জন্য জিন্নাহ্‌র মন তৈরি হলেও খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বিভক্ত বঙ্গ সহ পাকিস্তান অর্জন তাঁর কাম্য ছিল না। বড়লাটের কাছে তিনি আবেদন জানালেন যে 'বঙ্গ ও পাঞ্জাবের ঐক্য যেন বিনষ্ট না করা হয়' (পৃ ২৭১)। বিভক্ত পাঞ্জাব ও বাঙলার ভিত্তিতে "বিকলাঙ্গ ও কাটদষ্ট" পাকিস্তান যাতে জিন্নাহ্‌ স্বীকার করে নেন তার জন্য মাউনটব্যাটেন রোগে শয্যাশায়ী চার্চিলের সঙ্গে (২২শে মে ১৯৪৭ খ্রী) দেখা করে জিন্নাহ্‌র জন্য এক বিশেষ বার্তা নিয়ে আসেন (পৃ ২৫৭)। 'বড়লাট জিন্নাহ্‌কে জানিয়ে দিলেন যে ভারতবিভাগের পক্ষে তাঁর তাবৎ যুক্তি পাঞ্জাব ও বঙ্গবিভাজনের পক্ষেও প্রযোজ্য এবং ওই দুই প্রদেশের অমুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করা সম্ভব নয়' (পৃ ২৭১)। ১৯৪৭ এর জানুয়ারিতে শরৎচন্দ্র বসু, সুরাবর্দী এবং আবুল হাশেম সার্বভৌম বঙ্গের (অর্থাৎ এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের) প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেন। আকরাম খাঁ গোষ্ঠীও বঙ্গবিভাজনের বিরোধী ছিলেন, তবে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল অবিভক্ত বঙ্গকে পাকিস্তানের অঙ্গীভূত করা। জিন্নাহ্‌ সার্বভৌম বঙ্গের বিরোধী না হলেও পরবর্তী কালে প্রকাশ্য সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন। জওহরলাল, প্যাটেল এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা "সার্বভৌম বঙ্গ" প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। হিন্দু মালিকানার সংবাদপত্রগুলোও তারই প্রতিধ্বনি করে। তাদের আশঙ্কা ছিল যে সমগ্র বঙ্গই তাহলে শেষ অবধি পাকিস্তানের কবলিত হবে (খৃ ২৭৪, ২৭৬)। স্বভাবতই শরৎচন্দ্র, সুরাবর্দী আর হাশেমের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হল।

ব্রিটিশ ১৯৪৮ সালের জুনের পর কোনোমতেই ভারতে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। মাউনটব্যাটেন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্যাটেলকে ভারতবিভাগে সম্মত করেছিলেন। (পৃ ২৪৬)। জওহরলাল 'মাথা কেটে ফেলে মাথাব্যথার চিকিৎসা'-র (পৃ ২৯১) পক্ষপাতী ছিলেন। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করছেন, 'সেই মানসিকতায় চালিত হয়ে হিন্দু জনতার বড় একটা অংশ ও হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গই নয়; এমনকি কংগ্রেসেরও অধিকাংশ নেতা শেষ অবধি দেশবিভাগের অনুকূল হয়েছিলেন' (পৃ ২৯১-৯২)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নেহরুর ভারতবিভাগে রাজি হবার বহু কারণ তাঁর অন্যতম জীবনীকার মাইকেল ব্রেচার (Nehru —A Political Biography) বিশ্লেষণ করেছেন (পৃ ৩৭৬-৩৭৯)। ব্রেচার এ মন্তব্য ও করেছেন যে, 'ক্ষমতা-লাভরূপী পুরস্কার প্রাপ্তির' জন্য নেহরু ও প্যাটেল দেশ-বিভাগে সম্মত হন। (পৃ ৩৭৯)। এই তথ্যের হদিশ দিয়েছেন গ্রন্থকার ৩০ অধ্যায়ের ৩৪ নং পাদটীকায় (পৃ ৫৯)।

জিন্নাহ্‌ কোনোক্রমেই পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাজনের পরি-কল্পনাকে সমর্থন করছিলেন না। অসহিষ্ণু মাউনটব্যাটেন জিন্নাহ্‌র হাতে তুলে দিলেন চার্চিলের একটি ব্যক্তিগত চিঠি। তাতে লেখা ছিল : 'দুই হাত বাড়িয়ে আপনি যদি এই প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তবে ব্যাপারটা পাকিস্তানের জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন হবে' (পৃ ২৭৯)। ১৯৪৭-এর তেসরা জন জিন্নাহ্‌, মাউনটব্যাটেন-উত্থিত দেশভাগের প্রস্তাব (Partition Plan) 'অনিচ্ছুক মাথা নেড়ে' (রিল্যাক-ট্যান্ট নড) মেনে নিলেন (পৃ ২৭৯ ২৮০)।

১৯৪৭-এর ৭ অগস্ট জিন্নাহ্‌ করাচী বিমানবন্দরে পৌঁছলেন। করাচীর লাটভবনের সিড়ি দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে-করতে তাঁর নবনিযুক্ত সহায়ক নৌবাহিনীর লেফ-টেন্যান্ট এস. এম. আহসানকে লক্ষ্য করে বললেন, 'জান, আমার জীবিতকালে পাকিস্তান দেখে যেতে পারব—এমন আশা আমি কখনও করি নি। আমরা যা অর্জন করেছি তার জন্য ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত' (পৃ ২৮৩)। 'অতীতকে কবর দিতে হবে এবং আসুন আমরা হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান নামক দুই স্বাধীন ও সার্বভৌম

রাষ্ট্রের শুভারম্ভ করি' (পৃ ২৮৩)।

মোট ৩০টি অধ্যায়ের সাহায্যে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্নাহ্‌র জীবনবৃত্ত বিশেষত তাঁর রোমাঞ্চকর রাজনৈতিক জীবনের রূপান্তরের বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। সাম্প্রদায়িক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের ক্ষণপ্রভার ঝিলিক জিন্নাহ্‌র জীবন ও কর্মে বারবার দৃশ্যমান—সে কথাও গ্রন্থকার প্রমাণ-সহযোগে উল্লেখ করেছেন।

জিন্নাহ্‌ কি সত্যসত্যই ভারতবিভাগ করে মুসলমানদের এক স্বতন্ত্র বাসভূমি সার্বভৌম পাকিস্তান চেয়েছিলেন? সাম্প্রতিক কালে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হচ্ছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বিষয়টি আগ্রহ-সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। জিন্নাহ্‌র রাজনৈতিক প্রতিযন্দ্বী মৌলানা আজাদের অভিমত উদ্ধার করেছেন: 'সম্ভবত শেষ অবধি পাকিস্তান জিন্নাহ্‌র একটা দরাদরির বিষয় ছিল।' এস. কে. মজুমদার (Jinnah & Gandhi) থেকে আরম্ভ করে সাম্প্রতিক কালের ড. আয়েষা জালালেরও (The Sole Spokesman) এই মত। তাঁদের বক্তব্য—কংগ্রেস ভারতবিভাজনে রাজি হয়ে যাবে, একথা জিন্নাহ্‌ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। জিন্নাহ্‌ চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের 'অধিকতর সুযোগ'। তিনি গ্রুপিং পেলেই তৃপ্ত হতেন, মুসলিম সমাজের জন্য কেন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থায় মর্যাদাপূর্ণ ভাগ আদায় করাই ছিল তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের দাবি ছিল তাঁর রাজনৈতিক কৌশল ও চাপ সৃষ্টির অস্ত্র মাত্র। গ্রন্থকার আলোচনান্তে মন্তব্য করেছেন, 'জিন্নাহ্‌ সত্যসত্যই পাকিস্তানের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন কিনা—এই সংশয়ের জোরালো ভিত্তি আছে' (পৃ ৩০০)। উপরন্তু দ্রষ্টব্য: ড. আয়েষা জালাল: দ্য সোল স্পোকসম্যান, পৃ ৩৫-৬০)।

পাকিস্তান নিছক মুসলমানদের দেশ হোক—এটিও তাঁর কাম্য ছিল না। এর বহু প্রমাণ হাজির করেছেন লেখক। দু-একটি উদাহরণ: 'জিন্নাহ্‌ বিশ্বাস অথবা আচারে-বিচারে আদৌ গোঁড়া মুসলমান ছিলেন না। ...১৯৪৩ সালেও (১লা ফেব্রুয়ারি) বোমবের ইসমাইলি কলেজের এক বক্তৃতায় তিনি বলেন যে ধর্ম হল 'নিছক ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যেকার একটা ব্যাপার।' দেশবিভাগের ঠিক পূর্বে রয়টারের প্রতিনিধি ডুন ক্যাম্পবেলকে জিন্নাহ্‌ বলেন যে নূতন রাষ্ট্রটি হবে, 'এক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার সার্বভৌমত্ব থাকবে জনসাধারণের হাতে এবং ধর্ম, জাতি (caste) ও বিশ্বাস নির্বিশেষে নূতন রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নাগরিকতার সমান সুযোগ ভোগ করবেন' (পৃ ১০)। এমন-কী ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের রূপরেখার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান কোনমতেই ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না যার শাসনের দায়িত্ব থাকে দৈবী উদ্দেশ্যচালিত ধর্মযাজকদের হাতে' (পৃ ১৭১)। আবার ২৫শে অকটোবর রয়টারের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি 'পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিকরূপে অভিহিত করেন' (পৃ ২৮৫)। এই বিষয়ে আরও দেখুন (পৃ ২৭৮, ২৮৩)।

অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে তাঁর ভিতর মানবীয় আবেগের ন্যূনতা ছিল এবং তাঁর আচরণ ছিল হিমশীতল এবং ভাবাবেগহীন। সেই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন গ্রন্থকার। পত্নী রুটির সমাধিতে মাটি দেবার সময় জিন্না যেমন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন তেমনি দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ও পাকিস্তান ত্যাগে প্রস্তুত হিন্দু উদ্বাস্তুদের দুঃখদুর্দশার জন্য জিন্নাহ্‌র চোখে জল এসেছিল—তার বর্ণনা দিয়েছেন দেশবিভাগের পর পাকিস্তানে অবস্থানকারী সাংবাদিক এম. এস. এম. শর্মা, জিন্নাহ্‌র অন্যতম জীবনীকার হেকটর বলিথো, ফতিমা জিন্নাহ্‌ এবং জিন্নাহ্‌র অনুগামী মীর লায়েক আলি। দেশ বিভাগের সময়ে করাচীর মেয়র পার্শী জামশেদ নসরওয়ানজী বলেন, 'আমার সানুনয় মিনতি—বিশ্বাস করুন শ্রীযুক্ত জিন্নাহ্‌ মানবদরদী ছিলেন। চোখের জল ফেলার ব্যাপারে কোন দিনই তাঁর মধ্যে কোন প্রবণতা ছিল না—না, আদৌ না। কিন্তু দুবার আমি তাঁকে অশ্রুমোচন করতে দেখেছি। .....সে সময়ে আমি তাঁর সঙ্গে হিন্দুদের এক শিবিরে গিয়েছিলাম।.....শিবিরের বাসিন্দা সেইসব হিন্দুদের দুর্দশা দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন।' এমন বহু তথ্যের হদিশ দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা (দেখুন, পৃ ৫-৭, ৫৭, ২৮৫, ২৮৯-২৯০)।

জিন্নাহ্‌র ব্যক্তিগত জীবনও ছিল বিয়োগান্তক। তাঁর প্রথমা পত্নী অল্প বয়সে—জিন্নাহ্‌ বিলেতে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই—মারা যান। প্রণয়সূত্রে জিন্নাহ্‌ রুটিকে বিবাহ করেছিলেন ১৯১৮ সালে। পার্শী সম্প্রদায়ের স্যর দীনশাহ পেটিটের সুন্দরী কন্যা রুটি (রতনবাই / রাতি) মানসিক হতাশার শিকার হন। অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। একমাত্র সন্তান কন্যা দীনাকে অশেষ স্নেহ করতেন। কিন্তু তাঁর

অমতে বিবাহ করার জন্য সারা জীবন কন্যার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। ভগিনী ফতিমা জিন্নাহ্‌ই ছিলেন তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। জিন্নাহ্‌র পারিবারিক জীবনের বেদনার সহৃদয় বর্ণনা দিয়েছেন লেখক (পৃ ২৯৭-২৯৮)। তাঁর মনে হয়েছে জিন্নাহ্‌ যেন গ্রীক ট্র্যাজেডির নায়কের মতো যিনি শত প্রয়াস সত্ত্বেও জীবনের নানা পর্যায়ে শোচনীয় পরিণতি এড়াতে পারেন নি (পৃ ৩০২-৩০৩)।

"জিন্নাহ : পাকিস্তান—নতুন ভাবনা"-গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়েছে বর্ষীয়ান চিন্তাবিদ অন্নদাশঙ্কর রায় লিখিত অসাধারণ মূল্যবান একটি ভূমিকা। জিন্নাহ্‌ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। খেলায় বাজী ধরে তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেন। সেটা কংগ্রেসেরই কৌশলে' (পৃ ১২)। তিনি আরও লিখেছেন যে রাজাগোপালাচারী, বল্লভভাই, জবাহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং কৃপালনী গান্ধীজীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাধাদানে নিবৃত্ত করে দেশভাগ করিয়ে নিয়েছিলেন—সেটিও কম সত্য নয়। আমরা যেন জিন্নাহ্‌কেই পুরোপুরি দায়ী না করি' (পৃ ঐ)। তিনি সাহসের সঙ্গে লিখেছেন, 'সবাইকে হিন্দু বানাবার উদগ্র বাসনা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়। জিন্নাহ্‌ প্রমুখ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আত্মীয় না করে পর করে দেয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের হিন্দু-পুনরুজ্জীবনকামী শাখা। .....জিন্নাহর কংগ্রেস ত্যাগের পশ্চাতে সেটাও কাজ করছিল' (পৃ ১৩)। তাঁর বিশ্বাস, 'রোম যেমন একদিনে নির্মিত হয় নি পাকিস্তানও তেমনি একদিনে সংস্থাপিত হয় নি' (পৃ ১৪)। এটি বোধ হয় স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে ইতিহাসের কাঠগড়ায় শুধুমাত্র জিন্নাহ্‌কেই জবাবদিহি করতে হবে না।

প্রতিটি তথ্যের সূত্রনির্দেশ এবং আকরগ্রন্থের লেখকবর্গের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পাদটীকায় উত্থাপন করতে গ্রন্থকার শৈলেশকুমার ব্যবহার করেছেন ৬০টি মূল্যবান পৃষ্ঠা। এ-জাতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থে প্রত্যাশিত 'নির্ঘণ্ট' যত্নসহকারে গ্রথিত হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে কোনো-কোনো তথ্যের পুনরুক্তি ঘটেছে, অবশ্য প্রতিটি অধ্যায়কে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে তা জরুরি ছিল। জিন্নাহ্‌র নবতম এক ভাবমূর্তি নির্মাণ করেছেন তিনি। বাঙলা ভাষায় এমন গবেষণা-কর্ম এর আগে প্রকাশিত হয় নি। 'অতীতের ভুলত্রুটি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সাম্প্রতিক কালের বিচ্ছিন্নতাবাদের আক্রমণের সম্মুখীন হবার বুদ্ধি ও সাহসের সন্ধান দিতে' অশেষ পরিশ্রমসহকারে এই গ্রন্থ রচনা করেছেন লেখক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে এই গ্রন্থপাঠ অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

"আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ" বইটি বিপান চন্দ্রের ইংরেজি বই "ন্যাশনালইজম অ্যান্ড কলোনিয়ালইজম ইন মডার্ন ইন্ডিয়া"র অনুবাদ। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে লেখা আপাত-বিচ্ছিন্ন মোট চোদ্দটি প্রবন্ধ আলোচ্য বইটিতে সংকলিত। কিন্তু লক্ষণীয়, প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটা অন্তর্লীন যোগসূত্র রয়েছে। ১. ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকীকরণ, ২. উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা, ৩. ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (১৮৫৮-১৯০৫) : ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধারণা, ৪. ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের উপাদান : আদি জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপ, ৫. ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ : ১৯৪৭ সালের আগে, ৬. জওহরলাল নেহরু ও পুঁজিপতি শ্রেণী : ১৯৩৬ সাল, ৭. আধুনিক ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ, ৮. ১৯২০-র দশকে উত্তর ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী : আদর্শগত বিকাশ, ৯. ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা, ১০. লর্ড ডাফরিন ও ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চরিত্র, ১১. লেনিন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, ১২. কৃষকসম্প্রদায় ও জাতীয় সংহতি : সমকালীন ভারতবর্ষ, ১৩. তিলক এবং ১৪. এক-নায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সামাজিক উৎস—এই প্রবন্ধগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা ঠিক হবে না। ঔপনিবেশিকতাবাদের সম্প্রসারণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণজালবিস্তার আলোচ্য বইটিতে যেমন পরিস্ফুট, তেমনি পাশাপাশি দেখানো হয়েছে জাতীয়তাবাদের চরিত্রও নানা টানাপোড়নের

আধুনিক ভারত : ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ—বিপান চন্দ্র, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৭। পঞ্চাশ টাকা।

মধ্য দিয়ে কী ভাবে অষ্টাবক্ররূপ নিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বেনোজলে কলুষিত হয়েছে আমাদের সাধের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সেই সঙ্গে দেখানো হয়েছে, পুঁজিবাদীদের শোষণজালে কীভাবে সমর্পিত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতীয় অর্থনীতি। বিপান চন্দ্র এই বইয়ের ভূমিকাতে তাঁর উদ্দেশ্যটিকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: '…এই প্রবন্ধগুলিকে আমার দ্বিধাগ্রস্ত পদক্ষেপ, প্রাথমিক খসড়া বলা যেতে পারে। সুস্পষ্ট বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এগুলি রচিত হয়নি। এইসব প্রবন্ধ পড়ে পাঠকের যদি মনে হয় যে উত্থাপিত প্রবন্ধগুলি তাৎপর্যপূর্ণ এবং পরিস্ফুট দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা আছে, এগুলি একত্রিত করে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য তাহলে আমার সার্থক হয়েছে বলতে হবে। …… রাজনীতি, অর্থনীতি, ও মতাদর্শের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সরকারিনীতি, ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে, কোন আন্দোলন, তার সামাজিক ভিত্তি, তার উদ্দেশ্য, তার ভাবধারা, ও তার নেতৃত্বের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে যত স্পষ্ট ও সার্থকভাবে অনুশীলন করা সম্ভব হয়েছে, এমন আর কোথাও হয়নি।' লেখক মার্কসবাদের নিরিখে গোটা বিষয়টি পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক ইতিহাসদৃষ্টি ঔপনিবেশিক শোষণ ও যন্ত্রণার মূল কারণগুলিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করেছে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদের বিকাশের রূপটিও ধরা পড়েছে।

এই বইয়ের প্রথম প্রবন্ধ "ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকীকরণ"। ১৯৭০ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ হিসেবে প্রবন্ধটি পঠিত। ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা ভারতীয় অর্থনীতির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও কেন ভারতীয় অর্থনীতি পিছনে পড়ে রইল, অর্থাৎ সঠিক অর্থে আধুনিকীকরণ হল না—সে বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সারা পৃথিবীতে অর্থ-নৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ওই সময়ে ভারতীয় ধনিক ও বণিক শ্রেণী 'পাহাড়-পরিমাণ মুনাফাও অর্জন করে'। সে সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্য কিছুটা পিছু হটেছিল সন্দেহ নেই। এর পিছনে ছিল নানান বাস্তব কারণসমূহ। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, 'যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলে' ব্রিটেন ১৯২১ সালের পরে ভারতে তাদের বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করে এবং 'ভারতীয় শিল্পগুলির বিপুল মুনাফা ব্রিটিশ মূলধনকে বিরাট আকারে আকর্ষণ করল'। তবে ভারতীয় ধনিক-বণিকশ্রেণীও ক্রমশই ভারী শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছিল এবং 'ব্রিটিশ মূলধনের নতুন করে প্রবেশের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ করল।' এই প্রতিবাদের কোনো বড়ো রকমের ফল দেখা যায় নি, কারণ ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ভারতীয় বণিকদের পুঁজির যথেষ্ট বিকাশ সম্ভব ছিল না। ফলে, বিপান চন্দ্রের মতে, 'অনগ্রসর অর্থনীতির চিরায়ত 'মডেল'ই থেকে গেল।' কারণ, ভারতীয় পুঁজি-বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধাসামন্ততান্ত্রিক। তা ছাড়া, দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ শাসনাধীন থেকেও ভারতীয় অর্থনীতি বিকশিত না হওয়ার কারণানুসন্ধান করেছেন বিপান চন্দ্র। তাঁর মতে, ১. 'জাতিভেদ, যৌথ পরিবার ইত্যাদির মত আভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পরিচালিত আচার, অভ্যাস, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, ২. অতীত অনগ্রসরতার ভার এত বিপুল যে বাইরে থেকে আসা আধুনিকীকরণ তাতে বেশ বড় রকমের কোনো ভাঙন ধরাতে পারে নি', ৩. বিদেশীদের নির্মম শোষণ ও অর্থনৈতিক নির্গমন। সর্বোপরি, সমস্ত কিছুর মূলে ছিল ঔপনিবেশিকতার ভূমিকা। আসলে, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার মূলে ঔপনিবেশিক সরকারের অনিচ্ছা আর ব্যর্থতাই ছিল অন্যতম প্রধান কারণ। দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদগণ এই ব্যাপারটি খুঁটিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী কালে রজনী পাম দত্ত এই বিষয়টি নিয়ে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিপান চন্দ্র আধুনিকীকরণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভারতীয় বাস্তবতার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, 'উনিশ শতকে আধুনিকীকরণের অর্থ ছিল ব্রিটেনে শিল্প-পুঁজিবাদের বিকাশ এবং ভারতে ঔপনিবেশিকতা ও অনগ্রসরতার বিকাশ, ঠিক তেমনি আজ আবার আধুনিকীকরণের অর্থ হল সমাজতন্ত্র কিংবা অনগ্রসর পুঁজিবাদ। সব সময়েই তা পশ্চাদ্‌মুখী প্রবণতা বা নয়া উপনিবেশবাদের দ্বারা বিপদাপন্ন।'

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের পুনর্ব্যাখ্যা"য় মরিস ডি মরিসের ১৯৬৩ সালে 'জার্নাল অব ইকনমিক হিস্ট্রি'তে প্রকাশিত "টুওয়ার্ডস এ রি-ইনটারপ্রিটেশন অব নাইনটিনথ সেনচুরি ইনডিয়ান ইকনমিক হিস্ট্রি"র সমালোচনা করা হয়েছে। মার্কস এবং পাশ্চাত্যদেশীয় অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের মতামত এখানে যেমন আলোচিত, তেমনি ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টিভঙ্গিও

উপেক্ষিত হয় নি। একদা মরিস ডি মরিসের সঙ্গে তপন রায়চৌধুরীর যে বিতর্ক হয়েছিল, তাও এই প্রবন্ধপাঠের সময় স্মরণ করা যেতে পারে। বিপান চন্দ্রের মতে, 'মরিস উনিশ শতকের অর্থনৈতিক ইতিহাসের নতুন কোনো ব্যাখ্যা উপস্থিত করছেন না।' তিনি সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখা উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ সরকারি-বেসরকারি বইপত্র এবং তথ্যাবলীকে নতুন অর্থনীতির পরিভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। অথচ মজার বিষয় হচ্ছে এই যে, তাঁর পূর্বসূরীদের প্রতি তিনি কোনো কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করেন নি। মরিসের রচনায় কাঠামোগত বিশ্লেষণই প্রাধান্য পেয়েছে। বিপান চন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'উনিশ শতকের অর্থনৈতিক কাঠামো কেমন ভাবে বিকাশ লাভ করেছিল কিংবা বাস্তব অর্থনৈতিক বিকাশ প্রক্রিয়ার সঙ্গে কাঠামোগত পরিবর্তনগুলির সম্পর্ক কী, তার একটি দিকও তিনি আলোচনা করেন নি।' শুধুমাত্র মাথাপিছু আয় ও জাতায় উৎপাদনের বস্তুগত দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বাণিজ্যের বিস্তার এবং পরিবহণের সুব্যবস্থা ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে সাহায্য করবে। মরিস কখনো কখনো মার্কসের বক্তব্যে নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থন খুঁজেছেন। কিন্তু কোন্ বক্তব্যে কী সমর্থন তিনি চান, তা অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াটে। ভারত অন্যান্য দেশের তুলনায় অর্থনীতির দিক থেকে পশ্চাৎপদ ছিল কেন, তা মরিসের লেখায় স্পষ্ট নয়। তাই বিপান চন্দ্র বলেন, 'মরিস মূল প্রশ্নটি উপেক্ষা করতে চান, কিন্তু তাঁকে যখন চেপে ধরা হয়, তখন তিনি মূলত বিংশ শতকের পূর্বেকার সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা ও আলোচনাকে অবলম্বন করেন।' বরং বিপান চন্দ্র এই প্রবন্ধের শেষে সঠিক মন্তব্যই করেছেন, 'ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে ঔপনিবেশিক স্তরে নামিয়ে আনার কারণে ব্রিটিশ শাসন এ দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য দায়ী।'

১৯৬৬ সালে বিপান চন্দ্রের গবেষণামূলক গ্রন্থ "দি রাইজ অ্যান্ড গ্রোথ অব ইকনমিক ন্যাশনালইজম ইন ইন্ডিয়া" প্রকাশিত হয়। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল ১৮৮০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যবর্তী কালের ভারতের অর্থনৈতিক নীতিসমূহ এবং জাতায় নেতৃত্ব। বর্তমান আলোচ্য বইয়ের তৃতীয় প্রবন্ধ "ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি (১৮৫৮-১৯০৫ : ব্রিটিশ ও ভারতীয় ধারণা"তে উপরি-উক্ত গবেষণামূলক বইয়ের বক্তব্যের ছায়াপাত অনেকটাই লক্ষণীয়। বিপান চন্দ্রের মতে, 'ভারতের অর্থনীতির কৃষির বুনিয়াদকে এ সময়ে সজোরে ক্ষয় ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, শিল্পে দেশজ এক পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল এবং জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভিত্তি দৃঢ়মূল হয়েছিল।' তথাপি 'ভারতীয় লেখকরা এটাকে দেখেছিলেন ঐতিহ্যিক বা সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাদ্বর্তিতা থেকে ঔপনিবেশিক পশ্চাদ্বর্তিতায় রূপান্তর হিসেবে।' জাতায়তাবাদী লেখকেরা দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা কিভাবে আধুনিকীকরণের নামে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য এ দেশে পিছিয়ে পড়ছিল; তার ওপর আবার ছিল ঐ বিদেশীদেরই আধিপত্য। এইভাবে "ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ধারণা" তৈরি হয়। অপর পক্ষে, ব্রিটিশ লেখকরা ভারতায় অর্থনৈতিক অবস্থার পশ্চাদ্বর্তিতার তত্ত্ব অস্বীকার করেছেন, অথচ 'তাঁদের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বোঝায় তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল।' নিজেদের স্বার্থের দিকে তাকিয়েই তাঁরা উলটো গাইতে শুরু করেছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিলেন তার মূল উদ্দেশ্য হল, ঔপনিবেশিক শাসন টিকিয়ে রাখতে হবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থেই। উইলিয়াম লী-ওয়ার্নার, এম. ই. গ্র্যান্ট্ ডাফ, রিচার্ড টেম্পল, লয়াল প্রমুখেরা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদেরই সমর্থক। বিপান চন্দ্র দেখিয়েছেন, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের দুর্বলতম অংশ হল তাঁদের কৃষি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।' আধাসামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থা এ দেশের উন্নতির পথে যে অন্তরায় ছিল তা বলাই বাহুল্য। বিপান চন্দ্রের বিশ্লেষণে ভারতীয় আর্থনীতিক পরিস্থিতির চেহারা স্পষ্ট হয়েই উঠেছে।

চতুর্থ প্রবন্ধ "ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের উৎস : আদি জাতীয়তাবাদী ক্রিয়াকলাপ"। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে তিনটি পর্বে ভাগ করে আলোচনা করার পক্ষপাতী বিপান চন্দ্র। ১৯০৫ সালের আগের পর্ব, ১৯০৫ থেকে ১৯১৯ দ্বিতীয় পর্ব এবং তৃতীয় পর্ব হচ্ছে ১৯১৯ থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কাল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীরা চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুটিভাগে বিভক্ত হলেও উভয়েই একই কাঠামোর ভেতর কাজ করেছে। নরমপন্থারা 'ধরেই নিয়েছিলেন যে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আপাতত সমাজের শিক্ষিত স্তরে বা তাঁদের ভাষায় "শিক্ষিত শ্রেণীর" মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।' ব্রিটিশ সরকারেরও ছিল জনসাধারণের প্রতি অনাস্থা। মুষ্টিমেয় চরমপন্থী নেতা জনসাধারণের কাছে পৌছাতে পেরেছিল, কিন্তু, বিপানচন্দ্রের মতে, 'বাংলায় চরমপন্থী আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থাতেও কৃষকসম্প্রদায়কে লড়াইতে সামিল করা হয় নি।' চরমপন্থী নেতারা আন্দোলনের সঠিক

পথও দেখাতে পারেন নি, এমন-কী নরমপন্থীদের সঙ্গে রাজনৈতিক পার্থক্য কোথায় তাও বুঝতে বা বোঝাতে সক্ষম হন নি; ফলে সৃষ্টি হয়েছে সন্ত্রাসবাদ। জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রাখার ফলেই জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি পাকাপোক্ত হয় নি। অবশ্য গান্ধী জনসাধারণের ওপর অনেকটা আস্থাশীল ছিলেন। বিপান চন্দ্রের মতে এই সাধারণ মানুষদের কখনোই রাজনৈতিক দিক থেকে সংগঠিত করা হয় নি। রাজনীতির ব্যাপারটাই ছিল সাধারণত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে 'গান্ধীযুগে আন্দোলনের সামাজিক ভিত্তি পুঁজিপতি শ্রেণী পর্যন্ত' সম্প্রসারিত ছিল। গান্ধীর চিন্তা ও কর্মধারা কৃষককেন্দ্রিক—এ ধরনের মতের সঙ্গে বিপান চন্দ্র মোটেই একমত হতে পারেন নি। তাঁর প্রশ্রয়ে এ দেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর উত্থান কোনো অরাজনৈতিক ব্যাপার নয়। এ বিষয়টি নিপুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে 'ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদ : ১৯৪৭ সালের আগে' এবং 'জওহরলাল নেহরু ও পুঁজিপতি শ্রেণী : ১৯৩৬ সাল' প্রবন্ধ দুটিতে। গান্ধী কিভাবে ভারতীয় পুঁজিপতিদের কাছে আত্মসমর্পণ করছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাদেরই প্রতিনিধি হয়ে উঠছিলেন তা এই প্রবন্ধ দুটিতে বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। এদিকে জওহরলাল ১৯৩৩-৩৬ সালে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মার্কসবাদী বিপ্লবী হয়ে উঠেছিলেন।' তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হন। তীব্র সমালোচনা করে তিনি 'গান্ধীযুগে অক্ষুণ্ণ থাকা বুর্জোয়া রাজনৈতিক মতাদর্শগত আধিপত্যকে ক্রমশঃ দুর্বল করে তোলেন।' এতে গান্ধীও স্বয়ং কিছুটা অস্বস্তিতে পড়েন। অবশ্য ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী আস্তে-আস্তে নেহরুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের অবসান, ক্রমশ আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বিষয়গুলি খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বিপান চন্দ্র। আবার "আধুনিক ভারত ও সাম্রাজ্যবাদ" প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই দেখিয়েছেন যে নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে মনোযোগী। শুধু তাই নয়, বামপন্থীদের দুর্বলতাও যে 'পুঁজিবাদকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে' সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

"৯২০র দশকে উত্তর-ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী : আদর্শগত বিকাশ" প্রবন্ধে কমিউনিস্টদের সঙ্গে কানপুর, এলাহাবাদ ও পানজাবের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা একই সঙ্গে আন্দোলনে যোগদান করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব পড়েছে তাদের ওপর। বিপ্লব সংক্রান্ত বইপত্র সংগ্রহ, পাঠ এবং পাঠচক্রের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়। তাঁদের মনে আসে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চিন্তা। অথচ সঠিক নেতৃত্বের অভাবের ফলে সঠিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠতে পারল না। নেতৃত্বের বিচ্যুতি সম্পর্কে লেখক এই প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করেছেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়ে বিপান চন্দ্র এই বইতে নিরপেক্ষ আলোচনার অবতারণা করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। '১৮৮০-র দশক থেকেই জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার চেষ্টা চলছিল।' এই প্রচেষ্টা বিভেদকামী রাজনীতির জন্ম দেয়। অবশ্য সেই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবিত্ত মুসলমান নেতাদের তোষণ করার অলিখিত নীতি গৃহীত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উচ্চবিত্ত নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক দরকষাকষি ও স্বার্থ-সংঘাতে পিষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষ, বলি হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার। জনসাধারণকে দূরে সরিয়ে রেখে সাম্প্রদায়িক নেতাদের গুরুত্ব দেওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আবুল কালাম আজাদ বা আসফ আলির মতো কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে চেষ্টা চালিয়ে যান। বামপন্থী আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা কিছুটা দূর হয়। জনসাধারণ আন্দোলনের শামিল হয়, এবং সাম্প্রদায়িক নেতারা কিছুটা পিছু হটতে বাধ্য হন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের দাপটের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পর্যুদস্ত হয়ে সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী সমস্যাকে বাড়িয়েই তুলেছিল। বিপান চন্দ্র "ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা" প্রবন্ধের সিদ্ধান্তে যথার্থই বলেছেন, 'র‍্যাডিক্যাল পথেই হোক আর রক্ষণশীল পথেই হোক, সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কাঠামোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সমাধান ছিল না। একমাত্র শক্তিশালী বামপন্থী ও গণভিত্তিক রাজনীতিই এর সমাধান করতে পারত।'

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাবুশ্রেণীভুক্ত নরমপন্থী, তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে মোটেই ভীতিকর ছিলেন না, বরং সন্ত্রাসবাদী বা চরমপন্থীরাই তাঁদের আতঙ্কিত করে তুলেছিলেন। ফলে সরকার এঁদের ওপর কঠোর দমননীতি চালাতে বাধ্য হন।

এই জাতীয়তাবাদের কণ্ঠরোধ করা তাঁরা প্রয়োজনীয় মনে করেছেন ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। বিপান চন্দ্র তাঁর প্রবন্ধগুলিতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতাদর্শের ভিত্তিতে বিষয়টি আলোচনা করেছেন।

বর্তমান বইটি আধুনিক ভারত-ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নেই। বইটির বাঙলা অনুবাদ প্রকা করে প্রকাশক বাঙালি পাঠকদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন অনুবাদের ভাষা আরও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদিত হ বইটি সুখপাঠ্য হত।

মতামত

১

প্রসঙ্গ : সাহিত্যসাধকচরিতমালা

"চতুরঙ্গ" অকটোবর, ১৯৮৮ সংখ্যায় গ্রন্থসমালোচনা অংশে "দুই বঙ্গের জীবনীচর্চা" শিরোনামে নয়খানি গ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বলা হয়েছে 'প্রত্যেকটিরই প্রকাশক বাংলা একাডেমী।' এই একাডেমী বাংলাদেশের। সাড়ে সাত পাতার এই আলোচনায় তিন পাতা জুড়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমালোচনা করা হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মুসলিম সাহিত্যসাধকগণের চরিত রচনায় অনাগ্রহী, এটাই সমালোচকের বক্তব্য। তার জন্য তিনটি পাতা লেখার পর তিনি লিখলেন, 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হচ্ছে বলে অনেকে মনে করতে পারেন।' আমরা মনে করি তাই। তাঁর অভিযোগ কয়েকটি বাক্যেই শেষ করা যেত বলে আমাদের ধারণা।

এ পর্যন্ত ১৩৪খানি সাহিত্যসাধক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ-র সাহিত্য-সাধক রচনাকালে 'তৎকালীন সম্পাদক জল ঘোলা' করেন নি, বরং উৎসাহী হয়ে সেটি প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন। তবে পাণ্ডুলিপিটিকে প্রকাশযোগ্য করে তোলার জন্য প্রকাশে কিছু বিলম্ব ঘটেছিল। সাহিত্য অকাদেমী এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যৌথ উদ্যোগে ড. শহীদুল্লাহ-র জন্ম-শতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছিল পরিষৎ-মন্দিরে। জসীমউদ্দীন ও আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের সাহিত্যসাধক রচনার দায়িত্ব যথাক্রমে বর্তমান পত্রলেখক এবং ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়কে দেওয়া আছে। নজরুলের সাহিত্যসাধক লিখেছেন ড. সুশীলকুমার গুপ্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধক রচনার দায়িত্ব অর্পিত আছে পরিষদের বর্তমান সভাপতি জগদীশ ভট্টাচার্যের ওপর। বহুকাল পর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ দশ বছর আগে বাঙলা ভাষার শতাধিক সাহিত্যসাধকের চরিত রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আর্থিক কারণে ও লেখকগণের ঔদাসীন্যে তা প্রত্যাশিতভাবে এগোচ্ছে না। সমালোচক যেসব সাহিত্যসাধকের উল্লেখ করেছেন তাঁদের বিষয়ে সাহিত্য-সাধক চরিত রচনার জন্য বর্তমান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী
[প্রাক্তন সহ-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ]

২

'প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার'

"চতুরঙ্গ" পত্রিকার অগস্ট ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত ড. ভবতোষ দত্তের "প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার" লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছি।

আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ড. দত্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারকে যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা সত্যি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে যুক্ত দেশের অগ্রগতি—প্রাথমিক শিক্ষা বিনা 'দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে' দেশের কোনো বিকাশই সম্ভব নয়।

মৃত্যুর এক বছর আগে মহামতি লেনিন রাশিয়ায় ব্যাপক অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে শিক্ষার বিস্তারকে অগ্রাধিকার দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর লেখার একটি অংশ এইরকম : ...We shall have to cut down the expenditure of government departments other than the People's Commissariat of Education, and the sums thus released should be assigned for the latter's needs...

Pages From a Diary, Jan 4 1923,
Selected Works, vol 3, 1977.

সুনীল সেন

৩

"সাহিত্যের পরিচয় : ভাষা, দেশ না আবেগে ?"

সেপটেমবর ১৯৮৮-র "চতুরঙ্গে" শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ "সাহিত্যের পরিচয় : ভাষা, দেশ না আবেগে ?" পাঠ করে একটি প্রশ্ন জেগেছে মনে। শুভেন্দুবাবু প্রবন্ধটির

এক জায়গায় লিখছেন, ইংরেজি সাহিত্য অর্থে ইংরেজের লিখিত সাহিত্য নয়। তাঁর এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজ নয় এমন ইংরেজি ভাষার কিছু লেখকের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন লেখকও বর্তমান। কেউ মারকিনি, কেউ-বা অন্যদেশবাসী। এবং সম্ভবত এই কারণেই ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত লেখকরা বা তদ্‌জাতীয়রা ইংরেজি সাহিত্যের লেখকরূপে গণ্য হবেন না।

উদাহরণস্বরূপ, প্রবন্ধলেখক আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের ও আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৭-এ ভারতবিভাগের পর থেকে প্রথম পূর্ব-পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাটিকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে আর গণ্ডিবদ্ধ করা যাবে না। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে উঠেছে। যে অস্তিত্ব ভাষানির্ভর না হয়ে দেশনির্ভর হতে পারে। শুভেন্দুবাবুর এই মতামত অগ্রাহ্য করার নয়। কারণ, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আধুনিক বাঙলা কবিতার সঙ্কলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠিত কবরাও অনুপস্থিত। যেমন অনুপস্থিত পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত দেশবিভাগপরবর্তী আধুনিক বাঙলা কবিতার সঙ্কলনে পূর্ব-পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশের সব খ্যাতিমান আধুনিক কবির নাম। "দুই বঙ্গের কবি" শিরোনামে (শামসুর রহমান ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) সদ্যঃপ্রকাশিত পুস্তকটিও ভাষাগত সান্নিধ্য সত্ত্বেও দেশগত বিভেদের কথাই পরিস্ফুট করে—আর-একবার প্রমাণ করে শুভেন্দুবাবুর বক্তব্যের যথার্থতা। কিন্তু এর বিপরীত নজিরও আমরা দেখতে পাই—যেখানে শুভেন্দুবাবুর বক্তব্যের যথাযথ সমর্থন মেলে না। দেশটি অবশ্য আমাদের প্রতিবেশী কোনো দেশ নয়। সেটি প্রায় আক্ষরিক অর্থে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের দেশ ইংল্যানড। ইংল্যানডের অধিবাসীরাই ইংলিশম্যান। যার বাঙলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় ইংরেজ। এবার ইংরেজের রচিত সাহিত্যই ইংরেজি সাহিত্য বললেও তার সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু সে কথা লেখা নেই। লেখা নেই অর্থে, এমন সব ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকারের নাম সেই দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হতে দেখি যাঁরা কোনো-কালে ইংলিশম্যান বা ইংরেজ ছিলেন না, হবেনও না। তাঁরা তাঁদের রচনাশৈলীর গুণগত মর্যাদায়ও একটি ভিন্নতর দেশ আর জাতির প্রতিভূ, সেই সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যেরও প্রতিনিধিস্থানীয়। অথচ ইংল্যাণ্ডের নিকট প্রতিবেশী, একদা যার সমগ্র ভূখণ্ড ছিল ইংরেজ শাসনাধীনে, বর্তমানে যার একটি অঞ্চল মুক্ত, অপর অঞ্চলটি মুক্তির জন্য লড়াই করে চলেছে। ইংল্যানড থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানচিত্র যার—ইউরোপের সেই ভূখণ্ডটির নাম আয়ারল্যানড। তার অধিবাসী কবি, নাটকের আর ঔপন্যাসিকদের নাম ইংরাজি সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে বরাবর উল্লিখিত হয়ে আসছে। অসকার ওয়াইলড: ডব্লু. বি. ইয়েটস, বার্নার্ড শ প্রমুখেরা ইংরেজ না হয়েও ইংরাজি সাহিত্যের লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন চিরকাল।

অশোক মৈত্র

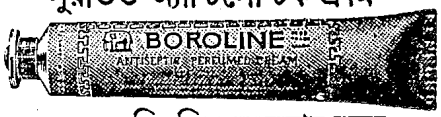
রোজই দেখি দাড়ি কামানোর শেষে চড়চড়ে
মুখ, মাঝে মাঝে টুকটাক কেটে যাওয়ার দাগ।
রোজই ভাবি—ভাগ্যিস্ বোরোলীন আছে।

রোজ সকালের সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরোলীন

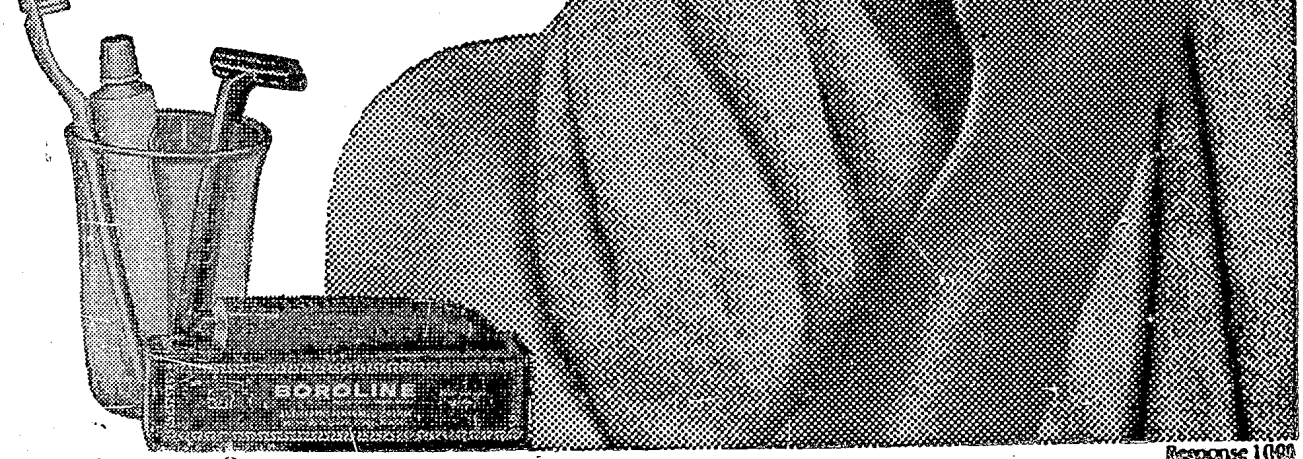
সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম



ত্বকের নিয়মিত সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম



জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩

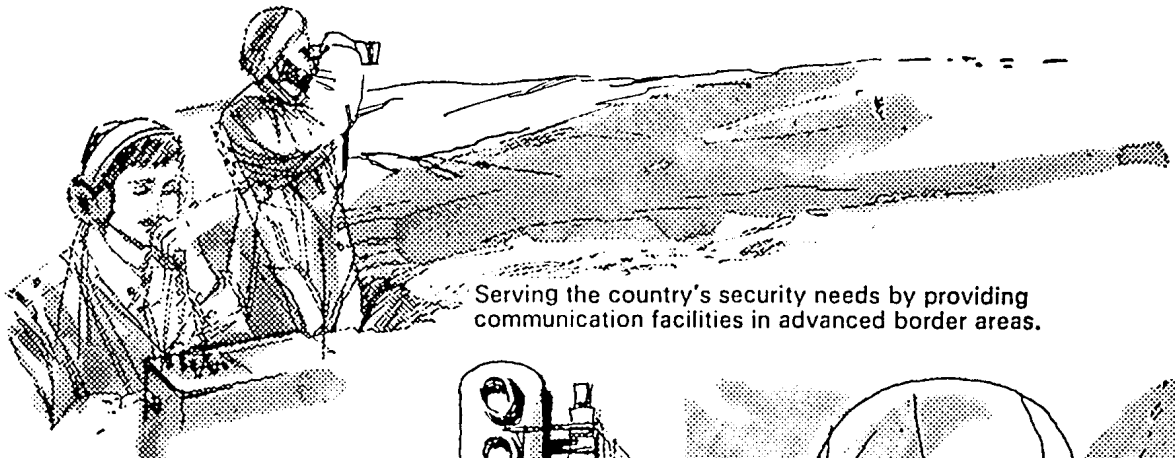


এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়।

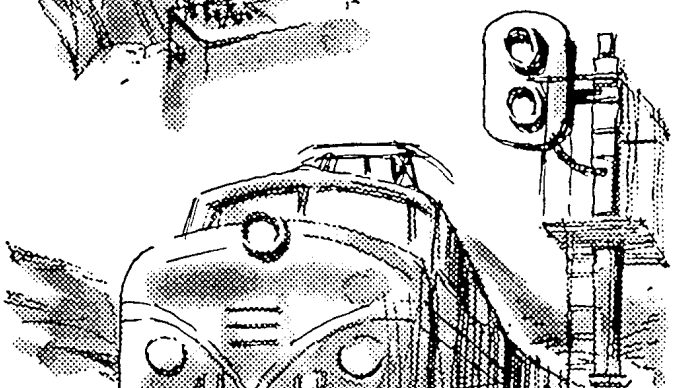
Response 1(90)

Postal Regd. No. WB/CC-435 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57 প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা

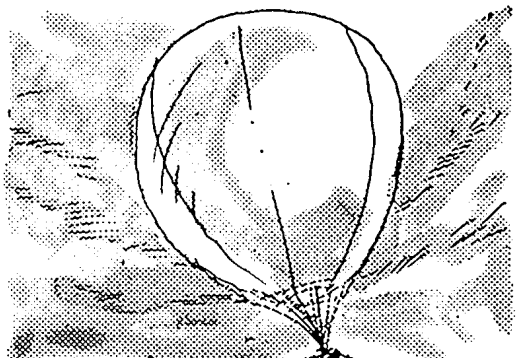
Contributing to vital national needs: Union Carbide.



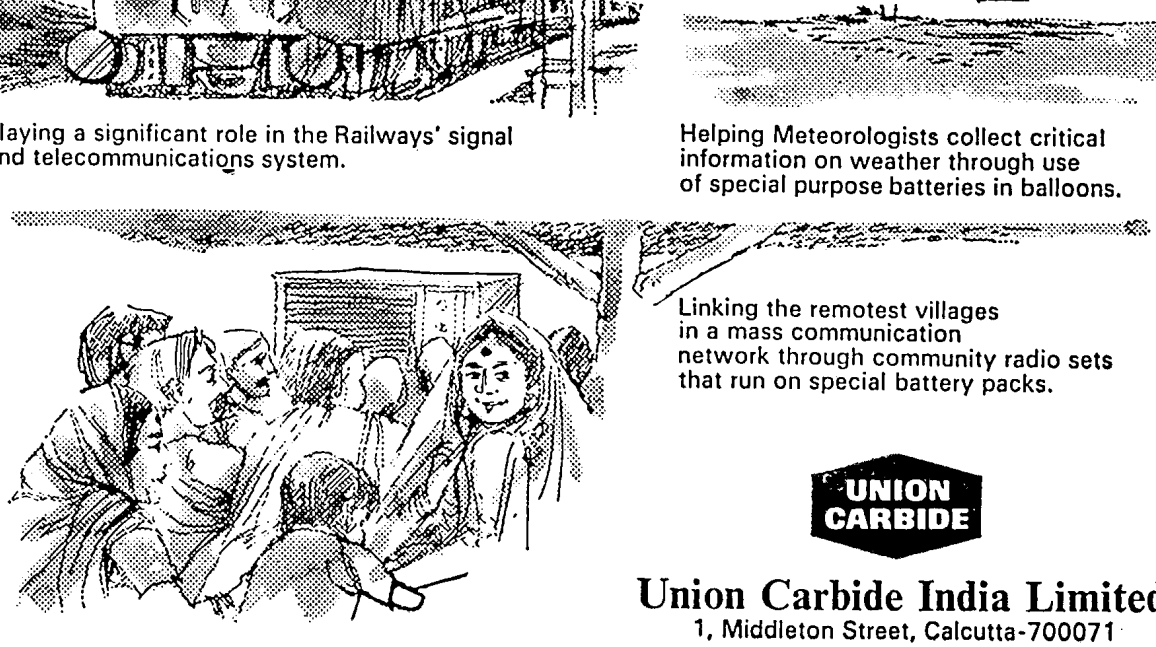
Serving the country's security needs by providing communication facilities in advanced border areas.



Playing a significant role in the Railways' signal and telecommunications system.



Helping Meteorologists collect critical information on weather through use of special purpose batteries in balloons.



Linking the remotest villages in a mass communication network through community radio sets that run on special battery packs.

UNION CARBIDE

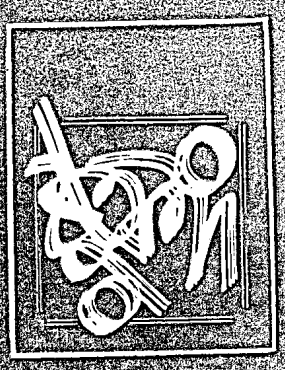
Union Carbide India Limited
1, Middleton Street, Calcutta-700071

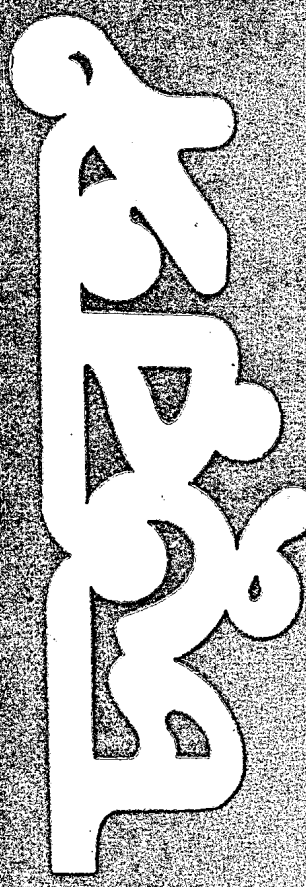
UCIL 660/80

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ডিসেমবর ১৯৮৮





আধুনিক বহুমাত্রিক সমস্যায় উৎপীড়িত সংবেদনশীল মানুষের জীবনে ধর্মবিশ্বাস আর যুক্তিবাদিতার ভূমিকা নিয়ে অধ্যাপক অম্লান দত্ত'র নিবন্ধ "ধর্ম ও যুক্তি"।

"দিকু" মহাজনদের অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সাঁওতালরা কিভাবে "রাজ"-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হল? "সাঁওতাল বিদ্রোহ" সংগঠনে ধর্মবিশ্বাসের ভূমিকা কী? অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর ধারাবাহিক নিবন্ধের বিষয়বস্তু এবার এটাই।

জন্মশতবর্ষে নেহরুর সমাজবাদের ধারণা এবং তাঁর পাঁচশালা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রূপায়ণপদ্ধতির মূল্যায়ন করেছেন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রাখাল দত্ত।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের আত্মিক সংকটের এক মর্মস্পর্শী ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন হায়াৎ মামুদ তাঁর "বাঙলা সাহিত্য ও অন্যদিগন্ত: বাংলাদেশী প্রাসঙ্গিকতা" নামের অন্তর্ভেদী রচনায়।

সাম্প্রদায়িকতা আর সংবিধান নিয়ে অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের এবং আমলাতন্ত্রের প্রহসন নিয়ে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থসমালোচনাভিত্তিক আলোচনা।

গৌরী আইয়ুবের ভিন্ন স্বাদের গল্প "কবন্ধ"।

"বিষয়: ব্রহ্মদেশ"-এর এবারের প্রসঙ্গ ব্রহ্মদেশে মিশনারি।

With best compliments of:

MINE SAFETY APPLIANCES LIMITED

P-25, TRANSPORT DEPOT ROAD
CALCUTTA-700 088

Phones : 49-1707/45-9773/49-1657/45-6904

Telex : 021-8066 MSAI IN

Cable : MINSAF, Calcutta

With Best Compliments from :

BENFED THE FARMER's FRIEND

BENFED is a familiar name among the farmers of West Bengal. Through its hundreds of Primary Co-operative Societies and 14 District Offices, BENFED comes closer to the farmers to fulfil their needs.

SOME OF BENFED's BUSINESS ACTIVITIES ARE :

* Distribution of Chemical fertilisers, quality seeds and pesticides.
* Distribution of Pumpsets and Shallow Tubewell Accessories.
* Marketing of Raw Jute & Jute Products.
* Marketing of Vegetables, Pulses, Spices and other Agricultural products.
* Owner of the only Modern Rrice Mill in West Bengal.

The West Bengal State Co-operative Marketing Federation Limited (BENFED)

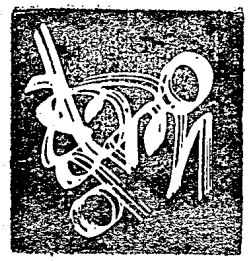
Regd. Office :
6, GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA-700 013

Business Office :
18, RABINDRA SARANI (PODDAR COURT)
(Gate No. 3 & 4, 7th Floor)
CALCUTTA-700 001

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থ,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
এই জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

মীরা





বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ৮
ডিসেমবর ১৯৮৮
অগ্রহায়ণ ১৩৯৫

ধর্ম ও যুক্তি অম্লান দত্ত ৬৫৩

নেহরু, সমাজবাদ ও পরিকল্পিত অর্থনীতি রাখাল দত্ত ৬৬৫

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৬৮৫

বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৬৯৭

বাঙলা সাহিত্য ও অন্য দিগন্ত : বাংলাদেশী প্রাসঙ্গিকতা হায়াৎ মামুদ ৭১০

জলদাপাড়াতে হরপ্রসাদ মিত্র ৬৭২

বিভাজন শীত আবুবকর সিদ্দিক ৬৭৩

সিন্দুক খুলে রত্নাংশু বর্গী ৬৭৪

পায়ের শব্দে গৌতম হাজরা ৬৭৫

কবন্ধ গৌরী আইয়ুব ৬৭৬

গ্রন্থসমালোচনা ৭২৩
অমলকুমার মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সনাতন মিত্র,
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিতর্ক ৭৩৪
সৈয়দ সামসুল আলম সাঈদ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মতামত ৭৪২
অনিলচন্দ্র সাহা, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, আজহারউদ্দীন খান

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

North India Wires Limited

"Regent House"

12, Government Place East, Calcutta-700 069

Phone : 22-1123, 22-1373
23-6007

Telex : 021-3496 NIWL IN
Gram : PURMO

Manufacturers of Quality Bright Bars & Shaftings in the widest range, with high dimensional accuracy and excellent finish from the latest imported plant by Cold Draw Process, Centreless Turning or Centreless Grinding. Available in Mild Steel, Stainless Steel and other varieties of Tools & Alloy Steel including ENIA Leaded and Non-Leaded.

সংসদের বই

সংসদ-এর সাহিত্য-সংস্কৃতি গ্রন্থমালা সংগ্রহে রাখার মত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী রচিত

- **রাজনীতি** ১৫·০০

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

- **বৈষ্ণব পদাবলী** ৭৫·০০
- **রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত** ৩০·০০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত

- **ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য** ৩৭·০০

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত

- **তন্ত্রের কথা** ১০·০০
- **উপনিষদের কথা** ১০·০০

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

- **উপনিষদের দর্শন** ২০·০০
- **ঠাকুরবাড়ির কথা** ২৫·০০
- **The Challenge to India** ৪৫·০০

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত

- **তে হি নো দিবসাঃ** ৪০·০০
- **Keats : From Theory to Poetry** ৩০·০০
- **Swami Vivekananda and Indian Nationalism** ৪৫·০০
- **India Wrests Freedom** ৭০·০০

অমিতা চক্রবর্তী রচিত

- **সংস্কৃত নাটকের গল্প** ১০·০০

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ কলিকাতা-৯

অনীক : পঁচিশ বছর

অনীক-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দু'টি বিশেষ সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডটি হবে গত পঁচিশ বছরে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ওপর বাছাই-করা প্রবন্ধের সংকলন। দ্বিতীয় খণ্ডটি হবে সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক থেকে নকশাল-পন্থী রাজনীতির মাসিক পত্রিকায় 'অনীক'-এর রূপান্তর এবং এর মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনীতি প্রসঙ্গে চিন্তা-ভাবনার বিকাশ ও উত্তরণের স্মারকগ্রন্থ।

দু'টি খণ্ডের মোট দাম হবে ৬০ টাকা।

৩১শে জানুয়ারী '৮৯-এর মধ্যে টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে মোট দাম পড়বে ৪০ টাকা। সডাক ৪৫ টাকা।

যোগাযোগ ও টাকা পাঠাবার ঠিকানা :
অনীক ॥ ইন্দ্রপ্রস্থ
খাগড়া-৭৪২১০৩ । মুর্শিদাবাদ

কলিকাতা গ্রাহক কেন্দ্র :
পিপলস্ বুক সোসাইটি ॥ ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট । কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

অনীক : ইন্দ্রপ্রস্থ
খাগড়া-৭৪২১০৩ । মুর্শিদাবাদ

কলিকাতা অফিস :
১৫০, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

New History Books

D. A. LOW, *ed.*
The Indian National Congress
Centenary Hindsights Rs 180

OM PRAKASH
The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630-1720 Rs 150

R. J. MOORE
Endgames of Empire
Studies of Britain's Indian Problem Rs 140

R. F. GOMBRICH, *ed.*
Oxford University Papers on India
Vol. 2, Part 1 : Indian Ritual and its Exgesis Rs 125

S. J. M. STEIN
The Earthy Soil
Bombay Peasants and the Indian Nationalist Movement 1919-1947 Rs 125

S. WEINTRAUB
A Stillness Heard Round the World
The End of the Great War : November 1918 £ 5.95

H. TREVOR-ROPER
Hitler's Table-Talk
Hitler's Conversation Recorded by Martin Bormann £ 6.95

ANDRZEJ WALICKI
A History of Russian Thought
From the Enlightement to Marxism £ 14.95

MAJID KHADDURI
The Gulf War
The Origins and Implications of the Iraq-Iran Conflict $ 24.95

OXFORD UNIVERSITY PRESS
Faraday House
P-17 Mission Row Extension
Calcutta 700 013

সংসদ প্রকাশিত ধ্রুপদী রচনাবলী

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত

- **বঙ্কিম রচনাবলী** দু' খণ্ডে প্রকাশিত।
  (১ম খণ্ড—৪০·০০ ; ২য় খণ্ড—৫০·০০)
- **রমেশ রচনাবলী**—ছ'টি উপন্যাস (২৫·০০)

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

- **মধুসূদন রচনাবলী** (৩৭·৫০)
- **দীনবন্ধু রচনালী** (২৫·০০)

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

- **দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী** দু'খণ্ডে প্রকাশিত।
  (১ম খণ্ড—৪০·০০ ; ২য় খণ্ড—৪৫·০০)
- **গিরিশ রচনাবলী**—১ (২৫·০০)

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

- **গিরিশ রচনাবলী,** ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম।
  (২য় খণ্ড—৪৫·০০ ; ৩, ৪, ৫—যন্ত্রস্থ)

অধ্যক্ষ জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

- **তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ**—তিন খণ্ড
  (প্রতি খণ্ড ৫০·০০)

ডঃ অশোক রায় সম্পাদিত

- **সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ** (১০০·০০)

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত

- **বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র**
  (কিশোর সংস্করণ) (২৫·০০)

সাহিত্য সংসদ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃ কলিকাতা-৯

ধর্ম ও যুক্তি

অম্লান দত্ত

ক

ধর্ম এবং যুক্তির ভিতর একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। কখনো এরা সমন্বয়ে পৌঁছয়, কখনো নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর একটা বাইরের রূপ আছে, একটা ভিতরের রূপ। সংসারে কিছু মানুষ ধর্মবিশ্বাসী, কেউ বা ধর্মকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এটা বিভেদের বাহ্যরূপ। মনের মধ্যে ধর্মবিশ্বাস ও যুক্তিবাদের যে বিতর্ক দেখা দেয়, সংশয়ের ঝড় ওঠে, সেটা বাইরের রূপ। কারো ক্ষেত্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস জয়ী হয়েছে, কেউ হন নিরীশ্বরবাদী। দুটোই বিশ্বাসের এপিঠ-ওপিঠ। কিন্তু বিশ্বাসেরই নয়, দ্বন্দ্বেরও মূল্য আছে। মনের ভেতর যে সংশয় আমাদের অস্থির করে, তারও নিজস্ব মহত্ত্ব আছে। যাঁরা চিন্তাশীল ও সূক্ষ্ম-চেতনাসম্পন্ন, তাঁদের অনেকেরই মানসলোক একটা তীব্র দ্বন্দ্বের দ্বারা সমৃদ্ধ। বিশ্বাস ও সংশয় দুয়েরই মূল্য আছে। এদের কী করে মেলানো যায়, সেটাই সমস্যা।

বিষয়টা স্পষ্ট করবার জন্য দুয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। বের্ট্র্যাণ্ড রাসেল এ-যুগের একজন প্রখ্যাত নাস্তিক বলে পরিচিত। কিন্তু কী গভীর বেদনায়, কত তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে, সেই নাস্তিক্য বিধৃত, আমরা অনেকেই সে-কথা মনে রাখি না। ১৯১৬ সালের ২৩শে অকটোবরের একান্ত ব্যক্তিগত একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—'The centre of me is always and eternally a terrible pain···a searching for something beyond what the world contains, something transfigured and infinite —the beatific vision—God. I do not find it, I do not think it is to be found···' ঈশ্বরের অনস্তিত্বের এই ঘোষণা এমন আর্তনাদের ভাষায় এখানে ধ্বনিত হয়েছে যে, সিদ্ধান্তের চেয়েও তার পিছনে যে-বেদনা আছে সেটাই স্মরণীয় হয়ে উঠেছে। এ কোনো আত্মসন্তুষ্ট নিরীশ্বর-বাদ নয়। আবার নিশ্চিত নিঃসংশয় ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের মন্দিরভাষণ থেকে কয়েকটি বাক্য শোনা যাক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভালো। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে, তার হাত থেকে যেন মুক্তিলাভ করি।' রাসেল অথবা রবীন্দ্রনাথ, কে কখন কোন্ সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, সেটাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতামালার প্রথমাংশ।

ঘটনা নয়। চেতনার ভিতরে যে দ্বন্দ্ব তাঁরা আজীবন বহন করেছেন, তার তাৎপর্য গভীর। সিদ্ধান্তের চেয়েও জিজ্ঞাসার গুরুত্ব বেশি, প্রশ্নই চেতনাকে দেয় গতি। প্রশ্নের গভীরতায় বিশ্বাসও গভীরতা পায়।

ধর্ম ও যুক্তির ভিতর যে দ্বন্দ্ব তার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এরপর উল্লেখ করা প্রয়োজন। দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে ধর্ম ও যুক্তি দুয়েরই চরিত্রের পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কোনোটিরই বিনাশের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। দ্বন্দ্ব দুই রকমের হয়। একরকমের দ্বন্দ্ব বিনাশাত্মক; অর্থাৎ একপক্ষের সম্পূর্ণ বিনাশই সেখানে লক্ষ্য। আরো একরকমের দ্বন্দ্ব আছে। সেখানে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে দুই পক্ষের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু কোনো পক্ষই বিনষ্ট হয় না। বরং দুই পক্ষই সম্ভবত দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে সমৃদ্ধ হয়। এই রকমের দ্বন্দ্বকে বলা যেতে পারে সমন্বয়মুখী। কোনো বিশেষ দ্বন্দ্বকে আমরা কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি সেটা জরুরি প্রশ্ন। কারণ সমগ্র দৃশ্যপটই দৃষ্টিকোণের ওপর নির্ভর করছে।

সম্প্রতি কম্যুনিস্ট-শাসিত সমাজেও ধর্মের প্রতি নতুন করে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। পৃথিবী থেকে ধর্ম-বিশ্বাসীরা দূর হয়ে যাবেন, এমন ধরনের নাস্তিক্যের স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবার বাস্তব সম্ভাবনা নেই। যুক্তি-বাদীরাও থেকেই যাবেন। এঁদের সবাইকে পাশাপাশি বাস করতে হবে। সহাবস্থান যেখানে অনিবার্য সেখানে পরস্পরকে বুঝবার একটা ঐকান্তিক প্রয়াস বাঞ্ছনীয়, এমনকি আবশ্যক। শ্রদ্ধাহীন সহবাসের মতো বিড়ম্বনা কমই আছে।

ধর্মের যাঁরা মিত্র তাঁরা নিশ্চিতভাবে যুক্তির শত্রু, এই রকমের কোনো প্রত্যয় থেকে আলোচনা শুরু করা অন্যায় হবে। যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী, তাঁরা সবাই যুক্তিবিরোধী নন। অনেকেই যুক্তির প্রয়োজন মানেন। অন্তত যুক্তির প্রতি একটা উভয়বলতা, একই সঙ্গে মান্যতা ও সাবধানতা, তাঁদের ভিতর উল্লেখযোগ্য-ভাবে দেখা যায়। এই ব্যাপারটা একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করা দরকার।

রাজা রামমোহন রায় ধর্মবিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁকে কোনোমতেই যুক্তিবিরোধী বলা যায় না। বরং যুক্তিবিচারের একটা ধারা তাঁর চিন্তায় ও কর্মে প্রত্যক্ষ। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ববিষয়ে আলোচনায় যুক্তির সুর সুস্পষ্ট। তাঁর সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ বর্জন যাই করি না কেন, একথা মেনে নিতে হয় যে, বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যে এমন যুক্তিধর্মী লেখা বেশি দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভিতরও একটা স্পষ্ট যুক্তিবাদী প্রত্যয় লক্ষণীয়, এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

এইমাত্র যে উভয়বলতার উল্লেখ করা হয়েছে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দ। 'রাজযোগ' নিয়ে আলোচনায় বিবেকানন্দ বলেছেন—'We find one fact held in common by all the great teachers of religion the world ever had. They all claim to have got their truths from beyond···The Yogi teaches that the mind itself has a higher state of existence, beyond reason, a superconscious state, and when the mind gets to that higher state, then this knowledge, beyond reasoning, comes to man.' অর্থাৎ চেতনার একটা স্তর আছে, যেটা যুক্তিকে অতিক্রম করা যায়। ধর্মের সত্য বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সেই স্তর থেকেই লাভ করা যায়। তবে কি মেনে নিতে হবে যে, যুক্তিবিচারের অধিকারের বাইরে ধর্মের প্রতিষ্ঠা? বিবেকানন্দ কিন্তু সেকথাও বলছেন না। বরং আশ্চর্য এক বিপরীত উক্তি আমরা তাঁর মুখে শুনি। 'যুক্তি ও ধর্ম' (Reason and Religion) এই নামে ইংল্যানডে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: 'Is religion to justify itself by the discoveries of reason, through which every other science justifies itself? Are

the same methods of investigation, which we apply to sciences and knowledge outside, to be applied to the science of Religion? In my opinion this must be so, and I am also of the opinion that the sooner it is done the better. If a religion is destroyed by such investigations it was then all the time useless, unworthy superstition; and the sooner it goes the better···All that is dross will be taken off, no doubt, but the essential parts of religion will emerge triumphant out of this investigation.'—উপরের উদ্ধৃত দুটি উক্তি কি পরস্পরবিরোধী? নাকি দুইয়ের ভিতর সামঞ্জস্য সম্ভব? সেই আলোচনায় পরে অগ্রসর হওয়া যাবে, আপাতত একটি কথাই বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে। বিবেকানন্দ বলেছেন যুক্তিকে ত্যাগ করা চলবে না। যুক্তির আলোতে ধর্মেরও বিচার চাই। সেই বিচারের ভিতর দিয়ে ধর্ম শুদ্ধ হয়ে উঠবে, যা-কিছু কেবলই কুসংস্কার, তা সবই পরিত্যক্ত হবে। এমনই হওয়া আবশ্যক। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন—'বেদের যতখানি অংশ যুক্তিসিদ্ধ, আমি ব্যক্তিগতভাবে ততখানি গ্রহণ করি।'

অতএব রামমোহন থেকে শুরু করে গত শতকের ধর্মজিজ্ঞাসার ধারায় যুক্তির প্রয়োজন বারবার স্বীকৃত হয়েছে। এমন কারো মনে হতে পারে যে, পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদের সঙ্গে রফা করবার জন্য এদেশের উনিশ-শতকী ধর্মসংস্কারকরা যুক্তিকে এক অনিচ্ছুক স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু একথা বললে রামমোহনের মতো মানুষের প্রতি অবিচার করা হয়। কোনো এক আন্তরিক প্রেরণা থেকেই এঁরা ধর্ম ও যুক্তির ভিতর সামঞ্জস্যস্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া, এই প্রেরণা একান্তভাবে আধুনিক, এমন বলা যাবে না। রামমোহন প্রাচীন শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, পুরনো ঐতিহ্যেও এই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। প্রাচীনেরা বলেছেন, কেবল শাস্ত্রকে আশ্রয় করে অন্ধভাবে কোনো বিনিশ্চয়ে উপনীত হওয়া কর্তব্য নয়; যুক্তিহীন বিচারে সত্যলাভ হয় না; বরং ধর্মহানি ঘটে। বুদ্ধি ও বিচারকে ত্যাগ করে বিবেক গঠিত হতে পারে না। এই প্রত্যয় বুদ্ধ, বৃহস্পতি কিংবা আদি শঙ্করের মতো প্রাচীনদের বাণীতে বারবার বহুরূপে ধ্বনিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক প্রেরণার ভিতরই কোথাও এর স্থান আছে, এ-কথা মেনে নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হওয়া ভালো।

অর্থাৎ ধর্ম ও যুক্তিকে অনড়ভাবে দুই বিপরীত শিবিরে স্থাপন করে একরকমের অন্ধ ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু সার্থক আলোচনার তাতে সম্ভাবনা অল্প। যদিও এই দুয়ের পার্থক্য স্বীকার্য, মতের সম্পূর্ণ ঐক্য যদিও আশা করা যায় না, তবু ধর্ম ও যুক্তির ভিতর সংলাপের প্রয়োজন আছে। এদের সংলাপ ফলপ্রসূ হতে পারে, এই বিশ্বাস অমূলক নয়। সব সার্থক আলোচনারই ন্যূনতম শর্ত হল, নিজের প্রতি বিশ্বস্ততা আর অপরের প্রতি সামান্য সহানুভূতি।

সহানুভূতির সঙ্গে স্বানুভূতির বিরোধ নেই। এদের যোগ ছিন্ন হলে ব্যক্তির উচ্চারণে সততা থাকে না। ধর্ম নিয়ে কথা বলতে গেলে আর্ষবাক্য যতই সহায়ক হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত নিজের উপলব্ধির প্রতি বিশ্বস্ততার বিকল্প নেই। আমারই চিন্তা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অনিবার্যভাবে সীমাবদ্ধ এই আলোচনা, সেই সীমা অতিক্রম করবার অধিকার আমার নেই। ভূমিকায় এই স্বীকারোক্তি করে নেওয়া সঙ্গত।

খ

বিশ্বের কয়েকটি প্রধান ও বহু আলোচিত ধর্মে ঈশ্বর থেকে শুরু হয় ধর্মের কথা। আদিতে ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, বাইবেলের আরম্ভেই পাই

এই বাক্য। আল্লার নাম নিয়ে উচ্চারিত হয়েছে কোরানের বাণী। ঈশ্বর ছাড়া ধর্মের ভিত্তি নেই। যাঁদের এই ধারণা তাঁদের কাছে নাস্তিক, অধার্মিক, নিরীশ্বরবাদী, এইসব শব্দ সমার্থক। অন্য রকমের প্রত্যয়ের ওপরও ধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, সে কথায় পরে যাব।

যুক্তি অথবা দার্শনিক বিচার দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত করবার চেষ্টা বহুদিন থেকেই চলেছে। আমরা সেই ইতিহাসে ঢুকব না। আঠারো শতকে ইউরোপে যখন যুক্তিবাদের জোয়ার এল, সেই সময়কার একটু উল্লেখ তবু আবশ্যক। সে সময়ে পাশ্চাত্যদেশে যুক্তি ও ঈশ্বরচিন্তার ভিতর সমন্বয়-সাধনের এক তাৎপর্যময় প্রয়াস দেখা যায়, বাঙলা-দেশের প্রাগ্রসর ধর্মচিন্তায় উনিশ শতকে যার প্রভাব এসে পৌঁছেছিল।

সতেরো শতক থেকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অগ্রগতি দ্রুত হয়ে উঠল আর তারই সঙ্গে যোগ নতুন যুক্তি-বাদের। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়মে বাঁধা। সবকিছুই চলমান আর বিশ্বের অংশস্বরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কিছুই নিয়মের বাইরে চলে না। সৌরমণ্ডলের সূর্যসহ পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ যে পরস্পর সম্পর্কে যুক্ত, এই যোগের সূত্রগুলি যে গণিতের ভাষায় যথাযথ-ভাবে প্রকাশ করা যায়, অযুতনিযুত বৎসর ধরে সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে এই নিয়মই যে ঘোষিত হয়ে চলেছে, এই আবিষ্কার মানুষের চেতনায় একটা দিব্য বিস্ময়ের মতো এসেছিল। সৌরমণ্ডলের যে ছবি বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর অভ্যন্তরেও দেখা গেল যেন তারই প্রতিচ্ছবি। আবার সৌর-মণ্ডলও যে-বিশ্বজগতের অতিক্ষুদ্র অংশ, সেই মহাবিশ্বে আছে নিয়মের রাজত্বের সীমাহীন সম্প্রসারণ।

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাওয়া গেছে ঈশ্বর সম্বন্ধে একটা ধারণা। অতি প্রকাণ্ড, অতি সূক্ষ্ম এক যন্ত্রের মতো চলেছে এই মহাবিশ্ব, যার ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রতিটি অঙ্গ যেন এক বিশ্বকর্মার সৃষ্টি। মানুষের তৈরি কোনো নিখুঁত যন্ত্রের মতোই এই বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে প্রভেদ এইখানে যে জ্যোতির্মণ্ডলের প্রকাণ্ডতায়, পরমাণুর ক্ষুদ্রতায়, তার সর্বব্যাপী গূঢ় সামঞ্জস্যের অব্যর্থ নৈপুণ্যে, মহাবিশ্ব এক অতুলনীয় পরমাশ্চর্য সৃষ্টি। এই সৃষ্টির ভিতরই প্রচ্ছন্ন আছে স্রষ্টার পরিচয়।

ধর্ম নিয়ে একটি সংলাপ (Dialogues Concerning Natural Religion) রচনা করেছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক হিউম। সেই সংলাপের অংশবিশেষ এইরকম: 'Look round the world, contemplate the whole and every part of it; you will find it to be nothing but one great machine, subdivided into an infinite number of lesser machines··· All these various machines, and even their most minute parts, are adjusted to each other, with an accuracy which ravishes into admiration all men who have ever contemplated them.···the Author of nature is somewhat similar to the mind of man, though possessed of much larger faculties, proportional to the grandeur of the work which he has executed.'—এইভাবে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে একটা যুক্তি উপস্থিত করা হয়েছে। যুক্তিটা মূলত এই: মহাবিশ্ব যন্ত্রের মতো চলেছে। এর অভ্যন্তরে এতই সামঞ্জস্য, অগণিত অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে এতই সূক্ষ্ম যোগাযোগ ও পরস্পর-নির্ভরতা, যে এ সবের পেছনে একটা তুলনাতীত শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধি ও সৃষ্টিকৌশল নেই—এমন ভাবা যায় না। ঈশ্বরই স্রষ্টা, অতি সূক্ষ্ম নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এই জগতের স্রষ্টা।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধারণা কিন্তু যুক্তিবাদী গ্রহণ করতে বাধ্য নন। বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মের অনুবর্তী, কার্য-

কারণের সূত্রে বাঁধা, একথা বৈজ্ঞানিক মানবেন, যেহেতু বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের অনুসন্ধানই বৈজ্ঞানিকের সাধনা। নিয়ম যদি না থাকত, তবে তো নিয়মের অনুসন্ধান অর্থহীন হত। কিন্তু জগতের এবং জাগতিক নিয়মসমূহের স্রষ্টা হিসাবে জগদীশ্বরের কল্পনা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে আবশ্যক নয়। কোনো-কোনো বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর মানেন, কেউ-কেউ মানেন না। যাঁরা মানেন না, তাঁদের সেই কারণে বৈজ্ঞানিক সাধনায় কোনো অসুবিধা ঘটে এমন দেখা যায় না। অর্থাৎ ঈশ্বর সম্বন্ধে উপকল্প বিজ্ঞানের পক্ষে অনাবশ্যক। রামমোহন বলেছিলেন, বিভিন্ন ধর্মের ভিতর যেখানে মিল, যেখানে সামঞ্জস্য, ধর্মের মূলবস্তু সেইখানেই, যেখানে অমিল, ধর্মের সারবস্তু সেখানে নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এইরকম বিচার অন্যায় হবে না। নিয়মে বিশ্বাস আছে সব বিজ্ঞানচর্চায়, সেটা বিজ্ঞানের সার। ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ভিতর বিভেদ আছে; সেটা বিজ্ঞানের সারবস্তু নয়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা এসে যায়। রামমোহন নিজে ব্রহ্মবিশ্বাসী ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত, যিনি বহু বৎসর যাবৎ "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, মূলত প্রকৃতির নিয়মেই বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তিনিও অবশ্য একসময় বলেছিলেন,—'জগতের নিয়ম জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা।' সেই সঙ্গে যুক্তিবাদী হিসেবে তিনি যোগ করেছিলেন, জগদীশ্বর 'কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার অনুরোধে কোনো নিয়ম অতিক্রম করেন না।' এখানেই একটা মৌল প্রশ্ন আবার এসে যায়। ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশ্বাস যদি বিজ্ঞানচর্চার পক্ষে অত্যাবশ্যক না হয়, আর জগতের নিয়মের কারণস্বরূপ প্রকল্পিত জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনাও যদি নিরর্থক হয়, তবে বাস্তব দৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রয়োজন কোথায়? প্রকৃতি-বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে ঈশ্বরের যে কল্পনা, তার মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ তাই থেকেই যায়।

আজকাল অনেকে বলছেন যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জড়পদার্থ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণায় একটা গভীর পরিবর্তন এসে যাচ্ছে, চেতনা ও জড়-পদার্থের ভিতর দূরত্ব ক্রমেই যেন মুছে যাচ্ছে। কেউ কেউ এইখানে ঈশ্বর-বিশ্বাসের এক নতুন ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছেন। মূল প্রশ্ন তবু থেকে যায়। গণিতই এই বিজ্ঞানের ভাষা। অর্থাৎ যা পরিমাপ করা যায়, তাই নিয়ে বিজ্ঞানের কাজকর্ম। ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে বিজ্ঞানীর ধ্যেয় বিশ্বের একটা মৌল ভেদ আছে। ঈশ্বর অপরিমেয়। শিখধর্মের ভাষায় তিনি 'অকাল' অর্থাৎ কালাতীত। প্রকৃতিবিজ্ঞানের পরিধির ভিতর এই ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব? প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বর প্রকৃতির ঊর্ধ্বে এবং তিনি সর্ব-শক্তিমান। প্রাকৃতিক শক্তির বাইরে এইরকম কোনো ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে প্রমাণ করা যায়—একথা যুক্তিবাদী মানবেন না।

ঈশ্বর থেকেই ধর্মচিন্তা শুরু করতে হবে এমন কোনো বাধ্যতা কিন্তু নেই। অন্তত ভারতীয় ঐতিহ্যে ভিন্ন দৃষ্টান্ত আছে। বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম ঈশ্বরচিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। দুঃখ আছে, এই সত্য থেকে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুরু হয়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক সম্ভব; দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা কঠিন। সংশয়বাদীরাও দুঃখের অস্তিত্ব বিষয়ে নিঃসংশয়।

প্রেয়োবাদীদের লক্ষ্য, যথাসম্ভব সুখের বর্ধন। যা কিছুতে মানবসমাজে সুখের সর্বাধিক বৃদ্ধি ঘটে, সেটাই নীতি হিসেবে গ্রাহ্য, সুনীতি। নিরীশ্বরবাদীরা বহুকাল থেকেই সুখবাদ বা প্রেয়োবাদের প্রতি আকৃষ্ট। আবার বঙ্কিমচন্দ্রও এই সুখবাদ থেকে আলোচনা শুরু করে ধর্মের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। 'ধর্মতত্ত্ব'-নামে দীর্ঘ আলোচনার তৃতীয় অধ্যায়ে, 'ধর্ম কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু বলছেন, 'ধর্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে, অন্য উপায় নাই।' সুখবাদ থেকে আলোচনা আরম্ভ করবার একটা সুবিধা এই যে এতে করে ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বর-

বাদীরা একত্রে যাত্রা শুরু করতে পারেন। তবে সেই যাত্রা বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হবে—এমন কোনো কথা নেই।

একরকমের সুখ আছে যা ইন্দ্রিয়নির্ভর। জৈব-সুখের এটাই ভিত্তিভূমি। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ' যাঁরা বলেন, তাঁদের কথা শুরু হয় ঐ ভিত্তি থেকে। কিছু অবস্থা জৈবসুখের অনুকূল, কিছু প্রতিকূল। প্রতিটি ব্যক্তি স্বভাবত এমন চেষ্টাই করে থাকে, যাতে অবস্থা যথাসম্ভব নিজ সুখের অনুকূল হয়।

প্রেয়োবাদী দর্শনে মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। এই মতবাদ কি মানুষকে সুখের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে?

প্রেয়োবাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর মূল সমালোচনা যেটা শোনা যায় তা হল এই যে, সুখেরও প্রকারভেদ আছে। নানা রকমের সুখের ভিতর গুণগত তারতম্য আছে, কাজেই তাদের মধ্যে তুলনা-মূলক বিচার করে সর্বাধিক সুখ নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে, গুণবিভাগের তাত্ত্বিক আলোচনায় সরাসরি না গিয়ে বরং সংসারের বাজারটা প্রথমে একবার ঘুরে এলে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত সম্ভবত আরো একটু নির্ভরযোগ্য হবে। শেষ অবধি বিচার অনিবার্যভাবে সূক্ষ্ম হয়ে উঠবে। তবে ভূমির স্পর্শ থেকে আরম্ভ করাই ভালো।

প্রেয়োবাদী প্রত্যয় মেনে নিলে একটা মূল সমস্যা এইরকম। প্রতি ব্যক্তি নিজ-নিজ সুখবৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত। কিন্তু এক ব্যক্তির সুখবৃদ্ধির চেষ্টায় অন্যব্যক্তির সুখের হানি ঘটতে পারে। সামগ্রিকভাবে সমাজের সুখবৃদ্ধিই সুনীতির উদ্দেশ্য। কোনো বিশেষ মানুষের নয়, বরং সকল মানুষের সুখের যোগফল বৃদ্ধি করাই সমাজের কর্তব্য। যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের সুখের জন্যই ব্যস্ত, সেখানে সকলের সুখের ব্যবস্থা কী করে হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি কথা পরপর বলা সম্ভব।

মানুষের অনেক কাজই ব্যক্তিগত স্বার্থে হয়ে থাকে। এইরকম সব কাজই অপরের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এমন নয়। পারস্পরিক স্বার্থে আবদ্ধ হয়ে আমরা এমন অনেক কাজ করি, যেসব কাজ সকলের পক্ষেই কমবেশি লাভজনক। যেমন বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ স্বার্থের অনুসরণ করে। তবু এই ক্রয়বিক্রয়ের ভিতর দিয়ে সকলেরই কমবেশি স্বার্থসিদ্ধি হয়। উভয়পক্ষের স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব বলেই উভয়পক্ষই বাজারে উপস্থিত হয়। অবশ্য বিক্রেতা অন্যায়ভাবে ক্রেতাকে ঠকাতে পারে, তেলে ভেজাল তার এক উদাহরণ। এইরকম অন্যায় ঠেকাবার জন্য রাষ্ট্রকে আইন তৈরি করতে হয়, অন্যান্য ব্যবস্থাগ্রহণও আবশ্যক হয়ে ওঠে। আইন এবং অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সমাজে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চাই, যে পরিবেশের ভিতর বিভিন্ন মানুষের স্বার্থসন্ধানী চেষ্টা মোটের ওপর ক্ষতিকর না হয়ে হিতকর হবে। স্বার্থবুদ্ধিকে উপযুক্ত আইন ও প্রতিষ্ঠান দিয়ে ঘিরে দিতে পারলেই আমরা বাঞ্ছিত সমাজের যথাসম্ভব কাছাকাছি চলে যাব। এককালে প্রেয়োবাদীরা এইরকম বলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এমন আইন ও প্রতিষ্ঠান কি রচনা করা সম্ভব, যাতে ছিদ্র নেই, পাপের প্রবেশপথ নেই? আইনের ভিতরও ত্রুটি থেকেই যায়। তাছাড়া আইনের উদ্দেশ্য ভালো হলেও স্বার্থসন্ধানী মানুষ আইন ফাঁকি দেবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করে। সমস্যাটা আসলে আরো গভীর। ফাঁকির সব পথ যদি বন্ধ করা যেত তবু কিন্তু সেটা বাঞ্ছনীয় অবস্থা হত না। নিশ্ছিদ্র আইন এবং আইনের প্রহরী দিয়ে বেষ্টিত সেই সমাজ হয়ে উঠত একটা বৃহৎ কারাগার।

যদি স্বার্থবুদ্ধি অথবা বাইরের নিয়ম ও প্রতিষ্ঠান অথবা এ দুই-এর কোনো প্রকার সমাবন্ধের দ্বারা মানুষের দুঃখনিবারণ সম্ভব হত, তবে ধর্মের প্রয়োজন সহজেই অস্বীকার করা যেত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

বাইরের কোনো নিয়ম ও ব্যবস্থাই বিবেক ও সদিচ্ছার বিকল্প হতে পারে না। এইখানেই অনেকে ধর্মের প্রয়োজন দেখেন। স্বার্থান্বেষী মানুষকে কর্তব্যবোধে ও পরার্থচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ধর্মের একটা ভূমিকা আছে, এইরকম অনেকে বলেন। ধর্মের সপক্ষে এটাই সরল যুক্তি। মানুষের সমাজকে একসঙ্গে ধরে রাখবার জন্য স্বার্থ অথবা ব্যক্তিগত সুখের অন্বেষণের অধিক কিছু মূল্যবোধ আবশ্যক। ধর্ম এই সমাজধারক মূল্য-বোধের আধার।

এমন অনেক যুক্তিবাদী আছেন, যাঁরা এইরকম মূল্যবোধের প্রয়োজন অস্বীকার করবেন না। কিন্তু এজন্য ধর্মের দ্বারস্থ হতেও সম্মত হবেন না। শুধু ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের অন্বেষণ নয়, অন্যের প্রতি সহানুভূতি, অপরের দুঃখে দুঃখবোধ—এইসবও মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই পরার্থমুখী বৃত্তির বিকাশ ও প্রয়োগের ভিতর দিয়ে একরকমের গভীর সুখ অনুভব করা যায়। স্বার্থপরতাই সুখলাভের শ্রেষ্ঠ পথ নয়। ভাষান্তরে বলা যেতে পারে, স্বার্থেরও স্তরভেদ আছে। উচ্চতর সুখের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এক উচ্চতর স্বার্থ। যুক্তি-বাদী এই পর্যন্ত স্বীকার করবেন। কিন্তু তিনি হয়ত বলবেন যে, যুক্তিই আমাদের এই উচ্চতর স্বার্থের পথে চালিত করতে পারে। এজন্য ধর্মের পরিভাষা নিষ্প্রয়োজন।

নাম অথবা পরিভাষা নিয়ে তর্ক আপাতত স্থগিত থাক। মূল কথাটার দিকে আবারও দৃষ্টি ফেরানো যাক। এইমাত্র যাকে মানুষের উচ্চতর সুখ ও স্বার্থ বলা হল, কীভাবে তার সাধন সম্ভব? বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, এই পথেই মানুষের সুখও পূর্ণতা লাভ করে। এজন্য প্রয়োজন—অনুশীলন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভাষা। এইখানে দাঁড়িয়ে তিনি ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ব্যাখ্যার অনুপুঙ্খে আমরা প্রবেশ করব না।

সমাজসংস্কারক ও বিপ্লবী দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত অনু-শীলনের চেয়েও সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্ব বেশি। সাম্যবর্ধক একটা সামাজিক কাঠামো, আইনের শাসন ও মানুষের কিছু বিধিবদ্ধ অধিকার, এইসব প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্তের স্বার্থবুদ্ধি নয়, মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি আরো মৌল ও মূল্যবান। একথা স্বীকার করে নেবার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, এসবই কি যথেষ্ট?

এই শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে একটা কথা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পরিবর্তন যদিও কাম্য তবু শাসনব্যবস্থার কোনো অবস্থান্তরই শেষ অবধি মানুষের আশা পূর্ণ করে না। কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনই সুখ ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সোভিয়েত সাম্যবাদী দেশে আজ শিক্ষার বিস্তারের পরও ধর্মের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠেছে। এর নিশ্চয়ই একাধিক কারণ আছে। বাইরের তন্ত্র, শাসন ও উপকরণের পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানুষের আশানুরূপ হিতসাধন ঘটে না, এই কষ্টার্জিত উপলব্ধি সম্ভবত ধর্মের প্রতি আগ্রহবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। চেতনার স্তরেও পরিবর্তন আবশ্যক।

এখানে একটা আপত্তি অনুমান করা যায়। চেতনার পরিবর্তন তো আপনি ঘটে না, সেটা ঘটে বাস্তব পরিস্থিতির চাপে, অতএব বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তনটাই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন। এই-রকম একটা কথা অধিকাংশ জড়বাদীর মুখে শোনা গেছে। কথাটা কিন্তু অর্ধসত্যের বেশি কিছু নয়। চেতনার ভেতরই একটা শক্তি আছে, বেগ ও গতি আছে, যেটা তাকে স্তর থেকে স্তরান্তরে ঠেলে দেয়। পরিস্থিতি কখনো এই গতির পথে সহায়ক হয়, কখনো প্রতিবন্ধক। কিন্তু কোনো বাধাই শেষ অবধি এই গতিকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করতে পারে না। আবার বাইরের কোনো সহায়তায়ও সাফল্য পূর্ণতা লাভ করে না। বাস্তব উপকরণের সাহায্য নিয়ে তবেই মানুষের মুক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব, এই চিন্তা অবস্থা-বিশেষে এমন-কী প্রতারক হয়ে ওঠে। উপকরণই

আবদ্ধ করে, উপকরণের হাত থেকেও চেতনার মুক্তি প্রয়োজন।

মানুষের ধর্ম এই, সে নিজেকে বারবার অতিক্রম করে যায়। এই অতিক্রমণের ব্যাপারে যুক্তির ভূমিকা যে সহায়ক হয়, একথা স্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য একটা কথাও আছে। যুক্তির একক শক্তিতে মানুষের বিশ্ববোধ ও মূল্যবোধের উল্লম্ফন ঘটে না। অন্য কোনো পথে ব্যক্তির চেতনায় নতুন অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির উদয় ঘটে। যুক্তি নিজস্ব বিচারপদ্ধতিতে তাকে শনাক্ত করে, মূল্য ও স্থায়িত্ব দেয়। এমনকি গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উচ্চতর সৃজনশীল কাজে এইরকম লক্ষ করা গেছে। শিল্প ও ধর্মের বেলায় এটা আরো স্পষ্ট। স্বজ্ঞা ও যুক্তির যুগ্ম ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার পথে এইভাবে যে ব্যাপারটা ঘটে তার পরিচয় দিতে গিয়ে পরিভাষা নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়, তর্কেরও তাই শেষ নেই। ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াটা বুঝে নেওয়াই আসলে জরুরি। যুক্তির ভূমিকার গুরুত্ব আছে। স্বজ্ঞার নাম নিয়ে অনেক মিথ্যা দাবি ও অন্ধসংস্কার এসে পড়ে। যুক্তি সেখানে প্রয়োজনীয় দ্বাররক্ষী আবার আলোচনার মূল্যবান মাধ্যম। কিন্তু স্বজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্তি সত্যের পথে বেশি দূর আরোহণ করতে পারে না।

সুখদুঃখের প্রশ্ন নিয়ে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে আমরা সুনীতিদুর্নীতির বিষয় ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। গোড়ার কথায় আবার ফিরে আসা যাক। চার্বাক সুখ চেয়েছিলেন; বুদ্ধ চেয়েছিলেন দুঃখ দূর করতে। অথচ চার্বাক ও বুদ্ধের ভিতর পার্থক্য অনেক। বুদ্ধ দুঃখের কারণ খুঁজেছিলেন মানবপ্রকৃতিতে এবং বিশ্বপ্রকৃতির কিছু মৌল বৈশিষ্ট্যে। চার্বাকের মতে সুখের চাবি আছে বাইরের সম্পদে ও পরিস্থিতিতে। এ যুগের প্রেয়োবাদীরা জগতে সুখের বৃদ্ধি চান। চার্বাকের সঙ্গে এঁদের কিছুটা মিল আছে। মার্কসবাদীরা alienation অর্থাৎ 'পারক্য' বা বিচ্ছিন্নতাবোধের কথা বলেন। দুঃখের আলোচনায় এইখানে অন্য একটা মাত্রা যোগ হয়েছে। সমাধানের চিন্তায় তবু পুরনো প্রশ্নটাই থেকে গেছে। মার্কসীয় ধারণায় বিচ্ছিন্নতাবোধের মূল কারণগুলি পাওয়া যাবে মানুষ্যসমাজের বাহ্য অবস্থায়। Towards Marx পুস্তকে প্রবীণ মার্কসবাদী অধ্যাপক সুশোভন সরকার যথার্থই বলেছেন: 'Marx thought that the root of alienation lay not in the nature of man, not in his ideas, but in the concrete conditions of social life. The corollary follows that, by changing social life, in an appropriate way, man can overcome alienation.' মার্কস দুঃখের মূল খোঁজেন নি মানবপ্রকৃতিতে অথবা বিশ্বপ্রকৃতির কোনো বৈশিষ্ট্য। দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতাবোধের কারণ নিহিত আছে বাহ্য সামাজিক অবস্থায়। কাজেই বহু জড়বাদীর এই বিশ্বাস যে, সামাজিক ব্যবস্থার যথাযোগ্য পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে পৃথিবীতে সুখের প্রতিষ্ঠা ও বিচ্ছিন্নতাবোধের দূরীকরণ সম্ভব। এই বিশ্বাসকে কিন্তু নিত্যসত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না।

দারিদ্র্য যে অনেক দুঃখের কারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দারিদ্র্য দূর হলেও দুঃখ দূর হয় না। সমাজে বহু অন্যায় ব্যবস্থা আছে, যার অবসান আবশ্যক। দুঃখ দূর হোক বা না হোক, অন্যায়কে সমর্থন করা যায় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন এ যুগের এক প্রধান কীর্তি, এদেশের এক প্রধান কর্তব্য। এসবই স্বীকার্য। কিন্তু তারপরও একথাটা মেনে নেওয়াই ভালো যে, দুঃখের ও বিচ্ছিন্নতাবোধের কোনো সমাজসর্বস্ব ব্যাখ্যাই যথেষ্ট নয়। সমাজের কোনো প্রকার পরিবর্তনেই দুঃখের সমস্ত মৌল কারণ দূর করা সম্ভব নয়। এ কথাটা না বোঝা অবধি এই বিশ্বপ্রকৃতিতে মানুষের অবস্থাটা ঠিক বোঝা হয়ে ওঠে না। ধর্মান্ধতা থেকে যেমন পারলৌকিক মোহের সৃষ্টি

হয়, দুঃখনাশের সমাজসর্বস্ব পথের প্রতিশ্রুতিও তেমনি একরকম লৌকিক মোহের কারণ হয়ে ওঠে। একটি মোহ অন্যটিকে ব্যঙ্গ করে চলেছে।

গ

মানুষের সুখদুঃখের অনেকটা প্রেম, জরা ও মৃত্যুতে আশ্রিত। সমাজের কোনো পরিবর্তনের ফলেই মানুষকে অমর করা যাবে না, গৃহে-গৃহে প্রিয়জনের মৃত্যুকে রোধ করাও সম্ভব হবে না। মানুষের আয়ু অবশ্য আরো দীর্ঘ করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রেম নেই, সেখানে আয়ুর দীর্ঘতায় সান্ত্বনা সামান্যই। জরা ও মৃত্যু আছে শুধু দেহেরই নয়, ভালবাসারও। একদিন যে-ভালবাসা ছিল উষ্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত, ক্রমে সে তার উষ্ণতা হারায়; অভ্যস্ত প্রিয় সম্ভাষণ হয়ে ওঠে যান্ত্রিক, সততাশূন্য ও অর্থহীন। দুটি প্রেমকে জরা গ্রাস করে না একই গতিতে, একটি ক্ষয়িষ্ণু হৃদয়ের অনিবার্য শীতলতার সাক্ষী হয়ে থাকে অন্য এক অসহায় ও বেদনাবিদ্ধ ভালোবাসা। মানুষের অনেক কঠিনতা ও অনেক কান্নারই মূল এইখানে।

জরা ও মৃত্যুর বাইরেও ব্যর্থতার অন্ত নেই। মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে কোনো বাহ্য কৌশলেই অসামঞ্জস্য দূর করা যায় না। আমরা প্রত্যেকেই যেমন অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, তেমনি আকাঙ্ক্ষা করি নিজের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মূল্যের স্বীকৃতি। সেই মূল্য সম্বন্ধে নিজের বিচার আর অপরের বিচারের ভিতর মিল হয় না। যদি-বা স্বীকৃতি আসে, তবু কতবার দেখা যায় তারও পিছনে আছে স্বীকৃতিদাতারই স্বার্থ। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যোগ অপূর্ণ থেকে যায়।

এসব কিছুই ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, প্রকৃতির এইরকমই নিয়ম। আমরা এসব জানি আর মনে-মনে সাবধান হয়ে উঠি, কিন্তু সাবধানতায়, অন্তরে-অন্তরে আমরা আরো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ি। আধুনিক মনের এক প্রধান যন্ত্রণা—একাকিত্ব। যুক্তি দিয়ে একে ঠেকানো যায় না, বাইরের সাফল্য দিয়েও নয়। আমরা তাই বিস্মিত হই না, যখন রাসেলের আত্মজীবনীতে পাঠ করি এই স্বীকারোক্তি: 'Always the secptical intellect, when I have most wished it silent, has whispered doubts to me. Underlying all occupations and all pleasures I have felt since early youth the pain of solitude.' যুক্তি কিংবা সতর্ক বুদ্ধির অভাবে নয়, বরং তার প্রভাবেই, রাসেল নিঃসঙ্গতায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রথম যৌবন থেকেই। একাকিত্বের যে বেদনা তিনি অন্তরে বহন করেছিলেন, সেটা নিতান্ত ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা নয়। বরং তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, সেই বেদনাকে তিনি একটা সার্থকতার দিকে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। আরো অগণিত মানুষ শুধু ক্ষতবিক্ষত হয়, অসহ্য কষ্টে বিকৃত হয়, অন্তরের সেই বোবা যাতনায়।

আধুনিক সুখবাদের ভিত্তিতেই সংলগ্ন হয়ে আছে একটা অনিবার্য সমস্যা। প্রেয়োবাদ শিক্ষা দেয় সুখদুঃখের ব্যাপারটাতে হিসেব করে চলতে, হিসেব করে দুঃখ এড়াতে এবং সুখ বাড়াতে। কিন্তু এই হিসেবী দৃষ্টিভঙ্গিই আবার স্নেহপ্রেমের শক্তিকে একেবারে মূলে দুর্বল করে দিতে পারে। প্রয়োগবাদী জীবনদর্শনের প্রভাবে আমরা অতিমাত্রায় কৌশলে অভ্যস্ত হয়ে উঠি। আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ি পদ্ধতিনির্ভরতায় ও সাফল্যের আকাঙ্ক্ষায়। কিছু বাহ্য সাফল্য হয়তো ঐভাবে লাভ করা যায়। কিন্তু আমাদের চেতনা হারায় অন্য এক গুণ। সাফল্যের আকাঙ্ক্ষাতেই আমরা প্রতিবেশী, ও সহকর্মীর কাছ থেকে ভিতরে-ভিতরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি, আমাদের সংবেদনশীলতা সংকীর্ণ হয়ে আসে। যেখানে কৌশলের প্রশ্নটা প্রধান, সেখানে সবকিছুই হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যসাধনের উপকরণস্বরূপ। এর ফলে বিশ্বের সঙ্গে ঘটে আমাদের অনাত্মীয়তা। ব্যক্তির সত্তাকে গ্রাস করে নেয় এমন

এক শূন্যতাবোধ যাকে কোনো কৌশলেই আর ঠেকানো যায় না। আধুনিক সুখবাদ ও প্রয়োগবাদী দৃষ্টি যদিও নিজেকে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন বলে দাবি করে তবু এইভাবে মানুষকে সে শেষ অবধি অস্তিত্বের এক গভীর সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়।

এই সংকট এ যুগে ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছে। একে ছোটো করে দেখা ভুল। বাইরের সমস্ত সাফল্য সত্ত্বেও মানুষকে এতে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছে আত্মহননের দিকে। এটা সার্বিক বিনাশের পথ। এরই ভিতর থেকে আবার ঠেলা দিয়ে উঠছে এমন একটা প্রশ্ন, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তার যেটা এক মূল প্রশ্ন। বিশ্বের সঙ্গে আন্তরিক পারক্যবোধের সীমা কি অতিক্রম করা যায় না? এই অতিক্রমণের পথেই কি মানুষ লাভ করে না অন্য এক সত্য? সেই সত্যই কি অবশেষে মানুষকে ভয় ও বিনষ্টি থেকে রক্ষা করে না?

স্বার্থ ও সাংসারিক উদ্দেশ্যনির্ভর যে-দৃষ্টি, সেটাই একমাত্র দৃষ্টি নয়। একরকমের নিরাসক্ত দৃষ্টিতেও বিশ্বের দিকে তাকানো যায়। স্পিনোজা সেইভাবে তাকাতে চেয়েছিলেন। তাঁকে কেউ-কেউ ঈশ্বরমত্ত বলেছেন। এই বর্ণনা সঙ্গত বলে মনে হয় না। বরং একরকমের শুদ্ধ যুক্তিনির্ভর আধ্যাত্মিকতার স্বাক্ষর তাঁর চিন্তায়। সেইভাবে তাকিয়ে তিনি দেখেছিলেন বিশ্বময় সামঞ্জস্য, কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য নেই, নিয়মের কোনো ব্যত্যয় নেই। আমরা ক্ষুব্ধ হই, কাতর হই, কারণ আমাদের স্বার্থে আঘাত পড়ে। কিন্তু যদি ভাবি যে, এই বিশ্ব তো আমার জন্য হয় নি, যদি ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বিশ্বের অন্তহীন পথপরিক্রমার দিকে তাকাই, তবে বিশ্ব-জোড়া সামঞ্জস্যময়তা আমাদের অন্য এক বিস্ময়ে আবিষ্ট করে। চিত্তকে যে-মুহূর্তে মানুষ ব্যক্তিগত বাসনা থেকে মুক্ত করে, সেই মুহূর্তে অন্য এক অপ্রত্যাশিত অনাস্বাদিত আনন্দে চিত্তের সেই শূন্যতা পূর্ণ হয়ে ওঠে। সাংসারিক সুখদুঃখের সঙ্গে এই আনন্দের মৌল প্রভেদ আছে। এইখানেই আমরা আধ্যাত্মিকতা ও চিত্তশুদ্ধির যে-ধারণা পাই তার সঙ্গে যুক্তির কোনো বিরোধ নেই।

আপত্তি উঠতে পারে, সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা-বর্জিত এই দৃষ্টি সাধারণ মানুষের আয়ত্তের ভিতর নয়। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'জ্যামিতিক' প্রমাণের ভিতর আবদ্ধ করে স্পিনোজা তাঁর বিশ্ব-দৃষ্টিকে যে বিশেষ রূপ দিয়েছেন, সেই দার্শনিক উচ্চতা ও প্রসার নিশ্চয়ই অসামান্য। কিন্তু সাংসারিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্বজগতের দিকে তাকানোটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, আর কিছুই স্বাভাবিক নয়, এই ধারণা সংসারী মানুষের একটা অভ্যস্ত সংস্কার। আসলে মনুষ্যপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর যে-সম্পর্ক তাতে স্বাভাবিকভাবেই নানা উপাদান মিশ্রিত হয়ে আছে। শিশু জন্ম থেকেই সংসারী হয়ে ওঠে না। সে শিশুর দৃষ্টি নিয়েই বিশ্বের দিকে তাকায়। সেই দৃষ্টিতে একটা সরল বিস্ময় আছে। ক্রমে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সে সাবধানী হতে শেখে। শিশুরও চেতনা মিশ্র উপাদানে গঠিত। একদিকে সে সবকিছুকে সহজে আপন করে নেয়; অন্যদিকে সে খামখেয়ালি; অনায়াসে নিষ্ঠুর। বড়ো হয়ে উঠবার সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক আচারে আর হিসেবি সতর্কতায় সে অভ্যস্ত হয়। হিংসাকে সে গোপন করতে শেখে, আর সেই সঙ্গে সবকিছুকে আপন করবার শক্তিও সাবধানতার আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে যায়। তবু বিশ্বের প্রতি ঐ সহজ বিস্ময়বোধ এবং আত্মার আত্মীয়তা-বোধ সাংসারিকতার শত আক্রমণেও মানুষের মন থেকে একেবারে লুপ্ত হতে চায় না। অতিসাধারণ মানুষের ভিতরও এইসব কিছু-কিছু থেকে যায়।

শৈশবই মনুষ্যত্বের জনক। ধর্মের সঙ্গে এর একটা গূঢ় সংযোগ আছে। যীশুখ্রীষ্ট শিশুদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখতে বলেছিলেন। সেটা শুধু বাইরের দ্বার নয়, ভিতরের দ্বারও। সংসারী মন পৃথিবীকে চেনে লাভক্ষতির হিসেব দিয়ে। বয়স্কদের জীবনের অনেক-খানি জুড়ে আছে ঐ হিসেবি মন। তবু এরই ভিতর

আমরা কখনো কখনো অকারণে আনন্দিত হয়ে উঠি। শুধু চোখ মেলে আলোর দিকে চাওয়ার মধ্যেই একটা চির নতুনের আনন্দ আছে। 'আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।' আসলে শৈশব শুধু একটা বিশেষ বয়সেরই নাম নয়, একটা প্রতীকী অর্থেরও দ্যুতি আছে ঐ শব্দের মধ্যে। 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে সেই যেন পাই শেষে। দু-হাত দিয়ে বিশ্বেরে ছুঁই শিশুর মতো হেসে।' এইসব গান যে আমাদের মনের ভিতর কোথাও একটা স্পন্দন জাগাতে পারে, তাতেই প্রমাণ হয় যে, অন্য এক অনুভূতির পৃথিবী এখনও আমাদের মধ্যে মৃত নয়। শৈশব ও কৈশোরের উপাদানে গঠিত এই পৃথিবী, উপেক্ষিত হয়েও মূল্যবান। এ যদি না থাকত, সংসার তবে ভিতরে ভিতরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। সংসার বেঁচে আছে এক উপেক্ষিত অকারণ প্রেমের অলক্ষিত সিঞ্চনে। এরই অভাবে সমৃদ্ধির মধ্যেও আমরা শুনি হাহাকার, জাগতিক সাফল্যের মধ্যেও দেখি বিস্তৃত এক ব্যর্থতাবোধ।

শৈশব যদিও জড়ত্বনাশী, তবু মানুষের ধর্ম এই দিয়ে পূর্ণ হয় না। শিশুর ভিতর যে অকারণ আনন্দ ও বিস্ময়ের শক্তি আছে, সে মূল্যবান হয়েও আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ। নিজের ভিতর যে অমূল্য সম্পদ আছে, শিশু তাকে মূল্যবান বলে চেনে না। মনুষ্যত্বের রক্ষার জন্য তাই শৈশবকে অতিক্রম করে যেতে হয়। শিশুর মধ্যে স্থিরতা নেই, সহজে সে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে। সংসারের নানা কাঠিন্য ও সমস্যার ভিতর দিয়ে আশা ও উদ্যম রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হয় অন্য এক দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও সাধনা। মানুষের কত শ্রেষ্ঠ প্রয়াস তো ব্যর্থ হয়েছে বারবার। আমাদের ভিতর যাঁরা সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, তাঁদেরও মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্রূপের কণ্টকের মুকুট। এইসব সাময়িক অথচ অনিবার্য ব্যর্থতা ও ধিক্কারের ভিতরও বিশ্বাস রক্ষা করা যাবে কোন্ শক্তিতে?

মানুষের যা-কিছু শ্রেষ্ঠ প্রয়াস তা ব্যক্তিবিশেষের কর্মে আবদ্ধ নয়। তার সঙ্গে যোগ আছে মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের। আজকের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর কাজের পিছনে আছে অতীতের বহু বিজ্ঞানীর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পর্যায়ক্রমে সাধনা। যে ভাষায় আমরা নিজেকে প্রকাশ করি, সেই ভাষা কণায়-কণায় গড়ে উঠেছে বহু প্রজন্মের ভিতর দিয়ে। কালের পরীক্ষায় কিছু রক্ষা পেয়েছে, কিছু হয়েছে পরিত্যক্ত। যে-সব আদর্শ আজ আমাদের অনুপ্রাণিত করে তার পিছনেও আছে দীর্ঘযুগ ধরে অনেক মানুষের সাধনা ও আত্ম-ত্যাগ। কোনো বড়ো উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা সমসাময়িক মানুষের কাছে প্রশংসা ও ধিক্কার যাই লাভ করুন না কেন, তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তি সমকালকে অতিক্রম করে যায়। মনে-মনে তাঁরা যুক্ত হন বৃহত্তর এক সত্তার সঙ্গে। সেই সত্তা যে মানুষের সমগ্র ইতিহাসকেই ব্যাপ্ত করে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারও পিছে আরো কী আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গঠনের সঙ্গে মানুষের আদর্শের যোগ কতখানি—সে-বিষয়ে তর্ক সম্ভব। তার কোনো মীমাংসা আশা করা যায় না। প্রমাণ-অপ্রমাণের সম্ভাবনাশূন্য সেই তর্কে আমরা আপাতত প্রবেশ করছি না। যে-কথা অনেকখানি নিঃসংশয়ে তবু বলা যায়, সে কেবল এই: ইতিহাসের ধারায় বাহিত যা-কিছু শক্তি সবই সঞ্চারিত হয়েছে মানুষে। মানুষের অন্তরে তার অধিষ্ঠান। আধ্যাত্মিকতার যে ধারণা এইসব নিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তার সঙ্গে মানবতাবাদের বিরোধ থাকবার কথা নয়। বেদান্ত বিষয়ে ১৮৯৬ সালের এক বক্তৃতায় বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন: 'যেখানেই মানুষ আছে, সেখানেই ধর্ম যদি তাহার সহায়ক না হয়, তবে তাহাতে বিশেষ প্রয়োজন নাই। ...প্রাচীন ধর্ম বলিত, যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম বলিতেছে, যে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে সে-ই নাস্তিক।' এইখানে মানবতাবাদীদের সঙ্গে বিবেকানন্দের মিল উল্লেখ-যোগ্য।

বিশ্বের অনন্ত বিস্ময়করতা, নিয়মে বিধৃত নিপুণ সামঞ্জস্য আর ভ্রান্তিশীল মানুষের বহু নিদারুণ ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তীর্ণ হবার অদম্য প্রয়াস, এইসব মিলে উদ্‌ভাসিত হয় কারুণ্যে ও লাবণ্যে মিশ্রিত অন্য এক জগৎ, যাকে মূল্য দিতে শিখে আমরা জীবনের মূল্য খুঁজে পাই। এর বেশি অতিপ্রাকৃত যা-কিছু দাবি করা হয়, সেইসব ছাড়াই ধর্ম সম্ভব। ধর্মের নামে প্রবঞ্চনার নিদর্শন তো ইতিহাসময় ছড়িয়ে আছে। তবু যে মানুষ ধর্মের কাছে ফিরে-ফিরে গেছে সেটাকে কেবলই কুসংস্কার বললে মানুষের প্রতি অন্যায় করা হয়। সাংসারিক ও নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, আশা-নৈরাশ্যের ঊর্ধ্বে মানুষের উচ্চতর আদর্শ ও প্রয়াসের যদি কোনো আশ্রয় থাকে, তবে তাকেই মহত্তর অর্থে ধর্ম বলা যেতে পারে। এই ধর্ম মানবধর্ম। সম্প্রদায়বিশেষকে ধারণ করে এর কাজ সম্পূর্ণ হয় না। বরং মনুষ্যজাতির সঙ্গে যুক্ত করে ব্যক্তিকে ধারণ করে এই ধর্ম। যে ধর্মে এ কাজ হয় না তার সঙ্গে যুক্তির বিবাদ থাকাই ভালো। শুদ্ধ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে নিঃস্বার্থ যুক্তির বিরোধ নেই।

বাঙলা, বাংলা

বাঙলা বর্ণমালা থেকে অনুস্বার (ং) তুলে দেবার একটি প্রস্তাব এসেছে। প্রস্তাবটি ভালো। সমর্থনযোগ্য। অনুস্বারের উচ্চাচরণ 'ঙ' দিয়ে ঠিকই প্রকাশ করা যায়।

প্রস্তাবকরা কি অহঙ, এবঙ, বরঙ, সুতরাঙ লিখতে রাজি? এবঙ, সরাসরি সংস্কৃত থেকে উদ্‌ধৃতিতে? যেমন, 'জানামি ত্বাঙ প্রকৃতিপুরুষঙ কামরূপঙ মঘোনঃ॥'

আর-একটি সমস্যা। 'বংলাদেশ' রাষ্ট্রের নামের বানানে কী করা হবে? ওঁরা না পালটানো পর্যন্ত সম্ভবত ওঁদের সংবিধানসম্মত নামের বানান যা আছে তা-ই রাখতে হবে।

নেহরু, সমাজবাদ ও পরিকল্পিত অর্থনীতি

রাখাল দত্ত

ক্ষমতা হস্তান্তরিত হওয়ার তিন বছর পর ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। নেহরু সে সময় ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁরই সযত্ন প্রয়াসে পরিকল্পনা কমিশন কাজ করতে শুরু করে। কিন্তু আজ যতটা মনে হয়, পরিকল্পনা কমিশনের সূত্রপাত ততটা সহজে সেদিন হয় নি। নেহরুকে এ ব্যাপারে কিছু-কিছু বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অনেকেরই হয়তো জানা নেই, তখনকার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী জন মাথাই পরিকল্পনা কমিশনের প্রসঙ্গে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। মাথাই অভিযোগ করেছিলেন—পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বহু অধিকার অন্যায়ভাবে দখল করে বসছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও পরিকল্পনা কমিশনে খুব একটা বিশ্বাস করতেন না। সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও নেহরুর একান্ত চেষ্টায় পরিকল্পনা কমিশন রূপ নেয়, এবং ভারতের আর্থনীতিক কর্মকৌশল রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

নেহরু শুধু যে যোজনা কমিশনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছিলেন, তাই নয়, স্বাধীনতাপূর্ব যুগে প্রায় তিন দশক ধরে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে নেহরু পরিকল্পনা এবং আর্থনীতিক সম্প্রসারণের ধারণা জাগিয়ে তুলেছিলেন। স্বাধীনতার পর ভারতের পররাষ্ট্রনীতি যেভাবে তিনি প্রভাবিত করেন, প্রায় একই মাত্রায় আর্থনীতিক উন্নয়নের কৃৎকৌশলে তাঁর প্রভাব পড়েছিল। আর্থনীতিক উন্নয়নের এক বিশেষ কৃৎকৌশলের সঙ্গে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন বড়ো হয়ে উঠেছে তা হল—নেহরু কেন এই বিশেষ কৃৎকৌশল গ্রহণ করেছিলেন, তার একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব কি না তা দেখা।

এই প্রসঙ্গে যে কথা প্রথমে বলা দরকার তা হল —সমাজবাদের প্রতি নেহরুর আকর্ষণ। বিশের দশক থেকেই তাঁর একাধিক রচনা আর ভাষণে এই আকর্ষণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। পানজাব প্রাদেশিক

সম্মেলনে ১৯২৮ সালে নেহরু সভাপতির ভাষণে বলেন, 'আর্থনীতিক বন্দোবস্ত হিসাবে ধনতন্ত্রের বিরোধিতাও আমাদের করতে হবে। এক দেশের উপর অন্য-এক দেশের আধিপত্যের আমরা বিরোধী। আমাদের সামনে একমাত্র বিকল্প কোনো না কোনো ধরনের সমাজবাদ। অর্থাৎ, উৎপাদন আর বণ্টনের উপায়গুলির রাষ্ট্রীয় মালিকানা।'

১৯২৮ সালেই কলকাতায় আর-একটি সভায় ভারতীয় পরিস্থিতিতে কমিউনিজম কতটা সংগতি-পূর্ণ, সে সম্বন্ধে নেহরু তাঁর সংশয় প্রকাশ করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি কমিউনিজমের আদলে তাঁর বিশ্বাসও ঘোষণা করেন। সমাজবাদ আর কমিউ-নিজমের আদর্শ তাঁর কাছে ছিল অভিন্ন। 'সমাজের আদর্শ হিসাবে আমি কমিউনিজমে বিশ্বাসী। কারণ, কমিউনিজম হল মূলত সমাজবাদ এবং আমার মতে সমাজবাদই একমাত্র পথ যা বিশ্বের ধ্বংস নিবারণ করতে পারে।' (ডরোথি ওয়ারনার-সম্পাদিত "নেহরু : দ্য ফার্স্ট সিক্স্‌টি ইয়ার্স্‌", ১ম খণ্ড, পৃ ১৬৫)। লাহোর কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে ১৯২৯ সালে নেহরু আবার বলছেন: 'আমি খোলাখুলি স্বীকার করছি, আমি সমাজবাদী এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আমি রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী নই, অথবা যে ব্যবস্থা শিল্পে আধুনিক রাজরাজড়ার সৃষ্টি, করে তাতেও আমার বিশ্বাস নেই।'

সমাজবাদে নেহরুর বিশ্বাস ক্রমেই জোরদার হতে থাকে। ১৯৩৬ সালে লখনউ কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে আবার তাঁকে আমরা বলতে শুনি, 'সমাজবাদ আমার কাছে শুধু আমার পছন্দসই একটি আর্থনীতিক মতবাদ নয়। সমাজবাদ একটি অপরিহার্য বিশ্বাস যা আমি মনেপ্রাণে ধরে রেখেছি।'

পরবর্তী কালে নেহরু এবং সুভাষচন্দ্র বসু এক-যোগে জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। গান্ধীজির কাছের মানুষ হলেও ত্রিশের দশকের শেষ দিকে আর্থনীতিক মতাদর্শের বেলায় দুজনের চিন্তাধারায় সুস্পষ্ট প্রভেদ ধরা পড়তে থাকে। নেহরু নিজেকে এই সময় থেকেই শিল্পায়ন এবং আধুনিকীকরণের প্রবক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকেন, এবং জাতীয় পরিকল্পনা সমিতিকে স্বাধীনতার পর ভারতের অর্থনীতির রূপরেখা রচনা করার দায়িত্ব দেন। স্পষ্টতই গান্ধীজির বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থা, স্বয়ম্ভর গ্রাম এবং রাজনীতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রী-করণ তাঁকে আকর্ষণ করে নি। তবে একথাও নির্ভুল যে আর্থনীতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তাধারার তফাত দুজনের মধ্যে সম্পর্কের বিশেষ হেরফের ঘটায় নি।

আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতার তিন বছর পর নেহরু পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। পরিকল্পনার সঙ্গে রাজ্যগুলিকে জড়িত করার জন্য ১৯৫২ সালে সৃষ্টি করা হয় জাতীয় উন্নয়ন সভা (ন্যাশনাল ডেভালাপমেনট কাউনসিল)। সব কয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের নিয়ে এই সভা গঠিত হয়।

সমাজবাদের প্রতি নেহরুর প্রগাঢ় আকর্ষণ কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫১-১৯৫৬) প্রতিফলিত হয় নি। বস্তুত, আর্থনীতিক ব্যবস্থায় কোনো মৌল পরিবর্তন অথবা দ্রুত বৈষয়িক উন্নয়নের কোনো প্রয়াসও প্রথম যোজনায় দেখা যায় নি। বরং দেশভাগ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রভাবিত ভারতীয় আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার তাগিদই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পেছনে কাজ করেছে। সেই সময়ের কয়েকটি প্রকল্প একত্র করেই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আকার দেওয়া হয়।

কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার একটা উল্লেখ করার মতো বৈশিষ্ট্য ছিল—ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার সঙ্গতি। এই পরিকল্পনাটি ছিল সাদামাটা এবং মোটেই উচ্চাভিলাষী নয়। পরিকল্পনার লক্ষ্য-মাত্রা যেমন ছিল সীমিত, তেমনই পরিকল্পনা জনসাধারণের উপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার

কথা ভাবে নি। আর্থনীতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকাও প্রথম পরিকল্পনায় বিশেষ স্বীকৃতি পায় নি। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনা ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি মেনে নিয়ে ঘোষণা করে, 'বর্তমানে- ভারতে পরিকল্পনার কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হল এমন এক উন্নয়ন-পদ্ধতির সূচনা করা, যার ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং জনসাধারণের কাছে অধিকতর সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের সুযোগ খুলে যাবে।' সম্পদের পুনর্বণ্টন নয়, সম্পদের সৃষ্টি করেই দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব—এ কথাও প্রথম পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল। সামাজিক সুবিচার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই ছিল এই পরিকল্পনার ভিত্তি। এই পরিকল্পনাকে কোনোভাবেই সমাজবাদী দেশের পরিকল্পনার সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

এখানে আবার একটি প্রশ্ন উঠছে। নেহরু ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করলেন। তাঁরই উৎসাহে এই কমিশন পাঁচ বছরের জন্য একটা পরিকল্পনা রচনা করল। অথচ, পরিকল্পনাটির উপর নেহরুর সমাজবাদী চিন্তাধারার প্রভাব পড়ল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর আংশিকভাবে আগেই দেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনা ছিল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট কয়েকটি জরুরি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা মাত্র। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে উৎপাদন-বৃদ্ধির উপর বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়েছিল। ধরে নেওয়া হয়েছিল, সরকারি ক্ষেত্রে ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করলে জাতীয় আয় পাঁচ বছরে ৯,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে। অর্থাৎ, এই পাঁচ বছরে জাতীয় আয় বাড়বে ১১ থেকে ১২ শতাংশ।

সম্পদ সংগ্রহের প্রশ্নে প্রথম পরিকল্পনায় কোনো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ছিল না। পরিকল্পনার রচয়িতারা করসংগ্রহের পরিমাণ খুব বেশি বাড়াতে চান নি। প্রথম পরিকল্পনার গোড়ায় এবং শেষে জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ করব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংগৃহীত হয়। অর্থাৎ, জাতীয় আয় এবং করের অনুপাত থাকে অপরিবর্তিত।

ঘাটতি ব্যয়ের প্রশ্নেও পরিকল্পনার রচয়িতারা ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। তাঁরা মনে করেছিলেন, ঘাটতি ব্যয় মূল্যবৃদ্ধি ঘটাবে; কাজেই মাত্র ২৯০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছিল।

প্রথম পরিকল্পনার আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষি আর কৃষিসংক্রান্ত কাজকর্মের উপর জোর। মোট ব্যয়ের ৩৮·৫ শতাংশই ধরা হয়েছিল এই অংশের জন্য। শিল্পকে দেওয়া হয়েছিল মোট সরকারি ব্যয়ের মাত্র ৮·৪ শতাংশ। শিল্পের এই আপেক্ষিক অবহেলার মূলে ছিল পরিকল্পনা-রচয়িতাদের বিশ্বাস যে, শিল্পে উৎপাদনক্ষমতার সদ্ব্যবহার করে উৎপাদন অনেকটা বাড়ানো সম্ভব হবে, নতুন শিল্পের প্রয়োজন ততটা নেই।

যাই হোক, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিতর্কের অবকাশ নেই, যে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোনো অর্থেই আর্থনীতিক পরিকল্পনার সমাজবাদী আকারের কাছাকাছি যায় নি। কিন্তু দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধেও কি একই কথা বলা চলে? এই পরিকল্পনাকে কি নেহরুর সমাজবাদ প্রভাবিত করেছিল? না-কি, দ্বিতীয় পরিকল্পনা ছিল আধুনিকীকরণের বাধ্যবাধকতার ফল?

এসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। প্রথমত, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় ভারত আর্থনীতিক উন্নয়নের যে কর্মকৌশল গ্রহণ করে তা ভারতের রাজনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল বলা চলে না। এই বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড অ্যাপটারের আলোচনা প্রাসঙ্গিক (ডেভিড অ্যাপটার: "সান কনসেপচুয়াল অ্যাপ্রোচেস ট্যু দ্য স্টাডি অব মডারনাইজেশন", পৃ ১৯৬৪)। বর্তমান প্রসঙ্গে এই আলোচনার বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই। তবে সংক্ষেপে বলা চলে স্বাধীন ভারতের রাজনীতিক

ব্যবস্থা বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম পরিকল্পনায় আপেক্ষিকভাবে সীমিত মাত্রা এবং দেশের উপর আর্থনীতিক বোঝা চাপিয়ে না দেওয়ার জন্য এই রাজনীতিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় রাজনীতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আর্থ-নীতিক কর্মকৌশলের বিরোধ দেখা যায়। অ্যাপটারের ভাষায়, রাজনীতির 'রিকনসিলিয়েশন সিসটেম' এবং অর্থনীতির 'মোবিলাইজেশন সিসটেম' পরস্পর-বিরোধী। আগেই বলা হয়েছে, রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতে এমন একটা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল যাতে বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ এড়িয়ে এক ধরনের সামঞ্জস্য-সাধনের সুযোগ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার আর্থনীতিক কৃৎকৌশল ছিল 'মোবিলাইজেশন সিসটেম' -সুলভ। অর্থাৎ, সমাজের আমূল পরিবর্তন করার চেষ্টা, পুরনো প্রতিষ্ঠান এবং মূল্যবোধ ভেঙে ফেলার প্রয়াস এই ধরনের 'মোবিলাইজেশন সিসটেম'-এর বৈশিষ্ট্য। সমাজ সম্বন্ধে ধারণা এখানে ব্যাপক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের গুরুত্ব এখানে অনেক বেশি, কারণ রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সমাজের উপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়।

সহজেই বোঝা যায়, সমাজবাদ এরকম 'মোবি-লাইজেশন সিসটেম'-এর সঙ্গে অনেক বেশি সঙ্গতি-পূর্ণ। আমরা আবার আমাদের গোড়ার প্রশ্নে ফিরে আসছি। সমাজবাদী নেহরু কি দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় দেশের আর্থনীতিক কর্মকৌশল তাঁর আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করেছিলেন ?

এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে বলে রাখা ভালো। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারত অবশ্যই আর্থনীতিক উন্নয়নের 'মোবিলাইজেশন' কর্মকৌশল গ্রহণ করে এবং সেই অর্থে সোভিয়েত রাশিয়া এবং অন্যান্য সমাজবাদী দেশ যে ধরনের আর্থনীতিক পরিকল্পনার সাহায্য নিয়ে থাকে, সেদিকে পা বাড়ায়, কিন্তু এ-কথা মনে করলে ভুল হবে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষেত্রে স্তালিন যে কর্মকৌশল গ্রহণ করেছিলেন, তার হুবহু অনুকরণ করেছিল। স্তালিন যে উপায়ে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন ভারত তাও অনুকরণ করে নি। তবে বলা যায়, মোটামুটিভাবে দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে, আর্থনীতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে অগ্রাধিকারের প্রসঙ্গে এবং সম্পদ-সংগ্রহের ব্যাপারে ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্তালিন আমলের সোভিয়েত পরিকল্পনার মধ্যে অবশ্যই সাদৃশ্য রয়েছে।

এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা সচেতনভাবেই রুশি মডেলের ধাঁচে রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পরিকল্পনা-কাঠামোর ভিত্তিতেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপ দেওয়া হয়। অধ্যাপক মহলানবিশ ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে এই কাঠামো ভারত সরকারের কাছে তুলে দেন। মহলানবিশের সঙ্গে নেহরুর ঘনিষ্ঠতা বহুদিন ধরে গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রাশিবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের (ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনসটিটিউট) গুরুত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে, এবং ১৯৪৯ সালে মহলানবিশকে মন্ত্রিসভার অবেতনভোগী রাশিবিজ্ঞানসংক্রান্ত পরামর্শদাতা নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৩ সাল থেকেই তিনি ভারতের পরিকল্পনা রচনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালের মধ্যেই মহলানবিশ অর্থনীতির বিষয়ে নেহরুর সবচেয়ে বড়ো পরামর্শদাতা হিসাবে স্থান করে নেন এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনায় তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মহলানবিশ নিজেই লিখে গেছেন, আর্থনীতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে নেহরুর আলাপ-আলোচনা ১৯৪০ সাল থেকেই চলে আসছিল। ওই সময়ে নেহরু ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সভাপতি।

মহলানবিশ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার কয়েক বছর আগে থেকেই ভারতের

মৌল আর্থনীতিক সমস্যা সমাধানে কী করা উচিত, সে সম্বন্ধে মতামত জানাচ্ছিলেন। দারিদ্র্য এবং বেরোজগারিই তাঁর মতে ছিল সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। তাঁর মতে, দেশে বিনিয়োগের হার জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১১ বা ১২ শতাংশ করতে হবে। তা না হলে আর্থনীতিক উন্নয়নের হার সন্তোষজনক করা যাবে না। অবশ্য এখানে তিনি প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী লুইসের মন্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। ১৯৫৩ সালে ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনসটিটিউটের মুখপত্র "সংখ্যা" পত্রিকায় মহলানবিশ একটি দ্বি-অংশ-সংযুক্ত (টু-সেকটর) মডেল পেশ করেন। তাঁর এই মডেলে আর্থনীতিক ব্যবস্থাকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছিল—একটি অংশে ছিল বিনিয়োগদ্রব্য উৎপাদন-শিল্প। মহলানবিশের এই মডেল পণ্যের যোগানের উপর বেশি জোর দেয়, এবং ধরে নেয় বহির্বাণিজ্য নেই। এই পটভূমিতে বলা হয়, ভারতের আর্থনীতিক সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করতে হলে বিনিয়োগদ্রব্য উৎপাদন-শিল্পের উপরেই জোর দিতে হবে। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ালে তাৎক্ষণিক সুবিধা পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে বিনিয়োগদ্রব্য বা মূলধনদ্রব্যের জন্য আরও অধিক পরিমাণে ব্যয় করতে হবে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পনা কর্মকৌশলের মৌল সুর একই। বামপন্থী অর্থবিজ্ঞানী মরিস ডবও এ-কথা বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছিলেন। তারও আগে ১৯২৭ সালে সোভিয়েত অর্থবিজ্ঞানী ফেলমান এই ধরনের একটি মডেল রচনা করেছিলেন। যাই হোক, মহলানবিশের পরিকল্পনা-কাঠামোর দুটি মৌল উদ্দেশ্য ছিল। এক, জাতীয় আয় বছরে ৫ শতাংশ করে বাড়ানো; এবং দুই, দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে ১ কোটি ১০ লক্ষ নতুন কাজের সৃষ্টি। প্রধানত ভারী শিল্পের (ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, খনিজ শিল্প) সম্প্রসারণের মধ্য দিয়েই এ-কাজ করা যাবে।

মহলানবিশের যুক্তি ছিল—জাতীয় আয় দেশের মূলধনদ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়েই সম্প্রসারিত করা যায়, আর মূলধনদ্রব্যের পরিমাণ বাড়াতে প্রয়োজন আরও বেশি করে বিনিয়োগ। আবার, বিনিয়োগ বাড়াতে হলে লাগবে বিনিয়োগদ্রব্য বা মূলধনদ্রব্য। কাজেই, মূলধনদ্রব্যের বা বিনিয়োগদ্রব্যের যোগান বাড়াতে হবে। ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করতে যতটা মূলধন প্রয়োজন হয়, তা বিনিয়োগদ্রব্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যক মূলধনের চেয়ে কম নিশ্চয়ই। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিতে অধিকতর মাত্রায় বিনিয়োগদ্রব্য উৎপাদনে সুফল পাওয়া যায় বেশি।

মহলানবিশ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ভারীশিল্পে কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা অনেক বেশি সীমিত। তিনি আরও বুঝেছিলেন, ভারী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বেড়ে যাবে, এবং এই চাহিদা ভার শিল্পের সাহায্য বাড়ানো যাবে না। এজন্য তিনি ক্ষুদ্র- ও কুটির-শিল্পের উপর নির্ভরতার কথা বলেছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে, নেহরুর প্রধান পরামর্শদাতা মহলানবিশ নিশ্চিতভাবে সোভিয়েত পরিকল্পনার আদলে পরিকল্পনা রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেইমতোই পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিত স্থাপনের কাজ চলার সময় ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনসটিটিউট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী দেশমুখের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য পেয়ে একটি 'অপারেশনাল রিসারচ ইউনিট' খোলে। বেশ কয়েকজন বিদেশী অর্থবিজ্ঞানী ১৯৫৩ থেকে এই বিভাগে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। উল্লেখ্য এই যে, অর্থবিজ্ঞানীরা প্রায় সবাই ছিলেন মার্কসবাদী বা বামপন্থী।

অধ্যাপক শার্ল বেত্‌ল্যাঁ (Charles Bettelheim) এসেছিলেন ফ্রানস থেকে। মহলানবিশ লিখে গেছেন, শার্ল বেত্‌ল্যাঁর পরিকল্পনার ধাঁচ তাঁর নিজের পরিকল্পনা-কাঠামোর খুবই কাছাকাছি ছিল।

বেত্‌ল্যাঁ সিদ্ধান্ত করেছিলেন—মোট বিনিয়োগের অন্তত ৩৭·২ শতাংশ বৃহদায়তন ও ভারী শিল্পে করতে হবে। কৃষিতে যাবে মোট বিনিয়োগের ২০ শতাংশ। বেত্‌ল্যাঁ প্রাকৃতিক সম্পদের জাতীয়করণের পক্ষেও মত প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ সালের শীতকালে আরও কয়েকজন বিদেশী অর্থবিজ্ঞানী মহলানবিশকে সাহায্য করেন। নরওয়ে থেকে আসেন রাগনার ফ্রিশ (Ragnar Frisch), পোল্যানড থেকে অসকার ল্যাঙগে (Oscar Lange) এবং ইংল্যানড থেকে রিচার্ড গুডউইন (Richard Goodwin)। তা ছাড়া, সোভিয়েত রাশিয়া থেকে অর্থবিজ্ঞানী ও রাশি-বিজ্ঞানীদের একটি দল সে সময়ে ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনসটিটিউটে উপস্থিত ছিলেন। এই দলে ছিলেন সোভিয়েত পরিকল্পনা কমিশনের দেগতিয়ার (D. D. Degtyar), পিসারিয়েভ (I. Y. Pisarev), রুবেনস্তাইন (M. I. Rubenstein) এবং মসক্‌ভিন (Moskvin)।

১৯৫৪ সালের নভেমবরে জাতীয় উন্নয়ন সভার অধিবেশনে নেহেরু সমাজবাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য আর-একবার স্পষ্ট করে প্রকাশ করলেন, 'সমাজের যে ছবি আমার মনে রয়েছে তা চূড়ান্তভাবে সমাজ-বাদী। আমি শব্দটি মোটেই কোনো গোঁড়া অর্থে ব্যবহার করছি না। আমি বলতে চাইছি, উৎপাদনের উপায়গুলি সামাজিক মালিকানায় থাকবে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের উপকারের জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। বেসরকারি উদ্যোগেরও যথেষ্ট সুযোগ এ ব্যবস্থায় রয়েছে, যদি অবশ্য প্রধান উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট থাকে।' জওয়াহরলাল নেহেরু: 'প্ল্যানিঙ অ্যানড ডেভলাপমেনট', পৃ ৫২। নয়া দিল্লী, পাবলিকেশন ডিভিশন।

১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে "সমাজবাদী ধাঁচের" সমাজব্যবস্থা কাম্য—এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। কাজেই, ভারতের আর্থনীতিক ভবিষ্যৎ কী পথে নির্ধারিত হবে, তা অন্তত সেই সময়ের মতো মোটামুটিভাবে স্থির করা হল। এখন প্রশ্ন উঠছে: দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে এতক্ষণ ধরে আলোচিত বিষয়গুলি কতটা প্রভাবিত করেছে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, নেহরুর সমাজবাদ, শিক্ষিত ভারতবাসীর চিন্তাধারা, প্রশান্ত মহলানবিশের প্রভাব, বামপন্থী বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি কতটা এবং কীভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার বিশেষ রূপ নির্ধারিত করেছিল।

এ প্রশ্নের জবাব ঠিক এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি ঘটনাই তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু নেহরুর আর্থনীতিক পরিকল্পনা বিষয়ে ধ্যানধারণার ব্যাখ্যা রয়েছে আরও গভীরে। অর্থাৎ, সমাজবাদে তাঁর বিশ্বাস এক বিশেষ ধরনের পরিকল্পনায় তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। ভারতের শিক্ষিত ও শহরবাসী অংশের আপাতবৈজ্ঞানিক ও শিল্পমুখী চিন্তাও তাঁর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। মহালনবিশ তাঁর খুবই কাছের লোক ছিলেন। মার্কসবাদী আর বামপন্থী বিশেষজ্ঞরা দ্বিতীয় পরিকল্পনার পেছনে কাজ করেছেন। কিন্তু এইসব প্রভাবের কোনো একটিই মৌল শক্তি হিসাবে কাজ করে নি। বিশেষ করে মহলানবিশ ও বিদেশী বিশেষজ্ঞরা নেহরুকে প্রভাবিত করে তাঁদের পছন্দ মতো পরিকল্পনা রচনা করেছেন, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং, উলটো ঘটনাটিই অধিকতর তথ্যানুগ। নেহরু জাতীয় অর্থনীতি এবং পরিকল্পনার বিষয়ে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে সমাজবাদে তাঁর বিশ্বাস, আধুনিক বিজ্ঞানে তাঁর আস্থা হয়তো কিছুটা ছিল। কিন্তু আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিশ্বজগতে ভারতের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। বিদেশী শক্তির প্রভাব থেকে দেশকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে শিল্পায়নের প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল। শিল্পায়ন, আর্থ-নীতিক উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ অবশ্যই অতীতে বিভিন্ন দেশে জীবনযাত্রার মানে উল্লেখ্য অগ্রগতি সম্ভব করে তুলেছে। কিন্তু এসবই দেখা গেছে শিল্পায়ন

এবং আধুনিকীকরণের দীর্ঘমেয়াদি পরিণতি হিসাবে। অধিকাংশ দেশেই, বিশেষ করে বিংশ শতকে, আধুনিকীকরণ এবং শিল্পায়ন অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে জাতীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিশ্বসভায় দেশের স্থান উচ্চতর করার প্রেরণায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জাপান, কমিউনিসট নেতৃত্বে চীন, সোভিয়েত রাশিয়া—প্রতিটি দেশই জাতীয় ক্ষমতা, প্রতিরক্ষা-শক্তি দৃঢ়তর করার জন্য ব্যাপক আর্থনীতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নেহরুর নেতৃত্বে ভারতে এই পরিস্থিতির কোনো ব্যতিক্রম ঘটেছিল মনে করার কারণ নেই। নেহরুর নিজের এবং তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা মহলানবিশের রচনা আর ভাষণের বহু উদাহরণ থেকে সপ্রমাণ করা যায় তাঁরা সার্বিক স্বাধীনতা এবং আর্থনীতিক স্বয়ম্ভরতার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন, এবং আর্থ-নীতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই দুটি লক্ষ্যে উপনীত হতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের বিশেষ করে ভারী শিল্পের অগ্রাধিকার, আপেক্ষিকভাবে কৃষিকে অবহেলা, আমদানির পরিবর্ত দেশের মধ্যে তৈরি করার আগ্রহ, সরকারি ক্ষেত্রে শিল্পোৎপাদন বাড়ানো, জাতীয়করণ, বেসরকারি উদ্যোগের নিয়ন্ত্রণ, জনসাধারণের উপর আর্থনীতিক সম্প্রসারণের বোঝা ঘাটতি ব্যয়ের মধ্য দিয়ে চাপানো—সবকিছুই বিচার করতে হবে আধুনিকীকরণের বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে।

নেহরু ভারতের দারিদ্র্য আর বেরোজগারি নির্মূল করতে আগ্রহী নিশ্চয়ই ছিলেন। কিন্তু জাতীয় ক্ষমতা, সামরিক নিরাপত্তা, আর্থনীতিক স্বয়ম্ভরতার দিকে তাঁর দৃষ্টি যে নিবদ্ধ ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এজন্যই তিনি বার-বার বলেছেন, শিল্পায়ন ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভারী শিল্পে কর্মনিয়োগ বাড়াতে বিশেষ সুযোগ নেই —ও-কথা জেনে বুঝে তিনি মহলানবিশের কাঠামো সমর্থন করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, নেহরুর কাছে মাত্র দুটি বিকল্প ছিল। একটি বিকল্প গান্ধীজি দেখিয়েছিলেন। বিকেন্দ্রিত আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা, স্বয়ম্ভর গ্রাম-সমাজ, ক্ষুদ্র- ও কুটির-শিল্পের প্রাধান্য এবং জন-সাধারণের জন্য মোটামুটি জীবনযাত্রার মান ছিল গান্ধীজির পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক। কিন্তু এই চিন্তাধারার মৌল ভিত্তি ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি বজায় রাখার আগ্রহ। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ শান্তির জন্য আগ্রহী হলে জাতীয় স্তরে ক্ষমতা বা সামরিক নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে-পৃথিবীর বৈশিষ্ট্য, সেখানে শিল্পায়ন, সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধি, জাতীয় স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হবে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন, নেহরুর মতো তাঁদেরও একই ধরনের আর্থনীতিক পরিকল্পনার আশ্রয় নিতে হবে।

জলদাপাড়াতে

হরপ্রসাদ মিত্র

গণ্ডার দেখার জন্যে
হাতির জাহাজে
পাকা ধানখেত পার হয়ে
দুলে দুলে মাঝেমাঝে ছিলই থমকানো।
ফুলগন্ধে ম'-ম'-করা বনভূমি
চেতনা-চমকানো।

কোনো কোনো পাখি শুধু বনে থাকে,
শহরে আসে না—
ব্রেজিলের কোনো-এক কাহিনীতে
পড়েছি তা। স্মরণে আসে না।

তিস্তা, তোড়শা, কালচিনি, মহানন্দা,
আত্রেয়ীর মতো
নদী খোঁজা ভেতরে চলছেই—
তার মানে, তরঙ্গগতি চায় প্রাণ
চায় নিজেকেই।

চিনি নানা উপজাতি কোচ মেচ টোটো—
চা-বাগান, নীলাকাশ, শাদা মেঘ, সবুজ পাহাড়
ইত্যাদি দেখতেই চাই।
হাঁটিনি কি জলদাপাড়াতে?

কেবলি উত্তাপ বাড়ছে—
জনস্ফীতি, বিভেদযন্ত্রণা।
গণ্ডার দেখার জন্যে তাই
অভয়ারণ্যেই পরিক্রমা।

মেটিয়াবুরুজে প্রায়ই পিটিয়ে খুনের দৃশ্য থেকে
বিদ্যেবুদ্ধি বৃথা পুঁজি ছুঁড়ে ফেলে
তাই সরে যাওয়া
জলদাপাড়াতে।

বিভাজন শীত

আবুবকর সিদ্দিক

তোমার আমার মাঝে বিভাজন শীত এসে গেছে,
হেমন্ত এনেছে এই আঁতুড়ের ন্যাতা হিমবাস।

আলপথে কুহকের ছাপ পড়ে, পিশাচের পথে
তীর্থযাত্রী চলে যায়। হাতের আদুরী বিবি সেও
পরনারী হয়ে যায়। তুরুপের তাসঘর ভাঙে,
ভেঙে ভেঙে যেতে থাকে প্রতি শীতে পুরনো সমাজ।
বোঁটছেঁড়া কষঝরা এলেবেলে ন্যাওটা মানুষ
অসিত বিধবা পরাপ্রকৃতির হাত ধরে চলে।
বিভাজন হতে হতে সরে সরে ভেসে যায় অই
রেলের জানালাআঁটা হাতপাখা কাঁচপোকা টিপ।

অনড় স্থিরতা নিয়ে আলিসায় বসে থেকে থেকে
কেমন সম্পর্ক সব তলে তলে ভাঙচুর হয়।

তোমাতে আমাতে যতো রাজবাড়ি রাজকীয়তা
শীত এলে পর সব ধসে যায়। পড়ে থাকে কিছু
ইঁট খোয়া পাটকেল চুন আর ঘুণসার এক
মজ্জমান ধূসর শুশুক।

বাংলাদেশ

সিন্দুক খুলে

রত্নাংশু বর্গী

এতক্ষণ কথা ছিল শিল্পের সিন্দুকে।
মুখোমুখি বসেছে ঠোঁট
মাপজোক ঠিক ছিল, রঙের অনুপাত আশ্চর্য নিখুঁত
আর তাই অক্ষরের দেয়ালে গাঁথা হল কবিতার উজ্জ্বল স্তবক
কিন্তু আমি চাই অন্যরকম আলো
নিস্তরঙ্গ বিন্যাসে ছোঁয়া কান্না, ভালোবাসা
যাতে লেগে থাকবে রাস্তার ধুলো আর আকাশের ধোঁয়া।

এতক্ষণ কথা ছিল শিল্পের সিন্দুকে
এবার সিন্দুক খুলে খোলা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিই শিল্পকে।

পায়ের শব্দে

গৌতম হাজরা

পায়ের শব্দে সোঁদালের গন্ধ ভেসে আসে।

এখানে নির্মাণ রেখেছি মুখ
এখানে দুহাতে জড়িয়ে রেখেছি সুখ,
অনেক অসুখও আছে যদিও
শুকনো পাতার সঙ্গে মিলেমিশে
তবুও জল চেয়েছি, জল দাও এই মৃৎপিরিচে!

যদিও পায়ের শব্দে আজানের ধ্বনি শুনি আজও
বেড়াজাল ছিঁড়েখুঁড়ে কী নতুন সবুজ বাগান
ঘরদোর নিকিয়ে রাখি পিটুলিগোলা জলে
কে আসবে অপেক্ষায় দিনগুলি সোঁদালের বুকে
নবান্নের, আলতামাখা পদচ্ছাপ স্মৃতির মতন

কবন্ধ

গৌরী আইয়ুব

শীতের পড়ন্ত বেলা। পিঠের উপর মিঠে রোদ। সবুজ ঘাস থেকে একটা ঠাণ্ডা আমেজ উঠে এসে সমস্ত শরীর-মনকে যেন আদর করছিল। খোলা মাঠে কী একটা অনুষ্ঠান চলছিল। সারি-সারি স্টীলের ফোলডিং চেয়ার অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো। হালকা নীলরঙের চেয়ারগুলি চোখকে আরাম দিচ্ছিল। অবশ্য সারি ভেঙে কোথাও-কোথাও চেয়ারগুলিকে কিছুটা এলো-মেলো করে দিয়েছিল দর্শকরা। যে যার সুবিধামতন এদিক সেদিক টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

তখন বোধহয় একটু বিরতি চলছিল। তাই অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল, হাতপায়ের আড়ষ্টতা ছাড়িয়ে নিচ্ছিল কেউ-কেউ···কেউ-বা পরিচিত জনকে খুঁজে পেয়ে নীচু গলায় কথা বলছিল। সব নিয়ে বেশ একটা সুন্দর সংযত পরিবেশ। অথচ কী যে ঘটছিল সামনের দিকে সেটা কিন্তু মনে নেই।

আমি প্রথম থেকেই একা বসেছিলাম, তখনও একাই বসে রইলাম। বাঁ পায়ের উপর ডান পাটি তুলে সেই হাঁটুর উপর অলস হাত দুটো জড়ো করে রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, অন্যমনস্ক। নিজের মনেই কী জানি কী ভাবছিলাম। আমার সারির দক্ষিণ প্রান্তের একেবারে শেষ চেয়ারটি বেছে নিয়ে বসেছিলাম আমি! পারতপক্ষে দুপাশে দুজন অচেনা লোক নিয়ে বসতে আর কার ভালো লাগে? তবে আমার বাঁ দিকেও কয়েকটা চেয়ার তখন পর্যন্ত শূন্য ছিল।···সে ক'টাকে ছেড়ে খানিক দূরে জনাকয় বসেছিল, অস্পষ্ট মনে পড়ছে। পায়ের কাছে ঘাসের উপর নামিয়ে রেখেছিলাম আমার পেটমোটা ব্যাগটা ···ব্যাগ তো নয়, বলা যায় একটা হোলড-অল। ব্যাগের উপর আমার মেটেরঙের গুর্জরা শালটাও পাট করে রেখে দিয়েছিলাম···গায়ে দেবার মতন ঠাণ্ডা তখনও পড়ে নি।

বসে থেকে-থেকেই হঠাৎ আমার ঘোর কেটে গিয়েছিল। অস্পষ্ট ঠুনঠান ধাতব একটা শব্দ শুনে সামান্য একটু ঘাড় বেঁকিয়েই টের পেয়েছিলাম যে

আমার পিছনের সারি বেয়ে বাঁ-দিক থেকে কেউ যেন এগিয়ে আসছিল, ঠিক আমার পাশের চেয়ারটিকেই লক্ষ্য করে। অনেক সময় কিছু না ভেবেই মানুষ যেমন করে থাকে, আমি তেমনি নিজের চেয়ারটা কয়েক ইঞ্চি আরো ডাইনে সরিয়ে নিয়েছিলাম। আগন্তুকের মনে হতে পারত তার পথ একটু প্রশস্ত করে দেবার জন্যই সরে গিয়েছিলাম। আসলে হয়তো নিজের দূরত্বটুকু সযত্নে সুরক্ষিত করার জন্যই ওইরকম করেছিলাম। আমার পাশের চেয়ারের পিছনটিতে এসে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে তারপর পিঠের দিক থেকে যখন এক-পা এক-পা করে নবাগত মানুষটি এগিয়ে এসে বসতে যাচ্ছিল তখন আমার চোখে পড়েছিল যে তার চলাটা স্বাভাবিক নয়···একটা কাঠ-কাঠ ভাব···কৃত্রিম পায়ের উপর হাঁটলে যেমন দেখায় আর কী! চেয়ারটাকে খানিক সুবিধাজনকভাবে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল সেই লোকটি···স্বভাবতই আমার নজর চলে গিয়েছিল তার মুখের দিকে। এখন বুঝতে পারছি যে যতটা চমকে ওঠা উচিত ছিল ততটা কিন্তু চমকাই নি প্রথমে। একটু অবাক হয়েছিলাম মাত্র।

তাই যখন দেখলাম নবাগত মানুষটির মাথাটাই নেই কো মোটে···সেখানে একটা ছোট্টমতন ফ্যান ঘুরছে তখন কিন্তু ব্যাপারটা বিশেষ তেমন ভয়াবহ ঠেকে নি প্রথমে। নীচু সিলিঙওয়ালা ঘরে অনেক সময় ওইরকম ছোটো ফ্যান দেয়ালে গাঁথা থাকে, ব্লেডগুলি বিঘতখানেক লম্বা, কিন্তু কোনো তারের কেসিং ছিল না ওগুলিকে ঢেকে। দুষ্টু ছেলেপুলের কথা ভেবে বরং একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। মনে-মনে আমিও ওই চলন্ত পাখার কাছে একটা আঙুল বাড়াতে গিয়ে চট করে সরিয়ে নিয়েছিলাম। স্পীড কম হলে কী হবে! আঙুলের ডগাটা কুচ করে কেটে উড়িয়ে না দিক, অন্তত একটা জোড় মট করে ভেঙে ফেলবে ঠিক। তাই ভাবছিলাম বলি (মাস্টারনীর স্বভাব যাবে কোথায়) যে, হোক না কাঁধের উপর চাপানো, তবু ওইরকম আঢাকা রাখা উচিত নয় ব্লেডগুলি।

যাই হোক, কারুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকাটা সভ্যতা নয়। তা ছাড়া, অন্যেরা কী মনে করছে ওকে দেখে সেটাও দেখবার জন্য চারদিকে নজর ঘুরিয়ে আনলাম একবার। কী আশ্চর্য! আর কেউই যেন অদ্ভুত কিছু লক্ষ করে নি মনে হল। করলে কি আশেপাশে সবাই এমন নির্বিকার হয়ে থাকতে পারত? ···আমার মাথায় তখন নানারকম ভাবনা আসছিল। ···হয়তো কোনো অ্যাকসিডেনটে মাথাটি হারিয়েছেন ভদ্রলোক।···হয়তো দেহকে চালু রাখার জন্য এটাই সার্জারির আধুনিকতম উদ্ভাবন। এদিকে কিন্তু খেয়াল ছিল যে দুর্ঘটনায় যারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারায় তাদের প্রতি ভয়, বিস্ময় কি বিরাগ প্রকাশ করা অমানবিক। তাই মুখের ভাব যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টায় একবার শুধু ঢোঁক গিলেছিলাম। তারপর আর কিছু ভাববার আগেই হাওয়ায় হিশহিশ করে কথা ভেসে এসেছিল আমাকে চমকে দিয়ে,

"এখানে বসতে পারি?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই"—না ভেবেই এরকম জবাব মানুষ দিয়ে থাকে সৌজন্য প্রকাশ করতে।

অমনি কাঠ-কাঠ আড়ষ্ট ভঙ্গিতে 'মানুষ'টি এসে ধপ করে চেয়ারের উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিল। চেয়ারটাও ক্যাঁক করে ঘাসে দেবে গিয়েছিল একটুখানি। তখন একবার মনে হয়েছিল, এ কি মানুষ না একটা যন্ত্র! হালকা গোলাপি রঙের সুতি শার্টের ভিতর থেকে কাঁধ-বুক-পিঠের ঋজুরেখার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল, যেন একটা টিনের বাকস কাপড় দিয়ে ঢাকা। কিন্তু মুখে আমি কৌতূহলের বদলে একটা সহানুভূতির ভাব ধরে রাখার চেষ্টা করছিলাম। অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য নড়েচড়ে বসেছিলাম নিজের চেয়ারেই···একবার শাড়ির আঁচলটা কাঁধের উপর গুছিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলাম···যদিও অবশ্য কটকি তসরের ভারী শাড়ি মোটেই খসে-খসে পড়ে

যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছিলাম যে আমার মতন প্রবীণা একজন মহিলাও অস্বস্তিতে পড়লে তরুণীদের মতনই অর্থহীন চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে পারে।

নিজেকে একটু বাগে এনে ভাগ্যহীন মানুষটির সঙ্গে সামান্য সৌজন্য বিনিময় করার চেষ্টায় একটু হেসে আবার তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে আর-একবার হোঁচট খেয়েছিলাম। ঘুরন্ত পাখার ডানার সঙ্গে কী করে স্মিতহাস্য বিনিময় করা যায় সে এক সমস্যা! পাখা অবশ্য খুব জোরে ঘুরছিল না···মনে হচ্ছিল যেন এক নম্বরের চেয়েও কম স্পীড। কিন্তু পাখা তো পাখাই···চোখ নয়, ঠোঁট নয়। সেদিকে তাকিয়ে থেকে-থেকে শেষ পর্যন্ত বোধ হয় আমার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গিয়েছিল।

তবু খানিক পরে মনে হয়েছিল যে আমার সৌজন্য প্রকাশের চেষ্টা যেন পাশের মানুষটির একেবারে অগোচরে থাকে নি। সেজন্যই সম্ভবত আবার ফিশ-ফাশ কথা ভেসে এসেছিল,

"বেশ গরম আজ, তাই না?"

হাঁ-সূচক অল্প একটু মাথা নেড়ে মাথাটা ঘুরিয়ে আশপাশটা দেখে নিয়েছিলাম চট করে। মনে হল না যে কেউ লক্ষ করছে আমার পাশেই ভীষণ অদ্ভুত কিছু ঘটছে একটা। এদিকে আমি কিন্তু ক্রমেই আরো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। পাখার অভাবে কিংবা পাখার পাশে, এমন-কী পাখার তলায় বসেও মানুষ 'আহ কী গরম' বলে অহরহ অভিযোগ করে ঠিকই, কিন্তু পাখা নিজে কখনও গরম বলে অভিযোগ করে এমন কথা কেউ কখনও শুনেছে? আর এই ক্ষেত্রে পাখাটি পাশে এসে বসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমার তো বেশ মোলায়েম শীতই লাগছিল। তার পর থেকেই বরং ঘামতে শুরু করেছিলাম। একটু-একটু করে যতই ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছিলাম ততই কানমাথা গরম হয়ে উঠছিল।

তবু উপর-উপর অবিচলতা বজায় রাখার জন্য নিজের নখের রঙ পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছিলাম ডাক্তারি নিষ্ঠার সঙ্গে। তা ছাড়া নার্সারি স্কুলের টিচারদের মতন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নখ যথেষ্ট পরিষ্কার কিনা, শিগগিরই কাটা দরকার কিনা—এসব প্রয়োজনীয় বিষয়েও অবহিত হওয়া দরকার মনে হচ্ছিল তখনই। কিন্তু তারই ফাঁকে আড়চোখে দেখতে পেয়েছিলাম পাশে-বসে-থাকা মানুষটির পা দুটি ধীরে-ধীরে সামনের দিকে প্রসারিত হচ্ছিল, তার ট্রাউজার্সের রঙ ছিল চীনেবাদামের খোলার মতন। গোলাপি পপলিনের আস্তিন দুটি হাঁটুর কাছে এগিয়ে এসে সযত্নে যেন চিমটি কেটে ট্রাউজার্সের কাপড় সামান্য তুলে ধরে একটু আলগা করে পা দুটিকে অবাধে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছিল। তখন তার হাত দুটির দিকে চোরা নজর পড়ায় আবার চমকে গিয়েছিলাম। দুটি হাত নয়, দশটি আঙুলও নয়। বলা যায় এক ধরনের দুটি স্টীলের চিমটে যেন। প্রত্যেকটি 'হাতেই' একটি করে স্টীলের বুড়ো আঙুল মতন ছিল, আর ছিল সব ক'টি আঙুল একত্র করলে যেমন দেখায় তেমনি একটি ইস্পাতের বাঁকানো পাত ···হাতছানি দেবার সময় চারটা আঙুল জুড়ে গেলে যেমন হয় ঠিক সেইরকম। ওই 'হাত'-দুটিই হাঁটুর কাছে নেমে এসেছিল···আর পা'দুটি সামনে এগিয়ে গিয়েছিল। তখন দেখতে পেয়েছিলাম পায়ের জুতোর রঙও ওই ট্রাউজার্সেরই মতন। কর্ডুরয়ের অমন আরামদায়ক জুতো-জোড়া এদেশী বলে মনে হচ্ছিল না।

এর পর হাওয়ায় যা ফিশফিশানি ভেসে এল তাতে আমার বুক হিম হয়ে গিয়েছিল। শোনা গেল,

'অনেকক্ষণ থেকেই তোমাকে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে পারছিলাম না।···'

'তোমাকে!' আমি তো ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পাখার ব্লেডের বয়স বোঝা যায় না ঠিকই, কিন্তু পোশাক-আশাক দেখে তো তাকে ছোকরাই মনে হয়েছিল···তিন কুড়ি বয়সের লোক মোটেই

মনে হয় নি। অবশ্য আজকাল বুড়ি-ছুঁড়ি বুড়ো-গুঁড়ো সবাই একই রকম পোশাক পরছে। তবু আমার মতন একজন প্রৌঢ়া আর ভীষণদর্শনা হেড-মিসট্রেসকে 'তুমি' বলার সাহস হবে প্রথম আলাপেই! এতে আমি বেশ বিমূঢ় বোধ করতে শুরু করেছিলাম। তা ছাড়া, আমার কাছে আসার জন্য এত ব্যগ্রতার কারণটাই বা কী?—সেটাও ভালো ঠেকছিল না মোটে। এতক্ষণ তো ঘামছিলাম—এবার মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল।

সন্তর্পণে ঘাড়টা একটু কাত করে বাঁ পাশে ওর দিকে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছিলাম ব্যাপারটা কী! কিন্তু ঘুরন্ত পাখাটাও ওই সময়েই নিজের বাঁ দিকে ফিরে কী যেন দেখছিল একটু ঝুঁকে। তারপর দেখলাম ওর বাঁ কাঁধে ঝোলানো একটা শান ব্যাগে হাত দুটো কী যেন খুঁজছিল। খানিক বাদে বাঁ-হাতে একটা নোটবই আর ঝকঝকে ক্রস পেনসিল উঠে এসেছিল···আরও খানিক খোঁজাখুঁজির পর ডান হাতে উঠেছিল একটা চকোলেটের বড়োসড়ো স্ল্যাব। আমি তখন তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। তাও কি অব্যাহতি পাওয়া গেল? মনে-মনে ভাবছিলাম, প্রেস রিপোর্টার নাকি কোনো কাগজের? কথাটা কিন্তু উচ্চারণ করি নি। অথচ উত্তর চলে এসেছিল,

"হ্যাঁ আমি এখন নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার।"

শুনে তো আমি জমে বরফ। কিন্তু কপালে যে ঘাম জমছিল তাও বুঝতে পারছিলাম—অথচ আঁচলটা তুলে যে ঘাম পুছব, তাও হাত সরছিল না। হাত পা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। কাঠ হয়ে বসে ভাবছিলাম যে কিছু ভাবাও তাহলে চলবে না? 'ভাবব না' কথাটা ভাবা চলবে কি? প্রচণ্ড অস্বস্তিতে আমার তখন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ আমার দিকে সেই বিলিতি চকোলেটের যতটা এগিয়ে এসেছিল এবং সেই সঙ্গে আমার গলা-শুকিয়ে-দেওয়া ফিশফিশ কথা,

"প্লীজ একটুখানি নাও—"

প্লীজই বটে! এমন প্লেজারের অভিজ্ঞতা যেন জীবনে আর কোনোদিন না হয়। কিছুক্ষণ যে নিতে ইতস্তত করছিলাম সেটা হাতখানা তুলতে পারছিলাম না বলেও। ভয়ে-জমে-যাওয়া তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে শেষে কোনোক্রমে কোল থেকে তুলে এনে চকোলেটের প্রান্তে ঠেকিয়েছিলাম। ভেঙে নেবার অনুৎসাহটা ব্যাখ্যা করে বলেও ছিলাম প্রায় ওইরকম ফিশফিশ স্বরে,

'এখন কি আর চকোলেট খাবার বয়স আছে?'

'আমার আছে আর তোমার নেই?'—শুনে আমি চেয়ার থেকে উলটে পড়ি আর কী! ঠকঠক করে হাত কাঁপছিল বলেই বোধ হয় ছোট্ট এক টুকরো চকোলেট আমার চেষ্টা ছাড়াই মট করে ভেঙে আমার দুই আঙুলের মাঝে উঠে এল·····এসেও কয়েক সেকেনড ধরে কাঁপতেই থাকল···আর আমি হাঁ করে বসে থাকলাম···ওটা মুখ পর্যন্ত তুলে আনতে পার-ছিলাম না।

চেয়ার থেকে যে পড়ে যাই নি তার একমাত্র কারণ, এই যে, কিশোর বয়স থেকেই ভয়কে জয় করবার চেষ্টা করতাম আমাদের প্রজন্মের কিছু মেয়ে। আমাদের ছিল সবলা হবার সাধনা। সেই সময়ে রেডিওতে "মহিলা মহল" অনুষ্ঠানের গোড়ায় গান হত 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরই অপমান।' শুনে সবল নারীত্বের অভিমানে আমাদের বুক ভরে উঠত।

তবু এই সবলার মুখে কোনো কথা জোগায় নি ওই মুহূর্তে। সবটুকু চেষ্টাকে একত্র করে বহুকষ্টে চকোলেটের টুকরোটা মুখে পুরে দিয়েছিলাম। তাতে বিশ্রী সিগারেটের গন্ধ পেয়েও অবিকৃত মুখে চুষতে চেষ্টা করছিলাম। এদিকে চোখে কিন্তু ঝাপসা দেখছিলাম, চোখের পাতাদুটি পর্যন্ত ঘামে ভিজে গিয়ে চশমার কাঁচে বাষ্প জমে উঠেছিল, গরমের দিনে রান্না করার সময় যেমন হয়।

যেন অনেক অনেকক্ষণ পর একটু-একটু করে

ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম ও কী করছে। দেখা গেল, খুশখুশ করে স্টীলের মসৃণ পেনসিলটা নোট বুকের উপর হাঁটছে···হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা চিমটে। আমার চোখ সেখানেই আটকে রয়ে গিয়েছিল। সারা শরীরে ভীষণ অস্বস্তি ছিল···প্রায় অস্থিরতা, কিংবা বলা চলে অব্যক্ত কিন্তু তীব্র একটা ইচ্ছার তাড়না ছিল দেহের সবকটি পেশীতে। মনের অন্তঃস্থলেও ইচ্ছাটা উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ক্রমে সর্বাঙ্গে ঐ একটা ইচ্ছাই নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়ছিল···যে করেই হোক পালাতে হবে। অথচ এদিকে পা-দুটো তো মাটিতে এঁটে গিয়েছে···হয়তো সবুজ ঘাসও গজিয়ে গিয়েছে তার উপর।

তারপর এক সময়ে দেখতে পেলাম নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টার লেখার স্পীড কমিয়ে ফেলছে, একটু সাহস পেয়ে তখন সন্তর্পণে আমার মাথাটা আরো একটু কাত করে ওর 'মুখের' দিকে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম যে পাখার স্পীড আগের চেয়েও কমে গিয়েছে। মনে হচ্ছিল অপেক্ষা করে থাকলে বোধ হয় দেখতে পাব একটু-একটু করে দুটোই থেমে যাবে। গেলও তাই। আমি তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই ডান হাতের চিমটেটা কলমসহ কেমন যেন উলটে গেল · হাত ওলটানোর ভঙ্গিতে। ভাবছে? না ঘুমিয়ে পড়েছে? মাথাটাও কাজ করছে না মনে হল···পাখাটা যখন থেমে গেছে। একটু পরেই টের পাওয়া গেল বাঁ পাশ থেকে বাকসর মতন কিছু একটা কাত হয়ে এসে আমার কাঁধে ঠেকছে একটু-একটু করে···যেন ঘুমে ঢলে পড়ছিল আমার ওপর। কী ভারী আর শক্ত মনে হয়েছিল বাকসটা···আমার কাঁধ ব্যথা করতে লেগেছিল।

আর না! কী করে কোথা থেকে যে আমার হাতে-পায়ে বল ফিরে এসেছিল জানি না। সাবধানে নিজেকে বাকসর তলা থেকে সরিয়ে এনে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। কী ভাগ্য ঘাসের উপর চেয়ার ঠেললে শব্দ হয় না! কিন্তু তবু নীচু হয়ে ব্যাগটা তুলে নিতে-নিতেই টের পেয়েছিলাম যে বাক্সটাও যেন চটকা ভেঙে সোজা হয়ে উঠে বসেছিল নিজের চেয়ারের উপর। আমার শালটা ব্যাগ থেকে গড়িয়ে ঘাসে পড়ে গিয়েছিল। সেটাও তুলে নেবার তর সইল না। কিন্তু হাওয়া খুব তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করেছিল, 'কী ব্যাপার? হঠাৎ চললে কোথায়?

আর চললে কোথায়! আমি তখন উড়তে পারলে উড়ি। কে বলে আমার হাঁটুতে আর্থরাইটিস···আমি প্রায় তখন রেসের ঘোড়া। পাগলের মতন একরোখা ছুটছিলাম কোনো দিকে না তাকিয়ে···মাঠঘাট পেরিয়ে ছুটছিলাম···অন্তত ছুটতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ক্রমেই মনে হচ্ছিল আমি যেন আর পারছি না। স্বপ্নে যেমন পায়ে-পায়ে জড়িয়ে যায়, পা নড়বড়ে হয়ে যায়, আমারও তেমনি হয়ে যাচ্ছিল। হাঁটু দুটো লগবগে রবারের তৈরি বলে মনে হচ্ছিল। প্রাণের দায়ে মাঠের উপর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে একটা পিচঢালা পথের কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম। সেখানে এসে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই ভাগ্যক্রমে একটা বাসও এসে থেমেছিল একেবারে আমার সামনেই। আমি পড়িমরি করে উঠে পড়েছিলাম। বাসটা স্টেশানের দিকে যাচ্ছিল · আমি উঠতেই ছেড়ে দিয়েছিল।

'বাব্বাঃ বাঁচলাম' বলে আমার আঁচল তুলে কপাল ঘাড় মুখ মুছতে-মুছতে একবার মনে হয়েছিল, কী হাস্যকর ব্যাপার! এই বয়সে এই দেহ নিয়ে ত্রস্ত কিশোরীর মতন ছোটা! কী বেমানান দেখাচ্ছিল নিশ্চয়ই, দেখাক্ গে, কেই বা দেখছিল! চশমাটাও মুছে নিয়ে চোখে পরে বাসের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকাতেই ভরসাটা আবার ধসে পড়েছিল যেন। স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম একটা খটখটে মূর্তি খটাশ-খটাশ করতে-করতে ছুটে আসছিল লম্বা-লম্বা পায়ে, যেন রণপার উপর ছুটছিল। তার মাথাটা··· না, পাখাটা বাঁই-বাঁই করে ঘুরছিল। হায়-হায়, এ

তো আমার পিছু ছাড়বে না। অবশ্য তখনও বেশ দূরে ছিল···আমার বাসটাকে ধরবার কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। তবু বাসটা যদি আলোর বেগে ছুটতে-ছুটতে একেবারে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পার হয়ে যেতে পারত, তবেই হয়তো স্বস্তি পেতাম আমি।···

স্টেশানে এসে নেমেই একটা ট্রেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুব ভরসা পেয়েছিলাম। টিকিট কাটতে কিছুই প্রায় সময় লাগে নি। বেছে-বেছে একটা ভিড়ে ঠাসা কমপার্টমেনটে উঠেছিলাম। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। আলো জ্বলে উঠতেই মুখটা যথাসম্ভব আড়াল করবার জন্য মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছিলাম। মিনিট তিন-চার পরে ট্রেনটা নড়ে উঠলে বুকের উপর থেকে একটা বোঝা নেমে গিয়েছিল। আমার ঠিক পরের বাসটাই যদি ধরতে পেরেও থাকে তবু এই ট্রেন ধরতে পারে নি কিছুতেই। এইটুকু সময়ের মধ্যে এসে পৌঁছনো কিছুতেই সম্ভব নয়।

মনকে এইভাবে ভরসা দিয়ে কামরার এক কোণে ঠায় বসেছিলাম। ট্রেন সারারাত ধরে চলল। একটু তন্দ্রা, একটু জাগরণ, একটু স্বস্তি, অনেকটা ভয়—সব মিলিয়ে কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল আমাদের চৈতন্যে। তারপর ট্রেন যখন এসে টারমিনাসে থেমে গিয়েছিল তখন গা ঝাড়া দিয়ে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছিলাম। গলা বার করে দেখে মনে হয়েছিল হাওড়া স্টেশান। যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে নামবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমিও আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম···তখন মনে পড়ল গুর্জরা শালটা হারিয়ে এসেছি···বুকের ভিতরটায় একটু হায়-হয় করে উঠেছিল···ভারি সুন্দর শালটা··· সুশীলা দিয়েছিল। যারা আগেভাগে নামবার জন্য ব্যস্ত তাদের পথ করে দিয়ে ধীরেসুস্থে নেমেছিলাম। কুনুই দিয়ে ঠেলে পথ করে নিতে আমার ভালো লাগে না। নেমে হাতের ব্যাগটা দোলাতে-দোলাতে প্ল্যাটফর্মে যখন হাঁটছিলাম তখন চোখে অনিদ্রার জ্বালা থাকলেও মনটা হালকা লাগছিল। আর-একটা নূতন দিনের আলোয় আগের দিনের ভয়টা কেমন অলীক অবাস্তব লাগছিল। ভাবতে-ভাবতে চলে-ছিলাম যে ট্যাকসি নেব না বাস নেব।

কিন্তু স্টেশানের বাইরে এসেই সামনে একটা খালি ট্যাকসি দেখে খুশি হয়ে তাই নিয়ে নিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে স্নান করে একটু শুয়ে নিতে ইচ্ছা করছিল। ট্যাকসির দরজাটা বন্ধ করে তার শব্দে বেশ একটা স্বস্তি বোধ করছিলাম। কিন্তু যেই ড্রাইভারকে বলতে যাচ্ছি কোথায় যাব অমনি একটা তীক্ষ্ণ শিশ শুনতে পেয়ে সেই শব্দের দিকে তাকিয়েই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল আর একবার··· আবার সেই কবন্ধকে দেখতে পেয়েছিলাম একটু দূরেই। ট্যাকসিটা চলতে শুরু করেই দিয়েছিল, ততক্ষণে স্টেশানের চত্বর পার হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। উলটো দিকের ভিড় ঠেলে একটা ঘুরন্ত পাখা মানুষের কাঁধে চড়ে ছুটে আসছিল আমারই ট্যাকসিটার দিকে। ···তার হিশহিশ ডাকও শুনতে পেয়েছিলাম আমি, ···'শোনো,···শোনো,···থামো ··থামো।' আমি থামি নি, আমি আর কিছু শুনতে চাই নি।

তখন আমি বুঝতে পারছিলাম যে আমার আর কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। এতদূর পর্যন্ত কী করে পৌঁছাল? মনে তো হচ্ছিল যে আগেভাগেই ওখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশনের বাইরে আমাকে ধরবে বলে।···কিন্তু সেটা সম্ভব হল কী করে? এতটা পথ কি দূর পাল্লার বাসে চলে এসেছে সারা রাত ধরে? কী জানি, আমি আর ভাবতে পারছিলাম না শুধু ঠিক করে নিয়েছিলাম যে এই বিপদ পিঠে নিয়ে আর বাড়ি যাওয়া চলবে না···সেখানে তো কোনো শক্তসমর্থ পুরুষ নেই যে ওটাকে ঠেকাতে পারে। ট্যাকসিটাকে খানিক ঘুরপথে নিয়ে গিয়ে সমরদের হাউসিঙ কমপ্লেক্সের একেবারে সামনে গিয়ে নেমে-ছিলাম। বিপদে আপদে ওরা তিন ভাই-ই আমার ভরসা। ট্যাকসির ভাড়া চুকিয়ে কোনোরকমে ছুটে গিয়ে লিফটে উঠেছিলাম। আবার ভেবেছিলাম

লিফটম্যানকে বলি, একটা অদ্ভুত মতন লোক যদি এসে জিজ্ঞেস করে আমি কোন্ অ্যাপার্টমেনটে ঢুকছি তবে যেন বলে না দেয়।···কিন্তু বলি বলি করেও লজ্জায় বলতে পারলাম না···আর কতক্ষণই বা সময় পেলাম বেসমেনট থেকে আটতলায় উঠে আসতে-আসতে! এই বয়সে আমার মতন একজন প্রৌঢ়া মহিলার পেছন-পেছন একটা হতভাগা ছুটে আসছে কুকুরের মতন শুঁকতে-শুঁকতে···বলা যায় এই কথাটা কাউকে? আর ভয়ে গলা তো কাঠ হয়েই ছিল।··· কোনো ক্রমে "এইট্থ্ ফ্লোর" ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে বার হয় নি।

লিফট থেকে অ্যাপার্টমেনটের দরজা দশ হাত দূরেও নয়···মনে হচ্ছিল যেন অনেক-অনেক দূর। সর্বশক্তি দিয়ে বেলটা টিপে ধরে দরজায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম···এমন কাঁপছিল সারা শরীর যে ভয় হচ্ছিল পড়ে যাব।···শৈশবের মতন ভয়ে পিঠ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। ওরা যে যেখানে ছিল সবাই হুড়মুড় করে ছুটে এসেছিল দরজায়···সমর অলক, মিনু···বাচ্চারাও বোধ হয় কেউ বাকি ছিল না। দরজা খুলতে ওদের তিন মিনিট লেগেছিল কিনা সন্দেহ অথচ তারই মধ্যে যেন একটা হইচই শব্দ উঠে এসেছিল অনেক নীচে সিঁড়ির গহ্বর থেকে।

এত সকালে ওইরকম সন্ত্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ চেহারায় আমাকে দেখে ওরা যত ভয় পেয়েছিল ততই অবাক হয়েছিল। আমি কেবল বলেছিলাম, "বলছি সব··· আগে দরজাটা ভালো করে বন্ধ কর্···কিছুতে খুলবি না।···'

'কেন···কেন···কে·· কী?'

'আগে জল দে···আর আমি একটু শোব···।' বলতে-বলতে কোনোরকমে ওদের একটা শোবার ঘরে ঢুকে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় ফেলেছিলাম। মিনু জল এনে দিয়েছিল। খেয়ে একটু দম নিয়ে যেই কথা বলতে গিয়েছি···অমনি আবার বাইরের দরজার ঘণ্টা পাগলের মতো বেজে উঠেছিল। আমি আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, 'খুলবি না খুলবি না. কিছুতেই খুলবি না।···"

মিনু ছুটে গিয়েছিল শোবার ঘরের দরজাটাও বন্ধ করার জন্য। তার আগেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম, বাইরের দরজার পাল্লায় স্টীলের চিমটের বেপরোয়া খটখটানি। আবার চিৎকার করতে গেলাম ···গলা দিয়ে আওয়াজ বার হল না।···

আমার ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভেঙে হাত পা অসাড় লাগছিল অনেকক্ষণ। এদিকে ঘেমে বিছানা পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। আর গলা কাঠ। বোঝা গেল, ওটা স্বপ্ন। সত্যি জল খাই নি মিনুর হাত থেকে। তখন উঠে বসে পাশের টিপয়ের উপর ঢেকে-রাখা জলের গেলাশ থেকে জল খেলাম। তারপর বেডসুইচ টিপে আলো জ্বেলে দেখলাম রাত প্রায় আড়াইটা। এমন একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নের কোনো অর্থ না খুঁজে পেয়ে ভীষণ অস্বস্তি লাগছিল। তবে সব দুঃস্বপ্নেরই তো একটা লাভের দিক থাকে—জেগে উঠে মনে হয়, 'আহ্ বাঁচলাম।' মনে হয় জীবনের সব অপ্রিয় অভিজ্ঞতার শেষেই যদি এমন পরম শান্তিময় জাগরণ থাকত।

কিন্তু মনের ওই শান্তিটা বেশিক্ষণ টিকল না। স্বপ্নটা আমাকে কেবলই কুরতে লাগল। অবশ্য কেউ হয়তো বলবে 'স্বপ্ন তো স্বপ্নই, তার আবার অর্থ হয় নাকি। মিছে মাথা ঘামানো।' কিন্তু না ঘামিয়েও পারছিলাম না। খানিকক্ষণ একটা বই পড়বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন লাগল না। একটা চাপা অস্থিরতা ···অদ্ভুত একটা অস্বস্তি লাগছিল।···ঠিক ভয় নয় কিন্তু প্রায় ভয়েরই মতন।

স্বপ্নটার কোনো যেন মাথামুণ্ডু নেই।···আর এরকম দম-আটকানো স্বপ্ন জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ল না।···আমার স্বপ্ন সাধারণত খুব সাদামাটা হয়। জাগরণে যে সমস্যার কোনো সমাধান পাই না, যে উদ্বেগ থেকে উদ্ধার পাই না, তারই একটা আপাত-সমাধান অনেক সময় ঘটে যায় স্বপ্নে।

ওইসব আটপৌরে স্বপ্নের মাঝখানে এমন একটা জটিল স্বপ্ন দেখে আমার খুব বিমূঢ় লাগছিল।

অবশ্য সাদামাটা স্বপ্নের অর্থ খোঁজার একটা ঝোঁক আমার আছে। ইউনিভার্সিটিতে আমার বন্ধু ছিল পদ্মিনী সরকার···ও পড়ত সাইকোলজি, ড. হরিপদ মাইতির ছাত্রী ছিল। ওর কাছে একবার শুনেছিলাম যে, যে-কোনো স্বপ্ন দেখার পরেই যদি সত্যিকারের অনুসন্ধান করবার ইচ্ছা নিয়ে নিজেই মনের আনাচকানাচ খুঁজে দেখি তন্ন তন্ন করে, তাহলে আমরা বেশির ভাগ স্বপ্নেরই একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নিজেরাই। হতে পারে সেই ব্যাখ্যার সবটা আমরা অন্যের কাছে স্বীকার করতে পারি না। কিন্তু নিজে বেশ বুঝতে পারি স্পষ্ট, কোন্ অস্বস্তিকর ব্যাপারটা স্বপ্নে কোন্ চেহারা নিয়েছে। এমন-কী স্বপ্নের অনেক ঘটনা আর বস্তুর প্রতীকী চেহারাটাও ধরতে পারা যায় ওইভাবে তলিয়ে ভাবলে। ওর কাছ থেকে শোনা অবধি মনে-মনে স্বপ্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করার একটা অভ্যাস আমার আছে। সব স্বপ্নেরই একটা বোধগম্য অর্থ খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। এই পাখা-কাঁধে কবন্ধটার কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলেই মহা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অবচেতনের কোন্ কারিগরিতে ওই রোবটের মতন মানুষটার সৃষ্টি হয়েছে কিছুতেই ঠাহর করতে পারছিলাম না। অনেক হাতড়ে দেখলাম মনের গলিঘুঁছি অন্ধিসন্ধি।

তারপর এক সময়ে আবার ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙল অন্য দিনের চেয়ে অনেক দেরিতে। ভাগ্যিস রবিবার। কিন্তু মুখে যেন বিস্বাদ লেগে আছে তখনও ছুটির দিনের পক্ষে বড়োই বেমানান।

চায়ের প্রথম কাপটা শেষ হতেই মনে পড়ল কাল সন্ধ্যায় ভেবেছিলাম সুরভিকে একটা চিঠি লেখা দরকার। ঠিক কী লিখতে চেয়েছিলাম ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল সুরভি একটা মনের মতন কাজ পেয়েছে তার অফুরন্ত অবসরকে ভরে তোলবার জন্যে। বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য একটা ফ্রী ডে কেয়ার সেনটার করেছেন এক ভদ্রলোক। পড়াশোনা, ছবি আঁকা, গান-বাজনা, নাচ, নাটক করা···এসব তো আছেই। তা ছাড়াও আহার বিশ্রাম খেলাধুলোর ব্যবস্থাও আছে। ভোর না হতেই বাপ-মা দিয়ে যায় তাদের ছেলেপুলেদের···আবার সন্ধ্যায় তাদের কাজের শেষে এসে বাড়িতে নিয়ে যায় ফিরিয়ে। সুরভি তাদের পড়ায়, ছবি আঁকায়···নতুন একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুযোগ পেয়ে তার ভারি ভালো লাগছে।

আমিও তার জন্য খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম। কতবার সুরভি বলেছে তাকে এমন একটা কাজ দিতে যা অর্থকর হবার দরকার নেই, তৃপ্তিকর হলেই হবে। আমি ভেবে পাই নি কী পরামর্শ দেব।···তবু সুরভির মনে একটা সংশয় আছে মনে হল।···'আনন্দলোক'-এর এই প্রতিষ্ঠাতাকে তার যেন কেমন অদ্ভুত লাগে··· অনেকে নাকি খুব ভয় পায় তাঁকে···ভদ্রলোকের স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে থাকতে না পেরে একটি সন্তানকে নিয়ে দেশত্যাগ করেছেন।···নানারকম গুজব শোনে তাঁর সম্বন্ধে।

গুজবে আমার অভিরুচি নেই। তাই সেসব শোনা হয় নি। আমি তাকে বলেছিলাম, 'তুমি তোমার কাজ নিয়ে থাকবে···যতটুকু নয় তার বেশি কাছে না ঘেঁষলেই হল।' এরপর আমাকে একটু অবাক করে দিয়ে সুরভি বলেছিল ভদ্রলোক নাকি আমাকে চেনেন। নাম জানতে চাইলাম। নামটা ঠন করে কানে বাজল। হ্যাঁ আমিও চিনি বইকি, অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই, তবে ক্বচিৎ কদাচিৎ নাম দেখেছি কাগজে, ওইরকম জনহিতকর কাজের সূত্রেই বোধহয়। সুরভিকে সে কথা বলায় সে বল না, 'একদিন আমি খুব প্রশংসা করছিলাম আপনার, ভদ্রলোক শুনে বলেছিলেন, তাঁর কিন্তু ধারণা একে-বারে অন্যরকম। কেন তা যদি আমি জানতে চাই তাহলে বলতে পারেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম না সে জানতে চেয়েছিল কিনা। কিন্তু বোঝা গেল চেয়েছিল, নইলে এরপর

সে কেন বল না, 'আমি তাঁকে বলেছি, আপনি যতই যা বলুন, যাঁকে আমি এতকাল ধরে ঘনিষ্ঠভাবে জানি তাঁর সম্বন্ধে আমার মত পালটাবে না।'

আমি কিছুই বললাম না এর উত্তরে। সুরভি অন্য নানা কথা পাড়ল। তারপর বিদায় নেবার সময় একটু টিপ্পনী কেটেছিল, 'এদিকে আপনার সম্বন্ধে কত কথা যে জিজ্ঞেস করলেন।' শুনে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

তাই সকাল বেলাতেই চিঠি লিখতে বসলাম কাগজ কলম নিয়ে। আমারও কয়েকটা কথা বলা দরকার সুরভিকে। আবার কবে আসবে তারজন্য বসে থাকা ঠিক হবে না। তাকে বলতে চাই যে ওই ভদ্রলোককে আমি একজন ঈভিল জিনিয়াস বলে জানি। সুরভিকে ভর করে কোন্ দিন না তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে চলে আসেন···ভাবতেই আতঙ্ক হচ্ছে।···মাথায় একটা যেন বিদ্যুতের আঘাত লাগল। এই তবে সেই কবন্ধ!

খোলা কলম বন্ধ করলাম। অনেকক্ষণ থুতনিতে হাত রেখে ভাবলাম। শেষকালে নিজেকে বললাম, 'থাক···আমি কেন নিজেকে ছোটো করব···ও নিজেই আবিষ্কার করুক কে কী!' কাগজকলম তুলে রাখতে-রাখতে নিজের অহংকে ধন্যবাদ দিলাম, আমার অবচেতনার ভয়ের কাছে আমাকে হেঁট হতে দেয় নি।

রবিবারটা এবার রবিবারের মতনই লাগল।

উদ্‌ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার

উদ্‌ধৃতিচিহ্ন আছে দু-রকম—এক-এক আঁকড়ির (' ') আর দুই-দুই আঁকড়ির (" ")।

যেখানে লেখকের বা বক্তার কথা উদ্‌ধৃতি করা হবে, সেখানে "চতুরঙ্গে" আমরা এক-এক আঁকড়ির চিহ্ন ব্যবহার করব। যেমন, কবি ভূমিকায় লিখছেন, 'নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে।'

উদ্‌ধৃতির মধ্যে উদ্‌ধৃতি দিতে হলে, দুই-দুই আঁকড়ি লাগানো হবে।

বই বা পত্রিকার নামের সঙ্গে দুই-দুই আঁকড়ি: "বিষবৃক্ষ", "মহুয়া", "তিন সঙ্গী", "বঙ্গদর্শন", "ভারতী", "প্রবাসী"।

প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতার নাম লেটারস্পেস করে দেওয়া হবে: ঝু ল ন, ব র্ষ শে ষ, স ভ্য তা র স ঙ ক ট।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৭.৬

পাগলপন্থার উদ্ভব আর প্রসার, কৃষকবিক্ষোভের সঙ্গে পাগল-নেতাদের ক্রমবর্ধমান যোগ এবং দুই ভিন্ন পর্যায়ের (১৮২৪/২৫ ও ১৮৩৩) পাগল-বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা থেকে এ অঞ্চলের কৃষকদের ধর্ম আর রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কয়েকটা সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব।

(ক) পাগলপন্থা কৃষকদের কাছে ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বলাই বাহুল্য, দুশ্চর সূফী সাধন-পদ্ধতি বহু কৃষকের কাছে গ্রহণীয় ছিল না। প্রধানত করিমের সহজবোধ্য সামাজিক দর্শন এবং নৈতিক আচারবিধি কৃষকদের আকৃষ্ট করেছিল। জমিদার-তন্ত্রের যে ভয়াল রূপ ১৭৭০-এর দশক থেকে ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ সামাজিক দর্শনের বিশেষ তাৎপর্য ছিল। করিম-প্রচারিত ধর্ম-বিশ্বাস এবং নৈতিক বিধান কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলে বহু জাতি- ও ধর্ম-ভুক্ত কৃষকেরা তাকে সহজে গ্রহণ করতে পেরে-ছিল। তা ছাড়া, সিদ্ধ ফকিরদের অলৌকিক ক্ষমতায় এ অঞ্চলের কৃষকদের দীর্ঘদিনের বিশ্বাসও পাগল-পন্থার জনপ্রিয়তার একটা কারণ। পারিবারিক এবং সামাজিক নানা দুর্বিপাক থেকে পীররাই পরিত্রাণের উপায় নির্দেশ করবে—এই ছিল সাধারণ বিশ্বাস।

(খ) জমিদারি স্বৈরাচারের পটভূমিকায় ক্রম-বর্ধমান কৃষকবিক্ষোভের সঙ্গে পাগল-নেতৃত্বের যোগ পাগলপন্থার দ্রুত প্রসারের অন্যতম প্রধান কারণ। এ যোগের নানা বৈশিষ্ট্য ১৮২৪-২৫ সালের বিদ্রোহের সংগঠনে আর লক্ষ্যে দেখা গেছে। বলা হয়েছে, বিদ্রোহের মূল উদ্যোগ মোটেই টিপুর ছিল না; বিক্ষুব্ধ কৃষকেরাই টিপুকে নেতা বানিয়েছে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি এক প্রচ্ছন্ন ধারণা যে, টিপু যেন আকস্মিক-ভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রতিবাদী কৃষককুল এবং পাগল-নেতৃত্বের সম্পর্ক অনেক নিবিড় সুদূরপ্রসারী এবং প্রত্যক্ষ। আমরা

দেখাতে চেষ্টা করেছি, আন্দোলনের প্রাথমিক উপকরণ যাই হোক না কেন, একেবারে শুরু থেকে সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে টিপুর যোগ অবিচ্ছেদ্য। এটা মেনে নেবার অর্থ কৃষকদের উদ্যোগকে খাটো করা নয়। নেতার অভিপ্রায় বা চিন্তাধারণা কৃষকদের অভিপ্রায় বা চিন্তাধারণার অবিকল প্রতিফলন নয়। কৃষকদের সক্রিয় বিক্ষোভ নানাভাবে সংগঠিত হতে পারে। ১৮২৪-২৫ সালের বিদ্রোহের বিশিষ্ট রূপ টিপুর ধ্যানধারণা, অনুগামীদের উপর তার গভীর প্রভাব, পাগলপন্থী হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং সংহতিবোধ এবং টিপু-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরো নানাভাবে বহুলাংশে নির্ধারিত হয়েছিল।

(গ) সংগঠনের এ বিশিষ্ট রূপের প্রাণকেন্দ্রে সক্রিয় ছিল এক ধরনের ধর্মবিশ্বাস—নেতার অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস। আগেই বলেছি, পাগলপন্থার জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ এ বিশ্বাস। কিন্তু বিদ্রোহের সময়কার এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। আগেকার বিশ্বাস হল, প্রতিকূল প্রাকৃতিক শক্তির উপদ্রব বা অন্য ধরনের আকস্মিক দুর্বিপাক থেকে নেতার অলৌকিক ক্ষমতা তাদের উদ্ধার করবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিত এবং রূপ স্বতন্ত্র: জমিদারতন্ত্র এবং ব্রিটিশরাজের অবসান, এবং স্বাধীন পাগলরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস নেতার অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে অপরাজেয় হবে।[১১১]

(ঘ) পাগলপন্থীদের বিশ্বাসের এ রূপান্তর তাই সংঘটিত হয়েছিল জমিদার- ও রাজ-বিরোধী কৃষক-চেতনার বিশ্বাসের একটা বিশেষ পর্যায়ে। ১৮২৪-২৫-এর আগেও মাঝে-মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে জমিদার-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছে কিন্তু এ বিশ্বাস তখন সক্রিয় ছিল না। এ বিশ্বাসের উদ্বোধন হয় সেই সময় যখন জমিদার-বিরোধী আন্দোলন এক রাজবিদ্রোহী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল। এর কারণ যুদ্ধজনিত এক বিশেষ অবস্থায় জমিদারি স্বৈরতায় আকস্মিক তীব্রতা বৃদ্ধি নয়। এর পটভূমিকায় ছিল সুনিশ্চিত এক নূতন প্রত্যয় যে, প্রজার কল্যাণসাধনে রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পুনর্বিন্যাস ছাড়া কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে না। পাগলরাজ প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা এ রূপান্তরিত বিশ্বাসের জন্মলগ্ন। আবার এ বিশ্বাস এই সংকল্পকেও প্রবল এবং সংহত করেছে।

(ঙ) মরিসনের কাছে এ-ধরনের বিশ্বাস স্রেফ 'আহাম্মুকি' মনে হতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহী পাগল-কৃষকদের চেতনার এ এক বিশিষ্ট ধর্ম। এমন নয় যে জমিদার আর ব্রিটিশরাজের সম্মিলিত শক্তির তুলনায় তাদের শক্তির হীনতা সম্পর্কে কোনো ধারণা বা অভিজ্ঞতা পাগলদের এ-বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল করেছে।[১১২] শত্রুপক্ষের শক্তিবিচারে কখনো তারা ভাবে নি, তারা এমনই হীনবল যে তাদের 'পরাজয় অনিবার্য'। বরং জয় সম্পর্কে নিশ্চিত প্রত্যয় তাদের নিত্যনিয়ত উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এমন নয় যে তাদের নিজেদের কোনো সামরিক প্রস্তুতি ছিল না; তাদের এ সহজ বিশ্বাস ছিল, নেতার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে তাদের এ-প্রস্তুতি হবে অপ্রতিরোধ্য। এ বিশ্বাসের মধ্যে মূঢ় কোনো ছলনা নেই; নেই নিজেদের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখার মতো আত্মপ্রবঞ্চনা। এ বিশ্বাস একান্তই সহজাত। তা বিস্তৃত যুক্তিজালের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো সিদ্ধান্ত নয়—যা যুক্তির বিবিধ উপকরণের হেরফেরে বহুলাংশে পালটে যেতেও পারে। এ-বিশ্বাসের আদিরূপ ভিন্ন; বিশেষ অবস্থায় তা রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। কিন্তু এ-বিশ্বাস তাদের যথাসাধ্য সামরিক প্রস্তুতির প্রচেষ্টাকে বিন্দুমাত্র শিথিল করে নি। এ বিশ্বাস তাদের দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অন্যান্য অনেক জায়গায় বিদ্রোহী কৃষকদের সামরিক প্রস্তুতি উন্নততর ছিল না; কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাস তাদের অনুপ্রাণিত করে নি। কারণ যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তাদের বিশ্বাসের জগৎ গড়ে উঠেছে, তা স্বতন্ত্র।

(চ) ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বিদ্রোহী কৃষকরা নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত; আর জাতিগত বিচারেও তারা পরস্পরের থেকে আলাদা; তাই পাগলপন্থা ধর্ম হিসেবে তাদের মধ্যে কোনো ঐক্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে নি—শেনডেলের এ ধারণাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। বিদ্রোহীরা যে একটিমাত্র উপজাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না, এটা ঠিক। নূতন ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপ্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করাও সম্ভব নয়। তবে শেরপুরের আপামর কৃষককুল যে এ নূতন ধর্মমত গ্রহণ করে নি, তা অনুমান করা যায়। কিন্তু আন্দোলনে পাগলপন্থার প্রভাব ছিল না, এ সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নয়।

আন্দোলনের সময় ধর্মবিশ্বাসের কোন্ বৈশিষ্ট্য তাকে প্রভাবিত করেছিল? এ বিশ্বাস সাধনপদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। এর উৎস, নেতাদের অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে আপামর কৃষকগোষ্ঠীর ধারণা—অন্তত আন্দোলনের বিশেষ মুহূর্তগুলিতে এ ধারণাই তাদের অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ বিশ্বাস তাই প্রধানত ধর্মীয় বিশ্বাস। ব্যক্তিজীবনে বা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীজীবনে ধর্মবিশ্বাস যাই থাকুক, এ নূতন বিশ্বাস গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে সাংস্কৃতিক বা ধর্মগত ব্যবধান সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছিল।

যেখানে উপজাতিরা সরাসরি পাগলপন্থা গ্রহণ করেছে, সেখানে এ গোষ্ঠীচেতনা আন্দোলনের সংগঠনকেও সমৃদ্ধ করেছে। যেখানে পাগলপন্থার প্রভাব মোটেই পৌঁছয় নি, বা খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানেও এ নূতন বিশ্বাসের ফলে কৃষকেরা বৃহত্তর এক গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নিজেদের মনে করত। আন্দোলনের মুহূর্তে, বড়ো পরিবর্তনের প্রত্যাশায় যখন কৃষকেরা অধীর, অন্য সব ব্যবধান, বা স্বাতন্ত্র্য-বোধ তখন লুপ্ত হয়ে যায়। আন্দোলনের সংগঠন অন্য ধরনের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সংগঠনের থেকে ভিন্ন।

৮

একটা বিশেষ পর্যায়ে ওহাবি-ফরাজি আন্দোলন ও পাগলপন্থী বিদ্রোহে ধর্মবিশ্বাসের বিশিষ্ট ভূমিকা আলোচনা করেছি। ১৮৩১-এর পর বাঙলায় ওহাবি আন্দোলনের সঙ্গে সংগঠিত কৃষকবিদ্রোহের বিশেষ কোনো যোগ দেখা যায় না। দুদু-পরবর্তী ফরাজি আন্দোলনে ধর্মবিশ্বাসের তুলনায় ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকাই ছিল বেশি। এ ভূমিকা প্রধানত কৃষকদের সংহতিচেতনাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অনুপ্রবেশের ফলে ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে ফরাজিদের গোড়াকার স্বাতন্ত্র্যবোধও অনেক দুর্বল এবং অস্পষ্ট হয়ে আসে। ১৮৩৩-এর পর পাগলপন্থীদের কোনো বড়ো আন্দোলন হয় নি। হলে ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব কী রূপ নিত, অনুমান করা শক্ত।

উপজাতিদের আন্দোলনে কিন্তু ধর্মের প্রভাব ক্রমেই বেড়েছে। বার-বার তাদের পরাভব ঘটেছে, কিন্তু আবার তারা শত্রুকে প্রতিরোধ করেছে। ধর্মের মধ্যেই তারা প্রতিরোধের প্রেরণা খুঁজেছে। এর জন্য নিজেদের প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস এবং আচারকে নতুনভাবে যাচাই করেছে। পুরনো বিশ্বাসের বেশ কিছু অংশ না ত্যাগ করলে শত্রুর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব। এ ধারণা তাদের পরিবর্তমান মানসিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দীর্ঘদিন ধরে চলেছে; কারণ নানাভাবে শত্রুর শক্তিবৃদ্ধিও ঘটেছে। পুরনো ধর্মবিশ্বাসের রূপান্তর যেমন ঘটেছে, তাদের প্রাচীন ইতিহাসকেও তারা নতুনভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছে। ধর্মচেতনা ইতিহাসচেতনার সঙ্গে মিশে গেছে। অনেক বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান তারা বর্জন করেছে বটে; কিন্তু গোষ্ঠী হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য-বোধ আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে।

বর্তমান আলোচনা তিনটি উপজাতির আন্দোলনে সীমাবদ্ধ—সাঁওতাল, মুণ্ডা আর ওরাওঁ। তিনটি আন্দোলনই দীর্ঘস্থায়ী ছিল। আন্দোলনের বিভিন্ন

পর্যায়ে ধর্মীয় প্রভাবের রূপও অভিন্ন নয়।

তিনটি আন্দোলন সম্পর্কেই আমরা কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

(ক) উপজাতিদের আন্দোলনে দুটি ধারা: সীমিত উদ্দেশ্যের আন্দোলন, এবং সমাজ- ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনসাধনের আন্দোলন। এ দ্বিতীয় ধরনের আন্দোলন কিভাবে শুরু হয়েছিল?

(খ) এ রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় ধর্মবোধের ভূমিকা কী ছিল?

(গ) আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উপজাতিদের ধর্মবোধই বা কীভাবে পালটে গেল?

৯

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ন্যায়পরায়ণতায় আস্থা সম্পূর্ণভাবে হারালেই বিক্ষুব্ধ কৃষককুল রাজনৈতিক ক্ষমতার আমূল পুনর্বিন্যাসের কথা ভাবে।

সাঁওতালদের মানসিকতায় এ পরিবর্তন কিভাবে ঘটল?

বস্তুত এ পরিবর্তন স্থানীয় প্রশাসনকে বিস্মিত করেছিল। সাঁওতালদের আচার-আচরণে, ভাবে-ভঙ্গিতে এর কোনো পূর্বাভাস আগে দেখা যায় নি। প্রশাসন হয়তো তাদের মনোভাব সম্পর্কে সব খবর রাখত না; কিন্তু তাদের যারা প্রধান শত্রু, যেমন মহাজন, তাদের তো জানার কথা। ধরতে গেলে ১৮৫৪ সালের মে-জুনের আগে মহাজন বা 'শান্তি-শৃঙ্খলা' রক্ষার ব্যাপারে সদাসতর্ক প্রশাসনের পক্ষে আশঙ্কাজনক এমন কোনো কিছু সাঁওতালেরা করে নি।

প্রশাসনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, সাঁওতালরা এর ন্যায়পরায়ণতায় সম্পূর্ণ আস্থাশীল। এ ধারণার ভিত্তি, মহাজন বা অন্যান্য দিখুদের সম্পর্কে অভিযোগ সরাসরি তারা স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিদের কাছেই জানিয়েছে। কারণ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তাদের বিচ্ছিন্নতা বলতে কিছুই ছিল না। সাঁওতাল অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে সরকারি প্রশাসনের অনুপ্রবেশ এত ব্যাপক আর গভীর হয়ে পড়েছিল যে ব্রিটিশরাজকেই তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র উৎস বলে মেনে নিয়েছিল।

অন্যান্য গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় নি, এমন জায়গায় সাঁওতালরা কদাচিৎ গ্রামপত্তন করেছে। যেসব অঞ্চলে সাঁওতালরা বিদ্রোহ করে, তারা সেখানকার আদিবাসী ছিল না। বাইরে থেকে এসে প্রধানত দুটো জায়গায় তারা বসতি স্থাপন করে—সরকারি এলাকা ডামিন-ই-কো, এবং আশে-পাশের জমিদারি এলাকা। জনবিরল ডামিনে আসার জন্য সরকারই প্রথম তাদের উৎসাহ দেয়। গোড়ার দিকে রাজস্ব ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধে দিয়েছিল। কিন্তু আস্তে-আস্তে রাজস্বের হার এবং পরিমাণ বাড়ে। সরকারি আমলার প্রভাবও তাই বাড়ে। রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত তহশীলদারের সংখ্যা বেড়ে চলে। রাজস্বের হার বাড়ানোর নূতন নিয়মে প্রশাসনের কর্তৃত্ব ক্রমেই কায়েম হয়। নির্দিষ্ট-পরিমাণ জমির জন্য নির্দিষ্ট-পরিমাণ রাজস্ব—এ ব্যবস্থা আগে চালু ছিল না। একজোড়া বলদ, গোরু বা মোষ দিয়ে যত জমি চাষ করা সম্ভব, তার উপর রাজস্বের হার ঠিক করা হত। নূতন ব্যবস্থায় আমলাদের তদারকির সুযোগ বাড়ল। তা ছাড়া নূতন বসতি স্থাপনের প্রয়োজনে মহাজনের উপর সাঁওতালদের নির্ভরতাও অপরিহার্য হল। অনেক প্রয়োজনীয় সামগ্রী তারা তৈরি করতে পারত না বলে বাইরের ছোটো-বড়ো ব্যবসায়ীর উপর তাদের নির্ভর করতেই হত। এ ধরনের লেনদেনের বিস্তার অনিবার্যভাবে সরকারি প্রশাসনেরও বিস্তার। পুরনো জমিদারি অঞ্চলে প্রশাসনের ভূমিকা আরো প্রত্যক্ষ। আবাদ, জন-সংখ্যা, ব্যবসা ইত্যাদি বাড়ার ফলে এ ভূমিকার ক্ষেত্র আরো বিস্তীর্ণ হয়।

প্রশাসনের ওপর এ আস্থা ক্রমেই দুর্বল হতে থাকে। প্রধানত মহাজনদের সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সাঁওতাল মানসিকতায় এ পরিবর্তন আসে।

মহাজনি শোষণ ও নিপীড়ন সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণার বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক, কারণ এ ধারণা তাদের বিদ্রোহের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। দেনার দায়ে মহাজনের কাছে জমি হারানোর ঘটনা পরবর্তী কালে বহু ঘটেছে; এভাবে বহু সাঁওতাল পল্লী মহাজনের কবলে চলে গেছে। ১৮৫৫-র আগে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা নগণ্য।

মহাজনি শোষণের তাৎপর্য শুধু চরম আর্থিক ক্ষতি নয়; মহাজনের কাছে বিচিত্র ধরনের অধীনতার বেড়াজালে সাঁওতালরা ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছিল। তাদের প্রধান অভিযোগ—দেনার দায়ে তারা শুধু সর্বস্বান্তই হয় নি; তারা 'গোলামে' পরিণত হয়েছে। নিজেদের সামাজিক মান-মর্যাদা সব খুইয়েছে; তাদের মা-স্ত্রী-বোনের 'ইজ্জত' নষ্ট হয়েছে; অথচ আদালতে এর কোনো প্রতিবিধান নেই।

সাঁওতালদের বদ্ধমূল ধারণা—কর্জের জন্য সুদ আদায়ের প্রথা 'ন্যায়' বিরোধী। বন্দী সাঁওতাল নেতা সিধু আর কানু রাজপুরুষদের এ কথা বোঝানোর জন্য একটা টাকা ও কিছু বীজ মাটিতে পুঁতে দিয়ে বলল, টাকাটা টাকাই আছে, বাড়ছে না; অথচ একটা বীজ থেকে কত ধানের চারা ওঠে।[১১৩] নেতারা এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নি। তারা সম্ভবত বলতে চেয়েছিল, ধার নেওয়ার ফলে যদি চাষের উন্নতি হত বা তাদের রোজগার বাড়ত, সুদ নেবার একটা যুক্তি থাকত। এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়, কেন সাঁওতালরা ধার নিত। ধারের ফলে রোজগার বাড়ে নি; কারণ পরিবারের ভরণ-পোষণ মেটানোর জন্যই ধারের প্রায় সব টাকা খরচ হয়ে যেত। সিধুর দেওয়া দৃষ্টান্তই যদি ধরি তাহলে মহাজনের থেকে নেওয়া ধান, বীজধান ইত্যাদি তো চাষের কাজে লাগানো যেত। কিন্তু এ ধরনের ধারও সাঁওতালরা করত। ফসল ওঠার সময় পর্যন্ত, মোটামুটি আহার্যের সংস্থান হিসেবে। যদি সুদ আদায় ন্যায়ধর্মবিরোধী হয়, তাহলে দেনা আদায়ের জন্য মহাজনদের নানা ফন্দিফিকিরকে তারা প্রকাশ্য প্রবঞ্চনা বলে মনে করত। তারা বলত, মহাজনি হিসেব-পদ্ধতি বোঝার মতো বিদ্যে-বুদ্ধি তাদের ছিল না। যেখানে মহাজনরা আইন-আদালত মারফত দেনা আদায়ের চেষ্টা করত সেক্ষেত্রে সাঁওতালদের অভিযোগ ছিল, আদালতের রায় মহাজনের একতরফা নালিশের উপর ভিত্তি করেই দেওয়া হত; তারা জানতেই পারত না, আদালত কিভাবে তাদের বিরুদ্ধে রায় দিল। শুধু তাই নয়। দেনা শোধের সামর্থ্য থাকলে মহাজনের সঙ্গে কোনোরকমে বনিবনা রক্ষা করা সম্ভব ছিল; না থাকলে মহাজনের হাতে হেনস্তার শেষ ছিল না। সাঁওতালরা একবার অভিযোগ করে, প্রতিহিংসাপরায়ণ মহাজন তাদের রোয়া খেতে টাটু ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে[১১৪]।

তবুও মহাজন ছাড়া তাদের চলত না। আর দেনা-শোধ না হওয়া পর্যন্ত মহাজনরা তাদের ইচ্ছেমত খাটিয়ে নিত। ধারও শোধ হত না, এ ধরনের 'গোলামি' ('কামিয়াতি') থেকেও মুক্তি জুটত না। বংশানুক্রমে এ বাধ্যবাধকতা থাকত।

'কামিয়াতি' প্রথার ব্যাপ্তি ঠিক করা শক্ত। সম্ভবত তখনও পর্যন্ত তা কয়েকটা অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে মহাজনরা সতর্ক থাকত, যাতে কামিয়ারা অন্যত্র না পালিয়ে যায়। অন্য জায়গায় কাজের সুযোগ জুটলে মহাজন নানাভাবে তাদের আটকাতে চেষ্টা করত। সবেমাত্র তখন রেলপথ বানানোর কাজ শুরু হয়েছে। মজুরের চাহিদা হঠাৎ বেড়ে যাওয়াতে এ কাজের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি মজুরি দিতে হত। কাঁচা পয়সার আকর্ষণে সাঁওতালরা এ কাজ করতে আগ্রহী হয়। বিনিপয়সার শ্রম হারানোর আশঙ্কায় মহাজনরা তাদের নানাভাবে বাধা দেয়।

সাঁওতালদের কাছে মহাজনিপ্রথার তাৎপর্য তাই

শুধু ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্দশা নয়—তা হল মহাজনের সহস্র নাগপাশে ক্রমেই জড়িয়ে পড়া, আর নিত্য-নিয়ত নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, পরিবারের ইজ্জতনাশ। এসব বোঝানোর জন্য সাঁওতালরা বলত, তারা যেন মহাজনের কেনা 'গোলাম'। এসবের ফল—সাঁওতাল-দের এক সুতীব্র গ্লানিবোধ।

অথচ এর থেকে পরিত্রাণের কোনো সহজ উপায় ছিল না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মহাজনের এসব কাজ অবৈধ। সম্ভবত স্থানীয় আদালতের যেসব উকিল-মোক্তারদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল, তারাই তাদের এসব কথা বুঝিয়েছে। মনে হয়, আদালতের কাছে সাঁওতালদের নানা আর্জিও তাদের লেখা।

আদালতে কোনো প্রতিবিধান মিলল না বলে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতালরা মহাজনের কাজ বিচার করল। তাদের মতে, এ-কাজ 'পাপ'।[১১৪ক] এ বিচারের মাপকাঠি নৈতিক। যা-কিছু গর্হিত, শুধু তাই 'পাপ' নয়; সাঁওতালদের ধারণায়, এটা ন্যায়-বিরোধী বলেই পাপ। এ ন্যায়ের ধারণা, অলঙ্ঘনীয় কোনো বিশ্ববিধানের ধারণা; এ বিধান সর্বত্র প্রযোজ্য। মহাজনের দুষ্কর্ম 'পাপ', কারণ তা সর্বত্রগামী নিয়মকে ভেঙেছে।

অর্থ নৈতিক বিচারে খানিকটা নির্দিষ্টতা থাকে। যেমন একটাকা ধারের বদলে ধান বা অন্য শস্য আদায় করতে গিয়ে মহাজন সাঁওতালচাষীকে কত ঠকাল, সে সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা চাষীর ছিল। কিন্তু নৈতিক বিচারে থাকে এক অনির্দেশ্য সীমান্ত। মহাজন সম্পর্কে তিক্ততা যতই তীব্র হচ্ছিল, নৈতিক বিচারের অস্পষ্টতাও বাড়ছিল। এ তিক্ততা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছল, যখন তাদের অর্থনীতিতে মহাজনের ভূমিকা সাঁওতালরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল; এ দিখু দুশমনদের সম্পূর্ণ বিনাশ তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

৯.১

মহাজনদের সম্পর্কে তাদের তিক্ততা ক্রমেই বাড়ছিল বটে, কিন্তু ১৮৫৪ সালের মে-জুন পর্যন্ত তারা কোনো হিংসাপ্রয়োগের কথা ভাবে নি। এমনও হয়েছে, মহাজনের কবল থেকে মুক্তির জন্য তারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। ১৮৪৮ সালে তিন-তিনটি গ্রাম এভাবে উজাড় হয়ে যায়। এ ধরনের ঘটনা সম্ভবত বড়ো একটা ঘটে নি। এ ধরনের সিদ্ধান্তে ঝুঁকি তো ছিলই। অন্য জায়গায় জীবিকা যে কম কঠিন হবে, তার কী নিশ্চয়তা আছে। তা ছাড়া, ধর্মীয় কারণেও তারা সহজে পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে চাইত না; তাদের বিশ্বাস, মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাদের যোগ এতে ছিন্ন হবে; কারণ এ গ্রামেই মৃতদের কবর।

সম্ভবত এভাবেই মহাজনদের সম্পর্কে তীব্র বিদ্বেষ নিরুদ্ধ এক আক্রোশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং সন্দেহ যে ক্রমেই বাড়ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মহাজনরাও আশঙ্কা করছিল, স্বভাবত-সহিষ্ণু সাঁওতালরা আক্রোশের বসে সহিংস কোনো পন্থা বেছে নেবে। এরকম আঁচও তারা সম্ভবত করেছিল। আগেভাগে তারা পুলিশ, আদালতকে তাদের আশঙ্কার কথা জানিয়ে দেয়। সাঁওতালদের একটা আর্জি থেকে এটা অনুমান করা যায়। সাঁওতালরা অভিযোগ করে, ধারের জন্য মহাজনের বাড়ি যাওয়ার মধ্যে তারা কোনো বদ মতলব সন্দেহ করত। এমনও নাকি হয়েছে, মহাজনরা থানায় নালিশ করেছে, সাঁওতালরা তাদের বাড়িতে হামলা করেছে। এ ধরনের নালিশের একটিমাত্র অর্থ, তারা সাঁওতালদের আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। মিছিমিছি সাঁওতালদের হেনস্তা করে তাদের কী-ই বা লাভ।

মহাজনদের আশঙ্কা মোটেই অমূলক ছিল না। ১৮৫৪ সালের মে-জুন মাসে ডামিন-ই-কো অঞ্চলে মহাজনদের বাড়িতে পরপর ছ বার সাঁওতালরা হামলা

করে[১১৫] (সরকারি দলিলের ভাষায় 'ডাকাতি')। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের কাছে খবর ছিল, আরো চল্লিশটা এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এ ঘটনাগুলি বিস্ময়কর ঠেকেছিল।[১১৬] কারণ, এ অঞ্চলে এ ধরনের হিংসার কোনো নজির নেই ; 'শান্ত এবং নির্বিরোধ প্রকৃতির' লোক বলেই সবাই সাঁওতালদের জানত। অথচ মাত্র সপ্তাহ দুয়েকের ব্যবধানে পর-পর এ হামলাগুলি ঘটে গেল। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার, মহাজনদের কোনো সম্পত্তিতে সাঁওতালরা হাত দেয় নি।

লক্ষণীয় ব্যাপার, পুলিশ, আইন-আদালত সম্পর্কে সাঁওতালদের মোহভঙ্গ হলেও এদের বিরুদ্ধে তখন হিংসার কোনো ঘটনা ঘটে নি। সম্ভবত সাঁওতালরা ভেবেছিল, এবার হয়তো প্রশাসন মহাজনদের শায়েস্তা করার জন্য কিছু একটা করবে। প্রশাসন যে এ-বিষয়ে কিছু ভাবে নি তা নয়।[১১৭] এ হামলাগুলির কারণ যে মহাজনি নিপীড়ন,—ভাগলপুরের ম্যাজিসট্রেট প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানতে পারে। তার পরামর্শ, সাঁওতালদের দেনা বা জমি সংক্রান্ত মামলা বিচারের ভার ম্যাজিসট্রেটের উপর দেওয়া হোক ; দেওয়ানি আদালতের বাঁধাধরা নিয়মকানুনের বদলে তিনি নিজের বিচারবুদ্ধিমতো মামলাগুলির নিষ্পত্তি করবেন। আইন-আদালত মারফত মহাজনরা নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করে নিচ্ছে। ম্যাজিসট্রেটের এ পরোক্ষ স্বীকৃতি তার পরামর্শের একটা প্রধান তাৎপর্য।

মহাজন-বিরোধী কোনো ব্যবস্থাই তখন নেওয়া হল না। বরং 'ডাকাতি'র অপরাধে হামলাকারীদের গুরু সাজা দেওয়া হল।

প্রশাসনের এ সহানুভূতিলেশহীন আচরণ সাঁওতালদের গভীরভাবে বিক্ষুব্ধ করে। বিদ্রোহের সময় বন্দী সাঁওতালদের অনেকেই বলেছে, সম্মিলিত প্রতিরোধের ভাবনা-চিন্তা তখন থেকেই শুরু হয়েছে বলা যায়। কেউ-কেউ এমনও বলেছে, তাদের 'হুল' এক তীব্র প্রতিশোধস্পৃহার ফল ; কারণ মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে সাঁওতালদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে।[১১৮]

তখনকার সাঁওতাল-মানসিকতার একটা প্রধান দিক, সরকারের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তাদের এত দিনের সন্দেহ এক গভীর অবিশ্বাসে পরিণত হল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মহাজনদের বাড়িতে হামলা অন্যায় কিছু নয়, মহাজনি উৎপীড়নের কথা তারা সরকারকে বহুবার জানিয়েছে ; কোনো ফল হয় নি; আর কী করা যায়, তারা ঠাহর করতে পারে নি ; মহাজনদের সতর্ক করে দেবার জন্যই তাদের ওপর হামলা ; সরকার কিন্তু তাদের এ মনোভাব বুঝতে চায় নি ; বরং সব দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে।

বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কোনো প্রতিহিংসা নেবার কথা তখন ভাবে নি। তাদের পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সুচিন্তিত যৌথ সিদ্ধান্তের ফল। 'হুল' শুরু হয় এর প্রায় এক বছর পর—১৮৫৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যবর্তী এ সময়ের ইতিহাস বহু দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, শত্রুর কবল থেকে মুক্তির নানা বিকল্প উপায়ের অনুপুঙ্খ বিচার, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার জন্য তীব্র হতাশার ইতিহাস। এ দ্বিধাদীর্ণ সাঁওতাল মানসিকতার বিস্তারিত বিবরণ মেলে না। তবে এটা আঁচ করা শক্ত নয় যে, এক প্রচণ্ড অস্থিরতা সমগ্র সাঁওতাল সমাজকে আলোড়িত করে তুলেছিল। সাঁওতালি সূত্র থেকেও জানা যায়, বিচিত্র ধরনের নানা গুজব এ সময় গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। স্পষ্টত, এক অজানিত শঙ্কার ভাব তাদের মধ্যে প্রতিফলিত।

সাঁওতালদের এ অশান্ত মনের খানিকটা পরিচয় মেলে ব্রাডলি বার্টের বিবরণে।[১১৯] এর ভিত্তি সম্ভবত বিদ্রোহের সময়কার কোনো মূল উপকরণ। "ডামিন-ই-কো'তে ১৮৫৪-র শীত মরসুম ছিল এক তীব্র অস্থিরতার সময় ; তা কিন্তু তখনও কর্তৃপক্ষের নজরে আসে নি···গোটা সাঁওতাল অঞ্চল জুড়ে যেন এক

অভূতপূর্ব ভাবের তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছিল—তা গভীর, রহস্যময়, বাইরে তার চিহ্নমাত্র নেই, অথচ একান্ত সত্য, এবং তীব্র ··এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এমনকী অরণ্যের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল এ অস্থির আবেগ···দর্শন, স্পর্শ এবং শ্রবণের অতীত এ আশ্চর্য বোধশক্তি সাঁওতালদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়· ১৮৫৪-৫৫ সালের সারা শীতকাল ধরে এটা চলল; বিদ্রোহের ধারণা তখনও মোটেই রূপ নেয় নি, কিন্তু এক অশান্ত মনোভাব সারা অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল।···দিনের শেষে প্রতিটি গ্রামে সাঁওতালরা জড়ো হত মাঝিস্থানে; অতি সন্তর্পণে একজনের মুখ থেকে অন্য জনের মুখে তাদের অসন্তোষের কথা ছড়িয়ে পড়ত···'

সাঁওতাল অঞ্চলে যেসব গুজব এসময় ছড়িয়েছিল, তার কিছু-কিছু মূল সাঁওতালি থেকে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে বাঙলায় অনুবাদ করেছেন।[১২০] কোনো-কোনো গুজব প্রাচীন সাঁওতাল লোকগাথা বা কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক গভীর শঙ্কাবোধ এবং সম্ভাব্য সঙ্কটের মুহূর্তে নিজেদের সংহতিরক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে নূতন উপলব্ধি। কয়েকটা উদাহরণ বাস্কের অনুবাদ থেকে তুলে দিচ্ছি।

একটা গুজব রটল, 'নাগনাগিনী আসছে মানুষ গিলবার জন্য। এ বিপদ কাটাবার জন্য পাঁচগ্রামের লোক জমায়েত হয়ে আর পাঁচগ্রামে যেত, একরাত ভক্তিভরে দেবতার আরাধনা করত···দুটি অবিবাহিত ছেলে পৈতে পরে, একটি ডালাতে নিম ও বেলকাঠের দুটি ছোটো সিন্দূরমাখানো লাঙ্গল নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাঁচটি গ্রাম ঘুরে শেষ করে তারা শেষের গ্রামের এক ফাঁকা মাঠে আমাদের ডেকে জড় করল। সেখানে বেলপাতা, আতপচাল ও সিঁদুর দিয়ে নাগনাগিনীর নামে পুজো করল। এ-সমস্ত করে তাদের গানগুলি আমাদের শিখিয়ে দিল···আমরাও তাদের মত পাঁচটা গ্রামে ঐভাবে ঘুরে বেড়ালাম।'

আর-একটা গুজব ছিল, 'একটা মহিষ আসছে; যার বাড়িতে উঠানে ঘাস দেখতে পাবে, সেখানে চরে বসবে। সে বাড়ির লোক মরে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে উঠবে না। এ ভয়ে সবাই রাস্তাঘাট পরিষ্কার করল।'

সংহতি রক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজন সম্পর্কে নতুন নৈতিক বোধকে ঘিরে কয়েকটা গুজব তৈরি হয়েছিল। যেমন, 'এক ছেলের মায়েরা সই পাতায়। কাপড় দেওয়া-নেওয়া ও খাওয়া-দাওয়া হত···হয়তো আত্মীয়তার বন্ধনে পড়ে যেন সবাই এক হয়। কোনো রকম বিদ্রোহ ঘটলে পরস্পরের নামে যেন কেউ কথা না লাগায়, এবং কোনো কথাবার্তা হলেও তা যেন গোপন থাকে।'

এ ধরনের আর-একটা গুজব: 'কে একজন দেকো-দের মারবার জন্য আসছেন। তোমরা রাস্তার মোড়ে একটা গরুর চামড়া ও এক জোড়া বাঁশী টাঙ্গিয়ে রাখবে, যেন তিনি বুঝতে পারেন যে তোমরা সাঁওতাল, না হলে তোমাদেরও সে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হবে। ভয়ে আমরা গ্রামে গ্রামে তা টাঙ্গিয়ে দিলাম।'

সাঁওতালদের সংহতিবোধের একটা প্রধান উৎস, ভিন্‌দেশী নানা সামাজিক গোষ্ঠী থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বোধ। মহাজনদের সম্পর্কে স্বাভাবিক বিদ্বেষ এ বোধ ক্রমেই প্রখর করেছে। কিন্তু একটা গুজব থেকে দেখতে পাই, হিন্দু সমাজের নিম্নতম জাতিগুলির অন্যতম ডোমদের সম্পর্কেও তাদের একই মনোভাব। যেমন, 'ডোমদের সম্বন্ধে এক গুজব রটল যে, কোন এক ডোমের ছোঁয়া লেগে গঙ্গা নদীতে সোনা বোঝাই নৌকা ডুবে গেছে। সেজন্য সমস্ত ডোমকে হত্যা করে শেষ করা হবে। ডোমরা ভয়ে বনের শিকারী পশুর মত পালাতে লাগল। সাঁওতাল-দের মত তারা পোষাক পরত, আর সাওতাল বাড়ীতে থাকত।'

যে তীব্র অশান্ত অনুভূতির কথা ব্রাডলি বার্ট লিখেছেন, তা এসব গুজবে অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত

হয়েছে। অন্যদিকে, এ অনুভবের বিপুল বিস্তারে এ গুজবগুলিরও ভূমিকা ছিল। এ ব্যাপ্তির একটা প্রধান কারণ হিসেবে বার্ট সাঁওতালদের বিশিষ্ট সমাজ-বিন্যাসের কথা বলেছেন। কিন্তু সাঁওতালদের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মুহূর্তগুলিতে গুজবগুলিও এ বিস্তারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। নানাজনের মুখে-মুখে ছড়াতে-ছড়াতে আদি কোনো কথার প্রসঙ্গ, প্রত্যক্ষ অর্থ, ব্যঞ্জনা, রঙ—সব কিছুই পালটে যায়। তাই তাতে অনির্দিষ্টতার সব লক্ষণ প্রকট হয়ে ওঠে। অনিশ্চিতের, অপ্রত্যাশিতের কুয়াশাময় এক পরিমণ্ডল তার চার ধারে গড়ে ওঠে। যে অস্থির মানসিকতার মধ্যে এ গুজবের জন্ম, তা এতে আরো বেড়ে যায়।[১২১]

যে সাঁওতালি আকর উপাদানের কথা বাস্কে উল্লেখ করেছেন, তার থেকে মনে হয়, সাঁওতালদের তখনকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত নানা গান এ ব্যাপ্তিতে সাহায্য করে। বিশেষ করে কুখ্যাত মহাজন কেনারাম ভকতকে ব্যঙ্গ করে লেখা নানা গান সাঁওতালদের মহাজন-বিদ্বেষকে আরো তীব্র করে তোলে।[১২২]

৯.২

যে দ্বিধা আর সংশয় দীর্ঘদিন সাঁওতালদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার একটা প্রধান কারণ, আন্দোলনে ব্রিটিশ রাজ সম্পর্কে তাদের করণীয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। স্থানীয় পুলিস, আইন-আদালতও ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙে গেল; কিন্তু বৃহত্তর রাজশক্তি সম্পর্কে তাদের সঠিক নীতি তারা বুঝে উঠতে পারে নি। কারো-কারোর আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, তাদের অভাব-অভিযোগ কলকাতার ছোটলাটকে জানালে প্রতিকার মিলবে। এ বিশ্বাস সাঁওতাল মানসিকতার এক বিশিষ্ট দিক। আসলে বিদ্রোহ শুরু হবার পরও তাদের এ বিশ্বাস অটুট ছিল। বিদ্রোহীদের কেউ-কেউ কলকাতায় গিয়ে ছোটলাটের কাছে আর্জি পেশ করার দায়িত্ব নিয়ে-ছিল। ১৮৬১ সালের আন্দোলনেও এ বিশ্বাস দেখা যায়।

সাঁওতালদের দ্বিধার আরো একটা কারণ, তাদের পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না কিভাবে ব্রিটিশরাজের পরাক্রমের সঙ্গে তারা পাল্লা দেবে। এ পরাক্রমের কথা তাদের অজানা ছিল না। পুলিশি দাপটের কথা তো তারা জানতই। ব্রিটিশ রাজের সৈন্যসামন্ত, বন্দুক, গোলা, গুলি—এগুলি সম্পর্কেও তারা বেশ কিছু জানত।

সব দ্বিধা আর সংশয়ের অবসান ঘটে ১৮৫৫ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি কোনো সময়ে দুই সাঁওতাল মাঝি সিধু ও কানুর প্রকাশ্য এক ঘোষণায়। তারা বলল—ভগবান প্রত্যক্ষভাবে তাদের কাছে আবির্ভূত হয়ে নির্দেশ দিয়ে গেছেন: শত্রুর বিনাশের জন্য সাঁওতালরা বিদ্রোহ করুক; তাদের জয় অনিবার্য; কারণ দিব্য অতিপ্রাকৃত শক্তি তাদের হয়ে লড়বে। এ ঘোষণায় সাঁওতালদের চেতনায় আমূল রূপান্তর ঘটল।

৯.৩

অতিপ্রাকৃত শক্তির ধারণা সম্পর্কে পাগলপন্থী ঐতিহ্য ও সাঁওতালি ভাষ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। পাগলপন্থীদের বিশ্বাস জাদুশক্তি, করিম শাহ, মা-সাহেবা এবং টিপুর দেহী অস্তিত্বে মূর্ত। সিধুকানু তা বলে নি; তারা শুধু বলেছে, ঐশী ঘোষণাটি প্রথমে তাদের কাছেই করা হয়েছে। অবশ্য সিধু-কানু এবং দিব্যশক্তির ভিন্নতার কথা তাদের অনুগামীরা মনে রাখে নি। সিধু-কানুই ভগবানে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দেবতার আবির্ভাবের ঘটনাটা আসলে কী, সে সম্পর্কে সাঁওতালদের পরিষ্কার কোনো ধারণা ছিল না। এ ঘটনার 'প্রত্যক্ষদর্শী' সিধু ও কানুর বিবরণেও অনেক গরমিল আছে। বন্দী অবস্থায় রাজপ্রতিনিধিদের কাছে তারা এ বিবরণ দিয়েছিল।

কানুর এক সাক্ষ্যমতে: 'বৈশাখ মাসে আমার

ঘরে ঠাকুরের আবির্ভাব···ঈশ্বর গৌরবর্ণ এক মানুষ, পরনে ধুতি ও চাদর; উঁচু এক জায়গায় বসলেন তিনি; কাগজের এক টুকরোর উপর লিখলেন; চারটে টুকরো আমাকে দিলেন; পরে আরো ষোলটা··· দিনের বেলায় তাকে দেখি না; শুধু রাতেই তাকে দেখা যায়।'

কানুর অন্য এক সাক্ষ্য[১২৩] [এ বিবৃতি পরোক্ষ উক্তিতে সাজানো হয়েছে]: 'এক সন্ধ্যাবেলা···উপরা থেকে তাদের [কানু এবং তার দুই ভাই] কাছে ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটল। সে [কানু] জিজ্ঞেস করল, দেবতা হয়ে তিনি গরীব মানুষের কাছে এলেন কেন। ঠাকুর বললেন, তাদের মঙ্গলের জন্যই। আরো বললেন, তিনি তাকে এবং তার ভাই সিধুকে 'ঠাকুর-সুবা' হিসেবে মনোনীত করেছেন; ভবিষ্যতে তারাই সাঁওতাল অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায় করবে; সরাসরি সরকারকে তা দেবে; কোনো দারোগা, বা ইজারাদারের মাধ্যমে নয়···সাঁওতালরা সমানভাবে নিজেদের মধ্যে জমি ভাগ করে নেবে; দেশ থেকে মহাজনদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে; জমিদারের সব ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে; তা ছাড়া বসতবাটীর জমি ছাড়া তাদের সব জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে।'[১২৪]

সিধুর সাক্ষ্য[১২৫]: মহাজনি জোরজুলুম থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে সাঁওতাল নেতাদের সম্মিলিত আলোচনার উল্লেখ করে সিধু বলল—'মাঝি এবং পরগনাইতরা সবাই আমার ঘরে হাজির হল; দু' মাস আমরা আলোচনা করলুম; পনটেট সাহেব ও মহেশদত্ত [দারোগা] আমাদের কোনো নালিশ কানে নেয় না; মা'বাপের মতো ব্যবহার করার কেউ আমাদের নেই। তারপর এক দেবতার আবির্ভাব; গাড়ির চাকার মতো দেখতে। আমাকে বললেন, পনটেট, দারোগা আর মহাজনদের খুন করো, তাহলে ন্যায় বিচার পাবে; আর পাবে বাবা-মা ['র মতো কাকেও)। ঠাকুর তখন চলে গেলেন।···ঠাকুরের আসার আগে এক টুকরো, তারপর আরো এক টুকরো কাগজ উপর থেকে পড়ল···তাতে লেখা আছে, মহাজনদের সঙ্গে লড়াই করো; তাহলে সুবিচার মিলবে।'[১২৬]

দেবতার আবির্ভাবের ঘটনা সম্পর্কে এ দুই নেতার বিবৃতি সরকারি মহল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে। তারা স্পষ্ট বলল—এ ঘোষণা দুই নেতার ভাঁওতামাত্র; ধর্মের নামে সাঁওতালদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করাই এ ঘোষণার লক্ষ্য; ধর্মের জিগির সাঁওতালদের প্রভাবিত করবেই, কারণ তারা 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন।' রাজ-প্রতিনিধিদের কেউ-কেউ এমনও বলেছে, কড়া মদের নেশায় স্বাভাবিক বিচারশক্তি হারিয়ে দু ভাই এ মিথ্যা কুহক সৃষ্টি করেছে।[১২৭]

এ ঘটনার ব্যাখ্যা সত্যিই দুরূহ। এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রশ্ন অবান্তর, কারণ শুধু দুজন এ ঘটনার সাক্ষী।

এর ব্যাখ্যায় দুটি জিনিসের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। সরকারি প্রতিবেদনেও বার-বার তাদের কথা বলা হয়েছে। (ক) এ ঘটনার আগের কয়েকটা মাসে গোটা সাঁওতাল সমাজ এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সরকারি রিপোর্টের সাদামাটা ভাষায় এর নাম 'উত্তেজনা'। এর সঠিক কারণও সেখানে নির্দেশ করা হয়েছে। বছরখানেক আগে মহাজনদের বাড়ি চড়াও হবার জন্য সাঁওতালদের যে কঠোর সাজা দেওয়া হয়েছিল, তা তারা একেবারেই মেনে নিতে পারে নি। দুঃসহ এক গ্লানিবোধ তাদের অবিরত পীড়িত করেছিল। (খ) দিব্যপুরুষ প্রত্যক্ষভাবে দুই নেতাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা আসলে এক দুরূহ প্রশ্নের সমাধান: কীভাবে তারা 'দিখু'দের কর্তৃত্ব আর শোষণ থেকে মুক্তি পাবে। বিশুদ্ধ ধর্মীয় কোনো প্রসঙ্গ এতে ছিল না।

এ-দুটো বিষয় মনে রাখলে এ ঘটনার ব্যাখ্যা খানিকটা সহজ হয়। এমন অনেক নজির আছে, তীব্র-অনুভূতিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন নিবিষ্ট-চিত্তে কোনো দুরূহ সমস্যায় মনোনিবেশ করলে হঠাৎ

তার সমাধান পেয়ে যায়। এ আকস্মিক কোনো প্রেরণার মতো ; এ সমাধান তার কাছে এত প্রত্যক্ষ, এত সন্নিকট, এত স্পষ্ট, এত সজীব যে, তার মনে হয়, বাইরে থেকে আসা কোনো বাণীর মধ্যে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে। যা একান্তভাবে তার অন্তর্লীন অনুভব, তা বাইরের অবয়ব নিয়ে আসে। তার মনে হয়, বহু-দূরস্থিত কোনো দেহী জ্যোতির্ময় সত্তা থেকে এ বাণী নিঃসৃত হয়ে এসেছে।

সিধু-কানুর কাছে দিব্যপুরুষের আবির্ভাব হয়তো এভাবেই ঘটেছিল। এ উপলব্ধি বিচ্ছিন্ন দুই ব্যক্তির ব্যক্তিগত মোক্ষলাভের চেষ্টার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় ; তা গোটা সাঁওতাল সমাজের মুক্তির উপায় সম্পর্কে সুদীর্ঘ অন্বেষার সঙ্গে যুক্ত। দিব্যপুরুষের নির্দেশ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৯.৪

দেবতার আবির্ভাবের ঘটনা বা তার ব্যাখ্যা যাই হোক, গোটা সাঁওতাল সমাজ একে তাদের মুক্তির জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বলে মেনে নিয়েছিল। বিদ্রোহের সূচনা আর বিস্তারে এ ঘটনার তাৎপর্য প্রধানত এজন্যই। তাদের দীর্ঘদিনের সংশয় এবং অস্থিরতা এতে দূর হল।

এ নূতন ধর্মচেতনা তাদের মানসিকতায় আনে এক আকস্মিক আমূল রূপান্তর। এ চেতনার প্রসার কিভাবে ঘটল, তা মোটামুটি অনুমান করা যায়। এ ঘটনা সম্পর্কে দুই নেতার ঘোষণা যাতে বহু সাঁওতালের কাছে পৌঁছাতে পারে, এজন্য তারা গোড়া থেকেই তৎপর ছিল। বিশেষ দূত মারফত তারা দূর-দূরান্তে এ ঘটনার প্রচার করে। সাঁওতাল-দের ওই সময়কার বিশেষ মানসিকতায় দূতের এ ভূমিকা দীর্ঘদিন অপরিহার্য থাকল না। তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এ খবর ছড়িয়ে দেয়। অল্প সময়ের মধ্যেই এ ঘোষণা জনশ্রুতির মাধ্যমে সর্বব্যাপী এক জীবন্ত বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

শুধুমাত্র দূত-মারফত প্রচারকেই সিধু কানু যথেষ্ট মনে করে নি। তারা চেয়েছিল, নানা অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা এসে আবির্ভাবের ঘটনাস্থল, নূতন দেবতার পূজামণ্ডপ, পুজোর আয়োজন প্রত্যক্ষ করুক। তাদের ধারণা ছিল, তাদের ঘোষণায় সাঁওতালদের বিশ্বাস এতে আরো দৃঢ় হবে।

নেতারা বলে পাঠান, তারা যেন পুজোর উপকরণ হিসেবে দুধ নিয়ে আসে। পুজোর একটা অঙ্গ ছিল নূতন বসানো ঠাকুরের মাথায় দুধ ঢালা। ২৫শে জুলাই লেখা মুর্শিদাবাদ ম্যাজিস্ট্রেটের এক চিঠিতে নূতন ঠাকুরের পুজো, তাঁর দর্শনলাভের জন্য সাঁওতাল-দের কৌতূহল ও সশ্রদ্ধ অধীর প্রতীক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ মেলে।[১২৮] ভাগনাদিহির এ অঞ্চল তখন ব্রিটিশ সেনার দখলে। সিধু-কানু, তার অনু-গামীরা সব সে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট পাশের গ্রামগুলি থেকে ঠাকুর-সংক্রান্ত নানা তথ্য যোগাড় করেন।

'ঠাকুর আসলে মাটির তৈরি বৃত্তাকার একটা জিনিস ; ছ'ফুট তার ব্যাসার্ধ, মাটি থেকে দু' ইঞ্চির মতো উপরে তোলা, পাশের মাটির সঙ্গে তা' আঁটা ; এর কেন্দ্রে আর একটা ছোটো বৃত্তের মতো করা হয়েছে ; তিন ইঞ্চির মতো তার ব্যাসার্ধ।···পাহাড়ীরা যে ধরনের গোরুর গাড়ি ব্যবহার করে ঠাকুর আসলে তার চাকার মতো·· ঠাকুরের পাশে ছড়ানো রয়েছে পাঁঠা আর দুটো মোষের কাটা মুণ্ডু ; আজ সকালেই দেবতার নৈবেদ্য হিসেবে তাদের বলি দেওয়া হয়েছে··· মাস দুই আগে সিধু আর চাদ গ্রামের মাঝিদের বলে বেড়াল, তাদের ঘরে ঠাকুর দেখা দিয়েছেন ; প্রত্যেকে যাতে পুজোর নৈবেদ্যর জন্য একবাটি দুধ নিয়ে আসে। কী রূপে ঠাকুর দেখা দিয়েছেন, গ্রামবাসীদের এ প্রশ্নের উত্তরে জানানো হল, আগুনের শিখার মতো। দুই ভাই আরো বললেন, আগামী শুক্রবার ঠাকুর আবার দেখা দেবেন ; সবাই যেন তাঁদের বাড়িতে তাই আসে। এ নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামবাসীরা রোজ তাঁদের বাড়িতে

দুধ নিয়ে যেত; ঠাকুরের সামনে তা রাখা হত; এ দুধ নাকি উপচে পড়ত; তাকেই ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রমাণ বলে বলা হত। কেউ এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে বলা হত, তার দুধের রঙ নীলচে; ঠাকুরের প্রতি সে বিশ্বস্ত নয়; তার আনা দুধ নেওয়া হত না। শুক্রবার কানু-সিধুর বাড়ীতে ঠাকুরকে দেখার জন্য সবাই হাজির হল। তাদের কিন্তু বলা হল, সেদিন ঠাকুর দেখা দেন নি; পনেরো দিন পরে পূর্ণিমার রাতে দেখা দেবেন। সিধু তাদের দুটো ছাপা বই দেখাল; আর কয়েক টুকরো কাগজ, এবং একটা ছুরি; বলা হল, ঠাকুরই এসব পাঠিয়েছেন। ঠাকুর বলেছেন, সাঁওতালরা এবার রাজা হবে; বলদের হালের জন্য এক আনা, আর মোষের হালের জন্য দু আনা খাজনা ধার্য হবে; মহাজনদের কিছুই দিতে হবে না, ভবিষ্যতে টাকায় এক পয়সা করে সুদ দিতে হবে; ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে; তাদের বন্দুক থেকে শুধুমাত্র জল বেরুবে। পূর্ণিমার আগেই সিধু সব সাঁওতালদের তার বাড়িতে আসতে বললেন।

'যে চারটে বই আকাশ থেকে পড়েছিল বলে বলা হয়েছিল, যাতে ঠাকুরের সব নির্দেশ লিখিত ছিল, বলে রোজ ঠাকুরবাড়িতে পড়া হত, আসলে তা সেণ্ট জন্ কথিত সমাচারের অনুবাদ। সিধুর বাড়ির বারান্দায় তাদের পাওয়া গিয়েছিল; সেখানে বসেই সিধু নানা নির্দেশ দিতেন; বারান্দার খুব কাছেই ঠাকুরকে রাখা হয়েছিল। বইগুলো সাদা কাপড়ে বাঁধা; সোনালি সুতো দিয়ে মোড়া।'

সাঁওতাল মানসিকতার রূপান্তরে অগণিত সাঁওতালের এ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিশেষ ভূমিকা আছে। দেবতার দর্শন নাই মিলুক, কিন্তু নূতন সুবা ঠাকুরের প্রত্যক্ষ দর্শন তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন এক অভিজ্ঞতা। তারা সাক্ষাৎ 'সুবা ঠাকুরের' মুখ থেকে সব শুনতে পেল। নেতাদের এ ঘোষণায় কোনো গোপনীয়তা ছিল না। সাঁওতাল ছাড়াও উৎসুক অন্য সবাইকে একই কথা বলা হত। তবে সুবা-ঠাকুরের কথায় কেউ প্রকাশ্যে অবিশ্বাস প্রকাশ করলে তারা স্বভাবতই রুষ্ট হত। এক সরকারি দলিল থেকে জানতে পারি, এ রকম অবিশ্বাসী এক অ-সাঁওতাল দর্শনার্থীকে নেতার নির্দেশে আটক করা হয়েছিল। সরকারি বর্ণনায় এমন কোনো ইঙ্গিত মেলে না যে, সাঁওতালদের অপূর্ণ প্রত্যাশার জন্য নেতাদের সম্পর্কে তাদের মনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

[ক্রমশ

সূত্র-নির্দেশ ও টীকা

১১১. পাগলপন্থী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে এ অলৌকিক শক্তির কোনো ভূমিকা নেই—শেনডেলের এ সিদ্ধান্ত বিচারসাপেক্ষ। এটা সত্যি যে, এ ধরনের অনেক আন্দোলনে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরতা অনেক বেশি ছিল। কোথাও-কোথাও এমনও দেখা গেছে, শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য বিদ্রোহীরা কোনো ব্যবস্থাই করে নি। তাদের বিশ্বাস ছিল, অতিপ্রাকৃত শক্তির আবির্ভাব আসন্ন; তাদের প্রধান করণীয়, শুধুমাত্র অধীর আগ্রহে তার জন্য অপেক্ষা করা; তাকে স্বাগত জানাবার জন্য সমবেত প্রার্থনা, গান বা নৃত্যের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত এক মানসিকতা তৈরি করা। শত্রুর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের একটামাত্র রূপ, এটা তারা বিশ্বাস করত না।

পাগলপন্থী আন্দোলনে এ ধরনের নিশ্চেষ্ট প্রতীক্ষার ভূমিকা ছিল সীমাবদ্ধ। বিদ্রোহীরা অবশ্যই জাদুশক্তি, মন্ত্র-শক্তিতে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তাদের ধারণা, তাদের নেতার মধ্যেই অতিপ্রাকৃত শক্তি মূর্ত হয়েছে। এর বাইরে কোনো শক্তির কথা সম্ভবত তারা কল্পনা করে নি। নেতার এ শক্তির উৎসও এক ধরনের জাদুশক্তি। এ শক্তিকে অতিপ্রাকৃত বলা চলে এ কারণে যে শুধুমাত্র নেতারই এ ক্ষমতা আছে। তাদের বিশ্বাস ছিল, নেতার মন্ত্রশক্তিতেই তাদের ব্যবহার্য সব সামরিক উপকরণে অপ্রতিরোধ্য এক শক্তির উদ্ভব হবে। বিশেষ গাছের কাঠ থেকে পাওয়া কাঠের তৈরি অস্ত্রশস্ত্রও তাই এ মন্ত্রের জোরেই ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাভূত করতে পারবে। তা ছাড়া, জাদুশক্তি শুধু যে দৃষ্টিগোচর বস্তু মারফত কার্যকর হবে, তা নয়। কারণ এ শক্তি অদৃশ্য শক্তি—মন্ত্রের

শক্তি। তাই নিরবয়ব শক্তির প্রভাবে বহুদূরের ব্রিটিশ বাহিনীর স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যাহত হবে।

১১২. ভিন্ন এক মত ব্যক্ত করেছেন গৌতম ভদ্র। পূর্বোল্লেখিত, পৃ প্র ৯৪ : 'অনিবার্য পরাজয়ের আশঙ্কা ও সাময়িক সাফল্যের অভিজ্ঞতাই জীইয়ে রাখে ধর্মভাবকে, কৃষক তার তৈরি কর্মকাণ্ডের নেতা খুঁজে বেড়ায় ধর্মীয় পীরে। সাফল্যকে স্থায়ী করে রাখতে চায় পীরের অলৌকিক জাদু-বিদ্যায়...'

১১৩. Bengal Judicial Proceedings ; 6 Dec. 1855 ; No. 52. বন্দী সাঁওতাল রঞ্জিৎ মাঝির বিবৃতি। ধার ধানে নিলে 'সুবা' পঁচিশ শতাংশ সুদ অনুমোদন করে।

১১৪. দামিন-ই-কোর সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট পন্টেট ১৮৪৯-এর ২২শে মে'র এক রিপোর্টে সাঁওতালদের এ অভিযোগের উল্লেখ করেন। Bengal Judicial Proceedings ; 14 Feb. 1856, No. 157. বিদ্রোহের উপর লেখা বীডওয়েল-এর রিপোর্টের অনুচ্ছেদ ৪৬।

১১৪ক. Bengal Judicial Proceeding ; 4 Oct. 1855, No. 16. রাজমহলে 'সাহেবদের' কাছে পাঠানো সিধু / কানুর স্বাক্ষরিত যে পরোয়ানায় মহাজন ও সাহেবের 'পাপ'-এর কথা বলা হয়েছে, তার তারিখ দেওয়া আছে : ১০ শ্রাবণ, ১২৬২।

১১৪খ. আর্জির তারিখ ২৯ অগস্ট, ১৮৫৪। বীডওয়েল-এর রিপোর্টের ৭৪ অনুচ্ছেদে এর উল্লেখ আছে। এ রিপোর্ট (১০ ডিসেমবর ১৮৫৫)-এর রেফারেনসের জন্য পাদটীকা ১১৪ দ্রষ্টব্য।

১১৫. Bengal Judicial Proceedings ; 9 Nov. 1854 ; No. 85 : ভাগলপুর কমিশনের লেখা চিঠি 29 Aug. 1854.

১১৬. ভাগলপুর বিভাগের কমিশনের মন্তব্য : 'The occurence of so many dacoities in quick succession...excited surprise and alarm. [Para 3].

১১৭. একই ; Paras 5-6.

১১৮. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July 1855 ; No. 44. ভাগলপুর কমিশনারের লেখা চিঠি 9 July 1855. Para 4. "the Santals had collected ...to the number of 6 or 7000, for the purpose (it was rumoured) of arranging the punishment inflicted on their comrades concerned in last year's dacoities. These dacoities were committed on the Bengalee Mehajuns who had oppressed them, and they complained that their comrades had been punished, while nothing had been done to the mehajuns whose exactions had compelled them to take the law into their own hands".

১১৯. F. B. Bradley-Birt, *The Story of an Indian Upland* (London, 1905) ; পৃ ১৮৩-৮৫। এ অনুবাদ সম্পূর্ণ আক্ষরিক অনুবাদ নয়। সরকারি দলিলে সাঁওতাল মানসিকতায় এ ধরনের পরিবর্তনের কোন উল্লেখ আমি পাইনি।

১২০. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, **সাঁওতাল গণ-সংগ্রামের ইতিহাস** (কলিকাতা, ১৯৭৬) ; নবম অধ্যায়। এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : (Additional Account by old Jugia', in Krefsurd, Bodding, Konow (tr & ed). *Traditions and Institusions of the Santals* (Oslo, 1942), পৃ ১০৯-৯১।

১২১. বিদ্রোহের মানসিকতার প্রসারে গুজরের ('anonymous speech in its classic form') ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য : Ranajit Guha, *Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India* (O. U. P., 1983), পৃ ২৫১-২৭৭।

১২২. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোল্লেখিত, পৃ ৬৩-৬৫

১২৩. Bengal Judicial Proceedings ; 20 Dec 1855 ; No. 132 ; 'Examination of Kanoo Santal'.

১২৪. Bengal Judicial Proceedings ; 20 Dec 1855 ; No. 83 ; 'Statement of Insurgent Sonthals'.

১২৫. Bengal Judicial Proceedings ; 8 Nov 1855. No. 26 ; 'Examination of Sedoo Sonthal lale Thacoor'.

১২৬. ব্রাডলি-বার্টের বইতে অন্য ধরনের বর্ণনা আছে। পূর্বোল্লেখিত ; পৃ ১৮৫-৮৬

১২৭. টেলরের (যিনি নূতন রেলপথ বানানোর কাজের তত্ত্বাবধান করছিলেন) বিবৃতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

'the Sonthals from living such a lazy drunken life for sometime past had got into a very excited inflammable state, and the leader perceiving this...formed a plan to plunder the country... They know that the only way to get the Sonthals to rise was to work upon their superstitions, and impose upon them the story of the Thacoor having given them the order to do so'. বিদ্রোহের উপর বীডওয়েলের রিপোর্ট (পূর্বোল্লেখিত) : Para 27. বীডওয়েল টেলরের এ সিদ্ধান্ত মোটামুটি মেনে নেন। 'a spirit of resistance nursed by the drinking and dancing assemblies"—তিনিও এর উল্লেখ করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত : 'at any rate an inflammatary state was produced, which required but a spark to set the whole Damin in a flame. This spark was supplied by the pretended divine revelation to Seedoo'. Para 76. ক্যাপ্টেন শেরউইল (Revenue Surveyor on Special Duty) একই কথা বলেছেন : 'When his [Santal's] ideas are assisted by the powerful muhooa spirit or by smoking ganja.....the Sonthal may be driven to acts of violence and desperation.' (Bengal Judicial Proceedings, 14 Eeb, 1856, No. 159).

১২৮. Bengal Judicial Proceedings; 23 Aug, 1855. No. 306। মুর্শিদাবাদ ম্যাজিস্ট্রেটের এ রিপোর্টের তারিখ ২৫ জুলাই, ১৮৫৫ ; Paras 6, 11.

শীলা যখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ত, তখন সে দৈনিক খবরের কাগজ পড়ত না। তখন সে লিখত

'সকলের চোখের সামনে অন্যায়টা হল, কিন্তু কেউ প্রতিকারের চেষ্টা করল না।'

এখন অষ্টম শ্রেণীতে সে দৈনিক খবরের কাগজ পড়ে, তাই এখন তার কলম থেকে বেরিয়ে আসে

'যতই প্রচেষ্টা কর, ওকে বাগে আনতে পারবে না।'

শীলার কানটা একেবারে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়
ব্রহ্মদেশে মিশনারিগণ

ইন্দো-চায়নায় ফরাসিদিগের রাজ্যস্থাপনের প্রসঙ্গে বার্নিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন—

ফরাসিগণ সেদেশে প্রথমত মিশনারি, পরে বাণিজ্যদ্রব্য এবং শেষে সৈন্য পাঠাইয়া ইন্দো-চায়নার উৎকৃষ্ট দেশগুলি অধিকার করে।

ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মত এই যে, ব্রহ্মদেশে ইংরেজগণ সে-নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্যলাভ করে নাই। ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া ন্যায়সঙ্গত অর্থ উপার্জনের জন্যই অন্যান্য এশিয়ান ও ইউরোপীয়ান বণিকগণের ন্যায় ব্রহ্মদেশে আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় রাজাগণ প্রথমত এইসকল ইংরেজ বণিকদিগকে ব্রহ্মদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য সাহায্য ও অনুমতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী রাজাগণ প্রতিযোগী বণিকগণের বা অধস্তন কর্মচারীদিগের পরামর্শে এই ন্যায়সঙ্গত বাণিজ্যে বিঘ্ন উৎপাদন করাতে "বাণিজ্যস্বত্ব রক্ষার জন্য", "নির্যাতিত রাজ্য (আরাকান, মণিপুর, আসাম ইত্যাদি) বা ব্যক্তিবিশেষকে সাহায্য করিবার জন্য" ইংরেজরাজ ব্রহ্মরাজগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হন। ব্রহ্মদেশে খ্রীষ্টান মিশনারিগণ আগমন করেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা আসেন ব্রহ্মদেশে ইংরেজের প্রভাব বিস্তৃত হইবার পর। ইন্দো-চায়নায় ফরাসি মিশনরিগণের ন্যায় ইঁহারা ব্রহ্মদেশের রাজনৈতিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। অখ্রীষ্টানদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও অশিক্ষিতদিগকে শিক্ষাদান করাই ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

পূর্বোক্ত এই মত সমর্থনের জন্য, ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে এক জনহিতৈষী-ভাবাবেগের (humanitarian movement) উৎপত্তি হয়। বিজিত বা নির্যাতিত দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদিগের

নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য এবং তাহাদিগকে সভ্যতা ও শিক্ষার আলোক প্রদানের জন্য সহৃদয় ইংরেজ নরনারীগণ সুদূর ব্রিটেন হইতে ভারতবর্ষ, নিউ-জিলাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে বহু অর্থ-ব্যয়ে খ্রীষ্টান মিশনারিদিগকে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন। "অবনত নেটিভদিগের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহা-দিগের কষ্ট দূর করিবার জন্যই ইংলণ্ডের সহৃদয় ব্যক্তি-গণ এইসকল মিশনারি সম্প্রদায় সংগঠন করেন" বলিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাসে লিখিত আছে।

এই শুভ উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যেসকল সমিতি সংগঠিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সমিতি উল্লেখযোগ্য :

১। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি, ২। লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি, ৩। স্কটিশ মিশনারি সোসাইটি, ৪। চার্চ মিশনারি সোসাইটি, ৫। ব্রিটিশ ফরেন সোসাইটি, ৬। এস-পি-জি সোসাইটি ইত্যাদি।

এইসকল সংঘের কার্যপরিচালনার জন্য গ্রেট-ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের খ্রীষ্টান মহানুভব ব্যক্তিগণ যথেষ্ট অর্থপ্রদান করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে দাসবিক্রয়প্রথা বন্ধ করিয়া, ইংরেজ মিশনারিগণ সহস্র সহস্র আর্ত নর-নারীর আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত দেশীয়দিগকে নির্মমভাবে নির্যাতিত করিয়া যেসকল পরস্বাপহারী ইউরোপীয় বণিকগণ প্রাচ্য-মহাদেশে ধনশালী হইতেছিল, তাহাদিগের অত্যাচার দমনের জন্য ইংলণ্ডের মিশনারিদিগের আন্দোলনের ফলে, ইংরেজদিগের মনে এক ধারণা জন্মায় যে :

It was the duty of the British Power to prevent the ruthless exploitation of the primitive people and to lead them gently into civilized ways of life.

এই ভাবের বশবর্তী হইয়া "ইংলণ্ডের মিশনারিগণ নিউজিলাণ্ড, জুলুল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অনেক প্রশংসনীয় কার্যের অনুষ্ঠান করেন, এবং তাঁহাদিগের চেষ্টায় নিরীহ ও অসহায় নেটিভদিগের কষ্ট দূরীভূত হয়।" বঙ্গদেশে যেমন কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি মহানুভব পাদ্রীগণ দেশীয় বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, অনাথ, আর্ত বা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীকে সাহায্যদান করেন, এবং বাঙলা ও ইংরেজি ভাষায় সংবাদপত্র মুদ্রিত করিয়া দেশের অভাব ও অভিযোগ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করিতে থাকেন, ফরাসি ও ইতালীয় পাদ্রীগণও তেমনি ব্রহ্ম-দেশে আসিয়া ভজনালয় প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া "অখ্রীষ্টান অসভ্য জাতির" মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের আলোক প্রদান করিতে থাকেন। Humanity and civi-lization—এই বাক্যই তাঁহাদিগের প্রচারকার্যের মূলমন্ত্ররূপে গৃহীত হয়। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই তাঁহাদের ছিল না। দয়াবান ব্যক্তিদিগের অর্থসাহায্যে "লোকহিতব্রতের অনুষ্ঠানের জন্য" ও "সুসমাচার প্রচারের জন্যই" তাঁহারা এদেশে প্রেরিত হইয়া-ছিলেন। ইহাই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত।

তাঁহারা আরও বলেন, "ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষগণ প্রথমত এইসকল পাদরীগণের লোকহিতকর চেষ্টায় ভারতবর্ষের শাসনকার্যে বিঘ্ন ঘটিবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন; কিন্তু শীঘ্রই মিশনারিগণ ইংরেজ সরকারের অর্থ সাহায্যে এবং শাসন-বিভাগস্থ কর্ম-চারীদিগের সহযোগিতায় এবং শিক্ষাবিভাগের ডাই-রেক্টর ও ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে, শিক্ষাদানে নিযুক্ত হওয়াতে কর্তৃপক্ষগণের সে আশঙ্কা দূরীভূত হয়।

'কিন্তু যে বিদ্যা বা যে জ্ঞান প্রদান করিলে দেশীয়গণ সচল ও স্বাবলম্বী হইতে পারিত, সেরূপ শিক্ষাদান করা মিশনারিগণের পক্ষে অসম্ভব হয়। ইংরেজি ভাষা, ব্যাকরণ, ভূগোল ও অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রাথমিক জ্ঞান প্রদান করিয়া, ইংরেজ সরকারের কোর্ট কাছারি অফিসে কিংবা বণিক কোম্পানির অফিস, গুদাম ও কারখানাতে চাকুরি গ্রহণ করিবার

জন্য যে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সেইরূপ বিদ্যাদান করিবার জন্যই তাঁহাদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত হইতে থাকে।' (বর্মার ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার পৃ ৮৮)

উচ্চব্রহ্মের স্বাধীন ব্রহ্মরাজসরকারে ইংরেজি ভাষায় চিঠিপত্র বা হিসাব রাখিবার প্রয়োজন ছিল না; বর্মিভাষাতেই কোর্ট-কাছারি ও অফিসের কার্য নির্বাহিত হইত। সুতরাং সেদেশে মিশনারি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা উপলব্ধ হয় নাই।

স্কট সাহেব তাঁহার গেজেটিয়ারে বলিয়াছেন যে 'ব্রিটিশ মিশনারিগণ ব্রহ্মদেশে আসিবার অনেক পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক মিশনারিগণ পিগুপ্রদেশে স্কুল ও গির্জা স্থাপন করিয়াছিলেন।' কিন্তু এইসকল ভজনালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, নিম্নব্রহ্মস্থ খ্রীষ্টান, ফিরিঙ্গি ও বিদেশীয় বণিকগণের বা তাহাদিগের উৎপাদিত দেশীয় পুত্রকন্যাদিগের ভগবদ্-ভজনার জন্য স্থান দেওয়া। বৌদ্ধ ব্রহ্মদেশীয়দিগকে খ্রীষ্টান করা ঐ মিশনারিগণের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল না। থাকিলেও এরূপ উদ্দেশ্য ব্রহ্মসরকারের ভয়ে প্রকাশ করা যাইত না। ঐসকল ভজনালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই মিশনারিগণ যখন ব্রহ্মরাজসরকারের নিকট জমি পাইবার দরখাস্ত করেন, তখন ব্রহ্মরাজার খ্রীষ্টান প্রজাদিগের জন্য ভজনালয় নির্মাণের উদ্দেশ্যেই জমি প্রয়োজন বলিয়া দরখাস্ত করিতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকান ব্যাপটিস্টগণও ব্রহ্মদেশে আসিয়া ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁহারাও নাট-ভক্ত কারেন ও শিথিলধর্ম তালাং ও মৌন জাতির মধ্যে প্রচারকার্য নিবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বর্মিগণ খ্রীষ্টান ধর্মে আস্থাবান ছিল না; মিশনারি স্কুলেও তাহাদিগের পুত্রকন্যাগণ বিদ্যালাভের জন্য যাইত না। তালাং মৌনং, বিশেষত কারেনরাই মিশনারি স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যাইত। ইওরোপীয় বণিকগণের সংশ্রবে, বাণিজ্য-ব্যবসায়ী তালাংগণ ইংরেজ বিদ্যাশিক্ষার উপকারিতা উপলব্ধি করাতে, তাহারাই সর্বপ্রথম তাহাদিগের পুত্রকন্যাকে মিশনারি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে এবং তালাং ও কারেনরাই সর্বপ্রথম স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টধর্ম বরণ করিতে থাকে। এইসকল খ্রীষ্টান যুবকরা টেনাসরিম ও আরাকানে ইংরেজ সরকারে বা বিদেশীয় বণিকদিগের অফিসে চাকুরি গ্রহণ করে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বর্মাদিগের সহিত এইসকল স্বধর্মত্যাগী কারেন-তালাং-মৌন্-আরাকানিদিগের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়।

যদিও চাকুরি-গ্রহণোপযোগী লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াই মিশনারি স্কুলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তথাপি কৃতবিদ্য দেশীয়দিগকে ইংরেজ রাজ্যে দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত করা তখন অসম্ভব ছিল। স্বাধীন ব্রহ্মদেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে শ্রেণীধর্মনির্বিশেষে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করিবার প্রথা ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনকর্তাগণ দেশীয়গণকে সে-অধিকার দিতেন না। সম্ভবত সদ্য অধীনতা-গ্রস্ত দেশীয়গণের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকাতেই বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁহার পরবর্তী বড়লাটগণ স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছিলেন যে 'দায়িত্বপূর্ণ কর্মে দেশীয়গণকে নিযুক্ত করা হইবে না।'

পরে স্যার টমাস মানরো প্রভৃতি সহৃদয় ব্যক্তিগণ 'urged the necessity of giving natives a higher opinion of themselves, by placing more confidence in them and rendering them eligible to almost every office.'

ইংরেজ রাজ নিম্নব্রহ্ম অধিকার করেন ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়ামেনট মহাসভা আদেশ প্রদান করেন যে—

'No native or any natural born subject of His Majesty, shall by reason of his religion, place of birth, descent

or colour be disabled from holding any place, office or appointment under the East India Company.'

কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্তও

'Not a single native was placed in a better position in consequence of that clause in this statute.' (Hay Comerson)

and

'No sooner was the Act passed, than the Government began to devise means for practically avoiding the fulfilment of it.' (Lord Lytton)

ব্রহ্মদেশে আগমনের প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে শাসনকার্য করিয়া ইংরাজ রাজকর্মচারিগণ প্রাচ্য জাতিদিগকে সুশাসনে রাখিবার নীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিজিত নিম্ন-ব্রহ্মের মিশনারি বিদ্যালয়গুলিকে প্রথম হইতেই গভর্নমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় এবং গভর্নমেণ্টের প্রদত্ত নিয়মাবলী অনুসারেই মিশনারিগণ এদেশে বিদ্যাদান করিতে থাকেন। পূর্বের শিক্ষাসমস্যা ছিল:

Whether to develop the great traditions of their learning instead of borrowing slavishly from the West or to reinforce them by the vitslising influence of new ideas capable of stirring an ancient and noble civilization out of its long stagnation.'

কিন্তু ইংরেজগণের ব্রহ্মদেশে আসিবার পূর্বেই ভারতবর্ষে এই শিক্ষাসমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ব্রহ্মদেশের মিশনারি সম্প্রদায় প্রথমত বিদ্যাদানে উৎসুক না হইয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতেই অধিক যত্নবান ছিলেন। নবদীক্ষিত দেশীয়গণের পুত্র-কন্যাদি বৌদ্ধবিদ্যালয়ে (ফুঙ্গি চাউঙে) বিদ্যাশিক্ষা করিতে যাইত না; কারণ এইসকল বিদ্যালয়ে লেখা-পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমণানুরূপ বেশ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্মসম্মত আরাধনা ও প্রার্থনাদি নিত্যকার্য সম্পন্ন করা ছাত্রদিগের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। অতএব তাহাদিগের জন্য ইংরেজি মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, স্বতঃই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। অন্যত্র ইংরেজি-শিক্ষিত যুবকদিগের অর্থাগম ও কর্মপ্রাপ্তি সহজলভ্য হওয়াতে অধিকাংশ ছাত্রই বিদ্যাশিক্ষার্থে মিশনারি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে এবং ফুঙ্গি বিদ্যালয়গুলি ক্রমশই নিম্ন-শ্রেণীস্থ ব্রহ্মবাসীদিগের মধ্যে পরিবদ্ধ রহিয়া যায়। সুতরাং এইসকল শিক্ষিত খ্রীষ্টান ও অল্পশিক্ষিত বৌদ্ধগণের মধ্যে সামাজিক সহানুভূতির অভাব উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মদেশের বিদ্যাশিক্ষা বহু পুরাতন কাল হইতেই বৌদ্ধ আচার্য ও ধর্মপ্রচারকগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। অধিকাংশ গ্রাম ও প্রত্যেক শহরেই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চাউঙ প্রতিষ্ঠা করিয়া অধিবাসীদিগকে ধর্মতত্ত্ব শুনাইতেন এবং কিশোর ও যুবকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে (ফুঙ্গি চাউঙ) বৌদ্ধ বালকগণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া ভিক্ষান্নে প্রতিপালিত হইয়া ফুঙ্গীদিগের ন্যায় পীত তিঙ্গান পরিধান করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে চিত্তসংযম অভ্যাস করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত। বর্ণ-পরিচয় ও বাল্যশিক্ষাদির ন্যায় প্রাথমিক পুস্তকাদি পাঠ করিয়া, ইহারা পাটীগণিত, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পাঠ করিত এবং পরে পালি ও ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যলাভ করিত। ১৭ হইতে ২০ বৎসর বয়সে সাধারণ শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, অথবা পিতামাতাকে সংসারকার্যে সাহায্য করিবার জন্য আহূত হইলে, ইহার পূর্বেই চাউঙ পরিত্যাগ করিয়া এই যুবকগণ সাংসারিক কার্যে প্রবেশ করিত, এবং বিবাহ করিয়া গৃহস্থধর্ম অবলম্বন করিত। বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী যুবকগণ ১০-১৫ বৎসর বয়স

পর্যন্ত ঐসকল সাধারণ ফুঙ্গি-চাউঙে শিক্ষালাভ করিয়া সমধিক জ্ঞান ও শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যাজ্ঞান-ভূষিত দেশপ্রসিদ্ধ বিদ্যাচার্যগণের নিকট গমন করিত।

ব্রহ্মদেশ যখন ব্রহ্মরাজার অধীনে ছিল তখন এই সকল ফুঙ্গি চাউঙের প্রতিভাশালী ও বুদ্ধিমান যুবকগণকে সরকারি কার্যে গ্রহণ করা হইত। তুজি, মিও-তুজি, মিওজা, মিওউন প্রভৃতি শাসন ধর্মাধিকারী রাজকর্মচারিগণ সাধারণত স্বীয়-স্বীয় পিতার পদ ও পদমর্যাদা প্রাপ্ত হইতেন; কিন্তু তথাপি কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিমান পুরুষগণেরও রাজকার্যে প্রবেশে অসুবিধা ছিল না।

নিম্নব্রহ্ম ইংরেজের অধিকৃত হইলে, ইংরেজ সরকারের চাকুরিতে ইংরেজিভাষাভিজ্ঞ রাজকর্মচারীর প্রয়োজন হওয়াতে এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারিগণ ব্রহ্মভাষায় লেখাপড়া করিতে অনভ্যস্ত থাকাতে, পূর্বোক্ত মিশনারি-স্কুলের ছাত্রগণই বিদ্যাশিক্ষান্তে সরকারি কার্যে নিযুক্ত হইতে থাকে। পালি ও ধর্ম-গ্রন্থবিদ ইংরেজিভাষানভিজ্ঞ ফুঙ্গিছাত্রগণের রাজ-কার্যে নিযুক্ত হইবার সুবিধা ছিল না; নিযুক্ত হইলেও উচ্চরাজকার্যে উন্নীত হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই কারণে বৌদ্ধপিতামাতাগণ কেবলমাত্র নিয়মরক্ষা করিবার জন্য পুত্রদিগকে প্রায় ২।১ মাস কাল ফুঙ্গিচাউঙে রাখিয়া, পরে ইংরেজি শিক্ষার জন্য মিশনারি বিদ্যালয়ে বা সরকারি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন। শহরের ফুঙ্গি চাউঙগুলি এইজন্য ক্রমেই ছাত্রশূন্য হইয়া যায়।

নিম্নব্রহ্মের অধিকাংশ মিশনারি স্কুলই ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইত। কিন্তু ফুঙ্গি চাউঙ বিদ্যালয়ের জন্য প্রথমত এরূপ অর্থ-সাহায্য দানের নিয়ম ছিল না। কিছু পরে ইংরেজ সরকারের এডুকেশন বিভাগের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক যেসকল ফুঙ্গিচাউঙে পাঠ করানো হইত, সেইসকল চাউঙে মাসিক ৫।১০ টাকা বৃত্তি প্রদানের নিয়ম হয়।

১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর মহারাজ তিব' উচ্চব্রহ্মের রাজা হন, তখন নিম্নব্রহ্মে (অর্থাৎ পিগু, টেনাসরিম প্রভৃতি জেলায়) সরকারি অর্থ-সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজি বিদ্যালয় ছিল ৩০৯৮টি। আর ঐসকল বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৭৬৮৭৪। ইহার মধ্যে সরকারি স্কুল ছিল মাত্র ২৯টি।

এইসকল সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ভিন্ন 'There was a large number of schools, lay monastic and missionary, receiving no aid from the state and therefore not borne in the books of statistics.'

স্বাধীন উচ্চব্রহ্মে মিশনারি বিদ্যালয় ছিল না, ফুঙ্গি চাউঙ ছিল। এইসকল চাউঙের আচার্যগণ বৎসরে একবার একত্র হইয়া উচ্চব্রহ্মের সকল ফুঙ্গি-চাউঙের বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম ও পরীক্ষাপদ্ধতি নির্ধারিত করিতেন। কখনো কখনো রাজার নিকট হইতে তাঁহারা বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য অর্থসাহায্যও পাইতেন। কিন্তু গ্রামের ও শহরের ধনী ও গরিব লোকরাই পর্ব-উপলক্ষে চাউঙের উন্নতিকল্পে যে অর্থ দান করিতেন তাহা দ্বারা চাউঙের সকল ব্যয় নির্বাহিত হইত। এইরকম বিদ্যালয়ে ও তৎসন্নিকটস্থ মন্দিরে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও আলোচনা হইত। ছাত্রগণ অল্প বয়স হইতে বৌদ্ধধর্মমতে শিক্ষিত হওয়াতে ধর্মান্তর গ্রহণ করিত না।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজ নিম্নব্রহ্মের দক্ষিণাংশ টেনাসরিম প্রভৃতি জেলা অধিকার করেন, তখন সেখানে টেভয় মিশন (১৮২৭), চ্যাউপিয় মিশন (১৮৩১) ও মৌলমিন মিশন (১৮২৭) নামক তিনটি মিশন সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়।

এইসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় মিশন সম্প্রদায় বালাংমৌন্ ও কারেনদিগের মধ্যেই ধর্মপ্রচার করিত। উচ্চব্রহ্মে এমন কী ব্রহ্মরাজার অধিকৃত নিম্নব্রহ্মেও তাহারা ধর্মপ্রচারে যাইতে সাহস করিত না। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট সমিতির পাদরি জাডসন—যাঁহার নামে রেঙ্গুনে এক কলেজ আছে এবং যিনি

সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেশীয় ভাষার অভিধান (ইংরেজি হইতে বর্মা এবং বর্মা হইতে ইংরেজি অভিধান) তৈরি করেন সেই মহাত্মা জাডসন ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রেঙ্গুনে ধর্ম-প্রচার আরম্ভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মরাজ-সরকার আমেরিকানদের প্রতি অসন্তুষ্ট না থাকিলেও পাদরি-দিগের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী-দিগকে ধর্মত্যাগ করাইয়া খ্রীষ্টান করা ব্রহ্মদেশীয় রাজকর্মচারী ও সাধারণ লোক উভয়েরই অপছন্দ ছিল। জাডসন সাহেব নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতা প্রাপ্ত হইয়া রেঙ্গুন পরিত্যাগ করেন এবং ব্রিটিশ-অধিকৃত আরাকান ও টেনাসরিমে তাঁহার প্রথম প্রচারকার্য নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু পুনরায় তিনি উচ্চব্রহ্মে গমন করিলে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ে (১৮২৪ সালে) তিনি আভানগরীতে ধৃত হন। তাঁহার সঙ্গে লেয়ার্ড, লানসিগো, গোজার প্রভৃতি আরও কয়েকজন বিদেশীয় লোককে বন্দী করিয়া আউঙ পিন্‌লে নামক এক ধান্যক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। লেয়ার্ড লিখিয়াছেন, 'আমাদের ট্রাউজার ও শার্ট ব্যতীত অন্যান্য কাপড় ছাড়াইয়া, কটিদেশে এক রশি বাঁধিয়া, মে মাসের রৌদ্রে, খালি পায়ে ও খালি মাথায় অমরাপুরায় লইয়া যাওয়া হয়। পায়ে ফোস্কা পড়ায় এবং নানা স্থানে কাটিয়া যাওয়ায় হাঁটিতে অপারগ হওয়াতে আমাদিগকে লোহার শিকলে বাঁধিয়া এক গোরুর গাড়িতে বসাইয়া দেওয়া হয়। আউঙ পিন্‌লে যাইয়া একটা জয়াট্‌-এ (পান্থশালায়) আমাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয়।' মশার উৎপাতে ও নানাপ্রকার সরীসৃপ-দিগের আগমনে এই পান্থশালায় বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে কষ্টকর হইয়াছিল। জাডসন সাহেবের স্ত্রী স্বামীর শুশ্রূষা করিবার অনুমতি পাইয়া শিশুসন্তানের সহিত আউঙ পিন্‌লে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উভয়েরই বসন্ত হয়। জাডসন সাহেবের চিকিৎসায় এবং শুশ্রূষায় তাঁহারা আরোগ্য লাভ করেন। পরে জাডসন্‌ সাহেবেরও জ্বর হয়। একটি সিংহীকে পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া পান্থশালার সম্মুখে রাখা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে অনাহারে বা অন্য কোনও কারণে এই সিংহীর মৃত্যু হইলে জাডসন সাহেব ঐ সিংহীর পিঞ্জরে সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। ডিসেম্বর মাসে (১৮২৪ সন) তাঁহাকে ইন্‌টারপ্রেটরের কার্যে নিযুক্ত করিয়া ইংরেজ সৈন্যের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিবার জন্য নিম্নব্রহ্মে লইয়া যাওয়া হয়।

জাডসন সাহেব ব্রহ্মদেশীয় রাজনৈতিক কার্যে কোন প্রকারে লিপ্ত ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব হইতে লেয়ার্ড, গোজার প্রভৃতি বিদেশী লোকদিগের ব্রহ্মদেশে পরিভ্রমণ ও যুদ্ধের সময়েও ব্রহ্মের রাজধানীতে তাঁহাদিগের অবস্থান ব্রহ্মরাজসরকার নির্বিঘ্ন মনে করেন নাই। গত মহা-যুদ্ধের সময়ে যে-সকল জার্মান ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে কাজ করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া ইংরেজ সরকারের হেফাজতে রাখা হইয়াছিল। ইহা যুদ্ধের নিয়ম। সুতরাং জাডসন, লেয়ার্ড প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করিয়া আউঙপিন্‌লে রাখাতে ব্রহ্মরাজ-সরকারের কিছু অন্যায় হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যায় না।

বিদেশীয় বিশেষত রাজ্য- বাণিজ্যলোভী ইওরোপীয়গণের প্রতি এবং ধর্মনাশী পাদরিদিগের প্রতি ব্রহ্মদেশীয়দিগের মোটেই বিশ্বাস ছিল না। পাদরিগণ ধর্মপ্রচারের জন্য সাধুভাবে ব্রহ্মদেশে বাস করিলেও তাঁহাদিগকে সমাজের ও স্বধর্মের শত্রু বলিয়াই মনে করা হইত। দেশীয় রাষ্ট্রবিপ্লবের সহিত এইসকল পাদরিগণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও অজ্ঞ ও অশিক্ষিত ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে বিদেশী ধর্ম-প্রচার করাতে তাঁহারা প্রথমত ব্রহ্মদেশীয়গণের অশ্রদ্ধাভাজনই হইয়াছিলেন।

স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করাকে বৌদ্ধগণ হিন্দুদিগের মতোই ভয়াবহ মনে করে। ধর্মভেদ ও সমাজভেদ সত্ত্বেও রাজনৈতিক একতা রক্ষা করা তখন সম্ভবপর ছিল না। ইওরোপেও এইরূপ ধর্মকলহে যথেষ্ট রাজনৈতিক কলহের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং

ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ নরপতিগণ, 'Who were the head of all churches, schools and monastaries'—এই সকল মিশনারিদিগকে ব্রহ্মদেশের অহিতকারী লোক বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। দ্বিতীয়ত মিশনারিদিগের স্কুল, গির্জা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রকাশ্যত শিক্ষাদান ও ভগবদ্‌ভজনা বলিয়া কথিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সমাজধ্বংসী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ঐসকল বিদ্যালয় ও ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশীয় রাজপুরুষগণের ধারণা ছিল। লিখিত আছে: চীন ও জাপানে খ্রীষ্টীয় মিশনারিদিগের প্রচারকার্যেও ঐসকল দেশের রাজপুরুষগণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশের নিকটবর্তী কাম্বোডিয়া, আনাম, ও টংকিন প্রভৃতি দেশে ফরাসি পাদরিগণের চেষ্টাতেই ফ্রান্সের রাজ্যস্থাপনে সুবিধা হইয়াছিল। ইহাও ব্রহ্মদেশের রাজমন্ত্রিগণ বিদিত ছিলেন। পিকিনস্থ রুশীয় রাজদূত মিশনারিদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'Men become missionaries as a kind of business; and women go into it as a kind of excitement and from a love of travel, knowing fully well that if they get into trouble there is always the Consul and the gunboat behind them. The fact is it is all the Rascals who become Christians.'

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার নামক এক প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক জাপানে খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তন করেন। জাপানের দক্ষিণ ভাগে এই নূতন ধর্ম শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বহুসংখ্যক লোক এমন কী উচ্চবংশীয় লোকরাও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু প্রথমত যেরূপ শ্রদ্ধাসহকারে জাপানিগণ এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল শীঘ্রই সে শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ওয়েবস্টার সাহেব তাঁহার হিস্টরি অভ দা ফার ঈস্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'The Government came to believe that the success of the new religion would severely disintegrate the fabric of the Japanese society and might even bring Japan into political dependence of foreign countries. Severe persecution followed. The Missionaries were expelled and if they returned they were put to death while tortures and excutions became the fate of their native followers. Christianity practically ceased in Japan for 200 years.'

এইসকল মন্তব্য অযুক্তিদোষে দুষ্ট হইলেও মিশনারিদিগের প্রতি প্রাচ্যমহাদেশের লোকেরা যে শ্রদ্ধা পোষণ করিত না তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশ হইতে অন্য একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি:

ঙা উ-নামক এক ব্রহ্মদেশীয় লোক খ্রীষ্টান হইয়া ১৩ বৎসর কাল রোমে শিক্ষালাভ করিয়া রেভারেণ্ড ফাদার ময়জেজ উ নামগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া আসেন। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের সময়ে ফাদার উ ব্রহ্মদেশের তদানীন্তন রাজধানী অমরাপুরায় বাস করিতেছিলেন। ইংরেজের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই ফাদার উকে ধৃত করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। কী অপরাধে এখন তাহা বলা অসাধ্য, শার্ল সাহেব লিখিয়াছেন: He was put in jail by Papan Min as an offset of the ill success of the Burmese troops and on account of his faith.

ব্রহ্মসৈন্যের পরাভবে এই পাদরির কী অপরাধ হইয়াছিল তাহা ব্রহ্মদেশীগণ ভাবিয়া নির্ণয় করিতে পারিবে না। যদি ঐজন্যই তাঁহার কারাদণ্ড হইয়া থাকে তবে অন্যান্য পাদরি ও খ্রীষ্টানদিগকে দণ্ডিত না করিয়া কেবলমাত্র ঙা উকে কী নিমিত্ত কারাবদ্ধ করা হইল? ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অকটোবর মহারাজ মিন্ ডনের

আদেশে ঙা উ মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু কিছু দিন পরেই 'as a result of ill treatment he had received, and of a spear wound' রেভারেণ্ড ফাদার উ ইহধাম ত্যাগ করেন।

অমরাপুরার খ্রীষ্টান সমাধিক্ষেত্রে একটি সমাধির উপর লিখিত আছে—

Here lies interred the remains of Don Gonzatez De Lanciego, Manye ara Shependar of Rangoon, who died at Amerpure on the 11th day of November AD 1838 aged seventytwo years.

গোজার বলিয়াছেন এই সাবন্দর মিঃ লাঁসিগোর 'was a man of honour and probity,' সাবন্দরের কাজে ইংরেজ বণিকগণের সহিত এই ব্রহ্মদেশীয় সরকারের কর্মচারী মিঃ লাঁসিগো'র বিশেষ সম্পর্ক ছিল। সুতরাং তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে ইংরেজদিগের এবং লাঁসিগোর বন্ধু গোজারের অভিমত উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু ব্রহ্মরাজসরকার তাঁহার উপর অত্যন্তই অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথম একবার তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিবার পর, মহারাজ বাজিডফায়ার দ্বিতীয় রানীর ভগিনীর অনুগ্রহে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার পাগান্ ওন্‌জীর কোপে পতিত হইয়া তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। এই সময়ে অপরাধ স্বীকার করাইবার জন্য 'a small cord bound his wrist together and was gradually tightened by the application of a lever'। কিন্তু এই সহিষ্ণু 'কালা' কিছুতেই আত্মদোষ স্বীকার না করায় প্রায় এক বৎসর কাল কারাকষ্ট ভোগ করেন। ইয়ান-ডা-কে সন্ধির পর, ইঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহার রাজপ্রাসাদে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবার-বর্গকে অমরাপুরায় নজরবন্দী থাকিতে হয়। 'He knew in fact too many secrets of the Burmese Government and this excited their keen jealousy and apprehension." ইহাই শার্ল সাহেবের সিদ্ধান্ত। ক্রফোর্ড সাহেব লিখিয়াছেন: 'ব্রহ্ম সরকার পরে লাঁসিগোর নির্দোষতার প্রমাণ পাইয়াছিলেন এবং মিথ্যা অভিযোগকারীকে তাঁহারা শাস্তিপ্রদান করিয়াছিলেন।' ইহাতে মনে হয় লাঁ সিগোর নামে কেহ ব্রহ্মসরকারে কোনও অভিযোগ করিয়াছিল।

পূর্বে দেখানো হইয়াছে যে উচ্চ ব্রহ্মদেশে খ্রীষ্টান মিশনারিগণকে সহজে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইত না এবং তাঁহারা ঐ দেশে সুব্যবহারও পাইতেন না। কিন্তু নিম্ন ব্রহ্মদেশে থাকিয়াও তাঁহারা এরূপ কার্য করিতেছিলেন যে স্বাধীন উচ্চব্রহ্মের রাজপুরুষগণও মিশনারিদিগের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে:

১। কোনো কোনো উৎকট অনুরাগসম্পন্ন পাদরি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্রহ্মদেশবাসীদিগকে এবং ব্রহ্মরাজদিগকে, নিম্নব্রহ্মবাসীদিগের চক্ষুতে হেয় করিবার অভিপ্রায়ে নানাপ্রকার কুৎসাবাদ করিতেন এবং ব্রহ্মসরকারের রাজনৈতিক বা শাসননৈতিক কার্যের কদর্থ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রহ্মরাজসরকারের তীব্র নিন্দাবাদ করিতেন।

২। রেঙ্গুনে তখন ইংরেজি ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছিল। এইসকল সংবাদপত্রের সহিত মিশনারিগণও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। *Anglo Indian, Truth, Burman* এইসকল নাম দিয়া কয়েকজন পত্রলেখক ঐসকল সংবাদপত্রে উচ্চব্রহ্মের রাজসরকার সম্বন্ধে নানা প্রকার মিথ্যা কথা প্রচার করিতেছিলেন। এমন-কী উচ্চব্রহ্মের স্বাধীন রাজা মহারাজ তিব'কেও কুৎসিতভাবে অঙ্কিত করিতে ইঁহারা ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। পরে দেখানো হইয়াছে যে রে. মার্ক নামক একজন পাদরি এইসকল দলের অগ্রণী ছিলেন।

৩। ভারত সরকার এই সময়ে যেরূপ অধ্যবসায়-এর সহিত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সকল দেশীয় রাজগণই রাজ্য-নাশভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাদরিগণ এইসকল সাম্রাজ্যকাঙ্ক্ষী ইংরেজগণের সঙ্গী ও বন্ধু-ভাবে বাস করাতে, তাঁহারাও ইহাদিগের সহধর্মী বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং উচ্চব্রহ্মদেশীয়গণ এই-সকল মিশনারিদিগকে সর্বদাই সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন।

৪। সুসভ্য ইংরেজ রাজ্যে বাস করিয়া এবং ন্যায়সঙ্গত নূতন শাসনপদ্ধতিতে শাসিত হইয়া, নিম্ন-ব্রহ্মের অধিবাসীদিগের এক ধারণা জন্মিয়াছিল যে স্বাধীন উচ্চব্রহ্মদেশের রাজা ও শাসনকর্তাগণ অত্যাচারী ও অসভ্য। মহারাজ মিন্‌ডনের মৃত্যুর পর মহারাজ তিব'র রাজসিংহাসনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত্র ও রাজরানীদিগের কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড, নিম্নব্রহ্মের লোকদিগের চক্ষে লোমহর্ষণ ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। রে. মার্ক প্রভৃতি পাদরি-গণ ঐ রোমহর্ষক কাণ্ডের যে ভীষণ প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন তাহাতে নিম্নব্রহ্মের ব্রহ্মদেশীয়গণও উচ্চব্রহ্মের রাজসরকারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

এস্-পি-জি মিশন

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ মিন্‌ডনের পুত্র তৌঙজে মিন্‌তা মান্দালয় হইতে পলায়ন করিয়া রেঙ্গুনে চীফ কমিশনারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত এস্-পি-জির মিশনের কর্তা, রেভারেণ্ড জি-ই মার্ক-এর সাক্ষাৎ হয়। কী কারণে বা প্রয়োজনে এই অসন্তুষ্ট রাজপুত্র মিশনারিদিগের সংস্পর্শে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও কেহ অবগত হয় নাই। কিন্তু পাদরি মার্কের সুমিষ্ট ব্যবহারে তৌঙজে মিন্‌তা অত্যন্তই মুগ্ধ হন এবং পিতার আদেশ অনুসারে মান্দালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি রেভারেণ্ড মার্ককে মান্দালয়ে আসিবার নিমন্ত্রণ করেন। কর্নেল ফ্লেডেন তখন মান্দালয়ে ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। রেভারেণ্ড মার্ক তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া, মহারাজ মিন্‌ডনের সম্মতিক্রমে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মান্দালয় নগরে আগমন করেন।

মহারাজ মিন্‌ডন্ এই ধর্মযাজককে বিশেষ সম্বর্ধনা করিয়া মান্দালয়ে গ্রহণ করেন। তাঁহার নিজ ব্যয়ে রে. মার্কর জন্য এক ত্রিছত্র বাসগৃহ নির্মাণ করাইলেন, এবং উহার নিকটেই একটি সুন্দর ও সুবৃহৎ বিদ্যালয় ছাত্রাবাস ও ধর্মমন্দির মহারাজ মিন্‌ডনের স্বকীয় ব্যয়ে নির্মিত হয়। মহারাজের ছয় পুত্র এই বিদ্যালয়ে ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরিত হন। এই বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় 'চ্যাউঙ-ড' অর্থাৎ রাজবিদ্যালয়। খ্রীষ্ট ধর্মপ্রচারেও মহারাজ মিন্‌ডন্ মুক্তহস্তে অর্থদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থে মান্দালয়ে যে গির্জা নির্মিত হয় (Church of Our Lord Jesus), ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বিশপ রে. মিল্‌ম্যান ঐ গির্জার উন্মোচনকার্যের অনুষ্ঠান করেন। ঐ উন্মোচনকার্যেও মিন্‌ডন্ অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

যে স্বাধীন ব্রহ্মদেশে খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের প্রবেশাধিকার ছিল না, সেই দেশে মহারাজ মিন্‌ডনের অর্থব্যয়ে স্কুল ও গির্জা সংস্থাপনে, মিন্‌ডন্ মহারাজের প্রশংসায় নিম্নব্রহ্ম পূর্ণ হইয়া যায়। মিশনারিগণ তাঁহাকে ধন্যধন্য করিয়া "মহাউদারচরিত্র মহারাজ" বলিয়া প্রশংসা করিতে থাকেন।

কিন্তু ৫-৬ বৎসরকাল পরেই ড. মার্কের চরিত্র ও উদ্দেশ্য ক্রমেই ব্রহ্ম সরকারের চক্ষে সন্দেহজনক হইয়া উঠে। মগরাজ মিন্‌ডনের পুত্রগণ মার্কের বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া গোমাংসভোজনে ও মদ্যপানে অভ্যস্ত হইয়া উঠে।

পুত্রদিগের এই চরিত্রদোষ অবগত হইয়া মহারাজ

মিন্‌ডন্‌ অবশেষে তাঁহার পুত্রদিগের ড. মার্কের বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করা বন্ধ করিয়া দেন, এবং দুর্গস্থ ধর্মমন্দিরে বৌদ্ধমূর্তির সম্মুখে তাঁহাদিগকে প্রণত করাইয়া প্রতিজ্ঞা করান যে তাহারা আর গোমাংস ভক্ষণ করিবে না, মদ্যপান করিবে না, এবং রাজদ্রোহসূচক কোন কার্যে যোগদান করিবে না। ইহার কিছুদিন পর, মহারাজ মিন্‌ডন ড. মার্ককেও মান্দালয় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন।

প্রকৃতপক্ষে কী অপরাধে পাদরি মার্ককে মান্দালয় পরিত্যাগ করিতে হয় বর্মার সরকারি কাগজপত্রে তাহার উল্লেখ নেই। ইংরেজিতে লিখিত পুস্তকে কথিত হইয়াছে যে কোনও রাজনৈতিক সুবিধা সংগ্রহের জন্য মহারাজ মিন্‌ডন্‌ ড. মার্ককে রাজপুত্রদিগের সহিত ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন। পাদরি মার্ক এই অনুরোধ প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলেন যে তিনি সংসারনির্লিপ্ত ধর্মযাজক। ঈশ্বরের দয়াপ্রচার ব্যতীত অন্য কোন কার্য, বিশেষত রাজনৈতিক কার্যে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত। মহারাজ মিন্‌ডন্‌ এই উক্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া আদেশ দেন যে—It would not be safe for Dr. Mark to stay at Mandalay.

কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধা সংগ্রহের জন্য মহামন্ত্রী কিনউনমিনজী বা রেসিডেণ্ট মেজর স্নোডেন প্রভৃতি বহুলোক বর্তমান থাকিতে, মার্কের সাহায্য প্রার্থনা করা ইংরেজের বন্ধু মহারাজ মিন্‌ডনের মত বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ নরপতির পক্ষে কত অসম্ভব তাহা লিখিয়া বুঝাইতে হয় না। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উ-টিন্‌ বলিয়াছেন—ইহা এক নির্বুদ্ধি লোকের বোকা মিথ্যা কথা।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত উপদেশ প্রদানের পরেও ড. মার্ক কয়েক মাসকাল মান্দালয়ে ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রে. কল্‌বেককে স্বপদে স্থাপন করিয়া মান্দালয় হইতে রেঙ্গুনে প্রত্যাগমন করেন। ড. মার্ক তাঁহার মিশনকার্য সম্বন্ধে "*Forty Years in Burma*" নামক একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মান্দালয় পরিত্যাগের কারণ তিনি উল্লেখ করেন নাই। মান্দালয় ত্যাগ করিয়া, মহারাজ মিন্‌ডনের মৃত্যুর পর, তিনি পুনরায় মন্দালয় আসিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু ফরেন মিনিস্টার কিন্‌উন্‌মিনজী তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে—'I (Rev. Mark) should on no account be allowed to visit Mandalay for the present and that if I persisted, orders would be issued to prevent my crossing the boundary. (*Forty Years in Burma*)।

পাদরি মার্ক সাহেব রাজনৈতিক কার্যে যোগ দিতে পারেন না বলিয়া যে অজুহাত দিয়াছিলেন, তাহাও সত্য নহে। কারণ মান্দালয় হইতে নির্বাসিত হইয়া রেঙ্গুনে আসিবার পর কিছুদিন তিনি নিস্তব্ধভাবে ছিলেন; তিব'র রাজ্যপ্রাপ্তির পরই তিনি স্বমূর্তি ধারণ করেন এবং Humanity and Civilization-এর দোহাই দিয়া ব্রহ্মরাজ সরকারের বিরুদ্ধে এমন ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন যে মান্দালয়ের পলিটিক্যাল রেসিডেণ্ট পর্যন্ত এই "রাজনৈতিক ফুঙ্গির" হল্লা নিবারণের জন্য রেঙ্গুনের চীফ কমিশনারের নিকট পত্র লিখিতে বাধ্য হন।

মহারাজ তিব'র রাজসিংহাসন গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বেই রাজকুমার নিয়াউং-ইয়ান মিন্‌তা সপরিবারে পলায়ন করিয়া রে. কলবেক-এর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথা হইতে তাঁহাদিগকে মি: শ'র রেসিডেন্সিতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। চার-পাঁচ মাস পরে (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) রাজদ্রোহী রাজপুত্রদিগের প্রাণদণ্ড করা হয়। মি: শ' পূর্বোক্ত নিয়াউং ইয়ান ও নিয়াউঙ ওক্‌ মিন্‌তাদিগকে আশ্রয় প্রদান করাতে এবং পূর্বোক্ত রাজদ্রোহী রাজপুত্রদিগের প্রাণদণ্ডের প্রতিবাদ করাতে মান্দালয়ের ইওরোপীয় অধিবাসিগণের মধ্যে এক আতঙ্ক উপস্থিত হয় যে তাঁহারা

যে-কোনও সময়ে আক্রান্ত হইয়া বন্দী ও নিহত হইবেন। মি: শ' হৃদ্‌রোগে মৃত্যুলাভ করেন। পরবর্তী পলিটিক্যাল এজেণ্টের মন্দালয়ে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মন্দালয় হইতে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি উঠাইয়া লওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রে. কল্‌বেক্‌ও তাঁহার বিদ্যালয় ও ভজনালয় বন্ধ করিয়া মান্দালয় হইতে রেঙ্গুন প্রত্যাগমন করেন।

এইসকল ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে রে. মার্ক পুনরায় রেঙ্গুনের ইওরোপীয়ান ব্যবসায়ীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া মহারাজ তিব'কে রাজ্যচ্যুত করিয়া, উচ্চব্রহ্মকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনয়নের জন্য ঘোরতর আন্দোলন করিতে থাকেন। অবশেষে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্য মন্দালয় আক্রমণ করে; মহারাজ তিব'কে বন্দী করিয়া রত্নগিরিতে প্রেরণ করা হয়। রে. কল্‌বেক্‌ এই ইংরেজ অভিযানের সঙ্গে মান্দালয়ে আগমন করিয়া মহারাজ তিব'র বিদ্যাশিক্ষণ-গৃহে (লাউ চাউঙ) সোৎসাহে বিজয়-উৎসব সম্পাদন করেন। প্রথমত কয়েক সপ্তাহ ঐ বিদ্যালয়েই ভজনাকার্য নির্বাহ হয়। পরে ব্রহ্মমহারাজের স্বর্ণসিংহাসনশোভিত দরবারগৃহে ঈশ্বর-ভজনাকার্য নিষ্পন্ন হইতে থাকে (বর্মা গেজেটিয়ার, মন্দালয় জিলা, পৃ ১৭৮)। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রে. কল্‌বেক্‌ তাঁহার পূর্বতন গির্জার সংস্কার করিয়া প্রচারকার্য আরম্ভ করেন।

রচনা : আনুমানিক ১৯৩৫ সাল

রোমান ক্যাথলিক মিশন

মান্দালয় জেলায় সর্বপ্রথম মিশনারি আগমন হয় ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে।

বার্নাবাই মিশনে ফাদার সেণ্ট জারমানো নামক এক পাদরি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রেঙ্গুনে আসেন এবং তথা হইতে সোজা অমরাপুরায় আগমন করেন। অমরাপুরা তখন সমগ্র ব্রহ্মদেশের রাজধানী।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার আবোলা নামক একজন ভিকার (Vicar) মহারাজ মিন্‌ডনের অনুমতি লইয়া দুইটি জায়গা গ্রহণ করেন। ঐ স্থানে ফাদার আবোলা সেগুনকাষ্ঠের এক বড়ো গির্জা নির্মাণ করেন। নানা-কারুকার্যে এই গির্জার অভ্যন্তরভাগ অলঙ্কৃত করা হয়। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে, এই গির্জা ভাঙিয়া বর্তমান জেনর্‌ল হাসপাতালের নিকট, তামিল ও দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের জন্য Church of St. Xavier নামক এক গির্জা স্থাপন করেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে) জন ব্যাপটিস্ট (Joannes Baptists) নামক দেশীয় পাদরি এই ভজনালয়ের কর্তা ছিলেন।

ইঁহারা কেহই ব্রহ্মদেশীয় রাজনৈতিক কার্যে কিছুমাত্রই সম্পর্কিত ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী-দিগের ঈশ্বরভজনায় সাহায্য করিবার জন্যই ইঁহারা মান্দালয়ে বাস করিতেছিলেন।

[ক্রমশ

বাঙলা সাহিত্য ও অন্য দিগন্ত : বাংলাদেশী প্রাসঙ্গিকতা

হায়াৎ মামুদ

১

বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যের অন্যতম দুর্ভাগ্যজনক ত্রুটি সম্ভবত এই যে বিদ্যাপীঠাশ্রিত পণ্ডিত (academics) ও সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মীদের মধ্যে এক পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা সর্বদাই বিদ্যমান। ফলে উভয়ের হার্দ্য সম্পর্ক ও সহযোগিতায় সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সমস্ত দিগ্‌দর্শী পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ হতে পারত, তা বহু ক্ষেত্রেই হয়ে উঠতে পারে নি। এ-রকম একটি ক্ষেত্রের নাম বাঙলা "আধুনিক" সাহিত্য। এই শতাব্দীর যেসব সাহিত্যকর্মকে বা যেসব ধারার সাহিত্যকে আমরা সাধারণত "আধুনিক" বলে চিহ্নিত করে থাকি, এ ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই—১৯২০ দশকের প্রথম দিক থেকে—তার শুরু। তবু আমরা যদি কোনো নির্দিষ্ট সালকে বা কোনো একটি বা একাধিক গ্রন্থকে চিহ্নিত করে বলতে চাই যে, ঠিক এইখান থেকেই বাঙলা সাহিত্য নতুন এক মোড় ফিরল—যেমন হয়েছিল জরমানিতে, বা ইংল্যানডে-ফ্রান্সে, অথবা এমন-কী রাশিয়ায়, তাহলে সেই বিশেষ সময়টি কখন, তা এখন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা-তর্ক-বিতর্কের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে নি। বাঙলা "আধুনিক" সাহিত্যের কালপঞ্জিকা প্রণয়নের কাজ এখনো অনারব্ধ হয়ে পড়ে আছে।

অথচ বিষয়টি জরুরি। কারণ, সমকালীন বাঙলা সাহিত্যে "আধুনিকতা"র উন্মেষ, প্রসার, স্থায়িত্ব ইত্যাদি পর্যায়ক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য প্রাথমিক তথ্যাদি সংরক্ষিত না হলে ক্রমশ বুঝে ওঠা মুশকিল হবে যে আমরা কোথায়, কতখানি এবং কেন "আধুনিক"। ঘটনা যদি এরকমই হয়ে থাকে যে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যা-কিছু লেখা হয়েছে এবং যেভাবে লেখা হয়েছে—অর্থাৎ থীম এবং কনটেন্‌ট্‌ যা, তা থেকে আলাদা পথ-চলাটাই বাঙলা সাহিত্যে "আধুনিক" খাত, তো তারও কার্যকারণ, সমাজেতিহাসগত প্রাসঙ্গিকতা, দৈশিক

শিল্পচিন্তা বা শিল্পান্দোলন ইত্যাদি অনুপুঙ্খভাবে জরিপ করা দরকার।

শতাব্দীর প্রায় শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে পিছনের সুদীর্ঘ পথের আরম্ভ-পানে তাকালে আজ আমাদের স্বভাবতই মনে হয়, বাঙলা সাহিত্যে "আধুনিকতা"র উন্মেষপর্ব ১৯১৩ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত সময়কাল। এর এক দিকে প্রমথ চৌধুরীর "সবুজপত্র"-র প্রকাশ, অন্য দিকে বুদ্ধদেব বসুর "কবিতা" পত্রিকা। এই সময়-সীমার ভিতরেই একে একে "কল্লোল" (১৯২৩), "কালিকলম" (১৯২৬), "প্রগতি" (১৯২৭), "পরিচয়" (১৯৩১)—পত্রিকা-কটি বেরিয়েছিল এবং এদের ঘিরেই একদল নবীন সাহিত্যিক ক্রমে-ক্রমে দেখা দিচ্ছিলেন। মনে রাখতে হবে, এই সারাটা পথ রবীন্দ্রনাথও সঙ্গে ছিলেন। মান, অভিমান, তর্ক, বিবাদ—সবকিছু সত্ত্বেও। জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" ভবনে ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে (বাঙলা ১৩৩৪ সনের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র) রবীন্দ্রপৌরোহিত্যে 'আধুনিক' সাহিত্য নিয়ে বিবাদনিষ্পত্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তবুও।

তবে, দুটি ঘটনা এইসব টানাপোড়েনের মধ্যেও ঘটে গিয়েছিল। তা হল: নতুন গদ্যভাষায় কথ্যরীতির প্রতিষ্ঠা, এবং গদ্যছন্দে নতুন কাব্যভাষা নির্মাণ। উভয় চেষ্টারই নান্দীপাঠ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে; কিন্তু "পুনশ্চ"র (১৯৩২) পরে তিনি বাঁচবেন আর মাত্র আট-ন বছর, ফলে তাঁর জীবৎকালেই তাঁর হাত থেকে পতাকা বহনের ভার প্রাকৃতিক নিয়মেই হস্তান্তরিত হয়েছিল তরুণতম প্রজন্মদের কাছে।

কাজী নজরুল ইসলাম আর মোহিতলাল মজুমদারের আবির্ভাব ১৯২১-২২ সালে, এবং গোকুল-চন্দ্র নাগের "পথিক" উপন্যাস বেরিয়েছিল ১৯২৫-এ: বাঙলা কবিতা আর কথাশিল্প সম্ভবত এখান থেকে বাঁক নিয়েছিল। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের (১৯২১-৩০) সাহিত্যপর্যবেক্ষকমাত্রেই জানেন যে ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে যেমন, তেমনি বাঙলা সাহিত্যেও এই সময় সাহিত্যনীতি ও সাহিত্যবিষয় সংক্রান্ত বাদ-প্রতিবাদে অত্যন্ত সংক্ষুব্ধ এক কাল। যত তরুণ কবি- ও লেখকযশঃপ্রার্থী তখন একে-একে সম্মিলিত হচ্ছিলেন, তার পূর্বে তেমনটি আর কখনোই ঘটে নি। ১৯৩৫ সালের মধ্যে আমরা সমস্ত মুখ্য কবি-সাহিত্যিককে এবং তাঁদের তৈরি উপন্যাস আর কাব্যের একাধিক ধারা এবং প্রবণতাসমূহকে পেয়ে যাই। এরই মধ্যে কবিতায় পঞ্চপাণ্ডব (জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে) থেকে সমর সেন, এবং উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ-অন্নদাশঙ্কর সকলেই ক্রমান্বয়ে এসে গেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ (মৃত্যু ১৯৪১)-শরৎচন্দ্রের (মৃত্যু ১৯৩৮) পরে বাঙলা সাহিত্যের সম্ভাব্য গতি-পথ ১৯৩৫ নাগাদ নির্ধারিত হয়ে গেছে।

২

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় যাঁরা "আধুনিক" বা "অতি-আধুনিক" নামে চিহ্নিত হয়েছিলেন, তাঁদের এহেন উপাধিপ্রাপ্তির প্রধান কারণ ছিল তাঁদের রচনার উন্মার্গীয় থীম। বিষয়বস্তুর দিক থেকে যদি সেগুলোকে আমরা বিভিন্ন ভাগে শ্রেণীবিন্যস্ত করতে চাই, তাহলে মোটামুটিভাবে চারটি প্রধান ধাঁচ চোখে পড়বে: ১. যৌনমনস্তত্ত্ব—অবদমিত কাম—মনোবৈকল্য; ২. পারিবারিক ও সমাজবন্ধনের অন্তরালে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি; ৩. সমষ্টিচৈতন্য, অর্থাৎ একক ব্যক্তি থেকে সামাজিক 'শ্রেণী'র দিকে চোখ ফেরানো—অন্য কথায়, রাজনৈতিক অর্থে 'সমাজ-চেতনা'; ৪. আবেগশাসিত অনুভূতিসর্বস্বতার বিপরীতে মস্তিষ্ক-প্রধান, বুদ্ধিপ্রবণ, যুক্তিনিয়ন্ত্রিত মনোজগৎ।

এখানে যা বিবেচ্য তা হল, এই সব-কটি প্রবণতা প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিমী পৃথিবীর চিন্তাজগৎ এবং শিল্প-সাধনার সহিত সম্পর্কিত, এবং সচেতনভাবে ও অচেতনভাবে উভয় প্রক্রিয়াতেই সেখান থেকে

আহরণ করে এদেশে নিয়ে আসা হয়েছে।

বাঙলা সাহিত্যে পশ্চিমের হাওয়া বয়ে নিয়ে আসেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর পশ্চিম কেবল ইংল্যানডে বা ইংরেজি সাহিত্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সহমর্মীরা যাঁরা বীরবলী দরবারে আসর জমিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই য়োরোপফেরতা : পণ্ডিত বা আই. সি. এস. রাজপুরুষ। কনটিনেনটাল সাহিত্যের হাতছানির ইশারা "সবুজপত্রে"ই প্রথম দেখি। তার মানে এই নয়, য়োরোপী হাওয়া "সবুজপত্রে"র জানলা দিয়েই শুধু ঢুকত। ইংরেজদের উপনিবেশ কলকাতায় ইংরেজি বই এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে অনূদিত য়োরোপ এসে হাজির হত। বাঙালি সিভিলিয়ান আর ইংরেজ জনগোষ্ঠীর বাইরে বঙ্গভাষী মধ্যবিত্তের কাছে তারা কতদূর পৌঁছুত সে-ব্যাপারে কোনো জরিপ বা পরিসংখ্যান সম্ভবত নেই; তবে এ-কথা মনে হয় ঠিক যে, বাঙালি লেখক-পাঠক উভয়েই য়োরোপীয় সাহিত্য বিষয়ে অনেকখানিই অচেতন ছিলেন, এবং প্রমথ চৌধুরীই প্রথম যিনি তাঁদের সংবিৎকে জাগ্রত করেছিলেন। অধিকন্তু, এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৯১১-২০) বিশ্বরাজনীতি অর্থাৎ ভারতবর্ষের ভিতরে আর বাইরে সার্বিক পরিস্থিতি এত উত্তাল ছিল যে কাগজে, বইপত্রে, জনশ্রুতিতে, উন্মুক্ত বা গোপন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পশ্চিমী হাওয়া-বদলের আঁচ আমাদের গায়ে লাগছিল। বিপ্লব, সন্ত্রাস, আইন-অমান্যতা—এসবের সাক্ষাৎ সম্পর্ক রাজনীতির সঙ্গে বটে, কিন্তু ব্যক্তিমানুষের মন এবং জনচিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতা এমনই যে রুদ্ধ কক্ষের কোনো-একটি বন্ধ দুয়ার খুলে গেলে সমস্ত ঘরেরই দরজা-জানলা অর্গলছিন্ন হয়ে ভেঙে পড়তে চায়। বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে প্রলেতারিয়েত ব্রাত্যশাসন কায়েম এমনই এক কালাপাহাড়ি ঘটনা যে, মার্কস-এঙ্গেলসের আগমন এদেশে অবশ্যম্ভাবী ছিল। ১৯১৯-এই দেখি, রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর বক্তৃতায় কমিউনিজম এবং বলশেভিজম্ নিয়ে কথা বলছেন। ১৯২০ সালের ১৭ই অকটোবর তাশখন্দে 'ভারতের কমিউনিসট পার্টি' গঠিত হয়েছিল এবং এর সংবাদ যথাসময়ে ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশে এসে গেছে। প্রকৃত সত্য এই যে, চিন্মোহন সেহানবীশ জানিয়েছেন ("রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী" পৃ ২০-২২ : ১৯৭৩ সং), ১৯০০ সাল থেকেই মার্কস এদেশে পরিচিত হতে শুরু করেন; ১৯১২-তে তো লালা হরদয়ালের প্রবন্ধই বেরিয়েছিল "মডারন্ রিভিয়ু" মাসিকপত্রে "Karl Marx, a Modern Rishi" নামে। ফ্রয়েডের তত্ত্ব সম্পর্কে এদেশের বিদ্বৎসমাজ প্রথম কবে অবহিত হন জানি না; তবে ১৯০০ সালে তাঁর যুগান্তকারী "দি ইনটারপ্রিটেশন অব ড্রীমস" বেরিয়ে গেছে এবং ১৯১৩য় শিষ্য ইউঙের সঙ্গে মনোমালিন্যের পূর্বেই তাঁর যাবতীয় প্রধান রচনা প্রকাশিত হয়েছে। জরমন ভাষায় প্রকাশিত তাঁর এসব রচনার ভিতর থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে এদেশে এসে পৌঁছেছিল—এমন ভেবে নেওয়া অসঙ্গত হবে না। অন্তত "কল্লোল"-এর লেখকেরা যে ফ্রয়েডের রচনাদি বা ভাবনাচিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ১৮৯০ সাল থেকে বারো খণ্ডে সমাপ্য স্যর জেমস ফ্রেজারের "দ্য গোলডেন বাউ" খণ্ডক্রমে যখন প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন এখানে অধ্যাপককুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী ছাত্রসমাজে তার অভিঘাত পড়েছিল। সব মিলিয়ে অবস্থা এমন যে বহুস্রোতা সামাজিক-সাংস্কৃতিক জঙ্গমতায় ও পারস্পরিক অভিঘাতঘূর্ণিতে বঙ্গদেশের তরুণ লেখক-সমাজ তখন উদ্বেল। এই প্রভাবসাংকর্য যে-অনুসন্ধিৎসার জন্ম দিয়েছিল তাঁদের মনে, তার ফলে সে সময়ে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের অনুবাদ বাঙলা ভাষায় ব্যাপকভাবে হতে দেখি। ফরাসি, রুশ, ওলন্দাজ, হাঙ্গেরীয়, স্ক্যাণ্ডেনেভীয়, ইতালীয় সাহিত্য এবং সাহিত্যিক নিয়ে পরিচিতিমূলক রচনা এবং তাঁদের রচনার বঙ্গানুবাদ তখন বড়ো একটা কম হয় নি। প্রসঙ্গত,

কবি নজরুলের "বর্তমান বিশ্বসাহিত্য" নামে একটি প্রবন্ধ তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতির আবহাওয়া বুঝতে সাহায্য করে ; নজরুলের মতো চঞ্চল এবং অধ্যয়ন-বিতৃষ্ণ মানুষও যে রুশ বা স্ক্যাণ্ডেনেভীয় সাহিত্য অত পড়ে উঠতে পেরেছিলেন তার নিশ্চিত কারণ ওইসব গ্রন্থের সহজলভ্যতা ও প্রচারব্যাপ্তি। এখন বিশ্বাস করা কঠিন যে "জাঁ ক্রিস্তফে"র মতো ধ্রুপদী উপন্যাস কিস্তিতে-কিস্তিতে অনূদিত হয়ে "কল্লোলে" বেরিয়েছিল। আজকের তরুণেরা হয়তো নামও জানে না—সুইডিশ সেলমা লাগের্লফ্, কি ইতালীয় দান্নুন্‌ৎসিও, কি রুশ লিওনিদ্ আন্দ্রেইয়েফ বিষয়ে বাঙালি পাঠক তখন জানতে পারতেন বিভিন্ন সাহিত্যপত্রের কল্যাণে।

এইভাবে পশ্চিমকে সর্বৈবভাবে আতিথ্য দিয়েছিলেন সেকালের তরুণ সাহিত্যকর্মীরা। য়োরোপীয় সাহিত্যভাবনা ও রচনাপ্রকরণ স্পষ্টতই অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁদের, এবং অনুসরণ বা অনুকরণের মাধ্যমে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে তার বহিঃপ্রকাশও দেখা গেল।

এতদিন পরেও, এখনও, হয়তো এই তাত্ত্বিক প্রশ্ন সমীচীনভাবেই করা চলে : শিল্পসাহিত্যের দৈশিক জমি প্রস্তুত না হলে সেই মাটিতে ভিনদেশী গাছ কতদূর ফল ফলাতে সক্ষম ? প্রশ্নটি নতুন নয়, সমকালেই উঠেছিল। যাঁদের আমরা প্রগতিদ্বেষী সংরক্ষণবাদী বলে জানি, তাঁরা "সবুজপত্র" থেকে "কল্লোলে"র সময় পর্যন্ত বারংবার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। সময় প্রতিকূল ছিল এবং তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন। তথাপি তাঁদের প্রশ্নের অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতা নস্যাৎ হয়ে যায় না। এই বিবেচনা তো নৈতিক কারণেই দেখা দিতে পারে যে, সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার ব্যাপার কতখানি বহিঃপ্রভাবের তাড়নায় বা অনুসরণে করা সঙ্গত, এবং কতখানিই-বা শিল্পীর নিজস্ব স্বভাব ও সামাজিক পরিমণ্ডলগত 'সত্যে'র তাড়নায় হওয়া বাঞ্ছিত।

তবে, এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে : বাংলা "আধুনিক" সাহিত্য যে-প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়েছে তেমন হওয়া উচিত হয় নি—এমন নেতিবাচক সিদ্ধান্ত যদি আমরা করি, তাহলেও মেনে নিতে হবে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন হাস্যকর এবং অসম্ভব। ভুল কিংবা ঠিক যা-ই হোক না কেন, বিগত অর্ধশতাব্দীরও বেশি নিরবচ্ছিন্ন চর্চার ফলে "আধুনিক", "আধুনিকতা" সম্বন্ধে আমাদের শিল্পবিচারগত অনুভব সুস্থিরতা পেয়েছে। অর্থাৎ কোনো রচনা আধুনিক কিনা, তা শনাক্ত করার কোনো এক বোধিগত প্রক্রিয়া বাঙালি পাঠক আর লেখক আয়ত্ত করে নিয়েছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বরেণ্য, শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আমরা "আধুনিক" বলি না, জসীমউদ্দীন বিশ শতকের বাঙলা কাব্যে একক, নিঃসঙ্গ, তুলনারহিত প্রতিভা —মেনে নিয়েও তাঁকে "আধুনিক" বলি না। এবং আরো নির্মম সত্য হল এই, তাঁদের অনুসারী বা অনুকারক যদি কেউ থেকে থাকেন, তাহলে তাঁরা অশ্রদ্ধেয় ও অপাঠ্য বিবেচিত হবেন। তার মানে এটাই যে, সাহিত্যে "আধুনিকতা"র কোনো এক মূল্যবোধগত ধারণা আমাদের মনে সক্রিয়।

আমার বিবেচনায়, এই ধারণাটি প্রধানত শৈলীনির্ভর, গৌণত বিষয়নির্ভর, এবং ফর্ম সম্পর্কে সচেতনতা, পরীক্ষানিরীক্ষা, প্রসঙ্গাশ্রয়ী শৈলী অন্বেষণ ইত্যাদি সামগ্রিক শিল্পবুদ্ধি আমরা পশ্চিমের হাত থেকে গ্রহণ করেছি।

৩

সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য আলোচনায় অর্ধশতাব্দী পূর্বের এই প্রেক্ষাপট মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। কারণ, ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যের যে-খাতগুলো দেখা গিয়েছিল, পরবর্তী কালে একমাত্র নাটকের পুনর্জন্ম ব্যতিরেকে, এ যাবৎ

গদ্যপদ্য সবই পুরনো খাত ধরেই প্রবাহিত হচ্ছে। বলা দরকার, কমলকুমার মজুমদার দলছুট, ব্যতিক্রম, অগত্যা আমাদের জরিপের চৌহদ্দিতে তাঁকে কখনোই ফেলা যাবে না।

আমাদের বর্তমান অনুসন্ধেয় বিষয়—বিগত পঁচিশ বৎসরে এই ভূখণ্ডে (অর্থাৎ একদা পূর্ব-পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশে) সাহিত্যনির্মাণে বিশ্ব-সংস্কৃতির বা য়োরোপের ভাবান্দোলন কি শিল্প-সাহিত্যের অভিঘাত বা প্রভাব আছে? এখানে প্রসঙ্গত মূল্যমানগত একটি মাপকাঠি থাকা সঙ্গত হবে শ্রেয়োবোধেরই কারণে এবং তা হল শিল্পমূল্য যাচাই-য়ের ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের রাজনৈতিক বিভাজন-রেখা অমান্য করা। প্রথমেই সত্যের খাতিরে স্বীকার করা প্রয়োজন: (১) বঙ্গদেশ ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত হলেও সাহিত্য বা সংস্কৃতি দ্বিখণ্ডিত হয় নি; (২) বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে উদ্ভূত হলেও পূর্বের মতোই সাহিত্য-সংস্কৃতি অবিভাজ্যই থেকে গেছে; (৩) একাত্তরপূর্ব ও একাত্তর-পরবর্তী পূর্ব-পাকিস্তানি ও বাংলাদেশী সাহিত্য শৈলীগতভাবে একই থেকে যাচ্ছে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে: ১৯৪৭ থেকে এখন পর্যন্ত এখানে যা-কিছু লেখা হয়েছে সবই অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় বহমান এবং সেই ধারাবাহিকতাও আবার '৪৭-পূর্ব-বর্তী অবিভক্ত বঙ্গের সাহিত্যধারার উত্তরসূরী। এভাবে বিবেচনা করলে মনে হতেই পারে যে, বাংলাদেশে রচিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনার কিছু নেই, তা হল রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত অথচ একই সংস্কৃতির যুগ্ম-ধারাবাহিত দুটি দেশের যৌথ সংস্কৃতিফসল। এমন মনে হওয়ায় নিশ্চয়ই ভুল নেই, তথাপি এ হচ্ছে আংশিক সত্য। বর্তমান বিশ্বে রাজনীতি ও রাষ্ট্র-ক্ষমতা এমনই এক সর্বগ্রাসী ব্যাপার যে রাষ্ট্র হিসেবে স্বতন্ত্র বলেই বাংলাদেশের সাহিত্যে ও শিল্পে অন্য একটি মাত্রা এসে দেখা দেয়। সেই মাত্রার আষ্টে-পৃষ্ঠে আমাদের ভৌগোলিক সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক রাজনীতি জড়ানো।

কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য বিচারেরও পূর্বে দেখা প্রয়োজন, পূর্ব পাকিস্তানের কবি-লেখকগণ উত্তরাধিকারসূত্রে কী পেয়েছিলেন। অব্যবহিতপূর্ব ঐতিহ্য হিসেবে "আধুনিক" বাঙলা কবিতা এবং কথাসাহিত্যের ধারা বহনের ভার তাঁদের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল।

এখানে একটু পিছন ফিরে তাকাতে হবে। "আধুনিক" বাঙলা কবিতার, বা সাহিত্যেরও, অন্তর্গত কিছু মৌলিক অসঙ্গতি বা উন্মার্গতা লক্ষ করা আবশ্যক।

য়োরোপে "আধুনিক" সাহিত্যান্দোলনের জন্ম হয়েছিল জরমনিতে ১৮৮৫ সালে দুটি ঘটনার ভিতর দিয়ে: একটি লাইপট্‌সিগ্‌ থেকে হিবল্‌হেল্‌ম্‌ আরেন-ডট্‌ সম্পাদিত কাব্যসংকলন Moderne Dichtercharaktere [আধুনিক কবিচরিত্র] প্রকাশনা, অন্যটি সাহিত্যসাময়িকী Die Geselbshaft [সংকীর্তন]-এর প্রকাশ যার পরিচিতিতে লেখা থাকত 'ein Organ der modernen Bewegung in der Literature' [সাহিত্যে আধুনিক আন্দোলনের মুখপত্র]। সমালোচকদের সাক্ষ্য: ১৮৯০ সাল নাগাদ সারা জরমনি, ভিয়েনা, অস্‌লো, জুরিখে "আধুনিকতা" যেন ছোঁয়াচে জ্বরের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল, অজস্র বইপত্র, গোষ্ঠী, আন্দোলন, সাহিত্যাদর্শের ওপরে "আধুনিক" নামাঙ্কিত সীল-মোহর সাঁটা থাকত। কিন্তু পঁচিশ বছরের মাথায় আন্দোলন মরে গেল। সামুয়েল্‌ লুব্লিন্‌স্কি নামে জনৈক সমালোচক সে-ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করলেন ১৯০৯ সালে তাঁর Der Ausgang der Moderne [আধুনিকদের প্রস্থান] গ্রন্থ। জরমানিতে মরে গেল বটে, কিন্তু ছড়িয়ে পড়ল য়োরোপে ভিন্ন-ভাষী দেশগুলোয় এবং ইঙ্গ-মার্কিন ইংরেজি ভাষা-জগতে। ১৯১০ সালে ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ লিখেছিলেন: 'On or about December 1910 human nature changed···All human relations

hifted—those between masters and ervants, husbands and wives, parents nd children. And when human relaions change there is at the same time change in religion, ccnduct, politics nd literature.' (*Mr. Bennett and Mrs. Brown*, 1924). অনেকে (যেমন রিচার্ড এল্‌ম্যান) ময়সীমা পিছিয়ে দিতে চান ১০ বৎসর, অনেকে যেমন ডি. এইচ. লরেনস) এগিয়ে আনতে চান বছর ; কিন্তু ১৯০০, বা ১৯১০, কিংবা ১৯১৫—াল যাই হোক না কেন, লরেনসের পর্যবেক্ষণ যথার্থ ছিল : ···the old world ended'। পুরনো পৃথিবীর পতনের সঙ্গে "আধুনিকতা"র অভ্যুত্থান ও গারিত্র্যলক্ষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এ তো কোনো তুন কথা নয়।

বাঙলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো সংশয়ী এমন প্রশ্ন তুলতেই পারেন : পুরনো পৃথিবী ভারতবর্ষে কিংবা বঙ্গদেশে ধসে যাচ্ছিল কি ? এ সময়ের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন যে, পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল নানা ক্ষেত্রেই, ছোটোবড়ো ঘটনা ঘটছিল প্রচুর ; তবুও এ-কথা বলা যাবে না যে সমস্ত কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে আর গপে মানুষের জীবনযাত্রা বা সামাজিক মূল্যবোধ রাতারাতি পালটে গিয়েছিল। পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হয়তো অলক্ষ্যে শুরু হয়েছিল, হতে পারে ; দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে তখনো কিছু পালটায় নি—পালটে যাবে, তবে তার জন্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত অপেক্ষার প্রয়োজন হবে। আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায়, বাঙলা কবিতার এই "আধুনিক" ধারাটি যা ২০ থেকে ৩০-এর দশক পার হতে-হতে স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করছিল, তার বীজ এদেশের মাটিতে ছিল না। এর ফলে বাঙালি কবিবর্গকে অনভিপ্রেত মাশুল দিতে হয়েছিল। এই মাশুল হল—নবনির্মিত কাব্যভাষার দুর্বোধ্যতাজনিত কারণে কবি এবং কাব্যভোক্তার সম্পর্কচ্ছেদ। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাঙালি কাব্যপাঠকের মেধান্যূনতাকে যতই অভিযুক্ত করুন, কবিদের কী পরিমাণ ভুগতে হয়েছিল তার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ আছে "কবিতা" বা "পূর্বাশা"র মতো সাহিত্যপত্রের বিরামহীন প্রচার আর সংগ্রামে। কবিতা আর অ-কবিতার পার্থক্য মেনে নিলেও এ-সত্য থেকেই যায় যে শিল্পমাত্রেই যখন রসগ্রাহীর মুখাপেক্ষী, তাই সৎ কবিতারও চাই অনুকম্পায়ী, সহৃদয়হৃদয়সংবেদী, বোদ্ধা কাব্যরসিক। তৃতীয় দশক (১৯২১-৩০) অবধি ঘটনাবলী কতখানি উন্মার্গীয় ছিল তার একটা বড়ো প্রমাণ হচ্ছে ৪০-এর দশকে তরুণদের বামপন্থী কাব্যচর্চার সামাজিক জনপ্রিয়তা। অবশ্য এও লক্ষ করতে হবে : তিরিশ বছর পরে বাঙলা কবিতায় শব্দব্যবহারের বৈচিত্র্য আর পরীক্ষানিরীক্ষা চলতে থাকায় কাব্যভাষা ক্রমান্বয়ে যে স্বতন্ত্র চেহারা অর্জন করেছিল, তার আশ্রয় চল্লিশের কবিদেরও নিতে হয়েছিল। পূর্বসূরীরা অস্পষ্টতই ইংরেজি Imagist কবিগোষ্ঠীর নিকট থেকে কাব্যসূত্র ধার করে কাজে লাগিয়েছিলেন ; কিন্তু পঞ্চম দশকের (১৯৪১-৫০) উত্তরসূরীদের আর পশ্চিমের দিকে তাকাবার প্রয়োজন পড়ে নি। এইসব দোলাচল ও সংক্ষোভ কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখক আর পাঠকের মাঝখানে কোনো প্রাচীর তোলে নি, কারণ কাহিনীকে পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা থেকে খুব দূরে নিয়ে গেলে গাল্পিক-ঔপন্যাসিকের চলে না। তবুও, এ কথাও তো ঠিক যে ধূর্জটিপ্রসাদ, অন্নদাশঙ্কর, সঞ্জয় ভট্টাচার্য কিংবা হাল আমলের অমিয় ভূষণ, অসীম রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, দেবেশ রায় প্রমুখ কথাশিল্পীরা মেধাপ্রবণতার দায়ে শাস্তি পাচ্ছেন, বাঙালি পাঠকের আম-দরবারে তাঁরা এখনো তেমন কক্কে পান নি।

পুরনো প্রসঙ্গে এবার ফেরা যাক। ১৯৪৭ সালে ওই তাহলে ছিল আমাদের ঐতিহ্যসূত্র। পাকিস্তান ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ায় সংস্কৃতিগত যত তর্ক ও কলহ উত্থাপিত হয়েছিল তা আমরা সকলেই জানি। এখানে শুধু এই বাস্তবতা লিপিবদ্ধ থাকুক যে, নতুন রাষ্ট্রের

প্রথম যে-নবীন সাহিত্যিক দল পঞ্চাশের দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা বিগত চল্লিশ বৎসর ধরে সৃষ্ট আধুনিক সাহিত্যধারাকেই বরণ করে নিয়েছিলেন —কী কাব্যে কী কথাসাহিত্যে। (আরেকটি ক্ষীণ প্রবাহ এরই সঙ্গে চলেছিল, এখনো চলছে, ইসলামি স্বাতন্ত্রিক চেতনাকে আশ্রয় করে। এ প্রসঙ্গ আমাদের বিবেচনাবহির্ভূত বিষয়।)

একেই বলে সময়ের শাসন- এবং শোষণশক্তি, কেননা শিল্পীর যেসব অভিজ্ঞতা আর বোধ কলকাতার মতো উত্তরোল, সদ্যব্যস্ত, বহুভাষিক, সংস্কৃতিবিচিত্র মেট্রোপলিসে উদ্বোধিত হতে পারে, সেসবের কোনো সুযোগই ছিল না ৫০ ও ৬০-এর দশকের বড়ো মফসসল শহর ঢাকায়। এ তো অজানা নয় যে, "আধুনিকতা"র জন্ম নগরেই হয়েছে এবং "আধুনিক" সাহিত্যের আন্দোলনের সঙ্গে পারী, ভিয়েনা, বার্লিন, প্রাহা, মস্ক্‌ভা, পিতেবুর্গ, লনডন, ৎসুরিখ্‌ বিভিন্ন সময়ে জড়িত থেকেছে। ভয়ে-ভয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যেসব "আধুনিক" বোধ জন্মাবার ক্ষেত্র এদেশের ঢাকা রাজধানীতে বা গ্রামীণ লোকালয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, সেই বোধ এবং ধারণাসমূহ আমরা কলকাতার নাগরিক জীবন থেকে নিয়ে এসেছিলুম। এরকম একটি সামাজিক ও ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার নাম অ্যালিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবোধ। য়োরোপীয় বিচ্ছিন্নতাবোধের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ঢাকা তো দূরের কথা, এমন-কী কলকাতার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে না; তবু, ওই বিচ্ছিন্নতাচেতনা কলকাতাতে হয়তো-বা অনেকখানি সম্ভবপর ওই নগরের জটিল আর সুদীর্ঘ বেড়ে-ওঠার প্রক্রিয়ায় এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবিপ্লবের আর বুরজোয়া সমাজের টেনশনের কারণে। ঢাকা এখনো সত্যিকার অর্থে নগরই হয়ে ওঠে নি: দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, কৃষিভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থা, সামন্ততন্ত্রীয় সমাজপদ্ধতি এখনো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্ন একাকী হওয়ার সুযোগ আমাদের অল্প। অথচ ৫০ ও ৬০-এর দশকে উল্লেখযোগ্য কবিতা আর কথাসাহিত্যের মধ্যে এই সুর তীক্ষ্ণ আর স্পষ্ট। শামসুর রাহমান থেকে শহীদ কাদরী, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌ থেকে সৈয়দ শামসুল হক—অনেক শক্তিশালী সাহিত্যকর্মীর রচনার ভিতরে এই অসুখ শনাক্ত করা যায়। অস্তিত্ববাদী দর্শন, সার্ত্র্‌ ও কাম্যুর রচনাবলী তখন বাজারে এসে গেছে। কারণ কি সেখানে নিহিত?

ব্যক্তিজীবনের মতো সাহিত্যেরও জীবনেতিহাসে খুব সম্ভব অপ্রত্যাশিত অকস্মাৎ ঘটনাদি ঘটে থাকে যা প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎকে পালটে দেয়। সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে এবং পূর্ব-পাকিস্তানি বা বাংলাদেশের সাহিত্যে য়োরোপীয় আগন্তুক "আধুনিকতা" এ-জাতীয় কোনো ঘটনা কিনা জানি না। সে যাই হোক, এ-কথা মেনে নিতেই হবে যে আমাদের মধ্যে আধুনিকতার এক ধরনের আত্তীকরণ এতদিনে ঘটে গেছে। নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন কি আকবর হোসেন বা বন্দে আলী মিঞা আর পড়া সম্ভব নয়, এমন-কী বহুলাংশে সত্যেন দত্ত, নজরুলও নয়।

৪

বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্বে পাকিস্তানি আমলে এদেশে সংস্কৃতিজগতে বাহান্নোর ভাষা-আন্দোলন বাদ দিলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন। এই ঘটনা একাধিক অর্থে প্রতীকী। কারণ এর মধ্যে শিল্পচেতনা, নৈতিক এবং সামাজিক ঔচিত্যবোধ, নন্দনতত্ত্বাশ্রয়ী বিবেকবুদ্ধি এবং রাজনৈতিক দিগদর্শন লুকোনো ছিল। বাঙালি সংস্কৃতিধারায় রবীন্দ্রনাথ মহত্তম শিল্পী বলেই তাঁর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এদেশের উদারপন্থী বুদ্ধিজীবী মহল সরকারি উদাসীন্য ও তিরস্কার সত্ত্বেও করতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন—এই ব্যাখ্যা সত্যের আপাতদৃশ্য অংশমাত্র। এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল রবীন্দ্রনাথকে

বর্ম হিসেবে ব্যবহারের অভিপ্রায়, যাঁকে সামনে রেখে এবং যাঁর আড়ালে থেকে আমরা—তদানীন্তন পাকিস্তানের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীর প্রগতিশীল "আ ধু নি ক" অংশ—মানবতাবাদী "আধুনিক" বিশ্বসংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র বজায় রাখতে পারব, এ-দেশের জনজীবনে ঐতিহ্যসূত্রে লালিত ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিচেতনার উপরে ধর্মাশ্রয়ী (theocratic) রাষ্ট্রের একদেশদর্শী সংস্কৃতিচিন্তা ও ধর্মীয়-সংস্কৃতির অত্যাচার প্রতিহত করতে সক্ষম হব। এরই সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিল এদেশের মানুষের নিজস্ব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ, এবং নিজেদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের পূর্বশর্ত বিবেচনায় রাজনৈতিক স্বাধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। রবীন্দ্রজন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপনের ঘটনা এসকল কারণের জন্যই "প্রতীক" : মগ্নশৈলের মতো রবীন্দ্রনাথ নামে এক শিল্পীব্যক্তি তার তুচ্ছ উপরিভাগ শুধু, অদৃশ্য অন্তরালে লুকিয়ে ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক উপলব্ধি এবং সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতের স্পষ্ট রেখাচিত্র।

এখানে একটি বিশেষ দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কেননা ঘটনাটি আমার বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটি এই যে, একটি "জাতীয় কমিটি" তৈরি হয়েছিল রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ পালনের জন্য। লক্ষণীয়, কোনো সাংস্কৃতিক কারণে দলমতনির্বিশেষে 'জাতীয়' সংঘবদ্ধতার সার্থক প্রয়াস সেইটিই প্রথম। রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিকে উপলক্ষ করে কোনো বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তিমনীষা (অর্থাৎ একজন কবি কি সমালোচক কি সংস্কৃতিসেবী) নন, অনেক বিভিন্ন মাপের "সামাজিক" মানুষ একত্র জড়ো হয়ে একটি সাংস্কৃতিক শক্তিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। সাংস্কৃতিক ধারাস্রোতে ব্যক্তির নয়, সংঘের এই বিজয় আমাদের লক্ষ না করে উপায় নেই। এ কি আশ্চর্য মনে হয় না—১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত এদেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যক্তিপ্রয়াসকে পিছু ফেলে সংঘ এগিয়ে যাচ্ছে! এতে এরকম কোনো অনিবার্যতা 'অ-দৃষ্ট' হয়ে থেকে যাচ্ছে কিনা জানি না যে গণসংস্কৃতি ও গণসাহিত্য সৃজনই আমাদের ভবিষ্যৎ। আমি সচেতন, বাংলাদেশের মানবসম্পদ ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে "গণসংস্কৃতি" ও "গণসাহিত্য" শব্দদ্বয়ের ব্যবহার বেশ তর্কসাপেক্ষ, তা হতেই পারে, যেহেতু আমাদের সাহিত্যের পরিলক্ষিত মান ও আমাদের সংস্কৃতির সর্বজনগ্রাহ্য শিল্পিত বহিঃপ্রকাশ এখনো বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সহিত সম্পর্করহিত, কারণ সাধারণ মানুষজন এখনো লিখতে-পড়তে জানে না। এখানে আমার বক্তব্য শুধু এটুকুই যে, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির নির্মাণ বা নিয়ন্ত্রণভার যাঁদের হাতে তাঁরা তাঁদের শিল্পবুদ্ধি ও সমাজ-অভিজ্ঞতা দিয়ে এই প্রত্যয়ে সন্তবত স্থিত হচ্ছেন যে, সাহিত্য ও সংস্কৃতি উভয় ক্ষেত্রেই সমষ্টিই মুখ্য, ব্যক্তি নয়; সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে তাঁদের বাধ্য করছে সমকালীন ইতিহাস এবং সময়।

উল্লেখযোগ্য যে ষাটের দশকে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা কবিতায় এসে যুক্ত হয়েছিল, তা হল ছড়া, রাজনৈতিক, ব্যঙ্গপ্রবণ, ক্রুদ্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ অজস্র ছন্দোবদ্ধ পঙক্তি আমাদের জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ কবিপুরুষেরা সেদিন উপহার দিয়েছেন। মানগত মূল্যবিচারের চেয়েও যা প্রণিধানযোগ্য তা হল, কবিতার একটি genre হিসেবে ছড়ার প্রতিষ্ঠালাভ। এবং এইসঙ্গে লক্ষণীয় যে এরই সমান্তরাল, কবিতায় আরো একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার এসে উপস্থিত হল : বাংলাদেশের কবিতায় সাংবাদিকতা, উচ্চকণ্ঠ ধ্বনিরব, মিছিলের কণ্ঠস্বর যুক্ত হল; নির্মলেন্দু গুণ, আসাদ চৌধুরী, মহাদেব সাহা প্রমুখেরা মূলত অন্ত্য-ষাট দশকেরই কবি। রুশ, ফরাসি, জরমন, ইতালীয় কবিতার সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করিয়েছিলেন সানাউল হক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, হায়াৎ মামুদ প্রমুখ দু-চার জন। মার্কিনী বীট বংশের, স্যুররিয়ালিজমের যন্ত্রসিদ্ধ কবিতার ছোঁয়াচ লেগেছিল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান,

কি আবদুল মান্নান সৈয়দের মতো জনা কয়েকের কাব্য-চর্চায়। কথাসাহিত্যে জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও হাসান আজিজুল হক দেখা দিয়েছেন; এঁদের আগে-আগে অল্প দূরত্বে হেঁটে গেছেন বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর: ছোটোগল্পের ভাষা তির্যক, সাংকেতিক, মননশীল হয়ে উঠেছিল। জ্যোতিপ্রকাশ তো গল্পকে প্রায় কাহিনী-মুক্ত করে কবিতার স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন। এইসব পরীক্ষানিরীক্ষা ও শিল্পভাবনা গ্রন্থপাঠবাহিত পশ্চিমী অভিজ্ঞতার স্বীকরণ বলে মনে করি।

দেশ জাতি সাহিত্য সংস্কৃতি এভাবে নিজের চার-পাশে তাকাতে-তাকাতে পথ চলতে-চলতে ১৯৭১-এ এসে থমকে দাঁড়াল। এ সময়ের কাণ্ডকারখানা বাঙালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে আর কখনো ঘটে নি। একাত্তরের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর বর্বর ঘৃণ্য হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে এ-দেশের সমগ্র বাঙালি জনশক্তি মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। যুদ্ধে জয় হয়েছিল, তবে তা পুরনো পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এক-টানে পূর্ববর্তী সমাজসত্য থেকে আমাদের টেনে ছিঁড়ে এনে নতুন এক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। আমাদের জন্যে প্রথম বারের মতো 'the old world ended' ১৯৭১ সালে।

৫

যুদ্ধের দংশন—তা আগ্রাসীই হোক বা আত্মরক্ষার্থেই হোক—কত গভীর, বিস্তৃত, অথচ আপাত-অদৃশ্য হতে পারে তা বাংলাদেশ জেনে গেছে একাত্তরের মুক্তি-যুদ্ধের কাছ থেকে। যুদ্ধজয় ও স্বাধীনতা অর্জনের পরেও দেশ ঠিকমতো চলে নি, চলছে না—আমরা সকলেই জানি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চক্রান্ত বা দৈশিক রাজনীতি ও প্রশাসনের ব্যর্থতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে, তার প্রয়োজনও নেই। আমি শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যুদ্ধকালের আর যুদ্ধশেষের সমাজপরিস্থিতিতে যেসব বদল ও ভাঙচুর হয়েছে, সেই দিকে। সর্বাধিক বড়ো পরিবর্তন এসেছে সামাজিক আচরণে আর মানবসম্পর্কে। বিনয়ী গ্রামীণ লাজুক বাংলাদেশ যুদ্ধের খাণ্ডবদাহে আমূল পালটে গিয়েছে; অশান্ত ক্রুদ্ধ সন্দেহপ্রবণ দুর্বিনীত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন এক হৃদয়রিক্ত পেশীবহুল অস্তিত্বে তার রূপান্তর ঘটেছিল। সমাজবিজ্ঞানীর কাছে আমার পর্যবেক্ষণ গ্রহণযোগ্য হবে কিনা জানি না, তবে সমাজরূপান্তর চিহ্নিত করার জন্য আমার নিজস্ব এক নিরীক্ষাকৌশল আছে। তা হল—একাত্তরের পর থেকে জনগণের মধ্যে কোহল ও নানাবিধ মাদক দ্রব্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান আসক্তি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের প্রতিযোগিতা, এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের সমাজ ও আইন-বিরোধী কর্মে উল্লসিত যোগদানের খতিয়ান নেওয়া। সমাজের বুনোট যে পূর্বের মতো নেই, এ সবই তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। এই পরিস্থিতিসকলের কার্যকারণ, ফলাফল, নিকট ও দূরাগত প্রতিক্রিয়াদি অনুপুঙ্খ-রূপে বিশ্লেষণ করলে গোটা বাংলাদেশের যে সামগ্রিক চেহারা উন্মোচিত হবে, সেটাই বর্তমান সমাজের যথার্থ চিত্র, এবং আমার বিশ্বাস, সেই মুখাবয়বের সঙ্গে '৭১-পূর্ব বাংলাদেশের কোথাও কোনোখানে মিল নেই।

১৯৭১-এর পর থেকেই বাংলাদেশ অস্থির, স্থিতি-হীন, নিত্যপরিবর্তমান অবস্থার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয় নি, নিত্য নতুন বঞ্চনা আর শাঠ্যের ভিতর দিয়ে যেতে-যেতে জনগণ তার শুভাশুভবোধ ও নৈতিক শক্তি হারিয়ে ক্রমশ অনুভূতিহীন নির্বিবেক জড়পিণ্ডে পরিণত হচ্ছে। একদা তার সম্মুখে যে-লক্ষ্য ছিল, ধীরে-ধীরে তা অলভ্য দিবাস্বপ্নের ন্যায় দূরান্তে প্রস্থানোন্মুখ। যুদ্ধের পূর্বে পাকিস্তানি আমলে সাধারণ মানুষের যে-রাষ্ট্রিক ভূমিকা ছিল তা আজো অপরিবর্তিত: বঞ্চনা শোষণ আর নির্যাতনের ফলে

সে শাসকগোষ্ঠী এবং প্রশাসনযন্ত্রের এক দুর্দমনীয় শত্রু। শিল্পী ও সাহিত্যিক জনগণেরই অন্তর্ভুক্ত, রাষ্ট্রশক্তির নয়। পূর্বেও তা-ই ছিল। সেদিক থেকে অবস্থানগত পরিবর্তন তার হয় নি।

সমস্ত অর্থেই ১৯৭১ সাল একটি অবশ্যগ্রাহ্য সীমারেখা : এখন থেকে সমাজের স্থায়ী মূল্যবোধগুলোর ভাঙচুর চলবে, সামাজিক সংহতির বন্ধনগুলো ক্রমশ শিথিল হতে থাকবে; সমাজের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের (institutions) স্বাভাবিক সমস্ত ক্রিয়াপদ্ধতি (norms) বিশৃঙ্খল আর এলোমেলো হবে; জনসংখ্যাবিস্ফোরণের চাপে গ্রামপলাতক জীবিকান্বেষী মানুষের পঙ্গপাল রাজধানী আর বড়ো শহর অভিমুখে ছুটবে, মফসসল শহর ঢাকা সর্বস্ব পণ করে যেন বস্তি-মেগাপলিস হওয়ার জন্য দুরন্ত ধাবমান, গৃহান্তরীণ মধ্যবিত্ত নারী পারিবারিক প্রয়োজনে ইসলামি প্রচারকে অবহেলা করেও আপিসে কলকারখানায় ধাওয়া করবে, দেশব্যাপী বারাঙ্গনাপল্লী পুড়তে থাকবে ও তার বাসিন্দারা সমাজদেহে নিজেদের ঠাঁই করে নেবে, মদ্যপান আইনত নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় হবে, অথচ তার সহজলভ্যতা ও ব্যবহারের ব্যাপকতা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে; ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা কল্পনাতীতরূপে বৃদ্ধি পাবে, অথচ একই সঙ্গে মানুষ ধর্মভ্রষ্ট হবে; দেশের রাজনীতিতে থেকে সভ্য এবং সংস্কৃতিমান সমাজের চারিত্র্যলক্ষণসমূহ শঠতা, মিথ্যাপ্রচারণা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, ন্যূনতম ন্যায়নীতি বিসর্জন ইত্যাদির ফলে বহিষ্কৃত হবে; দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার মূল্যবোধ উপহসিত হতে থাকবে; বিদেশনির্ভর পরিকল্পনাকাঠামোর ফলে বহির্বিশ্বের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনপ্রক্রিয়া ব্যাপক এবং স্থায়ী হবে, গণসংযোগমাধ্যম (communication media) ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির বিস্ময়কর উন্নতির প্রভাবে পশ্চিমী টেকনোলজির আক্রমণ রেডিও, টেলিভিশন, ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে দৈশিক সংস্কৃতিচর্চার ধারাবাহিকতা ক্রমশ ছিন্ন করে দিতে থাকবে (প্রমাণ : শহরে ও গ্রামেগঞ্জে পাঠাগারের বিনষ্টিসাধন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠ্যাভ্যাসের ক্রমাবলুপ্তি), শিক্ষানীতিতে বিপর্যয় এবং শিক্ষামান ও শিক্ষায়তনের ক্রমধ্বংসাধন, মানুষের নিঃস্বীকরণপ্রক্রিয়ার (pauperization) অগ্রাভিযান; অর্থনৈতিক শ্রেণীবিন্যাস মাত্র উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত—এই দুটি ভাগের মেরূকরণপ্রক্রিয়ায় সম্প্রসারিত, রাষ্ট্রযন্ত্রের সচেতন চেষ্টায় জনগণের হৃদয় থেকে দেশপ্রেমহননের প্রচেষ্টাবৃদ্ধি, শিক্ষিত সমাজ- ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আত্মবিক্রয় এবং বিবেকহীনতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উভয় দিক থেকেই মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার অবদমন, মৃত্যু, ক্ষুধা, হত্যা এবং সামাজিক অপরাধ ও নৈতিক অনাচারের প্রতি মানুষের অপরিমেয় ঔদাসীন্য আর স্থিতিস্থাপক সহনশীলতা, নিরন্ন ও বিত্তহীন এবং সংখ্যালঘু সচেতন শ্রেণীর মধ্যে সমাজতন্ত্রী ধ্যানধারণার প্রসার, সংস্কৃতিচর্চাব্রতী কিছু প্রগতিশীল আন্দোলনের (যেমন রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার ও অপসংস্কৃতিরোধের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান) অনমনীয় প্রতিরোধযুদ্ধ—একসঙ্গে এত কিছু পরস্পরপরিপূরক, পরস্পরযুযুধান ঘটনাক্রম সমান্তরালভাবে দেশের ভিতরে চলছে। ধ্বংস আর নির্মাণ, উন্নতি আর অবক্ষয়, মনুষ্যপ্রেম আর অমানবিকীকরণ (dehumanization)—সবই সমাজে প্রবলভাবে সহাবস্থান করছে। সমাজকাঠামো ও সমাজআভ্যন্তরীণ মানবসম্পর্ক—উভয়েই এখনো নির্দিষ্ট রূপাবয়বহীন, তরল, অসংহত, এবং কোন্‌খানে গিয়ে কবে স্থিতি পাবে, আমরা কেউই তা জানি না।

শিল্পী-সাহিত্যিকও প্রথমত সামাজিক মানুষ। তাঁকেও এই প্রবাহের মধ্যেই—মানুষ ও শিল্পসাধক উভয় হিসেবেই—টিকে থাকতে হচ্ছে। চতুষ্পার্শ্বে এত কিছু নিত্য ঘটছে যে তার বাইরে অন্যদিকে তাকাবার দায় ও স্পৃহা তাঁর কমে আসতে বাধ্য। বহিঃপ্রভাব স্বীকরণ দূরের প্রসঙ্গ, এ-মুহূর্তে বহির্বিশ্বের

শিল্পভাবনা আত্মসাতের দিকে মন দেওয়ার সুস্থিরতা পর্যন্ত তাঁর নেই। আমরা বিগত পনেরো বছরের (১৯৭৩-৮৭) দিকে তাকালে দেখতে পাব, বাংলা-দেশের সাহিত্যে য়োরোপ-আমেরিকার সাহিত্য-প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ। নিজের পরিমণ্ডলে যা ঘটছে তাকে ছেঁকে তুলতেই তাঁরা ব্যস্ত। গল্প, উপন্যাস, কবিতায় সর্বত্র গ্রামীণ ও শহুরে মানুষের জীবন, তার তৃষ্ণা আর অতৃপ্তি, এদেশের সামাজিক ভাঙন ধীরে-ধীরে শিল্পে বিবৃত হচ্ছে। এই অর্থে, শিল্পীর মনো-জগতে ইংরেজিভাষাবাহিত যে পশ্চিমী শিল্পনন্দনতত্ত্ব এতকাল জীবন্ত ছিল, এখন তা প্রায় মৃত।

তবে এই হয়তো সবটুকু নয়। শিল্পীর মনোজগতে হয়তো আরো এক ঘটনা কাজ করে যাচ্ছে। আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সাহিত্য হয়তো-বা তাঁকে অন্য ঈস্থেটিক্‌স্ শেখাচ্ছে। ব্যক্তির অন্তর্জগৎ শুধু নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির বহুরৈখিক জটিল সম্পর্কবুনোট, তার সমাজ-অস্তিত্বের টানাপোড়েন, এবং বৃহত্তর সমাজজীবনের সঙ্গে রাষ্ট্র ও রাজনীতির অভিঘাতকে সাহিত্যে স্থায়িত্ব দেওয়াই তাঁর কাজ। সমাজের সমুদয় স্রোতপ্রবাহকে শনাক্ত করাই তাঁর কাজ। তিনি শিল্প বলতে শুধু ব্যক্তিহৃদয় ও মনন ও শৈলীসর্বস্বতা আর বুঝবেন না, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-একক আর তাঁর কাছে মুখ্য হবে না, তিনি সমাজদেহে ব্যক্তির অবস্থানকে দেখাতে চাইবেন এবং সাহিত্য ক্রমেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক দলিল হয়ে উঠতে চাইবে।

প্রসঙ্গত, এখানে আরো এক নিষ্ঠুর সত্যের উল্লেখ করা কর্তব্য জ্ঞান করছি। বিদেশের সাংস্কৃতিক (সদর্থক) বা সাহিত্যিক প্রভাব আত্মসাৎ বা আত্তীকরণের প্রাথমিকতম পদ্ধতি সেই সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে ভাষাবাহিত সংযোগস্থাপন। আমাদের দেশে যে-একটি বিদেশী ভাষার খোলা দরজা দিয়ে বিশ্বসংস্কৃতির প্রবেশ এতকাল সম্ভব হয়ে এসেছে তার নাম ইংরেজি। ষাট দশকের মধ্যভাগ থেকে যে-প্রজন্মের আবির্ভাব এদেশে হয়েছে তাঁদের কাছে নানাবিধ সামাজিক ও শিক্ষাব্যবস্থাগত কারণে ইংরেজি আর "দ্বিতীয়" ভাষা থাকে নি, "বিদেশী" ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাস্তব অবস্থা এই যে, অনতি-তিরিশ যাঁরা এখন লিখছেন তাঁদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ অল্প পরিচয় ও অনভ্যাসের কারণে ইংরেজি ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ। স্বাভাবিক-ভাবেই ভিনদেশী ভাষা আর সংস্কৃতির দ্বারা প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। পরিস্থিতির এই ভিন্নতা অনেকের নিকট হতাশাব্যঞ্জক এবং আতঙ্কজনক মনে হতে পারে। আমার নিজের তা মনে হয় না শুধুমাত্র এই কারণে যে, সাহিত্যের বিকাশ বা উন্নতির পূর্বশর্ত ভিন্নভাষাজ্ঞান বা অন্যদেশী সাহিত্যের অভিজ্ঞাতজাত অভিঘাত নয়, বরং নিজস্ব সমাজ-অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মননধর্মিতা ও শিল্পচিন্তা।

৬

বিগত পনেরো বৎসরে (১৯৭৩-৮৭) এদেশে রচিত সাহিত্যে সর্বাধিক প্রবল ধারাটির নাম নাটক। আমাদের মনে পড়তে বাধ্য যে, '৭১-এর পূর্বে এখানে শক্তিশালী দু-চার জন নাট্যকার (নুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, সাঈদ আহমদ প্রমুখ) ও দু-একটি শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী (যেমন ড্রামা সার্কল্) থাকলেও নাটক তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি এবং নাট্য-চর্চাও বহু জনের সম্মিলিত শ্রম আর সাধনায় অবিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। তাই, নাটকের পুনর্জন্ম এখানে একান্তই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। আমার ধারণা, নাট্যমনস্কতার এই আকস্মিক উৎসারণ পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত সমাজসমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যবাহী সার্থক নাট্যচর্চা ও নাট্যাভিনয় দ্বারা অনুপ্রাণিত। ভুলে গেলে চলবে না, অন্তত কোটিখানেক মানুষ মুক্তি-যুদ্ধের সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ও সন্নিহিত রাজ্যগুলিতে

ন মাসের জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। বাংলাদেশে লক্ষ করবার মতো বিষয়: একাধিক অনিয়মিত নাট্য-সাময়িকী ও শতাধিক নাট্যগোষ্ঠীর অস্তিত্ব, এবং মঞ্চে আর টেলিভিশনে যত নাটক অভিনীত হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠভাবে তা সমকালীন সময়- ও সমাজ-কেন্দ্রিক। অনূদিত বিদেশী নাটক যা জনপ্রিয় হয়েছে তাও বের্টোল্ড ব্রেশ্‌ট্‌—এ ঘটনাও ইঙ্গিতবহ। বিভিন্ন স্থানের গ্রুপ থিয়েটার বা সেলিম আল দীনের 'গ্রাম থিয়েটার' কতদূর সার্থক, সে-বিচারে না গিয়েও বলা যায় যে এসবের পশ্চাতে নাট্যকর্মীদের গণমানুষ-চেতনার মূল্যবোধ বিন্দুমাত্র অবহেলাযোগ্য নয়। মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে এবং প্রযুক্তি-গত অভিজ্ঞতা হয়তো বিদেশানুসৃতও, তথাপি নাটকের বিষয়বস্তু ও কুশীলব বাস্তবতা বা সমকালীনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না।

সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে সৈয়দ শামসুল হক এখনো একসপেরিমেনটের রাজা। বিশেষভাবে লক্ষ্য-যোগ্য তাঁর 'অন্তর্গত' উপন্যাস। তিনি, শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং বর্ষীয়ান আবুজাফর শামসুদ্দীন ('দেয়াল' উপন্যাস) রাষ্ট্র ও রাজনীতি ও সমাজের আবর্ত এবং বাঙালি মুসলমানের মনো-ভূগোল ও সমাজপরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরছেন। বাঙালির আত্মপরিচয় আবিষ্কারের প্রয়োজনে উপন্যাসে বাঙলার প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়বস্তু এসেছে সেলিনা হোসেন, রিজিয়া রহমান ও শওকত আলীর রচনায়। মুক্তি-যুদ্ধের মধ্যে অবহেলিত প্রাকৃতজনের অবস্থান এবং অত্যন্ত গ্রামীণ বাঙলার (যেমন চট্টগ্রাম, উত্তরবঙ্গ, খুলনা) সমাজজীবনের ছবি উঠে আসছে হাসান আজি-জুল হক, বিপ্রদাস বড়ুয়া, আবুবকর সিদ্দিক, মুস্তাফা পান্না, মঞ্জু সরকার প্রমুখের রচনায়। শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত জীবনকে উপজীব্য করেছেন হুমায়ুন আহমেদ। রাহাত খান নিয়ে আসছেন গুলশান-বনানীর মাংসল ও মদির ড্রয়িংরুম। আমাদের লক্ষ করতেই হবে, ষাট দশকের গল্পপ্রবাহের শৈলীগত উন্মার্গতা (যেমন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মোস্তফা আনোয়ার) আর প্রশ্রয় পাচ্ছে না। রশীদ কবীর কি মাহমুদুল হকের বর্ণনা বা সংলাপের দ্যুতি ও শৈলীপ্রকরণ বিস্ময়কর, কিন্তু তাঁদের তৈরি মানুষজন ভাবজাগতিক ও অবাস্তব নয়, একান্তই সমাজ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ genre হিসেবে নতুন যে স্বাতন্ত্রিক মহিমা পেয়েছে তার কারণ কেবল শৈলী বা ভাষামাধুরী নয়: আহমেদ হুমায়ুনের আলেফ মিঞা কি সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ('গাছপাথর' ছদ্ম-নামে) কি হায়াৎ মামুদের "বাঙালি বলিয়া লজ্জা নাই" পাঠককে টানে সমাজভাবনার জন্যেই, অন্য কোনো কারণে নয় সম্ভবত।

কবিতাতেও এর সমান্তরাল ঘটনাই ঘটছে। ব্যক্তিগত প্রতীক জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে সামাজিক ঘটনাসংকেতকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যপুরাণ কি বাক্-প্রতিমার ব্যবহার তুলনামূলকভাবে এখন কম। রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ কবিরা মৌখিক বচন কি স্লোগানকে সরাসরি কবিতায় নিয়ে আসছেন। শামসুর রাহমানের কাব্যগত অবস্থান-পরিবর্তন চোখে না-পড়েই পারে না। এবং মোহাম্মদ রফিক যে ইতিহাস-দৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছেন তা অতুলনীয় এবং অভাবনীয়। কবিতায় গদ্যের সংক্রাম বিস্ময়কররূপে বেড়ে গেছে।

চিত্রকলায় কামরুল হাসানের দিগ্বিজয় সুস্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিমূর্ত চিত্রশৈলীতে আমাদের উদ্ধার নেই। এমন-কী, সুলতানের পেশল মানব-মানবীর দলও ধুলোকাদামাখা কৃষক ও কৃষানী। নবীন ও প্রবীণ যাঁরাই এখন ছবি আঁকছেন তাঁরা স্পষ্টতই পশ্চিম থেকে মুখ ফিরিয়ে গ্রামীণ বাঙলার নিসর্গ ও মানুষ, নৈসর্গিক ও রাজনৈতিক উপপ্লব. মাতৃভূমির রূপসী অথচ দারিদ্র্যমলিন আতুর ছবি তুলে ধরছেন।

সার্বিকভাবে বাঙলাদেশের শিল্পচৈতন্য এইভাবে

স্বদেশের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। দেশের বাইরে, দেশকে বাদ দিয়ে তাঁদের কোনো কথা নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে এই সত্যও মেনে নিতে হবে যে শৈলী-প্রকরণ, ভাষাব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা তাঁরা বিশ্বের সাহিত্যধারা থেকে প্রয়োজন-মতো নিচ্ছেন। শৈলীগত এই "আধুনিকতা" কিন্তু বিদেশের ধারাবাহিক অনুকরণ নয়, ৫০-৬০ বছর আগে আধুনিকতার যে-বীজ বাঙলা 'ভাষা'য় রোপিত হয়েছিল তা-ই দিয়ে ধীরে-ধীরে আকার পরিগ্রহ করছে।

৭

সবশেষে, বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে একটি কথাই বলবার আছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা নেতির দিক। দরিদ্র ও অনগ্রসর তৃতীয় বিশ্বে উন্নত পশ্চিমের সমাজে যে প্রযুক্তিকেন্দ্রিক আগ্রাসন দৃশ্যশ্রাব্য (audio-visual) মাধ্যমে আমাদের সংস্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে, তার কুফল সমাজদেহে এবং সংস্কৃতিক্ষেত্রে দৃশ্যমান। বাস্তব সাক্ষ্য হিসেবে এদেশের চলচ্চিত্র ও যৌনকাতর অজস্র সাময়িকপত্রের অত্যাচার নিরন্তর আমাদের প্রহার করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেক্স-ক্রাইমের পাঁচন, নিউজপ্রিণ্ট পেপারব্যাকের বোতলে। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রশাসননীতির ভণ্ডামি, নির্‌বুদ্ধিতা ও বিবেকহীনতার প্রশ্রয়ে পশ্চিমের অপসংস্কৃতি রাজ্য-পাট গেড়ে বসছে। সমাজজীবনে যে আত্মবিস্মরণ ও বিদেশাসক্তি সুকৌশলে রাষ্ট্র ছড়িয়ে দিচ্ছে, তার ফলে সমাজে মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়েছে এবং লিখিত রচনাদিতেও তার করাল ছায়া পড়ছে।

কিন্তু আমাদের বিচারে তা সাহিত্য নয় এবং অপ-সাহিত্যও নয়, লেখ্য পণ্য মাত্র। তা শ্রম আর মেধার অপচয় এবং রুচিবিকার মাত্র। অগত্যা, আমাদের বিবেচনার বাইরে পড়ে থাকার সঙ্গত কারণ তার আছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও ভারতীয় সংবিধান

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯৩৭ সন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রাক্কাল পর্যন্ত যে অশুভ সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠতে থাকে, তার জন্য ভারতবাসীকে কম মূল্য দিতে হয় নি। বস্তুত, এই প্রমত্ত সাম্প্রদায়িকতার পীড়নে নিতান্ত অসহায় বোধ করেই আমরা শেষ পর্যন্ত আত্মঘাতী দ্বিজাতি-তত্ত্বের সত্যতা মেনে নিতে বাধ্য হই, এবং ফলত বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির আনন্দ অনেকাংশে বিস্বাদ হয়ে যায় কলঙ্কময় দেশবিভাগের গ্লানি আর বেদনায়। এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশনায়কেরা যখন নতুন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন, তখন স্বভাবতই সাধারণ মানুষের মনে আশা ছিল এই যে, অতীত ইতিহাস থেকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা সবিশেষ তৎপর হবেন, অর্থাৎ, সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এমনই এক বলিষ্ঠ নীতি গৃহীত হবে এবং এই নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমনই সতর্কতা অবলম্বিত হবে, যাতে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়, যাতে অর্থহীন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আর হানাহানির মধ্য দিয়ে এদেশে মানবশক্তির মূঢ় অপচয় আর কখনও না ঘটে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে তা হয় নি, তার প্রমাণ স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের গত একচল্লিশ বছরের ইতিহাস। আমাদের বিশ্বাসে আর মানসিকতায়, আমাদের আচার-আচরণে আর অভ্যাসে ধর্মান্ধতার শিকড় এখনও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত—যার ফলে গত একচল্লিশ বছরে বারে-বারে দেশের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত তুচ্ছ কারণে জ্বলে উঠেছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন, যার দ্বারা বিপন্ন হয়েছে শত-শত নিরীহ নরনারীর নিরাপত্তা এবং অস্তিত্ব। এ ছাড়া, সাম্প্রতিক কালে দেখা দিয়েছে আর-এক নতুন ধরনের বিপদ : তীব্র সাম্প্রদায়িক চেতনার গর্ভ থেকে জন্ম নিচ্ছে এক যুক্তিহীন, বিধ্বংসী সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ, যার দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে আমাদের জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি। কাজেই এই মুহূর্তে আমাদের দেশ যেসব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন, সাম্প্রদায়িকতা নিঃসন্দেহে তাদের অন্যতম, এবং এই সমস্যার উপযুক্ত মোকাবিলার জন্য সর্বাগ্রে এর মূল কারণগুলি চিহ্নিত করা দরকার। এই বিচারে শ্রীঅনির্বাণ কাশ্যপ-লিখিত আলোচ্য গ্রন্থটি খুবই প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান রূপে বিবেচিত হবে, যেহেতু এখানে লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য হল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার উৎস-সন্ধান।

কী কারণে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব এখনও অব্যাহত—এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে লেখক তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি মেলেছেন আমাদের সংবিধানের দিকে, এবং প্রভূত অধ্যবসায় আর যত্ন-সহ সংবিধানসভার বিতর্ক আর আলোচনা এবং মূল সংবিধানের বিভিন্ন ধারার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে, স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আমাদের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ নিহিত আছে আমাদের সংবিধানে। অর্থাৎ, লেখকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, সম্মানিত সংবিধান-প্রণেতাদের সাহস, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির অভাবে সংবিধানে এমন কতকগুলি অতি-প্রশ্রয়ী ধারা সন্নিবিষ্ট হয় এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আবেগনির্ভর স্পর্শকাতরতার দোহাই দিয়ে এমন কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিত্যক্ত হয় যার ফলে স্বাধীন ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাধি নির্মূল করার ব্যাপারে আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা তো উপযুক্ত সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারেই-নি, বরং স্বীকৃত সাংবিধানিক অধিকারের ব্যাপকতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জুগিয়েছে।

লেখকের মতে, সংবিধান-প্রণেতারা তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারেন নি নানা কারণে। প্রথমত, সংবিধান প্রণয়নের প্রারম্ভিক পর্বে মাত্র চোদ্দ শতাংশ ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত সংবিধান-সভার চূড়ান্ত রায়দানের অধিকার সম্বন্ধে নেহরু ও তাঁর কোনো-কোনো সহযোগীর মনে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল। অবশ্য সংবিধান প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর সৃষ্টির আনন্দ আর উদ্দীপনায় সব দ্বিধা আর সংশয়ই ভেসে যায়। কিন্তু সম্ভবত প্রণেতাদের অবচেতনে এই দ্বিধা আর সংশয় ক্রিয়ারত ছিল বলেই তাঁদের পক্ষে স্থিতাবস্থা সম্পর্কিত

কমিউন্যালিজম অ্যাণ্ড কনস্টিটিউশন—অনির্বাণ কাশ্যপ। ন্যাশনাল বুক্স, নিউ দিল্লী। দু-শ পঁচাত্তর টাকা।

দুর্বলতা জয় করে কোনো কঠিন এবং চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয়ত, সংবিধানসংক্রান্ত ড্রাফটিং কমিটির সদস্যেরা বয়সে কেউ তরুণ ছিলেন না ; তাঁদের গড় বয়স ছিল একষট্টি। এ ছাড়া, কে. এম. মুন্সি ব্যতীত ড্রাফটিং কমিটির সদস্যদের কেউই কার্যত কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এঁরা সকলেই ছিলেন প্রকৃতার্থে বিশেষজ্ঞ এবং এঁদের কর্মক্ষেত্রে যাবতীয় সাফল্য এবং সুনাম অর্জিত হয়েছিল প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে ১৯৩৫ সনের ভারত সরকার আইনের প্রেক্ষিতে। সর্বোপরি, সংবিধান প্রণীত হয়েছিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। যদিও সংবিধানসভার আনুষ্ঠানিক কার্যকাল ছিল তিন বছরের কিছু বেশি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংবিধানসভায় সংবিধান আলোচিত এবং গৃহীত হয়েছিল ১৬৫ (লেখকের মতে, ১৬৬) দিনে। স্বভাবতই, সম্পূর্ণ কিছু গড়ে তোলার মতো মানসিকতা, সময় আর সামর্থ্য সংবিধানপ্রণেতাদের ছিল না। রণক্লান্ত, বয়োবৃদ্ধ দেশনায়কেরা আর নতুন করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে চান নি। সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে তাই তাঁরা মূলত অনুসরণ করেন আপোসের নীতি এবং বহুলাংশে ব্যবহার করেন ১৯৩৫ সনের ভারত সরকার আইনের কাঠামো।

এর ফলে বৃহদাকার ভারতীয় সংবিধানে অনেক উচ্চমানের আদর্শ আর প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু এগুলিকে যথাযথভাবে কার্যকর করার জন্য যে সুচিন্তিত, বলিষ্ঠ সূত্রাবলী প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল—আমাদের আপোসকামী, দূরদৃষ্টিহীন সংবিধানপ্রণেতারা তা থেকে বিরত থাকেন। যেমন, সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতবর্ষ ঘোষিত হয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে, অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সংবিধানের ২৫-৩০ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে দেশের সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়কে প্রায়-অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা দানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই ধর্মীয় স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে অন্ধ ধর্মীয় আবেগ আমাদের সমগ্র রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়াকে কলুষিত করে যে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শকে উন্মার্গগামী করে তুলতে পারে—একথা আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা ভেবে দেখেন নি। বস্তুত, লেখক শ্রীকাশ্যপ সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায় ধর্মবিষয়ে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিরতি, অথচ সংবিধানে সম্পূর্ণ ভ্রান্তভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্রের চোখে সমস্ত ধর্মের সমানাধিকার ও সাম্য সমার্থক রূপে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, লেখকের মতে, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সাংবিধানিক স্বীকৃতি (যা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংবিধানের ৩০নং অনুচ্ছেদে) দেওয়ার অর্থ কার্যত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শকে উপেক্ষা করা। কারণ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে মেনে নেওয়ার কার্যত অর্থ দাঁড়ায় রাষ্ট্রকর্তৃক ধর্মীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকেও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান। কিন্তু এর তাৎপর্য বিপজ্জনক, কারণ এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্ম থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সঙ্গতভাবেই লেখক আরও উল্লেখ করেছেন যে, ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত ছিল ধর্ম- ও সংস্কৃতি-নির্বিশেষে সমস্ত নাগরিকদের জন্য এক অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রবর্তন। সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে একটি নির্দেশাত্মক নীতিও লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু এই নীতি রূপায়ণের জন্য কোনো ইতিবাচক উদ্যোগই আজও পর্যন্ত গৃহীত হয় নি। এর প্রধান কারণ নির্বাচনী রাজনীতির স্বার্থে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের মাত্রাতিরিক্ত সতর্কতা। এর ফলে ভারতবর্ষে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এক অবৈধ অন্বয় স্থাপিত হয়েছে, যার দ্বারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষিত আদর্শ। একেবারে গোড়াতেই যদি আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা আপোসের অন্ধ গলি থেকে বেরিয়ে এসে শক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাহস দেখাতে পারতেন, তাহলে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা এমন অর্থহীন প্রহসনে পরিণত হত না। লেখক আরও মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক দল ও রাজনীতিকে চিরতরে নিষিদ্ধ করার জন্য সংবিধানপ্রণেতাদের তৎপর হওয়া প্রয়োজন ছিল, প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য নাগরিক আইনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কঠোর হওয়া দরকার ছিল, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সম্প্রদায়নির্বিশেষে এক ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, সংবিধানের ২৫(১) উপধারার মাধ্যমে ভারতবর্ষে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধর্মপ্রচারের অবাধ সুযোগ দিয়ে যে ধর্মান্তরকরণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে তা বিলোপ করা উচিত ছিল, এবং সংবিধানের ৪৮নং অনুচ্ছেদে যে গোহত্যানিবারণসংক্রান্ত নির্দেশাত্মক নীতি সন্নিবিষ্ট করা হয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে তাকে কঠোরভাবে কার্যকর করা দরকার ছিল।

লেখকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের যাথার্থ্য সম্পর্কে

বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। ধর্ম আর সাম্প্রদায়িকতার অহেতুক আধিপত্যে ভারতীয় রাজনীতি আর সমাজজীবনের স্থিরতা ও যুক্তিগামিতা আজ স্পষ্টতই ব্যাহত, এবং এর জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী আমাদের সাংবিধানিক ব্যবস্থা। সংবিধান শুধুমাত্র একটি রাষ্ট্র ও সমাজের সাংগঠনিক নির্দেশক নয়, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র একটি জাতির চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয় সংবিধানের দ্বারা। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা এই ঐতিহাসিক সত্য বিস্মৃত হয়েছিলেন এবং এই কারণে সংবিধানের পাতায়-পাতায় তাঁরা রেখে গেছেন তাঁদের ভীরুতা আর দুর্বলতার, অদূরদর্শিতা আর অবিমৃষ্যকারিতার অসংখ্য স্মারকচিহ্ন। লেখককে ধন্যবাদ যে, তিনি তাঁর শ্রমসাপেক্ষ গবেষণার মাধ্যমে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বস্তুত, তাঁর এই গ্রন্থটিকে পথিকৃতের সম্মান জানানো অন্যায় হবে না। কারণ, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে অন্য কোনো গবেষণা-কর্ম এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।

তবে, লেখকের কয়েকটি যুক্তি আর মন্তব্য আপত্তিকর বলে বিবেচিত হতে পারে, এবং কেউ-কেউ এগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা আবিষ্কার করে লেখকের মহৎ উদ্দেশ্যের অপ্রত্যাশিত অপকর্ষে ব্যথিত হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, লেখক পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে নিরন্তর অনুপ্রবেশে, জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্যর্থতায় এবং গোহত্যানিবারণে কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট না হওয়ায় সবিশেষ বিচলিত। লেখকের এই উদ্বেগ অবশ্যই অযৌক্তিক নয়। অনুপ্রবেশ এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি আমাদের দেশের দুই গুরুতর অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সমস্যা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, লেখকের মতে, এই দুই সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত এবং তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, মুসলিম-অধ্যুষিত রাষ্ট্র থেকে অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে না পারলে এবং ধর্মবিশ্বাসের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সব সম্প্রদায়ের মানুষকে জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণনীতি পালনে বাধ্য করতে না পারলে ভারতবর্ষে মুসলিম জনসংখ্যায় প্রবল বিস্ফোরণ ঘটবে, যার ফলে নষ্ট হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। অর্থাৎ, লেখকের বক্তব্য এই যে, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রে হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সযত্নে রক্ষা করাই হল সাম্প্রদায়িকতার সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়। নিরপেক্ষ বিচারে, এই সিদ্ধান্ত আর যাই হোক অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা অথবা অসাম্প্রদায়িকতার পরিচায়ক নয়। লেখককে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসীরা পরিচিত হন মানুষ এবং নাগরিক হিসাবে, কোনো ধর্ম-মতাবলম্বী হিসাবে নয়। কাজেই, ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অসাম্প্রদায়িকতার বিশুদ্ধ বাতাবরণ তৈরি করতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে, এখানে জনসাধারণের কতসংখ্যক হিন্দু এবং কতসংখ্যক মুসলিম—এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। একইভাবে গোহত্যা সম্পর্কে লেখকের স্পর্শ-কাতরতাও আমাদের পীড়িত করে। গোহত্যার বিরুদ্ধে কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক যুক্তির অবতারণা না করে তিনি সরাসরি এটিকে যুক্ত করেছেন সাম্প্রদায়িতার প্রশ্নের সঙ্গে। এর ফলে পাঠকের মনে এই ধারণা হতে পারে যে, হিন্দু ধর্মীয় আচারে গোহত্যা ও গোমাংসভক্ষণ অনুমোদিত নয় বলেই লেখক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে গোহত্যা-নিবারণে আগ্রহী। কিন্তু এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্তটি অনিবার্য হয়ে ওঠে তা হল এই যে, লেখকের মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে হলে, হিন্দুদের আচার, অভ্যাস আর বিশ্বাস অনুসারে মুসলিমদের নিজেদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন মেনে নেওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, লেখকের অভিমত এই যে, ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা দূরী-করণের স্বার্থে যা একান্ত প্রয়োজন, তা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ও রুচির কাছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নতি-স্বীকার। যে লেখক সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আন্তরিকভাবে বিচলিত বোধ করে তথ্যবহুল এই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছেন, তিনি যে এই বিপজ্জনক এবং প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্তে সায় দেবেন না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু গ্রন্থবিন্যাসে ও যুক্তিবিস্তারে যথেষ্ট সতর্ক না হওয়ার ফলে তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রতিক্রিয়াশীলতার পিছুটান এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এগুলি উল্লেখ করা হল এই আশায় যে, পরবর্তী সংস্করণে লেখক এই বিষয়গুলি নিয়ে নতুন করে ভাববেন।

দুঃস্বপ্নের প্রহসন

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পোলাণ্ডের বিখ্যাত লেখক স্তানিসোয়াভ লেম একটি দুর্ধর্ষ আখ্যায়িকা ফেঁদেছিলেন আপিশযন্ত্র / আমলাযন্ত্র সম্বন্ধে, যার রাক্ষুসে 'আ'-টার হাত থেকে কারুই রেহাই ছিল না। কল্পবিজ্ঞান এই আখ্যায়িকায় ভাবীকালের ব্রহ্মাণ্ডে কোনো-এক ছোট্ট গ্রহে আপিশ-আমলা ইত্যাদি কিছুই ছিলো না, কিন্তু সে ছিলো বিজ্ঞানে প্রকৌশলে প্রচণ্ড উন্নত এক দেশ, তারা যা খুশি তা-ই বানাতে পারে, পারমাণবিক শক্তির পরকাষ্ঠা ঘটিয়েছে, সর্বরোগহর বিশল্যকরণী এক কম্পিউটার আছে যাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই করানো যায়। এ হেন এক দেশে হঠাৎ একটা বিশ্রী, উদ্ভট, উৎকট, কিম্ভূত-কিমাকার মূর্তি উড়ে এসে জুড়ে বসলো, কিছুতেই আর নড়ে না, কিছু কথাই বলে না, কী তার মৎলব কী তার ফন্দি এই বিদঘুদেটার কাছ থেকে জাঁহাবাজ সব গুপ্তচর লেলিয়েও জানা যায় না—তারা পারমাণবিক বোমা মারলো, ঝোপঝাপ্পটকল পাঠালো, আতঙ্কক্রোম লেলিয়ে দিলো, সর্বগুণসম্পন্ন একটি অতিঅধিযন্ত্রকে কারদানি দেখাতে পাঠানো হ'লো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না—বিশ্রীটা, বিদঘুটেটা ব'সেই থাকে যেমনকে তেমন, চক্ষুশূল, ল্যাণ্ড-স্কেপটাকেই কেমন নচ্ছার বাজে বানিয়ে দিয়েছে সে। এ হেন সময় মহাকারিগর মহাবিজ্ঞানী ট্রুর্ল (হ্যাঁ, গল্পটা 'পৃথিবী কী ক'রে বাঁচলো', কলকাতা ১৯৭৯ বইয়েরই) হঠাৎ সেখানে এসে হাজির। সব শুনে-টুনে মুশকিল আসান ট্রুর্ল বললে, না, না, পারমাণবিক শক্তি, প্রোটোন, ফোটোন, পাই-মিউ-মিউট্রিনো কিছুই দরকার নেই—এ-সবে যদি কাজ না হ'য়ে থাকে তবে প্রাচীন, মহাফেজখানাপ্রসূত, আইনগত অর্থাৎ ধর্ষকামী কোনো যন্ত্র চাই—চাই একটি আপিশযন্ত্র অর্থাৎ আমলাযন্ত্র। ট্রুর্ল বললে :

"'শুধু চাই কালি-কলম, ইস্টাম্বর কাগজ আর সীল-মোহর, গালা, আলপিন, চোষকাগজ, গরাদলাগানো জানলা, দস্তার চামচে, একটা পিরিচ—কফি তো আগেই পেয়ে গেছি —আর একজন ডাকপিয়ন। কলমটা জরুরি—সেটা পাওয়া যাবে তো?'

"'সব জোগাড় ক'রে আনছি!' আর তারা, শশব্যস্ত, কাজে লেগে যায়।

"ট্রুর্ল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে, আর মুখে-মুখে ব'লে যায় কী লিখতে হবে: 'এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে [প্রসঙ্গ : প্রজাস্বত্বভোগী কর্তৃক বিঘ্ন ও উপদ্রব সৃষ্টি] না প্রচিপ পরিষদের সংহিতা অনুযায়ী রাজস্ববিধি গ. ১১৭ (উপধারা ঙ) ড্যাশ ২ ড্যাশ ককপ ৪-এর অনুচ্ছেদে ১৯৯ টীকার স্পষ্ট লঙ্ঘন করা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা দায়রায় সোপর্দযোগ্য এক গুরুতর অপরাধের সৃষ্টি হইয়াছে।'...

"ট্রুর্ল শীলমোহর ক'রে টিকিট লাগিয়ে নম্বর বসিয়ে খতিয়ান লিখে সাধারণ নিবন্ধভুক্ত ক'রে বললে, 'এবার পিয়ন গিয়ে এটা বিলি ক'রে আসুক।'

"ডাকহরকরা বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে,...[এবং] অবশেষে ফিরে আসে।

"'বিলি করেছো?' ট্রুর্ল জিগেশ করে।

"'করেছি।'

"'রশিদ কই?'

"'এই-যে, ঠিক জায়গাতেই সই করা। আর এই যে পুনর্বিচারের প্রার্থনা।'

"ট্রুর্ল পুনর্বিচারের প্রার্থনাটা নিয়ে, না-প'ড়েই, হুকুম করে সেটা প্রেরকের কাছে ফেরৎ পাঠাতে, আর প্রার্থনাপত্রের কোনাকুনি লিখে দেয়: 'যথাবিধি নিদর্শপত্রে আঙ্কিত নহে—অগ্রহণীয়।' আর পড়া যায় না এমনভাবে তলায় সে নিজের নাম সই করে।

"'আর এবার', সে বলে, 'তাহ'লে কাজে লেগে পড়া যাক।'

"সে ব'সে-ব'সে শুধু লেখে আর লেখে, আর অন্যরা যারা কৌতূহলী শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে ছাখে আর কিছুই বুঝতে পারে না কী হচ্ছে, জিগেশ করে ব্যাপার কী, এতে কী হবে।

"সরকারি আপিশের কাজ', ট্রুর্ল বলে উত্তরে। 'আর একবার যখন কাজটা শুরু হ'য়ে গেছে, তখন ফল ভালোই হবে।'

"ভূতের মতো খাটলো ডাকপিয়ন, সারাদিন চিঠি নিয়ে গেলো চিঠি নিয়ে এলো; ট্রুর্ল লেখ্যপ্রমাণকের কাজ করলো, নির্দেশপত্র পাঠালো, টাইপরাইটার চললো খটাখট, একটু-একটু ক'রে ক্রমে দানা বেঁধে উঠলো আস্ত একটা আপিশ;

প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ—জয়ন্তকুমার রায় ও মুনতাসীর মামুন। প্যাপিরাস, কলকাতা ৭০০ ০০৪। ১৯৮৭। পৃষ্ঠা ২৯৯। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

রবারস্ট্যাম্প আর রবারব্যাণ্ড, কাগজ-আঁটা ক্লিপ, আলপিন, আর নথি, উথা, সেরেস্তা, পত্রকোষ, তাড়া-তাড়া কাগজ, টুকিটাকি মন্তব্য, চামচে, 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা বিজ্ঞপ্তি, দোয়াত-কলম, ফাইলের মধ্যে নথি, কলম চলছে সবসময়, টাইপরাইটার খটাখট ক'রে যাচ্ছে, যেখানেই তাকানো যায় দেখা যায় কফির দাগ, বাজে কাগজ, আঠা মোছার ন্যাকড়া। ···টুর্ল ব্যবহার ক'রে যাচ্ছে রেজিস্টারি চিঠি, প্রাপক কর্তৃক পূর্ণ মূল্য দেয়, বিশেষ এক্সপ্রেস চিঠি, [স্পীড পোস্ট], প্রাপ্তিস্বীকার সংবলিত, আর সবচেয়ে যেটা মোক্ষম 'আইন-স্বীকৃত বকেয়া প্রাপ্য অবিলম্বে পরিশোধনীয়।' পাওনা আদায়ের জন্য কত যে চিঠি লেখে টুর্ল তার ইয়ত্তা নেই, লেখে চালান, রশিদ, বিজ্ঞপ্তি, আসেধাজ্ঞা, ক্রোকপত্র, তাছাড়া এর মধ্যেই চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ কষার বিশেষ খতিয়ান খোলা হ'য়ে গেছে, যদিও এখনও তাতে কোনো অঙ্ক বসানো হয়নি, আর টুর্লের মতে এটা নিতান্তই সাময়িক—হয়তো কখনো এর দরকার হবে না।···টুর্লকে [তারা] জিগেশ করে : এবার কী হবে ?

"তাতে টুর্লের কড়া উত্তর : 'আপিশের চৌহদ্দির মধ্যে গালগল্প চলবে না।' সে পিন দিয়ে কাগজ গাঁথে, শীলমোহর করে, দলিলদস্তাবেজ খুঁটিয়ে ছাখে, অনুজ্ঞাপত্র বাতিল ক'রে দেয়, র-এর তলায় ফুটকি বসায়, গলার টাই ঢিলে করে, চেঁচিয়ে জিগেশ করে এর পরে কে, দুঃখিত, আপিশ বন্ধ হ'য়ে গেছে, আবার এক ঘণ্টা পরে আসুন, কফি ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, দুধ দই হ'য়ে যায়, ছাত থেকে মেঝে অব্দি মাকড়শার জাল আর ঝুল, সেক্রেটারির দেরাজের খোপে একজোড়া পুরোনো ছেঁড়া মোজা আবিষ্কার হয়, কোষপত্র রাখার জন্য চারটে নতুন আলমারি চাই এখানে, নানারকম সমস্যার স্তূপ, আর সেই স্তূপগুলো নিয়ে আবার একদফা সমস্যা, ক্রোকপত্রের আজ্ঞালেখ, সাতদফা মোহরবসানো পুনর্বিচারের প্রার্থনা, অসবর্ণ মিশ্রণের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ।

"আর টাইপরাইটার খটাখট করে।···"

এবং যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিলো, সে এতেই ঘায়েল—যে-মুহূর্তে সে সই ক'রে প্রথম নোটিসটা নিয়েছে, পুরো ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছে, সেই মুহূর্তেই তার হ'য়ে গেছে।

২

স্তানিসোয়াভ লেম-এর এই আখ্যায়িকাকে কেউ-কেউ নিশ্চয়ই বলতে প্রলুব্ধ হবেন "দুঃস্বপ্নের প্রহসন"—কিন্তু যতই হাস্যোদ্রেককারী হোক না কেন, দুঃস্বপ্নটিকে এড়িয়ে যাবার নিশ্চয়ই কোনো উপায় নেই। দেশ যত শ্রেণীবিভক্ত, অর্থাৎ ধনীনির্ধনে যতটা ভেদ থাকবে ; দেশ যত অশিক্ষিত (নিরক্ষরই বলা ভালো হবে) এবং আমলারা যত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওস্তাদ হবে ; দেশ যত প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়বে আর আমলাদের ওপর থাকবে ত্রাণের ভার ; রাজনৈতিক নেতারা যতটা না আদর্শ তার চেয়েও বেশি মুরুব্বির গায়ের জোরে মাতুলকুলের প্রতাপে গদিতে বসবে, ততই আমলাভাগ্যেদের পোয়াবারোর একটা স্পেস (একটা জমি বা অবকাশ) তৈরি হ'য়ে যাবে—এসব কথা এতই পুরোনো কাশুন্দি যে ঘাঁটতে গেলেও গন্ধ ছড়ায়, সাত কাহন ক'রে বলার অপেক্ষাই রাখে না।

কেউ যদি বলেন, কোনো দেশের হালহকীকৎ দেখেই আন্দাজ করা যায় তার আমলারা কী-রকম লোক, তাহ'লে তার মধ্যে কতটা অসত্যের চোলাই দেয়া আছে, বলা মুশকিল। তবে কথাটাকে ঘুরিয়ে অন্যভাবেও সাজানো যায় : দেশের লোক যে-রকম, তার আমলারাও সে-রকমই হবে, কেননা তারা তো তার দেশকালসমাজের নাগালের বাইরে অবস্থিত কোনো কল্পিত আকাশ থেকে, কোনো আলাদা জগৎ থেকে, টুপ ক'রে ভুঁয়ে খ'সে পড়েনি—বিশেষত কোনো স্বাধীন দেশে। ঔপনিবেশিক সমাজে না-হয় একটা কৈফিয়ৎ খাড়া ক'রে বলা যেতো যে এই আমলারা গ্রেট ব্রিটেন বা এস্পানিয়া বা পোর্তুগাল থেকে এসে উদিত হয়েছেন।

তার ওপর গণতান্ত্রিক কোনো সরকারের আমলা, সামরিক শাসনের আমলে আমলা, জরুরি অবস্থার সময়কার আমলা (এবং যে-দেশে ঘন-ঘন সরকার পালটায়, নির্বাচন মারফৎ বা বন্দুক মারফৎ, এবং অবিরাম যে-দেশ নাকানি-চোবানি খেতে-খেতে নির্বাচিত সরকার, সামরিক শাসন, জরুরি অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়—এবং নির্বাচন হ'লেও সে-নির্বাচনও কতটা কারচুপি বা রিগিং নির্ভর বা কতটা অকলুষ সে নিয়ে প্রশ্ন থাকে, তখন নিশ্চয়ই খোলনলচে পালটে, দু-একজন নয়, সব পুরোনো আমলাকে বরখাস্ত ক'রে নতুন আমলার অবতারণা করা হয় না)—আমলারা কিন্তু মোটা-মুটি একই থাকে—এবং তখন আমরা তাঁদের কাজকারবার দেখে, একই অঙ্গে এত রূপ অবলোকন ক'রে, মুগ্ধ বা সম্মোহিত হ'য়ে যেতে পারি : "বহুরূপে সম্মুখে তোমার /

ছাড়ি কোথা খুঁজিছ আমলাকে ?'—এ-রকম কোনো কথাও কোনো প্রসিদ্ধ উক্তিকে একটু উকো দিয়ে ঘ'ষে কেউ ব্যবহার করতে পারেন।

'রাজকোষ হ'তে চুরি ? ধ'রে আন চোর'—বলবামাত্র এমনকী রাজতন্ত্রেও কোটালের সে কী উদ্দাম নৃত্য ! কাজীর বিচার কতটা আজগুবি, আমলা বা পারিষদরা কতটা বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য—সেটা জানবার জন্যে মাঝে-মাঝে বোগদাদের খলিফা হারুন-আল-রশিদ ছদ্মবেশে বেরুতেন, শোনা যায়—এবং মাঝে-মাঝে আবু হোসেনদের ফাটা কপালে যারপর নাই সৌভাগ্য এসে বর্তাতো—কিন্তু খলিফা স্বয়ং চেষ্টা ক'রেও কতটা সত্য খবর পেতেন, সন্দেহ। আর খবর-টবর না-নিয়েই, সরেজমিন তদন্ত না-ক'রেই, বলবামাত্র ভুল লোককে গ্রেফতার ক'রে শূলে চড়ানো—কেউ-কেউ বলবেন—এমনতর ব্যাপার এই কাজীর বিচারের যুগেই সম্ভব হ'তো, এখন আর হয় না। সত্যি হয় না ? এটা কি কেউ হলফ ক'রে কবুল করতে পারবেন যে যমজ না-হ'লে রামের জায়গায় শ্যাম এখন আর সাজা পায় না।

কতগুলো খটকা থেকেই যায়। মায়ের পেট থেকেই কি কেউ আমলা হ'য়ে জন্মায়—না কি বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে, এটা ওটা সেটা শিখিয়ে, তাকে তৈরি ক'রে নিতে হয় ? আমলারাই কি সত্যিকার দ্বিজ—তাহ'লে ? একবার ধরাধামে অবতীর্ণ হয় মনুষ্যরূপে, তারপর দীক্ষিত হবার পর তাদের দ্বিতীয় বা নবজন্ম ঘটে। তাদের কি আমরা বলবো নয়া ব্রাহ্মণ—কিংবা নব্য মৌলবী ? সেটা স্থির ক'রে নিতে পারলেই বোঝা যাবে কোথাকার জল কোথায় গড়াবে, কে দৌড়ুবেন কোন্ চার্চ, মন্দির, মসজিদ লক্ষ্য ক'রে।

৩

এক সময়ে, সবাই জানেন, বাংলা সাহিত্যে আমলাদের দারুণ দাপট ছিলো—সে বিলেতফেরতা আই. সি. এস. থেকে শুরু ক'রে কাগজে সরকারি বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিতে পারে এমন খুদে গোছের আমলারও। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে কিনা, সেটা পাঠকরাই ভালো বলতে পারবেন। অবসর নেবার পর তাঁরা যদি স্মৃতিচারণ করতেন—অর্ধেক কল্পনা অর্ধেক সত্য মিশিয়ে হ'লেও—তাতে এমন-কিছু বলার থাকতো না। কিন্তু এও তো জানা যে কী ক'রে আমলার বউ বা বান্ধবী সাহিত্য পুরস্কার পায় ; কিংবা কোনো রিটায়ার্ড আমলা যদি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বহুল প্রচারিত রসিকতা 'বিশ্ব বা রথী'-কে তর্জমা করে 'The World or the Charioteer' তবে আপনি লিখলে সেটা ছাপা না-হ'লেও তিনি লিখলে ছাপা হবেই। সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে আমলাদের আখ্যায়িকা রচনায়—স্মৃতিকথায়—কল্পনার মিশোল অনেকটাই দেখে 'প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ' গ্রন্থের লেখকদ্বয় আমলাদের দিয়ে লেখেন নি, বরং তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন—এবং তাঁদের যে-সব আখ্যায়িকা (ন্যারেটিভ, বইতে বলা হয়েছে নক্‌শা) মনে হয়েছে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাস করা যায়, সেগুলোকেই ব্যবহার করেছেন—এ-রকম আখ্যায়িকার সংখ্যা বইতে সাকুল্যে ২৫৩টি। অবশ্য বলা হয় নি কতটা, বা কী-কী, অন্য সূত্রে যাচাই ক'রে দেখা গেছে এরা কী-রকম ধোয়া তুলসী। তবে 'অন্দরমহল', অর্থাৎ ভেতরকার খবর—ফলে সবশুদ্ধ যে চল্লিশজন আমলার কাছ থেকে এই ২৫৩টি আখ্যায়িকা পাওয়া গেছে, কোথাও বলা হয় নি বহির্মহলে অর্থাৎ বাইরে কত কোটি সাধারণ লোকের জীবন নিয়ে তাঁরা ছিনিমিনি খেলেছেন—কেননা বাইরের কারু কাছ থেকে কোনো সাক্ষাৎকার নিয়ে আখ্যায়িকা সংকলন করা হয়নি। কিংবা আর্কাঈভ ঘেঁটে কতটা সাক্ষী, কী-রকম সাবুদ জোগাড় হয়েছে, তাও বলা হয়নি। এই আখ্যায়িকাগুলো প'ড়ে বরং এই ধারণাই হয় যে বেশির ভাগ আমলাই নানারকম দুর্দশা দুরবস্থা দুর্যোগের মধ্যেও যথাবিধি কর্তব্য সম্পাদন ক'রে চলেছেন—এমন নয় যে তাঁদের কেউ-কেউ খেয়ালখুশি মাফিক নিজের আখের (বা চাকরি) গোছাবার চেষ্টা করেন না—তবে দায়িত্ববান, কর্তব্যপরায়ণ, 'জনদরদী' আমলার সংখ্যাই বোধহয় বেশি। যদিও ভূমিকায় অর্থাৎ (সন্দর্ভে, ডিসকোর্সে) বলা হয়েছে 'গত চল্লিশ বছরে (১৯৪৭ থেকে ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত) পূর্বপাকিস্তান / বাংলাদেশে আমলা···আধিপত্যের দরুণ কী সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তাই মোটামুটি তুলে ধরা হয়েছে'। রচনার ভিত্তি হিশেবে প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিকে উপাদান ছাড়াও (সেগুলো অন্যান্য মুদ্রিত পুঁথিপত্র) যে চল্লিশজন উচ্চপদস্থ আমলার সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা বইয়ের "প্রাক্-ভাষে" গ্রন্থকারদ্বয় জয়ন্তকুমার রায় ও মুনতাসীর মামুন আমাদের জানিয়েছেন। যদিও এই চল্লিশ বছরে পূর্ব-পাকিস্তান / বাংলাদেশ বেশ কয়েকবার সামরিক শাসনের

অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো বা জরুরি অবস্থার শিকার হয়েছিলো (যেখানে সামরিক আমলারাই ছিলো প্রশাসনের কর্ণধার), এ-বইটির লেখকরা জানিয়েছেন 'মূলত বেসামরিক আমলাদের প্রদত্ত 'নক্‌শা'র ভিত্তিতে রচিত'। যে-চল্লিশজন আমলার তাঁরা সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাঁরা সবশুদ্ধ ২৫৩টি নক্‌শা বা ন্যারেটিভ শুনিয়েছেন—এ-কথাটা আগেই বলা হয়েছে। সেই ন্যারেটিভগুলোকে কোন্ সন্দর্ভ বা কোন্ ডিসকোর্সের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা জরুরি সেটা লেখকরা চেষ্টা করেছেন বইয়ের প্রথম অধ্যায় "ভূমিকা"য় বিশদ ক'রে তুলে ধরতে। যে-চল্লিশজন আমলার ন্যারেটিভ শোনা যাচ্ছে তাদের মধ্যে আছেন প্রাক্তন সি. এস. পি (সিভিল সার্ভিস অভ পাকিস্তান), পি. এস. পি. (পুলিশ সার্ভিস অভ পাকিস্তান) এবং 'আরো কয়েকটি ক্যাডারের সিভিল সার্ভেন্ট বা আমলা যাঁরা ১৯৫০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন/আছেন'। এই ন্যারেটিভগুলো কতটাই বা বানানো, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, প্ররোচনামূলক, কতটাই বা আস্থা ও বিশ্বাসের যোগ্য সে-সম্বন্ধে "ভূমিকায়" লেখকরা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন—এবং তাঁদের কাছে মনে হয়েছে এগুলো 'সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ'। কিন্তু কাউকে-কাউকে যে আমলা থেকে রাজনৈতিক নেতা কিংবা এমনকী মন্ত্রী হ'য়ে উঠতে দেখা গেছে (অর্থাৎ ছিলো আমলা, হ'য়ে গেলো মন্ত্রী)—এটাও লেখকদ্বয় একাধিক ক্ষেত্রে ইঙ্গিত করেছেন বা স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। আমলাদের বলা হয়েছে 'এলিট'—তবে আমলা হবার আগে তাঁদের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী, পৃষ্ঠপোষকতা লাভ বা নেপোটিসমের বিভিন্ন ধরণ ইত্যাদি কোথাও স্পষ্ট ক'রে তথ্যপ্রমাণসমেত উপস্থিত করা হয় নি—ধ'রেই নেওয়া হয়েছে এই পটভূমি পাঠকদের মোটেই অজানা থাকবে না। এ-প্রসঙ্গে একটি পুরোনো অজ্ঞাতনামা লেখকের "নকশা" কৌতুককর অবকাশ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে। নাতি ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে এসেছিলো বুড়ি দিদিমাকে প্রণাম করতে; বড়ো চাকরি পেয়েছে শুনে নাকি দিদিমা বলেছিলেন, 'ভালোই তো হ'লো, তবে দারোগা হ'তে পারলি না, দাদু।' অনেক সময় প্রাত্যহিক জীবনে খুদে-খুদে ধানীলঙ্কা চোখে-মুখে-জিভে বড্ড বেশি পানি এনে দেয়, সারাক্ষণ লালা ঝরাতে হয়, ঈশ-উশ বলতে হয়। দিদিমা তাদেরই জানতেন। তা থেকে অনুমান হয় এই ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন প্রথম প্রজন্মের আমলা।

আমলাদের স্মৃতিকথার নানাবিধ অসম্পূর্ণতার কথা মনে রেখে এবং সেই অসম্পূর্ণতা দূর করবার জন্যে, মানহানির মামলায় ফেঁসে যাবার ভয় এড়াবার জন্যে, এখানে তাদের নামহীন রূপে ক খ গ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ছাপার হরফে আমলারা নিজেরা যদি তাদের নানাবিধ বিচিত্র কীর্তিকলাপ ও কৃৎকৌশলের চিহ্ন ও লক্ষণ রেখে যেতে পারে, তবে যে-ন্যারেটিভে তারা নামহীন উপস্থিত, তা থেকে ঐ সব চিহ্ন ও লক্ষণ বেমালুম উঠে যেতে পারে ব'লে যে-যুক্তি দাঁড় করানো হয়েছে সেটা পুরোপুরি মেনে নেয়া মুশকিল। তবে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অমলাদের অপ্রতিহত প্রতাপ, রাজকীয় ঐশ্বর্য, দেশী-বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা সামরিক শক্তির সহযোগে যে-সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, উনভাষণ এবং ন্যূনতম টীকা সমেত এ-বই তার একটা হদিশ দেবে। জয়ন্তকুমার রায় এর আগে তাই ও ইন্দোনেশীয় রাজনীতি, বাংলাদেশী সমাজ ও গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে বই লিখেছেন, এর আগে ১৯৮৬তে প্রায় অনুরূপ বিষয়েই তাঁর আরো-একটি বই বেরিয়েছিলো 'অ্যাড-মিনিসট্রেটর্স ইন এ মিক্সড পলিটি'। মুনতাসীর মামুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, তিনি অন্তত ৪০টি বই লিখেছেন আগে, যার মধ্যে কোনোটির বিষয় ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ, সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের ইতিহাস, ঊনবিংশ শতাব্দীর নাট্যচর্চা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি। সুতরাং দুজন সমাজবিজ্ঞানীর পরিশ্রমের ফসল এ-বই যাঁরাই জাতীয়-জীবনে আমলাদের হামলা অথবা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কৌতূহলী তাঁদের শুধু যে কাজে লাগবে তা নয়—এর বিস্তৃত সূত্রনির্দেশ, পূর্ববর্তী মুদ্রিত গ্রন্থ বা রচনার পঞ্জি বিশদ পঠনপাঠনের কাজেও সাহায্য করবে।

৪

'আমলাচরিত যেন দ্রৌপদীর হাঁড়ি
ফুরায় না যত কেন ওলটাও তারে—
উপুড় করিবামাত্র পড়ে কাঁড়ি-কাঁড়ি
বিবিধ আশ্চর্য দ্রব্য : প্রভূত, বাহারে।'

দুঃস্বপ্নের প্রহসন একটা মোক্ষম লিখেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী—"কালান্তক লাল ফিতা"—শিবরামের অন্য অনেক চমকপ্রদ গল্পের সঙ্গে তাকেও বারে-বারে পড়া যায়। নথি, সেরেস্তা, ফাইল, কাগজ, চিঠি, নির্দেশ পাপোশের তলায়

রিপোর্ট, উই আর ইডুরের ব্যবহার্য খাতাপত্র, গল্পের গোরু মহাফেজখানায় ঢুকে প'ড়ে কাগজপত্তর খেয়ে ফেলেছে, একে চিঠি তাকে চিঠি, সুপারিশ, ধরাধরি, মুরুব্বির জোর, মামারও আবার মামা আছে, গ্র্যাণ্ড মামা, এমনকী হয়তো জুতোর ব্যবসাও আছে কারু—হাঁটতে-হাঁটতে ক-বার ক-জোড়া জুতো ছিঁড়বে কে জানে। 'উনসত্তর মামা-আমলার অনেকজন ভাগ্নে / পরস্পরকে বলে তারা তুইও একটু ভাগ্ নে।'

পোলাণ্ডের সোয়াভোমির স্রোজেক 'হাতি' বইতে আমলা বিষয়ে মোক্ষম কিছু ন্যারেটিভ শুনিয়েছেন, সুবীর রায়চৌধুরী যার কয়েকটি বাংলা ক'রে শুনিয়েছিলেন 'হরবোলা ১'-এ (কলকাতা, ১৯৭৮)। কিন্তু প্রহসন থেকে দুঃস্বপ্নেই আবার ফিরে-আসি যখন মনে প'ড়ে যায় ফ্রান্ৎস কাফকার 'দুর্গ', যেখানে হাসি মাছির কাঁটার মতো গলনালীতে আটকে গিয়ে খাবি খাওয়ায়। কাজীর খাম-খেয়ালখুশিকে সামলাবার জন্যে দরকার হয়েছিলো মোল্লা নাসিরুদ্দিনের, টিল অয়থেনস্পিগেলের, কিংবা আকবর বাদশার সভার বীরবলের। 'প্রশাসনের অন্দরমহলে'—তা সে বাংলাদেশেই হোক বা ভারতেই হোক—হাতে পায়ে ধ'রে মোল্লা নাসিরুদ্দিনকে ঢুকিয়ে দেয়া যায় না? গবেষকরা একটু ভেবে দেখতে পারেন।

নতুন পথে নতুন মানুষ

সনাতন মিত্র

যদি বুঝে থাকি মানুষ স্বভাবত র‍্যাশনাল, অর্থাৎ বুদ্ধিবোধ-সম্পন্ন এবং যুক্তিবোধপরিচালিত, তাহলে মানবসমাজ নিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের স্বপ্ন অবাস্তব কিংবা অলীক মনে করবার কোনো কারণ থাকে না। মঙ্গলচেতনা যদি মানুষের সহজাত হয়, একবার সেই চেতনাকে জাগাতে পারলে, যাকে রায় বলেছেন এক বন্ধনমুক্ত নতুন পৃথিবী, a new world of freedom, আকাশকুসুম হয়েই কেন থাকবে?

মানবতাবাদী পথ—মানবেন্দ্রনাথ রায়। সম্পাদক : মনোজ দত্ত। রেনেশাঁস পাবলিশার্স, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। পঁচিশ টাকা।

কিন্তু ওই "যদি"টা মস্ত বড়ো "যদি", ওরই ওপর রায় স্থাপন করেছেন তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা; ওতেই নিহিত আছে মৌল-মানবতাবাদের সম্পূর্ণ মৌলিক প্রশ্নটি। প্রথম প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর পাওয়া যায় আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকেই। যুক্তির অতীত অলৌকিকে মানুষ যে বিশ্বাস করে না তা নয়, কিন্তু তার জীবনযাত্রা যে পথ দিয়ে চলে, সেটা প্রধানত ন্যায়শাস্ত্র-অনুমোদিত। সিগারেট-সেবীর মশারির চাল থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলে আমরা জলের বালতির দিকেই হাত বাড়িয়ে থাকি। পরীক্ষা দিতে যাবার সময় অনেক ছেলেমেয়ে প্রসাদী ফুল সঙ্গে নেয় বটে, কিন্তু তারাও জানে, এবং তাদের বাবা-মাও জানেন যে, পড়াশোনা না করলে পাশের আশা সুদূরপরাহত। ভলতেয়ার বলেছিলেন, মন্ত্রতন্ত্রেও ভেড়া মরে, তবে তার সঙ্গে একটু আরসেনিক থাকলে কাজের সুবিধা হয়। একান্তভাবে মন্ত্রতন্ত্রেই বিশ্বাস করে, বলা বাহুল্য, আরসেনিকের জন্য কখনও পয়সা খরচ করে না, এমন লোক কেউ কোথাও দেখেছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু তাই বলে কি এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মানুষ যুক্তিবোধের দ্বারাই পরিচালিত—একান্তভাবে না হলেও বহুলাংশে? যাঁরা নিজেরা মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না, আরসেনিকের অপরিহার্যতায় বিশ্বাস করেন, তাঁরাও অনেকে মানুষকে স্বভাবত র‍্যাশনাল বলে মানতে রাজি নন। জনাথান সুইফট আলেকজানডার পোপকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, 'I have got materials towards a treatise, proving the falsity of that definition "animal rational" and to show that it would be only "rationis capax". অর্থাৎ মানুষের সংজ্ঞা "ratlonal animal" ঠিক নয়, হওয়া উচিত 'an animal capable of choosing reason'.

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, যে অর্থে মানুষকে talking animal কিংবা social animal বলা যায়, সেই অর্থে rational animal বলা যায় না। তা যদি বলা যেত, তা হলে মানুষের ইতিহাস অন্যরকম হত।

মানুষের সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বলতে গেলে দু রকমের ধারণা আমরা দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ, লেখক ইত্যাদির মধ্যে দেখতে পাই। একটা ধারণা সীমাবদ্ধতার, আরেকটা সীমাহীনতার। প্রথম ধারণাটা যাঁরা পোষণ করেন, তাঁরা বলেন মানুষের নৈতিক স্বভাবে, তার বুদ্ধিবৃত্তিতে এমন সব দোষত্রুটি বর্তমান, যার কোনো মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

অতএব মনুষ্যসমাজকে যদি টিকে থাকতে হয়, সেইসব দোষ-দুর্বলতাসংবলিত মানুষ তার উপযুক্ত যেসব সামাজিক ব্যবস্থা, প্রণালী ইত্যাদি ধীরে ধীরে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে তুলেছে, যেমন পণ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা, চিরাচরিত শ্রেয়োবোধ, পারিবারিক বন্ধন, কালের পরীক্ষায় যেসব ব্যবস্থা উত্তীর্ণ হয়েছে, তার ওপরেই নির্ভর করতে হবে। সেসবের মূলোৎপাটন করে আনকোরা নতুন রীতিনীতির প্রবর্তন করতে গেলে, মানুষেরা স্বভাবতই তাকে অস্বীকার করবে।

এই হল একটা মত। এর বিপরীত ধারণাটি যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের মতে মানুষ স্বভাবত দোষত্রুটিদুর্বলতা ইত্যাদির বশ নয়, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, অন্ধপ্রবৃত্তি, হিংসাদ্বেষ, লোলুপতা, আধিপত্যস্পৃহা ইত্যাদি যা-কিছু মানুষকে কলঙ্কিত করেছে, সেসব ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থার ফল। অতএব এমন সমাজ গঠন করতে হবে যা মানুষকে উচ্চতর চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

রায় তাঁর সমাজদর্শন স্থাপন করেছেন এই বিশ্বাসের ওপর যে যুক্তিবোধের মূল নিহিত আছে মানুষের স্বভাবে। এই বিশ্বাসের সমর্থন তিনি খুঁজে পেয়েছেন একেবারে মানুষের জৈবিক সত্তার মধ্যে। মৌল-গণতন্ত্রের যে বাইশটি মৌলিক-সূত্র আলোচ্য গ্রন্থটির পরিশিষ্ট ক-তে সন্নিবেশিত হয়েছে, তার চার নম্বর সূত্রটিতে তিনি বলেছেন, 'প্রাকৃতিক জগৎ নিয়মের রাজত্ব, আর এই অমোঘ নিয়মনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির অংশরূপে মানুষ মূলত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী, যুক্তিবোধ জৈবিক ধর্মেরই অন্তর্গত এবং সেই কারণেই যুক্তিবোধ ও ইচ্ছাশক্তি বিপরীতধর্মী নয়।'

এইখানেই যুক্তিতে একটা ফাঁক চোখে পড়ে। প্রকৃতি অমোঘ নিয়মে চালিত এবং আইনস্টাইন যেমন বলেছেন—প্রকৃতি পাশা খেলে না, এ কথা মেনে নিলেও, যুক্তিবিরোধী কিছু প্রকৃতিতে নেই, তা স্বীকার করলেও, মানুষের স্বভাবে সেরকম নিয়ম-অনুবর্তিতা অনিবার্য নয়, তা আমরা জানি। একবারও যদি কোনো মানুষ কখনও সেই যুক্তিনিয়ন্ত্রিত নিয়মের রাজত্ব থেকে বেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে আর প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘত্ব মানুষের বেলায় খাটে বলে ধরে নেওয়া যায় না। শৃঙ্খল সেখানেই ভেঙে পড়ে। No chain is stronger than its weakest link।

কাজেই মানুষের এতদূর বিবর্তনের পরে আর সেই জৈবধর্মের মূলে তার যুক্তিবোধের ভিত্তি না খোঁজাই বোধহয় ভালো। তাতে যদি যুক্তিবোধ মানুষের পক্ষে কতদূর স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সংশয় কিংবা বিতর্ক কিছু থেকে যায়, তার নিরসন অসাধ্য মনে করবার কোনো কারণ নেই।

আর যদি যুক্তিবোধ মানুষের জীবধর্মের অন্তর্গতই হয়, তাতেও বন্ধনমুক্ত মানুষের নতুন সমাজের গঠনে তা খুব কাজে লাগবে বলে মনে করা কঠিন। বরং সুইফট যে বলেছেন, মানুষের পক্ষে অযুক্তি পরিহার করে যুক্তির পথ অন্বেষণ করা সম্ভব, এই সম্ভাবনাই ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, এ বিশ্বাস রাখা যায়।

দর্শন থেকে, ইতিহাস থেকে, সমাজতত্ত্ব থেকে রায় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত খুঁজে ফিরেছেন। সে ভবিষ্যৎ পূর্ব-নির্ধারিত অমোঘ ভবিতব্য নয়। রায় মনে করেন না—ইতিহাস মানুষের ভাগ্য আগে থেকে নির্ধারিত করে রেখে দিয়েছে। এইখানে মার্কস্‌বাদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক মতভেদ। "পুরানো দর্শনের ব্যর্থতা" শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, 'মার্কসীয় তত্ত্বও পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্যে আস্থা রাখে। উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন শক্তিগুলির কার্যকরণে ইতিহাসের সৃষ্টি হয়: এ বিষয়ে মানুষের হাতে যেন কিছুই করবার নেই। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মকে মেনে নিতে হবে, মেনে নিতে পারলেই মানুষের মুক্তি। অর্থাৎ তোমার যখন নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মাবে যে তোমার কোনো স্বাধীনতা নেই, উৎপাদনের কিছু রহস্যময় শক্তির কাছে তোমার হাত-পা বাঁধা, তখনই নাকি তুমি যথার্থ স্বাধীন! মার্কসীয় স্বাধীনতার অর্থ হল ব্যক্তিমানুষের দাসত্ব। স্বেচ্ছায় দাসত্ব বরণ করে যারা, তাদের সমাজ স্বাধীন সমাজ হতে পারে না। সেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব কাল্পনিক, প্রচারধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টিমাত্র!'

কিন্তু তাই বলে ইতিহাসের যে কোনো লক্ষ্য নেই, তাও নয়। 'স্বাধীনতাই সব মানবিক প্রচেষ্টার প্রকৃত লক্ষ্য'—এই কথা বলে তারপরে তিনি বলেছেন, 'এই মতানুসারে দেখা যায়, মানুষের ইতিহাস একটি শেষ লক্ষ্যের দিকে চলেছে, মানুষের ইতিহাস অর্থহীন ঘটনাবলীর অসঙ্গত পরম্পরা মাত্র নয়...' (বিংশ শতকের সমাজদর্শন-সমালোচনা ও বিকল্প)।

তিনি আরও বলেছেন, 'স্বাধীনতার অনন্ত সন্ধানই মানুষের মৌলিকতম প্রবণতা: মানবপূর্ব জৈব বিবর্তনের স্তরেও এই প্রবণতারই প্রকাশ অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামরূপে।'

কাজেই যুক্তিবোধসম্পন্ন মানুষ যে সমাজ চাইবে তার প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে—স্বাধীনতার সংরক্ষণ এবং পরিপোষণ। রাষ্ট্রের গঠন এবং কার্যধারা এমন হবে যাতে

সেইরকম সমাজ স্থাপিত হয় এবং পরিপুষ্ট হয়। এই গ্রন্থের নানা জায়গায় তিনি তেমন সমাজের এবং রাষ্ট্রের রূপরেখা এঁকেছেন ; দেখিয়েছেন—কেমন করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করে স্বাধীনতাকে দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারা যায়, পিরামিডের মতো সংগঠন গড়ে তুলে ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনকে জনসাধারণের প্রকৃত স্বাধীন চিন্তা ও মতামতের এবং কর্মধারার ওপর স্থাপিত করা যায়।

ভারতীয় সংবিধানে ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের বিপদের দিকে তিনি ১৯৪৯ সালেও অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। আজ তার ফল আমরা চারিদিকে দেখতে পাচ্ছি। সমাজবাদী দেশে, ব্যক্তিস্বাধীনতার কী দশা হয়, সে কথাও ওই ১৯৪৭ সালেই "বিংশ শতকের সমাজদর্শন-সমালোচনা ও বিকল্প"-শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছেন, আজ সমগ্র পূর্ব ইউরোপে তা নিয়ে আলোড়ন।

"New Humanism" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি প্রচলিত রাজনৈতিক দলাদলির পথ পরিত্যাগ করে এক নতুন মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন ; বলেছেন, জীবন সম্পর্কে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি করতে হবে, এবং সেইজন্যে মানুষকে নতুন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ শেখাতে হবে, যাতে তার ওপরে প্রকৃত গণতন্ত্রের নির্মাণ সম্ভব হয়।'

'It will result in the rise of new men and women engaged in the task of establishing new form of social relations and building a new pattern of political institution.'

এ হল মানুষ সম্বন্ধে সীমাহীন প্রত্যাশার কথা। মানুষ যদি স্বভাবত যুক্তিবাদী হয়, এবং অতএব নীতিজ্ঞানসম্পন্ন হয়, তাহলে এই প্রত্যাশা অলীক স্বপ্ন মাত্র কী করে বলব?

প্রসঙ্গ আত্মহত্যা

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আত্মহত্যা যে অতিশয় গর্হিত কাজ, সে বিষয়ে আপনার, আমার, এবং ড. সুভাষচন্দ্র দের পক্ষে একমত হওয়া খুব সহজ, কেননা আত্মহত্যার বিপক্ষে হাজার যুক্তি আছে, তা আমরা জানি। দুঃখের বিষয়, কার্যকালে হয়তো দেখা গেল, অত সব জোরালো যুক্তি, ধর্মপুস্তকের যত ভালো-ভালো শিক্ষা, দার্শনিকদের যত অকাট্য সিদ্ধান্ত, সবই ধোঁয়া হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। তখন মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে কে বাঁচাবে? মৃত্যুই তো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, জীবনের হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও
সলিল-মাঝে।

আত্মহত্যার নিন্দা অ্যারিসটটলও করেছেন খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। তিনি বলেছেন, এ ভাবে দুঃখকষ্টের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা কাপুরুষতা। এদিকে মতেঁন আবার বলেছেন, "কান্নাকাটি করে কী হবে, সংসার তো তোমাকে বেঁধে রাখে নি। তোমার নিজের ভীরুতাই তোমার দুঃখযন্ত্রণার জন্যে দায়ী।' তার মানে, সাহস থাকে, তো আত্মহত্যা কর না কেন?

অবশ্য, অ্যারিসটটলও স্বীকার করেছেন, আত্মহত্যা করতে গেলে মৃত্যুভয়টা অন্তত জয় করতে হয়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও তিনি বলেছেন, এর পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকে না, থাকে পালাবার মতলব।

সুভাষচন্দ্র দেও তাদেরই নিন্দা করেছেন যারা 'ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখযন্ত্রণা এবং মানসিক চাপ বা আঘাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে' আত্মহত্যা করে। তাঁর মতে এ হল 'নীচ স্বার্থপরতা'। আর যাঁরা মহৎ উদ্দেশ্য কিছু সামনে রেখে, বড় আদর্শের জন্যে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

কিন্তু ধর্মীয় কারণে আত্মহত্যা লেখক সমর্থন করেন না, 'এ ধরনের আত্মহত্যাবোধ ঈশ্বরের অভিপ্রেত হতে পারে না। এ হল বিকারগ্রস্ত মনে পরিচায়ক।'

আসলে, 'ঈশ্বরের অভিপ্রায়' নিয়ে তর্ক চলে না। যখন কেউ বলে, 'আমি নিজের কানে শুনেছি', তখন শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা বৃথা। তেমনি আবার, যদি কেউ বলে, 'ভগবানকে পাই নি, এ ছার জীবন রাখব না', তখন কে তাকে বোঝাবে, শাস্ত্রে আছে আত্মহত্যা মহাপাপ? শাস্ত্র তার জন্যে নয়, আপনার আমার জন্যে।

আত্মা ও পরলোকে যদি বিশ্বাস করি এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করি, লেখকের যুক্তি মানতেই হয়, যে আত্মহত্যা করে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তির আশা সুদূরপরাহত। কে বলতে পারে, এই বই পড়ে তেমন কেউ-কেউ হয়তো আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করতেও পারেন। যদি তাই হয়, বলতেই হবে

আত্মহত্যা—ড. সুভাষচন্দ্র দে। প্রকাশক : গীতা দে, কলিকাতা-৯১। কুড়ি টাকা।

লেখকের উদ্দেশ্য সফল হল।

মুশকিল হচ্ছে, আত্মহত্যার ইচ্ছা কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কেন একজনের মধ্যে তার উদয় হয়, আরেক-জনের মধ্যে হয় না, এসব এত জটিল সমস্যা যে সে পথে এগিয়ে বেশিদূর যাওয়া অত্যন্ত কঠিন। লেখক অনেক সংখ্যাতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে থেকে এমন কোনও প্যাটার্নের হদিশ পাওয়া যায় না, যে তার ওপরে নির্ভর করে আত্মহত্যার প্রবণতার সম্পর্কে কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়।

আমেরিকাতে শ্বেতকায়রা আত্মহত্যা করে বেশি, কৃষ্ণ-কায়রা কম। কেন? বসন্তকালে বেশি, শীতকালে কম। কেন? ভারতবর্ষে ব্যাঙ্গালোর শহরে আত্মহত্যা হয় সবচেয়ে বেশি। কেন? অবশ্য ভারতবর্ষে এত আত্মহত্যা কেন হয়, বিশেষ করে স্ত্রীলোকদের মধ্যে, তার উত্তর আমরা সবাই জানি।

লেখক আত্মহত্যার সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, এমন কিছু-কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, যার সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন। যেমন, ইস্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ওপর থেকে মানসিক চাপ কমানো দরকার, একমাত্র তাহলেই তাদের মধ্যে আত্মহত্যার যে প্রবণতা আজকাল আমাদের আতঙ্কিত করছে, তার খানিকটা নিরসন হতে পারে।

যতদূর সম্ভব আত্মহত্যার ঘটনা নিবারণ করাই উচিত, তাতে কেউ দ্বিমত হবেন না, আশা করা যায়। এবং এ-কথাও সত্যি, আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে আনা অনেক সময় সম্ভব হয়। ১৯৫৩ সালে লণ্ডনে The Samaritans নামে যে প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছে, লেখক তার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কলকাতাতেও The Calcutta Samaritans নামে একটি সংস্থা ওই একই কাজ করে যাচ্ছে, তার কথা বলেন নি।

বিতর্ক

আরবি লিপি ও পারসিক লিপি প্রসঙ্গে

১

চতুরঙ্গের অগস্ট ১৯৮৮ সংখ্যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর বক্তব্যে—(১) আমার বক্তব্যকে নেহাত ব্যক্তিগত 'ধারণা' ধরে নিয়ে নিরর্থক বিবিধ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সরল সত্যকে অহেতু জটিল করে তুলেছেন। তিনি বলেছেন, (২) শামসুল নিজের অজ্ঞাতসারে যুগপৎ ব্রাহ্মণ্য এবং ইসলামি মোল্লাতন্ত্রের শোভিনিজমে আক্রান্ত। তিনি আরও বলেছেন, (৩) এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার তথ্যাদির প্রামাণিকতা কদাচ প্রশ্নাতীত নয়, এবং এই বুক অব নলেজ জাতীয় স্যুডো-পণ্ডিতির সহায়ক ও ধনীগৃহের শোভাবর্দ্ধক কেতাব সম্বল করে কোনো ধারণা গড়ে তোলা বিপজ্জনক। (৪) তিনি ভাষা, বর্ণমালা, লিপি, লিখনশৈলীর (calligraphy) সব টার্ম সম্পর্কে সচেতন নন, তাঁর জ্ঞান খোলসা করার জন্য বলছি—ইত্যাদি। (৫) জ্ঞানচর্চা থেমে নেই। নিরন্তর গবেষণার ফলে নিত্যনতুন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হচ্ছে।

উপরে উল্লিখিত মন্তব্যগুলিতে কিন্তু আবারো ব্যক্তিগত ধারণার উলটো প্রভাব পড়ে গেল। তবে তিনি শেষে বলেছেন, 'শামসুল যদি কিছু মনে না করেন—'

সত্যিই তো, মনে করার কোনো কারণ নেই, জ্ঞানচর্চা তো থেমে নেই, তাই কোনো বিষয় 'প্রমাণিত' এ কথাও বলা চলে না।

যেহেতু ইতিহাসের সরল সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে কোনো জটিলতা কিংবা ব্যক্তিগত ধারণা আরোপ করা কখনো পরিশীলিত পন্থা নয়, তাই, জনৈক শামসুল আলম সাঈদ কিংবা জনৈক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এখানে তুচ্ছ। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে নিত্যনতুন তথ্যাদি আবিষ্কার করতে হবে; অবকাশ ও অভিপ্রায় অবশ্যই থাকতে হবে।

১। 'ব্যক্তিগত ধারণা'-ও এখানে নিরর্থক, বিবিধ, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নয় কিছুতেই; কারণ একটু লক্ষ করলে অনুভব করা যায় যে, ইরানি ভাষা ও লিপি এখন গবেষকদের নিকট আর হেঁয়ালি কিছু নয়; এর আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করা হয়েছে। সিরাজ সাহেব এই (ভাষার) লিপির ও বর্ণমালার Arabicised হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। যাকে তিনি 'আধুনিক ফার্সি' বলেছেন, তাতে রয়েছে মুসলমানদের হাত।

এ প্রসঙ্গে 'স্যুডো-পণ্ডিতি খেতাব' মেনে উদ্ধৃতি দিতে হল: The Islamic conquest of Iran during the 7th century entitled not only a change of religion but also a change of language...

Iranian languages have been written in many different scripts during their long history, although various forms of Aramaic script have been predominant. Modern Persian is written in Arabic script, which is of Aramaic origin. For writing the Persian sounds p, c̄, ž and g—four letters have been added by means of diacritical marks. By the addition of further letters, this Perso-Arabic script has been adopted to write not only the other main modern Iranian languages, Pasto, Kurdish and Baluchi, but also those minor ones that are occasionally recorded. An advantage of the use of this consonantal script is that by not defining vowel qualities it is possible to include local dialact variations to a considerable extent. (E. B. Macropaedia, vol. 22, 15th Ed. Print 1987, pp. 628-630.)

আমি দুঃখিত, বক্তব্যটি অনবধানতার কারণে দ্বিতীয়বার উল্লেখ করতেই হল। তবে এই ধারণা সঙ্গত কারণে 'বিপজ্জনক' মনে হচ্ছে না ; ইতিহাসের সত্যতা এখানে স্পষ্ট।

২। ব্রাহ্মণ্য ও মোল্লা তন্ত্রের বিষয়ে আমার কোনো স্পর্শকাতরতা নেই। 'আর্য' শব্দের জন্য তিনি তা বলেছেন, কিন্তু মোল্লাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা বা তেমন কোনো শোভিনিজমে আক্রান্ত কেন, তা বুঝতে পারি নি। ফররুখ আহমদের মতো মোল্লাকে কবিতায় বিশ্লেষণ করেছি, এ যদি তিনি মনে করেন, তবে তিনি যে মূল বিশ্লেষণে প্রবেশ করেন নি, তা অনুমান করেছি।

তিনি ইরান শব্দটির উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে নিজেও তা দিয়ে একটু আক্রান্ত হয়েছেন বইকি। ইরান শব্দটির উৎস যে 'আইর', এবং তা যে নিখাদ আরবি, এ ধারণা বেমালুম কপোলকল্পিত। আমি ইরানিরা আর্য এ কথা বোঝাতে চেয়েছি। আর্য মেহের যে ইরানের অধিপতি একথা সকলেই জানে। ইরানিরাও নিজেদের শ্রেষ্ঠ আর্য বলে দাবি করে। প্রাচীন ইরানিরা আর্য শব্দটি দিয়ে জাতি বা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করত, যেমনটি করত প্রাচীন ভারতীয়রা : 'হে, আর্য! আর্যপুত্র!' ইত্যাদি। Indeed, both the Iranians and the Indo-Aryans used the same word to refer to themselves as a people : Arya (Sanskrit), Ariya (Old Persian) (*Ibid*, p. 612).

তা ছাড়া, আরবি "লোগত" বা অভিধানে ইরান শব্দের কোনো উল্লেখ নেই। যা আছে তা হচ্ছে 'বর্তমানের পারেস' ; বরঞ্চ ফার্সি অভিধানে লিখেছে যে, ফরিদুনের পুত্র 'ইরেজের' নামানুসারে দেশের নাম ইরান। এটাই বরং সঙ্গত, কারণ উভয় জাতিই তো আর্য, ভরতের নামানুসারে ভারত আর ইরেজের নামনুসারে ইরান ; আর 'আইর' শব্দ থেকে সেমেতীয় পদ্ধতিতে 'আরব' হওয়াই বরং যুক্তিযুক্ত।

৩। এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা শোভাব্যঞ্জক কেতাব হলেও তার তথ্যাদির প্রামাণিকতা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত ; 'প্রশ্নযুক্ত কোনো তথ্যে'র বিষয়ে সম্পাদকবর্গের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। তবে ইরানি ভাষা ও লিপি বিষয়ে যেসব স্যুডো-পণ্ডিতবর্গের মত গ্রহণ করা হয়েছে, সেসব তথ্য প্রশ্নাতীত বলে আমার মনে হয়। বর্তমান বিষয়ের জন্য যাঁদের লেখা গ্রহণ করা হয়েছে তাঁরা হলেন, R. L. Turner, Sir A. Grierson, S. K. Chatterjee, D. N. Mukharjee, W. B. Henning, Gilbert Lazard প্রমুখ। তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত সন্দেহ নেই। তাই তাঁদের মতামত গ্রহণ করলে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কোনো কারণ নেই। প্রকারান্তরে তার উলটো হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

সিরাজ সাহেব নিজেও ঈ. বি. থেকে 'ধারণা' সংগ্রহ করেছেন, ইরানি ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে তাঁর ধারণার সঙ্গে মিল রেখে সমান্তরালভাবে বলছি, ইরানি লিপির (Achamenet Court-এর বহিঃস্তূপ, মানসেরা গিরিলিপি ও জজিরাত আসাওয়ানের পেপিরাস ডকুমেন্টস, আবেস্তীয় লিপি, পহলভি লিপি বা খরোষ্ঠী লিপি, নকস-ই-রুস্তম, পাইকুসা, চীনের প্রাচীরগাত্রের তথাকথিত প্রাচীন বর্ণমালা ইত্যাদি ইসলামপূর্ব নিদর্শন। প্রাচীন স্তর হচ্ছে সুমেরীয় খোদাইকর্ম, তার থেকে আক্কাদীয় বা আসুর-বেবিলীয় বাণমুখী, খ্রীপূ ২০০০ থেকে ৭ম খ্রী আসুর বাণিপালের সময় পর্যন্ত। তারপর জটিলতা।

কিন্তু সিরাজ সাহেব 'আদি পারসিক লিপিই তথাকথিত আবেস্তা লিপি, ঈষৎ গোলাকার গড়ন, তার হাজার বছর পরে আরবি লিপির জন্ম' বলেছেন, এ কথার সঙ্গে মিলতে পারছি না। বাণমুখীর কয়েকটি ধারা সেমেতীয় লিপি সৃষ্টি করেছে, আরবি ও হিব্রু তাদের থেকে উদ্ভূত।

প্রাচীন খোরেজমীয় সম্বন্ধে বেশি কিছু জানা যায় না, তবে অন্ত্য খোরেজমীয় লেখা হয়েছে আরবি হরফে, এ কথা পণ্ডিতেরা বলেন, 'since the beginning of the 20th century it has been generally accepted that the homeland of the avesta was khawaregm...Much more is known of late Khawarejmian written in Arabic script. (Ibid, pp 626-627.)

সুতরাং জেন্দ আবেস্তার বর্তমান লিপি যে আরবি তাও বোঝা যাচ্ছে, আর আরবি লিপি হচ্ছে

"Logosyllale cuniform written "system" বংশোদ্ভূত, এ-কথাও পণ্ডিতেরা বলেন।

৪। ভাষা লিপি বর্ণমালা লিখনশৈলী (calligraphy) এসব টার্ম সম্বন্ধে সচেতন নই বলে তিনি আমার জ্ঞান খোলসা করার জন্যে কিছু কথা বলেছেন। এ যাবৎ আমাদের আলোচনায় calligraphy (লিখনকারুকলা-বিদ্যা বললে যথার্থ হয়) সম্বন্ধে কোনো জটিলতা ইতিপূর্বে দেখা দেয় নি। আরবি হরফে কিংবা ফার্সি হরফে লিখন-কারুকলার খ্যাতি পৃথিবীবিখ্যাত, মুসলমানরা চিত্রকলা নাকচ করেছে, কিন্তু তাদের চিত্রস্ফূর্তি কিছু পরিমাণে লিখনকারুকলায় ব্যয় করেছে। সংগীত নাকচ করেছে বলে আজানের ভেতর ভৈরবী সুর প্রবাহিত বলে আলাউদ্দিন খাঁ উল্লেখ করেছেন, এ কথা জানি। কিন্তু বাঙলা লিপির calligraphy সৃষ্টির বেলায় রবীন্দ্র-চিত্রকলা প্রবাহিত বলে বিতর্কের সূত্রপাত হতে পারে। তবে আমাদের বিতর্ক হচ্ছে ভাষা, লিপি ও বর্ণমালা নিয়ে। আধুনিক ফার্সি ভাষা ৭ম শতক থেকে আরবি / লিপি ও বর্ণমালায় লিখিত হয়ে থাকে, অতিরিক্ত চারটি ফার্সি ধ্বনির জন্যে আরবি বর্ণমালার চারটি বর্ণকে নোকতা দিয়ে খাড়া করা হয়েছে। বাঙলা বর্ণমালার ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। য়, ড়, ঢ় এই ধ্বনিগুলি নোকতা-সংবলিত।

সিরাজ সাহেব শাহনামাকে পহলবি লিপিতে লেখা বলেছেন। আসলে তিনি পহলবি ভাষায় শাহনামা রচিত এ কথা বললে যথার্থ হত। বলা হয়ে থাকে জাতীয়তাবাদী কবি ফেরদৌসী (মৃত্যু ১০২০) সম্পূর্ণ শাহনামা ৩৫০০০ থেকে ৬০০০০ শ্লোক (verses in short rhyming couplets)-এর ভেতর মাত্র দুইটি আরবি শব্দকে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ইরানি লিপি তাঁর হাতছাড়া হয়ে গেছে। সবচেয়ে অলংকৃত শাহনামাকে (ক্যালিওগ্রাফি ও চিত্রশোভিত, ১৩২০—১৩৬০ খ্রী) যে লিপি রয়েছে তাকে কোনো অবস্থায় আরবি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না।

তিনি চামড়ায় লেখা 'জেন্দ আভেস্তা'র কথা বলেছেন ; এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য এখানে উল্লেখ করছি। চামড়ায় লেখা কোনো লিপির মূলে রয়েছে খরোষ্ঠী লিপি ; খর অর্থ কাঁচা অথবা গাধা ; পোস্ত অর্থ চামড়া ; পণ্ডিতেরা বলেন, খরপোস্তী থেকে খরোষ্ঠী (অবশ্য এ নিয়ে নানা মতবিরোধ দেখা যায়) ; কাঁচা চামড়ায় লিখিত হত বলে লিপির নাম খরোষ্ঠী হয়েছে। এই খরোষ্ঠী লিপিও এক শ্রেণীর আরামীয় লিপি, তার সঙ্গে সেমেতীয় লিপির কোনো সম্পর্ক নেই।

খরোষ্ঠী লিপি ভারতেও প্রচলিত ছিল। অশোকের পশ্চিমাঞ্চলের inscriptionগুলি খরোষ্ঠী লিপিতে উৎকীর্ণ। এইচ. জি. ব্যহলার পশ্চিম ভারতে, ইরানে এবং মধ্য এশিয়ায় খরোষ্ঠী লিপি প্রচলিত ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন, যার সঙ্গে আরবি লিপির কোনো সাদৃশ্য নেই।

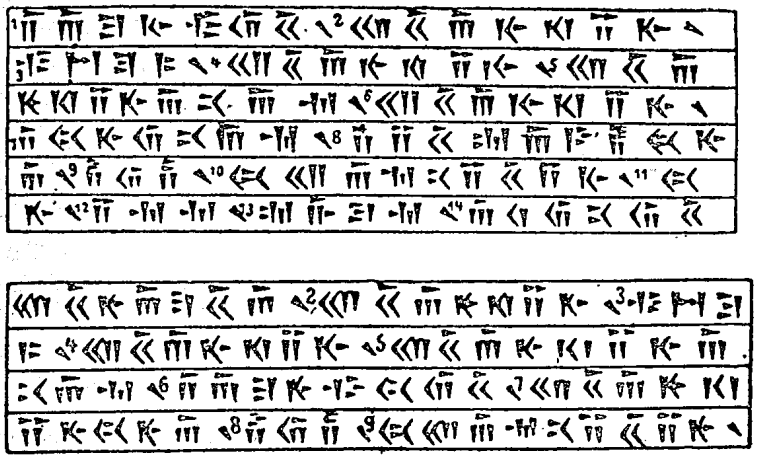
শামসুল আলম সাঈদ
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

২

শামসুল আলম সাঈদ আবার পত্রাঘাত করেছেন। একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। নীল আর্মস্ট্রংদের চাঁদে পৌঁছুনোর খবর যেদিন কলকাতার কাগজে বেরোয়, সেদিন সকালে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড। তখন থাকতাম ক্যানটোফার লেনে। বাজারের পথে দেখি, এক কাবুলিয়ালা সবিক্রমে লাঠি চালনা করছেন এবং 'জুট্' 'জুট্' বলে হুঙ্কার ছাড়ছেন। প্রচণ্ড ভিড়। মাথা ফাটার আগেই লোকেরা তাঁকে কাবু করে ফেলল এবং টানতে-টানতে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা পরে জানলাম। চাঁদে মানুষ গেছে শুনেই খাঁসায়েবের মাথায় খুন চড়ে গেছে। চাঁদে মানুষ গেছে ? এ কখনও হতে পারে ? বিলকুল ঝুট। তাই নিয়ে তর্কাতর্কির পরিণাম আর কী।

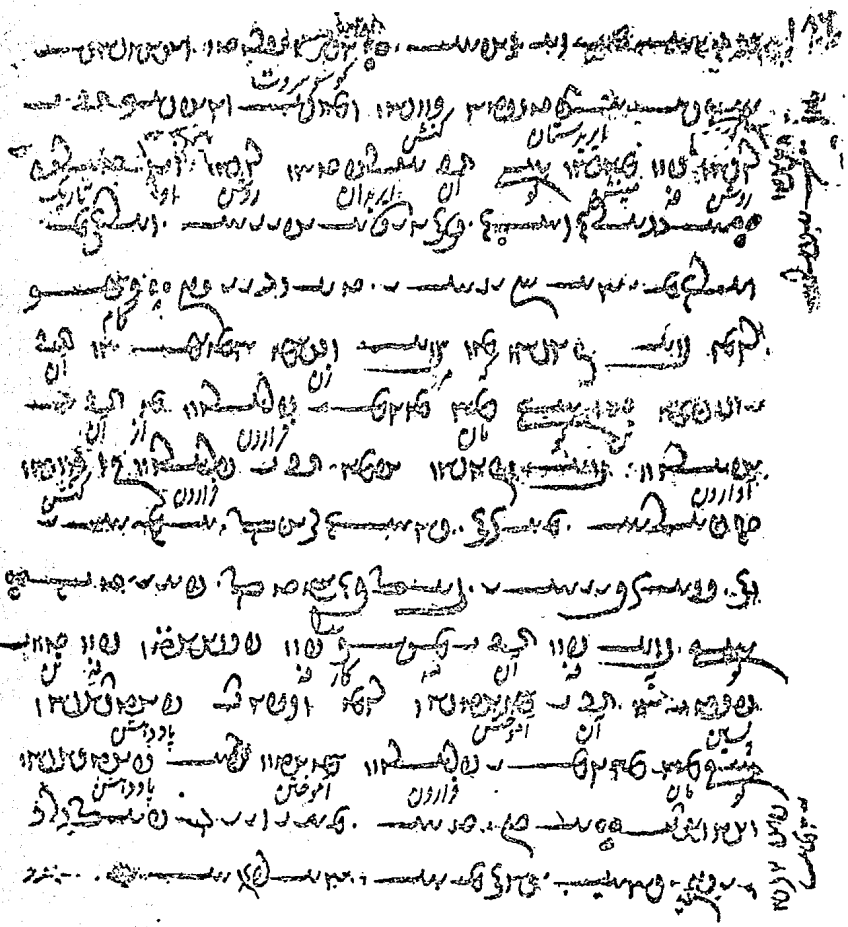
যাই হোক, শামসুলের সঙ্গে আর বিতর্কের অভিরুচি নেই। এবার প্রাচীন হখমনসীয় ফার্সি ও পহলভি ফার্সি লিপির নিদর্শন এবং প্রাক-ফার্সিলিপি যুগের হখমনসীয় কীলকাকার চিহ্নলিপির নিদর্শন এই জবাবের সঙ্গে ছাপতে অনুরোধ জানাচ্ছি সম্পাদক মহাশয়কে, যাতে বিষয়টির চাক্ষুষ ফয়সালা হয়। পরের মুখে ঝাল খাওয়া কখনই

উচিত নয়। স্বচক্ষে দেখে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে হয়। আবার বলছি, এই হখমনসীয় কীলকাকার লিপি সুপ্রাচীন সুমেরের অক্কাদীয়-বাবিলনীয় যুগের লিপি।



খ্রীপূ ৬ষ্ঠ শতকের কিউনিফর্ম লিপির নিদর্শন। ওপরেরটি Darius I-এর, নীচেরটি Xerxes-এর শিলালেখা। Voices in Stone—E. Doblhofer, প্রকাশক ঃ Paladin, London, ১৯৭৩ সংস্করণ, ১০৫ পৃষ্ঠা।

শামসুল E. B. সম্বল করে রণে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই সঙ্গে নেম-ড্রপিং! নামাবলী জপ গুরুবাদেরই নামান্তর। আপ্তবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। কে বলেছেন, সেটা বড়ো কথা নয়। কী বলেছেন, তার চেয়েও



খ্রীপূ ৪র্থ শতকের চামড়ায় লেখা জেন্দা অভেস্তার একটি পাতা। আদি পারসিক বর্ণমালাভিত্তিক লিপির নিদর্শন। দু লাইনের মধ্যে পরবর্তী যুগের পহলভি লিপিতে লেখা টীকা। অক্সফোর্ডে বোদলিয়ান লাইব্রেরিতে রক্ষিত। Persian Mythology—J. R. Hinnels, প্রকাশক Newnes Books (Rushden, England) 1985 সংস্করণ, ৫৭ পৃষ্ঠা।

কিসের ভিত্তিতে বলেছেন, সেটাই ধর্তব্য। ভিত্তিটা তন্নতন্ন পরীক্ষা করতে হয়। শামসুলের উদ্ধৃতি এবার E. B.-র ১৯৮৭ সালের পঞ্চদশ সংস্করণ মাইক্রোপিডিয়া!! খটকা লাগছে। ১৯৭৪ সালেই E. B. মাইক্রোপিডিয়ার দুটি বিভাগেরই পঞ্চদশ সংস্করণ বেরিয়েছিল, যা থেকে আমিও কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। তা হলে ১৯৮৭ সালে পঞ্চদশ সংস্করণ হয় কোন্ জাদুমন্ত্রে? শামসুল তাঁর উদ্ধৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত তো? রহস্যময় ব্যাপার! যাই হোক, যিনি লিখেছেন, 'Modern Persian is written in Arabic Script', তিনি হয় বদ্ধ উন্মাদ, নয় তো পণ্ডিতমূর্খ। তাঁর লেখা উচিত ছিল : 'Modern Persian Script is Arabicised Parthian Script'। গ্রিয়ারসন ভারতীয় উপমহাদেশ এবং সংলগ্ন অঞ্চলের যে-ভাষাসমীক্ষা করে গেছেন, তার পর্বতপ্রমাণ বিভ্রান্তি পরে ধরা পড়েছে। এ নিয়ে লিখতে গেলে প্রবন্ধ ফাঁদতে হয়। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা ওই কুকীর্তির খবর বিশদ রাখেন। প্রয়াত সুনীতি চাটুজ্জে মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তাঁর আরবি-ফার্সিজ্ঞান ছিল অতীব সীমিত, খণ্ডিত এবং ধার-করা। নজির দিতে বলে প্রবন্ধ ফাঁদতে হয়। এ নিয়ে আর কচকচির ইচ্ছা নেই। 'দলিলান-এ-কিম্মত্'-কে যিনি 'দলিলানা কিম্মত্' লেখেন, তিনি আরবি ফার্সির অ-ফ জানেন না। থাক। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে।*

'ইরান' শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে শামসুল একটি অভিধান থেকে ফরিদুন-পুত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি একটু খুঁজলেই জানতে পারতেন, ওই অভিধানকার কবি ফেরদৌসির 'শাহ্-নামাহ্' কাব্য থেকেই বস্তুটি টুকেছেন। ফরিদুন রূপকথার চরিত্র। 'শাহ্-নামাহ্' বস্তুত পৌরাণিক রূপকথামূলক বৃত্তান্ত। বইটি ইতিহাস নয়। কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র আছে বটে; কিন্তু তাদের কীর্তিকলাপ নিছক রূপকথা। 'রোম' শব্দ এবং শহরটির সঙ্গে রোমুলাসের রূপকথা-মিথলজি যেমন বানানো হয়েছিল, এ-ও তেমনি। সমস্ত ভাষার শব্দের মধ্যে যে মূল অর্থ লুকিয়ে আছে, তাতেই নিহিত রয়েছে ইতিহাস-সমাজতত্ত্বের একেকটি সূত্র। এ বিষয়ে Socio-linguist-দের সাম্প্রতিক কাজকর্মের খবর রাখা জরুরি। অন্তত রেমণ্ড উইলিয়ামের বইগুলি পড়া দরকার। ভাষার মধ্যে Key-word কীভাবে কত তথ্য লুকিয়ে রাখে, জানা যাবে।

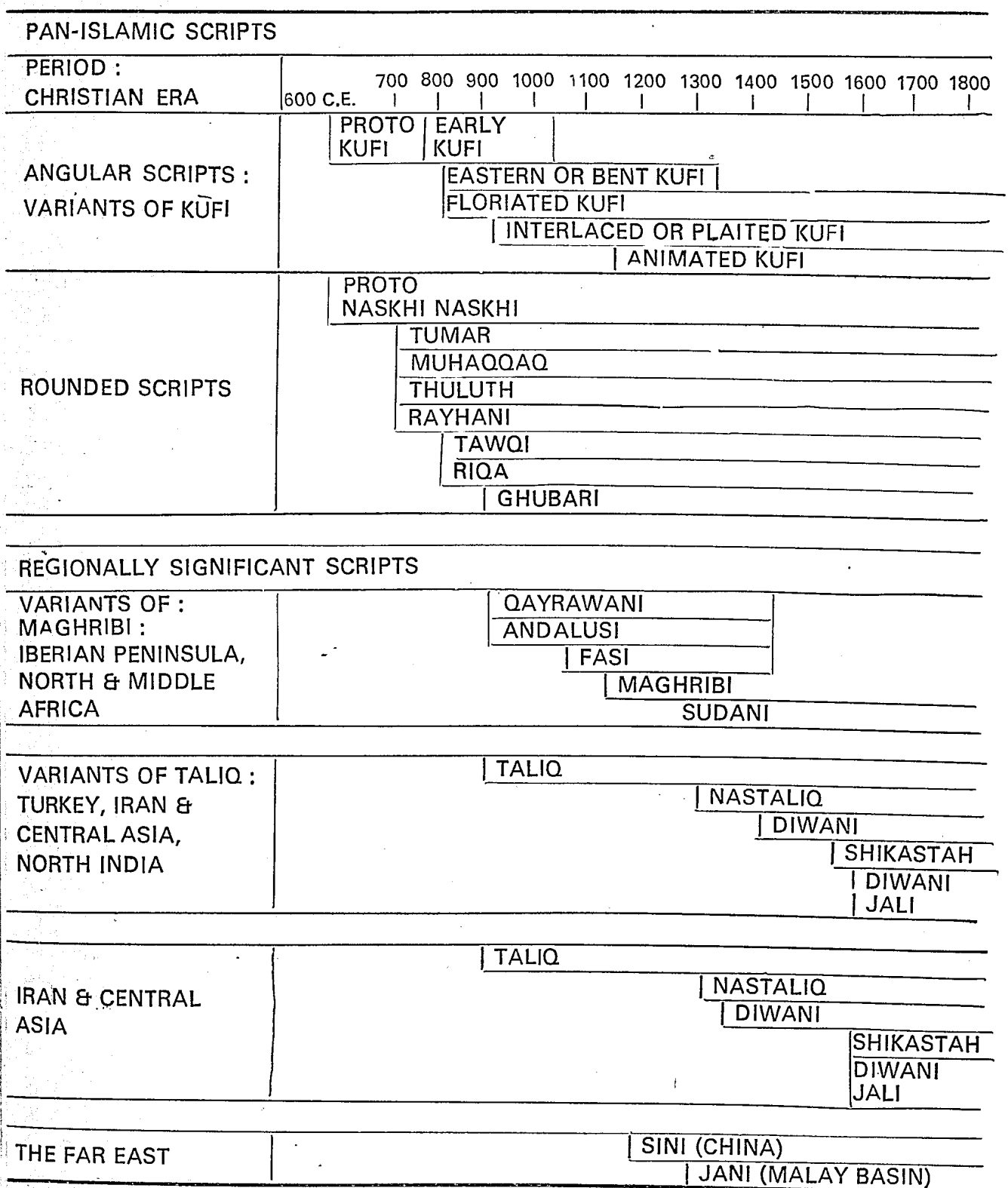
প্রাচীন আরবরা 'চন্দ্রকলাকৃতি উর্বর ভূখণ্ড' (Fertile Crescent) বলতে ইরান-ইরাক শব্দদুটি ব্যবহার করতেন। ইর শব্দ-জাত Dialectal variation ইরান এবং ইরাক। শব্দদুটির আরও একটি প্রাচীন অর্থ ছিল 'উপকূলবর্তী ভূমি (shore)'। নদী-বা সমুদ্রতীরের ভূমি স্বভাবত চন্দ্রকলাবৎ বাঁকা এবং উর্বর হয়। এ বিষয়ে সম্প্রতি কলকাতার রূপা প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত T. P. Hughes-এর 'Dictionary of Islam' গ্রন্থটি দেখুন। আরও দেখুন আরব-পশ্চিম এশিয়ার মানচিত্র। শব্দার্থতত্ত্বের চিত্রটি নিমেষে ধরা পড়বে। শব্দার্থতত্ত্ব প্রসঙ্গে একটি ভারতীয় দৃষ্টান্ত দিই : 'তিলোত্তমা'। এর অর্থ হিসাবে একটি পৌরাণিক গল্প চালু আছে। কিন্তু শব্দার্থতত্ত্ব অনুসারে এটি 'তিলের ন্যায় 'উত্তমা', এই সমাসবদ্ধ পদ। এ বিষয়ে ডি ডি কোশাম্বী 'An Introduction to Indian History'-তে বিশদ আলোচনা করেছেন। বইটি সুলভ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাচীন খোয়ারজামকে আরবরাই পরে খোরাসানে পরিণত করেছিলেন। ইরান তারই দক্ষিণে একটি অঞ্চল ছিল।

আগের চিঠিতে ইসমাইল এবং লা'মিয়া ফারুকির 'The Cultural Atlas of Islam' বইয়ের উল্লেখ করেছিলাম। ফারুকিদম্পতির এই গবেষণাগ্রন্থে Fertile Crescent-এর বিশদ বিবরণ আছে। এই সঙ্গে calligraphy জিনিসটি কী, তার নমুনা এই বই থেকেই অবিকল উদ্ধৃত করছি। শামসুল calligraphy বোঝেন নি। এই উদ্ধৃত চার্ট দেখলে বুঝবেন। ক্যালিগ্রাফির কারণেই যে-কোনও অজ্ঞ লোকও একপাতা আরবিতে লেখা এবং একপাতা ফার্সিতে লেখার তফাত নিমেষে ধরতে পারবেন।

---

* ভণ্ড গুরুদের মতো হ্যাডোপণ্ডিতদের কীর্তি প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক শারদীয় সংখ্যা "ঋতুপত্র গাঙ্গেয়" পত্রিকায় "পণ্ডিতি স্বেচ্ছাচার : কিছু নিদর্শন" নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছি। পত্রিকাটির ঠিকানা 'সংবাদ, ৫৭/২ডি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩।' সামসুল আগ্রহী হলে সংগ্রহ করে পড়বেন।

TIME CHART OF ISLAMIC CALLIGRAPHY



[FROM 'THE CULTURAL ATLAS OF ISLAM' BY I. & L. FARUQI, Page No. 365]

'চামড়ায় লেখা জেন্দা অভেস্তা' খরোষ্ঠীলিপিতে লেখা নয়। এ প্রসঙ্গে খরোষ্ঠীলিপি অবান্তর। জেন্দা অভেস্তা খরোষ্ঠীলিপিতে লেখা হবে কোন্ দুঃখে? এ কী উদ্ভট কথাবার্তা! তা ছাড়া, আমাদের আলোচ্য শুধু আরবি-ফার্সি। কলকাতার পার্শিরা পহলভি লিপিতে লেখেন। এ লিপি (আবার বলছি) আরবি, আধুনিক ফার্সি এবং উর্দু-ভাষী যে-কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি পড়তে পারবেন। এ চিঠির গোড়ায় এর নমুনা দিয়েছি। দেখে নিন। অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা কেন? শামসুল ডেভিড ক্রিস্ট্যালের "লিঙ্গুইস্টিক্স" বইটিকে স্কুলপাঠ্য বলেছেন দেখে তাজ্জব! কেন এই অদ্ভুত কথা মাথায় এল তাঁর? এ বই ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী বিশেষ পাঠকের জন্য লেখা। ভাষাবিজ্ঞানের সেকেলে এবং একেলে ধারণা, ফার্দিনান্দ সোস্যুর এবং চমস্কির বৈপ্লবিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা, Philology এবং Linguistics-এর মৌলিক পার্থক্য, ভাষা-ব্যবচ্ছেদের বিবিধ সমস্যা নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এ বই। এটি ভাষাবিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানের সহায়ক তো বটেই; উপরন্তু সোস্যুরের সিনাক্রনিক এবং ডায়াক্রনিক তত্ত্ব আরবি-ফার্সি আলোচনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত জরুরি। সন্দেহ হয়, শামসুল বইটি খুঁটিয়ে পড়েছেন কি না। কোনও ভাষা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার প্রাথমিক সূত্র হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন ডেভিড। এই বই স্কুলপাঠ্য!! সোস্যুরের বৈপ্লবিক তত্ত্ব শামসুল একেবারেই বোঝেন নি। আরবি এবং ফার্সি লিপির পার্থক্য এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সোস্যুরের ছকটি লক্ষণীয়। অতি গুরুত্বপূর্ণও বটে। এসব ফেলে ধান ভানতে শিবের গীতের মতো Buhler-ফিনিসীয় লিপি-গ্রীক লিগি ধরে টানাটানি কেন? আবার বলছি, পারসিক লিপির প্রায় এক হাজার বছর পরে প্রথম আরবি লিপির উদ্ভব ঘটেছিল। আগের চিঠিতে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য দিয়েছি। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবু বলছি ওই লিপি বর্ণমালাভিত্তিক লিপি। পাঁচ-ছয়ের দশকে রুশ প্রত্নউৎখননে প্রায় দু হাজার পহলভি কবিতা (Ostraca) উদ্ধার করা হয়েছে। লিপি পহলভি। ফারুকিদের চার্ট থেকে আরবি লিপির কাল দেখে নিন।

ইসলামের ঐতিহাসিক তথ্যবিষয়েও শামসুল অসতর্ক। সপ্তম শতকেই আরবদের পারস্য জয় লিখে ফেলেছেন! আমার আগের চিঠিটি খুঁটিয়ে পড়ে যাচাই করার ধৈর্যও তাঁর নেই। ফিলিপ বিট্টির 'মেকার্স অব আরব হিস্টরি' বইটি অন্তত পড়া উচিত ছিল। মাক্সিম রদঁ্যাস-র সাম্প্রতিক বিখ্যাত বই 'মোহাম্মদ' পেঙ্গুইনের দৌলতে সুলভ। যাই হোক, নিরলস অধ্যয়ন, বিবিধ খোঁজখবর ব্যতিরেকে E. B. সম্বল করে সেই কাবুলিওয়ালার হুঙ্কার হাস্যকর শোনাবে। কোনও বিষয়ে বলতে হলে খুঁটিয়ে জেনে বলতে হয়। রেজা শাহ্ নিজেকে পহলভি-বংশধর দাবি করতেন। কোনও প্রমাণ ছিল না এ দাবির পেছনে। তিনি ১৯২০ সালে পারসের নাম বদলে 'ইরান' করার প্রস্তাব পার্লামেণ্টে পাস করিয়ে নেন। কিন্তু বহু বিতর্কের পর অবশেষে প্রস্তাবটি কার্যকর হয় ১৯৩৫ সালে। তিনি ইউরোপে পড়াশোনা করেন। ফলে তথাকথিত আর্য-বাদীরা তাঁর মগজ ধোলাই করে দেয়। নিজে খেতাব নিয়েছিলেন Aryamehr অর্থাৎ আর্য-মিহির (আর্যদের সূর্য)। এ নামে একটি বিশাল তোরণ বানিয়েছিলেন তেহরানে। খুমেইনি এখন সেটির ইসলামিক নাম দিয়েছেন। চিত্রলিপি, চিহ্নলিপি(কিউনিফর্ম, ফোনেটিক, জিওগ্রিটিক, আইডিওগ্রাম ইত্যাদি লিপি) এবং Alphabatic writing system বা বর্ণমালাভিত্তিক লিপি বলতে কী বোঝায়, জানতে হলে প্রচুর অধ্যয়ন চাই। শামসুলকে শেষবারের মতো বলছি, 'আধুনিক ফার্সি আরবি হরফে লেখা হয়' কথাটাই হাস্যকর ভুল। সঠিক কথা হল: 'আধুনিক ফার্সিলিপি Arabicised পহলভিলিপি।' আরবি, ফার্সি এবং হিব্রু বর্ণনাম (আলেক, বে, তে ইত্যাদি) প্রায় একই হওয়ার কারণ এগুলি সবই আরামীয় বর্ণনাম থেকে সংগৃহীত এবং আরামীয় বর্ণনাম ফিনিসীয় লিপির বর্ণনাম থেকে সংগৃহীত। পল্লবগ্রাহিতা ছেড়ে আলোচনা নির্দিষ্টবিষয়কেন্দ্রিক হওয়া উচিত।

কথাটি 'বহিস্তুন' নয়, বেহিস্তান। বেহেস্ত্ / বেহিস্ত্ বহুবচন 'আম' যোগে নিষ্পন্ন। এই পাহাড়টির পূর্বনাম ছিল বাগাস্তনা। সে-ও ফার্সি শব্দ। 'বাগ' মানে God, আস্তানা মানে Place (স্থান)। ঈশ্বর বা দেবতাদের বাসস্থান। ইসলামি যুগে বেহেস্ত্ / বেহিস্ত্ (স্বর্গ) চালু হওয়ায় পাহাড়টি 'বেহিস্তান' নাম পায়। বেহিস্তানের স্থানীয় বিকৃত নাম বিসিতান, বিস্তান ইত্যাদি। অজ্ঞ বাঙালি মুসলিম পুঁথিকাররা 'বেসিতুন' লেখেন দেখেছি 'শিরিঁ ফরহাদ' পুঁথিতে। বেহিস্তান, নখ্শ্-ই-রুস্তম, রাসসামারা, মিশরের জজিরাত্ আসোয়ান (প্রাচীন গ্রীক নাম এলিফান্তিনে, ইংরেজি এলিফ্যাণ্টাইন) ইত্যাদি স্থানের লেখগুলি 'প্রাচীন পারসিক লিপি' নয়। অক্কাদীয়-বাবিলনীয় (বাব-এ-ল্যান)

কীলকাকার লিপি। এগুলি বর্ণমালাভিত্তিক নয়, নিছক চিহ্নলিপি। নিদর্শন ছবিতে দেখুন। জজিরাত আলোয়ানে প্রাপ্ত প্রথম Darius (ফার্সিতে দারাহ্)-এর ছিন্ন প্যাপিরাসের লেখাও কীলকাকার লিপিতে। এ বিষয়ে পেঙ্গুইন-প্রকাশিত W. S. Smith-এর 'The Art and Architecture of Ancient Egypt' (১৯৮১) বইটি সুলভ। কলকাতার ইংরেজি বইয়ের দোকানে খোঁজ নিলেও মিলতে পারে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলিকাতা-১৪

আমরি লিপি পারসিক লিপি প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনো চিঠিপত্র ছাপা হবে না।—সম্পাদক

মতামত

দুই বঙ্গের জীবনীচর্চা

১

"চতুরঙ্গ" অকটোবর ৮৮ সংখ্যায় আজহারউদ্দীন খান "গ্রন্থ-সমালোচনা"য় যে তথ্যের সন্নিবেশ করেছেন, তা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। আর এপারের বাঙালি বলে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে অজানা তথ্য জেনে। এই না-জানার মাঝখানে ছিল ব্রিটিশ শাসন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যেখানে ১২৬ জনের জীবনী-গ্রন্থমালায় মাত্র দুজন মুসলিম সাহিত্যিককে স্থান দিয়েছেন, সেখানে ওপার-বাঙলা একাডেমী প্রথম ত্রিশজনের মধ্যে সাত জন হিন্দু সাহিত্যিককে স্থান দিয়েছেন। এই তথ্য থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, ওপারের বাঙালিরা আমাদের থেকে অনেক বেশি উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন জীবনী-গ্রন্থমালায়।

গ্রন্থসমালোচনা পড়ে যে তথ্য আমাকে চমকে দিয়েছে, তা হল স্বনামধন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় থেকে সোমেন চন্দ ও অদ্বৈত মল্লবর্মনের জীবনীগ্রন্থ ওপার-বাঙলা একাডেমী প্রকাশ করেছেন। মনে পড়ে ১৯৪৮ সালে ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মরণীয় উক্তি, 'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য।' আজহারউদ্দীন সাহিত্যবিশারদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গভীর লজ্জা ও পরিতাপ অনুভব করেছেন। আমার কাছে যে তথ্য আছে তা এখানে উল্লেখ করছি। আমার মনে হয় এতে আজহারউদ্দীনের গভীর লজ্জা এবং পরিতাপ চলে যাবে। আসবে গভীর অশ্রদ্ধা। তথাপি উল্লেখ না করে পারছি না, কারণ যে ব্যক্তি সাহিত্যবিশারদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন, তিনি উভয় বঙ্গের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি-সাহিত্য সম্পাদনায় আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের শ্রম, সাধনা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে লিখেছিলেন: 'শ্রীআবদুল করিম চট্টগ্রামের একটি বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। তাঁর সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে। তথাপি তিনি সাহিত্যসেবায় অকাতরে পরিশ্রম করিয়া থাকেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তিনি এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদনাকার্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা ও যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাংলায় কেন, সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মেলে না। এক-একবার মনে হয় যেন, কোন "জার্মান এডিটর" এই গ্রন্থ সম্পাদনা করিয়াছেন।' আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত প্রাচীন পুঁথি "রাধিকার মানভঙ্গ" প্রসঙ্গে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উপরোক্ত স্মরণীয় মন্তব্য করেছিলেন। তথাপি এই বঙ্গে আবদুল করিমের জীবনীগ্রন্থ বের হয় না।

অনিলচন্দ্র সাহা
বাটানগর

২

অকটোবর '৮৮ "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় জীবনচরিত সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সাহিত্য পরিষদ' সংক্রান্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন শ্রদ্ধেয় সমালোচক। তিনি পরিষদের সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের প্রতি সুনির্দিষ্ট অঙ্গুলিহেলন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা ভালো, সাহিত্য পরিষদের একটা নিজস্ব পথ আছে যেটা বিভিন্ন প্রকাশনা ও এতাবৎ প্রকাশিত সামগ্রিক পত্রিকাগুচ্ছের মধ্যে বিধৃত। সুনিপুণ-ভাবে তলে তলে অনুসন্ধানের দ্বারা ইতিহাস রচনার কাজে এবং ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকার মহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে পরিষদ।

এবার আসা যাক "সাহিত্যসাধক চরিতমালা"র প্রসঙ্গে। এই গ্রন্থমালা রচনার পদ্ধতির কথা বলে রাখা ভালো। কারও জীবনী প্রকাশনার জন্য প্রথমে কর্মসমিতির নিকট প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাব গৃহীত হবার পর উপযুক্ত জীবনী-কারের অনুসন্ধান করা হয়। যদি কর্মসমিতি সরাসরি সেরূপ যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান না পান প্রস্তাবককে অনুরোধ করা হয় উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করার। যোগ্য ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করলে এবং পাণ্ডুলিপি জমা পড়ার পর সেটি পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরীক্ষার মানদণ্ড হল (ক) জীবনী, কর্ম ও সামগ্রিক পুস্তকতালিকা থাকতে হবে। (খ) একশত পৃষ্ঠার মধ্যে হতে হবে। (গ) পুরোপুরি আবেগ-বর্জিত হতে হবে। অবশ্য দ্বিতীয় শর্তটির অন্যথা করে এ-যাবৎ

একটিমাত্র জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। সেটির জন্য আমরা অবশ্য পরিষদের নিন্দা করতে পারি। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রস্তাব গ্রহণ থেকে পাণ্ডুলিপি প্রকাশ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে জীবনচরিত রচনার কাজ আটকে আছে প্রচুর, যেমন রচনার দায়িত্ব নিয়ে এখনও পাণ্ডুলিপি জমা দেননি এমন ঘটনা আছে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি। আরও একটি কথা, সাহিত্য-সাধকচরিতমালা নামক তথ্যপঞ্জী প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই নজর দেওয়া হয় যাঁদের জীবন বা কর্ম হারিয়ে যাবার পথে, রেনেসাঁসে অংশগ্রহণ করার দিকে নয়। বেশি খ্যাত যাদের জীবন ও কর্ম সহজলভ্য ও সদ্যঃপ্রয়াত জীবনের প্রতি তত বেশি দৃষ্টি সাধারণত দেওয়া হয় না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশে শাখা-সংগঠনের সংখ্যা কম ছিল না যাদের মাধ্যমে এবং বর্তমান ভারতে শাখা-সংগঠনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুক্ত মুসলমান সাহিত্যসেবকের সংখ্যা কম নয়। কর্মসমিতির সদস্যদের দ্বারা মুসলমান সাহিত্যসাধকের নাম-প্রস্তাব না আসতে পারে, কিন্তু উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের দ্বারা সেই সকল নাম প্রস্তাব-আকারে এসেছে অথচ প্রস্তাব গৃহীত হয় নি, এমন নজির যদি সমালোচক দিতে পারেন, সাহিত্য পরিষদের সাম্প্রদায়িকতার দোষ-প্রমাণ যথার্থ হয়। এবং বর্তমান কতজন মুসলমান সাহিত্যসাধকের নাম প্রকাশের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে তাঁদের নাম উল্লেখ করলে অভিযোগ স্পষ্টতর হত।

এবার আসা যাক শহীদুল্লাহর জীবনচরিতের পাণ্ডুলিপি বিষয়ে। ওটি জমা পড়ার পর পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ। জনাবআজাহারউদ্দিন খানের অন্তত অজানা নয়—পাণ্ডুলিপি বাতিল হওয়ার কারণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি বা সম্পাদকের কারসাজি নয়। কারণ অন্য কোথায়ও ছিল। কারণটা ধরা যাবে পাণ্ডুলিপি এবং তার সংস্কৃত মুদ্রিত রূপ পাশাপাশি পরীক্ষা করলে।

বর্তমান কালের সাহিত্য পরিষদের কর্মকর্তাদের নজির-বিহীন অক্ষমতা ও অযোগ্যতা নিশ্চয়ই পরিতাপের বিষয়, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্য-পরিষদ চালিত—এ উক্তি আমার মতে অসার।

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
২, বদনরায় লেন
কদমতলা, হাওড়া-১

৩

[আজহারউদ্দীন খানের "দুই বঙ্গের জীবনীচর্চা" লেখাটির সমালোচনা করে শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তী যে পত্র দিয়েছিলেন তা গত নভেমবর সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। সেই চিঠির জবাবে আজহারউদ্দীন এই পত্রটি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন —সম্পাদক]

অকটোবর সংখ্যায় "চতুরঙ্গ"-র গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে 'দুই বঙ্গের জীবনীচর্চা' নামে সমালোচনা বেরিয়েছিল —সে সমালোচনার একটি প্রতিবাদপত্র নভেমবর সংখ্যায় বেরিয়েছে। সমালোচক হিসেবে আমার বক্তব্য নিবেদন করার পূর্বাহ্নে একটি মুদ্রণগত সংশোধন করতে চাই। অকটোবর সংখ্যার ৫৪৬ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের শেষ পংক্তিতে 'জনগণের ভাষায়' বদলে 'জনসনের ভাষায়' হবে।

প্রতিবাদক গোড়াতেই লিখেছেন, 'তিনপাতা জুড়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সমালোচনা করা হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মুসলিম সাহিত্যসাধকগণের চরিত রচনায় অনাগ্রহী। ...অভিযোগ কয়েকটি বাক্যেই শেষ করা যেত বলে আমাদের ধারণা।' দেখা যাচ্ছে যে আমার অভিযোগ তিনি স্বীকার করেছেন—তাঁর আপত্তি হচ্ছে আমি বেশি কথা বলেছি। কয়েকটি বাক্যে লিখলেই কথা শেষ হত না—অনেকবার অনেকেই বলেছেন, পরিষদের কর্ণে জল প্রবেশ করে নি, দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা পরিবর্তন করেন নি, প্রতিবাদকও খুতি মেরে বেরিয়ে যেতেন। যুক্তি ও উদাহরণ দিয়ে বলেছি বলেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আমি শুধু মুসলিম সাহিত্যসাধকদের কথা বলিনি, হিন্দু সাহিত্যসাধক-দের কথাও বলেছি। তাঁরা যে একজাতীয় সংকীর্ণ মানসিকতা ও ফাঁপা উন্নাসিকতায় ভোগেন, একথা অস্বীকার করা যায় না।

শহীদুল্লাহ সাহেবের জীবনী রচনা প্রকাশে প্রতিবাদকের মতে তৎকালীন সম্পাদক জল ঘোলা করেন নি, বরং উৎসাহী হয়ে প্রকাশ করেছিলেন বলে সাফাই গেয়েছেন। তিনি ভেতরের ঘটনা জানেন কিনা জানি না—কিংবা জেনেও না-জানার ভাণ করতে পারেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত দিনের তাও আমার জানা নেই। তবে পরিষদের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত থাকলে একথা তিনি বলতে পারতেন না। ঘটনাটি যখন ঘটে কর্মকর্তাদের নামের তালিকায় তাঁর নাম

আমি দেখিনি। পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ (জুন ১৯৭১) তারিখে ৪কা২১৪ ৭৮ সংখ্যক চিঠিতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের ওপর একটি জীবনী লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি মাস দুয়েকের মধ্যে লিখে পরিষদে জমা দিই। বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রকাশের জন্য অনুমোদনও করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সোমেন্দ্র নন্দীর পর পরিষদের সম্পাদক হন মদনমোহন কুমার। তিনি অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে পাণ্ডুলিপি ফেরত পাঠিয়ে দেন অথচ নিজের বইগুলি পরিষদের অর্থে ছাপতে থাকেন। মদনমোহনের বিতাড়নের পর সম্পাদক হন দিলীপকুমার বিশ্বাস। আমি বন্ধুবর প্রদীপ চৌধুরীর মারফত দিলীপবাবুকে বিষয়টি বলি। তিনি ও প্রদীপবাবু উদ্যোগী হয়ে জীবনীটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেন। তাঁরাও এই ঘটনা প্রথমে জানতেন না। যে বইটি বেরুবার কথা ১৯৭১ (১৩৭৮) সালে, সেটি বেরুল ১৯৮১ (শ্রাবণ ১৩৮৮) সালে। একে জল ঘোলা বলব না তো কী বলব ?

আজহারউদ্দীন খান্
মেদিনীপুর

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economical.

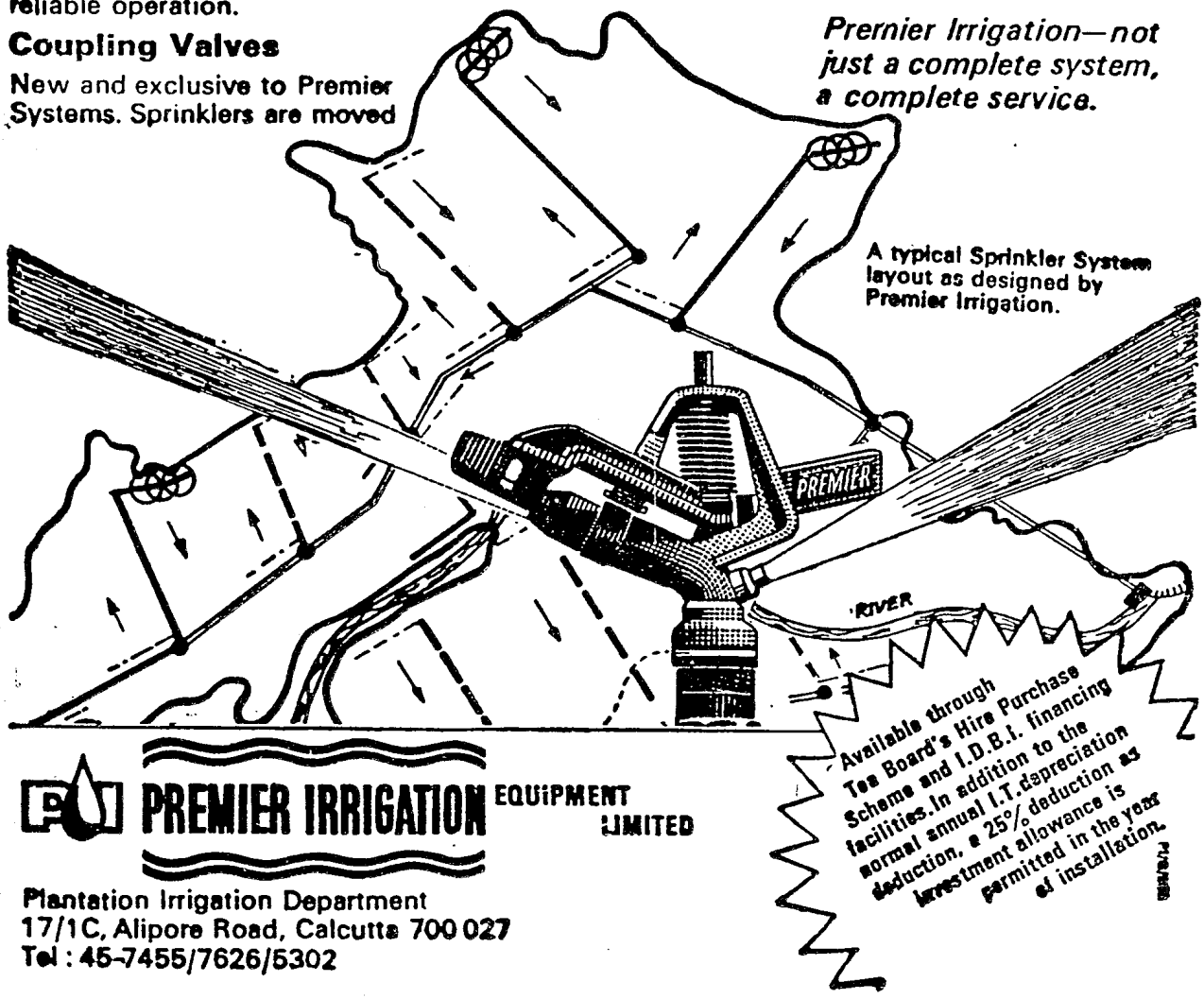
Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Premier Irrigation—not just a complete system, a complete service.



A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities. In addition to the normal annual I.T. depreciation deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302

Postal Regd. No. WB/CC-435 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57 প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা

রোজই দেখি দাড়ি কামানোর শেষে চড়চড়ে
মুখ, মাঝে মাঝে টুকটাক কেটে যাওয়ার দাগ।
রোজই ভাবি—ভাগ্যিস্ বোরোলীন আছে।

রোজ সকালের সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

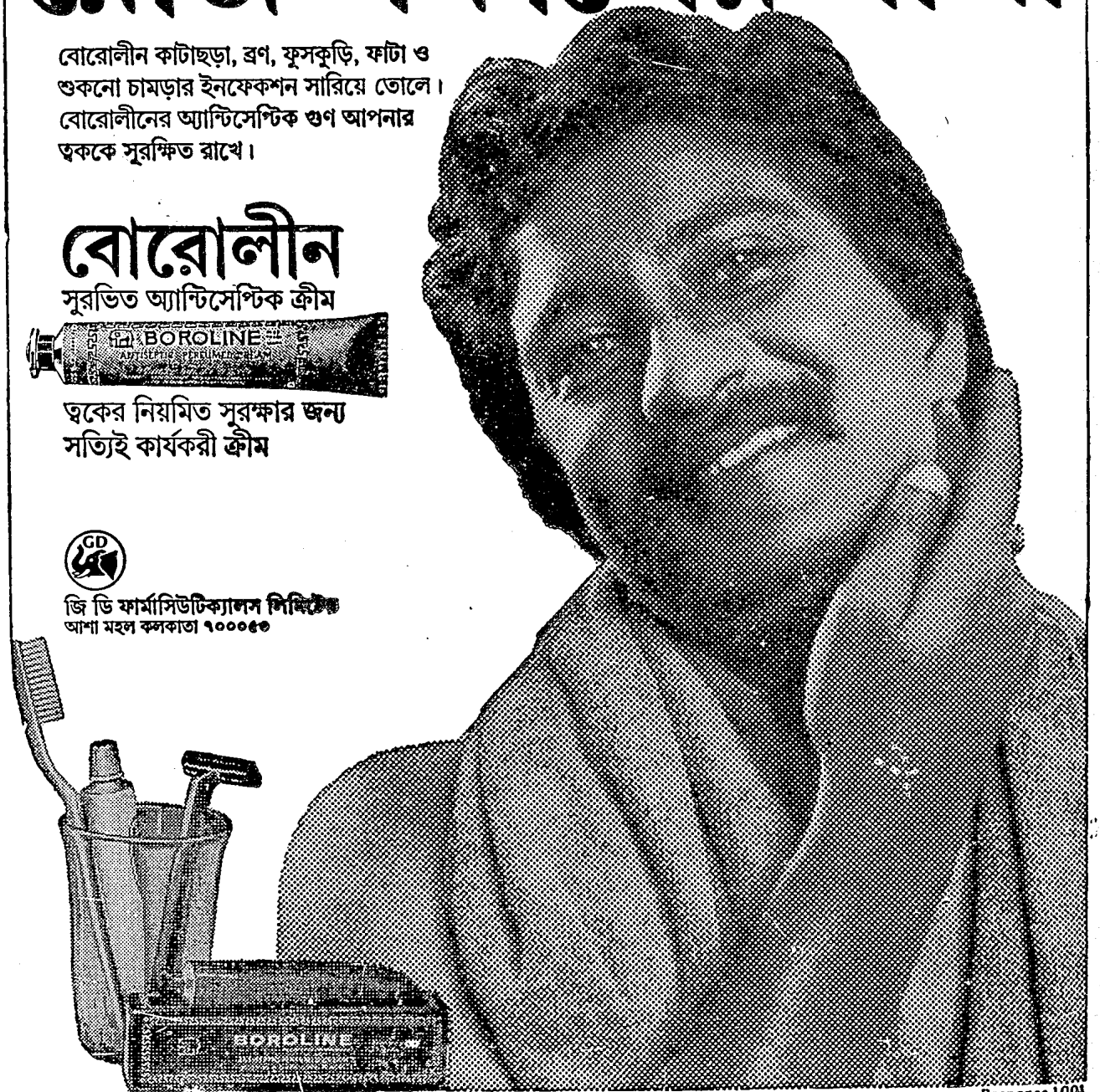
বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

ত্বকের নিয়মিত সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম

GD

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩



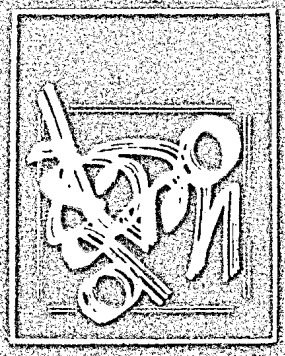
এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়।

Response 1004

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ নবম সংখ্যা জানুয়ারি ১৯৮৯



মানুষের বড়ো পরিচয় তার মননশীলতায়। তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন মাধ্যম থেকে বর্তমানে যে শিক্ষা পেয়ে থাকে, মননের বিকাশে তা তেমন ইতিবাচক নয় কেন? এরই অন্বেষায় অধ্যাপক অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ রচনা "মননশীলতার মন্বন্ত'র"।

অমিত অর্থব্যয় সত্ত্বেও, বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতে জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী তেমন সফল না হওয়ার হেতু বিশ্লেষণ করেছেন রাশিবিজ্ঞান-বিশারদ অধ্যাপক অতীন্দ্রমোহন গুন।

খ্যাতনামা ছন্দঃশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্র সেন শুরুতে ছিলেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী। অনুজ সুধীর সেনের স্মৃতিচারণে উদ্ভাসিত এই বিপ্লবীর ব্যক্তিমূর্তি এবং বাঙালি জীবনের সেই অগ্নিময় সময়।

সাঁওতাল-বিদ্রোহ চলাকালে যুদ্ধরত বিদ্রোহীদের চিন্তাচেতনায় যেসব ভাবান্তর ঘটেছিল, তারই বিশ্লেষণ আছে অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর এবারের কিস্তিতে।

তিরিশের দশক থেকেই "রবিবাসর" হল কলকাতায় সাহিত্যিকদের মিলনমঞ্চ। এই মঞ্চের প্রমুখ সংগঠক এবং একটানা পঁচিশ-বর্ষব্যাপী এর সম্পাদক সন্তোষকুমার দের কলমে এই "রবিবাসরে"র কহিনী।

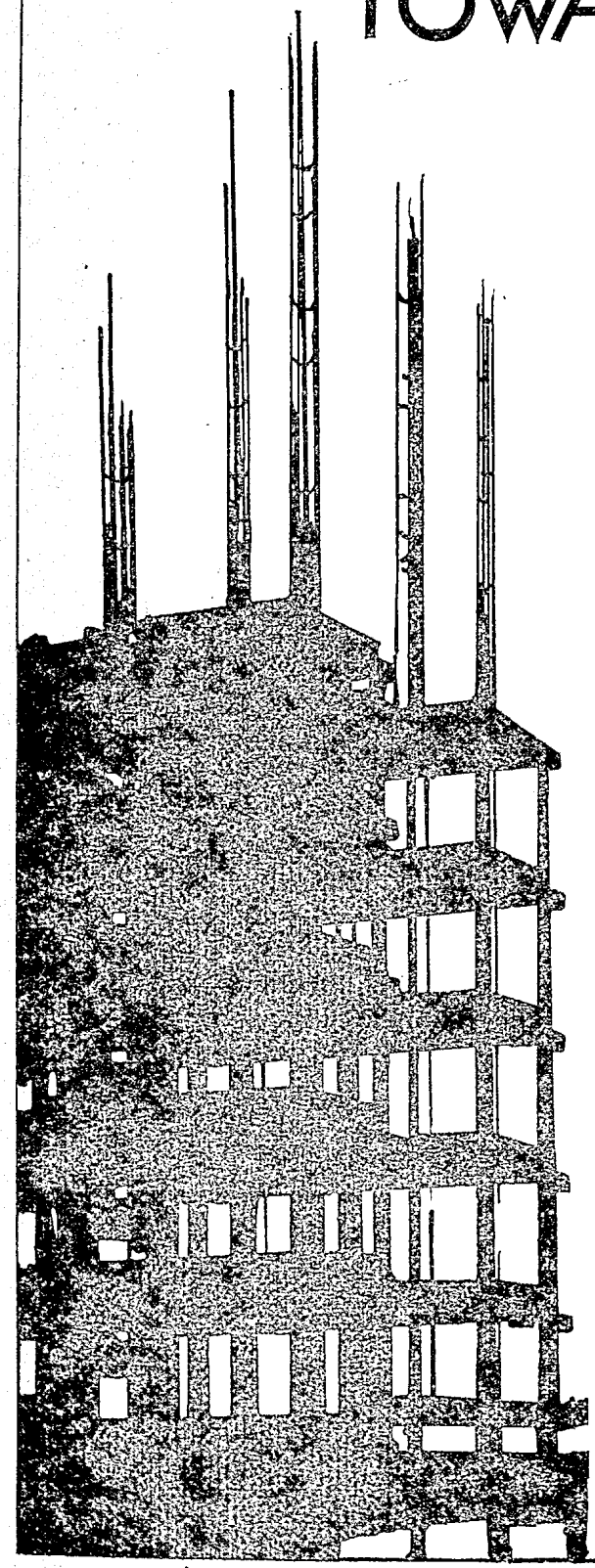
এবারের নাট্যমেলার পর্যালোচনা করেছেন অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়।

With best compliments of :

VAM ORGANIC CHEMICALS LTD

SKYLINE HOUSE
85, Nehru Place
New Delhi-110 019
Phone : 6435922
Teletax : (011) 6435888
Telex : 031-63094 VAM IN
031-62706 VOCL IN
Cable : VARGONIC

TOWARDS A HOME



HDFC

Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) is a financial institution which provides finance to individuals, co-operative societies and companies for new residential housing anywhere in India.

Highlights of the loan

Amount
Between Rs. 7,000 and Rs. 2,50,000 depending on your repayment capacity.

Rate of Interest
Between 12.5% and 14.5% p.a.

Terms of repayment
Repayment in equated monthly instalments with a maximum period of 20 years.

Security
Mortgage of property financed.

HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED

REGISTERED OFFICE:
Bombay
Ramon House, 169, Backbay Reclamation, Bombay 400 020.
Phone: 220265, 220282, 220908, 231054, 231146

BRANCH OFFICE:
Calcutta
Cooke and Kelvey Building, 1st floor, 20, Old Court House Street, Calcutta 700 001.
Phone: 281981, 282146

HOUSING LOANS MADE SIMPLE

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশা হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থ,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা





বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ৯
জানুআরি ১৯৮৯
পৌষ ১৩৯৫

মননশীলতার মন্বন্তর অমলকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৪৫
পরিবার-পরিকল্পনার মানসিকতা অতীন্দ্রমোহন গুণ ৭৫১
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৭৬৩
রবিবাসরের আসরে সন্তোষকুমার দে ৭৮৯
বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৮০১
বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি সুধীর সেন ৮০৭

অনৈসর্গিক বিরাম মুখোপাধ্যায় ৭৫৮
যেখানেই যাই আল মাহমুদ ৭৬০
যে দূরত্বে ইতিহাস শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় ৭৬১
উত্তরাধিকার মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ৭৬২

তিন বোন গুণময় মান্না ৭৭৯

গ্রন্থসমালোচনা ৮২১
রণেন্দ্রনাথ দেব, সমীর মুখোপাধ্যায়, কান্তি গুপ্ত, মৃণাল নাথ

নাটক ৮৩৫
বিবিধের মাঝে মিলন অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মরণে ৮৪৪
রবীন সুর : পরিব্রাজকের প্রস্থান কামাল হোসেন

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

রূপা'র বই

ড. প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা আবৃত্তি সমীক্ষা

তত্ত্ব-তথ্য-প্রয়োগ

[দাম : ৪০.০০]

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী

[দাম : ৪০.০০]

প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

অবনীন্দ্র-চরিতম্

[দাম : ২৫.০০]

বাণভট্ট / প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

হর্ষচরিত

[দাম : ৪০.০০]

কাদম্বরী

[দাম : ৩৫.০০]

দণ্ডী / প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

দশকুমার চরিত

[দাম : ৩০.০০]

কালীপদ সরকার

ইতিহাস-পুরুষ নেতাজী

[দাম : ৩০.০০]

প্রখ্যাত শিল্পী 'চণ্ডী লাহিড়ী'র
কার্টুন সমৃদ্ধ

মজারু মজলিশ-কথা

সম্পাদনা : ডঃ অরুণোদয় ভট্টাচার্য
উপস্থাপনা : দিগম্বর দাশগুপ্ত

[দাম : ৩৫.০০]

'সুশীলকুমার দাশগুপ্ত' পরিবেশিত

বীরবলের গল্প [দাম : ২০.০০]

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট : কলকাতা-৭০০০৭৩

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৬০ টাকা
ষাম্মাসিক ৩২ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির ঊর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথে
ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কর্মীদের চোখে আজ এক নতুন স্বপ্ন—যে স্বপ্ন ইতিমধ্যেই বাস্তবে রূপ নিতে শুরু করেছে।

আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে ডি. এস. পি-তে আসবে সমৃদ্ধি। সর্বাধুনিক কারিগরী-বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে এখানে তৈরী হবে আরো ভালো মানের ইস্পাত। বাড়বে উৎপাদন—ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সমতা রেখে বাড়বে ডি. এস. পি ইস্পাতের যোগান। হবে আরো বেশী লাভ—যার ফলে উপকৃত হবেন ডি. এস. পি-র কর্মীরা ও সেই সঙ্গে দেশের অসংখ্য মানুষ।

আগামী দিনের এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য ডি. এস. পি কারখানার সমস্ত কর্মী আজ অক্লান্ত ভাবে কাজ করে চলেছেন—কারণ, ডি. এস. পি-র সমৃদ্ধি মানেই তাঁদের ও সমগ্র জাতির কল্যাণ।

আজকের শ্রমের পুরস্কার—আগামী দিনের সমৃদ্ধি

স্টীল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা
দুর্গাপুর-৭১৩২০৩

While purchasing Hessian, Sacking, Yearn and Decorative Furnishing Fabrics & other Jute Products, please insist on quality product.

We are always ready to meet the exact type of your requirement.

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.

(*UNIT :* **AUCKLAND JUTE MILLS**)

"KANKARIA ESTATE"
6, Little Russell Street
Calcutta-700 071

Telephones : 29-2621
29-2623
29-7199
29-7698
29-7710

Cable : SWANAUCK, CALCUTTA
Telex : 21-2396 AUCK IN
Codes : BENTLEY'S SECOND

REGISTERED OFFICE & JUTE MILL AT **JAGATDAL**
24-PARGANAS, PHONES : BHATPARA 2757, 2758 & 2038

With best compliments from

BHARTIA SONS LIMITED

12, GOVT. PLACE EAST
CALCUTTA-700069

Phone : 28-1143
28-1374
28-6007

With best compliments of

MINE SAFETY APPLIANCES LIMITED

P-25, TRANSPORT DEPOT ROAD
CALCUTTA-700 088

Phones : 49-1707/45-9773/49-1657/45-6904
Telex : 021-8066 MSAI IN
Cable : MINSAF, Calcutta

শ্রীরানী চন্দ

আমার মা'র বাপের বাড়ি

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরের ধলেশ্বরী পাড়ের এক গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পালাপার্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুখদুঃখ, আনন্দবেদনার সরস কাহিনী একটি বালিকার গভীর পর্যবেক্ষণের সূত্রে বর্ণিত। মূল্য ২০.০০ টাকা

পূর্ণকুম্ভ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা। ১৯৫৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত। মূল্য ২৬.০০ টাকা

হিমাদ্রি

কেদার-বদরী ভ্রমণ-কাহিনী। ভ্রমণসাহিত্যের অপরূপ নিদর্শন। প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যে মনের কথা সাহিত্য হয়ে ফুটে উঠেছে। লেখিকার শিল্পী-মনের অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থটির পাতায়-পাতায়। মূল্য ২৫.০০ টাকা

শ্রীলীলা মজুমদার

অবনীন্দ্রনাথ

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা সাফল্যলাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা আলোচিত হয়েছে। মূল্য ১০.০০ টাকা

শ্রীমলিনা রায়

চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একনিষ্ঠ সেবক, বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচারে রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহকারী বন্ধু চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজের বহু বিচিত্র জীবনের সরস ও সুখপাঠ্য আলেখ্য। মূল্য ১০.০০ টাকা

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আপন মনের মাধুরী মিশায়ে

'ইন্দ্রজিৎ' ছদ্মনামে লেখকের যে-সকল রম্যরচনা এক সময়ে পাঠকদের বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল, তার নির্বাচিত সংকলন। মূল্য ৩০.০০ টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড ; কলিকাতা ১৭
বিক্রয়কেন্দ্র ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

Hindustan Wires Limited

Registered Office ;

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 44-6745 (3 lines) Telegram : WIREFIELD

Factory ;

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of ;

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS ; 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &
MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED
JAPAN

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economical.

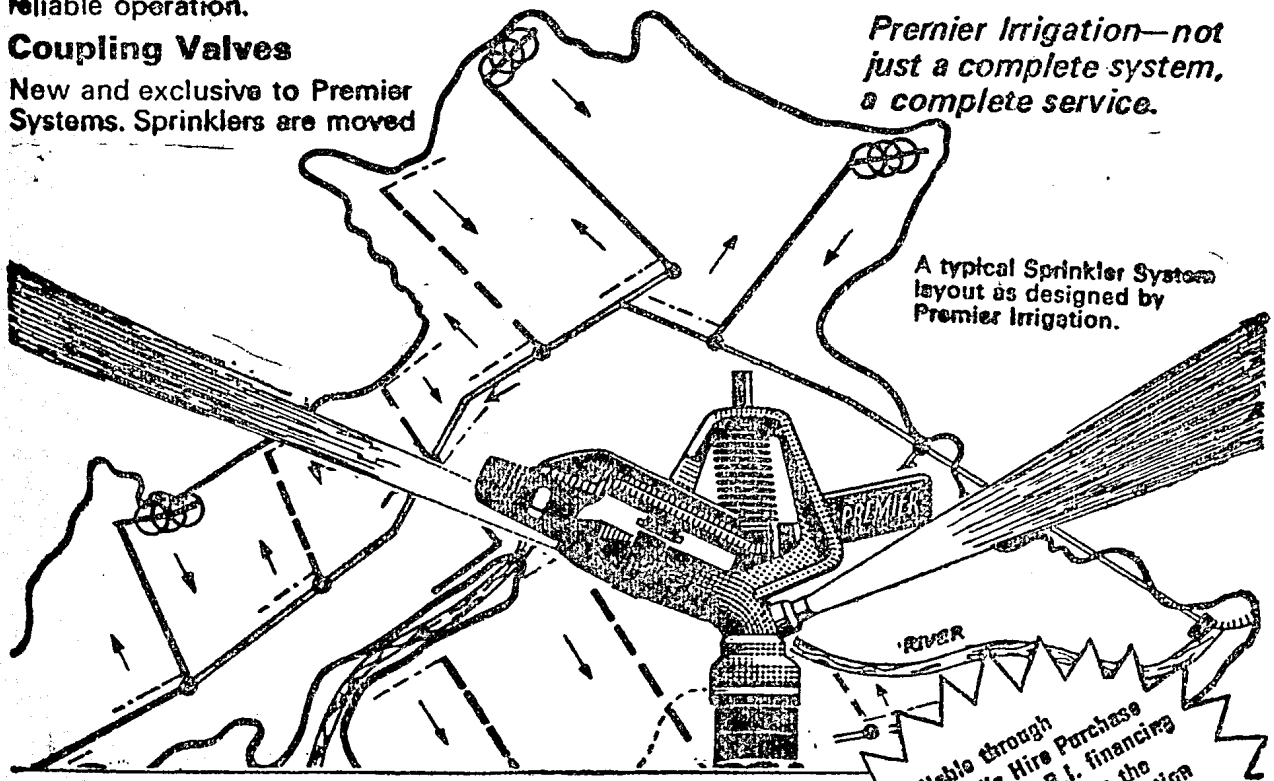
Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Premier Irrigation—not just a complete system, a complete service.



A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities. In addition to the normal annual I.T. depreciation deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302

KCI

IN THE SERVICE OF INDUSTRY & AGRICULTURE

PRODUCT RANGE INCLUDES—

- CAUSTIC SODA (Lye, Solid & Flakes)
- LIQUID CHLORINE
- HYDROCHLORIC ACID
- BENZENE HEXA CHLORIDE (Technical)
- STABLE BLEACHING POWDER
- PENTAERYTHRITOL (Technical & Nitration Grade)
- ACETALDEHYDE
- FORMALDEHYDE (Under construction)
- COTTON & SYNTHETIC BLENDED CLOTH
- COTTON & SYNTHETIC BLENDED YARN

KANORIA CHEMICAL & INDUSTRIES LIMITED

Corporate Office : "Park Plaza"
71 Park Street, Calcutta 700 016

Phone : 29-9472 (PBX)

Telex : 021-4484

• নতুন প্রকাশ •

ডঃ বিমলেন্দু মিত্র

রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আজকের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর আবার নতুন করে ভাববার সময় এসেছে আচার্য প্রযুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক উন্নতির কোন্ পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। ভারতের বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম পথপ্রদর্শক, যুগসন্ধিক্ষণের সামাজিক বিপ্লবের অন্যতম চিন্তাকার, স্বদেশী শিল্প স্থাপন ও বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের পথিকৃৎ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশিষ্ট নেতা, শ্রদ্ধেয় সমাজসেবী মানবদরদী প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনকথা, বৈজ্ঞানিক অবদান ও অন্যান্য বিষয়ের সম্পূর্ণ বিবরণে সমৃদ্ধ এই অনন্য বইটি বিশেষ এক প্রাঞ্জল অথচ সাহিত্যরসপূর্ণ ভাষায় রচনা করেছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সাহিত্যকার বর্তমান লেখক। আশা করি প্রতিটি বাঙ্গালীর ঘরে এই প্রফুল্লজীবনী সাগ্রহে আহৃত ও সমাদৃত হবে।

দাম ॥ ২৫·০০ টাকা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

□ অনীক □

'অনীক' এবছর পঁচিশ বছরে পা দিলো।

১৯৬৪ সালে মূলতঃ একটি বামপন্থী সাংস্কৃতিক পত্রিকা হিসেবে ভিন্ন নামে এর যাত্রা শুরু হলেও, পাঠকবর্গের কাছে 'অনীক'-এর মূল পরিচয় একটি রাজনৈতিক পত্রিকা হিসেবেই। গত পঁচিশ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির যেমন পট-পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বদলেছে 'অনীক'-এর দৃষ্টিকোণও। এই এক প্রজন্মকাল ধরে কোনো দল বা গোষ্ঠীর মুখপত্র না হয়েও 'অনীক' সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে অবিচল থেকেছে, প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে সমকালীন বিপ্লবী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশ হতে, এই প্রক্রিয়াকে তুলে ধরতে। সময় যেমন 'অনীক'-কে বদলেছে, সময়-বদলের সংগ্রামে 'অনীক'-ও তেমনি নিজের দায়িত্ব পালনের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। 'অনীক'-এর বয়োপ্রাপ্তির ইতিহাস তাই সমকালীন বিপ্লবী চিন্তার চলমান দর্পণও বটে।

'অনীক'-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দু'টি বিশেষ সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডটি হবে গত পঁচিশ বছরের বাছাই-করা প্রবন্ধের সংকলন। দ্বিতীয় খণ্ডটি হবে সাংস্কৃতিক ত্রৈমাসিক থেকে রাজনৈতিক মাসিক-এ 'অনীক'-এর রূপান্তর এবং এর মধ্য দিয়ে সমকালীন রাজনীতি প্রসঙ্গে চিন্তাভাবনার বিকাশ ও উত্তরণের স্মারকগ্রন্থ।

দু'টি খণ্ডের মোট দাম হবে ৬০ টাকা।

কিন্তু ৩১শে জানুয়ারী '৮৯-এর মধ্যে ৪০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হলে এই দামেই দু'টি খণ্ড পাওয়া যাবে। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হবে জানুয়ারী মাসে।

'অনীক'-এর প্রধান কার্যালয় (পোঃ খাগড়া । বহরমপুর । মুর্শিদাবাদ জেলা), বা কলকাতা কার্যালয় (১৫০, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট । কলকাতা-৭০০০০৭), কলকাতার পিপলস্ বুক সোসাইটি (১২, বংকিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট । কলকাতা-৭০০০৭৩), বা ভি. পি-তে (৫ টাকা ডাকখরচ দিয়ে) বই সংগ্রহ করা যাবে, এবং সেটা গ্রাহক-চাঁদা পাঠাবার সময় জানিয়ে দিতে হবে।

ডাকযোগে যোগাযোগ ও টাকা পাঠাবার একমাত্র ঠিকানা :

অনীক । ইন্দ্রপ্রস্থ । খাগড়া-৭৪২ ১০৩ । মুর্শিদাবাদ জেলা।

সংসদ প্রকাশিত

ধ্রুপদী রচনাবলী

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত

- বঙ্কিম রচনাবলী ১ম (৪০·০০)
- বঙ্কিম রচনাবলী ২য় (৫০·০০)
- রমেশ রচনাবলী (২৫·০০)

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত

- মধুসূদন রচনাবলী (৩৭·৫০)
- দীনবন্ধু রচনালী (২৫·০০)

ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত

- দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ১ম (৪০·০০)
- দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২য় (৪৫·০০)
- গিরিশ রচনাবলী ১ম (২৫·০০)

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

- গিরিশ রচনাবলী ২য় (৪৫·০০)
- গিরিশ রচনাবলী ৩, ৪, ৫ (যন্ত্রস্থ)

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত

- তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ—তিন খণ্ড (প্রতি খণ্ড ৫০·০০)

ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত

- সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ (১০০·০০)

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত

- বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র (২৫·০০)

সাহিত্য-সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

- রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত (৩০·০০)
- বৈষ্ণব পদাবলী (৭৫·০০)

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

- ঠাকুরবাড়ীর কথা (২৫·০০)
- উপনিষদের দর্শন (২০·০০)
- The Challenge to India (৪৫·০০)

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত

- তে হি নো দিবসাঃ (৪০·০০)
- India Wrests Freedom (৭০·০০)
- Swami Vivekananda and Indian Nationalism (৪৫·০০)
- Keats : From Theory to Poetry (৩০·০০)

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

- তন্ত্রের কথা (১০·০০)
- উপনিষদের কথা (১০·০০)

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

- ভারতের শাক্ত-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য (৩৭·৫০)

অমিতা চক্রবর্তী

- সংস্কৃত নাটকের গল্প (১০·০০)

জন্মের দিনে, অন্নপ্রাশনে উপহার দেবার মত

- আমার শৈশব : শোভন (৪৫·০০)
  সাধারণ (৩০·০০)

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলকাতা-৯

N. J. M. C. SALUTES
THE ARCHITECT OF MODERN
INDUSTRIAL INDIA
PANDIT JAWAHARLAL NEHRU
AND PAYS HOMAGE
ON HIS BIRTH CENTENARY

THIS IS A TIME OF TRIAL AND TESTING FOR ALL OF US AND WE HAVE TO STEEL OURSELVES TO OUR TASK. PERHAPS WE WERE GROWING TOO SOFT AND TAKING THINGS FOR GRANTED BUT FREEDOM CAN NEVER BE TAKEN FOR GRANTED. IT REQUIRES ALWAYS AWARENEES, STRENGTH AND AUSTERITY.

—Pandit Nehru

NATIONAL JUTE MANUFACTURERS CORPORATION LTD.

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

CHARTERED BANK BUILDINGS, 2ND FLOOR
4, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700 001

MANUFACTURERS OF QUALITY CARPET BACKING, HESSIAN, SACKING, FINE JUTE YARN AND SPECIALITY FABRICS.

Telegram : 'ENJAEMCI'

Telex : 7439 CROP IN

Tele. : 20-6127
20-6179
20-4708
20-6128
20-5102
20-6121

MILLS :

NATIONAL, ALEXANDRA, KHARDAH, KINNISON, UNION & R.B.H.M.

মননশীলতার মন্বন্তর

অমলকুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষ মননশীল জীব। বস্তুত, মননশক্তিই তার মনুষ্যত্বের মূল আধার। এই মননশক্তির মাধ্যমেই পরিপার্শ্বের বস্তুজগৎ সম্পর্কিত বিশাল জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার উন্মোচিত হয় মানুষের সামনে। বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়ে মনন তার সঙ্গে যুক্ত করে নিজের নিপুণ সক্রিয়তা, এবং এইভাবে জড় ও চেতনের সম্মিলনে মানুষের অন্তর্লোক সতত উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে জ্ঞানের আলোকে। একইভাবে মানুষের নৈতিক জগতেও মননের সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের ন্যায় ও অন্যায়, ভালো ও মন্দ সম্পর্কিত বিচারবোধের উন্মেষে সমাজের বস্তুগত জীবনব্যবস্থার অবদান যেমন নিতান্ত সামান্য নয়, তেমনই এই বস্তুগত প্রেক্ষাপটে অন্তরে নৈতিক মূল্যবোধের উদ্বোধনে এবং এই মূল্যবোধের প্রতি অবিচল আনুগত্য বজায় রাখার ব্যাপারে মননের ভূমিকাও উপেক্ষণীয় নয়। এই মননশীলতাই নিঃসন্দেহে প্রাণিজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অভিজ্ঞান, এবং মননের এই শক্তিময় ক্রিয়াশীলতা সম্পর্কে নিরন্তর সচেতন থাকা মানুষের পক্ষে বিশেষ জরুরি বলে মনে করেছেন বলেই দার্শনিকদের কেউ-কেউ মানুষকে চিহ্নিত করেছেন এক আত্মসচেতন প্রাণী-রূপে। এই দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আরও মেনে নিতে হয় যে, স্বাধীনতার সম্ভাব্যতা নিহিত এই আত্মসচেতনতার মধ্যে। কারণ মানুষ আত্মসচেতন বলেই সে প্রকৃতিজগতের বিপুল প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সংগ্রামে সাহসী হয় এবং নিজের মননশক্তির আঘাতে একের পর এক এই প্রতিবন্ধকতাকে পরাভূত করে প্রশস্ত করে নিজের বিজয়ের, স্বাতন্ত্র্যের ও স্বাধীনতার পথ।

আত্মসচেতন প্রাণী-রূপে মানুষের এই ভাবমূর্তি দর্শনতত্ত্বের জগতে বারে-বারে উজ্জ্বল মহিমায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেও প্রশ্ন ওঠে যে, ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে তা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে কীভাবে। অর্থাৎ, মানুষ অসামান্য মনন-শক্তির অধিকারী হওয়ার যোগ্য—সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অনিবার্যভাবে যে প্রশ্ন দেখা দেয় তা হল এই যে, কোন্ প্রক্রিয়ায় এবং কী-কী উপাদানের সহায়তায় একজন ব্যক্তির জীবনে তার মননশক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে। প্রশ্নটি অবশ্যই তুচ্ছ ও অপ্রাসঙ্গিক নয়, কারণ যে সত্য ব্যক্তির নিত্য-দিনের জীবনে রূপায়িত করা যায় না, সে সত্য বিমূর্ত দার্শনিকতত্ত্বের সীমানায় আবদ্ধ এক অধরা সত্য, যার কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা বা মূল্য নেই। আবার দর্শননিরপেক্ষ পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষের মননশীলতা-বিকাশের প্রশ্নটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ আধুনিক কালের প্রবল-বেগসম্পন্ন যান্ত্রিক জীবন-ধারার কল্যাণে আমরা সর্বত্রই যে উদ্বেগজনক অবস্থার সম্মুখীন তা হল এই যে,

প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিরই আচারে, আচরণে ও কর্ম-প্রকরণে মননশীলতার অবক্ষয় ক্রমবর্ধমান। এই কারণেই, অন্তত আমাদের দেশে, বৃহত্তর সমাজজীবন আজ গতানুগতিকতার অচলায়তনে আবদ্ধ; সেখানে আজ আর নিত্য-নতুন ভাবধারার আবির্ভাব দেখা যায় না, একটা নির্বোধ গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসাতেই সকলে ব্যস্ত। ফলত, আমাদের শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পে ও সাহিত্যে এখন পরিলক্ষিত হয় দুর্ভাগ্যজনক এক সৃষ্টিশীলতার সঙ্কট। এ যুগ যান্ত্রিক গতির যুগ, কিন্তু উদ্ভাবনী প্রগতির নয়।

মনে রাখতে হবে যে, মননহীনতা মানুষের স্বাভাবিক লক্ষণ নয়। অর্থাৎ, যে-কোনো সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষই মননের বৈশিষ্ট্যে ভূষিত, কিন্তু মননের নিছক অস্তিত্ব মানুষকে আপনা-আপনি মননশীল করে তোলে না। মানুষ মননশীল-রূপে স্বীকৃতি লাভ করে তখন, যখন তার জাগ্রত মননশক্তি সৃজনমূলক ও শুভ কর্মের মধ্য দিয়ে নিজের স্থায়ী পরিচয় রেখে যায়। মননশক্তির এই উজ্জীবন এক সচেতন ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যাকে সচল রাখার জন্য একদিকে যেমন চাই মানুষের পক্ষ থেকে সক্রিয় উদ্যোগ, অন্যদিকে তেমনই চাই অনুকূল বিষয়গত অবস্থা। এ বিষয়ে মানুষের সক্রিয় উদ্যোগের মূল ভিত্তি হল তার স্বাতন্ত্র্যবোধ। অর্থাৎ, মানুষ এক অনন্য প্রাণী; প্রাণিজগৎ ও বস্তুজগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও সে অন্য সব-কিছু থেকে পৃথক, বিশ্বচরাচরে তার অস্তিত্ব অবিরাম ও অভাবনীয় সৃষ্টির সূচক—এই প্রত্যয়ে নিরন্তর অনুপ্রাণিত হতে না পারলে মানুষের পক্ষে তার নিজের মননশক্তির বিকাশে উদ্যোগী হওয়া কখনই সম্ভব নয়। প্রকৃতি-জগতের সুবিশাল পটভূমিতে নিজের সুদৃঢ় ও অপরিবর্তিত অবস্থান সম্পর্কে মানুষ নিঃসংশয় হতে পারে এই স্বাতন্ত্র্যবোধের সাযুজ্যে; যার ফলে প্রবুদ্ধ হয় তার আত্মবিশ্বাস, এবং এই আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃপ্রণোদিত হয় নব-নব সৃষ্টির উদ্যোগে ও উদ্ভাবনে। যেহেতু প্রতিটি সৃষ্টি ও উদ্ভাবনই সম্ভব হয় মূলত মননের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণে, সে কারণে যতই এই সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়, ততই সুনিশ্চিত হয় মানুষের মননশীলতার অগ্রগতি।

তবে মানুষের মননশীলতার বিকাশ এক দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় প্রক্রিয়া যার পিছনে মানুষের পারিপার্শ্বিক বহির্জগতের অবদানও উপেক্ষণীয় নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মননের সক্রিয়তা প্রধানত দুই ধরনের। এক ধরনের সক্রিয়তা তাৎক্ষণিক, যা নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যার মধ্যে ফল-প্রসবের আকুতি অনুপস্থিত এবং যার অনেকটাই বিশৃঙ্খল ও অযৌক্তিক। এই ধরনের সক্রিয়তা দেখা দেয় সাধারণত আবেগের আঘাতে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-সুখ, প্রত্যাশা ও ব্যর্থতা-বোধের পরিপ্রেক্ষিতে মনোজগৎ স্বভাবতই তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সক্রিয়তা সাময়িক স্পন্দনমাত্র, ইতিবাচক কর্মোদ্যোগের প্রেরণা দেওয়ার মতো শক্তি যার নেই। অবশ্য এরই পাশাপাশি মননের আর-এক ধরনের সক্রিয়তা আছে যা যুক্তিগামী, স্থির লক্ষ্যাভি-মুখী ও সৃষ্টিশীল। এই সৃষ্টিশীল সক্রিয়তাই মানুষকে মননশীল করে তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সক্রিয়তা জন্ম নেয় জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল থেকে, রহস্যভেদের আকর্ষণ থেকে, অন্বেষণের দুর্বার ইচ্ছা থেকে। মানুষের এই জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল এবং অন্বেষণের প্রয়াস দেখা দেয় মূলত মননের বাইরের জগৎকে কেন্দ্র করে। পরিপার্শ্বের প্রকৃতিজগৎ তার বিপুল সামগ্রী-সম্ভার নিয়ে মানুষকে সততই উৎসাহিত করে অনুসন্ধানের নানা রোমাঞ্চকর অভিযানে। একই সঙ্গে এই প্রকৃতি তার প্রবল শক্তি নিয়ে মানুষের সামনে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর নির্মাণ করে আঘাত হানে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও শক্তির অহমিকায়। যতই এই আঘাত আসে ততই মনন সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রতিকূলতা অপসারণের

প্রতিজ্ঞায়, এবং এই আঘাত ও প্রত্যাঘাতের মিথ-ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে মননশক্তি। অর্থাৎ, বিরোধী বহির্জগৎই মননশক্তি উজ্জীবনের সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ। অন্যভাবে বলা যায় যে, মানুষের মননশীলতা পরিণত হয়ে ওঠে দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়ে, কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। মনে রাখতে হবে যে, এ সংগ্রামের কোনো শেষ নেই। কারণ, মানুষ তার মননশক্তিতে সজ্জিত হয়ে প্রকৃতির এক দুস্তর বাধা অতিক্রম করার সঙ্গে-সঙ্গে প্রকৃতি তার সামনে তুলে ধরে আর-এক নতুন প্রতিকূলতা। এই কারণেই মননের সক্রিয়তায় কোনো অন্তিমতা নেই, যেহেতু তাকে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকতে হয় প্রতিকূলতার মোকাবিলায়। উল্লেখ্য যে, এ সংগ্রাম নিছক ধ্বংসাত্মক সংগ্রাম নয়, সঠিক বিচারে এ সংগ্রাম নিঃসন্দেহে সৃষ্টির সংগ্রাম। অর্থাৎ, মানুষ তার মননশক্তি প্রয়োগ করে শুধুমাত্র প্রকৃতি-নির্মিত বাধাই অপসারিত করে না, একই সঙ্গে সে প্রকৃতিজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে এই প্রতিকূলতার পুনরুত্থানরোধে সচেষ্ট হয়। এই কারণেই মননশক্তি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় যে ফল পাওয়া যায়, তা কখনও অশুভ বা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হতে পারে না। একমাত্র মননশক্তির অপব্যবহার ঘটলেই পরিণাম অশুভ হয়ে ওঠে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মননশক্তি মানুষের একান্ত নিজস্ব হলেও এই শক্তির বিকাশে, সক্রিয়তায় বস্তুজগতের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। অতএব বস্তুজগৎকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ, তথাকথিত বস্তু-বিমুখ নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে মানুষ মননশীল হয়ে উঠতে পারে না। একইভাবে মননশক্তির বিকাশে সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কারণ একজন ব্যক্তির মননশক্তির সাফল্য ও সদর্থকতা সচরাচর নিরূপিত হয়ে থাকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত আরও পাঁচজনের ক্রিয়াশীল মননের কষ্টিপাথরে। অর্থাৎ, একজন মানুষ তার নিজের বিচারের মানদণ্ড প্রয়োগ করে নিজেকে মননশীল-রূপে দাবি করতে পারে না; স্বাভাবিকভাবেই এই মননশীলতার মাত্রা নির্ধারিত হয় অন্যের মূল্যায়ন ও মুক্ত স্বীকৃতির মাধ্যমে। আবার একজনের মননশক্তি সততই সঞ্চারিত হয় অন্যের মননে, এক ব্যক্তির উন্নত মননশীলতা অনুপ্রাণিত করে সমাজের শত-সহস্র ব্যক্তিকে। অন্যদিকে সমাজের অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠীর ধারণা-ভাবনা, আদর্শগত আনুকূল্য অথবা বিরোধিতাও ব্যক্তির মননকে নতুন পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা যোগায়, যার পরিণামে সমাজে নতুন চিন্তা ও আদর্শের উদ্ভব ঘটে।

মননশক্তির বিকাশ বস্তুজগতের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মননের সৃজনশীল সক্রিয়তায় কল্পনার কোনো ভূমিকা নেই। বস্তুত, কল্পনাশক্তি মননের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এবং এই কল্পনাশক্তি মননশীলতার এক মৌল উপাদান। অবশ্য যে কল্পনা মানুষকে জড়তায় আচ্ছন্ন করে হতোদ্যম ও গতিহীন করে তোলে, সে কল্পনা প্রকৃতার্থে নিষ্ক্রিয় ও নিরর্থক, এবং তার সঙ্গে মননশীলতার কোনো সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে বস্তুকে আত্মস্থ করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় তার সঙ্গে মেশায় আপন মনের মাধুরী অথবা মহৎ সৃষ্টির উল্লাসে মনন অনেক সময় অতিক্রম করে যায় বস্তুর সীমারেখা। এইভাবে জন্ম নেয় যে কল্পনা, তা মানুষকে স্বভাবতই নিয়ে চলে নতুন জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণের পথে, অনুপ্রাণিত করে নবতর সৃষ্টির প্রতিজ্ঞা ও উদ্যোগে। এরূপ ক্ষেত্রে কল্পনা স্পষ্টতই মননশীলতার সহায়ক শক্তি।

দুই

ওপরের আলোচনা থেকে যে জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে, দেশ-কালনির্বিশেষে মানুষ মননশীল প্রাণী-রূপে স্বীকৃতি লাভ করলেও ব্যবহারিক জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিই মননশীল নয়। কারণ বিনা প্রয়াসে এবং অনুকূল শর্তাদি পালিত না হলে একজন মানুষ

মননশীল হয়ে উঠতে পারে না। এই মননশীলতা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকা দরকার। যেমন, আমরা দেখেছি যে, মানুষের মননশীল হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল তার প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ। দ্বিতীয়ত, তাকে হতে হবে আত্মপ্রত্যয়ী ও যুক্তিনিষ্ঠ, জিজ্ঞাসু ও কৌতূহলী। তৃতীয়ত, মনন-শক্তির উদ্ভাসে প্রকৃতিজগৎ ও সামাজিক সম্পর্কের অবদান উপলব্ধি করার মতো চেতনা তার থাকা দরকার। তার আরও থাকা চাই সমস্ত জাগতিক প্রতিকূলতা মোকাবিলা করার মতো সংগ্রামী মানসিকতা এবং সৃষ্টিশীল কর্মে অনুপ্রাণিত হওয়ার উপযুক্ত কল্পনাশক্তি।

সব দেশে এবং সব কালে শিক্ষা মানুষ তৈরির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম-রূপে স্বীকৃত হয়েছে। কাজেই বাস্তব জীবনে মননশীল হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির যে ধরনের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠা দরকার একমাত্র শিক্ষাই তার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে শুধুমাত্র প্রথাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। সব দেশেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াও অনানুষ্ঠানিক স্তরে যে শিক্ষা চলে একজন ব্যক্তির সমস্ত জীবন জুড়ে, যে শিক্ষার মাধ্যম হল একদিকে পরিবার অন্যদিকে সমাজের প্রচলিত শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারা—সেই পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার অবদানও নিতান্ত সামান্য নয়। তবে এ বিষয়ে সুফল পেতে হলে সব ধরনের শিক্ষার মধ্যেই যথোপযুক্ত আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি সচেতন আনুগত্য থাকা নিতান্ত প্রয়োজন।

যে স্বাতন্ত্র্যবোধ মানুষের মননশীলতায় উত্তরণের প্রাথমিক সোপান, তা প্রকৃতপক্ষে নিজের মনুষ্যত্বের অপরিসীম মূল্য সম্পর্কে মানুষের অবিচল উপলব্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় যদি মনুষ্যত্বের মহৎ আদর্শ বারে-বারে ঘোষিত না হয়, যদি যান্ত্রিক শিক্ষার নিগড়ে আবদ্ধ শিক্ষার্থী তার মনুষ্যজীবনের উৎকর্ষ অনুভব করে ধন্য বোধ করার অবকাশ না পায়, তাহলে প্রাপ্ত শিক্ষার সহায়তায় তার ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু তার মনের অন্ধকার দূর হবে না এবং এমতাবস্থায় তার আত্মচেতনার গতি রুদ্ধ হবে। আবার এই আত্ম-চেতনার অভাবে অনিবার্যভাবেই ব্যাহত হবে তার আত্মবিশ্বাস, যা মানুষকে সাহসী করে, সংগ্রামী করে এবং উদ্‌বুদ্ধ করে যাবতীয় প্রতিকূলতাকে পরাভূত করে বিজয়গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষায়। আবার প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় এবং সেইসঙ্গে পারিবারিক জীবনচর্যাতেও কোনো-না-কোনো ভাবে বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহার জাগরণ অন্যতম লক্ষ্য হওয়া দরকার। কারণ এই জ্ঞান-পিপাসাই মানুষকে গতানুগতিকতার অবসাদ থেকে মুক্ত করে তাকে জিজ্ঞাসু করে, কৌতূহলী করে এবং প্রবৃত্ত করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অনুসন্ধানে। কাজেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা যদি নিছক রুটিনসর্বস্ব হয়, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রবক্তারা যদি সমাজজীবনে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে তথা-কথিত বিনোদনের লক্ষ্য অনুসরণ করেন এবং পরিবার-গুলি যদি জ্ঞানসঞ্চয়ের মহত্তর আদর্শ বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র বস্তুগত স্বার্থের পিছনে ধাবিত হয়, তাহলে এইসব উৎস থেকে লব্ধ শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিমানুষ বিনা প্রশ্নে তার পরিপার্শ্বকে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করে না। এই আপোস ও আত্মসমর্পণে অভ্যস্ত মানুষ স্বভাবতই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে পরিচয় দেয় তার সংগ্রামবিমুখতার।

আরও উল্লেখ্য যে, আদর্শ শিক্ষা মানুষের মনের সংকীর্ণতা দূর করে তাকে উদার করে তোলে। মনন-শক্তির জাগরণে এই উদারতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, একদিকে বিশাল প্রকৃতিজগৎ এবং অন্যদিকে ব্যাপক সমাজজীবন—এই দুইয়ের সঙ্গে নিবিড়, দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনের নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর ও বহুমুখী কর্ম-

ধারায় যুক্ত হতে না পারলে মননের ক্রিয়াপরিধি প্রসারিত হয় না। অর্থাৎ, কবির ভাষায়, 'আত্মমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনও শেখে নি বাঁচিতে।' যথার্থ শিক্ষাই পারে মানুষকে এই আত্মমগ্নতার বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে বিশ্বজনীন ও সমাজমনস্ক অনুভূতির উদারতায় অভিষিক্ত করতে, এবং মননের এই মুক্ত ও উদার প্রেক্ষাপটেই চলে মানুষের বিশ্বলোক ও সমাজজীবন সম্পর্কিত অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—যার মধ্য দিয়ে স্বভাবতই উজ্জীবিত হয় তার কল্পনাশক্তি ও সংগ্রামী মানসিকতা।

তিন

এই আলোচনার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তটি অনিবার্য হয়ে ওঠে তা হল এই যে, আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে সমাজজীবনের সর্বস্তরে যে মননশীলতার সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার মূলে রয়েছে আমাদের চরম ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষা নিয়ে আমাদের দেশে আলোচনা, সমালোচনা ও পরিকল্পনা নিতান্ত কম হয় নি এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে অনেক পদক্ষেপই দেখা গেছে গত একচল্লিশ বছরে। কিন্তু শিক্ষাকে মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধনের যথোপযুক্ত মাধ্যম রূপে ব্যবহার করতে আমরা আদৌ শিখি নি। আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষায় এবং স্কুল - কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিণামে ও বস্তুগত স্বার্থের প্রাবল্যে চিত্ত ও মননের সুষ্ঠু বিকাশের বিষয়টি নিদারুণভাবে উপেক্ষিত। এই কারণেই এদেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই যথার্থ যুক্তিবাদী ও তীক্ষ্ণ-মননসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে পারেন না, এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সততই পরিলক্ষিত হয় মননশীলতার মন্বন্তর।

ব্যক্তিজীবনে পারিবারিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পরিবারে প্রচলিত আচার, আচরণ ও অভ্যাসের প্রভাবে পরিবারস্থ তরুণ সদস্যদের যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে, বাকি জীবনের বহুমুখী সামাজিকীকরণ-প্রক্রিয়ার সচলতা সত্ত্বেও তা কতকাংশে অপরিবর্তিত থাকে সারা জীবন ধরে। কাজেই, পারিবারিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে যদি নিরন্তর মনুষ্যত্বের মহদাদর্শে যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়, তাহলে জীবনের প্রাথমিক পর্বেই একজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্দীপ্ত হওয়ার সুযোগ পায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান পারিবারিক শিক্ষায় মনুষ্যত্ব উন্মেষের এই জরুরি প্রশ্নে কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অধিকাংশ পরিবারেই যাঁরা প্রবীণ ও নিয়ন্তা তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল যে-কোনো উপায়ে বস্তুগত স্বার্থসিদ্ধি এবং জাগতিক সাফল্য লাভ। এই লক্ষ্যপূরণের প্রমত্ত নেশায় স্বাভাবিকভাবেই বিসর্জিত হয় মহৎ মনুষ্যত্ববোধ এবং নীচতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতার ভিড়ে ভূলুণ্ঠিত হয় যাবতীয় মানবিক সদ্‌গুণ। এই অবস্থায় পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে তরুণেরা যে শিক্ষা পায় তা তাদেরও আকৃষ্ট করে নিছক বিষয়সুখে, যার ফলে উদার মনুষ্যত্বে সঞ্জীবিত হওয়ার কোনো প্রেরণাই তারা পায় না পরিবারের জীবনধারা থেকে। এইভাবে আমাদের পারিবারিক শিক্ষা একজন ব্যক্তির জীবনের শুরুতেই তার মননের সুস্থ বিকাশে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

আমাদের সমাজে যাঁরা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, অর্থাৎ, যাঁরা লোকশিক্ষার স্বীকৃত কাণ্ডারী, তাঁদের ভূমিকাও এ ব্যাপারে খুবই হতাশাজনক। এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ আত্মমুখী শিল্পসর্বস্বতায় বিশ্বাসী, যার ফলে লোকশিক্ষার সামাজিক দায়িত্ব ও অঙ্গীকার সম্পর্কে এঁরা আদৌ সচেতন নন। এ ছাড়া শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি এখন স্পষ্টতই পর্যবসিত হয়েছে ব্যবসায়ের সামগ্রীতে। আজকের একজন লেখক বা শিল্পী যতটা আগ্রহী তাঁর নিজের সৃষ্ট শিল্পকর্মের বহুল বিপণনে, ঠিক ততটাই তিনি উদাসীন সমাজকল্যাণের বৃহত্তর দায়িত্ব সম্পর্কে।

সাধারণত, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সমাজে যথার্থ মননসম্পন্ন, আত্মসচেতন মানুষ গড়ে তোলার কাজ তিনি নিজের এক্তিয়ার-বহির্ভূত বলে মনে করে থাকেন। সহজতম উপায়ে জনচিত্তের বিনোদন এবং বিনিময়ে প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও অর্থ লাভ —এই হল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হল এই যে, আমাদের সামাজিক শিক্ষা এখন অন্তঃসারশূন্য যা মানুষের প্রবৃত্তি ও আবেগকে আন্দোলিত করতে পারে কিন্তু তার মননে সৃষ্টিশীল সক্রিয়তার ঝড় তুলতে পারে না।

তবে সবচেয়ে মারাত্মক গলদ লক্ষ করা যায় আমাদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায়। আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যে শিক্ষা- ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তা এমনই আদর্শহীন, উদ্দেশ্যহীন এবং প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন যে, শিক্ষার্থীর মননশক্তির বিকাশে কার্যত তার কোনো অবদান নেই। বস্তুত, মননশক্তি ও মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধনই যে শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য—এই কথাটা শিক্ষার্থীর কাছে বারে-বারে পৌঁছে দিয়ে তদনুযায়ী তার চরিত্রগঠনের কোনো প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয় না আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা এমনই আনন্দহীন ও আঙ্গিকসর্বস্ব যে শিক্ষার্থীর কাছে তা এক বিভীষিকা। এই ভয়ের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হওয়ার ফলে শিশুদের সরল ও সুকুমার চিত্তবৃত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ব্যাহত হয় তাদের স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণতা যার ফলে শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্বেই তাদের বুদ্ধি ও মন আক্রান্ত হয় জড়তায়। অন্যদিকে আমাদের উচ্চশিক্ষা এখন মূলত কেরিয়ারকেন্দ্রিক যা শিক্ষার্থীর কৃৎকৌশলগত দক্ষতা অর্জনের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু মানবিক সদ্‌গুণ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে যার কোনো ভূমিকা নেই। শিক্ষার প্রত্যক্ষ দায়িত্বে আছেন যে শিক্ষককুল, তাঁরাও এ ব্যাপারে নিরুদ্বিগ্ন থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেন। তাই দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম ও সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন-রীতি এমনভাবে প্রণীত যে কিছু তত্ত্ব ও তথ্য মুখস্থ করতে পারলেই এবং লিখিত প্রশ্নোত্তরকালে সেগুলি সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করতে পারলেই একজন বিদ্যার্থী সাফল্যের তকমা লাভ করতে পারেন। এই-ভাবে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে বেরিয়ে আসছেন হাজার-হাজার ডিগ্রিধারী ভ্রান্ত শিক্ষার প্রভাবে, যাঁদের চিন্তাস্রোত গতিহীন, যাঁদের কল্পনা-শক্তি ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা অতীব ক্ষীণ এবং বন্ধ্যা মননশীলতার কারণে যাঁরা সৃষ্টিশীল সংগ্রামে বিমুখ।

আমাদের সমাজে আজকের তরুণ প্রজন্মের আলস্য ও উদ্যোগহীনতা, ভীরুতা ও সংগ্রামবিমুখতা সম্পর্কে প্রবীণ প্রজন্ম অনেক সময় আক্ষেপ করে থাকেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এর জন্য তরুণেরা প্রকৃতপক্ষে দায়ী নন। আজকের তরুণ সম্প্রদায়ের প্রকৃতি ও চরিত্রে যেসব দুর্লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে, যথার্থ মননশীলতার অভাবই সেগুলির অন্যতম কারণ এবং মননের এই দুর্বলতার জন্য দায়ী আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাকে মনন ও মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম মাধ্যমরূপে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পুনর্বিন্যাসে উদ্যোগী না হলে মননশীল মানুষের অভাবে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে একদিন অচলাবস্থা দেখা দেবে, এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

বাংলাদেশের খুলনা সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মেহেরুন্‌নেসা মহুয়ার এক জিজ্ঞাসার উত্তরেই বর্তমান নিবন্ধ রচিত হয়েছে। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই।
—লেখক

পরিবার-পরিকল্পনার মানসিকতা

অতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

এক

১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেন, 'আমরা যেখানে বর্তমান জনগোষ্ঠীর জন্যই খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছি না, দারিদ্র্য, অনশন ও ব্যাধিতে যেখানে সারা দেশ বিপন্ন, সেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস চালিয়ে যেতেই হবে।'[১] এর অল্পদিন পরই কংগ্রেসের উদ্যোগে পণ্ডিত জওহরলালের নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হল। ১৯৪০-এর মে মাসে পরিকল্পনা কমিটির কাছে জনসংখ্যা-সংক্রান্ত সাব-কমিটি যে-প্রতিবেদন পেশ করলেন তার আলোচনাশেষে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর মধ্যে দুটি প্রস্তাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

[এক] 'আমরা এ-ব্যাপারে একমত যে জাতীয় আর্থনীতিক পরিকল্পনার প্রশ্নে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর আয়তন একটি মৌল বিষয়। কারণ জীবনধারণের উপায়গুলির সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে একে অবাধে বাড়তে দিলে জীবনমানের অবনতি ঘটবে এবং এর ফলে বহু সামাজিক ও উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাও বিঘ্নিত হবে।'

[দুই] 'সামাজিক অর্থনীতি, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও জাতীয় পরিকল্পনার স্বার্থে পরিবার-পরিকল্পনা ও সন্তানসংখ্যা সীমিত রাখা অত্যাবশ্যক, এবং রাষ্ট্রের উচিত এসব ব্যাপারে উৎসাহদানের নীতি গ্রহণ করা……।'[২]

দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর আর্থনীতিক যোজনা কর্মসূচীর রূপায়ণ আরম্ভ হলে প্রথম থেকেই সে-কর্মসূচীতে পরিবার-পরিকল্পনা একটি মুখ্য স্থান পেয়েছে। আর এ-গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বস্তুত, প্রথম যোজনায় (১৯৫১-৫৬) পরিবার-পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা, আর সমকালীন সপ্তম যোজনায় (১৯৮৪-৮৯) বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৬,৪০০ কোটি টাকা।

মনে রাখতে হবে যে, ভারতের মতো দেশে জনাধিক্য জাতীয় সমস্যা হলেও সভ্যসমাজে এ-সমস্যার সমাধান খুঁজতে হয় ব্যক্তিক স্তরে, পারিবারিক স্তরে। অর্থাৎ, যেহেতু বেশ কিছু মানুষকে মেরে ফেলে বা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজা সভ্যসমাজের রীতিনীতির পরিপন্থী হবে, তাই প্রতি দম্পতিকে পরিবারের আয়তন সীমিত রাখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়োজন হয়। আর দম্পতিদের জাতিগত লাভ-লোকসানের কথা বললে কাজ হয় না, তাদের বলতে হয় তাদের নিজস্ব লাভ-ক্ষতির কথা। পরিবারের আয়তন বড়ো হলে কী ক্ষতি বা অসুবিধা হতে পারে, আর সন্তানসংখ্যা অল্প হলে কী লাভ বা সুবিধা—এটাই তাদের বুঝিয়ে বলতে হয়। জাতির আর্থনীতিক বিকাশের পথে বিরাট জনসংখ্যা এবং তার উচ্চ-বৃদ্ধিহার বড়ো অন্তরায়, জনাধিক্য পরিবেশদূষণের সমস্যাকে জটিলতর করে তোলে, প্রাকৃতিক সম্পদের বিনাশ ত্বরান্বিত করে—এসব কথা সাধারণ ভারতবাসীকে বলার অর্থ হয় না। বরং তাদের বলতে হয়, পরিবার-পরিকল্পনার—অর্থাৎ অল্পসংখ্যায় সন্তানোৎপাদন এবং পর-পর দুবার সন্তানধারণের মধ্যবর্তী সময়কে দীর্ঘায়িত করার—ফলে তাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক দিক থেকে কী মঙ্গল সাধিত হবে।

তাই জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ অভিযানে বলা হচ্ছে 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার।' বলা হচ্ছে, পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সন্তান-সংখ্যা যথাসম্ভব অল্প রাখতে হবে (বলা হচ্ছে 'হাম দো, হামারা দো'—এটাই প্রকৃষ্ট নীতি)। একই কারণে জননীর স্বাস্থ্যের খাতিরেও পর-পর দুটি সন্তান-ধারণের মধ্যবর্তী সময়কে যথেষ্ট দীর্ঘ রাখা সমীচীন —এ-কথাটাও জনসাধারণকে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

প্রচারের কাজে বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, যাত্রা আর পুতুলনাচের—এমন-কী রাস্তাঘাটে, যান-বাহনে সুদৃশ্য বিজ্ঞাপনের—সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিবার-পরিকল্পনা নিয়ে পরামর্শ-দানের ব্যবস্থা হয়েছে। দেশের গ্রামগুলিতে পরামর্শ-দানের কাজে গ্রামসেবক ও গ্রামসেবিকাদেরও নিয়োগ করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে পরিবার-পরিকল্পনার নানা সরনজাম —যেমন, 'কনডম', 'লুপ', 'পিল'—প্রায় বিনামূল্যে আগ্রহী দম্পতিদের সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়েছে। নির্বীজকরণ ও বন্ধ্যাকরণের ব্যবস্থা এখন শুধু সহজ-লভ্যই নয়, এখন অস্ত্রোপচারে যে পুরুষ বা মহিলা সম্মত হবেন তাঁকে খানিকটা আর্থিক পুরস্কারদানেরও সংস্থান রাখা হয়েছে। একবার ভ্রূণসঞ্চার হয়ে গেলে গর্ভনিষ্কাশনের মধ্য দিয়ে সন্তানজন্ম পরিহারের সুযোগ সহজলভ্য হয়েছে। ১৯৭১ সালে 'মেডিক্যাল টার্মিনেশন অব প্রেগন্যান্সি অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে গর্ভনিষ্কাশনের জন্যে হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে প্রাণসংশয় ঘটানোর আর প্রয়োজন হয় না। হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানেই এখন গর্ভনিষ্কাশন ঘটানো যেতে পারে।

দুই

পরিবার-পরিকল্পনা নিয়ে জোর প্রচারাভিযান এবং সাজসরনজাম সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমাদের সার্বিক সাফল্য খুব চমকপ্রদ, এমন বলা ঠিক হবে না। বস্তুত, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপিনস প্রভৃতি দেশের সরকার পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী রূপায়ণে উদ্যোগী হন এ-দেশের প্রায় এক দশক পরে। কিন্তু তাঁরা ইতমধ্যে যোগ্য দম্পতিদের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগকে কর্মসূচীর ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে এসেছেন। আমাদের দেশে কিন্তু এ-অনুপাত ১৯৮৮ সালের হিসেবেও শতকরা মাত্র ৩৫-এর মতো। তাই আমাদের

অভিযান আরও জোরদার করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সরকারি হিসেবে অবশ্য বলা হয়েছে যে, কর্মসূচীর কল্যাণে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ শিশুর জন্ম রোধ করা সম্ভব হয়েছে। (অর্থাৎ পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী না থাকলে জনাধিক্যের সমস্যা এখন যেমন রয়েছে তার চেয়েও জটিলতর রূপ নিত।) কিন্তু আমাদের জনসংখ্যার শতকরা বার্ষিক বৃদ্ধিহার এখনও ২·১ বা ২·২। এ-হার পৃথিবীর যে-কোনো প্রাগ্রসর দেশের তুলনায় তো বটেই, এমন-কী চীনের তুলনায়ও অনেক ঊর্ধ্বে। (১৯৮৩-৮৪ সালে এ-হার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল ০·৭, সোভিয়েত ইউনিয়নে ০·৯, ব্রিটেনে ০·০, জাপানে ০·৭, ফ্রান্সে ০·৪, পশ্চিম জার্মানিতে —০·২ এবং চীনে ১·১। আর ভারতের মোট জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৮০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ফলে, ভারত যদিও এখন পৃথিবীর জনবহুল দেশ হিসেবে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, একুশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ এ-দেশ প্রথম স্থানে চলে যাবে—এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর কারণ কী?

কারণ হল কর্মসূচীর সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে পরিবার-পরিকল্পনা সংক্রান্ত জ্ঞান ও সাজসরনজাম প্রয়োগের অনুকূল মানসিকতার উপর। এমন মানসিকতা সাধারণভাবে আমাদের সমাজে সঞ্চার করা—অন্তত পক্ষে সমাজের বৃহত্তর অংশে সঞ্চার করা—এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি।

বলা যায়, ভারতীয় সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত মানুষ পরিবার-পরিকল্পনা অভিযানে সোৎসাহে সাড়া দিয়েছেন। এমন মানুষদের মধ্যে আছেন শিল্পপতি ও শিল্প-পরিচালক, ডাক্তার, এনজিনীয়র, চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যানট, উচ্চপদের সরকারি কর্মচারী, বড়ো কাগজের সাংবাদিক আর কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এসব মানুষ তাঁদের উচ্চ জীবনমান উচ্চতর করার মানসে 'ছোটো পরিবার সুখী পরিবার' আপ্ত-বাক্যকে মহোৎসাহে অনুসরণ করছেন। তাঁরা বিচার করতে বসেন, একটা গাড়ি বা ফ্রীজ বা রঙিন দূরদর্শন সেট কেনা উচিত হবে, না (আর) একটি সন্তানলাভ। প্রায়শই তাঁরা প্রথম বিকল্পটির অনুকূলেই সিদ্ধান্ত নেন। অনেক ক্ষেত্রে আবার এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে স্ত্রীদের সৌন্দর্যচেতনাও কাজ করে। এঁদের বাড়িতে গেলে দেখা যাবে পরিবারে মাত্র একটি বা দুটি সন্তান রয়েছে—প্রায় ক্ষেত্রেই মাত্র একটি সন্তান। অর্থাৎ আমাদের সমাজের এই উচ্চতর অংশে পশ্চিমী সমাজের মতোই অল্প সন্তানসংখ্যা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

পক্ষান্তরে, সমাজের অপেক্ষাকৃত অনালোকিত অংশে বা সমাজের নীচুতলায়—গরিব করণিক, ছোটো ব্যবসায়ী, বস্তিবাসী দিনমজুর এবং চাষী ও অন্য গ্রামীণ মানুষদের ক্ষেত্রে—পরিবার - পরিকল্পনার অনুকূল মানসিকতা এখনও শেকড় গাড়তে পারে নি। যেহেতু এঁরাই আমাদের সমাজের শতকরা অন্তত ৮০ জন মানুষ, তাই ভবিষ্যতে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী ঢেলে সাজানোর সময়ে সমাজের এই নীচুতলার কথা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে।

মানসিকতা সঞ্চারের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, জোর-জবরদস্তি করে সমাজের নীচু-তলার মানুষদের পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করা যায় ঠিকই, কিন্তু এভাবে তাৎক্ষণিক কিছু চমকপ্রদ সাফল্য দেখানো গেলেও পরিণামে এর ফল বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। সামাজিক - আর্থনীতিক বিকাশের কাজ ব্যাহত হয়, আর জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণের কর্মসূচীও এর ফলে বিঘ্নিত হয়। ১৯৭৫-৭৭ সালের জরুরি অবস্থার শেষে জনতা সরকারের দিনগুলিতে এমনটিই ঘটেছিল। চীনদেশের সাম্প্রতিক কালের অভিজ্ঞতা থেকেও এটা বোঝা যায়। সেখানে জোর করে এক সন্তানের পরিবার আদর্শ হিসেবে চালানোর ফলে শিশুকন্যা-হত্যার মতো পাপরীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, ফলে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন।[৩]

তিন

সমাজের নীচুতলায় পরিবার-পরিকল্পনা অভিযানে আশাপ্রদ অগ্রগতি কেন সম্ভব হয় নি, তা বুঝতে হলে দেখা দরকার সন্তানের জন্মদানকালে সাধারণ পিতা-মাতার মনে কী ধরনের ভাবনা ক্রিয়াশীল থাকে।

সন্তানলাভে সকল পিতামাতার ক্ষেত্রেই একটা মানসিক সন্তোষ মেলে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানবজীবনের একটি অপরিহার্য কর্মসম্পাদনে—মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায়, প্রজাতি-সংরক্ষণ (race preservation)-এ তাঁরা সক্ষম, এটা দেখাতে পেরে তাঁদের মর্যাদাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। সন্তানরা মধুর সাহচর্য দিয়ে পিতামাতার জীবনকে পূর্ণতা দান করে, এ-কথাটাও উপলব্ধি করা দরকার। বস্তুত, আধুনিক কালের পারমাণবিক পরিবারপ্রথায় বাড়িতে সন্তান না থাকলে কথা বলার লোকেরই অভাব হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের চোখে একটি অতিরিক্ত সন্তানের জন্মদান শুধু অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব কাঁধে নেওয়া নয়, তার রুজিরোজগারের কাজে অতিরিক্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও বটে। কারণ, স্বল্পবিত্ত পরিবারে একটি সন্তানের—বিশেষ করে পুত্রসন্তানের—জন্ম হলে মনে করা হয় পরিবারের সীমিত আয় বাড়াবার একটি অতিরিক্ত উপায় হল। সাধারণ দিনমজুর বা দোকানি বা সাধারণ চাষির কাজে তার সন্তান—বিশেষ করে পুত্রসন্তান—বেশ অল্প বয়স থেকেই যোগ দেয়—প্রথমে ফাই-ফরমাস খাটে, পরে নিজেই ছোটোখাটো কাজ জোগাড় করে নেয়। যেমন নিজেই ভূকর্ষণে, বীজবপনে, ফসলের পরিচর্যায়, শেষে ফসল কাটার কাজে হাত লাগায়।

তৃতীয়ত, পশ্চাৎপদ সমাজে সন্তানকে অন্য একটি ভূমিকাও পালন করতে হয়। পিতামাতার বার্ধক্যে যখন তাঁদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, তখন সন্তানকেই তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হয়। সন্তানলাভের সময়ে ভবিষ্যতের এমন সুরক্ষা সৃষ্টির কথাটাও নিশ্চয় পিতামাতার মনে থাকে।

এখন, অধিক সন্তানের জন্মদান পরিহার করেও মানুষের সৃজনস্পৃহা চরিতার্থ করার নানা উপায় আছে—শিল্পসাহিত্য তো বটেই, এমন-কী বস্ত্রবয়নের মতো কারুকর্মের মাধ্যমেও এ-উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। তবে এ-সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করতে হলে, তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা সঞ্চার করতে হলে শিক্ষার প্রসার দরকার।

নাবালক সন্তানের উপার্জনের সাহায্যে সংসারে সচ্ছলতা আনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় যদি প্রাপ্ত-বয়স্করাই যথেষ্ট পরিমাণে উপার্জন করতে পারেন। এজন্যে পর্যাপ্ত সংখ্যায় কর্মসংস্থান দরকার, দরকার প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্যেও উপযুক্ত সংখ্যায় কর্ম-সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা যায়, এজন্যে সামগ্রিক জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ও তার ন্যায়সঙ্গত বণ্টন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বার্ধক্যের নির্ভরপ্রাপ্তির লক্ষ্য নিয়ে অধিক সন্তানোৎপাদনের প্রয়োজন থাকে না যদি সন্তানদের দীর্ঘজীবনলাভ সম্বন্ধে পিতামাতা যথেষ্ট নিশ্চয়তাবোধ করতে পারেন। এজন্যে জনস্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে শিশুমৃত্যুহারের হ্রাস ঘটানোর জন্যে সন্তানজন্মের আগে আর পরে মাতার স্বাস্থ্য এবং নবজাত শিশুর স্বাস্থ্যের প্রযত্নের লক্ষ্যে কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় হয়।

রাষ্ট্র যখন তার উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ নাগরিকদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তখন সন্তানের এ-ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়বে (যেমন হয়েছে পশ্চিমের সমাজতান্ত্রিক ও মূলধনতান্ত্রিক উভয়প্রকারের দেশ-গুলিতে)। অর্থাৎ পশ্চিমী ধাঁচে একটি সুষ্ঠু সামাজিক-নিরাপত্তা-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে বার্ধক্যে সন্তানদের উপর নির্ভরতার প্রয়োজনে অধিক সন্তানের জন্মদান অনাবশ্যক হয়ে পড়বে।

তাই পরিবার-পরিকল্পনার অনুকূল মানসিকতা

সৃষ্টির জন্যে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে জনশিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার—যার ফলে সন্তানধারণ এবং সন্তান-পালন ছাড়াও নারীর আত্মবিকাশের বিকল্প পন্থা বর্তমান—এ-বোধ তাদের মনে সঞ্চারিত হতে পারে আর পরিবার-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আর উপায় তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে অধিকসংখ্যায় কর্ম-সংস্থান, নারীদের জন্যেও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান, উৎকৃষ্ট জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা, উন্নত এবং সহজলভ্য চিকিৎসাব্যবস্থা এবং সামাজিকনিরাপত্তাব্যবস্থা। ঐতিহ্যমুখী গ্রামীণ সমাজ ত্যাগ করে শহরবাসী হলেও মানুষের মধ্যে এমন মানসিকতা সঞ্চারিত হয় বলে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে।

চার

উপরে প্রয়োজনীয় মানসিকতা সঞ্চারের যে-কৌশল উপস্থাপিত হল তার রূপায়ণে অনেক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। অর্থাৎ এ-কৌশলের সবকটি অংশকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে আর্থনীতিক সমৃদ্ধি অত্যাবশ্যক। যেমন, নগরায়ণের কথা যা বলা হয়েছে, তা পরিকল্পনামাফিক করা না হলে শহরগুলি বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে এবং পরিবার-পরিকল্পনার প্রতিকূল মানসিকতাই উজ্জীবিত হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় কর্মসংস্থান করতে হলে বা সামাজিকনিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করতে হলেও জাতীয় আয়ের যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি-সাধন আবশ্যক হয়। আমাদের দেশে কিন্তু কর্ম-হীনতার সঙ্গেই রয়েছে ব্যাপক দারিদ্র্য। ফলে, কর্মক্ষম পুরুষের জন্যেই যেখানে যথেষ্ট সংখ্যায় উপযুক্ত কাজ পাওয়া অসম্ভব, সেখানে মহিলাদের কর্মসংস্থানের কথা বলা বাস্তব অবস্থার দিকে চোখ বুজে থাকা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বর্তমান আর্থনীতিক পরিস্থিতিতে সামাজিকনিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করাও অসম্ভব।

কিন্তু শুধু জনশিক্ষা এবং সুষ্ঠু জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলেই যে অনুকূল মানসিকতা সৃষ্টির কাজ অনেকদূর এগিয়ে নেওয়া যায়, তা পৃথিবীর নানা দেশের অভিজ্ঞতা থেকে সপ্রমাণ হয়েছে। আমাদের দেশে কেরলরাজ্যের অভিজ্ঞতা থেকেও আমরা এ-বিষয়ে খানিকটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

কেরল কোনোমতেই আমাদের দেশের সমৃদ্ধতর রাজ্যগুলির অন্যতম নয়, বরং আর্থনীতিক মানদণ্ডে তাকে পশ্চাৎপদ বলা চলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে-রাজ্যে জনশিক্ষাপ্রসারের কাজটিকে বেশ কয়েক দশক ধরে খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সে-রাজ্যে সাক্ষরতার হার ১৯৮১-র আদমশুমারির সময়ে ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে শতকরা ৭৫·৩ আর মহিলাদের ক্ষেত্রে শতকরা ৬৫·৭। (সারা দেশের বেলায় কিন্তু একই সময়ে এ-হার ছিল যথাক্রমে শতকরা মাত্র ৪৬·৯ ও ২৪·৮।) প্রবীণ অর্থনীতিবিদ্ ড. ভবতোষ দত্ত তাঁর সাম্প্রতিক পুস্তক "আট দশক"-এ লিখেছেন, 'কোচিন থেকে সমুদ্রের উপকূল ধরে যে রাজপথ সেই পথে চলেছি কন্যাকুমারী। রাস্তায় একটু পরে-পরেই বই-খাতা হাতে ছেলেমেয়ের দল। কেরলে শিক্ষা-প্রসারের পরিসংখ্যান জানতাম, কিন্তু শিক্ষাবিস্তার যে এখানে স্পষ্ট দৃশ্যমান তাও বুঝলাম। আর প্রত্যেকের হাতে একটা খবরের কাগজ।'[৪]

জনস্বাস্থ্যের বিষয়টিকেও সেখানকার সরকার—তা প্রাক্তন মহারাজার সরকারই হোক, কংগ্রেস সরকারই হোক আর কমিউনিস্ট সরকারই হোক—যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। কেরলের চিকিৎসাব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানকার গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও ভালো ডাক্তার, ওষুধপত্র ও সাজ-সরনজাম রাখা হয়। এর ফলে অত্যন্ত গুরুতর ধরনের অসুস্থতা ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রোগীকে শহরের বড়ো হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। শিশুমৃত্যুহারের দিকে তাকালে এর সুফল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বার্ষিক শিশুমৃত্যুহার

বলতে বোঝায় কোনো বর্ষে প্রতি হাজার নবজাতকে শিশুমৃত্যুর (অর্থাৎ জীবনের প্রথম বছরে মৃত্যুর) সংখ্যা। ১৯৮৪ সালে সারা দেশে এ-হার ছিল ১১৪ (শহরাঞ্চলে ৬৫, গ্রামাঞ্চলে ১২৪), কিন্তু কেরলে তা কয়েক বছর আগেই ৫০-এর নীচে নেমে আসে। সামগ্রিক মৃত্যুহারও সারা দেশের বেলায় ছিল শহরাঞ্চলে প্রতি হাজার মানুষে ৭·৭ আর গ্রামাঞ্চলে ১৩·০ ; কিন্তু কেরলে শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল উভয়-ক্ষেত্রে এ-হার ছিল প্রতি হাজার মানুষে ৬·৭।

কেরলে জনশিক্ষানিয়ন্ত্রণের কাজে জনশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এসব ব্যবস্থার শুভ প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে পড়েছে। কেরলরাজ্যের দম্পতিরা সাগ্রহে ও বিপুলসংখ্যায় পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচীর অংশীদার হচ্ছেন। ১৯৭১-৮১-র দশকে সারা দেশে জনসংখ্যাবৃদ্ধি পায় শতকরা ২৫·০ হারে, আর কেরলে বৃদ্ধিহার ছিল ১৯·২। ১৯৮৪ সালের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে সারা দেশে জন্মহার তখনও প্রতি হাজার মানুষে ৩৩, অন্যদিকে কেরলে এ-হার ছিল হাজার মানুষে ২৫·৬।

সাম্প্রতিক কালে দুজন সমাজবিজ্ঞানী—কে. মহাদেবন ও এম. সুমঙ্গল—তাঁদের গবেষণার ভিত্তিতে যে-সিদ্ধান্তে এসেছেন তার দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যেতে পারে। অন্ধ্র আর্থনীতিক দিক থেকে কেরলের তুলনায় বেশ খানিকটা অগ্রসর রাজ্য। (যেমন, ১৯৭৪-৭৫ সালে কেরলে মাথাপিছু আয় ছিল ৮৬১ টাকা আর অন্ধ্রে ১,০০৩ টাকা, এ-দুয়ের অনুপাত প্রায় ১০ : ১২।) কিন্তু কেরলে জন্মহারের দ্রুত হ্রাস ঘটেছে, অন্যদিকে অন্ধ্রে জন্মহার এখনও বেশ উঁচুতে রয়েছে (১৯৮৩ সালে শহরাঞ্চলে এ-হার ছিল প্রতি হাজার মানুষে ২৭·২ আর গ্রামাঞ্চলে ৩১·৫)। তাই তাঁদের প্রশ্ন ছিল : কীভাবে কেরল তার জনসংখ্যা বা জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার সীমিত রাখতে সক্ষম হয়েছে?

তাঁদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে গবেষকদ্বয় কেরলের একটি গ্রাম ও অন্ধ্রের একটি গ্রাম বেছে নিয়েছিলেন। নৃতাত্ত্বিক (anthropological) ও সমীক্ষা (survey)—এই উভয় ধরনের তথ্য-আহরণপদ্ধতির সমন্বয়ে তাঁরা দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, কেরলে প্রজননশীলতা দ্রুত হ্রাসের পেছনে মুখ্য বেশ কিছু সামাজিক-আর্থনীতিক কারণ কাজ করেছে। এগুলো হল বিয়ের বয়সের ঊর্ধ্বমান, শিশুমৃত্যুহারের নিম্নগতি, স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনার ব্যাপক পরিকাঠামো, জন্মশাসনের নানা পদ্ধতির বহুল ব্যবহার এবং পরিযাণ (migration)।

এ-দুই লেখক অন্য কয়েকটি কারণের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিছু পরিবারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন পুত্রসন্তান, না কন্যাসন্তান, এমন পছন্দাপছন্দ কেরলের গ্রামটির পিতামাতাদের কাছে গৌণ; তাঁরা কিছু নিকটাত্মীয়ের প্রতি দায়িত্বপালন স্বাভাবিক কর্তব্য বলে মনে করেন; নারীরা সে-সমাজে অধিকতর মর্যাদার অধিকারী; এবং সেখানে আধুনিকতার ব্যাপকতর প্রসার ঘটেছে। এ-সবকিছুই সেখানে জন্মহারের হ্রাস-সাধনে সহায়ক হয়েছে। অন্ধ্রের গ্রামটির বেলায় এসব তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি।

লেখকদ্বয় তাঁদের গবেষণার আলোকে সারা ভারতের (বা অন্য বিকাশশীল দেশের) জন্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণোপযোগী উন্নয়নের যে-মডেল উপস্থাপিত করেছেন তার মধ্যেও সামাজিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে, আর্থনীতিক বিকাশের উপর ততটা নয়।[৫]

লাতিন আমেরিকার দুই দেশ, কিউবা ও ব্রাজিলের পরিস্থিতিরও তুলনা করা যেতে পারে। কিউবা আর্থনীতিক মানদণ্ডে মোটেই সমৃদ্ধ দেশ নয়, কিন্তু সেখানকার সমাজবাদী সরকার সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সঙ্কল্পবদ্ধ, তাই শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের যথেষ্ট সংস্থান রেখেছেন এবং এসব সুবিধার সমবণ্টনের ব্যবস্থা করেছেন। পক্ষান্তরে, ব্রাজিলের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও সেখানে আয়বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিক্ষা বা

জনস্বাস্থ্যের সুযোগ গরিব মানুষের কাছে তেমন পৌঁছতে পারে নি। এর ফলে কিউবায় জন্মহারের দ্রুত হ্রাস ঘটেছে; ব্রাজিলে কিন্তু এ-হারের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নি।[৬]

উল্লেখপঞ্জী

১. Subhaschandra Bose : *Crossroads-Works of Subhaschandra Bose, 1938-40*, (পৃ ১৪)। Asia Publishing House, Bombay, 1962.

২. National Planning Committee : *Population, Report of the Sub - Committee*, (পৃ ১৪৪-৫)। Vora & Co., Bombay, 1947.

৩. — "Chinese move to stop female infanticide", *The Statesman*, Calcutta (September 9, 1988). (এ-প্রসঙ্গে *The Statesman*-এ ১৯ সেপটেমবরের সম্পাদকীয় নিবন্ধ *"Unwanted Daughters"*-ও দ্রষ্টব্য।)

৪. ভবতোষ দত্ত : "আট দশক" (পৃ ২২০)। প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৮৮।

৫. Mahadevan, K. and Sumangal, M. : *Social Development, Cultural Change and Fertility Decline—A Study of Fertility Change in Kerala.* Sage Publications India, New Delhi, 1987.

৬. Solas, R. and Valentei, D. (ed.) : *Population and Socio-Economic Development* (পৃ ১২৩)। Progress Publishers, Moscow, 1986.

[নিবন্ধে উল্লেখিত পরিসংখ্যান ভারত সরকার প্রকাশিত *India 1986*, *Family Welfare Bulletin* এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘ-প্রকাশিত *Demographic Year Book* থেকে নেওয়া হয়েছে।]

উদ্‌ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার

উদ্‌ধৃতিচিহ্ন আছে দু-রকম—এক-এক আঁকড়ির (‘ ’) আর দুই-দুই আঁকড়ির (“ ”)।

যেখানে লেখকের বা বক্তার কথা উদ্‌ধৃত করা হবে, সেখানে "চতুরঙ্গে" আমরা এক-এক আঁকড়ির চিহ্ন ব্যবহার করব। যেমন, কবি ভূমিকায় লিখছেন, 'নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে।'

উদ্‌ধৃতির মধ্যে উদ্‌ধৃতি দিতে হলে, দুই-দুই আঁকড়ি লাগানো হবে।

বই বা পত্রিকার নামের সঙ্গে দুই-দুই আঁকড়ি : "বিষবৃক্ষ", "মহুয়া", "তিন সঙ্গী", "বঙ্গদর্শন", "ভারতী", "প্রবাসী"।

প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতার নাম লেটারস্পেস করে দেওয়া হবে : ঝু ল ন, ব র্ষ শে ষ, স ভ্য তা র স ঙ ক ট।

অনৈসর্গিক

বিরাম মুখোপাধ্যায়

জানতে কি এই জাদুময় ছুরি ও কাঁচির খেলা?
অবাধ্য অস্থির কোলেস্টোরাল এ-বেলা ও-বেলা
সূক্ষ্মনালী ধমনীর প্রাণবাহী রক্তের উশ্রীতে
চর্বির শিকড়পিণ্ড তালগোল পলকে জমাট

যমদূত-পরোয়ানা এই বুঝি শিয়রে দাঁড়িয়ে—
এ ম্যাজিক-ছুঁচ জানে বিনষ্ট বুকের নিরাময়
দ্বিমাত্রিক পেথিডিন, শল্যবিদ্ হাজার তঙ্কায়
আতঙ্কেরে আপাতত টুঁটি চেপে ধরেছে কব্জায়।

পকেটমারের মুখ হুঁশিয়ার সতর্ক যাত্রীরা
ভিড়ভাড়াক্কায় ঠিক চিনে নেয় আঁচে ও আন্দাজে
আড়িপাতা গোয়েন্দা-চাহনি—ম্যাজিক-কাঁচির ধার;
ওস্তাগর দর্‌জির কাঁচি কিন্তু আড়ে ও ওসারে

সড়গড় অতিক্ষিপ্র কৌণিক কুশলী কাটছাঁটে
ঢ্যাড়া মোটা সেলাইয়ে ষোলোআনা খাপ খেয়ে যায়
কেপ্‌মার বাট্‌পাড় উলঙ্গ উন্মাদ ইস্‌তক্
উঠ্‌তি-নচ্ছার আর ইতরকে ভদ্দর বানায়।

এই ছুঁচ-ছুরি-কাঁচি দৈবজ্ঞের চেতাবনী নয়,
মস্তিষ্কের পুরনো ঘিলুকে চেঁচেপুছে পালটিয়ে
মেধা আর মনীষার মিহি আলোড়ন-বিলোড়ন
তুলিআঁকা জোড়াভুরু টিকলো নাকের রোমফোঁড়া

সময়ে পায় নি কোনো টোট্‌কার বিহিত শুশ্রূষা
শতাব্দীর শেষ পাদে বিষাক্ত স্ফোটক চিরে ফেড়ে
পচা পুঁজ ক্যাত্‌রানি সাফ করে ছুরির ম্যাজিক
এ-যাত্রায় মুমূর্ষুকে কন্দর্পের কান্তি ফিরে দ্যায়।

আরসুলা নেঙ্‌টি ইঁদুর আর শিকারী বিড়াল
সহঅবস্থান কিংবা কুটুম্বিতা কখনো সম্ভব?
হাতির পায়ের থাবা নিরুপায় ঘাসফড়িঙের
ইচ্ছামৃত্যু; রাতের প্যাঁচার খাদ্য মাছি ও মাকড়

তুরুপের টেক্কা খোঁজে আচ্ছাদক আদাড়ে পাঁদাড়ে ;
সমুদ্রগভীরে ধাবমান তিমি-র চোখের টর্চে

ঝাঁক-ঝাঁক হেরিঙের অক্সিজেন অনটন হ'লে
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে মরে দৈত্যতুল্য ঢেউয়ের আছাড়ে—
অনিসর্গ মৎস্যগন্ধ তাতল সৈকত ছায় কোনো
নোঙরের সুনিশ্চিত সাবলীল জীবনের মানে

না কি ছুটন্ত উল্কার চক্রনেমি-ছোঁয়া অভিশাপ ॥

যেখানেই যাই

আল মাহমুদ

যেখানেই যাই, কী যেন খুঁজতে খুঁজতেই যাই।
সবুজ মাঠে তরমুজগুলো মানুষের মুখের কুটিলতাকে
লজ্জা দিতে চুপচাপ পড়ে থাকে। আমি তরমুজের
স্তব্ধ বিদ্রূপ সহ্য করতে পারি না বলে সেদিকে তাকাই না।
কারণ আমাদের উভয়ের অভ্যন্তরেই তো রয়েছে লাল লজ্জা।
অবশ্য আমার শরমটা কেন যে তরমুজের মতো ঠাণ্ডা নয়,
কাকে জিজ্ঞেস করি?
মনে হয় সারা জীবন কিছু একটা জিজ্ঞেস করব বলেই তো
খুঁজতে খুঁজতে যাওয়া। নয় কি?
—কত মাঠ, গোপাট আর
গ্রাম পার হলাম। প্রশ্ন না করতেই পাখিরা ঝাঁক বেঁধে কত
উত্তর দিয়ে গেল। মাটির ভেতর থেকে শব্দ করে উঠল
আর্দ্র পতঙ্গের দল। বাঁশঝাড়ের পরদা সরিয়ে দেখলাম
গাঁয়ের মাঠে পূর্ণিমার পেঁচারা আমাকে কত যে উত্তর দিতে
চাইল। প্রহরে প্রহরে বেজে উঠল আমার খোঁজার জবাব
কিন্তু আমার কালা একভাষী কান কিছুই তো অনুবাদ করল
না। শুধু ভাবল, সুন্দর সুন্দর। শুধু বলল, গান গান।

তরমুজের মাঠে এসে একটু বিশ্রাম নিই। কী আর খুঁজব?
এখানে প্রাণ, পতঙ্গ ও উদ্ভিদের জবাবটা অনুবাদ করার
মতো কাউকে তো পেলাম না পৃথিবীতে। শেষ পর্যন্ত একটা
পাকা তরমুজের কাছে বসে ফলটিকে দুখণ্ড করে দেখি
আমি যা চাই তার চেয়েও অর্থবহ ফাঁক খুলে দিয়ে
লাল হয়ে আছে তৃপ্তি।

যে দূরত্বে ইতিহাস

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

যে দূরত্ব চোখের দৃষ্টিকে স্পষ্ট করে
সে দূরত্ব পেতে আর কতদূর যাব?
দূরত্বেই ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত হয়—এ তত্ত্বই
বুদ্ধকে সত্য করে তুলেছিল এবং তাঁর শিক্ষা
করেছে অস্বীকার। অর্থাৎ সমকালের প্রতি
নির্ণীত নেই কোনো দায়। নিকট স্বজনের কাছেও।
অতএব দূরত্ব সৃষ্টি করি পিছু হটে অথবা
দলছুট্ হয়ে—চরণে নয়নে আড়াআড়ি।
তবু সে স্বচ্ছ দৃষ্টি কই দূরত্বেও যারে চিনে নেব।
সমকাল দূরে সরে যায়। কবে যে ইতিহাস হব?

উত্তরাধিকার

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

যে প্রিয় প্রতিবেশী
আমাকে উপহার
আমিও তাকে দিই
অথচ বাঁকা চোখে
সেও তো দেখে আজ

খুশির ঈদে দিল
এবং ভালোবাসা
দশমী পার হলে
এখন দেখি তাকে
তেমনি আঁকাবাঁকা

জীবনে রঙ নেই
এবং সংশয়
রেখেছে উত্তরে
তাকেই নিয়ে যাব
এমন অবেলার

কেবল সন্দেহ
পিতৃপিতামহ
এই কি অধিকার!
আগামী কাল ভোরে
স্বপ্ন দেখা ভালো!

নদীতে যাই যদি
যেমন গিয়েছিল
রক্তে ভাসা নদী
খরার মুখ মুছে
জননীসম্ভবা

তেমনি নদী যায়
সুদূর ইতিহাসে
স্নানের সুখ দিল
সবুজ ফসলের
দিনের পাটরানী।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৯.৫

সাঁওতাল মানসিকতার রূপান্তরে দুটি বিশিষ্ট পর্যায় লক্ষ করা যায়। দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার ঠিক পরে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের সংশয় কেটে যায় বটে; কিন্তু বিদ্রোহের মানসিকতা তখনও গড়ে ওঠে নি। স্পষ্টত সিধু-কানু তখনও দিখুগোষ্ঠী আর ব্রিটিশ-রাজের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষের কথা ভাবে নি।

নূতন রেলপথ বানানোর কাজে নিযুক্ত সাঁওতালদের তখনকার মনোভাব সম্পর্কে টেলরের প্রতিবেদন[১২৯] গুরুত্বপূর্ণ। তিনি নিজেই দেখেছেন, ওই ঘটনার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে সাঁওতাল অঞ্চলে কী বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

'এর ফলে বহু সাঁওতাল রেলপথ বানানোর কাজ ছেড়ে চলে যায়; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, তারা ভয়ানক আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তাদের বলা হয়েছিল, তারা যেন যত সম্ভব শীগগির গঙ্গা পার হয়ে চলে যায়। এর পর আবার কিছুদিন সব শান্ত। জুন মাসের (১৮৫৫) শেষ পর্যন্ত নূতন ঠাকুর সম্পর্কে আর কিছু শোনা যায় নি। তখনই শুনতে পেলুম, আবার ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটেছে; আর সহস্র-সহস্র সাঁওতাল তাকে দেখার জন্য যাচ্ছে; লুঠতরাজ বা খুনখারাপি সম্পর্কে একটা কথাও শুনি নি।'

কেন সিধু-কানু সঙ্গে-সঙ্গেই বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেয় নি, তার একটা কারণ—তাদের এ গভীর বিশ্বাস যে, ভগবদ্-নির্দেশ-সংবলিত তাদের ঘোষণার কথা জানতে পেরে ব্রিটিশরাজ, মহাজন ইত্যাদি শত্রুরা সতর্ক হবে; তাদের ভুল শুধরে নিয়ে সাঁওতালদের আর হেনস্তা করবে না। নেতাদের ধারণা ছিল, সাঁওতালদের আর্জি, আবেদন-নিবেদন তারা হেলায় উপেক্ষা করেছে; কিন্তু ঐশী নির্দেশ তারা অমান্য করবে না। বিদ্রোহের কিছুদিন আগে সিধু-কানু তাদের সবাইকে পরোয়ানা মারফত সতর্ক করে দিয়েছিল। সম্ভবত, দেবতার আবির্ভাবের পরে-পরেও এসব পরোয়ানার মূল কথা সবাইকে জানানো হয়ে-

ছিল।[১৩০]

নেতাদের প্রত্যাশা বিফল হল। শত্রুরা তাদের পরোয়ানা গ্রাহ্যই করল না। সহিংস বিদ্রোহ ছাড়া আর কোনো পথ নেতাদের সামনে খোলা রইল না।

৯.৬

বিদ্রোহের আগে সাঁওতাল মানসিকতার একটা দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূল উদ্দেশ্য এবং উপায় সম্পর্কে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সাঁওতালরা একইরকম-ভাবে ভাবছিল। রাজপুরুষদের কাছে বিভিন্ন অঞ্চলের সাঁওতালের সাক্ষ্য এবং বীডওয়েল কমিশনের[১৩১] কাছে নানা জমিদার, নীলকর, য়ুরোপীয় ইত্যাদিদের লিখিত প্রতিবেদন থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। পুনরাবৃত্তি থাকলেও আমরা বিভিন্ন ধরনের এ সাক্ষ্যের কিছু-কিছু উদ্‌ধৃত করব। বিদ্রোহের মানসিকতা কী অল্প সময়ের মধ্যে সব সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, এতে বোঝা যায়।

উদ্‌ধৃতিগুলি দেবার আগে এ মানসিকতার কয়েকটা বিশিষ্ট ধর্মের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।

(ক) দেবতার আবির্ভাবের ঘটনা সম্পর্কে সাঁওতালদের বিশ্বাস সর্বব্যাপী। কিন্তু কী ঘটেছিল তা নিয়ে নানা জনের নানা ধারণা।

(খ) নেতাদের ঘোষণায় দিব্যশক্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে; সাঁওতালদের সপক্ষে এ শক্তির হস্তক্ষেপে প্রবল শত্রুকুলের পরাভব অনিবার্য; সীমিত শক্তি সত্ত্বেও সাঁওতালরা থাকবে অপরাজেয়।

(গ) বিদ্রোহের ফলে সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা হবে; হবে ন্যায়ধর্মের জয়, আর দিখু-শাসন-শোষণের অবসান।

(ঘ) এরই সঙ্গে ঘটবে ব্রিটিশ-রাজের বিলোপ। কিন্তু বহুব্যাপ্ত এ ক্ষমতার বিনাশের উপায় সম্পর্কে সাঁওতালদের কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না।

(ঙ) বিদ্রোহের ফলে য়ুরোপীয় 'সাহেব'গোষ্ঠীও নির্‌মূল হবে।

(চ) সাঁওতালরাজের সমাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল কিছুটা স্ব-বিরোধী। একদিকে তারা বলছে, দিখুরা নিশ্চিহ্ন হবে। কিন্তু নেতাদের নানা ঘোষণা থেকে মনে হয়, তারা শুধু চাইত, দিখুদের কাজকর্মের উপর সাঁওতালরাজের নিয়ন্ত্রণ; যেমন জমির খাজনার 'ন্যায়সঙ্গত' হার ঠিক করবে এ নূতন রাজ; পুরনো কায়দায় মহাজনি কারবার চলতে দেওয়া হবে না।

সাঁওতালদের নূতন বিশ্বাসের জগৎ সিধু-কানুর ঘোষণা এবং নির্দেশকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল বলে আমরা তাদের কিছু পরোয়ানা বা নির্দেশ প্রথমে উদ্‌ধৃত করব।

বীরভূম ম্যাজিসট্রেটের লেখা (২৪ জুলাই ১৮৫৫) এক চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি, আগের দিন সন্ধ্যাবেলা এক বৃদ্ধা রমণী বিদ্রোহীদের সদর কার্যালয় থেকে এক পরোয়ানা এনে জেলার সদরে দিয়ে যায়।[১৩২] সম্ভবত সেটা কিছুদিন আগের লেখা— বিদ্রোহ শুরু হবার (৭-১০ জুলাই) আগে তো বটেই। সিধু-কানুর স্বাক্ষরিত এ পরোয়ানার মূল ঘোষণা সাঁওতালদের তখনকার চিন্তাভাবনাকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

'বাগনাদিহির বাসিন্দা কানু ও সিধু। সিধু, কানু এবং তাদের ভাইদের বাড়িতেই ঠাকুর দেখা দিয়েছেন। ঠাকুর যাই বলেছেন, সবটুকুই দূর আকাশ থেকে এসেছে; কানু মাঝি ও সিধু মাঝি যা বলেছে, তাই ঠাকুর। ঠাকুর বলেছেন: "গরিব লোকেরাই যুদ্ধ করুক; কানুমাঝিকে তা করতে হবে না; ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবেন; তোমরা ঠাকুরের কাছে থেকে যুদ্ধ করো; গঙ্গামা ঠাকুরের কাছে যাকে পাঠাবেন, তিনি অগ্নিবৃষ্টি ঘটাবেন; ঠাকুরের করুণা নিয়ে যারা থাকতে রাজি, তারা যেন গঙ্গা পার হয়ে যায়..." ঠাকুরের নির্দেশ, প্রতি বলদের (হালের) জন্য এক-আনা, প্রতি মোষের (হালের) জন্য দুআনা খাজনা ধার্য হবে। ধর্ম ও বিচারের যুগ শুরু হবে। বেধর্মী

কাজ যারা করবে, পৃথিবীতে তারা আর থাকতে পারবে না। মহাজনরা পাপ করেছে; তারা অন্যায় কাজ করেছে। সব আইনকানুনকে আমলারা অকেজো করে রেখেছে; এটা সাহেবদের পাপ; সাহেবরা ম্যাজিসট্রেটের দায়িত্ব নেন বটে; আসলে তাদের নায়েব-সেজওয়ালরাই তদন্তটা করে; আর জোরজুলুম করে ষাট, আশি টাকা আদায় করে নেয়। এটা সাহেবদের পাপ; এজন্যই ঠাকুরের নির্দেশ, দেশের শাসনভার আর সাহেবদের ওপর থাকবে না। তোমরা যদি এ হুকুম না মান, পরোয়ানা মারফত তোমাদের যা বলার আছে বলবে; তোমরা সাহেবরা যদি হুকুম মানতে রাজি থাক, তাহলে গঙ্গার অপর পারে থাকবে; না মানলে গঙ্গার এপারে থাকতে পারবে না। আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি ঝরবে; নিজের হাতেই ঠাকুর সাহেবকুলকে খতম করে দেবেন; তোমাদের বন্দুক আর গুলি সাঁওতালদের গায়েই লাগবে না; ঠাকুরই তাদের অস্ত্রের যোগান দেবেন;...যদি তোমরা সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, দেখবে দুদিন, দুরাত একদিন একরাতের মতোই কেটে যাবে।'

১০ই শ্রাবণ ১২৬২ সালে ভাগনাদিহি থেকে রাজমহলের 'সাহেব'দের কাছে পাঠানো'[১৩৩] আর একটা 'ঠাকুরের পরোয়ানা'য় উপরে উদ্ধৃত পরোয়ানার বেশ কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাকি অংশটা একরকম :

'...সাহেব ও গোরা সৈন্যরা লড়াই করবে, কানু ও সিধু মাঝি করবে না। ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করবে। সাহেব আর সৈন্যরা, তোমরা ঠাকুরের সঙ্গে লড়বে; ঠাকুরের সাহায্যের জন্য মা-গঙ্গা আসবেন ··সত্যযুগ শুরু হয়েছে; সত্যিকারের ন্যায়বিচার এবার প্রতিষ্ঠিত হবে। যারা সত্যভাষী নয় এই পৃথিবীতে তাদের থাকতে দেওয়া হবে না।'

'পুনঃ আমি অগ্নিবৃষ্টি ঝরাব; ঠাকুর নিজ হাতে সব সাহেবদের খতম করবে; তোমরা বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করলেও গুলি সাঁওতালদের গায়ে লাগবে না; তোমাদের হাতি-ঘোড়া সব ঠাকুর সাঁওতালদের দিয়ে দেবেন।'

ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের এক চিঠি[১৩৪] থেকে জানা যায়, বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রচারিত 'ঠাকুরে'র বাণী-সংবলিত একটা চিরকুট পূর্ণিয়াতে ধরা পড়েছে। উপরে উল্লেখিত পরোয়ানার কোনো-কোনো বিষয় এখানেও বলা হয়েছে, বিশেষ করে ব্রিটিশবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ ভূমিকার কথা :

'ভাগনাদিহি থেকে দুজন ঠাকুর যাবেন; ঠাকুরের নিজের নাম এসেছে আকাশ থেকে। সুবা ঠাকুর স্বেচ্ছায় যাবেন। কেষ্টঠাকুর, আর রামচন্দ্র, যার বাহু উপরদিকে তোলা—এ-দুই ঠাকুর যাবেন। ঠাকুরের নিজের নামই যুদ্ধ করবে। ঠাকুরের আদেশেই রায়তেরা মাদল বাজায়; য়ুরোপীয় সৈন্য আর ফিরিঙ্গীদের মুণ্ড তিনিই কাটবেন; ঠাকুর নিজেই যুদ্ধ করতে আগ্রহী। ঠাকুরের যুদ্ধ বারো দিনের মধ্যেই শুরু হবে। ঠাকুর নিজেই এ পরোয়ানা পাঠিয়েছেন; দুরাত একরাতে আর দুদিন একদিনে পরিণত হবে। ঠাকুরের এ নির্দেশ।'

বিদ্রোহ শুরু হবার ঠিক পরেই সাঁওতাল মানসিকতায় যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, তা বীডওয়েলের কাছে টেলরের লিখিত প্রতিবেদন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।[১৩৫]

'জুলাইয়ের ছয় বা সাত তারিখ নাগাদ আমি শুনতে পেলুম, সাঁওতালরা অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করছে; তারা তখন বলতে শুরু করেছে, এবার তাদের রাজত্ব কায়েম হবে; আর বাকি সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। তারপর খবর এল তারা দারোগা, এবং আরো পনেরো-ষোলো জনকে খুন করেছে··· দশই জুলাই পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের মতো সাঁওতাল আমার সঙ্গে ছিল। সেদিন সবাই একসঙ্গে আমার কাছে এসে বলে, তাদের ঠাকুর খবর পাঠিয়েছে, তারা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চলে আসে;

না হলে তাদের প্রাণসংশয় ঘটবে; তাই তাদের যেতেই হবে। কারও সম্পর্কে তারা কোনো অভিযোগ করে নি; তাদের যেতে হবে, কারণ তা ঠাকুরের হুকুম। ঠাকুরের খবর যে নিয়ে এসেছিল, সে তখনও রান্না করছিল। আমি তাকে ধরতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু খাবারদাবার উনুনের উপর রেখেই পালিয়ে গেছে সে। এই সাঁওতালরাই মাত্র দু-একদিন আগে তাদের জন্য ঘর বানিয়ে দিতে কতই না অনুনয়-বিনয় করেছে; বলেছে তারা গ্রাম ছেড়ে এসে শ্রীকুণ্ডে থাকবে। আর আমার জন্য কাজ করবে (রেলপথ বানানোর কাজ)। এখন শুনলুম, তারা পরের দিন আমাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল···তারা ···আরও খবর পাঠিয়েছে, সুবার চড়ার জন্য আমার একটা ঘোড়া তাদের চাই; ঠাকুরের নৈবেদ্য হিসেবে আমার মুণ্ডুটাও দরকার।'

তাদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকেই[১৩৬] টেলর সাঁওতালরাজের আসন্নতা সম্পর্কে তাদের ধারণার কথা জানেন।

'এসবের (বিদ্রোহ, হিংসা ইত্যাদি) কারণ, তাদের এক দেবতা নাকি সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন; তাঁর অভিপ্রায়, ভারতবর্ষের এ এলাকায় তিনি রাজত্ব করবেন।'

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর নানা আঞ্চলিক অধিনায়ক এবং অন্যান্য রাজপুরুষদের কাছে বন্দী সাঁওতালদের সাক্ষ্য থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, সিধু-কানুদের নানা ঘোষণা আর নির্দেশ কী গভীরভাবে তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তারা সবাই বলেছে, সাঁওতাল-রাজের আসন্নতা সম্পর্কে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাদের সব কর্মপ্রয়াসকে উদ্দীপিত করেছে। এ ধরনের কিছু সাক্ষ্য আমরা উদ্ধৃত করছি।

বিদ্রোহ শুরু হবার দু-একদিনের মধ্যেই (৯ জুলাই) ঔরঙ্গাবাদের সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার ইডেন গুপ্তচর সন্দেহে এক সাঁওতালকে আটক করেন। তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে লেখা ইডেনের এ প্রতিবেদন:[১৩৭]

'বিদ্রোহীরা উদ্দেশ্য হিসেবে বলছে, সব য়ুরোপীয় এবং প্রতিপত্তিশালী দেশীয় লোকদের খতম করবে··· দিনে চার-পাঁচটা গ্রাম লুট করছে। তারা বলছে, এ সবই ভগবানের নির্দেশে; এক শিশুর বেশে তার আবির্ভাব; তারা এ শিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়; এ শিশুই ভগবান এবং রাজার মতো দেশশাসন করবে ···প্রধান নেতার নাম সিধু, তারা ফৌজের কথা বলছে; সিপাহী এবং উচ্চপদাসীন সেনানায়ক, ফৌজের এ দুই ভাগ। স্পষ্টত, এটা সুপরিকল্পিত এবং সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ···আমার নিশ্চিত ধারণা, কারো প্ররোচনা না হলে এটা ঘটতে পারত না···'

এর পরের দিন (১০ জুলাই) ইডেন আরো কিছু জানতে পারেন।[১৩৮]

'তারা বলছে, তারা সরকার বা জমিদারের জন্য কোনো কাজই করবে না। জমির জন্য তারা নির্দিষ্ট একটা হারে মাত্র খাজনা দেবে···প্রতিটি পুলিশ-বরকন্দাজ এবং কোমপানির সঙ্গে যুক্ত সবাইকে তারা খুন করবে বলছে।'

তিনজন সাঁওতাল নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে বলে[১৩৯]: '···সিধু ও কানুর নির্দেশে তারা জমায়েত হয়েছে···এ দুই প্রধান নেতা ভগবানের আদিষ্ট প্রতিনিধি···তাদের উদ্দেশ্য, সারা মুলুক তারা দখল করে নেবে। তারা ভালোই জানত, তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠানো হবে; কিন্তু সিধু-কানু তাদের বলেছেন, বন্দুক থেকে শুধুমাত্র জল বেরুবে।'

সিউড়ির দারোগা পাঁচজন সাঁওতাল মাঝিকে গ্রেপ্তার করে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে নিয়ে আসে। তাদের সাক্ষ্য:[১৪০]

'তারা আমাকে বলল, বিদ্রোহের একটামাত্র কারণ, তাদের মনের উপর সুবার (স্বাধীন সাঁওতাল-রাজ) কল্পনার অনন্যসাধারণ প্রভাব। কানুমাঝির নির্দেশেই ভাগলপুর থেকে এসে এসব কথা প্রচার করেছে।···তারা (পাঁচ মাঝি) সুবাকে (কানুমাঝি)

কখনও দেখে নি; তারা নামও শোনে নি; [সুবা নামেই অনেকে কানু / সিধুকে জানত]; কিন্তু সাঁওতালরা আবার এক মহান জাতিতে পরিণত হবে, এ কল্পনায় তারা পরম উল্লসিত হয়েছিল; তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, (লড়াইয়ের সময়) কেউ তাদের কাছে দাঁড়াতেই পারবে না; তাদের কেউ মরবে না; মরলেও তারা আবার জীবন ফিরে পাবে; [ব্রিটিশ] সৈন্যের বন্দুকের গুলি জল হয়ে যাবে; (তাদের) একটা ছোটো ছুরিরও এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকবে যাতে বিশালসংখ্যক বিপক্ষদল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

আসলে, বিদ্রোহ শুরু হবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সাঁওতালরা বিশ্বাস করতে শুরু করে, সাঁওতাল-রাজ শুধুমাত্র অস্পষ্ট কোনো ধারণা নয়, একান্তই বাস্তব সত্য।

১৫ জুলাইয়ে লেখা বীরভূম ম্যাজিসট্রেটের চিঠি থেকে আমরা জানতে পারি[১৪১]: 'দামিন-ই-কো এবং রাজমহল পাহাড় থেকে বিশেষ দূতেরা এসে বীরভূমের আপামর সাঁওতাল সম্প্রদায়কে রাজদ্রোহে উদ্‌বুদ্ধ করেছে···সাঁওতালরা ঘোষণা করেছে, তারা এখন সারা দেশের মালিক; য়ুরোপীয়দের তারা নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে; ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে তারা বদ্ধপরিকর। কোনো গ্রাম লুঠ করার পর তারা চামড়ার তৈরি দুটো পতাকা উড়িয়ে দেয়; এটা তাদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক।'

'প্রত্যক্ষদর্শী'দের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা[১৪২] (১৫ জুলাই) ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের চিঠিতেও এ ধরনের ঘোষণার উল্লেখ আছে: 'কোম্পানির জমানা শেষ; তাদের সুবার রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে।'

নূতনরাজের সঙ্গে নূতন রাজার ধারণা অনিবার্যভাবে সম্পৃক্ত। রাজকীয়তা সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা মুর্শিদাবাদ ম্যাজিসট্রেটের এক চিঠি (১৩ জুলাই) থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়: 'জানতে পেরেছি, বিদ্রোহীরা এক রাজা নির্বাচিত করেছে; তাকে পালকি করে তারা নিয়ে যায়; সঙ্গী পারিষদবর্গের পোশাক ও ভাবভঙ্গি রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।'[১৪৩]

সাঁওতালদের কোনো-কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচীতে "সুবা" সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস প্রতিফলিত। বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে লেখা এক চিঠিতে (৩ অগস্ট) এ সম্পর্কে খানিকটা জানা যায়: 'অনেক সাঁওতাল মৌর নদীর উত্তরে কোমুরাবাদে জড়ো হয়েছে। নানা জমিদারি এলাকাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে; দারোগাদের নিয়োগ করা হয়ে গেছে; ভূমিজ এবং অন্যান্য রায়তদের চাষবাস সম্পর্কে নির্দেশ জারি করা হয়েছে···বলদ-টানা হালের উপর চার আনা, আর মোষ-টানা হালের উপর আট আনা রাজস্ব ঠিক হয়েছে।'[১৪৪]

বস্তুত বিদ্রোহ চলায় সময় 'সুবা' সম্পর্কে প্রচার কখনও থামে নি। (এক অর্থে 'সুবা' সাঁওতালরাজ; অন্য অর্থে সাঁওতালদের রাজা)। পরে-পরে সিধু-কানুর মতো স্থানীয় নেতাদেরও অনুগামীরা 'সুবা' ডাকত। এরকম এক সুবা তিনপাতার শালের ডাল পাঠিয়ে সবাইকে জানায় (সেপটেমবর), শীগগির সে সিউড়িতে যাবে; রায়তেরা যাতে ভয়ে না পালিয়ে যায়। এ ঘোষণা স্থানীয় সাঁওতালদের মধ্যে নূতন এক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। বীরভূম কালেকটর লেখেন (২২ সেপটেমবর): 'তারা ঘোষণাটা পেয়েছে; এর ভিত্তিতে রটিয়ে দিয়েছে, ফিরিঙ্গিদের রাজত্ব শেষ; কাকেও তারা ডরায় না।'[১৪৫]

বিদ্রোহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নেতারা খোলাখুলি সবাইকে একই কথা বলেছে; এ বিষয়ে কোনো গোপনীয়তা ছিল না। অসাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকদেরও বিদ্রোহীদের লক্ষ্য এবং কাজকর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। রাজপুরুষদের কাছে তাদের এবং সাঁওতালদের সাক্ষ্যে বিশেষ কোনো গরমিল নেই।

ঔরঙ্গাবাদের সহ-ম্যাজিসট্রেট (৯ জুলাই) শেখ সাম্মু নামক একজনের সাক্ষ্য নেন[১৪৬] :

'ভাগনাদিহিতে মাটি ফুঁড়ে এক ঠাকুরের আবির্ভাবের ঘটনা শুনে আমি দিন তেরো আগে তা দেখতে যাই। সেখানে দেখি প্রায় হাজার সাতেক সাঁওতালের জমায়েত—তাদের হাতে ধনু, তীর আর তলোয়ার। আমি তাদের ঠাকুরের কথা জিজ্ঞেস করাতে কানু সাঁওতাল এবং তার দুই ভাই বললে, এ ঘরেই ঠাকুর দেখা দিয়েছেন; আমাকে লেখা এক কাগজের টুকরো দেখিয়ে বললে, ঠাকুরই এটা তাদের দিয়েছেন; ঠাকুর আরও বলেছেন, এ মুলুক পাপে ভরে গেছে; ঠাকুর তাই তাদের রাজত্ব দিলেন; যারা তাদের শাসন মানবে না, তাদের মেরে ফেলা হবে, এবং তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হবে; ইংরেজদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি বললুম, এ-কাগজ তো ভগবান থেকে পাওয়া নয়; কোনো য়ুরোপীয়ের লেখা। এজন্য তারা আমাকে গ্রেপ্তার করলে··· ।'

বন্দী সাঁওতালদের স্বীকারোক্তি, সাক্ষ্য, এবং অন্যান্য নানা সূত্র থেকে পাওয়া প্রতিবেদন থেকে দুটি বিষয় পরিষ্কার বোঝা যায় : স্বল্প সময়ের মধ্যে সাঁওতালদের মানসিকতায় আমূল রূপান্তর ঘটে; এবং বিদ্রোহের প্রেরণা, মূল লক্ষ্য এবং কর্মসূচী সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা মোটামুটি অভিন্ন ছিল।

৯.৭

কোন্ ঘটনা থেকে বিদ্রোহের শুরু, তা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই। মতানৈক্য তার পটভূমিকা নিয়ে।

বিদ্রোহের শুরু দীঘা থানার দারোগা মহেশ দত্ত আর তার চার বরকন্দাজের খুন দিয়ে। দারোগাকে সিধুই খুন করে। গ্রেপ্তারের পর তাকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করে: 'আমি নিজের হাতে তলোয়ার দিয়ে মহেশ দত্তকে খুন করি; স্বেচ্ছায় ভগবানের নির্দেশে আমি তা করেছি।'[১৪৭]

কিন্তু কেন এ খুন, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা নানারকম। আমরা প্রধানত রাজপুরুষদের কাছে সিধুকানুর এবং কোনো-কোনো 'প্রত্যক্ষদর্শী'র সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করব। কী ঘটেছিল, সিধুকানুরই সবচাইতে ভালো জানার কথা।

এ ধরনের সাক্ষ্য থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়, ব্রিটিশরাজের "ন্যায়পরায়ণতা" সম্পর্কে সাঁওতালদের আস্থা যখন প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, তখন স্থানীয় পুলিশ ও মহাজনের মধ্যে গূঢ় যোগ-সাজসের প্রমাণ আবার তারা নূতন করে পেল। থানা কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র মহাজনের মর্জিমতো সবকিছু করছিল —তা নয়। তাদের হাবে-ভাবে আচারে-আচরণে ছিল আগের মতো ক্ষমতার উগ্র আস্ফালন। থানার হুকুম না মানলে তার পরিণাম কত সাংঘাতিক হতে পারে —এ সম্পর্কে সাঁওতালদের শাসানি দেওয়া হল। আবার তারা বুঝল, থানার লোক তাদের কী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে। এটাকে তারা শুধু মহাজন কেনারাম ভকত আর দারোগা মহেশ দত্তের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্রের বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখল না। অসহায় সাঁওতালদের রক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের ব্যর্থতা তাদের মানসিকতায় এক প্রতীকী রূপ পেল: তা হল গোটা ব্রিটিশরাজের ব্যর্থতা।

খুনের কারণ সম্পর্কে সিধু আর কানুর সাক্ষ্যে যথেষ্ট গরমিল, কিন্তু মিল আছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। তা হল, মহাজনদের কার্যকলাপ নিয়ে দারোগা আর তার বরকন্দাজদের সঙ্গে সিধুকানুদের প্রচণ্ড বচসা। তাদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের নিরুদ্ধ অন্ধ আক্রোশ চকিত খুনের মধ্য দিয়েই মুক্তি পায়। এ খুনের পরিণাম নিয়ে সাঁওতালদের কোনো ভয় ছিল না। ছিল না বিন্দুমাত্র অনুশোচনা।

সিধুর সাক্ষ্যমতে[১৪৮] : পাঁচকোঠীবাগান নামক এক জায়গা থেকে ফেরার পথে মহেশ দত্তর সঙ্গে তার দেখা হয়। দারোগাকে সে সরাসরি জিগ্যেস করে—পাঁচ বছর ধরে সাঁওতালরা মহাজনদের বিরুদ্ধে

নালিশ করে আসছে; তার কাছেও আর্জি পেশ করা হয়েছে; অথচ কোনো তদন্ত তখনো পর্যন্ত হয় নি। দারোগাদের কাছে এর কৈফিয়ত দাবি করা হয়। দারোগা কোনো সদুত্তর তো দিলই না, বরং সিধুকে গালিগালাজ করে। এর ফলে উত্তেজনা। তার ফলে খুন।

কানুর ব্যাখ্যা[১৪৯] ভিন্ন: দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর সিধু-কানু নানা জনের কাছে পরোয়ানা পাঠায়। জবাব দেওয়া দূরের কথা, কেউ প্রাপ্তি-স্বীকারও করে নি। এ অবস্থায় তাদের করণীয় সম্পর্কে সাঁওতালরা মাঝে-মাঝে একসঙ্গে মিলে আলাপ-আলোচনা করত। পুলিশ এসব জমায়েতের কথা জানতে পারে। থানার এক সেপাই একদিন এ-ধরনের এক জমায়েতে আসে, এবং উপস্থিত সব সাঁওতালদের গুনতে থাকে। তাকে বলা হল, সে যাতে দারোগার হাতে পরোয়ানাগুলো দেয়; আর যাতে দারোগা ঠিক ঠিক জায়গায় সেগুলো পাঠিয়ে দেয়। সে ভয়ানক রেগে যায়। যাবার আগে শাসিয়ে যায়, পরের দিন সে ফের আসবে, দারোগা আর একশ সেপাই নিয়ে। সত্যিই সে এল; সঙ্গে দু-গাড়ি ভরতি দড়ি। সেদিন সাঁওতালদের শিকারে যাবার কথা ছিল। দরকারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছিল। পথে পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে দেখা। দারোগা তাদের জিগ্যেস করে, কেন তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জড়ো হয়েছে। শিকারের কথা সে বিশ্বাস করে নি; বলল, তাদের আসল মতলব 'ডাকাতি'। সঙ্গে যে মহাজনরা এসেছিল, তারা এ নালিশই করল। এ অভিযোগে সাঁওতালরা তীব্র বিক্ষুব্ধ হয়। বলে, যদি মহাজনরা এর যথাযথ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহলে মিথ্যা নালিশের জন্য প্রত্যেক মহাজনকে পাঁচটাকা জরিমানা দিতে হবে। দারোগা এ প্রস্তাব গ্রাহ্যই করল না। গাড়িভরতি দড়ি দেখে কানু দারোগাকে বলে, কী করবে সে আগে থেকেই ঠিক করে এসেছে; তাদের বাঁধার জন্যই এত দড়ি আনা হয়েছে। এর থেকেই কথা-কাটাকাটি। কানু খুন করল দারোগার সঙ্গে আসা মানিকচাঁদ মহাজনকে। আর সিধু, দারোগা এবং আরো তিন-জন মহাজনকে। বরকন্দাজদের কেউ-কেউ খুন হল।

সাঁওতালদের ঘন-ঘন জমায়েতের ব্যাপারটা যে মহাজনদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর সাঁওতালরা তাদের উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ্যেই বলেছে। বস্তুত, মহাজনদের কাছেও পরোয়ানা পাঠিয়েছে। সম্মিলিত প্রতিরোধের জন্য সাঁওতালদের প্রস্তুতির কথা তাদের অজানা থাকার কথা নয়। তাদের ভয় ছিল, গত বছরের মতো আবার তাদের উপর হামলা হবে। সম্ভবত তারাই তৎপর হয়ে সাঁওতালদের উপর নজর রাখার জন্য থানা-পুলিশকে বলে। দলবল নিয়ে দারোগা যখন সাঁওতালদের শাসাতে যায়, কয়েকজন মহাজন সঙ্গেই ছিল। দারোগার সঙ্গে সাঁওতালদের বচসার একটা প্রধান কারণ: মহাজনদের বিরুদ্ধে তাদের এতবার নালিশেও কাজ হয় নি; অথচ মহাজনদের নালিশে দারোগা গাড়িভরতি দড়ি নিয়ে তাদের হুমকি দিতে আসে।

বিদ্রোহ শুরু হবার সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে ভাগলপুরের কমিশনারও নানা সূত্র থেকে জানতে পারেন[১৫০], মহাজনদের প্রসঙ্গ নিয়েই দারোগার সঙ্গে সাঁওতালদের বাক-বিতণ্ডা শুরু। সাঁওতাল-জমায়েতের খবর পেয়ে দীঘার থানাদার সেখানে পৌঁছলে, সাঁওতালরা নাকি তাকে বলে, বাঙালি মহাজনরা তাদের উপর ভয়ঙ্কর জোরজুলুম চালাচ্ছে; তাই শাস্তিস্বরূপ মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হোক; আর যারা-যারা এ জরিমানা দেবে না, তাদের ধরে এনে সাঁওতালদের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিসট্রেট প্রাথমিক তদন্তের ফলে জানতে পারেন[১৫১], দারোগার সঙ্গে দেখা হলে সিধু তাকে জিগ্যেস করে, সে তার পরোয়ানার জবাব দেয় নি কেন। দারোগা নাকি বলে, এর কারণ সে

থানায় ছিল না। এ নিয়েই বচসা।

দীঘা থানার এক বরকন্দাজ আর এক পেয়াদা ছিল প্রত্যক্ষদর্শী। তাদের সাক্ষ্যে[১৫২] তারা খোলা-খুলি বলেছে, দলবল নিয়ে দারোগার সাঁওতাল-জমায়েতে যাবার কী অর্থ হতে পারে, সিধু-কানু তা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। তারা দারোগাকে সোজা-সুজি বলে, তাদের বেঁধে নেবার জন্যই তার আসা। সিধু তাকে ব্যঙ্গের সুরে বলে, সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এলেই বরং ভালো করত। তর্কাতর্কির শুরু এখান থেকেই।

অন্য এক অসাঁওতাল প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে। সাঁওতালরা দারোগাকে জিগ্যেস করে—মতু পরেশনাথ বলে তাদের একজনকে দারোগা গ্রেপ্তার করল কেন? দারোগা বলে, গত বছর কয়েকটা ডাকাতি হয়ে গেছে; এ বছরও সাঁওতালদের নানা বেআইনি জমায়েত হয়েছে; মতুকে আটকে রাখার এই কারণ। সিধু বলে, তার ঘরেই দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে; দারোগা তাকেই বাঁধলে পারে। এভাবেই বচসার শুরু।

৯.৮

আমরা দেখেছি ধর্মের প্রভাবে সাঁওতাল প্রতিরোধ-আন্দোলন কী ভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেল। এ বিষয়ে দুটো জিনিস লক্ষণীয়। যে ধর্মীয় ধারণার ফলে এ রূপান্তর ঘটল, তা অংশত মাত্র পুরনো। আর অখণ্ড সাঁওতাল উপজাতিসত্তা সম্পর্কে যে বোধ বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল তাও পুরনো বিশ্বাসমাত্র নয়। ধর্মবোধ আর উপজাতি-সত্তাবোধে নূতন লক্ষণের উন্মেষ এবং বিকাশ লক্ষণীয়।

কোনো বিশেষ ব্যক্তির কাছে ভগবানের আবির্ভাবের ঘটনা প্রাচীন সাঁওতালি ধর্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সাঁওতাল ভগবান অদৃশ্য। এ অদৃশ্য শক্তির মূর্তরূপের কোনো উল্লেখ সাঁওতাল পুরাণে (মীথোলজিতে) নেই। শুধু তাই নয়, ঠাকুর যাঁর কাছে আবির্ভূত, সাঁওতালমানসে তিনিই রূপান্তরিত হয়ে গেলেন ঠাকুরে। সাঁওতাল ভগবানের কোন্-কোন্ বিভূতি তার উপর আরোপিত হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে সাঁওতাল সমাজে এ-বিশ্বাস ক্রমেই ব্যাপক হয়ে যায়, তিনি অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী। মূল ঘোষণায় সিধু-কানু শুধু বলেছিল, শত্রুর বিরুদ্ধে সাঁওতালদের বিদ্রোহে দিব্যশক্তি তাদের সপক্ষে হস্তক্ষেপ করবে। কিন্তু ক্রমেই এ অলৌকিক শক্তি নেতার উপর আরোপিত হয়। দিব্য-শক্তির হস্তক্ষেপ যেভাবেই ঘটুক, সাঁওতাল ধর্মবোধের নূতন একটা লক্ষণ এই ছিল যে, এ হস্তক্ষেপ কোনো ব্যক্তি, কোনো বিশেষ সাঁওতাল গ্রাম বা গ্রামসমষ্টির কল্যাণের জন্য মাত্র নয়, বা আকস্মিক কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারী থেকে পরিত্রাণের জন্য নয়; তা গোটা সাঁওতাল উপজাতির মুক্তির জন্য, এক আদর্শ সাঁওতাল সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য। নেতা কিন্তু তাঁর প্রচারে যে ভাষা, যে প্রতীক ব্যবহার করেছেন, তা একান্তভাবেই সাঁওতালপুরাণ, লোকগাথা ও সৃষ্টিতত্ত্বে ব্যবহৃত ভাষা আর প্রতীক। শত্রুদের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ বিচ্ছিন্ন, আঞ্চলিক কোনো ঘটনা নয়; এটা যেন সারা বিশ্বব্যাপী আসন্ন প্রলয়ের আভাস; কারণ 'পৃথিবী' 'পাপে' ভরে গেছে; প্রলয় আনবে নূতন সৃষ্টির অঙ্কুর; আকাশ থেকে নিরবচ্ছিন্ন 'অগ্নিদৃষ্টি'তে সাঁওতালশত্রুকুলের বিনাশ ঘটবে; আর এ ঘোর দুর্যোগে সময় সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যাবে; 'দুদিন দুরাত্রি একদিন একরাত্রি হবে।'

অখণ্ড সাঁওতাল উপজাতিসত্তা সম্পর্কে ধারণাতেও নূতন লক্ষণ সুস্পষ্ট। পুরাণ, লোকগাথা, সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা গ্রাম বা 'ক্ল্যান'-এর থেকে বৃহত্তর কোনো সত্তার ধারণা করতে পারত। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণাও ছিল; কিন্তু সেটা যেন অবচেতন যৌথ স্মৃতি। এ স্মৃতিও নানাভাবে

ঝাপসা হয়ে যেতে পারত। পাড়ায়-পাড়ায় রেষারেষি, সংঘর্ষ অবিরতই ঘটত। উল্লেখযোগ্য এই, আলাদা পাড়ার আলাদা প্রতীকচিহ্ন ছিল। দিখুদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রমবর্ধমান জটিলতার মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সাঁওতালদের ধারণা প্রখর হতে থাকে। কিন্তু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এক অভিন্ন সাঁওতালি অস্তিত্ব সম্পর্কে বোধ শুধু এভাবে বিকশিত হয় নি।

এ বোধের বিকাশে সাঁওতাল ধর্মগুরুর সচেতন প্রয়াসের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। যতদূর জানা যায় এ চেষ্টার শুরু বিদ্রোহের প্রায় বারো বছর আগে। এ সম্পর্কে যৎসামান্য যা আমরা জানতে পেরেছি, তা এক খ্রীষ্টান মিশনারির প্রতিবেদন[১৫৩] থেকে: এ চেষ্টা এক 'মাঝি' বা 'পরগনাইত' মোগো রাজার। তার বাস ছিল দামোদরের পাশে। বারো বছরের চেষ্টায় তার শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল তিনশোয়। সংখ্যাটা নগণ্য বটে; কিন্তু তারা এক বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত। নানা অঞ্চলের সাঁওতালদের ঐক্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ করাই ছিল প্রধান আদর্শ। নানা ধরনের জাদুবিদ্যা, তুকতাকে তারা ছিল কুশলী। সংগঠন ছিল গুপ্ত; এর শক্তির একটা প্রধান উৎস নেতার প্রতি অবিচল আনুগত্য।

বিদ্রোহ পর্যন্ত এ সংগঠনের প্রভাব স্থায়ী হয়েছিল কিনা বলা শক্ত। সম্ভবত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। এ ধরনের চেষ্টা নূতন করে শুরু হয় ১৮৫৪ সালের মে-জুনের কাছাকাছি কোনো সময়। 'ডাকাতি'র অভিযোগে কঠোর দণ্ড-বিধানের পর বহু গ্রামের মর্মাহত, বিক্ষুব্ধ মাঝিরা মিলে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে পরামর্শ করতে থাকে। কিন্তু বিশাল সাঁওতাল-অঞ্চলের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় বিদ্রোহের কয়েক মাস মাত্র আগে। তাও সম্ভব হয় সাঁওতালরাজ সৃষ্টির প্রেরণায়, এবং নূতন এক নৈতিক এবং ধর্মীয় চেতনার প্রভাবে। ধর্মগুরুরা কীভাবে এ চেতনা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করেছি।

৯.৯

দিব্যশক্তির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস বিদ্রোহের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করলেও সাঁওতালরা কিন্তু সম্পূর্ণ দৈবনির্ভর ছিল না। সামরিক প্রস্তুতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করেছে।

সংগঠনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দিক—বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়ানো সাঁওতালদের বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা। সম্ভবত, প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল সিংভূমের সাঁওতালদের সঙ্গে। সরকারি মহল প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল, সিংভূম থেকে সাঁওতালরা যাতে না আসতে পারে। কিন্তু দামিন এলাকার সাঁওতাল এবং সিংভূমের সাঁওতালদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের জন্য সরকারের এ চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নি। শেরউইলের বিবরণ থেকে জানতে পারি, দামিন অঞ্চলে যেসব সাঁওতাল সাম্প্রতিক কালে বসতি স্থাপনের জন্য এসেছে, তাদের একটা বড়ো অংশ এসেছে সিংভূম থেকে।[১৫৪]

অল্প সময়ের মধ্যে অন্যান্য সাঁওতাল অঞ্চলেও বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের এ আকস্মিকতা এবং বিপুল প্রসারে শাসককুল আতঙ্কিত এবং বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। হতবুদ্ধি ভাগলপুর ম্যাজিসট্রেট বিদ্রোহ দমনের এক উপায় বাতলাল। তার মতে, দামিন থেকে সব সাঁওতালদের 'উন্‌মূলন' ছাড়া শান্তি আসবে না। 'তারা একজোট হয়ে বিদ্রোহ করেছে।[১৫৫]

অন্যান্য উপজাতিদের মধ্যেও বিদ্রোহের সপক্ষে প্রচার চালানো হয়েছিল। বিদ্রোহে তাদের ভূমিকা ঠিক কী ছিল, তা বলা শক্ত। তবে পাহাড়িয়ারা ছাড়া কেউ সাঁওতালদের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে নি।

বিদ্রোহ অতিক্রান্ত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, এ কথার উল্লেখের পর বর্ধমান বিভাগের কমিশনার বলেন: 'আরো উদ্বেগের কারণ, পাশাপাশি সব জেলাতেই এটা ছড়িয়ে পড়ছে। সাঁওতাল, ধল,

ধানুকদের বড়ো-বড়ো দল নলহাটি থেকে নান্‌গুলিয়া পর্যন্ত পাহাড়ের পাদদেশে জমা হয়েছে।'[১৫৬]

আগেই বলেছি, প্রধান ব্যতিক্রম পাহাড়িয়া উপজাতি। বিদ্রোহীদের প্রতি কোনো সহানুভূতি তারা তো দেখায়-ই নি, সবরকমে তাদের প্রতিকূলতা করেছে। বিদ্রোহের শুরুতেই ঔরঙ্গাবাদের সাব-ডিভিশন্যাল অফিসার উল্লসিত হয়ে জানায়: 'একমাত্র ভালো খবর, পাহাড়িয়ারা বিদ্রোহে যোগ দেয় নি।'[১৫৭] রাজমহল ও ভাগলপুরের উত্তরাংশে সাঁওতাল-বিরোধী অভিযানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পাহাড়িয়াদের থেকে বিশেষ সাহায্য পায়। সাঁওতালদের গোপন আস্তানার খবর তারাই সৈন্যদের দিয়েছিল।[১৫৮]

এটার ব্যাখ্যা সহজ। পাহাড়িয়াদের আস্তে-আস্তে উচ্ছেদ করেই সাঁওতালরা নিজেদের চাষাবাদ বাড়ায়। পাহাড়িয়ারা তাই ক্রমেই পিছু হটতে থাকে; সাঁওতালদের সঙ্গে না পেরে উঠে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে চলে যায়। সাঁওতালরা তাই তাদের জাতশত্রু।

উপজাতিরা ছাড়া সাঁওতাল সমাজ ও অর্থনীতির সঙ্গে দীর্ঘকাল গভীরভাবে সম্পৃক্ত নানা সম্প্রদায়ও বিদ্রোহীদের বিশেষ সাহায্য করেছিল। এক য়ুরোপীয় নীলকরের প্রতিবেদন-মতে, পাঁচটা জাতের লোকদের বিদ্রোহীরা বিন্দুমাত্র ক্ষতি করে নি—কামার, ছুতোর, কুমোর, তেলী আর গোয়ালা।[১৫৯] বিশেষ করে, কামার এবং গোয়ালা বহু জায়গায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র তৈরি এবং মেরামতিতে কামারের সাহায্য ছিল অপরিহার্য। গ্রাম "লুঠ" করার সময় দুটো জিনিসের উপর সাঁওতালদের বিশেষ নজর ছিল—খাদ্যশস্য আর লোহা। লুঠের লোহা তারা সঙ্গে-সঙ্গে কামারকে দিয়ে দিত। অস্ত্রশস্ত্রের অব্যাহত যোগান এতেই সম্ভব হয়েছিল। গোয়ালারা পাহাড়ি পথঘাটের অন্ধিসন্ধি জানত—সম্ভবত গোরুর পাল নিয়ে তাদের হামেশা ঘুরতে হত বলেই এটা সম্ভব হত। সৈন্যদলের আসার খবর তারা সঙ্গে-সঙ্গে সাঁওতালদের জানিয়ে দিত।

সরকারি মহলে তাই এসব সম্প্রদায়ের উপর তীব্র আক্রোশ ছিল। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার জানান: 'সব পাওয়া খবর থেকে মনে হচ্ছে, গোয়ালা, তেলী এবং অন্যান্য জাতের লোকেরাই সাঁওতালদের হিংসার কাজে প্ররোচিত করেছে, তারা সংবাদ যোগায়; সাঁওতালদের মাদল বাজায়; অন্য সব কাজে তাদের নির্দেশ দেয়; তাদের হয়ে গোয়েন্দাগিরি করে ···লোহারেরা তাদের তীর আর কুড়োল বানিয়ে দেয়।'[১৬০]

এ বিষয়ে শেরউইল তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন[১৬১]: 'গতকাল আমি নিজে দেখেছি, গোয়ালারা খবর পাচার করছে; আর সাঁওতালদের কাছে দই আর দুধ নিয়ে যাচ্ছে; আমাদের সৈন্যদলের আসার খবর তারাই মাদল বাজিয়ে সাঁওতালদের জানিয়ে দেয়···এ গোয়ালারাই সাঁওতালদের লুঠের জন্য নিয়ে যায়; আর দেখিয়ে দেয় কোথায় লুঠের জন্য সেরা মাল জুটবে।' অন্য এক সরকারি প্রতিবেদন-মতে, গণপৎ গোয়ালা ছিল 'প্রধান গোয়েন্দা ও পথ-প্রদর্শক।'[১৬২] পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভাগলপুরের শরিয়াহাট গ্রামের বেচু রাউত গোয়ালাকে বিদ্রোহে বিশিষ্ট ভূমিকা নেওয়ার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়।[১৬৩] তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, কানু সাঁওতাল তাকে 'সুবা' বলে মনোনীত করে; পদমর্যাদার প্রতীক হিসেবে কানু নিজেই তার মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দেয়। যেদিন (১৭ নভেমবর) তাকে ধরা হয়, সেদিন এক সাঁওতাল-জমায়েতে সে সভাপতি হিসেবে কাজ করছিল।

জামতারার এক গ্রামে হানা দিয়ে সৈন্যরা যে ষাট জন বিদ্রোহীকে গ্রেপ্তার করে, তার মধ্যে চল্লিশ জন অসাঁওতাল। জাতিতে তারা তেলী, কুমোর, কুলওয়ার। 'সর্বপ্রকারে তারা বিদ্রোহীদের তাদের তৈরি জিনিস দিয়ে সাহায্য করেছে। সবাই জানে, এদের সাহায্য ছাড়া সাঁওতালরা কিছুই করতে পারত

না।'[১৬৪]

সাঁওতালরা জানত, শুধুমাত্র নিজেদের শক্তি, অন্যান্য উপজাতি বা সম্প্রদায়ের সাময়িক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে প্রবলপ্রতাপশালী শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। প্রথম থেকেই তাদের চেষ্টা ছিল কোনো-কোনো স্থানীয় জমিদার বা বাইরের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির সমর্থন আর সাহায্য যেন তারা পায়। জমিদার সম্পর্কে তারা জানত; কিন্তু সাঁওতাল-অঞ্চলের বাইরের কোনো-কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির কথা তারা শুনেছিল মাত্র; তাদের সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। উল্লেখযোগ্য এই, তবুও নানা ক্ষীণ যোগসূত্র ধরে সাঁওতালরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। সামরিক প্রস্তুতির জন্য চেষ্টার কোনো কসুর তারা করে নি।[১৬৫]

অন্যদিকে নেতারা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, যাতে বিদ্রোহীদের নিজেদের মধ্যে যোগসূত্র অব্যাহত থাকে, এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা আর সংহতি অটুট থাকে। সব নির্দেশ আসত সিধু-কানুর থেকে। বিভিন্ন অঞ্চলের সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল তাদের মনোনীত প্রতিনিধির উপর। মৌখিক এবং লিখিত নির্দেশ পাঠানো হত দূত মারফত। লুঠের মাল সম্পর্কে কঠোর নির্দেশ ছিল, সবকিছু যেন নেতা বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খাদ্যশস্য সম্ভবত এ-নির্দেশের আওতায় ছিল না। স্থানীয় বিদ্রোহীদের প্রয়োজনেই তা ব্যবহার করা হত। নেতারা বিশেষ সতর্ক ছিল, যাতে লুঠের মালের বখরা নিয়ে কোন্দল আন্দোলনের সংহতি নষ্ট না করে। পরিষ্কার বোঝা যায়, পরে-পরে এ নির্দেশ সবক্ষেত্রে মানা হয় নি।

বিদ্রোহীদের সংগঠন যতই মজবুত হোক না কেন, ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। একেবারে গোড়ার দিকে কোনো-কোনো সাফল্যে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তারা ভাবল, অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাক্রম নিষ্ফল হয়ে যাবে, সিধু-কানুর এ ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ হতে চলেছে। কিন্তু অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সৈন্যের হাতে সাঁওতালদের অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির কথা কোথাও অজানা থাকল না। নেতাদের মন্ত্রপূত শরীর ব্রিটিশদের গোলাগুলিতে অক্ষত থাকবে, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। এসব ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সাঁওতালদের সংগঠনও ক্রমেই দুর্বল হয়ে যায়। খুদে ব্যবসায়ীরা সিধু-কানুর কাছে নালিশ জানাল, সাঁওতালরা যথেচ্ছ লুঠতরাজ করছে। নেতাদের থেকে আবার কড়া নির্দেশ এল, এসব যাতে আর না ঘটে। কিন্তু লুঠতরাজ সম্পর্কে বিদ্রোহীদের মনোভাবও তখন পালটে গেছে। তা আর সংগঠনের শক্তিবৃদ্ধির উপায় বলে গণ্য হল না। ব্যক্তিগত স্বার্থ সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠল।[১৬৬]

কানু সাঁওতাল কিন্তু দৈববাণীর অমোঘতায় বিশ্বাস হারায় নি। তার ধারণা, তার ভবিষ্যদ্বাণীর নিষ্ফলতার আসল কারণ, তার অনুগামীদের চারিত্রিক অশুদ্ধি। নির্দিষ্ট দিনে দেবতার পুনরাবির্ভাব না ঘটার কারণ হিসেবে কানু বলেছিল, দেবতার পূজার উপচার হিসেবে সাঁওতালদের আনা দুধ বিশুদ্ধ নয়। রাজপুরুষদের কাছে বন্দী কানু বলে: 'অনেক গোলা পড়তে থাকে; সিধু এবং আমি দুজনেই জখম হই। ঠাকুর বলেছিলেন, (ব্রিটিশের) বন্দুক থেকে জল বেরুবে; কিন্তু আমার সৈন্যরা অপরাধ কিছু করেছে। তাই ঠাকুরের কথা ফলল না।'[১৬৭]

বন্দী সব সাঁওতালরা কিন্তু একই ধরনের সাক্ষ্য দেয়: এ নিষ্ফলতা থেকে আসে চরম মোহভঙ্গ, আর তীব্র এক হতাশাবোধ। 'এসব ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হল। কত সাঁওতাল হতাহত হল; বাকিরা ধরে নিয়েছে, সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া নিরর্থক।'[১৬৮] নদীয়া বিভাগের কমিশনারকে কয়েকজন ধৃত সাঁওতালের স্বীকারোক্তির কথা জানানো হয়: 'তারা অবশ্যই জানত, তাদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠানো হবে; কিন্তু সিধু-কানু তাদের বলেছে, গাদা-বন্দুক থেকে শুধুমাত্র জল বেরুবে। এটা যে কী মারাত্মক

ভুল, মহেশপুরে তা তারা বুঝল। একটা গোলা সিধুর বাহুতে এসে পড়ে, এবং তার বুকের মধ্যে ঢুকে যায়; কানুও বুকের পাশে আঘাত পায়।'[১৬৯]

এ পরাজয়ের মুহূর্তে বিদ্রোহীদের নৈতিক বল সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। সিধু-কানুকে অ্যাদ্দিন তারা 'ঠাকুর' বলে মেনেছে; অথচ তাদের নির্দেশ তারা এখন হেলায় উপেক্ষা করল। তাদের স্বার্থপ্রণোদিত আচরণে সংগঠনের সংহতি প্রায় লোপ পেল। নেতাদের কঠোর শাসানিও বিভ্রান্ত অনুগামীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে পারল না। যে প্রেরণা এতদিন সব সাঁওতাল-কর্মপ্রয়াসকে উদ্দীপিত করেছে, তার উৎস ক্রমেই শুকিয়ে এল।

৯.১০

১৮৭৪ সাল পর্যন্ত কোনো-কোনো অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা আবার মাঝে-মাঝে সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু ১৮৫৫-র 'হুলে'র মতো ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে নি।

এর কারণ সাঁওতালরা নিজেরাই অংশত ব্যাখ্যা করেছে। তাদের অনেকেই বলেছে, 'হুলে'র নিষ্ফলতাই নূতন আন্দোলন সম্পর্কে তাদের দ্বিধার প্রধান কারণ। এ ব্যর্থতাবোধের সঙ্গে জড়িত ছিল এক পরম নিশ্চিত প্রত্যয়ের বিলোপ। তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, লড়াইয়ে তারা অপরাজেয়, অপ্রতিরোধ্য। এ বিশ্বাস ভেঙে গেল। চোখের সামনে তারা দেখল, কতশত সাঁওতাল লড়াইয়ে অসহায়ভাবে প্রাণ দিয়েছে; কত গ্রাম পুড়ে ধ্বংস হয়েছে; কী বিপুলপরিমাণ শস্য সৈন্যরা নির্বিচারে জ্বালিয়ে দিয়েছে। সাঁওতালরা পরে বলত: দিখু-দুশমনদের হাত থেকে নিস্তার পাবে বলে তারা হুলে নেমেছিল; পরিণামে তাদের ভাগ্যে জুটেছে সীমাহীন দুর্দশা; শক্ত হয়েছে দিখুদের হাত; পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে কত সাঁওতাল এখন উন্মূল; দিখুদের 'গোলামি' করে কোনোরকমে তারা দিন গুজরান করছে।[১৭০]

তা ছাড়া, ব্রিটিশ সৈন্যের দুর্ধর্ষ শক্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সাঁওতালদের মনের উপর এক স্থায়ী প্রভাব হয়ে রইল। তারা খোলাখুলি বলত, ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই মূঢ়তা বই কিছু নয়। ১৮৭৪ সালের বিদ্রোহের নেতা ভগীরথ মাঝি বলেছিল: 'নির্বোধ আমি মোটেই নই; আমি দুটি মাত্র আঙুল যদি তুলি, তারা (ব্রিটিশেরা) পাঠাবে পুরো এক পলটন।'[১৭১] ভগীরথ-অনুগামীদের বানানো নূতন মন্দির যখন সৈন্যরা এসে ভেঙে দেয়, মন্দিরের সাঁওতাল পাণ্ডা খুবই 'বিষণ্ণ' হয়; 'অবাক' আর 'বিরক্ত' হল গ্রামের মাঝি; কিন্তু সবাই বলল, 'আচ্ছা, সরকার কা হুকুম।'[১৭২] সাঁওতাল পরগনার কমিশনারের কাছে সাঁওতালরা নাকি শপথ করে বলেছে, বিদ্রোহ করার কোনো ইচ্ছেই তাদের নেই। 'আমার প্রশ্নের উত্তরে সব জায়গা থেকে মোটামুটি এক ধরনের জবাব পেয়েছি—'গতবারের বিদ্রোহ, এবং তার ফলস্বরূপ আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ভুলে যাবার মতো বোকা আমরা নই।'[১৭৩]

শুধু পরাজয়ের গ্লানি, আর মোহভঙ্গজনিত হতাশাই নূতন বিদ্রোহ সম্পর্কে তাদের দ্বিধা আর সতর্কতার কারণ নয়। বিদ্রোহের উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলার মতো শক্তিও তাদের ছিল না। এর প্রধান কারণ, 'হুলে'র সময় এবং পরে তাদের যৌথ গ্রামীণ সংগঠন প্রায় ভেঙে যায়। অনেক গ্রামপ্রধান (মাঝি) প্রাণ হারিয়েছে; অনেকে শাস্তির ভয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। যারা গ্রামে থেকে গেল তাদের অনেকেই পুরনো মর্যাদা এবং অধিকার বজায় রাখতে পারে নি। প্রধানত এটা জমিদারি এলাকায় ঘটেছে। বিদ্রোহের পরে-পরেই জমিদারি পরিচালনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে প্রথমে য়ুরোপীয়-পরিচালিত জমিদারিতে, পরে অন্য জমিদারিতেও। বিদ্রোহে যেসব মাঝির সক্রিয় ভূমিকা ছিল, জমিদার স্বভাবতই গ্রামের উপর তাদের পুরনো কর্তৃত্ব খর্ব করতে চায়। তা ছাড়া, তারা ভাবল, পুরনো মাঝিদের বদলে

বাইরের কাউকে এনে বসালে খাজনা বাড়ানোর কাজটা অনেকটা সহজ হয়। তারা এক নূতন ফন্দি আঁটল। তারা বলতে শুরু করল, ক্ষমতার দিক থেকে মাঝিরা অন্যান্য অঞ্চলের অস্থায়ী ইজারাদারদের মতোই; তাদের একটিমাত্র দায়িত্ব, কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করে জমিদারের হাতে তুলে দেওয়া। গ্রামের নানা পালে-পার্বণে, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য তাদের যে বিশিষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল, জমিদার তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। জমিদার চাইল, তার মর্জিমতো মাঝিরা নূতন হারে খাজনা আদায় করুক; যদি তারা গররাজি হয়, তাহলে তাদের সরিয়ে দিয়ে বাইরের লোককে এ দায়িত্ব দেওয়া হবে। মাঝিরা এ নূতন বিধান মানে নি; তাদের সব স্বাতন্ত্র্য এবং মর্যাদা হারিয়ে তারা শুধুমাত্র জমিদারের হুকুমবরদার হতে চায় নি। আদালত কিন্তু তাদের যুক্তি মানল না; রায় দিল, গ্রামে মাঝিদের স্থায়ী কোনো অধিকার নেই। ফলে, পুরনো মাঝিরা টিকে থাকুক বা না থাকুক, সাঁওতালদের গ্রামীণ সংগঠনের সঙ্গে তাদের যোগ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে এল।[১৭৪]

[ক্রমশ

সূত্র-নির্দেশ ও টীকা

১২৯. Bengal Judicial Proceedings; 14 Feb. 1856. No. 166. বীডওয়েলের কাছে W. C. Taylor (East India Railway)-এর চিঠির তারিখ ২ অকটোবর, ১৮৫৫

১৩০. আগেকার আবেদন এবং আর্জির সঙ্গে এসব পরোয়ানার পার্থক্য মৌলিক। এখানে বিশেষ কোনো সাঁওতাল অঞ্চলের অভিযোগ নেই। অভিযোগ আসছে নূতন সাঁওতাল ধর্মগুরু সিধু-কানুর থেকে; অভিযোগ স্থানীয় আদালত বা থানার কাছে নয়; সাঁওতালদের সব শত্রু-গোষ্ঠীর কাছে, সরাসরি। সবথেকে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য— এ পরোয়ানা আসলে এক সতর্কবাণী: সাঁওতালদের সম্পর্কে দিখুরা তাদের অভ্যস্ত হালচাল পালটে ফেলুক; পরোয়ানা সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানাতে হবে।

১৩১ A. C. Bidwell-কে 'Special Commissioner for the Suppression of the Sonthal Insurrection' নিযুক্ত করা হয়। বিদ্রোহের কারণ, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন লেখেন তিনি।

১৩২. Bengal Judicial Proceedings; 23 Aug. 1855, No. 221। এ পরোয়ানার নকল ভাগলপুর ম্যাজিসট্রেটের চিঠির (২৪ জুলাই ১৮৫৫) সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল।

১৩৩. Bengal Judicial Proceedings; 4 Oct. 1855, No. 20.

১৩৪. Bengal Judicial Proceedings; 23 Aug. 1855, No. 219.

১৩৫. এ চিঠির সূত্রের জন্য পাদটীকা নং ১২৯ দ্রষ্টব্য

১৩৬. Bengal Judicial Proceedings; 19 July, 1855, No. 17. 'শ্রীকুণ্ড' থেকে টেলরের লেখা চিঠির তারিখ 7 July 1855.

১৩৭. Bengal Judicial Proceedings; 19 July, 1855, No. 2. A. Eden-এর চিঠির তারিখ ৯ জুলাই ১৮৫৫।

১৩৮. Bengal Judicial Proceedings; 19 July, 1855, No. 3.

১৩৯. Bengal Judicial Proceedings; 30 Aug. 1855, No. 129. নদীয়া বিভাগের কমিশনারের কাছে এ বিবৃতিসহ লেখা চিঠির তারিখ ২১ জুলাই, ১৮৫৫।

১৪০. Bengal Judicial Proceedings; 6 Sept. 1855, No. 118; বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের চিঠির তারিখ ৯ অগস্ট ১৮৫৫। Para 5.

১৪১. Bengal Judicial Proceedings; 23 Aug, 1855, No. 116. বীরভূম ম্যাজিসট্রেটের চিঠির তারিখ ১৯ জুলাই, '৫৫।

১৪২ Bengal Judicial Proceedings; 23 Aug. 1855, No. 57.

১৪৩. Bengal Judicial Proceedings; 19 July, 1855, No. 46.

১৪৪. Bengal Judicial Proceedings; 30 Aug. 1855, No. 30.

১৪৫. Bengal Judicial Proceedings; 4 Oct.

1855, No. 60. ২২শে সেপটেম্বর ১৮৫৫-এ লেখা বীরভূম কালেক্টরের ডায়েরি।

১৪৬. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July, 1855, No. 21. "The Deposition of Sheikh Summoo taken on oath on 9 July 1855 before the Assistant Magistrate of Aurangabad.

১৪৭. Bengal Judicial Proceepings ; 8 Nov. 1855, No. 26. 'Examination of Sedoo Sonthal, late Thacoor'.

১৪৮. একই

১৪৯. Bengal Judicial Proceedings ; 20 Dec. 1855, No. 83. 'Statement of Kanoo Manjhee of Bagnodee, Tacoor Sobah, aged 34...'

১৫০. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 205. ভাগলপুর কমিশনারের চিঠির তারিখ ২১ জুলাই, '৫৫।

১৫১. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 306.

১৫২. একই ; 19 July, 1855 ; No. 45. ভাগলপুর ডিভিশনের কমিশনারের কাছে তারা সাক্ষ্য দেয়। কমিশনারের চিঠির তারিখ, ১০ জুলাই, ১৮৫৫।

১৫২. একই ; 14 Feb. 1856 ; No. 161. Droese, Church Mission Society to Bidwell, 8 Oct. 1855. 'মোর্গো রাজা'কে Droese বলেছেন : 'a Sonthal Chief, a Chief of Chiefs'.

১৫৪. একই ; 14 Feb. 1856, No. 159. W. S. Sherwill to Bhagalpur Commissioner, 24 July, 1855, Para 4.

১৫৫. একই ; 23 Aug, 1855; No. 47. ভাগলপুর ম্যাজিস্ট্রেট লেখেন (16 July 1855) : '...the entire extirpation of the Sontal tribe will be the only way to ensure peace' ; Para 2

১৫৬. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 63. কমিশনারের চিঠির তারিখ ১৮ জুলাই, ১৮৫৫।

১৫৭. Bengal Judicial Proceedings ; 19 July 1855, No. 2.

১৫৮. Bengal Judicial Proceedings ; 6 Sept. 1855, No. 76. Officiating Secretary to the Government of India, Military Department-এর চিঠিতে (20 Aug. 1855) পাহাড়িয়াদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'the hillmen who are the deadly enemies of the Sonthal tribes, and are now aiding us in hunting them out of their jungles"

১৫৯. Bengal Judicial Proceedings ; 14 Feb. 1856, No. 160. J. H. Barnes to Bidwell, 15 Oct. 1855.

১৬০. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855 ; No. 301. কমিশনারের চিঠির তারিখ 28 July 1855। কমিশনারের মতে, এদের এবং বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সাঁওতালদের একই ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত। Para 7

১৬১. Bengal Judicial Proceedings ; 23 Aug. 1855, No. 303. শেরউইলের চিঠির তারিখ ২৮ জুলাই, ১৮৫৫।

১৬২. Bengal Judicial Proceedings ; 30 Aug. 1855, No. 140. ভাগলপুর কমিশনারের চিঠিতে (3 Aug. 1855), গণপতকে বলা হয়েছে : 'the head spy and guide'. Para I.

১৬৩. Bengal Judicial Proceedings ; 6 Dec. 1855, No. 170. বেচুর এ কাজকে বলা হয়েছে : 'an overt act of rebellion'.

১৬৪. Bengal Judicial Proceedings ; 22 Nov. 1855, No. 60. H. L. Pester নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষের চিঠি (3 Nov. 1855)।

১৬৫. হাজারিবাগে "মীর সাহেব" বলে পরিচিত একজনের সঙ্গে সাঁওতালরা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে। সরকার পক্ষের অনুমান, মীর সাহেব আসলে সিন্ধুপ্রদেশের প্রাক্তন এক আমীর আব্বাস আলি। সাঁওতালরা তাকে 'সুবা' বলে জানত ; বলত, সে কোনো রাজার ছেলে। মহেশ দত্তের খুন হবার (৬ জুলাই '৫৫) চারদিন আগে সিধু মাঝি ধানু মাঝির হাত দিয়ে তার কাছে চিঠি পাঠায়। নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্য ছিল, আসন্ন বিদ্রোহে তার সহযোগিতা চাওয়া। 'মীর সাহেবের' সঙ্গে সাঁওতালদের আগের পরিচয় ছিল খুবই সামান্য। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার খোঁজ নিয়ে জানেন, মীর সাহেবের শিকারে যাওয়ার সময়

সাঁওতালদের কেউ-কেউ শিকার ধরার কাজে সাহায্য করার জন্য যেত ('jungle-beaters')। মীর সাহেবের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কিন্তু যোগাযোগ হয়নি। সে সময় সাহেব নাকি হাজারিবাগে ছিল না। চিঠি পড়ে তার এক 'ভৃত্য' নাকি বলে, সাঁওতালদের উচিত সরকারের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেলা। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সরকারি দলিল দ্রষ্টব্য: (ক) Bengal Judicial Proceedings; 30 Aug. 1855, No. 146. ভাগলপুর কমিশনারের সহকারীর লেখা চিঠি (২৫ জুলাই '৫৫); (খ) Bengal Judicial Proceedings; 6 Sept. 1855, No. 107. ভাগলপুর কমিশনারের লেখা চিঠি (২০ অগস্ট, ১৮৫৫). (গ) Bengal Judicial Proceedings; 6 Dec. 1855, No. 52. "Statement of Ranjeet Manjee". (রণজিৎ এক সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে)।

১৬৬. Bengal Judicial Proceedings; 30 Aug. 1855, No. 130. সিধু-কানুর কাছে লেখা কিছু চিঠি এবং তাদের কোনো-কোনো উত্তর এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে এ গোপনীয় চিঠিগুলি পড়ে। তাদের একটা মূল কথা হল: ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ক্রমেই বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলছে; ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে পেরে ওঠা খুবই শক্ত হয়ে উঠছে; তাই সিধু-কানু যাতে যত সত্বর সম্ভব, আরো সামরিক সাহায্য পাঠান। 'Paper No. 6' বলে উল্লেখিত চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে, সাঁওতালরা যে নির্বিচারে গ্রাম 'লুঠ' করছে, তার জন্য সিধু-কানুর সম্মতি আছে কিনা। 'সব শ্রেণীর ব্যবসাদারেরা' সিধু-কানুকে লিখছে, তারা যেন সেখানে এসে সব খোঁজ নেয়। এসব ব্যবসাদারের ধারণা, এ লুঠে সিধু-কানুর কোনো সম্মতি নেই; সাঁওতালরা তাদের নির্দেশ সরাসরি 'অমান্য' করছে।

১৬৭. Bengal Judicial Proceedings; 20 Dec. 1855, No. 132. 'Examination of Kanoo Sonthal'.

১৬৮. Bengal Judicial Proceeding; 6 Sept. 1855, No. 118. পাঁচজন সাঁওতাল মাঝি বর্ধমান বিভাগের কমিশনারকে এসব কথা বলে। তাদের নাকি বলা হয়েছিল: 'they were assured that no one could stand before them, that none of their people should be killed, that [if killed] they would be restored to life...that a small knife should have a miraculous power to sweep away a mass of opponents...' Para 5. কমিশনারের চিঠির তারিখ ৯ অগস্ট, ১৮৫৫।

১৬৯. Bengal Judicial Proceedings, 30 Aug. 1855, No. 129; কমিশনারের কাছে লেখা চিঠির (২১ জুলাই) Para 11.

১৭০. *Man in India*: Rebellion Number, Dec. 1945; W. J. Culshaw & W. G. Archer, "The Santal Rebellion" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। Chotrac Desmanshi-র মন্তব্যের অনুবাদ: '...We Santals came in sorrow and misfortune through the rebellion...instead of blessing a great curse fell upon us...after the rebellion we Santals began to scatter because of our hunger. For hunger, we Santals who set out to rule ourselves attached ourselves by hundreds to Deko for our living. Many returned to Sikar as day labourers, and for the most part people went to Bengal to work for Dckos as day labourers...'. P. 222.

১৭১. Bengal Judicial Proceedings; Nov. 1874, Nos. 1-3; Boxwell, Offg. Deputy Commissioner, Sonthal Parganas to the Commissioner, Sonthal Parganas, 1 Oct. 1874, Para 46.

১৭২. একই; Para 52.

১৭৩. Bengal Judicial Proceedings; June 1861, No. 371, Offg. Commissioner of the Sonthal Parganas to the Govt. of Bengal, 24 May 1861; Para 25.

১৭৪. Bengal Judicial Proceedings; July 1871; No. 156; Demi-official from A. Money Commissioner, Sonthal Parganas, 21 June, 1871. কমিশনারের মতে: 'Since 1859 it [Rent Act X] has been the guide in all rent disputes...The Zamindars and the law recognise the manjee in his capacity of settlement holder, merely

as a farmer.' ইজারাদার ('farmer') হিসেবে মাঝির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর জমিদার যদি খাজনা বাড়িয়ে দেয়, তাহলে মাঝির করণীয় কী ? কমিশনারের মতে, মাঝি এ বিষয়ে আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করবে। আদালতের মামলা ব্যয়সাপেক্ষ বলে মাঝি মামলার ঝামেলায় যেতে চাইত না। আর মাঝি জমিদারের খাজনা বাড়ানোর দাবি মেনে নিলে গ্রামের সাঁওতালরা স্বেচ্ছায় মাঝিকে দেয় অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দিত। সাঁওতালদের সমাজ-সংগঠনে এ সংহতিবোধ কমিশনার বুঝতে চান নি। তাই তাঁর এ উদ্ভট সিদ্ধান্ত : 'Unfortunately the Sonthals are stupid, and as a rule, consider their lot and the manjee's lot as bound up together.'

বাঙলা, বাংলা

বাঙলা বর্ণমালা থেকে অনুস্বার (ং) তুলে দেবার একটি প্রস্তাব এসেছে। প্রস্তাবটি ভালো। সমর্থনযোগ্য। অনুস্বারের উচ্চারণ 'ঙ' দিয়ে ঠিকই প্রকাশ করা যায়।

প্রস্তাবকরা কি অহঙ, এবঙ, বরঙ, সুতরাঙ লিখতে রাজি ? এবঙ, সরাসরি সংস্কৃত থেকে উদ্‌ধৃতিতে ? যেমন, 'জানামি ত্বাঙ প্রকৃতিপুরুষঙ কামরূপঙ মঘোনঃ ॥'

আর-একটি সমস্যা। 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের নামের বানানে কী করা হবে? ওঁরা না পালটানো পর্যন্ত সম্ভবত ওঁদের সংবিধানসম্মত নামের বানান যা আছে তা-ই রাখতে হবে।

তিন বোন ১

গুণময় মান্না

রবিবারের সকাল, বেলা নটার কাছাকাছি। বাজারটা সেরে আসা দরকার, বেশি দেরি হলে স্ত্রী বিরক্ত হবেন বুঝতে পারছি। কিন্তু এমন আলসেমি লাগছে যে আরাম-কেদারার হেলান ছাড়তেই ইচ্ছে করছে না, ওঠা তো দূরের কথা। খবরের কাগজটা চোখের সামনে রাখছি একবার, একবার টিপয় থেকে তৃতীয় কাপ চায়ের শেষ চুমুক দিচ্ছি, ফস করে দেশলাই জ্বালছি সিগ্রেট ধরাবার জন্য। শরীরটা অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে দেখছি। বছরখানেক পরে রিটায়ার করব, তখন না জানি কী হাল হবে।

একটি ষোলো-সতেরো বছরের মেয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কাগজ আর সিগ্রেট সরিয়ে একবার চোখ না তুলে পারলাম না। মেয়েটির মুখে একচিলতে মুচকি হাসি, চোখে বোধহয় একটু দুষ্টু-বুদ্ধি। পরেছে শালোয়ার-পানজাবি, উড়না সমেত। তিনটে তিনরকম রঙের। আমিই পালটে মনে-মনে হাসলাম—মেয়েটির সাজবার শখ খুব, কিন্তু রুচি নেই, নেই হয়তো সঙ্গতিও। চোখে ধ্যাবড়া কাজল, শালোয়ারটা খাটো, তবু সেটাই পরেছে।

কে, কেন এসেছে এসব প্রশ্ন না করেই চালান করে দিলাম, 'ভিতরে মাসিমার কাছে যাও, ডান দিকে দরজা…'

খবরের কাগজে চোখ রাখলাম, কিন্তু আজকাল মনঃসংযোগ হয় না দেখছি। তা ছাড়া সব বাসি, একঘেয়ে খবর—কোথায় তেলের ট্যাঙ্কারের ওপর আক্রমণ, কোন্ রাজ্যের শাসকদলের বিধায়করাই বিদ্রোহী, আর নারীনির্যাতন। কাকে পুড়িয়ে মেরেছে, কতগুলোকে চাকরি দেবার ছল করে এনে বিক্রি করে দিয়েছে। দিনকাল যে কী পড়ল! কই, বছর দশ আগেও মেয়েদের নিয়ে এত খবর ছিল না। বিশেষ করে এইসব ঝক্কারজনক খবরগুলো।

রাখলাম কাগজখানা, সিগ্রেটে শেষ টান দিয়েছি,

এইবার উঠতেই হবে—ভেতর থেকে স্ত্রীর রূঢ় কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'কী নাম, মিনতি? মিনতিই বটে ...ওঁদের অফিসের বেয়ারার মেয়ে? তা আমার কাছে কেন, ওঁর কাছেই যাও...'

এই রে, অজান্তেই সাপের লেজে পা দিয়ে ফেলেছি। তখন না ভেবেই মেয়েটিকে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম—মানে, এইটুকু ভেবে যে মেয়েরা মেয়েদের কাছেই যাক। ভুলেই গিয়েছিলাম, স্ত্রী মেয়েদের দু-চক্ষে দেখতে পারেন না, বিশেষ করে এই এখনকার উচ্চিংড়ে (কথাটা তাঁরই) মেয়েগুলোকে। আমাদের দুটিই ছেলে, প্রবীর বর্তমানে বিদেশে আছে রিসার্চের জন্য; ছোটো সুবীর উচ্চ-মাধ্যমিক দিয়ে জয়েনট এন্‌ট্র্যানসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমাদের মেয়ে নেই। স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে গর্ব করেন, তা গর্ব করার কারণ আছে বটে, আবার মেয়ে নেই বলেও তাঁর গর্ব। বলেন, 'আমার খুব ভাগ্য ভালো আমার গর্ভে মেয়ে জন্মায় নি...' মানে, তিনি আজকালকার মেয়েদের রীত-ব্যাভার দেখে লজ্জায় মরে যান, ক্রোধে টগবগিয়ে ওঠেন। বুঝলাম, কিন্তু যদি মেয়ে থাকত তাহলে তিনি কী করতেন—ফেলে দিতেন?

আরাম-কেদারা ছেড়ে উঠেছি, মিনতি ভেতর থেকে বেরিয়ে আবার এ-ঘরের দরজার সামনেই এল। আশ্চর্য হলাম যে তার মুখে কোনো অপমান কি লজ্জার চিহ্নমাত্র নেই। খুব খুশি, যেন মাসিমা আদর করেছেন। উচ্ছল কণ্ঠে বলল, 'বাবা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিল, দিয়ে বাজারে গেল বোনদের জন্য জামা-কাপড় কিনতে...আপনি আমাকে ডেকে-ছিলেন, জ্যেঠু?'

আবার সেই রুচির অভাব, বাবা পাঠিয়ে দিল, কিনতে বাজারে গেল! অবাকও হলাম অন্য কারণে, আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম! মিনতির চোখ তখন পড়েছে রাস্তার ওপর, 'এই যে বাবা...'

একটু আগেই শুনেছি মিনতির বাবা আমাদের অফিসের বেয়ারা, কিন্তু কোন্ জন? ঘরের বাইরে আসতে হল না, রাজেন দরজার মুখে মিনতির পাশে এসে হাতজোড় করে একটু নত হয়ে নমস্কার করে হাসল, 'আপনি স্যার বেরোচ্ছেন? একে আনতে বলেছিলেন...স্যার, একে একটু বুঝিয়ে বলবেন তো, আমার কথা তো শোনে না। একটুও লেখাপড়া করে না, স্যার, কিন্তু আপনার কথা ঠেলতে পারবে না...'

আমার একটু গোলমাল লাগছিল। রাজু আমাদের অফিসের পুরনো বেয়ারা—লোকটি সাদা-সিদে, মাথায় টাক, গোলগাল মুখ, সব সময়ই সেই মুখে হাসি, আর কাজ বললেই তৎক্ষণাৎ তালিম করে, আজকাল লয়ালটির খুব অভাব দেখা যায় সর্বস্তরেই, কিন্তু রাজু সম্বন্ধে সেকথা বলা যায় না। ওকে দেখলেই ভালো লাগে। তাছাড়া, অফিসের কাজের বাইরেও আমার চা-সিগ্রেট আনা, কি টিফিনের কৌটো এগিয়ে দেওয়া, এসব কাজে আমি ওর কাছে কতকটা বাঁধা।

কাজেই, এই বেলা হয়ে গেছে, বাজারে বেরুবার মুখেই এই বাধাটা ভালো না লাগলেও, আমি হেসে বললাম, 'রাজু, তোমার মেয়ে তো তোমার কথা ঠেলেও না। এই তো, আমার কাছে আসতে বলেছ, এসেছে। তুমিই ওকে শান্ত-সুবোধ মেয়ে হয়ে পড়া-শুনো করতে বোলো...'

'ওরে বাস্‌রে, আমি বলব লেখাপড়ার কথা! আমার কানাকড়ির যোগ্যতা আছে? স্যার, আপনি আমাদের মাথার উপর বাপ-মা আছেন, কত শিক্ষা আপনার, আমরা সব বলাবলি করি। আপনার ছেলেদের কথা, স্যার...সারা শহর গুণগান করে, বড়োবাবু, ছোটোবাবু...'

ওর কথা শেষ হল না, ছোটোবাবু অর্থাৎ আমাদের ছোটো ছেলে সুবীর বাইরে থেকে ঘুরে ঢুকল, তার হাতে একগোছা কাগজপত্র, 'বাবা...'

একটু থমকে গেল সুবীর, এদেরকে দেখে। পরক্ষণেই যোগ করল, 'বাবা, হেড-স্যার বললেন কাল অফিসে যেতে, সেখানেই সই করবেন। বললেন যে

বাড়িতে সীল নেই…'

হল কী, মিনতি সুবীরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খিকখিক করে হেসে ফেলল, তারপর হাসি চাপতে না পেরে বাঁ-হাতের রুমালটা মুখে চাপা দিল।

'মিনু-মা, ছি, বড়োদের সামনে হাসতে নেই। দাদা গুরুজন, লেখাপড়ায় হীরের টুকরো…নে, প্রণাম কর, জ্যাঠামশায়কে করেছিলি? একটু পায়ের ধুলো পেলেও…'

মিনতি কী করত বলা যায় না, কিন্তু ঠিক তখনই ওদিকের ঘরের ভেতর থেকে স্ত্রী ভারী গলায় বলে উঠলেন, 'খোকা, শোন্, এদিকে আয়, পরে বাবাকে বলিস…'

সুবীর চলে গেল।

আমার মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠেছে, রমার রূঢ়তার কোনো সীমা নেই। বুঝলাম, ওরা ঠিক এই মুহূর্তে অবাঞ্ছিত অতিথি, এমন-কী তর্কের খাতিরে ধরা গেল মিনতি এক বখাটে মেয়ে, কিন্তু আমাদের সৌজন্যবোধ থাকবে না কেন। সুবীর প্রণাম নিলে, কি একটা কথা বললে ছোঁয়াচ লেগে যেত!

ব্যাপারটা চাপা দিতে হল আমাকে, হেসে বললাম, 'রাজু, বেলা হয়ে গেছে, বাজারে বেরোচ্ছি আমি…তোমাদের সঙ্গে আর-এক সময় কথা বলব…' ঘরের কোণ থেকে ঝোলাটা তুলে নিলাম, 'মিনতি, শোনো, মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো, বাবার মনে কষ্ট দিও না…'

এতেও একটু হেসে ফেলল মিনতি, কিন্তু সায় দিয়ে মাথাও কাত করল। দরজার বাইরে বেরোতেই আর-এক দৃশ্যের সম্মুখীন হলাম, মিনতি সোৎসাহে বলল, 'ওরা আমার বোন…'

দেখলাম, রাস্তার পাশে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাত ধরাধরি করে। মিনতি মতোই মুখের আদল, মনে হল পিঠোপিঠি বোন সব, বয়সের তফাত এক বছর কি দু বছরের বেশি নয়। এও মনে হল, ওরা এখনো মিনতির মতো শৌখিন, কি চালিয়াত হয় নি। তবে কী রকম করে আমাকে দেখছিল, পরীক্ষার দৃষ্টিতে —যেমন বিরুদ্ধ পক্ষকে দেখে।

যাকগে। পাছে এদের সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ আটকে যেতে হয়, তাই তাড়াতাড়ি সেরে দিতে চাইলাম, 'তোমার নাম কী?'

'সুমতি…'

'আর তোমার?'

'আমার নাম রত্না দাস…'

'সে কী রাজু, মেয়েদের কী নাম রেখেছ? মিনতি-সুমতি তো বেশ মিলেছে, কিন্তু…'

উত্তর দিল মিনতি, 'জ্যেঠু, ও আমাদের মাসতুতো বোন। মেসো-মাসি দুজনেই মরে গেছে, তাই বাবা নিজের মেয়ে বলে মানুষ করছে…'

'ও…', তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। মিনতিকে মনে-মনে বললাম, তোমার সঙ্গগুণে অন্য দুটো বোন কি আর মানুষ হতে পারবে।

২

দুপুরবেলা খেতে দিয়ে স্ত্রী সোজাসুজি চার্জ করে বললেন, 'ওই মেয়েটাকে ডেকে পাঠিয়েছিল কেন?'

'না, ঠিক ডেকে পাঠাই নি। আরে, শোনো, মিনতি তাই বলছিল তো?…হ্যাঁ, ওরা চলে যাবার পর মনে পড়ল। অফিসে একদিন কথায়-কথায় রাজুকে তার ছেলেমেয়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম… জান, আমাদের ঠিক উলটো, ওর ছেলে নেই। ঘরের কথা, মেয়েদের কথা বলল, আমি শুধিয়েছি, তাইতেই খুব খুশি। স্ত্রী রুগ্ণ, মেয়েদের সব দেখাশোনা রাজুকেই করতে হয়। ওর ইচ্ছে, মেয়েদের লেখা-পড়া শেখায়। বলেছিলাম বটে, তোমার মেয়েদের নিয়ে এসো একদিন…'

'লেখাপড়া শেখার মেয়েই বটে…', স্ত্রী মুখ টিপে হাসলেন, 'তা তোমার সঙ্গে কী?'

হাসলাম আমিও, 'রাজুর চোখে আমি কেবল বস

নয়, আমি দারুণ পণ্ডিত। আর আমাদের ছেলেরা এক-একটি শংকরাচার্য, যদি একটু বাতাস-টাতাস লাগে, মানে রাজু তাই মনে করে…'

'আমিও বাতাস-টাতাস লাগার ভয় করি…', রমা গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ছেলেদের সঙ্গে ওদের কখনো দেখা হয় এ আমি একেবারেই চাই না…'

'না চাইলে…'

একটু খারাপ লাগল, এতটা ছুঁইছুঁই কেন। খেতে-খেতে রাজুর কথাটা ভাবছিলাম। বললাম, 'দেখো, রাজুর মেয়েরা ভালো কি মন্দ এক মিনিট দেখেই বলা যায় না। কিন্তু রাজুকে আমি অনেক দিন থেকে জানি, খুব ভালো মন ওর। আর বাবা হিসেবে…'

'থাক, যে বাবা মেয়েকে কন্‌ট্রোল করতে পারে না, তাকে আর সার্টিফিকেটটা না-ই দিলে…'

'কনট্রোলের বাইরে কী দেখলে তুমি…সাজ-পোশাক? আজকাল কে না সাজে…তোমার ছেলেরা সাজে না?'

'ইস, কী রকম তুলনা করলে, তোমার কিছুতেই ঘেন্না হয় না…'

স্ত্রী উঠে গেলেন। ধরে নিচ্ছি, পাতে দেবার জন্য কিছু আনতে গেলেন। রাজুকে বা তার মেয়েকে নিয়ে আর কোনো কথা হয় নি।

পরের দিন বিকেলে রোজকার অভ্যেসমতো বেড়াতে বেরিয়েছি, শহরের পাশ দিয়ে যে নদী বয়ে গেছে তার ধারে। স্ত্রী কখনো সঙ্গে থাকেন, কখনো থাকেন না, আজ ছিলেন। কিছুটা যেতে না যেতে স্ত্রী বললেন, 'আমাকে ছুটিয়ে মারবে নাকি, অমন ঝড়ের মতো চললে…'

গতি মন্থর করে তাঁর সমান হলাম, 'সরি, আমি মনে করেছিলাম, ব্রিস্‌ক্‌ ওঅকিং তুমি পছন্দ কর…'

একটু যেতে না যেতেই রমা আবার বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'নদীর ধার ছাড়া কি বেড়াবার জায়গা নেই? বলো ফিরি…'

'তখন বিকল্প পথের কথা তো বল নি। আজ যখন এসে পড়া গেছে…'

'তাহলে বাপু তাড়াতাড়ি চলো একটু…' চাপা স্বরে বললেন, এবং বেশ জোরে জায়গাটা পেরিয়ে যেতে চাইলেন।

'আরে, উলটো হয়ে গেল যে…' হেসে বললাম।

কিন্তু তার কারণটাও বুঝলাম। এই বিকেল-বেলাটা গঙ্গার ধারে মুক্তবায়ুলোভী আমাদের মতো লোকজন কিছু আসে বটে, কিন্তু সে আর ক-জন। ছেলেমেয়ে, আর যুবক-যুবতীরাই সব গুলজার করে রাখে; নদীর ধারে, পার্কে, যেখানে যাও সেখানেই তাই। স্বামী-স্ত্রীর জুটি থাকে ঠিকই, কিন্তু যারা স্বামী-স্ত্রী নয়, কোনোকালে হবেও না, তারাই বেশি। আবার একটা গোটা দলের পিছনে আর-একটা দল লেগেছে, এমনও আছে। ওরা নেমে পড়ছে নদীর কোলে, দুটি বকের মতো বসে আছে, কথা বলছে কি বলছে না, উঠে আসছে বাঁধের গা বেয়ে।

স্ত্রী এইসবের মধ্যে এসে পড়তে হয়েছে বলে এমনিতে বিরক্তবোধ করছিলেন, আবার ঠিক তখনই আমাদের সামনে একটি ঘটনা। তেইশ-চব্বিশ বৎসরের এক বিবাহিতা মেয়ে তারই সমবয়সী কিংবা একটু ছোটো এক যুবককে হাত ধরে টেনে নিয়ে বাঁধের ওপর উঠল, রাস্তাটা তাড়াতাড়ি পেরিয়ে নামল গিয়ে নদীর কোলে। স্বল্পবাস মেয়েটির থেকে চোখ সরিয়ে চকিতে তাকালাম স্ত্রীর মুখের দিকে। বললাম, 'আর খানিকটা গেলেই ভিড় কমে যাবে, ওদিকটায় নিরিবিলি…'

রমার মুখখানা শুকনো, কঠিন। চোখ সোজা সামনের দিকে, তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব দ্রুত এগোচ্ছেন, রাস্তায় যেন তাঁর চোখে কিছুই পড়ে নি।

সেটা ঠিক কথাই। আমাদের তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, রাস্তায় মেয়েরা বেলেল্লাপনা করলে আমাদের কী। তা ছাড়া, মাথা নেই তার মাথাব্যথা, আমাদের কোনো মেয়েই নেই। আমি

রঞ্চ অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে চাইলাম, 'দেখো, জয়েনট এনট্র্যান্স তো এসেই গেল···কিন্তু তারপর কী ? সুবীর কোন্ লাইনে যাবে···'

আশাতীত ফল পাওয়া গেল। স্ত্রী সঙ্গে-সঙ্গে যোগ দিলেন আমার সঙ্গে—বোঝা গেল, মন থেকে বিচ্ছিরি জিনিসগুলো তিনিও মুছে ফেলতে চাই-ছিলেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো আমার মেলে না, আমি বলি ডাক্তারি পড়ুক। তুমি তো এনজি-নীয়র আছই, আবার কেন···'

'বড়ো ছেলে কী বলে·· লেখে তোমাকে কিছু ?'

'ও গেল চিঠিতে লিখেছে, ভাই নিজে যেটা চায় সেই লাইনেই দিও। খোকাকে জিগ্যেস করেছিলাম, স বলে, আগে পরীক্ষা তো দিই। দুটোতেই চান্স পাব এটা ভাবছ কেন···'

'ঠিক কথাই। তবে আমাদের হাতে এখনো অনেক সময় আছে···'

কিন্তু আমাদের মন্দভাগ্য, আবার আমরা একই রকম—বরং এবারে একটা অতি বিচ্ছিরি ঘটনার সম্মুখীন হলাম। এদিকটা আমাদের প্রত্যাশামতো নিরিবিলি ঠিকই, কিন্তু নিরিবিলির সুযোগ অন্যরাও খোঁজে।

আমাদের ডান দিকে নদীর পরপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, বাঁ দিকে গ্রামের বনজঙ্গলে আবছা আঁধার নেমে এসেছে—জায়গাটা মনোরম সন্দেহ নেই। পথে কিছু লোক আছে, তবে দেখে মনে হয় গ্রামের শ্রমিক-মজুর সব, শহরে সারাদিনের কাজকর্মের পর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছে। একেবারেই তৈরি ছিলাম না, হঠাৎ আমরা ওদের চার জনের দলটির একেবারে কাছে এসে পড়লাম—জায়গাটা বাঁকের মাথায়, একটা ঝাঁকড়া বটগাছের আড়াল ছিল বলে আগে থেকে চোখে পড়ে নি।

স্ত্রী চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মিনতি না ?···'

'হুঁ···'

আমার গলার মধ্যে আটকে গিয়েছিল, যেন পা দুটোও। মিনতিকে এক যুবকের সঙ্গে এই অবস্থায় দেখব একটুও আশঙ্কা করি নি। যদিও ওরা রাস্তা থেকে খানিকটা নীচে নদীর কোলে বসেছে, এদিকে পেছন-ফেরা, নিজেদের নিয়েই মশগুল—তবু মনে হল, দৈবাৎ যদি পিছন ফেরে। তাহলে লজ্জার শেষ থাকবে না।

'চলে এসো···'

স্ত্রীই বাঁচিয়ে দিলেন, আমরা সেখান থেকেই একেবারে উলটোমুখে ফিরলাম, এবং দ্রুত জায়গাটা ছেড়ে এলাম। যা দেখেছি, সে নিয়ে যে স্ত্রীর সঙ্গে কোনো কথা হতে পারবে তা ভাবি নি, কিন্তু একটু অবাক লাগল যে তিনিই কথাটা তুললেন।

'সঙ্গে আর দুটো মেয়ে কে ?'

'মিনতির বোন···তুমি কাল দেখ নি। ওরা গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল···'

'ছেলেটাকে তুমি চেন ?'

'চেনার কোনো প্রশ্নই নেই, কী করে চিনব। মনে হল ভদ্রঘরের ছেলে···'

'ছেলেটাকে গিলে খাচ্ছে···আর শয়তানি দেখেছ ওই ছোটো মেয়ে দুটোর। একটু নীচের দিকে বসেছে বোন দুজনে, যেন নিজেদের মধ্যে কত কথা আর নদীর জলে কী নাই জিনিস দেখছে···দিদিকে যা-খুশি করার সুযোগ দিচ্ছে আর কী। শয়তান, শয়তান, ওদের প্রত্যেকটার রক্তের মধ্যে শয়তানি আছে···'

আমি কিছু বলতে পারলাম না। এমন অপ্রস্তুত লাগছিল—কাল স্ত্রীর কাছে ওদের পক্ষে কিছু বলে-ছিলাম !

হঠাৎ রাগ চলে গিয়ে স্ত্রী একটু হেসে উঠল খিক করে, 'কেমন, তোমার-রাজুর মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে তো ?'

'দেখছি তাই···' স্ত্রীর বলার টোনটা আমার ভালো লাগছিল না।···'রাজুর জন্য দুঃখ হয়, মেয়েদের জন্যে সে এত করে···'

'এত বোকামি করে, বল···তুমি বরঞ্চ তাকে বোলো লেখাপড়ার আর দরকার নেই, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিক···'

'তাই বলব ··' ক্লান্ত স্বরে বললাম, চাইছিলাম যে প্রসঙ্গটা স্থগিত থাক।

৩

বলব বললাম বটে, কিন্তু রাজুর সঙ্গে পরের দিন পনেরো-কুড়ি আমার দেখাই হল না। সে কী জন্যে কয়েক দিন ছুটি নিয়েছিল, আমাকেও টুরে যেতে হয়েছিল বার দুয়েক, আর টিফিনের সময়ও প্রায়ই ফাইল ঠেলি। তখন রাজু কাছে এলেও ওসব কথা বলার উপযুক্ত অবকাশ হয় না।

রাজুকেও দেখলাম একটু অন্যরকম যেন, একটু রোগা, চুপচাপ, তবে সেটা আমার ভুল হতে পারে। আর সত্যি কথা বলতে কি, সেই দুদিন মনের মধ্যে একটা আলোড়ন উঠেছিল বটে, সেটা একরকম ভুলেও যাচ্ছিলাম। কোনো এক বেয়ারার মেয়ের বিয়ে নিয়ে আলোচনা করতে উৎসাহও ছিল না।

একদিন টিফিনের পর খালি কাপ-ডিশ নিয়ে চলে যেতে গিয়েও রাজু দরজার পরদার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি সিগ্রেট ধরিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কী, রাজু, কিছু বলতে?···তোমার বাড়ির সব খবর ভালো তো?'

দেয়ালের পাশে মেঝেতে কাপ-ডিশ নামিয়ে ফিরে এল রাজু, দেখলাম তার চোখ দুটো ভিজে-ভিজে। একটু বিহ্বল স্বরে বলল, 'মেয়েটা অথৈ জলে পড়ল, স্যার···মনটায় খুব কষ্ট আছে, কিছু প্রতিকার করতে পারছি নি···'

'অথৈ জলে পড়ল? কী বলছ তুমি ··'

'শুনবেন, স্যার, সে অনেক বিত্তান্ত। আপনাকে বলব বলে ভেবেছিলাম, স্যার, পাছে বিরক্ত হন তাই বলি নি। স্যার, পল্লব বলে একটি ছেলে · ওদের ফ্যামিলি ভালো, স্যার, স্বচ্ছল গেরস্ত, বাপ-মা, আরো দুই ভাই আছে, কিছুটির অভাব নেই···সে ছেলের সঙ্গে মিনু-মা যে কবে ভাব-ভালোবাসা করে আসছিল, কিছুটি জানি নি, স্যার···'

চকিতে সেদিনের সেই নদীতীরের কথা মনে পড়ল। আন্তরিক দুঃখিত হলাম, মনে-মনে বললাম, 'রাজু, তুমিই জানতে না, তা না হলে ওরা তো এক-হাট লোকের মধ্যে সব কিছুই খোলাখুলি করে।'

রাজু আপসোস করে বলল, 'মেয়ে কি একদিনের জন্যও আমাদিকে বলেছিল, তা হলে তো বারণ করতাম। সে ছেলে একদিন এসে বলে, আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিন। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম ···ছেলে ভালো, স্যার, সেকথা একশ বার স্বীকার করব, লম্বা চওড়া চেহারা, মুখখানি দেখলে চোখ জুড়ায়, লেখাপড়া শিখেছে, রোজগারও আছে কিছু। এমন ছেলে জামাই পেলে কে না লুফে নেবে। কিন্তু আমার ভয় হল, বললাম এ-বিয়ে কী-রকম হবে, তোমরা হলে উঁচু জাত, তোমার বাপ-মা আছেন, তাঁদের কাছে যেয়ে আমার অনুমতি নিতে হবে। ছেলে বলল, কেন অপমান হবেন, রেজিস্ট্রি বিয়ে দিন ···তা আমার অতটা সাহস হল না। বললাম, আমাকে মাপ করতে হবে, সে আমি পারব না। ছেলে চলে গেল তখনকার মতো, পরের দিন মিনুর মায়ের কাছে এসে ভয় দেখিয়ে গেল, মেয়েকে আপনারা আটকে রাখতে পারবেন? মেলামেশা আমরা করবই, তাতে যদি মেয়ের কিছু খারাপ হয়ে যায়, কলঙ্ক হবে কার? বিয়েটা দিলে ভালো হত না কি···'

অসহিষ্ণু হয়ে রাজুকে থামালাম, 'ভয় পেয়ে ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছ তো? তুমি এই রকম কাপুরুষ কেন? একটা গুণ্ডা তোমাকে শাসাল, আর তুমি···সেই রাস্কালটা তোমাকে কিসের ভয় দেখিয়েছিল বুঝতে পার নি?'

'স্যার, রাগ করবেন না···রাগ আমারও হয়েছিল।

মাথার ভিতর আগুন জ্বলেছিল। কটা দিন আমি যেন পাগলের মতো হয়ে গেছলাম···মুখে খাবার তুলতে পারি না, অফিসে আসতে পারি না। ক্যাজুয়েল লীভ নিয়েছিলাম, স্যার···'

মনে পড়ল বটে, মাঝখানে রাজু কয়েক দিন অনুপস্থিত ছিল।

আমি কিছু বললাম না, এবং অপেক্ষা করে রয়েছি দেখে রাজু বলল, 'তবে কিসে আমার মত হল, তাই জানতে চাইছেন তো? তাই বলি। আমার ছেলে নাই, ভাই-ভাগারি নাই, ওই দুই মেয়ে, কি তিন মেয়ে বলতে পারেন। আর আমার স্ত্রী···মানুষের নিজের আর কতটুকু, বলুন? যাদের নিয়ে আপনার সংসার, তারা সবাই যদি আপনার বিরুদ্ধে যায়, আপনি কী করবেন? স্ত্রী ওকেই জামাই করতে চায়, বড়ো মেয়ের কথা ছেড়েই দিলাম, তাকে নিয়েই তো কথা, অন্য দুই মেয়েও ওই এক দিকে। তাতেও শক্ত হয়ে ছিলাম আমি। শেষে আমার মত বদলে গেল···সে ওই ছোটো মেয়ে রত্নার জন্য। নিজের মেয়েকে বাগে না আনতে পেরে, আমি শালীর মেয়ে রত্নাকেই ধরলাম, তুই একটু তোর দিদিকে বুঝিয়ে বল, মা। উলটে সে কী বলল জানেন? বলল, মেসোমশাই, পল্লবদার সঙ্গেই দিদির বিয়ে দিন, তা না হলে ও সুইসাইড করবে। আর দিদি যদি সুইসাইড করে, তাহলে আমরা···সবটা বলল না রত্না, চেপে গেল। শেষে আর-একটা কথা সে বলেছিল, কাঁদতে-কাঁদতে, পল্লবদার মুখ আমরা ভুলব কী করে···পাগল, পাগল, ওরা সবাই যেন পাগল হয় গেছল···'

'কথাটা তোমার ছোট মেয়ে বলল!···তার মানে কী হল, সে-ই বা কাঁদে কেন?'

রাজু ঘাড় নেড়ে বলল, 'জানি না, স্যার, ওদের কথার মানে বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকু বুঝলাম, ওরা সবাই যখন একদিকে ছুটেছে, তখন আমি আর বাধা দিই কেন? ওদের ভালো হলেই হল···'

'তাহলে বলছিলে কেন, মেয়েটা অথৈ জলে পড়ল? ছেলে ভালো, ঘর ভালো, মেয়েরাও চাইছিল···'

'বলছি, স্যার। ছেলের বাপ-মা, ছেলে-বউকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, দুদিনও পেরায় নি···'

'তা মেয়ে-জামাই তোমার কাছেই আছে তো?'

ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখে রাজু হাসল, 'তা হলে ত ভাগ্য মানতাম। কাছে রাখবার জন্যে কত সাধাসাধি করলাম, জামাই যদিও মত করে, মেয়ে কিছুতেই আসবে না···'

'তা ওরা কোথাও তো আছে···'

'তা আছে, স্যার। ওই নদীর ধার দিয়ে মাইল চারেক যেয়ে গাঁয়ের মধ্যে একটা ঝুপড়ি ভাড়া নিয়ে আছে। পাশেই গো-বাথান···শহরের গোয়ালারা সেখানে গোরু রাখে···'

'ঠিক জায়গাতেই আছে, তুমি চিন্তা কোরো না···'

রাজুকে এরকম কথাটা বলা আমার উচিত ছিল না, কিন্তু আমার কী রকম রাগ হচ্ছিল, নিজেকে ঠেকাতে পারলাম না। রাজুর সেটা লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থা নয়। সে বলল, 'না, চিন্তা আমি করি না, ওর বোনেরা প্রায় যায়। খপর-টপর নিয়ে আসে, খুব গরিবের মতো থাকে, মিনুমা নাকি তাতেও খুব খুশি···কিন্তু স্যার, দুঃখ কী জানেন, বিয়ের পর মিনু আমার ঘরে আসে নি, জামাইকেও আসতে দেয় না···নিজের বাপ-মাকেও তার ঘরে যেতে দিবে নি, ই কী রকম খেপামি বলুন তো স্যার! আমরা কী দোষ করলাম? দুটো পয়সা, কি কিছু জিনিসপত্র পাঠালেও নেবে না। বাপের মনে দুঃখ হয় কিনা বলুন···'

'মনে করো, তোমার মেয়ে সুখী হয়েছে, যা চেয়েছিল পেয়েছে। তাহলে তোমার নিজের আর দুঃখ থাকবে না। আচ্ছা, এখন তুমি এসো···'

'হ্যাঁ, স্যার···' থতমত খেয়ে থেমে গেল রাজু, এতক্ষণ যে আমার সময় নষ্ট করেছে, তার জন্য লজ্জিত। নমস্কার করে চলে গেল।

৪

সেদিন রাত্রে স্ত্রীকে সমস্ত কথাই বললাম, রাজুর কাছে যা শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম, স্ত্রী উত্তেজিত হয়ে উঠবেন, কি মিনতির শ্রাদ্ধ করবেন, কিন্তু তিনি সেসব কিছুই করলেন না। আগাগোড়া শুনলেন কাহিনীটা, তাও বিচিত্রভাবে, যেন এসব যে ঘটবে সেটা তিনি আগেই জানতেন, আমি বলছি অগত্যা তাঁকে শুনতে হচ্ছে, ভাবটা এইরকম। শোনার পর উঠতে যাচ্ছিলেন, আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কিছু বলবে না? অন্তত বাবা হিসেবে রাজু যে দুঃখ পেয়েছে…'

'তোমরা পুরুষেরা মেয়েদের কথা কিছুই বোঝ না…' বলে তিনি চলে গেলেন।

যা বাব্বা, স্ত্রীই আমাকে যেন ধাঁধা লাগিয়ে দিলেন। মিনতি, বা মিনতির মতো মেয়েদের সম্বন্ধে তিনি যেসব বিষোদ্‌গার করে থাকেন, কই, সেসব তো কিছুই শুনলাম না।

যাকগে, ওসব কুটকচালে ব্যাপার নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাতে চাই না। সিগ্রেটের প্যাকেটটা টেনে নিয়ে কেদারায় গা এলিয়ে দিলাম।

অবশ্য মাথা ঘামানোর আমার নিজেরই অনেক জিনিস ছিল। এক বছর পরেই আমি রিটায়ার করছি, তারপর মফসসল ছেড়ে কলকাতার কাছে আমাদের পৈতৃক বাড়িতে চলে যাব। আজকাল অফিসে কাজের চাপ বেশি, তাছাড়া আমার সার্ভিস বুক সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র ঠিক করার ব্যাপারে আমাকে দিনের পর দিন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। এদিকে, ছোটো ছেলের পরীক্ষার পর তাকে ঠিক লাইনে দেওয়ার সমস্যাও ছিল।

এসব কারণে, এবং রাজুর মেয়েদের ব্যাপারে কী রকম একটা অ্যালারজি হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য ওকে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করি নি। আর লোকটা যতই বশংবদ হোক, জিজ্ঞেস না করলে নিজের থেকে কিছু বলেও না। তবে লোকটার ভাগ্য মন্দ, কলকাতা যাবার আগে শুনলাম, ওর বড়ো মেয়ে মারা গেছে, এবং মেজো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।

আমাদেরই অফিসের আর-এক বেয়ারা বিপিন আমাদের জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা এবং গাড়িতে তোলার ব্যাপারে খুব সাহায্য করছিল। স্ত্রীকেই সে কথাগুলো জানিয়েছে—রাজুর পাড়াতেই নাকি তার ঘর। মিনতির স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল—ছেলে হতে গিয়ে মারা যায়। বিপিনের ধারণা, জামাইটা অত্যন্ত বদ, তার চরিত্রদোষও আছে, প্রসব-বেদনার সময় বউকে হাসপাতালেও দেয় নি—কে জানে, বউটা যাক, সেরকমই হয়তো চেয়েছিল। রমা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আর মেজো মেয়ের বিয়ে হল কোথায়? বিপিন সজোরে মাথা নেড়েছিল, 'উটি বলতে পারব নি, মাসিমা। রাজুদার ফ্যামিলিটাই ওইরকম। বড়ো মেয়ের বিয়ে হয়েছিল রেজিস্ট্রি করে, মেজো মেয়ের হল কালীবাড়িতে পুজো দিয়ে, আবার ছোটো মেয়ের কী রকম হয়…তা কোথায় বিয়ে হল, কার সঙ্গে হল, কেউ কিছু জানে নি, মাসিমা, জামাইকেও দেখে নি, মেয়েও হাওয়া। কে জানে, বাবা, মেয়েকে বিক্রি করে দিল নাকি, আজকাল তো সেরকমও হচ্ছে…'

রমার কাছে বিবরণ শুনে আমি মাথা নাড়লাম, 'হতে পারে না, এটা বিপিনের রটনা। আচ্ছা, কালই আমি জিজ্ঞেস করব রাজুকে…'

'পরের মেয়ে নিয়ে তোমার অত মাথাব্যথা কেন? কিছু জিগ্যেস করতে হবে না তোমাকে।'

আচ্ছা-আচ্ছা। তাই হবে। কিন্তু তিনি যে পরের মেয়ের সাত কাহন কথা শুনে রিপোর্ট করছিলেন, তার কী?

কলকাতায় গিয়ে বছরখানেক কোথা দিয়ে যে কেটে গেল বুঝতে পারি নি। রাইটার্স বিল্ডিংসে পেনসন সেলে বারবার ছুটতে তো হচ্ছিলই, ইতিমধ্যে আমাদের বড়ো ছেলে বিদেশ থেকে ফিরে এসেছিল, তার বিয়েও দিয়েছি। বউ নিয়ে সেখানেই সে ফিরে

গেছে। পাত্রী-নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপার স্ত্রীর ওপর পুরো ছেড়ে দিয়েছিলাম, কেননা, তাঁর ধারণা ওটা আমি একেবারেই পারব না। মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, আমার পাত্রী কিন্তু আমিই নির্বাচন করেছিলাম—বলি নি, কারণ আজকাল তাঁর মেজাজের ঠিক থাকে না, পরিহাসও বোঝেন না কখনো-কখনো, সে নিয়েই যদি ঝাঁকিয়ে ওঠেন। ছোটো ছেলে সুবীর মেডিক্যালেই পড়ছে, বাড়িতে থেকে। এ ব্যাপারেও স্ত্রীর জেদটা শেষ পর্যন্ত বজায় থেকেছে।

সে যাই হোক, বছরখানেক পরে আবার আমাকে পূর্বতন কর্মক্ষেত্রে একবার আসতে হল। পেনসন-সংক্রান্ত আরো কিছু কাগজ উদ্ধার করবার জন্য, এ জিনিস যেন শেষ হয়েও শেষ না। স্ত্রীও সঙ্গে এলেন, আমরা দুজন উঠলাম আমাদের এক সহকর্মীর কোয়ার্টার্সে। তাঁরা বেশ সমাদরেই গ্রহণ করলেন।

দুদিন ছিলাম। দুপুরবেলা অফিসে চলে যেতে হত, ফিরতে সন্ধের কাছাকাছি। স্ত্রী বন্ধুর বাসাতেই থাকেন। দ্বিতীয় দিন ফিরে বললাম, 'কাজ মিটল, কাল ভোরের গাড়িতেই ফিরছি। তুমি এর মধ্যে সব গুছিয়ে নিও···এঁরা সব কোথায়, কারুর সাড়া-শব্দ পাচ্ছিনে···'

স্ত্রীর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে যাচ্ছিলাম, উত্তর না পেয়ে তাকাতেই একটু চমক লাগল। মুখ-খানা থমথমে।

'জান, রাজুর সঙ্গে দেখা হল···রাজুকে মনে আছে তো তোমার, তোমাদের অফিসের বেয়ারা, রাজু? কী চেহারা হয়েছে ওর, চেনা যায় না···'

আমি মাঝে-মাঝে তাই ভাবি, সব জিনিসেরই উলটো রথের পালা আছে। এক সময় রাজুকে আমি ভালো বলতাম। হয়তো ভালোও বাসতাম, তখন স্ত্রী তার ওপর খাপ্পা ছিলেন, সে মিনতির মতো মেয়েদের বাপ বলে···আর এই যে আমি এখন রাজুকে ভুলেই গেছি, তার বা তার মেয়েদের কথা মনে আনতে চাই না, এখন দেখছি তার সম্বন্ধে স্ত্রীর কণ্ঠে সমবেদনার সুর। আবার আমাকেই জিজ্ঞেস করা, রাজুকে তোমার মনে আছে তো? মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্প।

আমিও একটা খবর দিলাম স্ত্রীকে, 'অফিসে গিয়ে শুনলাম, সেও মাস তিনেক হল রিটায়ার করেছে। কিন্তু তাকে তুমি পেলে কোথায়?'

'যাচ্ছিল কোথাও, এই কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে ···আমি তো চিনতেই পারি নি, এমন চোখ-মুখ হয়েছে তার। ডাকলাম তাকে···সেও প্রথমটা চিনতে পারে নি, তারপর প্রণাম করে ধপ করে বসে পড়ল, হাঁপাচ্ছিল লোকটা। একটু চা করে দিতে চাইলাম, খেল না। এত করে বললাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে···প্রথম তো খুব খুশি হয়ে রাজি হল, তারপর হঠাৎ উঠে চলে গেল। মনে হয় ওর মাথার ঠিক নেই···'

'আমারও মাথা বেঠিক হবার জোগাড়···কথাটা কী বলবে?'

আমার বিরক্তিটা স্ত্রী লক্ষ করলেন না, ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'জান, রাজুর ছোটো মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে, আর···দাঁড়াও, আগে তোমায় চা করে দিই···'

'সেই ভালো···'

স্পষ্টই লক্ষ করলাম স্ত্রী উত্তেজনা চাপবার জন্যে সরে যেতে চান, যেতে দিলাম। আমি জামা-কাপড় ছেড়ে হাতমুখ দিয়ে বসলাম বারান্দায়। স্ত্রী চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'রাজুর জামাই পল্লবকে তো তুমি দেখেছিলে···আচ্ছা, ওকে কি তোমার খুব সুপুরুষ বলে মনে হয়?'

'দেখেছিলাম সেই নদীর কোলে তো, বটগাছ-তলায়? তা সে তুমিও তো দেখেছিলে। আর সুপুরুষ কিনা সেই সার্টিফিকেট আমি না দিয়ে মহিলারা দিলেই ভালো হত না কি?'

আবার একটু চমক লাগল, আমার এই পরিহাসটা তাঁকে স্পর্শই করল না। স্পষ্টত, তিনি নিজের

ভাবনাতেই মগ্ন ছিলেন, মনের মধ্যে মেলাচ্ছিলেন কিছু, আমি উপলক্ষ মাত্র।

বললেন, 'আচ্ছা, মেয়েদের মধ্যে কী আছে বলতে পার? পুরুষদের মধ্যে কী দেখে তারা পতঙ্গের মতো পুড়ে মরে?'

এটারও উত্তর মেয়েদেরই দেওয়া উচিত—কিন্তু কথাটা বললাম না। অন্য দিকে আমার একটু লাগছিল—যে পুরুষ জাতের কথা স্ত্রী বলছিলেন, আমি নিশ্চয়ই তার বাইরেই রইলাম। আমার স্ত্রী কোনোদিন দগ্ধ হয়েছেন বলে তো মনে হয় না—না কি হয়েছিলেন?

স্ত্রী বললেন, 'জান না, রাজুর তিন মেয়েই পর-পর ওই পল্লবকেই বিয়ে করেছে···দুটো মেয়ে মরেছে, কে জানে ছোটোটাও মরবে কিনা···'

আমি আর নিস্পৃহতা বজায় রাখতে পারলাম না, 'মানে, কী বলছ তুমি···'

'তাই বলছি। মিনতিকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে রেখে-ছিল পল্লব, কথাটা ঠিক কী কেউ জানে না, খুব কষ্ট দিত মেয়েটাকে, তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি। মেজো মেয়ে সুমতি···তিন বোনই সেই প্রথম দিন থেকে ওকেই ভালোবেসেছিল কিনা কে জানে। পাছে বাবা বিয়ে না দেয়, তাই সুমতি কালীবাড়ি গিয়ে ভগ্নী-পতিকে বিয়ে করেছিল, দিদির মতো সেও বাপের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখত না। তারপর সে সুইসাইড করেছে···'

'ওটা একটা অভিশপ্ত ফ্যামিলি···কিন্তু ঘটনাটা কী?'

'না গো, অভিশপ্ত নয়, মেয়েদের মধ্যে কী আছে ···তুমি সেই যে শুনেছিলে, ছোটো মেয়েটা বলেছিল, পল্লবদার মুখ ভুলতে পারব না, তো সেই দিকেই চেয়ে আছে সব মেয়ে···' স্ত্রীর কণ্ঠস্বর আবেগে ভারী হয়ে এল, 'মেয়েরা নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারে। সুমতি সুখেই ছিল, স্বাস্থ্যও নাকি ভালো হয়েছিল তার, গর্ভের পর মাতৃসদনে গিয়ে ফুটফুটে মেয়ে কোলে নিয়ে ফিরেও এসেছিল···সে মেয়ে এখন মানুষ হচ্ছে মাসির কোলে···হয়েছিল কী জান, ছোটো বোন এসেছিল পোয়াতি মেয়েকে সাহায্য করতে, দিদি-জামাইবাবুর সংসার চালাতে, আর কী, এদিকে তার পেটে ছেলে এসে গিয়েছিল। যখন চার মাস, তখন সুমতি সব টের পায়···'

চায়ের কাপটা ঠক করে নামালাম টিপয়ের ওপর, 'সুমতি যখন টের পেল তখন ওই ট্রেটার সুপুরুষ, আর স্নেহের বোনটিকে গুলি করে মারতে পারল না!···'

স্ত্রী সরোদনে বললেন, 'সেটাই উচিত ছিল, কিন্তু মেয়ে তো···মেয়েদের মন তোমরা কিছুই বোঝ না···'

'অন্তত এক বয়স্কা মহিলার মন বুঝছি না, এটা ঠিক···' তিক্ত কণ্ঠে বললাম॥

রবিবাসরের আসরে ১

সন্তোষকুমার দে

প্রস্তাবনা

কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে একটি আনন্দ-অনুষ্ঠান হবে। রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কাছেই, তার অপর পারে, অল্প দূরে হিন্দুস্থান পার্কে, বাঙলার ব্রাউনিং দম্পতি কবি নরেন্দ্র দেব ও রাধারানী দেবীর বাসভবন "ভালোবাসা"। কবিদম্পতি শরৎচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী, তাই তাঁরা উভয়েই শরৎচন্দ্রের আহ্বানে এসেছেন অনুষ্ঠানের উপযুক্ত আয়োজন করতে। শরৎচন্দ্রের মাতুল "বিচিত্রা" মাসিক পত্রের সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ও হাজির।

শরৎচন্দ্রের বিরাট বৈঠকখানার সব আসবাবপত্র বের করে, ঘর ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে, সারা মেঝে জুড়ে ফরাস বিছানো হয়েছে। সভাকক্ষ সাজাবার জন্য এসেছে প্রচুর পরিমাণে ফুল—শ্বেতপদ্ম, বেল, জুঁইয়ের গোড়ে মালা, রজনীগন্ধার ঝাড় আর বর্ষার কদমফুল। বারান্দায় আর সভাকক্ষের প্রতিটি দোরগোড়ায় বিচিত্র আলপনা আঁকা হয়েছে। প্রধান ফটকের দুই পাশে সুদৃশ্য কলাগাছ, চিত্রিত ঘট, জল ভরে সশীর্ষ ডাব দিয়ে কলাগাছের গোড়ায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কবিদম্পতি সতর্ক দৃষ্টিতে সযত্নে সকল সজ্জাকর্ম তদারকি করছেন।

অন্যত্র রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে। সেখানে ঠাকুর চাকর ছুটাছুটি করছে। অন্তত শতখানেক লোক খাবে, তার উপযোগী প্রচুর উপাদেয় ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করবার আয়োজন হয়েছে।

এত আয়োজন কিসের জন্য? যেন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে আজ কারো বিয়ে বা বউভাতের উৎসব। না, সেসব কিছু নয়, শরৎচন্দ্র একটি সাহিত্যসভার সদস্য, সেই সভার একটি অধিবেশন ডেকেছেন তাঁর বাড়িতে, তাই এই আয়োজন। সভাটির নাম রবিবাসর, যেখানে বাঙলা সাহিত্যের দিকপাল ব্যক্তিগণ সদস্য—শরৎচন্দ্র,

উপেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র দেবও সদস্য। রাধারানী দেবী সদস্য নন, কিন্তু শরৎচন্দ্র বিশেষ করে তাঁর সহায়তা চেয়েছেন আজকের সভাস্থলটি রুচিশীল-ভাবে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতে, কারণ আজ এখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আসবেন। রাধারানী শুধু শরৎচন্দ্রেরই স্নেহধন্যা নন, রবীন্দ্রনাথেরও তিনি পরম আদরের পাত্রী। তিনি তাই সুনিপুণভাবে আজ রবিবাসরের সভাস্থলটি সাজিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সেদিন রবিবার, ৩ শ্রাবণ, ১৩৪৩ (১৯ জুলাই, ১৯৩৬), রবিবাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশন। বিকেল বেলা দু-এক জন করে সদস্যরা আসতে শুরু করেছেন, তখন শরৎচন্দ্র তাঁর গাড়ি পাঠালেন, জোড়াসাঁকো থেকে রবীন্দ্রনাথকে আনতে। গাড়িতে গেলেন রবিবাসরের সদস্য কবি গিরিজাকুমার বসু আর শরৎচন্দ্রের এক বালিকা ভ্রাতুষ্পুত্রী। কবি এসে পৌঁছালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গাড়ি থেকে হাত ধরে নামালেন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন, তাঁর পাশে শরৎচন্দ্র, নরেন্দ্র দেব এবং অন্য কতিপয় বিশিষ্ট সদস্যসহ রবিবাসরের তৎকালীন সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু। কবি সহাস্যে জলধর সেনকে বললেন—এই যে, জলধরদাদা যে!

জলধর সেন ছিলেন সে সময়ে সাহিত্যিক সমাজের সার্বজনীন দাদা। বয়সে প্রবীণ, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবেও বিশেষ খ্যাতিমান। তিনি "বঙ্গবাসী", "বসুমতী", "হিতবাদী", "সুলভ সমাচার" প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করবার পর ১৩২০ সালে "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক হয়ে জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বয়সে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে যদিও প্রায় দুই বছরের বড়ো ছিলেন (তাঁর জন্ম—১লা চৈত্র, ১২৬৬) তবু রবীন্দ্রনাথ একে জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাতে তাঁর গাঁয়ের জমিদার, এজন্যও জলধর রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। সেই রবীন্দ্রনাথও তাঁকে সবার সামনে দাদা সম্বোধন করায় তাঁর গৌরব নিঃসন্দেহে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

সেদিন সভায় অতি অন্তরঙ্গ পরিবেশে এসে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে আনন্দিত হয়েছিলেন। এমন-কী জলধর সেন যখন সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়ে বললেন, সেদিন সদস্যদের কোনো রচনা পাঠ করা হবে না, শুধু কবির ভাষণ শোনা হবে, তখনও রবীন্দ্রনাথ তাতে স্বীকৃত হলেন। শুধু সভার প্রারম্ভে সর্বাধ্যক্ষের আদেশে উপেন্দ্রনাথ একটি স্বরচিত গান শোনালেন এবং সর্বাধ্যক্ষের অনুরোধেই মুখে-মুখে একটি কাহিনীও শোনালেন যা ঘটেছিল উপেন্দ্রনাথ একবার শান্তিনিকেতনে গেলে। গল্পটিতে এমন হাসির খোরাক ছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাতে কবি নিজে পর্যন্ত উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিলেন। পরিবেশটি যে তাঁর কাছে সত্যই মনোরম হয়েছিল এতে তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ সদস্যদের অনুরোধে কবি রবিবাসরের 'অধিনায়ক'-পদ গ্রহণেও সম্মত হলেন। আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবিবাসরের সেই সম্বন্ধ বজায় ছিল এবং তাঁর তিরোধানের পর আর কাউকে রবিবাসরের 'অধিনায়ক'-পদে বসানো হয় নি।

সদস্যদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ সেদিন তাঁর "বলাকা" কাব্য হতে ছবি কবিতাটি ('তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা') তাঁর অতুলনীয় স্বকীয় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করেছিলেন এবং সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেনের অভ্যর্থনার প্রত্যভিভাষণে অতি অন্তরঙ্গভাবে নিজের কথা কিছু বলেছিলেন। রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ যেসব ভাষণ দিয়েছেন তার সঙ্গে এটিও আমার "রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থখানিতে (প্রকাশকাল রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী—১৩৬৮) সংকলিত আছে।

এই রবিবাসর সভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৩৬ সালে (১৯২৯), তাই ১৩৯৬ সালে তার হীরকজয়ন্তী-বর্ষ হতে চলেছে। ইতিপূর্বে ১৩৬১ সালে রজতজয়ন্তী এবং ১৩৮৬ সালে সুবর্ণজয়ন্তী যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়েছে। সেসব অধিবেশনের বিবরণ যথাস্থানে বলা যাবে।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে

রবিবাসরের সংস্পর্শে আসবার। সেটা ১৩৪৬ সালের কথা। ছাত্রজীবনেই "ভারতবর্ষ", "বিচিত্রা" প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতাম, তখনও কলকাতায় আসি নি। কলকাতায় আসবার পর "ভারতবর্ষ" পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ঘটনাক্রমে নরেন্দ্রনাথ এবং আমি একই বৃহৎ বাড়ির (৪৫ আমহার্স্ট স্ট্রীট) দুই পৃথক অংশে বাস করতাম, তাই পরস্পর পরিচিত ছিলাম। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আমার সাহিত্যিক পরিচয় কিছুই জানতেন না, আমিও গায়ে পড়ে তাঁকে কিছু বলতে সঙ্কোচ বোধ করতাম। ফণীন্দ্রনাথ সেই সঙ্কোচ ভেঙে দিয়ে আমাকে নরেন্দ্রনাথের সহকারী করে ছাড়লেন। সেই থেকে রবিবাসরের পুণ্য সংস্পর্শ হতে আর বিচ্ছিন্ন হই নি। মাঝে-মাঝে বিদেশে গেলেও ফিরে এসে আবার রবিবাসরের কর্মভার গ্রহণ করেছি। দেখতে-দেখতে রবিবাসরের সঙ্গে যোগাযোগ অর্ধশতাব্দীব্যাপী হতে চলেছে। এই বিশিষ্ট সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকায় একদিকে যেমন বাঙলা সাহিত্যের দিক্‌পাল ব্যক্তিদের সান্নিধ্যলাভে ধন্য হয়েছি, তেমনি রবিবাসরের বহু স্মরণীয় অধিবেশনে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য হয়েছে। আজ জীবন-সায়াহ্নে "চতুরঙ্গ"-সম্পাদকের আহ্বানে রবিবাসরের বিষয়ে লিখতে বসে বিমূঢ় বোধ করছি। প্রস্তাবনা শেষ করবার আগে রবিবাসরের সদস্য অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কটি কথা উদ্ধার করি :

> রবিবাসরের কথা যে ভাবে, যে লেখে, যে শোনে সে-ই পুণ্যবান। রবিবাসরের কথা ভাবতে গেলে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠের একপ্রান্তে একটিই মাত্র ডালপালা-মেলা ঘনপত্র গাছ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই ধার ঘেঁসে বয়ে চলেছে একটি স্বাদুসলিলা স্বচ্ছ নদী। জায়গাটি যেন অনেক স্নিগ্ধতা ও হৃদ্যতা দিয়ে তৈরী। নদীটি যেন কোন্ অতীত স্মৃতির আশীর্বাদ দিয়ে ভরা। মনে হয় সমস্ত মাঠের শূন্যতার দাহ পেরিয়ে এখানে এসে বসলে শুধু শান্তি পাব তা নয়, কৃততীর্থ হয়ে যাব।
>
> —রবিবাসরের স্মৃতি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত রবিবাসর (বার্ষিকী)-১, (১৯৬৮), পৃ ২১৭

২

সূচনা

পত্র-পত্রিকার অফিসে স্বভাবতই সাহিত্যিকদের সমাগম ঘটে থাকে, বিশেষ করে সেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ যদি মজলিসি মানুষ হন তবে তো সোনায় সোহাগা, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ "ভারতী"র আড্ডা। সেখানকার আকর্ষণ এত দুর্বার ছিল যে একবার গেলে বার-বার যেতে হত। "রবিবাসর" সাহিত্যসভাটির পত্তনও হয়েছিল প্রথমে একটি নামকরা মাসিকপত্রের দপ্তরকে অবলম্বন করে। পত্রিকাটির নাম "মানসী ও মর্মবাণী"। যে সময়ে এই পত্রিকার সূতিকাগারে রবিবাসরের জন্ম হয় তখন তার অফিস ছিল কলকাতার ২৩-বি বেথুন রো বাড়িটিতে। এই বাড়িটি রবিবাসরের অন্যতম প্রবীণ সদস্য শ্রদ্ধেয় চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ির কাছে। তিনি যাতায়াতের পথে দেখতেন "মানসী ও মর্মবাণী" দপ্তরে কর্মাধ্যক্ষ সুবোধচন্দ্র দত্তের কাছে নবীন প্রবীণ সবশ্রেণীর সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটত এবং প্রায়ই তিনি তাঁদের চা-জলপানে পরিতুষ্ট করতেন। এখানে যাতায়াতের সময় এবং "ফরোয়ার্ড" পত্রিকায় কার্যকালে চপলাবাবুর সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা হয় হাওড়ার নীলমণি চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি ছিলেন রবিবাসরের প্রথম সম্পাদক—যাঁর প্রযত্নে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল বলা চলে, তাই তাঁর পরিচয় একটু বিশদভাবে দিতে চাই।

নীলমণিবাবুর জন্ম হয়েছিল ৩১ জুলাই, ১৮৯৭। হাওড়া শহরের বিশিষ্ট ডাক্তার অধরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পিতা। তাঁর হাওড়ার বাড়ির ঠিকানা ছিল ১১ ধর্মতলা লেন, খুরুট, হাওড়া-১। ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে তখনকার সকল জননেতাদের

যাতায়াত ছিল, এমন-কী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও অসহযোগ আন্দোলনের সময় একদিন ডাক্তার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে গিয়েছিলেন। নীলমণি সেনট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু এবং জরমান ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতৃদেব নেপাল মহারাজের প্রধান চিকিৎসক থাকাকালীন নীলমণিও নেপালে ছিলেন, নেপালি ভাষাও তিনি ভালোভাবে জানতেন। এই সুশিক্ষিত তরুণটির সঙ্গে আলাপ করে দেশবন্ধু তাঁকে তাঁর "ফরোয়ার্ড" পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন, পরে নীলমণি শরৎচন্দ্র বসুর "নেশন" পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি Indian Journalists' Association-এর সদস্য ছিলেন।

সাংবাদিক জীবনে চপলাকান্ত ভট্টাচার্যও "ফরোয়ার্ড" পত্রিকায় প্রথম কাজ শুরু করেন। সেখানে বার্তাসম্পাদক ছিলেন অনিল রায়। চপলাকান্ত ছিলেন তাঁর সহকারী। অনিল রায়ের সঙ্গে সহকর্মী নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ও "মানসী ও মর্মবাণী"র সুবোধ দত্তর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। বয়ঃকনিষ্ঠ চপলাকান্তকে এঁরা সকলেই বিশেষ স্নেহ করতেন। বিশেষ করে নীলমণিবাবু তাঁকে পারিবারিক বন্ধু হিসাবে নিয়মিত-ভাবে নিজেদের বাড়ির সকল উৎসব-অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেন।

নীলমণিবাবু সুলেখক ছিলেন। সাংবাদিকতার কাজ দীর্ঘদিন না করে তিনি "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "আনন্দবাজার পত্রিকা", "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রভৃতিতে নিয়মিত লিখতেন ও "পরিকথা" নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তা ছাড়া তিনি খুব ভালো ইংরাজি লিখতেন বলে অনেক মৌলিক ইংরাজি ছোটোগল্প এবং অনেক বাঙলা গল্পের ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন।

নীলমণিবাবুর সাহিত্য-অনুরাগের আর-একটি দিক ছিল। তাঁদের পারিবারিক প্রকাশন সংস্থা "চট্টো অ্যানড চট্টো" কোমপানির (Chatto & Chatto) অংশীদার হিসাবে কাজ করতে-করতে তিনি ক্লাইভ স্ট্রীটে অফিস করে Literary Guild of India নামক একটি উৎকৃষ্ট বিলাতি পুস্তক আমদানির কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানি বাছাইকরা দামি-দামি বিলাতি বই এনে গিল্ড্-এর সদস্যদের কাছে মাসিক কিস্তিতে সরবরাহ করতেন। তিনি Literary Guild of India হতে ইংরাজি ভাষায় আগাগোড়া পুরু বিলাতি প্রুভন আর্ট পেপার ব্যবহার করে যে মূল্যবান ক্যাটালগ ছাপাতেন তার একখানি নমুনা তাঁর দেওঘরের বাড়ি হতে উদ্ধার করে দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সে ক্যাটালগ সদস্যদের বিনামূল্যে দিতেন, তাতে প্রচুর বাছাই ইংরাজি বইয়ের বিবরণ সহ বিদেশী লেখকদের চমৎকার পাতাজোড়া ছবি থাকত। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা যে খণ্ডটি আমি পেয়েছি তাতেই আছে পিথাগোরাস, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নোবেলপুরস্কারবিজয়ী সিগরিড আনড্সেট, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল-বিজয়ী লুইগি পিরানদেল্লোর ছবি।

ব্যবসায় বৃদ্ধির সঙ্গে তিনি ইনডিয়ান মিরর স্ট্রীটে টেম্পল প্রিনটিঙ ওঅর্কস নামে ছাপাখানা এবং ট্রেড সারভিস ব্যুরো নামে আরও দুটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এই সাহিত্যানুরাগী, কর্মবীর মানুষটি ১৯৫১ সালে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে কর্মজীবন হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে হাওড়ার বিরাট বসতবাড়ি ছেড়ে চলে যান দেওঘরে। সেখানে রাজনারায়ণ বসুর স্মৃতিপূত একটি বাড়ি ক্রয় করে পিতার নামে বাড়ির নাম রাখেন "অধরায়তন"। এই ঐতিহাসিক বাড়িতে শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্রনাথ-সহ কৈশোরে মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর কাছে এসেছেন। সে সময় ওই অঞ্চল এখনকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ ছিল না। দেওঘরের এই বাড়িতেই ২৭ ডিসেমবর ১৯৮০ তারিখে নীলমণিবাবুর দেহাবসান হয়।

আমার পরম সান্ত্বনা আমি তাঁর জীবৎকালে

তাঁর বিষয়ে "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় লিখেছিলাম এবং তিনি যে রবিবাসরের প্রথম সম্পাদক ছিলেন রবিবাসরের সুবর্ণজয়ন্তীতে সদস্যগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে সে-কথা স্মরণ করেছেন, এ সংবাদ শুনে তিনি আনন্দে অভিভূত হয়ে অনুজতুল্য চপলাকান্তকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চপলাবাবু সেই চিঠি আমায় দেন এবং রবিবাসরের পুরাতন কথা বিস্তারিত ভাবে বলেন। মৃত্যুকালে নীলমণিবাবুর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

"মানসী ও মর্মবাণী" অফিসের মজলিসেই এক সময় কথা ওঠে এই আড্ডাটিকে একটি সাহিত্যসভা হিসাবে গঠিত করা হোক। সে-কাজে নীলমণিবাবু বিশেষ উৎসাহিত হন এবং ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে আশুতোষ মুখুজ্জে রোডে একটি পরামর্শসভা বসে। তাতে উপস্থিত ছিলেন—রায় জলধর সেন বাহাদুর, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শশীকুমার সেনগুপ্ত, কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সতীশচন্দ্র মিত্র, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র মিত্র, কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ গুহ এবং নীলমণি চট্টোপাধ্যায়। [দ্র. "জলধর সেন" (প্রবন্ধ) : ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্র—২য় খণ্ড, পৃ ৭৭]

এই সভায় "মানসী" - সম্পাদক সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি এবং নীলমণি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক-সহ কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভার নাম রাখা হয়—'রবিবাসর', যা কেবল রবিবারেই কোনো সদস্যদের গৃহে অনুষ্ঠিত হবে।

রবিবাসরের প্রথম চিঠির কাগজ ইংরাজিতে ছাপা হয়েছিল। সভাটির পরিচয়ে বলা হয়েছিল—A Rotary Club of the Literateurs, ঠিকানা —২৩-বি বেথুন রো, কলকাতা।

সুবোধচন্দ্র দত্তের আহ্বানে তাঁর বাসভবন ৫ আশুতোষ মুখুজ্জে রোডে রবিবাসরের প্রথম অধিবেশন হয়—৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ (২৪ নভেম্বর, ১৯২৯)। সভাপতি সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওই বৎসর কলকাতা এবং হাওড়ায় কয়েকটি অধিবেশন হয়। বৎসরের শেষ অধিবেশনে ২৬ অকটোবর ১৯৩০ তারিখে পরের বৎসরের জন্য জলধর সেন সভাপতি নির্বাচিত হন। মনে হয়, তখন প্রতি বৎসর সভাপতি নির্বাচন হবার কথা হয়েছিল, পরে সে প্রথা পরিত্যক্ত হয়।

১৫ শ্রাবণ ১৩৩৭ তারিখে প্রকাশিত রবিবাসরের প্রথম বর্ষের সদস্যতালিকার কয়েকখানি অতি-দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকা নীলমণিবাবুর দেওঘরের গৃহে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। তা থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি। পুস্তিকাখানি প্রবাসী প্রেস ১২০/২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা হতে সজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত। এতে সদস্যগণের তালিকায় ৪০ জনের নাম আছে, অর্থাৎ প্রথম বৎসরে নির্ধারিত ৫০ জন সদস্যসংখ্যা তখনও পূর্ব হয় নি। সেই তালিকাতে ছিলেন :

জলধর সেন, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ফণীন্দ্রনাথ পাল, সতীশচন্দ্র মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমণি চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ গুহ, সরোজকুমার মিত্র, শশীকুমার সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র দত্ত, মন্মথনাথ ঘোষ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, চারুচন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র দেব, প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রনাথ মৈত্র, মহারাজকুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, নলিনীকান্ত সরকার, হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার সরকার, রাজশেখর বসু, গিরীন্দ্রশেখর বসু, সুহৃৎকুমার মিত্র, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বগলারঞ্জন ভট্টাচার্য, হরগোবিন্দ সেন, নীরদচন্দ্র চৌধুরী, প্রমথনাথ বসু এবং গোপাল

হালদার।

এঁদের কয়েক জনকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছিল।

তালিকায় উল্লেখিত জলধর সেন "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক, কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা "প্রবাসী"-র সহকারী সম্পাদক, ফণীন্দ্রনাথ পাল "যমুনা" পত্রিকার সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বহুভাষাবিদ পণ্ডিত, মন্মথনাথ ঘোষ জীবনীকার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাকুমার বসু, নরেন্দ্র দেব কবি, লালগোলার মহারাজকুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় শিকারকাহিনীর লেখক, প্রফুল্লকুমার সরকার "আনন্দবাজারপত্রিকা"র সম্পাদক, রাজশেখর বসু রসসাহিত্যিক ("পরশুরাম") এবং গিরীন্দ্রশেখর বসু বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ, নলিনীকান্ত সরকার গায়ক, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দার্শনিক, নীরদচন্দ্র চৌধুরী বর্তমানে অকসফোর্ড-নিবাসী আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন ইংরাজি সাহিত্যের লেখক এবং গোপাল হালদার প্রমুখ চিন্তানায়ক মনীষীদের আমি চিনবার সুযোগ পেয়েছি আর নরেন্দ্রনাথ বসুই ছিলেন রবিবাসরের পরবর্তী জীবনে প্রাণপুরুষ, যাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে বয়স অল্প থাকলেও রবিবাসরের অনেক অধিবেশনে আমার যাওয়া সম্ভব হত।

৩

কার্যকরী সমিতির অনেক কড়া নিয়ম করা হয়েছিল। কিন্তু 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' বলে একটি প্রবাদ আছে। রবিবাসরের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র চারটি সভা হয় এবং নানা গোলযোগে কার্যসমিতি লোপ পায়। ১৪ ডিসেমবর ১৯৩০ তারিখে এক সভায় জলধর সেনকেই সর্বাধ্যক্ষ উপাধিতে ভূষিত করে তাঁর উপরেই সকল কাজের ভার দেওয়া হয়। দেখা গেল, সার্বজনীন দাদার প্রভাবে অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। নীলমণিবাবুর স্থানে দ্বিতীয় বৎসরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক হলেন, পরের বৎসর অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষে তাঁরই সহকর্মী শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা সম্পাদক হলেন।

চতুর্থ বর্ষেও অধিবেশনের সংখ্যা বেশি হয় নি। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মাত্র তিনটি অধিবেশনের পর রবিবাসর কিছু দিন বন্ধ থাকে। পঞ্চম বর্ষে ১৩৪১ সালের ২রা বৈশাখ জলধর সেনের বিশেষ আবেদনে ঐতিহাসিক মন্মথনাথ ঘোষের শ্যামবাজার ট্রামডিপোর পিছনের বাড়িতে রবিবাসরের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই সভায় জলধর বলেন, বার্ধক্যহেতু তিনি সভার ভার বহন করতে অক্ষম, সদস্যদের মধ্য হতে কেউ সে দায়িত্ব গ্রহণ করুন। সেই সভায় নতুন সম্পাদক হলেন নরেন্দ্রনাথ বসু। তিনি একটি শর্তে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হলেন যে জলধর সেন সভার সর্বাধ্যক্ষপদে স্থায়িভাবে থাকবেন। তাঁর উপদেশমত সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ বসু সকল কাজ সমাধা করবেন। রবিবাসরের পঞ্চম বর্ষটি নানা কারণে স্মরণীয়। এই বৎসরেই শরৎচন্দ্র রবিবাসরের সদস্য হন। তার আগে এসেছেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। "প্রবাসী" "মডার্ন রিভিউ" ও "বিশাল ভারত" তিনটি বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও সদস্য হন। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে রবিবাসর আহ্বান করেন (৩০ ফাল্গুন, ১৩৪৩) সে অধিবেশনে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বসুর সময় থেকেই রবিবাসরের ক্রমোন্নতি লক্ষিত হয়, তার কারণ নরেন্দ্রনাথের নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা এবং তৎকালীন আর্থিক সামর্থ্যের সঙ্গে যোগ হয়েছিল জলধরের দলমতনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে অগাধ জনপ্রিয়তা।

নরেনবাবুর কাছে শুনেছি, পার্শিবাগানে রাজশেখর বাবুদের পৈতৃক বাড়িতে তখন উৎকেন্দ্র সমিতি নামে একটি সাহিত্যিক আড্ডা ছিল। সেখানেও জলধরের

যাতায়াত ছিল। রাজশেখর বসু তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের বড়োকর্তা, সপরিবারে বেঙ্গল কেমিক্যালের মানিকতলার কারখানার কোয়ার্টারেথাকতেন, তবে প্রতি রবিবারে পার্শিবাগানে এসে অন্যান্য আড্ডাধারীদের সঙ্গে মিলিত হতেন। তেমন একটি সভায় রাজশেখর তাঁর প্রথম রসরচনা "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" যখন পাঠ করেন সেখানে জলধর উপস্থিত ছিলেন। পাঠ শেষ হলে তিনি লেখাটি পকেটস্থ করেন। রাজশেখরের আবাল্য বন্ধু চিত্রশিল্পী যতীন সেনগুপ্তর অতুলনীয় রেখাচিত্রসহ সেই গল্প "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিস্মিত পুলকিত হন, এমন-কী রাজশেখরের বিষয়ে তাঁর "বস্" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে চিঠি দেন। মোট কথা—জলধর সেনের অনুরোধে উৎকেন্দ্র সমিতির প্রায় সকল সদস্য একযোগে রবিবাসরে যোগ দেন, তার মধ্যে রাজশেখর, গিরীন্দ্রশেখর দুই ভাই, দুই নরেন (নরেন্দ্র দেব ও নরেন্দ্র বসু), শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখও ছিলেন। শরৎচন্দ্রকেও জলধরই রবিবাসরে এনেছিলেন। রবিবাসরের সকল সদস্যই জলধরের চরিত্রগুণে মুগ্ধ ছিলেন এবং যতদিন জলধর বেঁচেছিলেন (মৃত্যু—২৬ চৈত্র, ১৩৪৫) রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে সকলেই আন্তরিক ভাবে তাঁকেই রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষরূপে চাইতেন। রবিবাসরে তাঁর ৭৮ বৎসরের জন্মদিনে কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র যে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি—তাতে কী দৃষ্টিতে সদস্যরা তাঁকে দেখতেন তা বেশ বোঝা যাবে—

...বয়োবৃদ্ধের অন্ত নাহিক ভবে,
দাদা তারা নয় সবে।
সরল প্রাণের সুমধুর রসায়নে
না জানি কি জাদু উপজয় দরশনে,
সেই গুণে তুমি সকলের বরণীয়
অজাত-বৈরী সুহৃদোত্তম প্রিয়,
সবাকার সুরে প্রাণটি তোমার বাঁধা,
—সার্বজনীন দাদা।

শখের দলের সুশাসক অধিকারী,
বর্মাসিগারধারী।
আইন-কানুন তোমার মুখের বাণী,
বিধিনিষেধের আর কিছু নাহি জানি।
ইচ্ছা তোমার এষণা যে আমাদের
সহজিয়া রীতি, নাহি কোন হেরফের।
পরান তোমার যেন দুধে ধোয়া, সাদা
তাই এজমালি দাদা।
আটাত্তরের চৌকাঠে আজি এলে,
ওই দুটি বাহু মেলে
ডাকিলে মোদের তোমার দেহলী 'পরে,
পঞ্চাশী দল ছুটে আসে তব ঘরে।
পয়লা চৈত্রে একি মৈত্রের মেলা,
শ্রদ্ধা-পরাগে অভিনব হোরিখেলা!
চরণে তোমার বাঙলার ধূলিকাদা
শিরে তুলি দাও দাদা।

(বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৪৩)

এই জলধর সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লেখেন—

ভাবতে অবাক লাগে, কোন একদিন স্বপ্নময় অতীতে আমাদের তিরিশ-গিরিশের বাড়িতে রবিবাসরের আসর বসেছিল। স্বয়ং তীর্থপতি জলধরদা উপস্থিত ছিলেন—শস্য ফলাতে পারে অথচ আপাত-উষর কোন্ মাঠের উপর সেই মেঘ না স্নেহবর্ষণ করেছে—আর তাঁকে ঘিরে আমরা সেকালের অতি আধুনিকেরা বসেছিলাম আপনজনের মত—প্রেমেন, প্রবোধ, মনোজ, ভবানী* আর হেম বাগচী।

—রবিবাসরের স্মৃতি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
রবিবাসর (১ম খণ্ড), পৃ ২১৭

জলধর সেন ৭৯ বৎসর বয়সে ২৬ চৈত্র ১৩৪৫ তারিখে কলকাতায় পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ পুরী থেকে যে চমৎকার কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ কবিতাটি রচনা করেন এটি তত দীর্ঘ নয়, বরং এটি পড়লে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ

* প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, মনোজ বসু এবং ভবানী মুখোপাধ্যায়।

যে অতুলনীয় দ্বিপদীটি লিখেছিলেন—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

সেটিই বেশি মনে পড়ে। তবে রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষের স্মৃতিতে রবিবাসরের অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য মাত্র না হয়ে এটি হয়ে উঠেছে বিশ্বকবির হাত দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতির শ্রদ্ধার্ঘ্য—তাই জলধর-জীবনী প্রসঙ্গেও এটি অবিস্মরণীয় হয়ে আছে—রবিবাসর প্রসঙ্গে তো বটেই। কবিতাটি এই—

জ ল ধ র

বাঙালীর প্রীতি-অর্ঘ্যে তব দীর্ঘ জীবনের তরী
স্নিগ্ধ শ্রদ্ধাসুধারস নিঃশেষে লয়েছে পূর্ণ করি।
আজি সংসারের পারে দিনান্তের অস্তাচল হোতে
প্রশান্ত তোমার স্মৃতি উদ্ভাসিত অন্তিম আলোতে॥

পুরী, ২৬।৪।৩৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪

রবিবাসরের সদস্যরা তো বটেই, যাঁরা সদস্য না হয়েও রবিবাসরের সংস্পর্শে এসেছেন—তাঁদেরও অনেকে রবিবাসর বিষয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন। রবিবাসরের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধনের দিন (৮ই বৈশাখ ১৩৮৬) ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্রের আহূত রবিবাসরে আমি তেমন কিছু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছিলাম যাতে রবিবাসর-প্রসঙ্গ উল্লিখিত আছে। গত দশ বৎসরে সেই তালিকায় আরও কিছু গ্রন্থের নাম সংযুক্ত হওয়া সম্ভব। তবে সেদিন সভাশেষে যিনি ৫০টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন, সেই ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় আমায় ডেকে ঐ গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করবার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ড. রায় নিজেও একসময়ে রবিবাসরের সদস্য ছিলেন।

যে যে গ্রন্থে রবিবাসরের বিষয় আলোচনা আছে বলে জানি এখানে তা উল্লেখ করি—

১-২০। রবিবাসর (বার্ষিক সংকলন—এ পর্যন্ত ২০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে)। ২১। রবিবাসরে রবীন্দ্রনাথ—সন্তোষকুমার দে। ২২। জলধর সেনের আত্মজীবনী—সম্পাদনা: নরেন্দ্রনাথ বসু। ২৩। জলধর-কথা—সম্পাদনা: ব্রজেন্দ্রনাথ দাস। ২৪। শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য—রাধারানী দেবী। ২৫। বনস্পতির বৈঠক—প্রবোধকুমার সান্যাল। ২৬। ভারতের শিল্প ও আমার কথা—অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ২৭। এ নিঃস্ব জীবনে—ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ২৮। বিগত দিন—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ২৯। আত্মজীবনী—ভবানী মুখোপাধ্যায়। ৩০। আমার শিল্পীজীবনের কথা—আব্বাসউদ্দিন আহমদ্ (ঢাকা)। ৩১। জীবননদীর বাঁকে বাঁকে—যোগেশচন্দ্র বাগল। ৩২। তৃণখণ্ড—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৩। একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। ৩৪। রবীন্দ্র-আশীর্বাদ-ঝর্ণাধারায় নিত্য স্নাত—দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা। ৩৫। শরৎ শতবার্ষিকী গ্রন্থ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ৩৬। হুগলী জেলার ইতিহাস (১ম খণ্ড)—সুধীরকুমার মিত্র। ৩৭। নতুন তথ্যে শরৎচন্দ্র—গোপালচন্দ্র রায়। ৩৮। মর্জিমহল—বনফুল। ৩৯। অমর স্মৃতি—ড. সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়। ৪০। স্মৃতিবিচিত্রা—অজিতকৃষ্ণ বসু (অক্টোবর)।

—('আলোচনা' মাসিক পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত)

এ বাদে রবিবাসর বিষয়ে প্রবন্ধ আর কবিতা এবং কতিপয় গান যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ, জলধর সেন, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, নীরদচন্দ্র চৌধুরী (অকসফোর্ড), প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মোহনলাল মিত্র, অমলকৃষ্ণ গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, কুমারেশ ঘোষ, প্রভাতকুমার হালদার, প্রাণতোষ ঘটক, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী, সন্তোষকুমার দে, ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভাস্কর, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, বেলাদেবী, মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত), সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ব্রজমোহন দাস প্রমুখ।

রবিবাসরের পরিচয় দিতে গিয়ে "বিচিত্রা"-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'আমাদের রবিবাসর শিল্পী ও সাহিত্যিকগণের মিলন-সভা। সাহিত্য ঠিক এর লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। পনেরো দিন অন্তর সদস্যদের মিলিত হওয়াই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এর সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশ অতিক্রম করতে পারে না।* এই সংখ্যা সর্বদা পূর্ণ তো থাকেই, অধিকন্তু সদস্যপ্রার্থী-রূপে পাঁচ-সাত ব্যক্তি সততই প্রতীক্ষা-তালিকায় অবস্থান করেন। কোনো সদস্যের মৃত্যু অথবা সদস্যপদত্যাগ ভিন্ন কারও পক্ষে রবি-বাসরে প্রবেশ করবার উপায় নেই।

'রবিবাসরের নিজস্ব কোনও আস্তানা নেই। পঞ্চাশ জন সদস্য এবং তদুপরি আহ্বায়ক কর্তৃক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে এত বৃহৎ এক অনুষ্ঠান, কিন্তু এর অধিষ্ঠানের জন্যে এক পয়সা ভাড়া দিতে হয় না। বিদেহী আত্মার মতো নিরাশ্রয় নিরবলম্ব হয়ে তেরো দিন এই প্রতিষ্ঠান যেন বায়ুভূত হয়েই গোপনে অবস্থান করে, তারপর চতুর্দশ দিনে আহ্বানকারীর গৃহে উড়ে এসে জুড়ে বসে। তখন এর উৎসবময় সুপুষ্ট মূর্তি দেখে কে বলবে যে এর দেহ নেই। এইভাবে রবিবাসর পর্যায়ক্রমে এক সদস্যের গৃহ থেকে অপর সদস্যের গৃহে পরিক্রমণ করে বেড়ায়।'

—বিগত দিন, প্রথম খণ্ড, পৃ ৬১

আর ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—'রবিবাসর নামটির মধ্যেই একটি প্রশস্ত অবসরের স্নিগ্ধ গুঞ্জন, একটি আরাম ও মুক্তির উদার ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। স্বতঃই মনে হয় যেন এই মিলনকেন্দ্রটি আমাদের মনকে আধুনিক যুগের উত্তপ্ত পরিবেশ থেকে নিয়ে গিয়ে উহার প্রতি একটি নিভৃত আশ্রয়ের আমন্ত্রণ প্রসারিত করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের বৈঠকী মজলিসটি যেন অতীত এবং অধুনা অপ্রাপ্য ফরাস-বিছানা-বালিসের এলায়িত আলিঙ্গনকে আমাদের দেহমনের তৃপ্তির জন্য বিছিয়ে রেখেছে। হয়ত বাসরের মদির নিবিড়তা এর মধ্যে নাই। কিন্তু আসরের নিশ্চিন্ততা বহু পরিমাণেই আছে। দাম্পত্য প্রণয়ের তপ্ত ইক্ষুচর্বণের পরিবর্তে আছে সৌহার্দ্যের অনাবিল প্রীতি, দারুণ গ্রীষ্মে ডাবের জলের সুশীতল আতিথেয়তা। পীরিতি-সাগরের দুঃখবায়ু-বীজিত, অস্বস্তি-কণ্টকিত জোয়ার-ভাটার বদলে আছে সম-প্রাণতার অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। বাসরকক্ষের চারিদিকে যে একটি আনন্দিত পরিবারপরিবেশের বিস্তীর্ণ বহিরঙ্গ প্রসারিত থাকে, দাম্পত্য মিলনের কেন্দ্রোৎক্ষিপ্ত যে একটি উল্লাসবৃত্ত নিজ পরিধির সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিল্লোলকে একটি বিন্দুতে সংহত করে, আমাদের রবিবাসর সেই মিলনমুখর মহাসঙ্গমের একটি শাখা-নদী। যেখানে পরম দ্বৈতের অদ্বৈত ভাব সিদ্ধরসরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে যে বহু হতে একের দ্বিত্বের মাধ্যমে পরিণতি, রবিবাসর সেই লীলাপরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। সে বাসর না হলেও বাসরের পুষ্পসুরভিত হাওয়ায় অভিস্নাত।'

রবিবাসরের বার্ষিক সংকলনগ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধ "আমাদের রবিবাসর" লিখেছিলেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনিই ছিলেন রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ। বার্ষিক সংকলনটির সম্পাদক হিসাবে আমার উপর সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করে তিনি বলেছিলেন, 'রবিবাসরের ঐতিহ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে সম্পাদনা কোরো।' তারপর সেই বার্ষিক সংকলনের কুড়িটি খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তাতেই বিধৃত আছে রবিবাসরের ধারাবাহিক ইতিহাস।

রবিবাসরের প্রতিষ্ঠাকালে ১৩৩৬ সালে সভাপতি ছিলেন সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বর্ষেই সভাপতিপদে নির্বাচিত হন জলধর সেন। তারপর যখন তাঁকে রবিবাসর পরিচালনার সকল দায়িত্ব দেওয়া হয় তখনই সভাপতি-পদের নামকরণ করা হয়—'সর্বাধ্যক্ষ'। রবীন্দ্রনাথ যখন রবিবাসরে যোগ

* কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত সর্বাধ্যক্ষ থাকার সময় এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৫২ করা হয়।

দেন তখন তিনি হন "অধিনায়ক"—তবে রবিবাসরের সকল দায়িত্ব সর্বাধ্যক্ষের উপরেই ন্যস্ত থাকে। জলধর সেন আমৃত্যু সেই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ১৩৩৭ থেকে ১৩৪৫ সাল পর্যন্ত জলধর রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সর্বসম্মতিক্রমে প্রফুল্লকুমার সরকারকে সর্বাধ্যক্ষ করা স্থির হয়। সেই শুভ সংবাদ ভারতবর্ষ-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন "আনন্দবাজার পত্রিকা"র বর্মণ স্ট্রীটের অফিসে প্রফুল্লবাবুকে জানাতে যান তিনি শুনে আপত্তি জানান, বলেন—যে সভায় তাঁর শিক্ষাগুরু অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র রয়েছেন সেখানে প্রফুল্লবাবু কিছুতেই সর্বাধ্যক্ষের আসনে বসবেন না।

প্রফুল্লবাবুর ঐকান্তিক অনুরোধে সদস্যগণ তখন অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রকে রবিবাসরের দ্বিতীয় সর্বাধ্যক্ষপদে নির্বাচন করেন। খগেন্দ্রনাথ এই পদে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩৪৫ থেকে ১৩৬৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর তিনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে রবিবাসর পরিচালনা করেন। সে সময় নরেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদক ছিলেন।

প্রফুল্লকুমার সরকারের মত আরও কয়েকজন সদস্য অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ছাত্র ছিলেন। রায়-বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র পূর্ববর্তী সর্বাধ্যক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুরের মত কেবল আর-একজন রায়বাহাদুরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রেসিডেনসি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের এক স্বনামধন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। পরে সরকারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন এবং আশ্চর্য দক্ষতায় দর্শনশাস্ত্র হতে বাঙলা সাহিত্যে অধ্যাপনাতেও নিজ স্বকীয়তায় প্রখ্যাত হন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও খনেন্দ্রনাথের ছাত্র ছিলেন এবং খগেন্দ্রনাথকে তিনি আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করতেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের সময় খগেন্দ্রনাথই রবিবাসরের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন, ফলে রবীন্দ্রতিরোধানের বর্ষপূর্তিতে রবি-বাসরের রবীন্দ্রস্মরণসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এবং খগেন্দ্রনাথের ইচ্ছা পালনের জন্য উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। রবিবাসরের সেই অধিবেশনটিতে এত জনসমাগম হয়েছিল বহুলোক সভাস্থলে স্থানাভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনতে থাকেন। আমি রবি-বাসরের এত বড়ো এবং এত জনাকীর্ণ সভা আর কখনও দেখি নি। অবশ্য শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত দুটি রবি-বাসরেই হলভর্তি জনসমাবেশ হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্র-তিরোধানের এক বৎসর পরেও ইউনিভারসিটি সিনেট হলের মতো এত লোক অন্য কোনো রবিবাসরে দেখি নি।

খগেন্দ্রনাথ একজন খ্যাতনামা কীর্তনগায়ক ছিলেন। স্বনামধন্য সঙ্গীতবিজ্ঞানী পণ্ডিত ভাতখণ্ডে পর্যন্ত তাঁর কাছে কীর্তনের কলাকৌশল ও গায়ন-পদ্ধতি জানতে কলকাতায় এসেছিলেন। আমরা রবিবাসরেও তাঁকে বহুবার কীর্তন গাইতে শুনেছি—তবে সে নেহাত নমুনাস্বরূপ। বিশিষ্ট কীর্তনসমাজে তিনি ছিলেন একজন বিশেষ সমাদৃত উচ্চাঙ্গের কীর্তন-শিল্পী—যিনি কীর্তনে শুধু নিজে কেঁদে ভাসাতেন না, শ্রোতাদেরও কাঁদিয়ে ছাড়তেন। তাঁর কীর্তনের তালে-তালে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দে নৃত্য জুড়ে দিয়েছেন—এমন দৃষ্টান্তও আছে।

অধ্যাপক হিসাবে এবং ব্যক্তি হিসাবে তিনি কী গভীর প্রভাব ছাত্রসমাজে বিস্তার করতেন সে বিষয়ে কিছু স্মৃতিচারণ করেছেন প্রেসিডেনসি কলেজে তাঁর ছাত্র চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। এখানে তা থেকে সামান্য অংশ তুলে দিচ্ছি—

'(প্রেসিডেনসি কলেজে) যে অধ্যাপকমণ্ডলীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম অধ্যাপক (খগেন্দ্রনাথ) মিত্র তাঁহাদের অন্যতম এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ, সুশ্রী সুগঠিত আকৃতি, প্রদীপ্ত দৃষ্টি, অপূর্ব বাচনভঙ্গী। তাঁহার অধ্যাপনায় অজ্ঞাত বিষয় আপনিই হৃদয়গ্রাহী হইয়া

উঠিত। সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ছিল তাঁহার বাচনভঙ্গী। সুমিষ্ট শান্ত ধীরভাবে কথাগুলি বলিতেন। কিন্তু সেই বলার মধ্যে কোথাও একটা শক্তি থাকিত যাহা বলিয়া দিত, ইহাই তোমাদের মানিয়া লইতে হইবে। ইহার উপর আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ব দেখিয়া মনে হইত, সুদক্ষ মণিকারের হাতে মার্জিত হীরকখণ্ডের যেমন সকল মুখ দিয়াই জ্যোতি স্ফুরিত হয়, এ ব্যক্তিত্ব সেই রকমই। বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সকল দিক দিয়াই যেন আলো ঠিকরাইয়া পড়িতেছে।'

গান্ধীজির ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন, ম্যাট্রিক এবং আই-এ পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র চপলকান্ত বি-এ ক্লাশে খগেন্দ্রনাথের কাছে দর্শন-শাস্ত্রে অনার্স পড়তে পড়তে কলেজ ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই সময়ের একটি ঘটনা—

'আন্দোলন লইয়া যে সময়টা খুব ব্যাপৃত সেই সময়ে অধ্যাপক মিত্রের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছিলাম। কলেজে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক ছিল, কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঘনিষ্ঠতার যোগ আর রহিল না। ইহার অনেক দিন বাদে একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পশ্চিম ফুটপাত ধরিয়া যাইতেছিলাম, বিপরীত দিক হইতে তিনি অসিতেছিলেন। যেখানে মনোমোহন লাইব্রেরিটা ছিল সেইখানে তাঁহার সামনাসামনি আসিয়া পড়িলাম। খালি পায়ে, মাত্র একটি খদ্দরের চাদর গায়ে, চুল অবিন্যস্ত—এইভাবে যাইতেছিলাম। তিনি দুই হাতে ধরিয়া আমাকে দাঁড় করাইলেন, ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—"চপলা, এ তোমার কী চেহারা হইয়াছে? তুমি কি সন্ন্যাসী হইয়া গেলে?" উত্তর দিতে পারিলাম না। মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।'

তবু ছাত্রবৎসল খগেন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় ছাত্র চপলাকান্তকে ভোলেন নি, যে প্রেসিডেনসি কলেজে ভর্তি হওয়াই ভাগ্যের কথা; সেই প্রেসিডেনসি কলেজেই মেধাবী দরিদ্র সম্পূর্ণ অপরিচিত ফরিদপুর হতে আগত একটি ছেলেকে চপলাবাবুর অনুরোধে খগেন্দ্রনাথ তৎকালীন প্রেসিডেনসি কলেজের অধ্যক্ষ ব্যারো সাহেবকে ধরে ফুল ফ্রীশিপ আদায় করে দিয়েছিলেন।

খগেন্দ্রনাথ কলেজ হতে অবসর নিয়ে সরকারি শিক্ষা বিভাগে যোগ দেন, সেই কাজে থাকতে-থাকতেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন—প্রথমে কাউনসিল অব স্টেট, পরে লেজিসলেটিভ এসেমব্লিতে।। স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রও তখন গভর্নর-জেনারেলের সদস্য ছিলেন। একদিন স্যার ভূপেনের সিমলার বাসভবনে কীর্তন শোনাবার জন্য খগেন্দ্রনাথ-এর আমন্ত্রণ আসে। তিনি গাইতে গেলে সকলে বায়না ধরেন—এমন গান গাইতে হবে যাতে সভাসদ সকলে নাচতে বাধ্য হন। খগেন্দ্রনাথ তাতেই সম্মত হয়ে গান শুরু করেন। কীর্তনের অগ্রগতির সঙ্গে এমন প্রবল ভাবের সঞ্চার হয় যে শ্রোতারা সবাই আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করেন। নাচের বেগও এত প্রবল হয় যে বাড়িটা যেন কাঁপতে থাকে। এই ঘটনাটি খগেন্দ্রনাথ চপলাকান্তের কাছে নিজে বিবৃত করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য: রবিবাসর সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা—৩, পৃষ্ঠা ৭২)

এই প্রখর ব্যক্তিত্বশালী অথচ শান্ত সংযত বৈষ্ণব প্রকৃতির মানুষটি যখন রবিবাসরে এসে বসতেন সভা সত্যিই যেন আলোকিত হয়ে উঠত। চপলাবাবু তাঁর সহপাঠী বন্ধু শ্যামাপ্রসাদকে অনুরোধ করেছিলেন, খগেন্দ্রনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর নিযুক্ত করতে। শ্যামাপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'আরে ভাই, সে খগেনবাবু কি আর আছেন'। তিনি তখন অসুস্থ।

সেই অসুস্থ অবস্থাতেই বাড়িতে রবিবাসর ডাকলেন। উপলক্ষ তাঁর প্রিয় ছাত্র চপলাকান্ত সদ্য পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণ করে ফিরেছেন। তাঁকে অভিনন্দন

জানাবেন। সে অধিবেশনে আমি উপস্থিত ছিলাম। গুরুশিষ্যের মিলনের সেই মধুর দৃশ্যটি আজও যেন চোখের উপর ভাসছে। অসুস্থ খগেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে, চপলাকান্ত তাঁর পায়ের কাছে ফরাসে। খগেন্দ্রনাথ গভীর মমতার সঙ্গে চপলাকান্তকে অভিনন্দন জানালেন, আশীর্বাদ করলেন। আর চপলাকান্ত তাঁর ভাষণের প্রাক্‌কালে গুরুবন্দনায় কী আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন!

রবিবাসরে এইরকম মনীষীদের সমাবেশ বহু বহু বার ঘটেছে। তাই তার বৃত্তান্ত বলতে বসলে আর ফুরোতে চায় না।

[এই প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা ভবিষ্যতে প্রকাশের ইচ্ছা আছে।—সম্পাদক]

যাঁরা ছাপার জন্য লেখা তৈরি করেন, তাঁদের অনেকের কলম থেকে অনেক ভুল বানান বেরোয়। এই সংখ্যার পাণ্ডুলিপি ছাপতে পাঠাবার আগে যেসব শব্দের বানান আমাদের শুধরে দিতে হয়েছে, তাদের অসম্পূর্ণ একটি তালিকা—

ঊর্ধ্ব (ঊর্ধ, ঊর্ধ), অ্যালিয়েনেশন (এ্যালিয়েনেশন), কিংবা (কিম্বা), জাদু (যাদু), তত্ত্ব (তত্ব), দাবি (দাবী), দামি (দামী), ধরন (ধরণ), পশ্চাৎপট (পশ্চাতপট), বয়ঃকনিষ্ঠ (বয়োকনিষ্ঠ), পরিষ্কার (পরিস্কার), পুরস্কার (পুরষ্কার), সদ্যোজাত (সদ্যজাত), সংবর্ধনা (সম্বর্ধনা)।

চতুর্থ অধ্যায়

উচ্চব্রহ্মদেশীয় রাজপ্রাসাদের আমোদ-প্রমোদ

মহারাজ তিব'র সিংহাসনলাভের পর হইতে, রাজ-দরবারে ও রাজপ্রাসাদে যেরূপ নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র, কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড হইতেছিল, কন্‌সাল সাহেবের তর্জন এবং বৈদেশিক ভাগ্যান্বেষিগণের রূঢ় ব্যবহার উচ্চব্রহ্মে যেরূপ অশান্তি উৎপাদন করিতেছিল, নানা-প্রকার ও নানাজাতীয় গুপ্তচর যেভাবে রাজ্যমধ্যে, এমনকী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজ্যনাশের রন্ধ্র অনুসন্ধান করিতেছিল, এবং রাজ্যের প্রধান মন্ত্রি-গণ দ্বেষ- ও হিংসা-পরবশ হইয়া তিব'কে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যেরূপ গুপ্তভাবে একাধিক ষড়যন্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজ তিব'র পারিবারিক জীবন যে অত্যন্ত অশান্তিময় হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হয় না।

কিন্তু এরূপ ষড়যন্ত্র, কারাদণ্ড ও অশান্তিই তাঁহার জীবনপুস্তিকার সকল অধ্যায় নহে।

মানুষ আনন্দের সন্তান। অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেও সে আনন্দের অনাবিল অমৃতরস হইতে বঞ্চিত হয় না। মহারাজ তিব'র দিনরাত্রি ও সন্ধ্যা-প্রভাত, ছোটোবড়ো রাজনৈতিক উদ্বেগে দুর্যোগময় থাকিলেও অন্যদিকে ছিল রাজ-অন্তঃপুরে মহারানী থুপিয়ালার প্রীতি, লেট্‌ঠোন-ড' কক্ষে বন্ধুদিগের নির্দোষ হাস্য-পরিহাস, রাজ-উদ্যানে নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক, রাজমঞ্চে মাঝে প্রভৃতি সুগায়িকার মনোহর সংগীত এবং ধর্মমন্দিরে মহারাজ তিব'র ভক্তিললিত প্রার্থনা, অযাচিত দান ও বিদ্যা-বৃদ্ধ বৌদ্ধাচার্যগণের সহিত ধর্মালোচনা।

একদিকে ছিল মহারাজ তিব'র রাজসভায় নিত্য-নূতন রাজনৈতিক সমস্যা—ব্রহ্মরাজ্য সংরক্ষণের জন্য সন্ধি, বিচ্ছেদ, মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদের গভীর গুপ্ত মন্ত্রণা ; আর অন্যদিকে ছিল মহারানী থুপিয়ালার

দরবারে নিত্যনূতন রঙ্গময় প্রেমের মোকদ্দমা। এক-দিকে ছিল রাজ্যমধ্যে চুরি, ডাকাতি ও বিদ্রোহ নিবারণের জন্য ব্রহ্মসৈন্যের কুচকাওয়াজ; আর অন্য-দিকে ছিল রাজ-উদ্যানে আনন্দপ্রসূ চৌরান্বেষণ, বন-ভ্রমণ, অলীক-বিবাহ ও সখীবৃন্দের রাল্‌বী খেলা। একদিকে ছিল তিব'র বিলাসকক্ষে মদিরামত্ত বয়স্ক-গণের উচ্চহাস্য, অন্যদিকে প্রতি বৌদ্ধপর্বে দেবমন্দিরে নির্জলা উপবাস ও উচ্চ স্তোত্রধ্বনি। একদিকে রাজধানীর প্রকাশ্যপথে রজতমুদ্রাধ্বনিমুখর জনপূর্ণ দ্যূতশালা, আর অন্যদিকে ছিল ধর্মমন্দিরে পলিতকেশ বৌদ্ধাচার্যগণের সুগম্ভীর টায়া-হ-জিন (ধর্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা)। এইরূপ পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলীর মধ্যে মহারাজ তিব' ও মহারানী থুপিয়ালার রাজত্বকাল সুখে-দুঃখে, শান্তি-অশান্তিতে বৈচিত্র্যময় ছিল।

প্রাতঃকাল ৮টা হইতে দু-প্রহর ১২টা পর্যন্ত মহারাজ তিব' রাজকার্য করিতেন। অপরাহ্ণ তিনটা পর্যন্ত বিশ্রাম করিয়া অন্তঃপুরে বা রাজপ্রাসাদের বাহিরে নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অতিবাহিত করিতেন। তৎপরে সন্ধ্যাপ্রার্থনাদির শেষে বিলাসকক্ষে তিনি বয়স্যদিগের সহিত তাসপাশা খেলিয়া রাত্রি নয়টার পর শয়নকক্ষে আসিতেন। আবশ্যকীয় কার্যের জন্য মহামন্ত্রী ও আতুইন-উনগণ যে-কোনো সময়ে মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন।

অন্তঃপুরে ও বিলাসকক্ষে যেরূপ আমোদ-প্রমোদ হইত, তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প পাঠকগণকে বলিব।

(ক)

রাজান্তঃপুরের আমোদ-প্রমোদ

নভেমবর মাস, বিকাল বেলা, দিনে প্রখর রৌদ্র ছিল, এখনো ঠাণ্ডা পড়ে নাই। দক্ষিণের উদ্যানে আজ চা-পান হইবে। মহারাজ তিব' মহারানীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

মহারাজের ত্রিশজন সহচর এই চা-পানে যোগ দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মহারাজ তিব'র সহিত দক্ষিণের উদ্যানে আসিয়াছেন। সকলেই সম্ভ্রান্ত-বংশের পুত্র, শিক্ষিত যুবক, ব্যায়ামবলিষ্ঠ দেহ, সুবর্ণ-কান্তি উজ্জ্বল মুখশ্রী, সুবিন্যস্ত কেশ, শিরে রক্ত-রেশমের উষ্ণীষ, অঙ্গে শুভ্র-রেশমের এঞ্জি এবং পরিধানে নৌসৈন্যনীল রেশমি লৌঞ্জি।

৪টার সময়ে মহারানী থুপিয়ালা তাঁহার ত্রিশজন সহচরীসহ উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মুখে শুভ্র তানাখার লঘু-প্রলেপ, শিরে সুকৃষ্ণ কেশের কুণ্ডলীকৃত কবরী, তাহাতে জ্যোতির্ময়ী হীরকের নক্ষত্রোজ্জ্বল কেশবন্ধ, হস্তে মণিময় বলয়, কণ্ঠে মুক্তার মালিকা, কর্ণে হীরকের কুণ্ডল, অঙ্গে বলাকা-শুভ্র এঞ্জি, বক্ষে লেবু-নীল রেশমের কাঁচুলি এবং পরিধানে জবারক্ত রেশমের বিচিত্র থামিন। সকলেই উচ্চবংশের কন্যা, সুশিক্ষিতা ও সুচরিত্রা। পদ্মরাগসন্নিভ অধরোষ্ঠে লঘু হাস্যবিজলী বিজড়িত করিয়া এই যুবতীগণ মহারানীর সহিত উদ্যানে আগমন করিলে, মহারাজ তিব' সানন্দে আসন হইতে উত্থান করিয়া মহারানীকে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং মহারানী থুপিয়ালা আসন গ্রহণ করিলে পর মহারাজ তিব' তাঁহার বামপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। মহারানীর সহচরীগণ তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবেশন করেন; মহারাজের সহচরগণ তাঁহার বামপার্শ্বে পারস্যদেশীয় কার্পেটের উপর বসিলেন।

উদ্যানমধ্যে প্রত্যেক দশ হাত অন্তর ত্রিশখানি ছোটো কার্পেট বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহার উপর অর্ধ-হস্ত-উচ্চ স্বর্ণপত্রমণ্ডিত চা-পদ (teapoy)। মহারাজার ভৃত্যগণ তাহার উপর স্তরে-স্তরে অপরাহ্ণ ভোগ ও চা-পাত্র সাজাইয়া রাখিয়াছিল।

সকলে উপবেশন করিলে মহারাজ তিব' বলিলেন;

—মহারানী, তোমার সখীগণ সকলেই অনূঢ়া, আমার সহচরগণও সকলেই অবিবাহিত। আমরা

দুইজন মাত্র বিবাহিত জায়াপতি—এই চা-পানে উপস্থিত আছি দেখিয়া আমি অত্যন্তই দুঃখিত হইতেছি। তোমার সুন্দরী সহচরীগণের নিদারুণ স্বামী-শূন্যতা আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। অতএব আমি আজ এই শুভ সম্মেলনে আমার সহচরগণের সহিত তোমার সহচরীগণের উদ্বাহ-কার্য সম্পন্ন করিয়া পুণ্যলাভ করিতে ইচ্ছা করি।

মহারাজের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া মহারানী বিস্মিতনেত্রে তাঁহার লজ্জানম্র সখীগণকে অবলোকন করিতে করিতে কহিলেন :

ভবেশ্বর, তোমার এই বিস্ময়জনক অনুরোধে আমার সুশীলা সখীগণ অত্যন্ত ভীত ও লজ্জিত হইয়াছে। তাহারা অনূঢ়া হইলেও মহাসুখে রাজ-অন্তঃপুরে বাস করিতেছে। তোমার প্রগল্‌ভ সহচরদিগকে ইহারা বিবাহ করিয়া সুখী হইবে না। অতএব তুমি এই বিসদৃশ ইচ্ছা পরিত্যাগ করো।

মহারাজ তিব' পুনরায় কহিলেন—

যুবতীদিগের যুবসঙ্গ-বাসনাই স্বাভাবিক। তোমার সঙ্গলাভেও ইহাদের পতিসঙ্গ-বাসনা অপূর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং তুমি আমার প্রস্তাবিত এই পুণ্যকার্যে বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া তোমার সখীগণের সম্মতিলাভ করিতে চেষ্টা করো। আমিও আমার সহচরগণের মতামত পরীক্ষা করিতেছি।

এই বলিয়া মহারাজ তিব' আসন হইতে উঠিয়া তাঁহার সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

মহারানীর সহচরীগণ মহারাজের এই লজ্জাকর প্রস্তাবে অসম্মতি বিজ্ঞাপন করিতে করিতে মহারানীকে বেষ্টন করিয়া নানা প্রকার অনুনয় করিতে লাগিল। মহারানী তাহাদিগকে বলিলেন :

সখীগণ, আমি কোনদিনই মহারাজার আজ্ঞা অমান্য করি নাই। আজ আমি কী উপায়ে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিব? আমার অনুরোধ তোমরা মহারাজের আদেশ অনুযায়ী বিবাহ করিতে সম্মত হও। এত শীঘ্র, এক অপরাহ্নের মধ্যে কোনো প্রকারেই তোমাদের বিবাহকার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। সম্ভবত তিনি পরিহাস করিয়াই এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন। তোমরা মহারাজের প্রস্তাবে সম্মত হও। দেখি, তিনি কী করেন!

মহারানীর এইরূপ অনুরোধে তাঁহার সখীগণ সম্মত হইল এবং লজ্জিতভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া স্ব স্ব অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

মহারাজ শীঘ্রই সহচরগণের সম্মতিলাভ করিয়া সহর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। মহারানী বলিলেন :

মহারাজ, আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য "দেবা-মানবা-যক্ষা-নাগা" সকলেই সর্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমার সুশীলা সখীগণও স্বর্ণব্রহ্মের রাজাধিপতির অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত নহে। কিন্তু আমি সানুনয় নিবেদন করিতেছি যে, আমার সুন্দরী ও সদ্বংশজা সখীগণ এই আকস্মিক বিবাহে উপযুক্ত ও বাঞ্ছিত পতি লাভ না করিলে চিরজীবন কষ্ট ভোগ করিবে, এবং তাহাতে মহারাজের পুণ্যলাভ না হইয়া পাপসঞ্চয়ই হইবে। অতএব যে উপায়ে আমার লজ্জাশীলা সখীগণ উপযুক্ত পতিলাভ করিয়া সুখী হইতে পারে, তাহার সদুপায় করুন।

মহারাজ তিব' বলিলেন :

রাজেন্দ্রাণী, তোমার এই সদ্‌যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। সকল বিবাহই বিধির নির্বন্ধানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং আমি এরূপ সুন্দর উপায়ে তোমার সখীগণের স্বামী নির্বাচন করিব যে তাহাতে কেহই অসন্তুষ্ট হইবে না।

এই বলিয়া মহারাজ তিব' তাঁহার ভৃত্যগণকে ইঙ্গিত করিলে, তাহারা ত্রিশ প্রকারের ভিন্ন-ভিন্ন পুষ্প আনিয়া মহারানীর সম্মুখে স্থাপন করিল। মহারাজ তিব' বলিলেন :

মহারানী, তোমার সখীগণ ইহা হইতে ভিন্ন-ভিন্ন

জাতির-এক-একটি পুষ্প তাহাদিগের কবরীতে স্থাপন করিয়া নিকটস্থ পর্বত-গুহায় ও কুঞ্জ-বিতানে উপবেশন করুক। আমার যে সহচর অনুরূপ পুষ্প লইয়া তোমার যে সখীর নিকট উপস্থিত হইবে, সে তাহার প্রেমভিক্ষা করিয়া সম্মতিলাভ করিলে, তাহাকে বিবাহ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইবে।

মহারাজের এইপ্রকার বাক্যে মহারানী ও তাঁহার সহচরীগণের আরুদ্ধ হাস্যে উদ্যান আধুনিত হইয়া উঠিল। মহারানী বলিলেন :

মহারাজের আদেশ আমাদিগের শিরোধার্য; কিন্তু আমার সখীগণ যে সময়ে পুষ্পনির্বাচন করিয়া কবরীতে পরিধান করিবে, তখন তোমার সহচরগণ এখানে অবস্থান করিতে পারিবে না। কারণ তাহারা ইহা দেখিতে পাইলে অদৃষ্টানুরূপ জায়া গ্রহণ না করিয়া দৃষ্টানুরূপ পত্নী মনোনয়ন করিবে। তোমার উদ্ভাবিত এই অদৃষ্ট পরীক্ষাও বিফল হইবে।

মহারানীর এই উপদেশে মহারাজ তাঁহার সহচর-গণকে উদ্যান হইতে পনেরো মিনিটের জন্য অপসৃত হইতে আদেশ দিলেন। সহচরগণ সানন্দে উদ্যানের বহির্ভাগে চলিয়া গেলে একজন সহচরী তাহাদিগকে পরিদর্শন করিয়া মহারানীকে জানাইল। সখীগণ অতঃপর কপোতীপুঞ্জের ন্যায় মহারানীর সম্মুখে আগমন করিয়া ইচ্ছানুরূপ এক-একটি ফুল গ্রহণ করিল এবং স্বীয়-স্বীয় কবরীতে তাহা স্থাপন করিয়া উদ্যানস্থ কৃত্রিম পর্বতকের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল প্রত্যেক গুহায় ও লতাবিতানে এক-একটি কার্পেটের আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। উচ্চহাস্যে পর্বত, কানন ও কুঞ্জগৃহ নন্দিত করিয়া, এক-এক যুবতী এক-এক আসনে উপবিষ্ট হইয়া অদৃষ্টলভ্য প্রণয়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সহচরীগণ এইরূপে পর্বতগুহা ও কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলে, মহারাজ তিব' তাঁহার সহচরগণকে আহ্বান করিলেন। তাহারাও পূর্বোক্ত পুষ্প হইতে এক-একটি পুষ্প গ্রহণ করিয়া বক্ষের বামপার্শ্বে স্থাপন করিয়া স্বীয়-স্বীয় প্রণয়িনীর অনুসন্ধানে গমন করিতে আদিষ্ট হইল।

মহারাজ তিব' ও মহারানী থুপিয়ালা উদ্যানে উপবেশন করিয়া সহাস্যে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।

আর অন্যদিকে কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, লতাগৃহ, কদলী-কুটির ও পর্বতগুহা হইতে হাস্যের রোল উত্থিত হইতে লাগিল। যুবকগণ তাহাদিগের অদৃষ্টলভ্যাদিগকে চিনিয়া লইবার জন্য কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এক-দুই-তিন-চার কুঞ্জে বাঞ্ছিতাকে মিলিল না। পঞ্চম কুঞ্জে এক সুন্দরীকে দেখিয়া এক যুবক তাহার নিকট উপবেশন করিল; সম্বোধন করিল :

—প্রিয়তমে!

সুন্দরী হাসিয়া বলিল—

—আ মোলো; চক্ষুতে ছানি পড়িয়াছে নাকি? দেখিতে পাও না আমার কবরীতে কী ফুল? যুবক সুন্দরীর কবরীর দিকে চাহিয়া বলিল :

—প্রিয়ে, ফুল ভিন্ন হইলেও আমার হৃদয় অভিন্ন নহে; তুমিই আমার হৃদয়েশ্বরী!

সুন্দরী উচ্চহাস্য করিয়া যুবককে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল :

—তোমার দয়িতাকে তুমি বাছিয়া লও, বন্ধু! অযথা আমার সময় নষ্ট করিও না। আমি আমার প্রার্থিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

যুবক হতাশ হৃদয়ে কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য কুঞ্জে প্রবেশ করিল। সেখানেও বাঞ্ছিতাকে পাইল না। অন্বেষণ করিতে-করিতে পাইল তাহাকে দশম কুঞ্জে। দেখিল তাহার সুন্দর সলজ্জ হাসি, দেখিল তাহার দেববাঞ্ছিত মুখশ্রী, দেখিল তাহার রতিনিন্দিত সৌন্দর্য। আনন্দে আত্মহারা হইয়া যুবক জানু পাতিয়া যুবতীর নিকট উপবেশন করিল। বলিল :

—এই যে আমার হারানো-মানিক কুঞ্জ উজ্জ্বল

করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

যুবতী আয়তলোচনে যুবকের বক্ষঃস্থিত পুষ্পটিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করিল। যুবক সাগ্রহে বলিল :

—আমি জানিতাম না আমি কত ভাগ্যবান! লোকে তোমাকে কী নামে ডাকে, সুন্দরী!

মধুরকণ্ঠে স্নিগ্ধস্বরে যুবতী উত্তর দিল :

—মা ছেইন টিন্। ছেইন টিন্ আমার শুভাদৃষ্টের শুক্রতারা, কোটি কোটি জন্মের পুণ্যফলে আজ আমি তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

যুবকের ব্যায়ামদৃঢ় উন্নত বক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুবতীর গণ্ডদেশ রক্তিম হইয়া উঠিল। উত্তেজিত যুবক সুন্দরীর চম্পককোমল অঙ্গুলিগুলিকে সস্নেহে সম্প্রেষণ করিয়া প্রথম প্রেমের কতকগুলি আবেগময় উচ্ছ্বাসময় অসম্ভব তোষামোদপূর্ণ প্রলাপবাক্যে যুবতীকে অভিনন্দিত করিল। প্রণয়মধুর কোমলস্পর্শে ও অপরাহ্ণের রক্তিম আলোকে, যুবতীর অপূর্ব মুখশ্রী আরো অমৃতময় হইয়া উঠিল। যুবক আরো প্রবল উচ্ছ্বাসে যুবতীর নিকট প্রেমভিক্ষা করিতে লাগিল।

সুন্দরী এমন অকপট প্রেমাকাঙ্ক্ষীকে নিরাশ করিলেন না। মুহূর্তের মধ্যে অর্ধঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। প্রণয়িণীকে সঙ্গে করিয়া উদ্যানে ফিরিয়া আসিবার জন্য মহারাজের আহ্বান আসিল।

যুবক-যুবতীগণ তাহাদের নিভৃত মিলন ভঙ্গ করিয়া যুগ্মে-যুগ্মে পর্বতকন্দর হইতে বহির্গত হইল। যুবতীগণ লজ্জায় মস্তক নত করিয়া তাহাদিগের দৈবলব্ধ ভর্তার সহিত উদ্যানে পুনরাগমন করিলে মহারানী বলিলেন :

তোমরা এখন চা-পান করিয়া বিশ্রাম করো। তোমাদিগের বিবাহ সম্বন্ধে মহারাজ যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই প্রতিপালিত হইবে। প্রত্যেক কার্পেটের উপর প্রত্যেক প্রণয়িযুগল মহাহর্ষে উপবেশন করিল, ভৃত্যগণ চা পরিবেশন করিতে লাগিল। মহারাজ তিব' ও মহারানী থুপিয়ালা চা-পান করিতে-করিতে তাহাদিগের সহচর-সহচরীদিগের বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সহচরগণ মহা আগ্রহে স্বীয় প্রণয়িণী-গণের সহিত সরস বাক্যালাপ করিতে লাগিল।

চা পান শেষ হইলে, মহারাজ বলিলেন :

যে যুবতী তাহার অদৃষ্টলব্ধ পতিকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, সে এখন মহারানীর নিকট প্রত্যাবর্তন করুক।

মহারাজের এই আদেশ শুনিয়া এক চম্পকবরনী সুদীর্ঘলোচনা ষোড়শী উঠিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার প্রণয়ী সস্নেহে তাহার হাত ধারণ করিয়া নিম্ন-স্বরে বলিল :

তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে অদ্যই আমি আত্মহত্যা করিব। তুমি আমার অন্ধকার জীবনের ধ্রুবতারা, তুমি আমার স্বর্গের পারিজাত, তুমি আমার নিঃসঙ্গ জীবনের চিরসঙ্গিনী, আমি তোমাকে ছাড়িব না।

যুবকের প্রেমাচ্ছন্ন নয়ন ও মিনতিপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া ষোড়শীর হৃদয়ে করুণা-সঞ্চার হইল। সে নিঃশব্দে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া রহিল, আর উঠিতে চেষ্টা করিল না।

কেহই উঠিল না দেখিয়া মহারাজ পুনরায় উচ্চকণ্ঠে বলিলেন :

আমি আরো পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। যে স্বামী গ্রহণে অনিচ্ছুক সে উঠিয়া দাঁড়াও।

সলজ্জ হাস্য, মৃদু অনুনয় ও সম্মতিপূর্ণ কটাক্ষে যুবযুবতীদিগের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃত্তগুলি আন্দোলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কোনো যুবতীই কার্পেট হইতে উঠিয়া অসম্মতি বিজ্ঞাপন করিল না।

মহারাজ তখন পুনরায় উচ্চস্বরে কহিলেন :

যে যুবক তাহার লব্ধ প্রণয়িনীকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক, সে দণ্ডায়মান হোক।

আবার সহর্ষ কটাক্ষ ও সলজ্জ মুখশ্রেণীতে উদ্যান মনোরম হইয়া উঠিল। কোনো যুবকই প্রণয়িণীকে পরিত্যাগ করিয়া আসন হইতে উঠিল না।

মহারানী তখন হাসিতে-হাসিতে তাহার সহচরী-গণকে আহ্বান করিলেন। মহারাজ বলিলেন :

আমি তোমাদিগের রাজা মাত্র; তোমাদিগের পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তোমাদিগকে বিবাহিত করা আমার অসাধ্য। তোমরা এখন এই উদ্যানসম্মিলন ভঙ্গ করিয়া স্ব স্ব কার্যে গমন করো। তোমাদিগের পিতামাতার সম্মতিলাভ করিলে, বিবাহের প্রস্তাব পুনরায় বিবেচিত হইবে।

মহারানী তাঁহার সাথীগণকে লইয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। পথে তিনি সখীগণকে বলিলেন :

নির্লজ্জ মেয়েরা! আজ তোমাদের সতীপনার প্রমাণ পাইলাম। আজ হইতে তোমরা কেহই অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে পারিবে না। মহারাজের সহচরদিগের সহিত কথা বলিতে পারিবে না।

সখীগণ পরস্পরের মুখ অবলোকন করিয়া হাসিয়া লুটোপুটি হইতে লাগিল। মহারানী প্রতিবাদ করিলেন না। [ক্রমশ

রচনা : অনুমান ১৯৩৫ সাল

বড়দা
ও
আমার তরুণকালের স্মৃতি

সুধীর সেন

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রবীন্দ্র-অধ্যাপক এবং রবীন্দ্র-ভবনের প্রথম অধ্যক্ষ 'রবীন্দ্র-তত্ত্বাচার্য', রবীন্দ্রগবেষক, ঐতিহাসিক ও বাঙলা ছন্দঃশাস্ত্রের রূপকার মনীষী প্রবোধচন্দ্র সেন ৯০ বছর বয়সে পরলোক গমন করলে তাঁর জীবনী আলোচনার জন্য উদ্যোগী হয়ে তাঁর বিপ্লবী জীবনের অজ্ঞাত তথ্য সন্ধানে তাঁর সহোদর, আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন প্রবীণ অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপুঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মী ড. সুধীর সেনের কাছে তাঁর নিউ ইয়র্কের বাড়িতে যাই। তিনি তাঁর 'বড়দা'র বিষয়ে যেসব কাহিনী শোনালেন তা যেমন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তেমনি চমকপ্রদ। প্রবোধচন্দ্রের অনুরাগীদের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁর ৮২ বছর বয়সেও সে কাহিনী নিজেই গুছিয়ে সুন্দরভাবে লিখেছেন। এখানে ড. সেনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

ড. সুধীর সেনের জন্ম হয়েছিল অবিভক্ত বাঙলার কুমিল্লা শহরে, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি। কুমিল্লার বিখ্যাত ঈশ্বর পাঠশালা আর কলকাতার প্রেসিডেনসি কলেজের নাম-করা ছাত্র হিসাবে তিনি বি. এ. পরীক্ষায় অর্থনীতি এবং বাঙলায় প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণপদক পান। পরে লনডন স্কুল অব ইকনমিকস হতে স্নাতক হয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রে জার্মানির 'বন্' বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তখন জারমান ভাষায় দুখানি অর্থনীতির বই ও বহু প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। ইউরোপের আরও কয়েকটি ভাষা, বিশেষত ইতালিয়ান ভাষা রপ্ত করে তিনি রোম ও ইউরোপের নানা চিত্রশালা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে পড়াশুনা করেন, ও সেইসব চিত্রশালার শিল্পকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

তাঁর বেশির ভাগ লেখাই ইংরাজি ভাষায় হলেও বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে কাজ করবার সময় তিনি "দেশ" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। গত ২২শে ফেবরুয়ারি ১৯৮৬ তারিখের "দেশ"-এ চৈনিক চিত্রশিল্পী সু বেইহং সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ ইংরাজি প্রবন্ধের আমার করা বাঙলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

ইউরোপে দীর্ঘ দশ বৎসর বাসের শেষ পর্যায়ে যখন তিনি ইতালিতে উচ্চপদে কর্মরত ছিলেন, তখন মি. লেনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্টের আহ্বানে ভারতে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠনের কাজে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। সে সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিকট-সান্নিধ্যে আসেন। পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁকে ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির কাজে সহায়তা করতে ডাকেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রাশিয়ায় ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলে ড. সেন তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়ে মস্কো যান।

দামোদরে প্রবল বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন আমেরিকার টেনেসি ভ্যালি অথরিটির ধাঁচে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা হয় তখন ড. সেনকে সেই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয় এবং বাঙলা, বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যাবতীয় মতভেদ দূর করবার ভার পড়ে তাঁর উপর। তিন পক্ষের পূর্ণ সমর্থন লাভের এক বৎসর পরে দামোদর ভ্যালি করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. সেন ইতিমধ্যে আমেরিকায় টেনেসি ভ্যালিতে সরেজমিনে কার্যপদ্ধতি দেখে আসেন এবং তিনিই ডি. ভি. সি-র প্রথম সেক্রেটারি ও চীফ একজিকিউটিভ রূপে নিযুক্ত হন। সংগঠনের কাজ অনেকখানি অগ্রসর হলে ও বিশ্বব্যাঙ্ক হতে দুইটি ঋণের সহায়তা পেয়ে করপোরেশন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠলে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে বম্বে যান এবং গ্রেট ঈস্টার্ন শিপিং কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে ভারতের জাহাজ

পরিবহণ শিল্প সুপ্রসারিত করতে সাহায্য করেন। ছয় বৎসরের অধিককাল (১৯৪৮-৫৪) ডি. ভি. সি-তে তাঁর কর্মকুশলতার পরিচয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১৯৫৬ সনে তিনি নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তরে যোগ দেন এবং ১৯৬৬ সন পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশে 'ইউ-এন-ও'র নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে বিশেষ সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। এখন অবসর জীবনে তিনি নিউ ইয়র্কের স্থায়ী বাসিন্দা।

তবে দীর্ঘদিন বিদেশে বাস করলেও এবং ইংরাজিতেই প্রায়শ লিখতে অভ্যস্ত হলেও রবীন্দ্রকাব্য এখন তাঁর কণ্ঠস্থ আছে। ছাত্রজীবনে তিনি পাণিনির ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্যাদি ভালো করেই পড়েছিলেন, এমনকী টোলের পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সে স্মৃতি এখনও ভোলেন নি। তা ছাড়া তাঁর 'বড়দা' ছন্দঃশাস্ত্রী প্রবোধচন্দ্রের বাঙলা ছন্দ বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় তিনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী। সে সময়ে তিনি ছন্দচর্চাও করেছিলেন এবং বহু সুন্দর কবিতাও লিখেছিলেন—তার পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি। রবিবাসরের সভায় আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের স্মরণ-অনুষ্ঠানের জন্য তিনি চমৎকার মন্দাক্রান্তা ছন্দে 'অশ্রুদূত' নামে একটি কবিতা লিখে আমাকে পাঠিয়েছিলেন, তার কিছুটা তুলে দিচ্ছি, যাতে বোঝা যাবে এখনও তিনি সহজেই কেমন সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারেন। তিনি লিখেছিলেন—

একদিন দৈবাৎ তুলেছি গুটিকয় মাত্রা-অক্ষর-স্বরের তাল,
তিন বৃত্তের তান রচিল মনোহর ছন্দ-বিজ্ঞান মায়ার জাল।
চার পাঁচ বৎসর জীবনে হল মোর বাঙলা ছন্দের মহোৎসব,
বন্ধুর পন্থায় পাথেয় হল সেই পুণ্য সম্পদ সুদুর্লভ।

* * *

ঝঞ্ঝার বাত্যায় আসিল উড়ে আজ ছন্দকৌতুক, প্রাচীন সখ,
মন্দাক্রান্তায় রচিনু বসে তাই 'অশ্রুদূত' মোর নিরর্থক।

তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—(১) United Nations in Economic Devolopment —Need for a New Strategy। (২) A Richer Harvest : New Horizon for Developing Countries। (৩) Reaping thc Green Revolution—Food and Job for All। (৪) Turning the Tide (আচার্য প্রবোধচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত)। (৫) Tagore On Rural Reconstruction, বিশ্বভারতী হতে ১৯৪৩ সনে প্রথম প্রকাশিত। অনেক নূতন তথ্য ও গবেষণাসহ বর্ধিতাকারে নতুন সংস্করণ এবার রবীন্দ্রজন্মোৎসবে বিশ্বভারতী হতে প্রকাশিত হবে। (৬) Land and Its Problems। (৭) Conflict of Economic Ideologies—An Attempt at Recon-ciliation। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ও বিশ্বভারতী হতে ১৯৪১-৪২ সনে প্রকাশিত হয়েছিল। (৮) Ending World Hunger। (৯) Obligations of Affluence। (১০) Wanderings।

শেষোক্ত গ্রন্থত্রয় প্রকাশের অপেক্ষায়, তার মধ্যে Wanderings বের করছেন ম্যাকমিলান কোম্পানি। তাতে তাঁর দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের কার্যকালের ইতিবৃত্ত আছে। তাঁর একখানি বাঙলা কাব্যগ্রন্থও প্রকাশের আয়োজন চলছে। —সন্তোষকুমার দে

১ : শহর থেকে গ্রামে

বড়দা ছিলেন আমার চেয়ে ন বছরের বড়ো। প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ যখন শুরু হল ১৯১৪ সনের অগস্ট মাসে, তখন তাঁর বয়স ছিল সতেরো, আমার ছিল মাত্র আট। যুদ্ধ শুরু হবার অল্প পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমানে। সেখানে গৃহবন্দী হয়ে ছিলেন তিন বছরের উপর। বয়সের এই ব্যবধানের জন্য তাঁর বাল্য, ছাত্র ও বিপ্লব-জীবন সম্বন্ধে আমার নিজস্ব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নিতান্তই সামান্য এবং তাও অনেকটা ঝাপসা।

গ্রা ম বা স - ব ন বা স

বয়সের পার্থক্য ছাড়াও বড়দার জীবনের এ অধ্যায় সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় একান্ত সংকীর্ণ আরো একটি বিশেষ কারণে। আমার বয়স যখন সাতের কোঠায়, তখন মা-বাবা আমাকে পাঠিয়ে দেন কুমিল্লা থেকে অনেকটা দূরে, গুরুহিত গ্রামে। সেখানে মাসির বাড়িতে থেকে কসবা স্কুলে পড়তাম। মেসো ছিলেন সে স্কুলে অঙ্কের মাস্টার; তাঁরি তত্ত্বাবধানে থেকে আমার পড়াশোনা হত। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী —সব জড়িয়ে তিন বছর ওখানে ছিলাম।

কুমিল্লা থেকে কসবা কুড়ি মাইল দূরে, কমলা-সাগর রেল-স্টেশনের কাছে। আর ওখানকার স্কুল থেকে গুরুহিত ছিল আধ মাইল দূরে; কাঁচা সড়ক ধরে মাঠের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হত। মাইলের দিক দিয়ে এ দূরত্ব সামান্য, কিন্তু আবহাওয়া আর জীবনযাত্রার দিক দিয়ে কুমিল্লার সঙ্গে তুলনায় মনে হত এ তফাত যেন আকাশ-পাতাল। সে গ্রামবাস আমার কাছে মনে হত বনবাস। কিছু দিন থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। কেমন করে আবার কুমিল্লায় ফিরে যাব—সে-ই ছিল তখন আমার সবথেকে বড়ো কামনা। ফলে শুরু হল আমার জীবনের প্রথম বিদ্রোহ। অনেক লড়াই করে তিন বছর পরে ফিরে আসি কুমিল্লায় এবং ভরতি হই ওখানকার ঈশ্বর পাঠশালার সপ্তম শ্রেণীতে।

ফিরে এসে দেখি বড়দা ওখানে নেই। বাড়ির সবাই এ সম্বন্ধে একেবারে চুপ। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে আমি ছিলাম চতুর্থ। হয়তো ছোটো বলে বা মনে আঘাত পাব বলে আমাকে কেউ কিছু বলতে চায় নি। তবু ছোটো হলেও মনে-মনে অসোয়াস্তি বোধ করতাম। বাড়িতে সব সময়েই ছিল একটা গুমট ভাব, আর সব-কিছুই যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল একটা ম্লান বিষাদের ছায়া।

আসলে কী ঘটেছিল তা জানতে বা শুনতে লাগল বেশ কয়েক বছর, অনেকটা পশ্চাদ্‌দৃষ্টি বা অন্তর্‌দৃষ্টি দিয়ে। তবে ওখানকার কাহিনী এখনো আমাদের কাছে অনেকাংশে অজ্ঞাত রয়েছে। তার কারণও খুব সহজ। এজাতীয় বিপ্লবজীবনের ধর্মই হল সব-কিছুই গোপন রাখা, এমন-কী একান্ত আপন জনের কাছ থেকেও। কাজেই বড়দা যতদিন সক্রিয়ভাবে তাতে নিমগ্ন ছিলেন, ততদিন কাউকে কিছু বলেন নি বা জানতে দেন নি। আর যেদিন বন্দী-জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে আবার ঘরে ফিরে এলেন, সেদিন থেকেই পুরোদমে শুরু করলেন নূতন অধ্যায়। নিজের অতীতের উপরে সবলে টেনে দিলেন এক স্থূল যবনিকা। তাঁর বিপ্লবজীবনের কথা বা বন্দীজীবনের কাহিনী ঘুণাক্ষরেও কাউকে কোনোদিন কিছু বলেন নি। বড়দার সঙ্গে বহুকাল বহু বিষয়ে বহু কথা হয়েছে, কিন্তু তাঁর বিপ্লবজীবনের কথা ভুলেও কোনোদিন তোলেন নি। সে সম্বন্ধে কিছু বলার অনিচ্ছা এতই সুস্পষ্ট ছিল যে, সাহস করে সে সম্বন্ধে তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করার কথা ভাবতেও পারি নি।

তবু নানা ঘটনা থেকে তখনকার দিনে বড়দার মনোভাব, চালচলন আর ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তাঁর অগোচরেই একটা ছবি অনেক দিন আগেই মনে-মনে এঁকে রেখেছিলাম :

যৌবনে তুমি ছিলে আগ্নেয়গিরি,

মানিতে না কোনো বন্ধন-শৃঙ্খল,
চৌদিকে যেন স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরি,
ছুটিতে নিয়ত দুরন্ত চঞ্চল।
মনে হত চারিপাশে
কাঁপিছে সবাই ত্রাসে।

আগুন আমার ভাই

বিপ্লব, বিদ্রোহ, বিদ্বেষ—সবকিছু ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে, তাঁর দেশপ্রীতির জ্বলন্ত প্রমাণরূপে। সেই আগুন নিয়ে খেলার যুগে বড়দার বিশেষ পছন্দের গান ছিল—'আগুন আমার ভাই'। তাই আসল ভাইদের অনেক সময় সে আগুনের তাপ বিশেষ করে সইতে হয়েছে। বড়দার হাতে কী পরিমাণ মার খেয়েছি সে সময়ে, এখন তা মনে হলে হাসি পায়। ছিপ নিয়ে সেজদা কি ছোটো ভাই কানুর (আমার চেয়ে মাত্র আঠারো মাসের ছোটো) সঙ্গে কোনো গাছপালায় ঢাকা ছোটো পুকুরে মাছ ধরতে যেতাম। কোথা হতে বড়দা ছুটে এসে আমাদের মেরে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে আবার উধাও হতেন। কোনো কারণে কানু আমার সঙ্গে ঝগড়া করলে বড়দা এসে দুজনকেই মেরে সমান-ভাবে শাসিয়ে চলে যেতেন। কারণ কী, কার দোষ কতখানি তা জানবার বা জিজ্ঞেস করবার তাঁর ফুরসত ছিল না।

কসবা-গুরুহিতে যে তিন বছর ছিলাম তখন বছরে মাত্র বার তিনেক কুমিল্লা আসতে পারতাম, ছুটির দিনে। একবার গরমের ছুটিতে কুমিল্লা এলাম, সম্ভবত ১৯১৩ সনে। দুপুরবেলা খাবার পর বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম, তারপর বার হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখি সামনে বড়দা, কোনো কথাবার্তা নেই, ধরে আমাকে ঝেড়ে মারলেন। আমি তো অবাক। কী অপরাধ একেবারে বুঝতে পারি নি। তখন বড়দা একখানি কাগজ বার করে দেখালেন—একটি লিস্ট, তাতে গোটা ছয় ডিটেকটিভ উপন্যাসের নাম। বললেন—'ওখানে স্কুলে গিয়ে বুঝি এই হচ্ছে? আর কোনো কাজ নেই, বাজে বই পড়ছ?'—তখনো দোষ ঠিক ধরতে পারি নি। ডিটেকটিভ উপন্যাস কাকে বলে, পড়লে কী ক্ষতি, কেন—সেসব জানবার বা বুঝবার ক্ষমতা তখনো হয় নি।

আসল ব্যাপারটা হয়েছিল এই: কসবা স্কুলে ছিল একটি ছোটো লাইব্রেরি, আর সেখানে ছিল দুটো তাকভরা বই, সব-শুদ্ধ শ-খানেক হবে। বই পড়ার আগ্রহবশতই হোক বা নির্বাসনের দুঃখ দূরী-করণের জন্যই হোক, আমি মনে-মনে ঠিক করলাম, একদিক থেকে শুরু করে একে-একে সবগুলো বই পড়ে ফেলব, অবশ্য আমার স্কুলের লেখাপড়ায় অবহেলা না করে। কয়েকটি বই পড়বার পরই হাতে এল—"জাপানের গুপ্তচর"। তন্ময় হয়ে পড়লাম, এত ভালো লাগল যে মনে হল, আরো কিছু এজাতীয় বই পড়ব, তাই সেই বইয়ের পেছনের পৃষ্ঠায় যে কটি বইয়ের নাম ছিল, সেগুলো যত্ন করে টুকে নিয়ে আমার ছোটো হাতকাটা জামার এক পকেটে রেখেছিলাম এবং সেই জামা গায়েই গাড়ি ধরে কুমিল্লা গিয়ে-ছিলাম। সেই লিস্ট দৈবাৎ বড়দার হাতে পড়ে, আর তারি ফলে দেখতে হল তাঁর সেই অগ্নিমূর্তি।

এদিকে আমার ডিটেকটিভ উপন্যাসের পরই হাত পড়ল বঙ্কিমচন্দ্রে, ফলে সবার আগে আমার কপালে এল "কপালকুণ্ডলা"। প্ল্যান-মতো তাই পড়ে গেলাম। আমার অধ্যয়নের ব্যবস্থা আধুনিক ছিল বললে অতিশয়োক্তি হবে। ঘরে ছিল গোটা চারেক খাট। এক ধারে মেজের উপর চট পেতে কেরোসিনের ডিবি সামনে নিয়ে পড়তাম, মাঝে-মাঝে এক হাতে মশা তাড়াতে হত। রাত্তিরে চারদিক থাকত নিঝুম, মাঝে-মাঝে শেয়ালের ডাকছাড়া। তাই মনোনিবেশে কোনো ব্যাঘাত হত না।

বড়দা আমার বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যয়নের কথা শুনলে কী বলতেন জানি নে, হয়তো খুশি হতেন না। তবে অন্তত এটুকু বুঝতেন যে আমার স্বভাব খেলো ছিল না বা পড়াশোনায় নিষ্ঠারও অভাব ছিল না।

ক্লাসে সব সময়েই প্রথম হতাম, সে খবর পেয়ে বড়দা বিন্দুমাত্র আনন্দ প্রকাশ করেন নি। বরঞ্চ মন্তব্য করলেন—'নিরস্ত পাদপদেশে এড়ণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে'। আর তা ছাড়া চলতি কথায়—'খালি বনে খাটাস বাঘ।' এখনো মনে আছে, এই দুই প্রবাদবাক্য শুনে আমার কী পরিমাণ অভিমান হয়েছিল। ভাবলাম, সবাই মিলে আমাকে পাঠিয়ে দিলে গ্রামে, সেখানে লেখাপড়ায় যতটুকু সম্ভব ভালো করে যাচ্ছিলাম, তারপর আমাকে দোষ দিলে গ্রামের স্কুলে পড়ি বলে।

আমার ক্ষুণ্ণ হবার কারণ ছিল যথেষ্ট, তবু পেছনের দিকে তাকিয়ে অনেক বছর পরে বুঝতে পেরেছিলাম, কেন আমাকে এমন অকরুণ কথা শুনিয়েছিলেন। আমার সম্বন্ধে হয়তো মনে-মনে বড়দার একটা বিশেষ দাবি ছিল। যদিও মুখ ফুটে কোনোদিন সে কথা আমাকে বলেন নি। সেই অগ্নিযুগে সবার কাছে দাবি করাই ছিল তাঁর স্বভাব—মানুষকে উৎসাহ দেওয়া ও তার কাছ থেকে দাবি করা, এ দুইয়ের মধ্যে তাঁর কাছে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁর অধ্যাপক-জীবনে সেই স্বভাব অবশ্য ষোলো আনা বদলে যায়। সবাইকে সব কাজে উৎসাহ দেওয়াই ছিল তখন তাঁর সবথেকে বড়ো আনন্দ।

তা ছাড়া সে সময়ে বড়দা ছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুলের ছাত্র আর সে স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন অভয় দাস। সারা বাঙলাদেশে তখন তাঁর নাম ছিল শিক্ষক, শাসক আর স্কুল-পরিচালক হিসেবে। ছাত্রদের দুরন্ত রাখার ও শিক্ষাব্রতে তাদের একনিষ্ঠ করে তোলার প্রধানতম উপায় তাঁর কাছে ছিল বেত্রাঘাত, নির্মম ভাবে, নিজের হাতে। ফলে অভয় দাস যে-স্কুলেই হেডমাস্টার হিসেবে যেতেন, সেখানেই ছাত্র ও শিক্ষক সবাই থাকত তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত। আর ছাত্ররা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উচ্চস্থান দখল করে লাভ করত একরাশি স্কলারশিপ। বড়দার আমলেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয় নি। তাঁর ক্লাসে উপরের দিকে ছিলেন দশ-বারোজন প্রতিভাবান ছাত্র। ম্যাট্রিকুলেশনের ফল যখন বেরুল তখন তাঁরা স্কলারশিপ দখল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন[১]। তার বছর খানেক পরেই তাঁরা নতুন করে সবাইকে তাক লাগিয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কারণে। এই বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ যুববৃন্দই ছিল সে অঞ্চলে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রদূত। তাই অচিরে সবাই উধাও হলেন বন্দী হিসেবে রাজ-কারাগারে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে।

বড়দার কাছে তাঁর জিলা স্কুলের তুলনায় কসবার স্কুল নগণ্য মনে হবে, সেটা আর বিচিত্র কী?

জুতোর বাক্সে পিস্তল

কিছু দিন পরে আবার ছুটি উপলক্ষে কুমিল্লায় আসি। যে-খাট আমি ব্যবহার করতাম, তার নীচে একদিন দেখি একটি জুতোর বাক্স সুতো দিয়ে বাঁধা। ভাবলাম, কী রকমের সুতো একবার খুলে দেখি। সুতো না-কেটেই বাক্সটা খুললাম—কই কোনো জুতো তো নেই, তার বদলে দেখি কাগজে মোড়া একটা অদ্ভুত জিনিস—লোহার তৈরি, কালো রঙ, বেশ ভারী। এক ফুট লম্বা হবে, তার এক দিক খানিকটা মোটা, আরেক দিক সরু। কিছুই বুঝতে পারলাম না। যাঁরা বাড়িতে ছিলেন তাঁদের ডেকে এনে জিনিসটা দেখলাম, এবং এটাকে কী বলে, এটা দিয়ে কী করা হয় জানতে চাইলাম। কেউ কিছু বললেন না, অথবা হয়তো বলেছিলেন—'এসব তোমার না জানলেও চলত।' ভাবলে অবাক হই, আমি তখন কত হাবা ছিলাম। পিস্তল কাকে বলে, আট-নয় বছর বয়সেও তা জানতাম না। এ যুগে সেটা অকল্পনীয়। হাঁটা-চলা-দৌড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গেই এখন বন্দুক-পিস্তলের সঙ্গে শিশুদের পরিচয় হয়ে যায়।

সেদিন বাড়িতে গুমট ভাব আরও বেড়ে গেল।

১. প্রবোধচন্দ্র যে-বার বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন সেবার তাঁর ক্লাস হতে মোট এগারো জন বৃত্তি পেয়েছিলেন। —স.

সবাই চুপ। তারপর কী ঘটেছিল আমি স্বচক্ষে দেখি নি, শুধু সেজদা-মেজদার কাছে শুনেছি। বাবা সেই লৌহ-যন্ত্রটি নিজে লুকিয়ে নিয়ে যান মাইল খানেক দূরে, কুমিল্লা স্টেশনের কাছে, চুপি-চুপি, সন্ধেবেলা। সেখানে রেললাইনের পশ্চিমে অনেকটা পানায় ঢাকা একটি পুকুরে সেটি বিসর্জন দিয়ে আসেন। তারপর বড়দা যখন বাড়ি ফিরে এলেন—সেদিনই কিনা মনে নেই—তখন জুতোর বাক্স খালি দেখে রুদ্রমূর্তি ধারণ করলেন। সব শুনে তিনি বাবাকে নিয়ে যান রেল-স্টেশনের পাশে সেই পানায় ঢাকা পুকুরের পাড়ে। সেখানে ডুবুরি দিয়ে সে যন্ত্রটি উদ্ধার করে আনা হয়। বড়দা তখন শান্ত হলেন। কিন্তু বাড়ির গুমট ভাব কাটল না। বাড়িতে সবাই যেন কিছুদিন ধরে বৃহত্তর দুঃসংবাদ বা দুর্ঘটনার জন্য মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

বোধহয় তার কয়েক মাস পরেই আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে খানাতালাস হয়। সে উপলক্ষে কলকাতা থেকে আসেন স্বয়ং মিস্টার কোলসন, (Coleson) তখন উনি ছিলেন ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ, কমিশনার চার্লস টেগার্টের দক্ষিণ হস্ত। তাই থেকে বোঝা যায়, সে সময়ে বড়দার উপর গোয়েন্দা-বিভাগের কী পরিমাণ নজর ছিল। শুনেছি, বেশ কিছু কাল ধরেই বড়দা চট্টগ্রাম বিভাগে অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন। তাঁকে ঠিক কোন্ তারিখে কোথায় গ্রেপ্তার করা হয় আমার সঠিক জানা নেই, তবে তখন তিনি কুমিল্লার বাইরে ছিলেন, সম্ভবত কলকাতায়।[২]

কেন গ্রামবাস

যে যুগে তরুণদের সাধনা ছিল গ্রাম থেকে শহরে যাবার, শিক্ষাদীক্ষার সুযোগসুবিধার জন্য, সেই যুগেই আমাকে যেতে হল উলটো দিকে—কুমিল্লার মতো প্রগতিশীল শহর ছেড়ে দূরে এক নগণ্য গ্রামে। এ ভাগ্যবিপর্যয় কেন? সে প্রশ্ন বহুবার আমার মনে জেগেছে। নানা রকমের কারণ শুনেছি, যথা: ছোটো ভাই আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, দুজনে ছাড়াছাড়ি হলে গৃহশান্তির পক্ষে ভালো হবে। মাসির পাঁচ মেয়ে, ছেলে নেই; তাই একটি ধার-করা ছেলেও বাড়িতে থাকলে সবাই খুশি হবে!

গিরিধারী পাঠশালার তৃতীয় শ্রেণী থেকে পাশ করে বার হলাম। বড়দাও ছোটোবেলায় ওই পাঠশালাতেই পড়েছিলেন। কুমিল্লায় কোনো হাই স্কুলে ভরতি হলে আমাকে স্কুলের মাইনে দিতে হবে—মাসে আড়াই টাকার মতো। কসবা স্কুলে ভরতি হলে সে খরচটা বেঁচে যাবে, মেসো ওখানকার স্কুলে মাস্টার বলে।

আপাতদৃষ্টিতে কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এগুলো বরাবরই মনে হত কষ্টকল্পিত, অর্থাৎ যুক্তি নয়, অজুহাত বলে। আমাদের কুমিল্লার বাড়িতে অনেক সময়েই গ্রামের আত্মীয়, বিশেষ করে জ্যেঠতুতো ভাইরা, থেকে স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করেছে, তাদের বেলা স্কুলের মাইনে দিতে বাবা তো কোনো কার্পণ্য করেন নি।

আসল কারণ কী তা সঠিক জানবার কোনো উপায় ছিল না, কোনোদিন চেষ্টাও করি নি। তবে অনেকটা অনুমান করতে পারি, প্রমাণ ছাড়া। বড়দার বিপ্লবজীবনের সূত্রপাত হয় আনুমানিক ১৯১১ কি ১৯১২ সনে। বাড়ির লোকের কাছে এ জাতীয় ব্যাপার খুব বেশিদিন ষোলো আনা গোপন রাখা সম্ভব হয় নি। বড়োরা বোধহয় কিছুদিনের মধ্যে তার আঁচ করেছিলেন, ফলে পরিবারে জেগেছিল একটা আশঙ্কা আর আতঙ্ক। মনে-মনে হয়তো একটা ভয়ও ছিল। বিশেষ করে মা-বাবার মনে, যে একদিন আমিও বড়দার অনুকরণ বা অনুসরণ করতে পারি।

তবু আর তিন ভাইকে ছেড়ে গ্রামবাসের জন্য আমাকে বাছাই করা হল কেন? মেজদা সেজদা আমার থেকে অনেকটা বড়ো ছিলেন, আর ছোটোভাই তো ছোটো এবং সবথেকে আবদারে। তাই আমাকেই

২। প্রবোধচন্দ্র গ্রেপ্তার হন ১২ সেপটেম্বর, ১৯১৬ তারিখে। —স.

যোগ্যতম মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। সঙ্গে হয়তো ছিল আরো একটি কারণ। আমি ছিলাম অনেকটা বড়দার ছাঁচে ঢালা। তাই 'বিপথে' যাবার আশঙ্কাটাও আমার বেলায় হয়তো ছিল অনেক বেশি।

মাতুলক্রম :

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার বড়োমামা উপেন্দ্রচন্দ্র নিয়োগীর কথা। মাঝে-মাঝে মনে হয় এ ব্যাপারে হয়তো তাঁরও হাত ছিল। তিনি ছিলেন অনেক দিকে আমাদের অভিভাবকের মতো। কোনো সমস্যা দেখা দিলে মা-বাবা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন, তাঁর পরামর্শমতো চলতেন। সব ভেবে তিনিই হয়তো সে সময়ে মা-বাবাকে বলেছিলেন যে আমাকে কিছুদিন দূরে সরিয়ে রাখলেই ভালো হয়।

লোকে বলে—'নরাণাং মাতুলক্রমঃ'। অনেক সময় মনে হয়, একথার মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে। বড়োমামা আর বড়দার মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য ছোটোবেলা থেকেই লক্ষ করে এসেছি। দুজনেরই প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী, দুজনেই ছিলেন বিদ্যার জাহাজ। তাঁরা ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন না, তবে ঘরে বসেই তন্নতন্ন করে খবরের কাগজ পড়ে সারা দুনিয়ার খোঁজ-খবর রাখতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে দুজনেরই ছিল অসাধারণ রাগ। বড়োমামাকে ভয় করত মা-বাবা থেকে আরম্ভ করে সবাই। কেউ তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু বলার বা করার সাহস করত না। ছোটো হলেও আমি ছিলাম তাঁর বিশেষ স্নেহের পাত্র, আর সেজন্যই তাঁর মতের সঙ্গে সায় না দিলেও তিনি কিছু মনে করতেন না, বরঞ্চ সেজন্য খুশিই হতেন।

বড়োমামার বিশেষ খ্যাতি ছিল অঙ্কবিশারদ হিসেবে। অঙ্কের প্রতি বড়দারও আকর্ষণ ছিল প্রচুর, সঙ্গে-সঙ্গে ছিল একটা জন্মগত প্রতিভা। বিপ্লবজীবন এসে তাঁর ছাত্রজীবনকে অভিভূত না করলে অঙ্কশাস্ত্রই হয়তো তাঁর সাধনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াত। সে সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল বলে মনে করি।

বড়োমামা কৃতিত্বের সঙ্গে সব পরীক্ষা পাশ করে এম-এ-র জন্য ঢুকলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর সেই সময়েই হল তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়। পরীক্ষা পাশ করবার কোনো ভাবনা তাঁর ছিল না। বিশেষ চেষ্টা না করেই ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হবেন, সে সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে শুনেছি সেজন্য মাঝে-মাঝে ক্লাস কামাই করে অন্যদিকে মন দিতেন। একবার ক্লাসে নাকি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর কোনো ছাত্রবন্ধু 'প্রকসি' দিয়েছিলেন, ফলে তাঁকে বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে বিতাড়িত করা হয়। শেষ ছাত্রজীবনের এই সামান্য ত্রুটির জন্য তাঁকে অসামান্য শাস্তি ভোগ করতে হল, তিনি কোনোদিন কোনো সরকারি কলেজ বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার সুযোগ পেলেন না। বহুকাল তিনি ছিলেন কুমিল্লায় একটি ছোটো টেকনি-ক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান পরিচালক। সেখান থেকে তিনি যান কুমিল্লায় ঈশ্বর পাঠশালায় ডেপুটি হেডমাস্টার হয়ে। স্কুলের নবম আর দশম শ্রেণীতে অঙ্ক পড়ানোই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তবে প্রয়োজনমতো তিনি অন্য বিষয়ও পড়াতেন। বড়ো-মামার মতো বড়দাকেও তাঁর কর্মজীবন কাটাতে হয়েছে সরকারি জগতের বাইরে, যদিও অন্য কারণে।

দাবাখেলায় মামা ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। শুনেছি এবং কিছু-কিছু দেখেওছি যে ছুটির দিনে অনেক দূর থেকে লোক আসত তাঁর সঙ্গে দাবাখেলার জন্য। কোনো-কোনো সময় খেলা চলত অষ্ট প্রহর। বড়দার এজাতীয় কোনো নেশা ছিল না এবং তা পছন্দও করতেন না। তবে ছাত্রজীবনে গুলিখেলা খুব ভালোবাসতেন আর সে খেলায় তাঁর দক্ষতাও ছিল অসাধারণ। মনে পড়ে, মেজদা-সেজদার সঙ্গে ছোটো বেলায় তাস খেলেছি ভয়ে-ভয়ে, একান্ত গোপনে, বড়দার চোখের আড়ালে।

এ ক্ষেত্রে প্রসঙ্গত বলা উচিত, বড়োমামা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যানসেলার স্বর্গত সত্যেন সেনের শ্বশুরমশাই।

বি স্মৃ ত স্মৃ তি

উপরে বড়দার যে-ছবি ফুটে উঠেছে সেটা একতরফা। শিশুবেলায় তাঁর কাছ থেকে অনেক স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। অন্যের কাছে তা শুনেছি, বিশেষ করে মার কাছে। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, অতি শিশুবেলা, অর্থাৎ বছর পাঁচেক আগেকার স্মৃতি নাকি মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই শূন্যতার মাঝখানে জেগে থাকে শুধু দু-একটা বিশেষ ঘটনা—সারা জীবনের স্মৃতিস্তম্ভরূপে। মনে হয় কথাটার মধ্যে সত্যতা আছে। অন্তত আমার বেলা যে তাই হয়েছে, তা নিজের মনে খানাতলাসি করেই সহজেই বুঝতে পারি।

শিশুবেলার একটি ঘটনা আজো ভুলতে পারি নি। তখন সবেমাত্র স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি, হাতে খড়ির অল্প পরেই। স্কুল মানে প্রাথমিক পাঠশালা, প্রাইভেট, একজনমাত্র মাস্টার, জনা আটেক ছাত্র—তাদের সবার বয়স আমারি মতো। গরমের দিনে সকাল সাড়ে ছয়টায় ক্লাস শুরু হত। একদিন ঘুম থেকে উঠে আমার অদম্য কান্না এসে গেল। বড়দা ছুটে এলেন, কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। 'অনেক বেলা হয়ে গেছে, আমার ক্লাস কামাই হয়ে গেল।' শুনে বড়দা হেসে বললেন, 'কিছু হবে না, আমি তোমাকে নিজে স্কুলে নিয়ে যাব।' তক্ষুনি বই শ্লেট নিয়ে বড়দার হাত ধরে তালপুকুরের পশ্চিম-দক্ষিণ পাড় দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে স্কুলে গিয়ে হাজির হলাম। সব শুদ্ধ মিনিট ছয়েকের পথ। গিয়ে দেখি খালি বেঞ্চি, খালি চেয়ার, কেউ নেই। অবাক হয়ে গেলাম। তখন বড়দা আমাকে বোঝালেন—'এই ছাখ ওখানে একটা আলো জ্বলছে। এখন সকাল নয়, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তুমি তো দিনের ঘুম থেকে উঠেছ, রাতের ঘুম থেকে নয়। তোমার স্কুল কামাই হয় নি।' তখন নিশ্চিন্ত হলাম আর বড়দার হাত ধরে নেচে-নেচে বাড়ি ফিরে এলাম।

তরুণ শৈশবে বড়দার কাছে অনেক স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছিলাম। স্মৃতির ভাণ্ডারে তার নিদর্শন সামান্য। কিন্তু অন্তরের অনুভূতিতে তা রয়েছে অপরিমেয়। তারপর তাঁর জীবনে হঠাৎ এল সেই অগ্নিযুগ, দেশোদ্ধারের দুর্জয় আহ্বান নিয়ে। তার সঙ্গে এল নির্মম আত্মবলিদানের পালা। তখন আর সবকিছুই তাঁর কাছে হল অবান্তর—স্নেহমমতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবই। সেই বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত হল সুদীর্ঘ কারাবাসে। তারপর আবার ধীরে-ধীরে ফিরে পেলাম আসল বড়দাকে।

মৌ ন আ লা প

অনেক লড়াই করে আমি ফিরে এলাম কুমিল্লায় এবং ভরতি হলাম ওখানকার ঈশ্বর পাঠশালার সপ্তম শ্রেণীতে। প্রায় একই সময়ে বড়দাও ফিরে আসেন কুমিল্লায়, তবে বাড়িতে নয়, জেলখানায়। তখনকার দিনগুলির ছবি এখনও আমার মনে ভাসে, মনে হয় যেন মাত্র সেদিনের কথা। বড়দার সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি ছিল মাসে একবারের মতো। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ হলেও সব ব্যবস্থা করবার ভার পড়ত আমার উপর। অনুমতির জন্যে আমাকে যেতে হত পুলিশের আড্ডায় অর্থাৎ সি-আই-ডি বিভাগে। সেখানে দেখা হত বিশেষ করে দুজন অফিসারের সঙ্গে। কোট-প্যানট পরা, কোমরে পিস্তল ঝোলানো। ততদিনে পিস্তলের চেহারা আর তাৎপর্য সম্বন্ধে এমন-কী আমারো একটা ধারণা হয়েছিল। তবু তাঁদের আমি ভয় করি নি, বরঞ্চ সহজভাবে হাসিমুখে ওঁদের সঙ্গে কথা বলেছি। বোধহয় সেজন্যই ওঁরা আমার সঙ্গে খুব ভালো, এমন-কী সস্নেহ ব্যবহার করতেন। তাই তাঁদের কাছ থেকে বড়দাকে দেখতে যাবার অনুমতি পেতে আমার কোনোদিন বিন্দুমাত্র অনুরোধে হয় নি।

তারপর মা-বাবাকে নিয়ে যাত্রা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে তালপুকুরের পুব পাড় দিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে সেই প্রকাণ্ড ধর্মসাগরের পশ্চিম পাড় দিয়ে আরো কিছুদূর উত্তর দিকে এগিয়ে

গিয়ে হাজির হতাম এক উঁচু দুর্ভেদ্য দেয়াল-ঘেরা জেলখানার লৌহফটকে। ছোটো একটা জানালা দিয়ে পুলিশের অনুমতিপত্র দেখাবার পর দরজা খুলে দেওয়া হত, আমরা গিয়ে বসতাম ফটকের পাশেই একটি ছোটো ঘরে। সে ঘরের আসবাবপত্র ছিল গোটা চারেক কাঠের টুল আর চেয়ার। 'কয়েদী'-দর্শনের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট বলে মনে করা হত।

কিছুক্ষণ পরে অনেক ভিতর থেকে আসতেন বড়দা। আমার যতদূর মনে পড়ে, বড়দার জন্য বাড়ি থেকে কিছু নেওয়া নিষিদ্ধ ছিল, তাই আমরা যেতাম খালি হাতে। বলা বাহুল্য, মার পক্ষে সেটা ছিল বিশেষ কষ্টদায়ক। বড়দার পোশাক ছিল সাধারণ আর স্বাভাবিক—পরনে ধুতি, গায়ে শার্ট, পায়ে চটি। বড়দা মা-বাবাকে প্রণাম করতেন, আমিও যথারীতি প্রণাম করতাম। তারপরে হত কুশলপ্রশ্ন। মা অবশ্য খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কিছু-কিছু প্রশ্ন করতেন। বড়দার কাছে বোধহয় সেগুলি অবান্তর মনে হত, তাই যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেন। আমার পড়াশুনা সম্বন্ধেও বড়দা দু-একটা প্রশ্ন করতেন, তবে আধ ঘণ্টা সময়ের অধিকাংশ সময় কাটত নির্বাক ভাবে—উচ্ছ্বাস দমন আর অশ্রু-সংবরণের চেষ্টায়। তাই সেই ভিজিটগুলি ছিল যেমন মৌন, তেমনি মর্মন্তুদ।

বড়দা চলে যেতেন জেলখানার ভিতরে, অনেকটা দূরে। তারপর বিকট শব্দ করে খুলে দেওয়া হত বৃহৎ লৌহফটক, আমরা বেরিয়ে আসতাম গম্ভীর মুখে, নিস্তব্ধ ভাবে। আবার সেই লাল সড়ক ধরে ধর্মসাগরের কোণে এসে তার পশ্চিম পাড় দিয়ে, বালিকা বিদ্যালয়ের পাশ কাটিয়ে তালপুকুরের পুব পাড় দিয়ে ফিরে আসতাম নিজেদের বাড়িতে, একান্ত ধীরে-ধীরে, প্রায় নিঃশব্দে। মা গ্রহণ করতেন শয্যা, বাবা মন দিতেন বাগানের কাজে আর পূজা-অর্চনায়। আর আমি কী ভাবতাম বা কী করতাম ঠিক মনে নেই।

শুধু জানি তখন আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করত নানা জিনিস। ঝড়ের দুর্যোগে ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো। সেই মর্মান্তিক জিনিসগুলো মনের উপর যে গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল, তার স্পষ্টতা ছ-সাত দশকেও বিশেষ কমে নি।

২ : সমর্পণ

একদিন মা আমাকে নিয়ে গেলেন এক গেরুয়াধারী, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীর কাছে। ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'আমার এ ছেলেকে আপনি সাধু করে নিয়ে যান, তাহলে আমি খুব খুশি হব।' সন্ন্যাসী একটু চমকে উঠলেন, হাসলেন, কিন্তু 'তথাস্তু' বললেন না। বরঞ্চ মন্তব্য করলেন—'এ বড়ো কঠিন পথ, সবার উপযোগী নয়।' তবে সন্তান সম্বন্ধে ধর্ম-পরায়ণ মাতার অমন উচ্চাদর্শ দেখে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন।

এই উৎসর্গর মূলে কি নিছক ভক্তি ছিল, না একটা মর্মান্তিক ভীতি, যে আমিও হয়তো একদিন বিপ্লবের পথ ধরে গিয়ে বন্দী হব রাজকারাগারে? মার সঙ্গে এ নিয়ে আমার কোনো কথা হয়নি। তার দরকারও ছিল না। কারণ বছর দুয়েকের মধ্যেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ পাওয়া গেল যে এই সম্প্রদানের পিছনে ছিল ধর্মভক্তি নয়, রাজদ্রোহিতার ভীতি।

সেই সন্ন্যাসীর নাম ছিল শ্যামসুন্দরানন্দ, আমাদের কাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেনের গুরুভাই। দুজনেরই গুরু ছিলেন স্বামী নিত্যানন্দ। কলকাতার মহানির্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা। সে মঠ হল রাসবিহারী অ্যাভিনিউর উপরে, লেক মার্কেটের কাছে। এখনো তা সন্ন্যাসীদের একটি বিশেষ আস্তানা হিসেবে পরিচিত। ট্রামে করে যেতে অনেক সময়ই দেখা যায় গেরুয়া-পরা সাধুরা ওখানে ঘোরাফেরা করছেন। ফুটপাত থেকে মাঝে-মাঝে কীর্তন বা ভজনের ধ্বনিও শোনা যায়। তখনকার দিনে অবশ্য সে অঞ্চল ছিল

গাছপালা আর জঙ্গলে ঢাকা। মহানগরীর এত কাছে থেকেও তাই এই আশ্রমটি ছিল অনেক দূরে। এ আরণ্যক আচ্ছাদন তার আধ্যাত্মিক আকর্ষণকেও হয়তো গভীর করে রেখেছিল।

কাকা ছিলেন আমাদের গ্রাম চুস্টার দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি আত্মীয়। তবে বাবা-কাকা দুজনেই ১৯০০ সনের কাছাকাছি কুমিল্লায় তালপুকুরের উত্তর পাড়ে বাড়ি তৈরি করেন। দুই বাড়ি ছিল পাশাপাশি। মাঝে কোনো বেড়া ছিল না। দুই পরিবারে ছিল অবাধ আনাগোনা। কাকার বাড়ির পুকুরই ব্যবহার করা হত আমাদের সংসারের দৈনন্দিন সব কাজের জন্য। তাই সম্পর্কে দূরের হলেও তাঁকে আমরা একান্ত আপন বলে মনে করতাম, আর 'কাকা' বললে তাঁকেই বুঝতাম।

তিনি ছিলেন কুমিল্লার একজন নামকরা উকিল। সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্বান আর বিজ্ঞ বলে শহরে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। আইনের সঙ্গে-সঙ্গে চলত তাঁর গীতা ও শাস্ত্র-পাঠ। তা ছাড়া কাকা ছিলেন একান্ত ধর্ম-পরায়ণ, আর তাঁর ধর্মজীবনের এক বৃহদংশ ছিল সাধু-ভক্তি আর সাধুসেবা। সব জড়িয়ে কাকার প্রভাব আমাদের বাড়ির উপর ছিল প্রচুর। আমরা সবাই তাঁকে যেমনি শ্রদ্ধা তেমনি মান্য করতাম। কাকার কোনো কথা কোনোদিন অবহেলা করবার সাহস করি নি।

মা-বাবা ছিলেন আরেক গুরুর শিষ্য। তাঁর নাম গম্ভীরানন্দ, তাঁর আশ্রম ছিল মধ্যপ্রদেশে। এ গুরুর সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি সন্ন্যাসধর্ম প্রচার করতেন না। সংসারে থেকেই দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করে ও ধর্মজীবন যাপন করে সবাই শান্তি, আনন্দ ও মুক্তি লাভ করতে পারে—এই তাঁর দীক্ষার মূলমন্ত্র। বাড়িতে মা-বাবার গুরুভাই-বোনদের সমাগম হত। তাঁরা সবাই ছিলেন "সংসারী"।

বড়দা নিজেকে বলতেন নাস্তিক, জীবনের শেষ পর্যন্ত ছিলেনও তাই। তিনি চলে গেলেন বিপ্লবের পথে, তারপর উধাও হলেন বাড়ি থেকে। ফলে বাড়িতে বেড়ে গেল পূজা-অর্চনা, ধর্মকর্ম, সাধুসেবা,—যদিও মা-বাবা কখনো কিছু বলেন নি, তবু অনায়াসে ধরে নেওয়া যায় যে তাঁদের সে সময় সবথেকে বড়ো কাম্য ছিল নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, বড়দার জেলখানা থেকে মুক্তি। বিপ্লবের তরঙ্গ আর ধর্মের তরঙ্গ মিলে আমার জীবনে তখন এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, তার ঘাতপ্রতিঘাত আর দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ থেকে অব্যাহতি পেতে লেগেছিল বেশ কয়েক বছর।

এদিকে পাশের বাড়িতে লেগে ছিল বারো মাসে তেরো পার্বণ, আর তার সঙ্গে হত সাধুসমাগম। সন্ন্যাসীরা প্রায় এসে হাজির হতেন, অনেক সময় বেশ কয়েকজন একসঙ্গে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সংসারী শিষ্যদের জন্য আধ্যাত্মিক খোরাক জোগানো, আর সঙ্গে-সঙ্গে নূতন শিষ্য জোগাড় করা। তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তরুণদের উপর। কী করে কয়েক-জনকে বাছাই করে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করে আশ্রম-বাসী করে তোলা যায়, সেটাই ছিল তাঁদের চরম লক্ষ্য আর পরম কাম্য।

কাকার বড়ো ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁর নির্দেশমত গুরুদের কাছে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করে। যতদূর মনে পড়ে, সবাই ছিল শ্যামসুন্দরানন্দের শিষ্য। কাকার তিন ছেলে আর দুই মেয়ের মধ্যে গুরুর সব-থেকে নজর ছিল বড়ো ছেলের উপর। তাঁর ডাকনাম ছিল শিব, ভালো নাম ছিল শৈলেশ, আমার থেকে দু বছরের বড়ো। আমারও একটা ডাকনাম ছিল—শম্ভু। বাড়ির সবাই চিরদিন সেই নামই ব্যবহার করতেন। বড়দাও শেষ পর্যন্ত আমাকে সেই নামেই ডাকতেন, যদিও তিনি নিজের ডাকনাম 'গণেশ' অপছন্দ করতেন আর বহুকাল আগেই তা বর্জন করে-ছিলেন। অবশ্য বড়দা সবথেকে বড়ো বলে তাঁর বেলা ডাকনাম ব্যবহারের কথা বিশেষ ওঠে না।

'শিবশম্ভু'—এই দ্বন্দ্ব সমাস তখন বিশেষভাবে

চালু ছিল। নানা জায়গায় তা শোনা যেত। তার কারণও ছিল সহজ। শিবদা ছিলেন আমার সোদর-প্রতিম। আমরা থাকতাম একই সঙ্গে, একই ঘরে। দুজন যেতাম দুই স্কুলে, তা ছাড়া দিনেরাতে অধিকাংশ সময় আমরা কাটাতাম একসঙ্গে। আমরা ছিলাম একই গুরুর শিষ্য। কিন্তু তারও চেয়ে মস্ত বড়ো ছিল আমাদের চিন্তাধারার সামঞ্জস্য, সব কাজে নিষ্ঠা আর একাগ্রতা, অধ্যয়নে অধ্যবসায় আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা এবং রঙিন জল্পনা-কল্পনা। ফলে আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের এক নিগূঢ় ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অদৃষ্টের চক্রান্তে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সে বন্ধন বিচূর্ণ হয়ে গেল।

৩ : চতুর্ধুরন্ধরের তর্কবিতর্ক

শিবদা ছিলেন কুমিল্লা জিলা স্কুলের ছাত্র। বড়দাও বছর সাতেক আগে সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। শিবদা ক্লাসে বরাবর প্রথম হতেন, প্রতিভাবান ছাত্র বলে শহরে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর সহপাঠী বন্ধু ছিলেন রেবতী বর্মণ আর গিরীন্দ্র চৌধুরী। লেখাপড়ায় আর বিদ্যায় বুদ্ধিতে দুজনেরই প্রচুর সুনাম ছিল। ক্লাসে সব সময়েই তাঁরা শিবদার নীচেই—দ্বিতীয় কি তৃতীয় স্থান দখল করতেন। আমি পড়তাম অন্য স্কুলে, ঈশ্বর পাঠশালায়, তাঁদের থেকে দুই ক্লাস নীচে। বয়সেও তাঁদের চেয়ে দু বছরের ছোটো ছিলাম, তবু তাঁরা আমাকে তাঁদের সমবয়সী বলেই মনে করতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের চারজনকে নিয়ে গড়ে ওঠে ছোটো একটি দল বা সমিতি—a gang of four। যৌবনের প্রেরণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর বহুমুখী কল্পনা। কুমিল্লায় তখন বিপ্লবের হাওয়া বইছিল পুরোদমে, আর দেশসেবার আহ্বান শোনা যেত পথে-ঘাটে, নানা কণ্ঠে, বিচিত্র ভঙ্গিতে। সেই উন্মাদনার দিনে আমাদের কী কর্তব্য সে প্রশ্ন নিয়ে আমাদের মধ্যে মাসের পর মাস চলেছিল বহু গবেষণা আর তর্কবিতর্ক। তখনকার স্মৃতি এখনো মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে হয় সব যেন মাত্র সেদিনের কথা।

আমাদের মিটিং হত ঘন-ঘন, লোকচক্ষুর অন্তরালে, আর সেজন্য আমরা চলে যেতাম শহর থেকে পাঁচ-ছ মাইল দূরে, অধিকাংশ সময়েই ময়নামতী পাহাড়ে। চার জনেই সাইকেলে করে যেতাম, কিন্তু একসঙ্গে নয়; পাছে কর্তৃপক্ষের মনে কোনো সংশয়ের উদ্রেক হয়, সেই আশঙ্কায় আমরা একা-একা, একটু ঘুরে-ফি'র, পাহাড়ের গায়ে একান্ত নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে যথাসময়ে হাজির হতাম।

শীগগিরই আমাদের আলোচনায় সবথেকে বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল একটি—বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় দেশোদ্ধারের জন্য আমাদের কী করা উচিত আর কী করে তার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হতে পারি। স্বাস্থ্যচর্চা ও যথারীতি লেখাপড়া করা সম্বন্ধে কোনো মতভেদ ছিল না, কিন্তু গিরীন আর রেবতীর কাছে তা যথেষ্ট মনে হয় নি। এই মামুলি একঘেয়ে কর্তব্যের বাইরে আমাদের তক্ষুনি হাতে-কলমে কিছু করা একান্ত দরকার, তাদের কাছে বার-বার সে-কথা শুনেছি।

গিরীন ছিল মূর্তিমন্ত অগ্নিদূত, আত্মোৎসর্গের জন্য উদ্ব্যস্ত, আত্মসংযমের কথা তার কাছে ছিল নিতান্তই অবান্তর। গিরীশ প্রস্তাব তুলল, আমাদের বেছে-বেছে কর্মী জোগাড় করতে হবে আর তাদের নিয়ে অনুশীলন বা যুগান্তর দলের মত জাতীয় দল গড়ে তুলতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের আগরতলা গিয়ে দেখতে হবে সেখানকার অরণ্যে কোথায় আমরা গোপনে একটা জায়গা নেবার ব্যবস্থা করতে পারি। উদ্দেশ্য, সেখানে অবিলম্বে কুচকাওয়াজ শুরু করে দেওয়া, যেন পিস্তল-চালনায় সহজে হাত পাকাতে পারি। এই প্রথম পর্ব সমাপ্ত হলে শুরু হবে আমাদের কর্মযজ্ঞ, দেশের নানা জায়গায়, নানা ভাবে।

আমাদের চারজনে মিলে তখন সে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

রেবতীর উত্তেজনা ছিল একটু নীচু স্তরের, মাত্র কয়েক ডিগ্রী নীচে। তাই গিরীনের সঙ্গে মোটের উপর সে ছিল একমত। দরকার হলে দুজনেই স্কুল ছেড়ে দিয়ে এই সংগঠনের কাজে নিজেদের সব শক্তি আর সময় নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। শিবদা মোটের উপর চুপ করে সব শুনতেন আর মাঝে-মাঝে আমার দিকে তাকাতেন। বয়সে ছোটো হলেও আমার মতামতের উপর তাঁর আস্থা ছিল গভীর। অনেক ব্যাপারেই পরামর্শ দেবার ভার এসে পড়ত আমার উপর।

গিরীন আর রেবতীর প্রস্তাবে আমি বিন্দুমাত্র সায় দিতে পারি নি। বলতাম, আত্মত্যাগ করাই তো সবথেকে বড়ো কথা নয়, সে ত্যাগের ফলে দেশের কী লাভ হল, সেটাই তো হল আসল কথা। আমরা তো নিজের চোখে দেখেছি কত প্রতিভাদীপ্ত তরুণ জীবন দেশসেবার অকাল উন্মাদনায় পড়ে বিব্রত বিধ্বস্ত হয়েছে। আরো বলতাম, দেশসেবা সহজ কাজ নয়, তার জন্য প্রয়োজন সুদীর্ঘ সাধনার। সেই বৃহৎ কর্মযজ্ঞের জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে সেটাই হল আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য। এই সুদীর্ঘ সাধনায় আমরা কী করে পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি, সবার আগে আমাদের তাই ভেবে দেখতে হবে।

অনেক জোর দিয়ে বহুবার এ কথা বলেছি যে, দেশসেবার জন্য মানুষের তৈরি হতে লাগে বহু বৎসর। পরিপক্ক জীবনে সাত্যিকারের দান ও সেবার জন্য বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে তখন কয়েকবারই চিত্তরঞ্জন দাশের কথা বলেছি। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি দেশের কাজের জন্য নানাভাবে তৈরি হয়েছিলেন, তারপর যখন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল তখন তিনি সব ছেড়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই অল্প দিনের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সারা দেশকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তা তো আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। আমাদেরও সেই দূরদৃষ্টি নিয়েই চলতে হবে। দেশসেবার আদর্শ চোখের সামনে রেখে তার জন্য নিজেকে তৈরি করাই হল বর্তমানে আমাদের সবথেকে বড়ো দেশসেবা।

আমার মন্তব্যের শেষে মনে করিয়ে দিতাম গুরু গোবিন্দের কথা—'বন্ধু, তোমরা যাও ফিরি ঘরে।'—কারণ এখনো সাধনা সমাপ্ত হয় নি; এখনো কর্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় আসে নি। আমাদেরও গুরু গোবিন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে।

শিবদা আমার যুক্তি ষোলো-আনা সমর্থন করতেন, গিরীন-রেবতীও আমার কথা মন দিয়ে শুনত, কখনো তা ঠিক অগ্রাহ্য করত না। কিন্তু তাদের আসল পরিচালক ছিল যুক্তিবিবেচনা নয়, অন্তরের অদম্য আবেগ। ফলে তাদের মনে ছিল প্রচণ্ড দ্বিধা।

আমাদের এ আলোচনা চলেছিল ১৯২০-২১ সনে, অর্থাৎ ৬৭-৬৮ বৎসর আগে। তখন যা বলেছিলাম, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তার সত্যতা আরো বিশেষ করে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছি। যৌবনের প্রারম্ভে আমার এই আত্মসংযম ও দূরদৃষ্টি বা অকালপক্কতা কোথা থেকে এসেছিল, তা অবশ্য বোঝা কঠিন নয়। সেই একটানা তিন বছর গ্রামবাস, স্কুল থেকে ধার করে সহজ কঠিন নানা বই নির্বিচারে অধ্যয়ন, কল্পনারাজ্যে অবাধ বিচরণ, আর শহরের সব উন্মাদনার বাইরে আপনমনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা—সব কিছুই আমার অকালপক্কতায় সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই।

তারপর এল রবীন্দ্রযুগ। রবীন্দ্রনাথের লেখা তখন থেকেই দিনের পর দিন মনের খোরাক জুগিয়েছে। তাঁরই কাছে শিখেছিলাম সত্যিকারের দেশসেবা আত্ম-বলিদানে নয়। আত্মসংযম করে সৃষ্টির কাজে ও দেশ-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করাই ছিল আসল দেশসেবা। তাঁর সেই বাণী স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলাম।

রবীন্দ্রনাথের এ আদর্শ বা আদেশ ব্রতরূপে গ্রহণ করা আমার পক্ষে তখন একান্তই সহজ ছিল আরো

একটি মস্ত বড়ো কারণে। চোখের সামনে ছিল বড়দার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—তাঁর বিপ্লব-জীবন, নিষ্ঠুর আত্মত্যাগ ও সুদীর্ঘ কারাবাস। দেশের জন্য কঠিন প্রয়াস আর প্রতিদানে কঠোর শাস্তি। নির্ভীক অস্ত্রধারী বিপ্লবীদের বীরত্ব মর্মস্পর্শী হোক না কেন, তার ফলে ইংরেজের সিংহাসন টলবে না, শুধু নিজেদেরই নির্যাতিত হতে হবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

আর ঠিক এই সময়েই এল গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, সারা দেশে এক বিরাট তুফানের মতো। অবিলম্বে ব্রিটিশ সিংহাসনও টলমল করে উঠল।

'আত্মার বলে কে পশুবলের মগজে ডাকায় ঝিঁ ঝিঁ,
কে রে ও খর্ব, সর্বপূজ্য গান্ধীজি, গান্ধীজি?'

এই অহিংস অসহযোগই যে স্বাধীনতালাভের একমাত্র উপায়, তা বুঝতে আমার বেশিদিন লাগে নি। তবে গোড়া থেকেই গান্ধীজির প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আমার মনে প্রচুর সন্দেহ ছিল। চরকাকে কেন্দ্র করে তাকে তিনি একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রেখেছিলেন। তাই গান্ধীজির শ্রেষ্ঠ দান হল—জনজাগরণ, জাতীয় সংগঠন নয়। ফলে নিজের মনে এক অভিনব স্বপ্নের সূচনা শুরু হয়: কী করে গান্ধীজির আধ্যাত্মিক বলের সঙ্গে রবীন্দ্র-আদর্শের সমন্বয় করা যায় যেন সর্বতোমুখী সৃজনক্রিয়ার সাহায্যে দেশ আবার বলিষ্ঠ সমৃদ্ধ ও সুন্দর রূপ ধারণ করতে পারে। এই স্বপ্নই হল আমার জীবনে বিপ্লবের শামিল। তার জন্যে বহুল পরিমাণে দায়ী হল বড়দার বিপ্লবজীবন।

বহু তর্ক-বিতর্ক সত্ত্বেও আমাদের চার বন্ধুর মতামতের কোনো পরিবর্তন হয় নি। কারণ আসল দ্বন্দ্ব ছিল গিরীন আর রেবতীর নিজের মনের মধ্যে, অর্থাৎ তাদের বুদ্ধিবৃত্তি আর অন্তরের তাড়নার বৈষম্য। তা সত্ত্বেও আমাদের বন্ধুত্ব কখনো খর্ব হয় নি, বিশেষ করে তা ছিল দেশপ্রীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়া, আমাদের আরও অনেক আলোচ্য বিষয় ছিল—নিজের লেখাপড়া, সংবাদ-বিনিময়, নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা। আমাদের মিটিং-ও তাই অব্যাহত ভাবে চলেছিল। তারপর হঠাৎ এল একদিন বজ্রপাত। ফলে ছত্রভঙ্গ হয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়লাম নানা দিকে।

ব জ্র পা ত

শিবদা আর আমার দীক্ষা হয়েছিল একই গুরুর কাছে, কিন্তু আমাদের মন্ত্রজপ ছিল নামমাত্র, আমাদের সত্যিকারের "আহ্নিক" ছিল অধ্যয়ন আর বৈপ্লবিক গবেষণা। গুরু শ্যামসুন্দরানন্দ তাঁর দর্শন দিতে এসে তা মনে-মনে আঁচ করেছিলেন ও প্রকাশ্যতই সেজন্য বিচলিত ছিলেন।

এ দিকে সাধুদের সমাগমে, কাকার সংসার ধীরে-ধীরে একটা আশ্রমে পরিণত হতে চলেছিল। সে সংসারের খুঁটি ছিলেন খুড়িমা। একমাত্র তিনিই পতি-ভক্তি ও গুরুভক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে-ছিলেন। একদিন হঠাৎ অল্প কয়েকদিনের রোগে খুড়িমা চিরবিদায় নিলেন। কাকা একেবারে ভেঙে পড়লেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সংসারও পড়ল ভেঙে। সে সময় শ্যামসুন্দরানন্দ এসে হাজির হলেন—ধূম-কেতুর মতো, উপলক্ষ কাকার মনের আধ্যাত্মিক খোরাক জোগানো, এই নিদারুণ আঘাতের সময় তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া। তিনি এই মহান কর্তব্য কী ভীষণভাবে পালন করেছিলেন তা কোনোদিন ভুলতে পারি নি।

গুরুর সেই তীব্র কণ্ঠ ও নির্মম বাণী আজও আমার কানে বাজে—'সংসারে মানুষের মুক্তি নেই। ভগবান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন,—আপনাকে কোন্ পথে যেতে হবে। মায়া ত্যাগ করুন। শিবকে আর কতদিন আঁকড়ে রাখবেন? তাঁকে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিন, ধর্মের পথে যেতে দিন।'

প্রায় মাসখানেক গুরুজী ওখানে বসে দিনের পর দিন কাকার কানে এই মন্ত্র দিলেন। শেষে তাঁরই

জয় হল। খুড়িমার শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হল। তার অল্প পরেই তিনি শিবদাকে নিয়ে চলে গেলেন তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করবেন বলে।

কাকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো লোক আশেপাশে ছিল না। দুই বাড়িতে আমরা সবাই কাকাকে যেমন শ্রদ্ধা করতাম, তেমনি ভয়ও করতাম। তাঁর মতের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার সাহস আমাদের ছিল না। আর শিবদার তো কথাই নেই। তিনি ছিলেন কাকার হাতে-গড়া মানুষ। এখনো মনে পড়ে, রোজ সকালে কাকা মন্ত্র জপ করার সঙ্গে-সঙ্গে এসে দেখে যেতেন শিবদার পড়াশোনা কেমন চলছে। কিছু বোঝাবার থাকলে তাকে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে শিবদা ছিলেন যেমনি মেধাবী ছাত্র তেমনি বাধ্য পুত্র। কাকার প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য শ্রদ্ধা আর ভয়। তাঁর কোনো কথার প্রতিবাদ করার কথা ভাবতেও পারতেন না। তাঁকে সংসার ছেড়ে যেতে হবে চিরদিনের জন্য ও আশ্রমে সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করতে হবে, কাকার এত বড়ো সিদ্ধান্তও তিনি নির্বিকারে নির্বিচারে মেনে নিলেন। কাকার আদেশ আর আশীর্বাদ মাথা পেতে নিয়ে শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় সবাইকে ছেড়ে শিবদা চলে গেলেন।

[ক্রমশ

সঙ্গে

১ ক। অনেক প্রত্যাশার সঙ্গে ওরা আপনার কাছে এসেছিল।
খ। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে ওরা আপনার কাছে এসেছিল।

২ ক। আমরা এখন আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ করছি—ম্যাগির মতো আধা তৈরিকরা খাবারের চল খুব বাড়ছে।
খ। আমরা এখন আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করছি···

৩ ক। শিকারী সাহসের সঙ্গে সেই ঘন বনের মধ্যে একলাই ঢুকে গেলেন নেকড়ের সন্ধানে।
খ। শিকারী সাহস করে···

ক-চিহ্নিত বাক্যগুলি বঙ্গভাষায় দৈনিক সংবাদপত্রের মহান অবদান। সমাজের ভিত্তিমূলে যাদের অবস্থান, সেই শ্রমজীবী-সমাজ আর নারীসমাজ কিন্তু খ-চিহ্নিত বাক্যগুলিই বলেন।

ঊনবিংশ শতকে বাঙালির ইউরোপ-অন্বেষা

রণেন্দ্রনাথ দেব

ঊনবিংশ শতকের বাঙলাদেশ, বাঙালি জাতি এবং সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য প্রবল। এ পর্যন্ত বহু প্রখ্যাত লেখক এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন, অনেক মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো কিছু গ্রন্থ বার হবে। এই বইটি এ বিষয়ে সাম্প্রতিকতম গবেষণা। ড. তপন রায়চৌধুরী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন কৃতী ছাত্র। আকবর এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সুখ্যাত বইটির নাম সুপরিচিত। নতুন বইটিতে তিনি গবেষণাকর্মের আলোকপাতে উনিশ-শতকী বাঙলার একটি নতুন প্রদেশকে অধিগম্য করেছেন। ইয়োরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ আর সংঘাতে বাঙালি চিত্তের জাগরণ ঘটেছিল। সেই ইয়োরোপকে নানা মনীষী নানাভাবে গ্রহণ করেছেন। ড. রায়চৌধুরী বিশেষ-ভাবে তিনজন মনীষীর উক্তির আলোকে আমাদের ইয়োরোপ-অন্বেষার বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেয়েছেন। এ তিনজন মনীষী—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এবং স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রথম অধ্যায়ে পশ্চাৎপটবর্ণন। লেখক বলেছেন, তাঁর আলোচনার একটি উদ্দেশ্য পাশ্চাত্ত্য বিষয়ে ভারতীয় দৃষ্টির বিভিন্ন সম্ভাবনা এবং বৈচিত্র্যের পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা। সে যুগের ভারতীয় ইয়োরোপ-আবিষ্কারের কয়েকটি কৌতূহল-জনক দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। ভারতীয়ের কাছে আদর্শ নায়ক ছিলেন ম্যাটসিনি আর গ্যারিবলডি, বিসমার্ক নন। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা ("জ্ঞানান্বেষণ" ও "এনকোয়ারার" পত্রিকা দুটির পৃষ্ঠপোষক মুষ্টিমেয় কটি তরুণকে বাদ দিলে) প্রায় সবাই হিন্দুধর্মের গৌরব ও পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। ভূদেব, বঙ্কিম এবং অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিরা (যাঁদের মধ্যে রয়েছেন পজিটিভিস্ট যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও) ধর্মকে জাতীয় জীবনের প্রধান ভিত্তি করে তুলতে চেয়েছেন। এই নব্য সম্প্রদায় ইয়োরোপকে আমন্ত্রণ করেছেন, কিন্তু ইয়োরোপের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনাও তাঁরা দেখেছেন। "রাজার জাতের" উদ্ধত ব্যবহারে তাঁরা অনেকেই অপমানিত বোধ করেছেন; রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র ও আরো অনেকের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের সংস্পর্শে এসে ইয়োরোপের চিন্তাজগতের বিরাট ভাণ্ডার তাঁদের প্রলুব্ধ করেছিল। মিল আর বেন্থামের চিন্তাধারা আমাদের মনীষী-দের উদ্দীপ্ত করে। তাঁদের নানাবিধ উক্তি আমাদের চমৎকৃত করে। চন্দ্রনাথ বসু অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ভারতের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করা উচিত, যাতে বিশ্ব-জাতিসভায় ভারত মর্যাদার আসন গ্রহণ করতে পারে এবং ইংল্যানডের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয় পারস্পরিক সম্ভ্রমদ্যোতক। ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবের ফলে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ছিল অনিবার্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারা। ভূদেব দেশীয় ঐতিহ্য এবং সাধনায় প্রগাঢ় নিষ্ঠাবান ছিলেন, একথা সবাই জানেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। ইংরাজের সঙ্গে সম্পর্কে তাঁকে নিত্য আসতে হত। তিনি ইংরাজের সঙ্গে করমর্দন করতেন এবং বাড়িতে এসে স্নান করে জামাকাপড় ছেড়ে ফেলতেন। তিনি কখনো কোনো সাহেবের গৃহে আহার করেন নি। অথচ ইংরাজ রাজপুরুষদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর অত্যন্ত হৃদ্যতা জন্মেছিল। ইনসপেক্টর অব স্কুলস মেড্‌লিকট, হজসন, প্র্যাট প্রভৃতি ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। একমাত্র লেফটেন্যানট-গভর্নর ক্যামবেলের সঙ্গে তাঁর কিছু মনকষাকষি হয়। প্রয়োজনে চাকরির ব্যাপারে তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিয়েছেন, এমন-কী একবার মিসেস উড্রোর সাহায্যও যাচ্ঞা করেছিলেন। ভূদেব স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবে আস্থাবান ছিলেন, কিন্তু ইংরাজি

Europe Reconsidered—Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal—By Tapan Raychaudhuri, Delhi Oxford University Press. 1988. pp. 369. Rs. 170.

শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। ভুললে চলবে না, তিনি স্বেচ্ছায় সংস্কৃত কলেজের পড়াশোনায় ইতি দিয়ে হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়েছিলেন।

ভূদেবের চিন্তাধারার আর-একটি বৈশিষ্ট্য মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁর সহমর্মিতা, সম্ভ্রমবোধ। তিনি মার্শম্যানের ইতিহাসগ্রন্থে পূর্বতন মুসলিম শাসকদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে মিথ্যা বলেছেন। ভূদেব প্রথম যৌবনে কিছুদিন কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেছিলেন। সেখানে মুসলমান ছাত্র ও সহকর্মীদের সান্নিধ্যে এসেই তাঁর মনে মুসলমান সম্প্রদায় সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ জাগে।

ভূদেবের চিন্তাধারায় কয়েকটি দিক কৌতূহলজনক। তিনি বিদ্যাসাগরমশায়ের পাঠ্যপুস্তকগুলির একটি ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—বিদ্যাসাগরমশায় আদর্শ চরিত্র হিসাবে শুধু ইয়োরোপীয় চরিত্রগুলিকেই বড়ো করে দেখান, আদর্শ ভারতীয় চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেন নি। অথচ ভূদেব নিজে বিশেষ ভাবে পড়তেন স্ব-উদ্যোগে যাঁরা বড়ো হয়েছেন তাঁদের কথা, যেমন Smile's *Industrial Biography*, Davenport's *Lives of Individuals who Raised themselves*, Brewster's *Martyrs of Science*, biographies of Stephenson, Watt and Joshua Wedgwood।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও ভূদেব এ শিক্ষাকে বলছেন খাঁটি সোনা নয়, গিল্‌টির গয়না। পাশ্চাত্ত্য জাতির দেশজয়ের বৃত্তান্তও তাঁর বিবেচনায় ক্রূরতার উপাখ্যান। ইংরাজের আচরণ অবশ্য স্প্যানিশ, পোর্তুগীজ ও ফরাসিদের তুলনায় কম নিষ্ঠুর। কিন্তু ইংরাজ কখনো আমাদের তাদের সমান মর্যাদা দেবে, এটা আশা করা অসঙ্গত। তবু ইংরাজের প্রতি ভূদেবের কিছুটা শ্রদ্ধা গোপন নেই। তিনি বলেছেন ইংরাজ স্বার্থপর, সহানুভূতিশূন্য, কিন্তু তার স্বভাব বীরত্বপূর্ণ; সে গুণের কদর জানে। তা সত্ত্বেও ভূদেব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছেন, ইংরাজের শাসনেই আদিবাসী জনজাতিসমূহ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

ভূদেবের আর-একটি চিন্তাবৈশিষ্ট্যের প্রতি লেখক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মধ্যে ভূদেব বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন অগুস্ত কোঁতের প্রতি। কোঁৎ পুরোহিতশ্রেণীকে উচ্চ আসন দিতেন। ভারতের ব্রাহ্মণরাও সেই উচ্চাসনের দাবিদার, এজন্যই কি ভূদেব কোঁতের অনুরাগী হয়েছিলেন?

"নিরেট রেউড় বাঁশ" ভূদেবের চরিত্রবিশ্লেষণটি মনোজ্ঞ।

ভূদেবের তুলনায় বঙ্কিমের স্বভাবে দ্বন্দ্বের ভাব প্রবল। তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা পাই। লেখক বঙ্কিমের পারিবারিক জীবনের চিত্র দিয়েছেন প্রথম। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার এবং অন্য তিন ভাইয়ের খুব প্রীতি আর শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মাঝে-মাঝে এই যৌথ পরিবারের কারো-কারো আচরণে, বিশেষত তাঁর বাবার আর সঞ্জীবচন্দ্রের অমিতব্যয়িতায়, তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতেন। পিতার মৃত্যুর পর রাগ করে কিছুদিন বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তুলে দেন। এই পরিবেশে তাঁর নিজ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকশিত হয়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিও নবযুগের ব্যক্তিত্বে ভাস্বর।

ড. রায়চৌধুরী বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রাবলীর মধ্যে প্রচলিত বিধিলঙ্ঘন-প্রবণতার উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়টি স্ফুটতর করে বললে ভালো হত।

বঙ্কিমের জীবনে একটি ক্ষোভ ছিল—তাঁকে ইংরাজের অধীনে আজীবন দাসত্ব করতে হয়েছে। পিতার ঋণ শোধের গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে থাকায় চাকরি ছাড়তে পারেন নি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের উদ্ধত আচরণ তাঁকে প্রতিপদে বিক্ষত করত। জেলাম্যাজিস্ট্রেট বাকল্যানড, মেকলে, ওয়েস্টমেকট, বেকার—প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ বেধেছে। এই পরিবেশে তাঁর মনে জাতিবৈরের ভাব জাগা আশ্চর্য নয়। ইংরাজ সরকার তাঁকে রায়বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি দিলে তা-ও বঙ্কিমের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রেভারেনড হেস্টির সঙ্গে পত্রযুদ্ধে বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম-অনুরাগ জ্বলন্তরূপে প্রকাশ পায়। বঙ্কিম প্রথম জীবনে নাস্তিক-ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি গভীর ধর্মানুরাগী হন। বঙ্কিমের মনোজীবনের এই বিবর্তন অকারণ নয়।

বঙ্কিম ইংরাজ শাসনে অতৃপ্ত ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ কখনো স্তিমিত হয় নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় আমাদের সাহিত্যে আদিরসের ছড়াছড়ি তাঁর কদর্য মনে হত। তিনি বিশেষ ভক্ত ছিলেন ইংরাজি ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার। বঙ্কিম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দুই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশগুলির স্বীকরণ করেছেন, আবার দুই সাহিত্যের নিকৃষ্ট উপাদানগুলি বর্জনও করেছেন।

বঙ্কিমের ধর্মবোধের বিশ্লেষণ করে লেখক দেখিয়েছেন তাঁর ভিক্টোরীয় নৈতিক শুচিতাবোধ তাঁর ধর্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত করেছে। হিন্দুধর্মে যেখানে উৎকট অশালীনতা রয়েছে, তাকে

তিনি ঘৃণা করেছেন। ধর্মকে তিনি সামান্য আচার-অনুষ্ঠান বলে বিবেচনা করতেন না। ধর্ম বৃহৎ অর্থে সংস্কৃতির সমার্থক, একথা তিনি বলেছেন "হিন্দুধর্ম বিষয়ক পত্রাবলী"-তে।

ইংরাজ শাসনের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করলেও পাশ্চাত্ত্য সমাজের মহান দিকগুলির উল্লেখ তিনি করেছেন সশ্রদ্ধ চিত্তে। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে অবাধসুযোগ, মানুষের সাম্যভাব, স্ত্রীপুরুষের সমমর্যাদা প্রভৃতি গুণগুলির প্রশংসা করেছেন বঙ্কিম। অবশ্য পাশ্চাত্ত্যের বহু রীতির সমালোচনাও করেছেন তিনি। বঙ্কিম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভক্ত ছিলেন না কেননা সেখানে মিলের ক্ষুরধার বুদ্ধির চেয়ে গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতাশক্তির আদর বেশি। পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদ, যা অন্যজাতির পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করে, তারও দোষ তিনি দেখিয়েছেন। খ্রীষ্টধর্মের প্রতি একদা তিনি আকৃষ্ট বোধ করেছিলেন। পরে এ আকর্ষণ স্তিমিত হলেও খ্রীষ্টধর্মের ভালো দিকগুলিকে তিনি স্বীকার করতেন।

ইয়োরোপের যে জিনিসটি বঙ্কিমকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল তা তার সাহিত্য। সাহিত্যের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং এই সাহিত্যের মহিমাখ্যাপনে বঙ্কিম চিরকাল মুক্তকণ্ঠ ছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয়। ভূদেব এবং বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার সঙ্গে ভারতীয় জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিরোধ বিষয়ে অবহিত হন এবং এটা তাঁদের মনে এক প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। বিবেকানন্দ ইংরাজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত হলেও তাঁর মনে প্রথম দিকে ইয়োরোপের প্রতি গভীর আকর্ষণ বা তীব্র বিরোধিতা—কোনো ভাবই ছিল না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ে তিনি বিশদ আলোচনা করতে থাকেন আমেরিকা ভ্রমণের পর থেকে। ভূদেব-বঙ্কিমের সঙ্গে এখানে বিবেকানন্দের বিরাট পার্থক্য। এই তিন মনীষীর মধ্যে একা বিবেকানন্দই পাশ্চাত্ত্য দেশে ভ্রমণ করেন ও প্রত্যক্ষভাবে সে সমাজের সঙ্গে পরিচিত হন।

বিবেকানন্দ তরুণ বয়সে সংগীত ও মুসলমানি রান্নার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। আইনের চর্চার প্রতিও তাঁর টান ছিল। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর জীবনের পথ বদলে যায় এবং রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ তাঁকে নবজন্ম দেয়। আমেরিকার অপূর্ব সাফল্যের পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন গঠনে উদ্যোগী হন। ইয়োরোপ-আমেরিকায় বিবেকানন্দ বেদান্তের আধ্যাত্মিকতা প্রচার করেন, কিন্তু ভারতে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যক্রমে সেবাধর্ম প্রাধান্যলাভ করে, বেদান্তচর্চা তুলনেকটা গৌণ। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" ও অন্যান্য গ্রন্থে ইয়োরোপের জীবন ও আদর্শকে বিশ্লেষণ করেছেন বিবেকানন্দ। আমেরিকায় বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচার সবক্ষেত্রে সুগম হয়নি। পণ্ডিতা-রমাবাই-এর দল ও প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতি স্পষ্টতই তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন। দেশে "অমৃতবাজার পত্রিকা"ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। এত সব বাধার মুখে বিবেকানন্দের বিশ্বজয় এক অপূর্ব কীর্তি।

পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের মধ্যে ফ্রান্সের প্রতি বিবেকানন্দ বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতেন। দরিদ্র মানবের দুঃখমোচন ছিল যাঁর জীবনের ব্রত, তিনি ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পাবেন—এ অস্বাভাবিক নয়। নেপোলিয়নের পতন ও ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ের উল্লেখ তিনি করেছেন গভীর দুঃখের সঙ্গে।

পঞ্চম অধ্যায়টি বিশেষভাবে পঠনীয়; লেখকের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তগুলি এখানে সংক্ষেপে নিবদ্ধ হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্যবিষয়কভাবনা মাত্রাতিরিক্ত অনুশীলনে দাঁড়ায়। যে তিনজন মনীষীর কথা বলা হল, তাঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু হওয়ার জন্য গর্বিত। কিন্তু তাঁদের হিন্দুত্ব একরকম নয়। ভূদেবের হিন্দুধর্ম ছিল স্মৃতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আবার অনুষ্ঠানাদিকে অবজ্ঞা করেন নি এবং দ্বিজজাতির শ্রেষ্ঠত্বে ছিলেন নিঃসন্দেহ। বঙ্কিম কিন্তু আচারাদির প্রতি ছিলেন বিরূপ এবং বর্ণভেদপ্রথাকে মনে করতেন ভারতের অধোগতির হেতু। তিনি যে জীবনদর্শনের কথা বলেছেন তা যতটা গীতা-মহাভারতের উপর প্রায় ততটাই কোঁৎ-স্পেন্সার-মিলের উপর স্থাপিত। আবার হিন্দু ঐতিহ্যের অর্থও বঙ্কিম-বিবেকানন্দের কাছে একরকম নয়। বিবেকানন্দ মনে করতেন ভারতীয় ধর্মের প্রাণ বেদান্ত এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যে নিহিত। তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, রজোগুণের চর্চাকে এবং এ গুণের চর্চার দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

উনিশ-শতকী বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাকে বুঝতে গেলে তিনটি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কী-রকম ছিল তা জানা দরকার। বিষয় তিনটি হল—সমাজসংস্কার, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক এবং জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন।

ভূদেব সামাজিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। মুসলিম শাসকদের তিনি অত্যাচারীরূপে চিত্রিতও করেন

নি। জনসাধারণের উন্নতির জন্য, শিক্ষাবিদ্‌রূপে, তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার ও আদিবাসী সমাজের উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবাবিবাহের মতো সামাজিকসংস্কারকার্যে উৎসাহিত বোধ করেন নি এবং মুসলমান শাসনকালকে অত্যাচারের কালরূপে চিহ্নিত করেছেন। এদিক থেকে দেখলে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সহযোদ্ধা মনে হতে পারে, কিন্তু দরিদ্র রায়তদের পক্ষ তিনি যেভাবে সমর্থন করেছেন তাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব উদারতা প্রকাশ পায়।

বিবেকানন্দও, বঙ্কিমের মতো, সামাজিক সংস্কারের জন্য স্মরণীয় নন। মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রশংসা ব্যঞ্জক। সভ্যতার প্রসারে খ্রীষ্টধর্মের তুলনায় ইসলামের অবদান বেশি, একথা তিনি বলেছেন। মানবসমাজের উন্নতির জন্য তিনি চাইতেন আত্মজ্ঞানের উপলব্ধির পথে বাধা দূরীভূত হোক এবং একাজে ভারতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পাশ্চাত্যবাসীর উদ্যম মিলিত হোক।

দীর্ঘ আলোচনাটিতে লেখকের পরিশ্রমশীলতার ছাপ সুস্পষ্ট, যদিও এ বইটিকে তাঁর পূর্ববর্তী রচনার চেয়ে উৎকৃষ্টতর মনে হল না। উনবিংশ শতকের বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্যে বিষয়ে যাঁদের কৌতূহল রয়েছে ড. রায়চৌধুরীর এ লেখাটি তাঁদের অবশ্যই পড়তে হবে।

সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি নিয়ে সমকালীন ভাবনার একটি কাঠামো

সমীর মুখোপাধ্যায়

নানান সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলনই হল বর্তমান গ্রন্থ। সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলির সাহায্যে লেখক সমকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতির রূপকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধগুলি রচিত হওয়ার ফলে গ্রন্থটির মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা একেবারেই অনুপস্থিত। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র। তবে সবগুলিকে মিলিতভাবে পড়লে এক ধরনের ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়।

লক্ষণীয় যে বর্তমান গ্রন্থটিতে প্রথমেই আলোচনায় এসেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, যিনি বর্তমান প্রজন্মের কাছে বিস্মৃতপ্রায় হলেও ভারতের বামপন্থী মতাদর্শের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে অনেকের কাছেই শ্রদ্ধেয়। তাঁর সম্পর্কে লেখকের সশ্রদ্ধ অথচ যুক্তিনির্ভর আলোচনাটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী হয়েছে। রোমানটিক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কিভাবে যুক্তিবাদী মানবেন্দ্রনাথ রায় হয়ে শেষ পর্যন্ত মৌল মানবতাবাদীতে পরিণত হন—লেখকের কলমে তার সুন্দর প্রতিফলন ধরা পড়ে। রোমানটিক নরেন্দ্রনাথ রামদাস বাবাজীর সান্নিধ্য থেকে জঙ্গি জাতীয়তাবাদী অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন এবং শেষ পর্যন্ত ঘটনাচক্রে নরেন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে এবং নতুন নামের সঙ্গে গ্রহণ করেন নতুন মতাদর্শ—মার্কসবাদকে। কিন্তু রোমানটিকতার আধিক্য স্বতই মানুষকে বাস্তববিমুখ করে মানবেন্দ্রনাথ রায়ও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফলে আসে হতাশা। জাতীয় বুর্জোয়াদের উপনিবেশবাদের সঙ্গে আপোসমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধে একদা যিনি লড়াই করেছিলেন তিনিই ১৯৩৬ সালে ফিরে এলেন ভারতে তাদেরই সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসে। অল্প সময়ের মধ্যেই পুনরায় হতাশার শিকার হয়ে তিনি নিক্ষিপ্ত হন 'রাজনৈতিক রিক্ততার কঠিন ভূমিতে'। এবার আশ্রয়ের সন্ধান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে—'নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল ব্যক্তির গাণিতিক সমষ্টিই হল সমাজ এবং এ ছাড়া সমাজের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।' (পৃ ১৫)

লেখকের রচনা পড়ে মনে হয়েছে যে, মানবেন্দ্রনাথ ক্রমশই রাজনৈতিক নিঃসঙ্গতা ও রিক্ততার পথে চলেছেন এবং তার থেকে বেরিয়ে আসার এক মরিয়া প্রচেষ্টার ফলেই জন্ম দিয়েছেন তাঁর মৌল মানবতাবাদের। অথচ লেখক এই মৌল মানবতাবাদকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'যথার্থ মানসপ্রতিমা' বলে কেন যে উপসংহার টানলেন বোঝা গেল না, কারণ লেখক নিজেই এক জায়গায় বলেছেন, 'রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং একাকিত্বে নিমজ্জিত মানবেন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন সম্পূর্ণ এক নতুন সম্ভাবনার। এই স্বপ্নই অনতিকালের মধ্যে রূপ নেয় এক নতুন দর্শনচিন্তায়, যাকে তিনি

দেশ কাল সমাজ—অমলকুমার মুখোপাধ্যায়। কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১২। ১৯৮৮, পৃ ১৪১। পঁচিশ টাকা।

অভিহিত করেন মৌল মানবতাবাদ নামে।' (পৃ ১০)

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "জন্মশতবর্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস"-এ লেখক প্রাক-স্বাধীনতা যুগের একটি আদর্শবাদী রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতালাভের পর কিভাবে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, সেই বিষয়টির ওপর মূলত আলোকপাত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, 'স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে...এ যাবৎ ইতিহাস কংগ্রেসের আদর্শচ্যুতি ও অবক্ষয়ের ইতিহাস।' জনসেবার আদর্শ থেকে বিচ্যুত কংগ্রেস দল শুধু সরকার-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে তাই নয় তা নেহরুর ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যেও পরিণত হয়েছে। ক্ষমতার লোভ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, স্বজনপোষণ, দুর্নীতি এমন পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যে দলগতভাবে কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। লেখকের এইসব বক্তব্যের সঙ্গে অন্যেরা তো বটেই, এমনকী কংগ্রেস দলের অনেকেও সহমত হবেন। কিন্তু এই প্রবন্ধটিতে যা বিশেষভাবে অনুপস্থিত তা হল কংগ্রেস দলের শ্রেণীগত চরিত্র সম্পর্কে লেখকের কোনো বক্তব্য। কোন্ আর্থ-সামাজিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসদলের উদ্ভব, বিকাশ এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তার নেতৃত্ব গ্রহণের ঘটনাগুলি ঘটে, তা না জানলে আজকের কংগ্রেস দলের অবক্ষয়ের বিষয়টি আর্থ-সামাজিক-কারণরহিত একটি আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা বলে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক। আর-একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোনো ধরনের গঠনমূলক কর্মসূচী ছাড়াই শুধুমাত্র নেহরু ও শ্রীমতী গান্ধী তাঁদের গণমোহন নেতৃত্বের দ্বারাই এই বিশাল ভারতবর্ষে কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—দেশীয় রাজনীতির ব্যাখ্যায় এটি একটি অতিসরলীকরণ বলেই মনে হয়।

"কংগ্রেস রাজনীতিতে গান্ধীর আবাহন ও বিসর্জন" প্রবন্ধে লেখক 'কংগ্রেস রাজনীতির ইতিহাসে গান্ধীপর্ব সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়' বলে মন্তব্য করেন। সনাতন মূল্য-বোধের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজি তাঁর নেতৃত্বকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য গণমোহিনী শক্তি বিশেষভাবে সহায়তা করে। অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী গান্ধীজি রাজনীতিতে উগ্রপন্থাকে কোনোদিন মেনে নিতে পারেন নি এবং সেই কারণেই চৌরিচৌরার ঘটনার পরি-প্রেক্ষিতে তিনি অসহযোগ আন্দোলন থেকে সরে এসে-ছিলেন। তবে লেখকের এই বক্তব্যের সঙ্গে একাধিক গান্ধী-বিশেষজ্ঞ ভিন্নমত পোষণ করেন। পূর্ববর্তী প্রবন্ধে লেখক যদিও পরোক্ষভাবে কংগ্রেস সংগঠনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বের জন্য নেহরুকে কটাক্ষ করেন, আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সেই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রবর্তক হিসেবে গান্ধীজির নাম উল্লেখ করেন। 'গান্ধীজি', লেখকের মতে, 'কংগ্রেস দলের সিদ্ধান্ত-করণপ্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েই ক্ষান্ত হন নি, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা এই প্রক্রিয়াকে নিরন্তর নিয়ন্ত্রণ করে তিনি কংগ্রেস সংগঠনে কার্যত এক ধরনের ব্যক্তিগত স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।' (পৃ ২৫) সুতরাং আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস দলের যে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা দেখা যায় তা মূলতই যে গান্ধীজির অবদান, সেই বিষয়ে লেখক মৌন থেকেছেন। অবশ্য গান্ধীজি যে ভারতীয় রাজনীতিকে নৈতিকতার দ্বারা বাঁধতে চেয়েছিলেন লেখকের সেই বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন। প্রবন্ধটিতে গান্ধীজি সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য ততটা যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণাত্মক নয়, যতটা আবেগ-নির্ভর। তাই ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চ থেকে গান্ধীজির ক্রমান্বয়ে সরে যাওয়ায় লেখক যে ব্যথিত হয়েছেন, তা নিতান্তই ব্যক্তি গান্ধীর জন্য—রাজনৈতিক গান্ধীর জন্য নয়। আমাদের দেশের প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য নেতা হয়েও গান্ধীজি দেশের জন্য, এমনকী কংগ্রেস দলের জন্যও কোনো অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কর্মসূচী কিন্তু দিয়ে যান নি। অহিংসা, অসহযোগ, অনশন —এসবই ছিল ইংরেজ-বিরোধী লড়াইয়ের কৌশল মাত্র, দেশগঠনের কর্মসূচী নয়। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক কর্মসূচী প্রভৃতি বিষয়ে নেহরুর বক্তব্য অনেক স্পষ্ট ছিল। মার্কসবাদী তত্ত্বে মূলত অবিশ্বাসী নেহরু কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ভারীশিল্পের বিকাশের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন, সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষতা প্রভৃতির ন্যায় সুস্পষ্ট কর্মসূচীর আশ্রয় নিয়ে দেশকে পরিচালিত করতে চান নির্দিষ্ট লক্ষ্যে। এই কর্মসূচী পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় কর্মসূচীতে পরিণত হয়। গান্ধীজির ব্যর্থতা এখানেই; তা ছাড়া নেহরু তাঁর কর্মসূচী স্বাধীনতার-প্রাপ্তির আগেই ঠিক করেন। ফলে স্বভাবতই স্বাধীনতা-লগ্ন যখন সমাসন্ন, তখন গান্ধীজি 'কংগ্রেসের এক নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত প্রহরী'। পুঁজিবাদী ভারতের রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে গান্ধীজির "রামরাজ্যে"র সাযুজ্য কোথায়? ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতেই আজ ভারতে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশই বিলীন

হয়ে যাচ্ছে। তাই আজকের ভারতবর্ষে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গান্ধীজির আদর্শকে ত্যাগ করার ফলেই দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে লেখকের যে ধারণা, তার সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। ক্ষতি যা হয়েছে, তা পুঁজিবাদী শ্রেণীর দুর্বলতা, দোদুল্যমানতা এবং সুবিধাবাদী মনোভাবের জন্য।

চতুর্থ প্রবন্ধ "ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্র ও কমিউনিসট পার্টি"তে লেখক মূলত সংসদীয় ব্যবস্থায় বামপন্থীদের ক্ষমতাসীন থাকার রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, সংসদীয় ব্যবস্থাকে বিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করার পরিবর্তে কমিউনিসটরা আপোসপন্থার নীতি অনুসরণ করে মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হচ্ছে। সংসদীয় পথে যে প্রকৃত মানবমুক্তি আসে না, সেই কথাটা বোঝানোর পরিবর্তে কমিউনিসটরা মানুষের মধ্যে নির্বাচনী ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহ তৈরি করছে। অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিসটরা সংসদীয় ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বুর্জোয়া ত্রুটিগুলির শিকার হয়ে পড়ছে। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সাধারণের মনে এইরকম ধারণা জন্ম নিচ্ছে যে এর পুনর্বিন্যাস ঘটলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যাবে। দ্বান্দ্বিক সূত্রে সংসদীয় ব্যবস্থা এবং কমিউনিসটরা একে অপরের ওপর ক্রিয়াশীল থাকার কারণে কমিউনিসটরা যেমন সংসদকে ব্যবহার করতে চায় বৈপ্লবিক স্বার্থে তেমনি সংসদীয় ব্যবস্থাও কমিউনিসটদের মধ্যে প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুকূল মনোভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা করে বলে লেখক যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা খুবই যুক্তিগ্রাহ্য। তবে তার কারণ হল—মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে এবং নিজেদের মধ্যে বিশেষভাবে রাজনৈতিক মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দলীয় পর্যায়ে ব্যর্থতা একদিকে, এবং অন্যদিকে অর্থনীতিবাদের প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক। অবশ্য এই প্রসঙ্গে লেখক বর্তমান প্রবন্ধে কিছু বলেন নি।

বর্তমান প্রবন্ধের মধ্যে লেখক এক জায়গায় বলেছেন যে, যে সংসদবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ভিত্তিতে সি. পি. আই ভেঙে সি. পি. এম-এর জন্ম হয়, পরে সি. পি. এম সেই সংসদবাদে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে সি. পি. আই (এম)-এর আবির্ভাবের এটাই কি ঐতিহাসিক কারণ? সি. পি. আই কোথাও সংসদীয় ভিত্তিতে ক্ষমতা-দখলকে তার লক্ষ্য বলে যেমন ঘোষণা করেনি, তেমনি সি. পি. এম ও তাদের দলীয় কর্মসূচীতে সংসদকে অচ্ছুত বলে বর্ণনা করে নি। সুতরাং লেখক সি. পি. এম-এর সংসদীয় অবস্থানকে যেদিক থেকে 'ইতিহাসের পরিহাস' বলেছেন তা খুব ইতিহাস-সম্মত নয় বলে মনে হয়। আর-একটি কথা উল্লেখ করা দরকার: বর্তমান প্রবন্ধে লেখক "সমাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু উভয় কমিউনিসট দলই বর্তমানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখেছে যা অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যে যাত্রা করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে অবশ্য এই লক্ষ্যে কতদূর কে অগ্রসর হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। এখনও যদি কংগ্রেস দল পশ্চিমবাঙলার প্রায় ৪০% মানুষের সমর্থন পায়, তবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে মানুষের অগ্রগতির হার খুব উৎসাহ-ব্যঞ্জক বলে মনে হয় না। আর সর্বভারতীয় প্রসঙ্গে লেখক যে প্রশ্নটি রেখেছেন, তা খুবই প্রাসঙ্গিক। এইজাতীয় প্রবন্ধ সবসময়ই বিতর্কমূলক হয়, এটিও হবে। লেখক খুব বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যে বিষয়টির ধারেকাছেও লেখক যান নি তা হল বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত বিষয়ক কার্যাবলী যা পশ্চিমবাঙলার বামপন্থী রাজনীতির মূল শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করছে।

আজকের ভারতবর্ষে একটি বৃহৎ সমস্যা সন্ত্রাসবাদ হলেও তা আমাদের দেশে কোনো নতুন ঘটনা নয়—এই প্রসঙ্গই লেখক আলোচনা করেছেন তাঁর পঞ্চম প্রবন্ধে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগেও সন্ত্রাসবাদ ছিল, তবে তার লক্ষ্য ছিল বিদেশী শাসক, আর আজকের সন্ত্রাসবাদের শিকার অগণিত সাধারণ নিরীহ মানুষ। এই প্রবন্ধে লেখক মনে করেন যে ইংরেজ শাসনের দমনপীড়নের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের যে যৌক্তিকতা ছিল, আজকের ভারতে তা নেই, কারণ এখন মানুষের ক্ষোভ প্রকাশের জন্য গণতান্ত্রিক বিভিন্ন মাধ্যমগুলি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। বিভিন্ন তত্ত্বের সাহায্যে লেখক বোঝার এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, সন্ত্রাসবাদ নিজে কোনো রোগ নয়, সমাজব্যবস্থায় নিহিত কোনো রোগের লক্ষণ। লেখকের ধারণা এই যে, ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির ভোটসর্বস্বতা আধুনিক ভারতে সন্ত্রাসবাদের অন্যতম উৎস। সংকীর্ণ ও তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক মুনাফার জন্য অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি এমন সব সামাজিক শক্তির সঙ্গে আপোস করে যা পরবর্তী কালে সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে বেপরোয়া হতে সাহায্য করে। বাস্তবে এমন ঘটনাই ঘটেছিল পানজাবে—প্রকাশ সিং বাদল মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতা-চ্যুত করার জন্য যখন ভিনদ্রেলওয়ালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলা হয়। পশ্চিমবাঙলার বামপন্থী সরকারকে অপদস্থ

এবং কিছুটা বিপদগ্রস্ত করার জন্যই কি ঘিসিং সাহেবের প্রতি কিছুটা সহানুভূতির মনোভাব দেখানো হল না কেন্দ্রের তরফে? ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে সত্তরের দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত নকশাল-রাজনীতির ভ্রান্তিকে মূলধন করে কি দলীয় ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসবাদকে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নি পশ্চিমবাঙলার পথেপ্রান্তরে? টি. এন. ভি. নামক একটি আজব অস্তিত্বকে সামনে রেখেই কি ত্রিপুরায় অতি সম্প্রতি রাজনৈতিক মুনাফা অর্জন করা হল না? লেখকের বর্তমান প্রবন্ধটিতে আর-একটু সবিস্তারে বলা দরকার ছিল—রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে কারা এই সন্ত্রাসবাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। অন্যথায় এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠকমনে বিভ্রান্তি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

"শিক্ষা, রাজনীতি, ও পশ্চিমবঙ্গ" প্রবন্ধে লেখক বিগত এক দশকের শিক্ষার অগ্রগতিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে এই রাজ্যে শিক্ষার আনুষ্ঠানিক ও আয়তনগত উন্নতি হয়েছে কিন্তু শিক্ষার গুণগত মান ক্রমহ্রাসমান। এর উদাহরণ হিসাবে লেখক উল্লেখ করেছেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নোংরা পরিবেশের কথা। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির দেওয়ালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বার্তাবাহী পোসটারের বহুলতায় সেগুলিকে রাজনীতিচর্চার আখড়া বলে মনে হতে পারে। বর্তমান সরকারের পরোক্ষ প্রশ্রয়ে শিক্ষায় রাজনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটছে। আর রাজনীতিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ফটকের বাইরে রাখতে পারলে শিক্ষা কত সুন্দর ও সার্থক হয় তার প্রমাণ হিসেবে লেখক নরেন্দ্রপুর ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের নাম উল্লেখ করেছেন।

অত্যন্ত স্পর্শকাতর অথচ গুরুত্বপূর্ণ এই প্রবন্ধটির বিচারের ভার পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলেও দু-একটি বিষয় নিতান্ত উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। রাজনীতির অসংখ্য পোসটার কি সত্যিই শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করে? যে সমাজ আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের দ্বারা দীর্ণ, সেখানে ছাত্রসমাজ তার সম্পর্কে যদি উদাসীন থাকে, তবে কি তা সুস্থ সমাজমনস্কতার পরিচয় হয়? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পোসটার কি বামফ্রনটের দান? স্বাধীনতা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী যুগেও কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পোসটার পড়ে নি? এখন যদি তা বেড়ে থাকে তবে তা ক্রমবর্ধমান সামাজিক অসন্তোষের প্রতিফলন নয় কি? নরেন্দ্রপুর, সেন্ট জেভিয়ার্সের মতন কলেজগুলিতে সমাজের যে অংশের ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে, তারাই কি আমাদের রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামাজিক অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করে? আমাদের ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে কি শুধু ছাত্ররা রাজনীতি করে? এসব সত্ত্বেও লেখকের স্পষ্টবাদিতা অভিনন্দনযোগ্য এবং বেশকিছু সমালোচনা যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছে।

"পশ্চিমবঙ্গের দশম বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক একদিকে রাজনৈতিক মেরুভবনকে বামফ্রনটের সাফল্যের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন, অন্যদিকে শ্রেণী-চেতনার ও রাজনৈতিক চেতনার অভাবের কথা বলেছেন। মনে হয় রাজনৈতিক মেরুভবনের পরিবর্তে দলীয় মেরুভবন (party polarization) শব্দটি ব্যবহার করলে ভালো হত।

"মূল্যবোধের সংকট" প্রবন্ধে লেখক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে যে অবক্ষয় তাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। অর্থনৈতিক উপাদানটিকে আলোচনার বাইরে রেখেছেন। মনে হয় না এই দুটি মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে মূল্যবোধের বর্তমান সংকটকে শুধুমাত্র শিক্ষার দিক থেকে পর্যালোচনা করা বাস্তবসম্মত হবে।

এ ছাড়াও আলোচ্য গ্রন্থটিতে "রাজীব নেতৃত্বের প্রথম আড়াই বছর", "ভাষাশিক্ষার সংকটের স্বরূপ", "প্রশাসনের গড্ডালিকা", "ধর্ম ও আধুনিক সমাজ", "পণ্ডিত বিদায়", "প্রজন্মের দূরত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট সুপাঠ্য হলেও লেখকের বক্তব্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তবে সমস্ত কিছু সত্ত্বেও রাজনীতিসচেতন পশ্চিমবাঙলার মানুষের কাছে গ্রন্থটির যে বিশেষ আকর্ষণ থাকবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

রসকল্পনার প্রসন্নতায় বাংলাদেশের দুই লেখিকা

কান্তি গুপ্ত

জাহানারা ইমামের "জীবনমৃত্যু" গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আসাদের মা গল্পটি গড়ে উঠেছে শহীদজননী শেফু আপার অস্তিত্বরক্ষার কথাকে অবলম্বন করে। মুক্তিযোদ্ধা আসাদ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরশয্যায় শায়িত। মাকে রেখে গেছে দেশের মানুষের কাছে, দেশের মাটিতে। শহীদ জননী, স্বামী-পরিত্যক্তা শেফু আপার সন্দর্শনে রাহেলা ছুটে গেল শহরের প্রান্তে। সেখানে, 'মাঠের বিরাট চত্বরে নোংরা পানিতে ডোবা বাঁশের মাচার ওপর দশ-বারোটা টিনের ঘরের' কোনো একটাতে, নোংরা পানি ঠেলে উঠে শেফু আপার জন্য অপেক্ষা করার কালে রাহেলা দেখল :

> 'আসাদের মা দুইহাতে কয়েকটা ছোট পুঁটুলি উঁচু করে ধরে ওই ঘরটা থেকে নেমে এ ঘরের দিকে (যেখানে রাহেলা অপেক্ষমান) আসছেন। ছোট্টখাট্ট মানুষ, পানি তার বুকসমান। ঘোলাটে পানিতে ভাসছে কত কি জঞ্জাল, খড়কুটো, মানুষের মল। সেই সমস্ত নোংরা দুর্গন্ধ জঞ্জালের ভেতর দিয়ে একবুক পানি উজিয়ে আসাদের মা আসতে লাগলেন।'

জাহানারা গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন রাহেলার চোখে দেখা এই বর্ণনাংশে, নির্লিপ্ত চিত্তে—সহজ সরল ভাষার আশ্রয়ে। বিক্ষোভের ঝড় নেই, করুণ রস উদ্রেকের প্রয়াসও অনুপস্থিত। কিন্তু শহীদ-জননীর অস্তিত্বের এই কাহিনী ইতিহাসের বহতা ধারায় এক কঠিন সত্যের খোঁজে পাঠকহৃদয়কে অন্বেষী করে তোলে। রুদ্ধ কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে;

> 'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
> এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা'
> ... ...

জাহানারা ইমাম জয়ী। বাস্তব পৃথিবীর হাজারো আসাদের মার জন্য ব্যাকুলতায় পাঠকচিত্তকে তিনি পূর্ণ করতে পেরেছেন।

জাহানারার "জীবনমৃত্যু"র অন্তর্ভুক্ত আটটি গল্পের ছয়টি গল্প মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। অপর দুটি, নেই মামা আর স্বপ্নের দালান গল্প গঠনে লেখক-প্রতিভা ভিন্ন উপকরণ সংগ্রহে ব্যয়িত। নেই মামায় নারী-মুক্তি তথা নারীর অধিকার রক্ষার প্রতি সম্ভ্রম এবং সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ঝুমি, তুলি ও মিতু তিন বন্ধু। এদের স্বতন্ত্র দুর্গে পুরুষশাসিত সমাজের আক্রমণ। জাহানারা ভ্রূকুটি হেনেছেন পরাভবকে। বিজয়মাল্য অর্পিত হয়েছে নারীমুক্তির আয়োজনে। গল্পের বলিষ্ঠতা কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ প্রত্যাশিত সংযমের অভাবে। সমাপ্তি অংশে ঝুমার স্বীকারোক্তি অনাবশ্যক, মূল অভিপ্রায় প্রকাশেও ব্যর্থতাকে ডেকে আনে। স্বপ্নের দালান গল্পের অন্তর্ভুক্তি এই গল্পসংকলনে সার্থক বলে মেনে নিতে অস্বস্তি হয়। হয়তো উঠতি ধনীদের শহর-কেন্দ্রিক মনোভাবের প্রতি তির্যক দৃষ্টি, বা 'যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে' সে মাটির প্রতি গভীর মমত্ববোধে জাহানারা অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু গল্পগঠনের দুর্বলতা কোনো অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করতে পারে নি। সে কারণে সমাপ্তি অংশে রহিমা বিবির সংলাপ আকস্মিক, আরোপিত বলে অনুভূত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত গল্পচতুষ্টয়ের অন্যতম আবার আসি ফিরে গল্পটিতে দেশের জন্য জীবন তুচ্ছ করার সংকল্পটি ভাস্বর। পাক আর্মির দানবীয় উৎপীড়ন বাংলাদেশের জ্যোতিষ্মান হৃদয়কে নিষ্প্রভ করতে পারে নি, এই ভাববীজ গল্পের মুখ্য আশ্রয়। জীবন মৃত্যু গল্পটি বাঙলা ছোটোগল্পের ভাণ্ডারে অনন্যতন্ত্রতার দাবি রাখে। বাঙালি যুবক গেরিলা যুদ্ধে বাঙলার মাটিকে দুর্জয় ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল, এর স্বাক্ষর রয়েছে জীবন মৃত্যু গল্পে। সমুচ্চ রোমানটিক উদ্দীপনায় জীবনকে তুচ্ছ করার যৌবন-উল্লাস সক্রিয় করে তোলা প্রতিভা-সাপেক্ষ। এই গল্পের প্রতিটি ছত্রে জাহানারা স্পন্দিত করেছেন—'এই যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে ?'

বাস্তব প্রত্যক্ষ জীবনে জাহানারা ইমাম বীরজায়া, বীর-জননী। তাঁর এই বীরাঙ্গনা-মূর্তি রূপ নিয়েছে "জীবনমৃত্যু"র গল্পগুলিতে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে জাহানারার গৃহপ্রাঙ্গণ থেকে। এই যুদ্ধকে তিনি সঞ্চার করেছেন সাহিত্যের

জীবনমৃত্যু— জাহানারা ইমাম। অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা-১। পঁয়ত্রিশ টাকা।

জীবন থেকে—হোসনে আরা শাহেদ। নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা-১। চল্লিশ টাকা।

পঞ্চমন্ত্র—হোসনে আরা শাহেদ। পালক পাবলিশার্স, ঢাকা-২। পঁচিশ টাকা।

বৃহত্তর প্রাঙ্গণে। অকৃত্রিম শিল্পচেতনায় বাস্তব সত্যকে অধিকতর সত্যরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

রায় বাঘিনী গল্পে স্থান পেয়েছে বিপ্লবী-জননীসত্তা। শত্রু-অধ্যুষিত অঞ্চলে মার কাছে আকস্মিক উপস্থিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা আসেম আর রকিব। মাতৃপ্রাণ সমস্ত সংস্কারকে দূরে ঠেলে বুকে তুলে নিলেন বিপ্লবী পুত্র আসেম আর তার বন্ধু রকিবকে। সামান্য উপকরণ, অথচ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে মানবসম্পর্কের পরিসরে জাহানারা উপহার দিলেন অসামান্যা জননীকে, যে জননীর স্নেহজাহ্নবী হৃদয়ের অভ্যন্তরে বহ্নিমান আগ্নেয়গিরি। জননীর অসামান্য প্রদীপ্তি পাগড়ী গল্পে। মা-মনিরা মুক্তিযুদ্ধে হারিয়েছেন একমাত্র পুত্র রবিনকে। বীরশয্যায় শায়িত পুত্র রবিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে একফোঁটা অশ্রু তিনি বর্ষণ করেন নি। অপরকেও ভৎর্সনা করেছেন কান্না-প্রকাশে। একদিন পুত্রহারা জননীর কাছে আগমন ঘটল সহযোদ্ধাদের। মনিরা তাদের দেখাতে গেলেন রবিনের প্রথম জন্মদিনের ছবি। অকস্মাৎ নেমে এল জননী-হৃদয়ের বহুসঞ্চিত বর্ষণ। 'মনিরা অচেতন হয়ে পড়ে ডুবে গেল সে পানির অতল তলে।' গল্পের অবলম্বন বাৎসল্যরস। এই রসধারায় প্রবহমান চিরঞ্জীব বাণী : শোক হোক শক্তি!

রায় বাঘিনী ও পাগড়ী গল্পদুটি পাঠান্তে 'চৈতালী' পর্বে বীর সন্তানের জন্য জননীর কাছে রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনা আবৃত্তি করার ইচ্ছা দুর্মদ হয়ে ওঠে,

দীর্ঘ গর্ভবাস হতে জন্ম দিলে যার
স্নেহগর্ভে গ্রাসিয়া কি রাখিবে আবার?
চলিবে সে এ সংসারে তব পিছু পিছু?
সে কি শুধু অংশ তব, আর নহে কিছু?
নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার
সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।
... ...

বিশ্বের সকল সংগ্রামী অভিযাত্রীদের কাছে জাহানারা ইমামের সৃষ্ট মাতৃমূর্তি অক্ষয় হয়ে রইল।

হোসনে আরা শাহেদের "জীবন থেকে" গ্রন্থটির প্রকাশনা সংস্থার একটি ঘোষণা দেখা গেল। 'নাসাস প্রকাশিত একটি নিবন্ধগ্রন্থ'—এরকম ঘোষণা অনুল্লেখ থাকলে 'জীবন থেকে" গ্রন্থটির পরিচয় সম্পর্কে সংশয় থেকে যেত। হোসনে আরা শাহেদ অভিজ্ঞতার প্রস্তুতিভূমিতে যে লেখনী চালনা করেছেন; তা গল্পের আবেদনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তথ্য ও তত্ত্ব, বিচার ও বিশ্লেষণকে আড়াল করে সমধিক আগ্রহ প্রতিফলিত হয়েছে প্রার্থিত রসে বিষয়কে বিলীন করার সাধনায়।

প্রবন্ধ-নিবন্ধের স্থান বিদ্যার সভায় নয়, সাহিত্যের আসরে, হৃদ্‌বৃত্তির সংযোগে। স্বাদুতাদানে সকলকেই নিরন্তর শিল্প-চেতনা প্রখর রাখতে হয় নানাবিধ উপকরণ ও উপায়কে খুঁজে নিতে। হয়তো "জীবন থেকে" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আটটি নিবন্ধকে বিশেষ কৌলীন্য দানের আয়োজনে শাহেদের এ এক ভিন্নতর রুচি ও মর্জি।

আগে পরে, কাগজের বাইরে, স্বপ্নের লাশ, প্রত্যাবর্তন ও তীর্থস্থান—এই পাঁচটি নিবন্ধে শাহেদের অভিজ্ঞতার পরিক্রমা মানবজীবনের পহেলা প্রহরের পথে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এই পথ দোসরা প্রহরে সংক্রামিত। সকল ক্ষেত্রেই শাহেদের পর্যবেক্ষণশক্ত ক্রিয়াবান। তবে, রূঢ় কঠিন বিচারবিশ্লেষণভূমিতে কেবল স্নিগ্ধ মধুর রসের বহতা ধারা। মানবশিশুর সুখস্বর্গচ্যুতিতে শাহেদ-হৃদয় বেদনাহত। কার্যকারণের উদ্দেশ্যে আঘাত অপেক্ষা দীর্ঘশ্বাসের সঞ্চার।

আগে পরে-তে স্থান নিয়েছে দরিদ্র স্কুলশিক্ষক পুত্র বটু ও শিল্পপতির কনিষ্ঠ সন্তান পেপসির শৈশবের সখ্য। বয়ঃক্রমে সখ্য অক্ষুণ্ণ থাকে নি। Conditioned reflex! পরিবেশ পেপসিকে শিখিয়েছে দরিদ্র বন্ধু বটুর জন্য ধনীর স্বার্থোদ্ধত স্বভাব বিসর্জন দেওয়া যায় না। রূঢ় বাস্তব। তথাপি লেখনীগুণে কেন যেন Wordsworth-এর পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে,

At length the Man perceives it die away,
And fade into the light of common day.

প্রত্যাবর্তনে ভিন্ন স্বরে একই কথা বলা হয়েছে। দরিদ্র পিতার অশ্রু-ঘর্ম-রক্তের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত সন্তান বয়ঃক্রমে পিতার প্রতি কর্তব্যপালনে উদাসীন। ছদ্মগাম্ভীর্যে মূল্যবোধের বিবর্তনের কথা পিতার মুখে উল্লেখিত হয়েছে বটে, আসলে শাহেদ প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, আধুনিক শিক্ষা ডাক্তার, মাস্টার, উকিল তৈরি করে—মানুষ করে না; মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষা দেয় না।

কাগজের বাইরের কিশোর রবি খবরের কাগজের প্রতি ভক্তিবশতই খবরের কাগজ বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। তার বিশ্বাস ছিল খবরের কাগজ সত্য সংবাদই পরিবেশন করে এবং সত্য সংবাদ প্রকাশে নির্ভীক। স্বভাবতই রবির বিশ্বাস ভাঙতে দেরি হয় নি। এবং সে কারণেই সত্য-প্রতিষ্ঠাকল্পে তাকে আত্মাহুতি দিতে হল। কাগজের

বাইরেতে শাহেদের যৌবন-সংকল্প খুঁজে নেবার অভিপ্রায়। স্বপ্নের লাশ ও তীর্থস্থানে যথাক্রমে শিশুশিক্ষা ও নারীশিক্ষার ওপর আঘাতের কথা। স্বপ্নের লাশে শিশু বুলবুলিকে পড়া ছেড়ে বিদ্যালয়ের পরিচারিকার কাজ নিতে হয় আর তীর্থস্থানে গৃহবধূ জানায়, শ্বশুর-শাসিত জীবনের সংবাদ। গৃহবধূটি শৈশবে প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রী হিসেবে স্বপ্ন দেখেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হবার; হয় নি। আশংসিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে শাহেদ সার্থক। কোনো মতবাদের বঙ্কিম দৃষ্টি ব্যতিরেকেই তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিদ্যমান ধনের অসাম্য ও সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রতি পাঠকের ভ্রূকুটি নিক্ষিপ্ত হয়।

নতুন হাওয়ায় এক ফেরিওয়ালাকে কেন্দ্র করে শাহেদের শ্লেষ। 'উন্নতির জন্য, উন্নয়নের জন্যে জীর্ণতা বড় বাধা···। এজন্যই সদ্য উন্নত এবং আরো উন্নয়নশীল পুরনো ঢাকায় পুরনো জীর্ণরা থাকলে চলবে না।' এই শ্লেষ সঞ্চারিত ত্রিশঙ্কুর জাতিতে। বধির ও পাষাণ সমাজের কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছেন, বিত্তবানের বিত্তের গৌরবের কাছে লেখকের লেখার সৌরভ নিষ্প্রভ হওয়ার কাহিনী। ত্রিশঙ্কুর জাতিতে শাহেদের ভর্ৎসনা তীব্র আর নির্মম। ভিন্ন সুর উঠেছে 'নাছোড় ছায়ায়'। দরিদ্র হীনশ্রী জীবন থেকে শাহেদ সংগ্রহ করেছেন পাতিব্রত্যে উজ্জ্বল কমলাকে। গভীর বেদনায় স্পর্শ করতে চেয়েছেন। কিন্তু নিরর্থক দীর্ঘশ্বাসে প্রতিভা নিঃশেষিত হয় নি। কর্তব্যবুদ্ধি-ধর্মবুদ্ধিবিরহিত পতিদেবতার ওপর বর্ষিত হয়েছে শাহেদের শাণিত আক্রমণ। 'নাছোড় ছায়ায়' ব্যক্তিজীবনকে স্পর্শ করার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক।

সহজাত সরলতা ও সরসতা শাহেদের সূক্ষ্মতর শিল্পকর্মের অধীন। "জীবন থেকে" গ্রন্থটিতে সর্বত্রই সহৃদয় রসকল্পনার প্রসন্নতা।

হোসনে আরা শাহেদ "পঞ্চমমন্ত্র" গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন আঠারোটি প্রবন্ধ। জীবনপরিক্রমায় নানা মানুষ, নানা ঘটনা, নানাবিধ সংবাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। এই সান্নিধ্যই প্রবন্ধগুলির উৎস। সংকলিত গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে বিচার-বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যান অপেক্ষাকৃত স্বল্প, অধিক স্থান অধিকার করেছে বিষয়ীর উল্লাস। বেশির-ভাগ প্রবন্ধেই মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রতি তির্যক দৃষ্টি, উন্মার্গতার প্রতি ভ্রূকুটি। মেকি ভণ্ডামি অসাধুতার ওপর রসিকতার উত্তপ্ত প্রলেপ।

এ ধরনের প্রবন্ধশ্রেণীকে মননপ্রধানরূপে বিবেচনা করেছেন অনেকে। কেউ-কেউ অভিহিত করেছেন রম্যরচনা নামে। আবার নকশা রূপে চিহ্নিত করার ঝোঁকও দেখা যায় মাঝে-মাঝে। কালীপ্রসন্ন-বঙ্কিমচন্দ্র-ইন্দ্রনাথ পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসু-সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রসন্নতায় এসব প্রবন্ধে উচ্চশোভিত শ্রী। হাল আমলে, ক্ষীণ হাসির যুগে এরকম প্রবন্ধ রচনার আয়োজন দৈনিক সংবাদপত্র সাপ্তাহিকের দৌলতে নজরে আসে বটে, কিন্তু সেখানে নিছক চটক মজা স্ফূর্তি। কবি-কল্পনাশূন্য লঘুচপল ঠাট্টা। হোসনে আরা শাহেদের "পমঞ্চমন্ত্রে"র প্রবন্ধগুলি ব্যতিক্রম। সর্বত্রই সাহিত্যপ্রাণতা।

রসিকতার অনুরোধে শাহেদের লেখনী পরিচালিত হয় নি। সকল প্রবন্ধেই গভীর জীবনবোধের প্রসার। তাঁর রচনা ঠাট্টা-বিদ্রূপ নয়, লোকজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তবে, শাহেদ বৈদগ্ধ্যে, চাতুর্যে, বাকসংযমে অনির্বচনীয় উচিত্যরক্ষায় সফলতা অর্জন করেছেন, এরকম অনুভূতিতে পরিতৃপ্তি লাভ করা গেল না। অনেক ক্ষেত্রেই শব্দসংযোজনায়, বাক্যগঠনে প্রতিভার সুসংহতি অপেক্ষা কৈশোরিক উল্লাস পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের প্রবন্ধে অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই প্রত্যাশিত। শব্দসংযোজনায়, বাক্যগঠনে কৃত্রিম প্রয়াস ব্যর্থতাকেই আহ্বান করে। দৃশ্যমান কোনো স্বাদ বা উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশে সমর্থ হয় না। তথাপি হোসনে আরা শাহেদকে সংবর্ধনা জানাতেই হয়। মূল্যবোধশূন্য হীনশ্রী যুগে হালকা রঙ্গপটু মনের ভাবনায় পাঠকহৃদয়ে তিনি মূল্য সঞ্চয় করার সুযোগ দিয়েছেন।

বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ

মৃণাল নাথ

১

আজ থেকে একশো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছিলেন: 'প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহাকে বাংলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয় (ঠাকুর ১৮৮৫ : ২৭৪)।

ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথম রূপা সংস্করণ ১৯৮৭; দাম: ৫০ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যের এক যুগ পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "উপসর্গের অর্থবিচার" (১৮৯৭, ১৮৯৮)। কেউ কেউ মনে করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই 'অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধটিতেই সুস্পষ্টভাবে বিকশিত হয় নব ব্যাকরণদৃষ্টি' (আজাদ ১৯৮৪ : চব্বিশ)। বস্তুত, বিশ শতকের গোড়াতেই সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বে শুরু হয় একটি "আন্দোলন"—যাকে ব্যাকরণ আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমরা কিছুদিনের ব্যবধানে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দেখতে পাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৯০১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১) এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের অন্য একটি প্রবন্ধ পরবর্তী বৎসরে প্রকাশিত হয় "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় (ঠাকুর ১৯০২)। বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হবে, তার কাঠামো নিয়ে তীব্র বিতর্ক, বাদানুবাদ চলে ; পণ্ডিতেরা দুটি শিবিরে ভাগ হয়ে যান, একদল প্রকৃত বাংলার ব্যাকরণ চান, তাঁরা বাংলাকে একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন ভাষা হিসেবে দেখতে চান, অন্যদল চান বাংলা ব্যাকরণ হবে সংস্কৃত ব্যাকরণের আদলে।

বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি ছিল তখনকার দিনে তা আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৯০১) নিবন্ধ থেকে জানতে পারি। তিনি বাংলা ব্যাকরণের তিন রকমের প্যাটেণ্টের কথা উল্লেখ করেছেন, একটি হল, 'মুগ্ধবোধ প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার সংস্কৃত পণ্ডিতগণ, আর একটি হাইলি প্যাটেণ্ট গ্রন্থকার মাষ্টারগণ। এক প্যাটেণ্টে সংস্কৃত সূত্রগুলির তর্জমা, আর এক প্যাটেণ্টে ইংরেজী রুলগুলির তর্জমা।' 'বাঙ্গালা ভাষা যে একটা স্বতন্ত্র ভাষা উহা যে পালি, অর্ধমাগধী, সংস্কৃত, পার্সি, ইংরেজী প্রভৃতি নানা ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, গ্রন্থকারগণ সে কথা একবারও ভাবেন না। অনেকে আবার দুই প্যাটেণ্ট মিশাইয়া এক প্রকার খিচুড়ী প্রস্তুত করেন।...তাহাতে যুক্তির লেশমাত্রও নাই, বহুদর্শিতার নামও নাই।' তাঁর মতে বাংলা ভাষার কোনো ব্যাকরণই নেই, বাংলা ব্যাকরণের নামে শিশুদের যা পড়ানো / শেখানো হয় তা বাংলা ব্যাকরণের ছদ্মবেশে সংস্কৃত ব্যাকরণ মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও (১৯০১) ঐ একই সময়ে জোরের সঙ্গেই বলেন : 'খাঁটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ এখনও অস্তিত্বহীন। বাঙ্গালার যে অংশ সংস্কৃত হইতে ধার করা নহে, সে অংশ খাঁটি বাঙ্গালা, সে অংশের ব্যাকরণ নাই। সে অংশের ব্যাকরণ এখন গড়িতে হইবে ; খাঁটি বাঙ্গালা আলোচনা করিয়া তাহাকে খাড়া করিতে হইবে।'

রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখের আহ্বানকে স্মরণ করেই প্রথম খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করার প্রয়াস করেন যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি (১৯১২)। এই ব্যাকরণ যদিও উত্তম, তবুও একে বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বলা সঙ্গত হবে না। এর পর যিনি এ কাজে ব্রতী হলেন তিনি পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপ-মহাদেশের ভাষাবিদদের অন্যতম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তাঁর ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণ বেরোয় ১৯৩৬ সালে। তিনি তাঁর নিজের ব্যাকরণ সম্পর্কে বলেন : 'ইহাতে খাঁটি বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ আছে তেমনই সাধু বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত উপাদান-এর ব্যাকরণ আছে' (শহীদুল্লাহ ১৯৬৯ : ।০)। শহীদুল্লাহ্ সাহেব খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-লিখেছেন ঘোষণা করলেও, সংস্কৃতের মায়াজাল তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। শহীদুল্লাহ্-সাহেবের ব্যাকরণের তিন বছর পরে কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী ব্যাকরণ-পুস্তক "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"। গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানতে পারি, এই ব্যাকরণ তিনি লিখতে আরম্ভ করেন ১৯৩২ সালে, ১৯৩৬ সালে লেখা সম্পূর্ণ হয়। তাঁর ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় দেওয়া হয় ১৯৩৮ সালে এবং প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪২, এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫ সালে)। তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় আমাদের জানান : 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিলে যাহা বুঝি, বইখানিতে তাহারই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার "সাধু" ও "চলিত" উভয়বিধ রূপই আলোচিত হইয়াছে। সাধারণত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে ভাষাগত সংস্কৃতমূলক শব্দ লইয়াই বেশি কথা থাকে। আমি যথারীতি বাঙ্গালার সংস্কৃত শব্দাবলীর বিচার করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি ও উচ্চারণ এবং ব্যাকরণঘটিত বাঙ্গালার বিশিষ্ট বা স্বকীয় নিয়ম বা পদ্ধতি নির্ণয় করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছি। উচ্চারণ ও বর্ণবিন্যাস এবং ব্যাকরণ বিষয়ে খাঁটি বাঙ্গালার স্বকীয় রীতির নির্দেশ না থাকিলে, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণকে সম্পূর্ণাঙ্গ বলা চলে না। প্রস্তুত পুস্তকে বাঙ্গালা ভাষার ঐতিহাসিক আলোচনা নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারের আধারেই আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ ইহাতে করিবার যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি।' (চট্টোপাধ্যায় ১৯৪৫ : ১/০—১৵০)

২

বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত—এ প্রশ্ন তুলেছিলেন আচার্য সুকুমার সেন। তিনি তাঁর নিবন্ধে (সেন ১৯৭৮) একটি খসড়া রূপরেখাও দিয়েছিলেন—তা এক কথায় অসাধারণ। পরবর্তী কালে তিনি (সেন ১৯৮৭) চলিত বাংলার ব্যাকরণগত কাঠামোও আমাদের উপহার দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কেমন হবে, ইস্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণই বা কেমন হবে, তা আমরা জানতে পারি পবিত্র সরকারের প্রবন্ধ থেকে (সরকার ১৯৮৩ক, ১৯৮৮)। ভাষাতত্ত্বের এই চূড়ান্ত বিজয়ের যুগে বসে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেমন ব্যাকরণ রচিত হবে, তার তাত্ত্বিক দলিল হাজির করা, অথবা একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ উপস্থাপিত করা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আজ থেকে ৫০ বৎসর পূর্বে বাংলা ভাষার একটি সার্বিক এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করা কেমন কাজ ছিল তা আমাদের ভেবে নিতে তেমন বেগ পেতে হয় না।

যে কথা বলছিলুম। বিতর্ক শুরু হয়েছিল বিশ শতকের শুরুতে—বাংল ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ তৈরি করতে হবে অথবা খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ তৈরি করতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, বাংলা ভাষার যে ব্যাকরণ হবে তাতে কী কেবলই "প্রাকৃত" উপাদান থাকবে? বাংলা কী সংস্কৃত বা অন্য ভাষাকে আত্মসাৎ করে নি? সেই সব উপাদান কী উপেক্ষিত হবে? বাংলা ভাষা মানে কী শুধুমাত্র চলিত ভাষা? ভাষাবিজ্ঞানীরা এককালে বলতেন, বাংলার সংস্কৃত অংশের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের দ্বারস্থ হলেই চলবে, বাংলা ব্যাকরণ থেকে তাকে বিসর্জন দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে যে rational চিন্তাধারা তাও পাই রবীন্দ্রনাথে। তিনি স্পষ্ট করেই জানান যে প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণে সংস্কৃতের নিয়মাবলী যেমন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চলবে না, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে সংস্কৃত থেকে ধার করা অংশকেও অবহেলা করা চলবে না। সত্যিকারের বাংলা ব্যাকরণে তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। [এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের আলোচনা দ্রষ্টব্য: নাথ ১৯৮৮]।

এই কথার সূত্র ধরেই আরেকটি বিষয়ের দিকে এগোতে পারি। বাংলা ভাষার দুটি রূপ বা রীতি আছে। তাকে বলা হয় সাধু ও চলিত। এই দুই রীতিতেই সাহিত্য রচিত হয়েছে, হচ্ছে। সাধু ভাষা পুরোপুরিই সাহিত্যের বাহন, কদাপি কথ্য ভাষা হিসেবে ছিল না। চলিত ভাষা কথ্য ভাষারই মান্য রূপ। সাধু ও চলিতের মধ্যে তফাত খুবই সামান্য, সর্বনামের কিছু রূপে, ক্রিয়াপদে এবং অন্যান্য কিছু পরসর্গে। সাধু ও চলিতের মধ্যে যে পার্থক্য তা কয়েকটি সূত্রের দ্বারাই ধরা যেতে পারে। এরকম কয়েকটি সূত্রের কথা জানিয়েছেন শিশিরকুমার দাশ (১৯৮৫-৮৬)। এ কথাটা এখানে বলা হল এ কারণে যে যেহেতু বাংলা ভাষার এই দুই রীতি রয়েছে, বাংলা ভাষার যে ব্যাকরণ হবে তাতে এই দুই রীতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—না হলে সে ব্যাকরণ হবে এক খণ্ডিত ব্যাকরণ, বাংলা ভাষার পূর্ণ বা সার্বিক রূপ তাতে থাকবে না।

৩

সুনীতিকুমারের "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রকাশিত হয় আজ থেকে পাঁচ দশক পূর্বে। বস্তুত, বাংলা ব্যাকরণে তখন এক বিরাট নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। সুনীতিকুমারই প্রথম ব্যক্তি যিনি একটি সার্থক এবং পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ আমাদের উপহার দিলেন। শুধু তাই বলব না, বলব তিনি একটি encyclopaedic ব্যাকরণ আমাদের কাছে উপস্থাপিত করলেন। ব্যাকরণের বিষয়বস্তু কী? আমরা সকলেই জানি ব্যাকরণের বিষয়বস্তু তিনটি: ১. ধ্বনিতত্ত্ব, ২. রূপতত্ত্ব, এবং ৩. অন্বয় বা বাক্যরীতি। তাঁর এই ব্যাকরণে এই তিনটি বিষয় যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং বিশ্লেষণের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি আলাদা আলাদা ভাবে নির্দেশ করেন কোন্ নিয়মগুলি খাঁটি বাংলার, আর কোন্‌টিই বা তৎসম বা সংস্কৃত সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সংস্কৃতের পোশাক তিনি কখনো বাংলা ভাষার গায়ে পরান না। তিনি সন্ধিকে তাঁর ব্যাকরণে রেখেছেন বটে, তবে, তিনি বলে দেন যে তা সংস্কৃত ব্যাকরণের, এবং খাঁটি বাংলা মৌখিক সন্ধির উদাহরণও দেন। তেমনি রূপতত্ত্বের বেলায় বাংলা প্রত্যয় যেমন দেখান, তেমনি উদাহরণ দেন সংস্কৃত বা বিদেশী প্রত্যয়েরও।

বর্তমানে বিতর্ক উঠেছে বাংলার কারক-বিভক্তি নিয়ে। চার্লস ফিলমোরের মডেলে এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধও বেরিয়েছে (সরকার ১৯৮৩খ; মোরশেদ ১৯৮৮)। যেহেতু পুস্তকটি পুনর্মুদ্রণ, কিছুতেই প্রত্যাশিত নয় যে আজকের কারক-তত্ত্ব অনুসারে তিনি বাংলার কারক-বিভক্তি দেখাবেন। সমাসের

বেলায়ও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আমরা একথা কখনোই ভাবতে পারি না যে ১৯৩৯ সালে বসে সুনীতিকুমার আজকের ভাষাবিজ্ঞানের অন্তরদৃষ্টি পাবেন। তিনি তাঁর ব্যাকরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাতটি কারককেই উপস্থিত করেন। সমাসের বেলায়ও তিনি সংস্কৃতের যাবতীয় শ্রেণীবিভাগ মেনে নিয়েছেন যান্ত্রিকভাবে। সমাস সম্পর্কে বিদেশে নোতুন চিন্তাভাবনা হচ্ছে। যে নোতুন, পূর্ণাঙ্গ, সার্বিক ব্যাকরণ পরে তৈরি হবে, তাতে তা দেখতে পেলেই আমরা খুশি হব। সুনীতিকুমার তার জন্যে রেহাই পেতে পারেন।

আজকের দৃষ্টিতে সুনীতিকুমারের "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ"-এর অনেক ত্রুটিই হয়তো ভাষাবিজ্ঞানীদের চোখে পড়বে, আর যেহেতু তিনি নিজে ভাষাবিদ ছিলেন, তাঁর ত্রুটি অনেক বড়ো করে দেখানো হবে। তবুও একথা অনায়াসেই বলা যায় যে তাঁর "ভাষাপ্রকাশ"-এর মতো বাংলা ভাষার এমন গভীর অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কেউ করতে পেরেছেন বলে জানি না। গত কয়েক দশক ধরে অনেক ভাষাবিজ্ঞানীই ভাষা-ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, 'সার্থক' বাংলা ব্যাকরণ হল না বলে হা-হুতাশ করেছেন। আজ পর্যন্ত কী একটিও খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ (স্কুলপাঠ্য নয়) আমরা পেয়েছি সেইসব বিদগ্ধজনের কাছ থেকে ? সুনীতিকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই একজন বিশ্রুত ভাষাবিদ বলেন : 'এমন কি যে ব্যাপারে তাঁর প্রতি আমাদের আশা ছিল সবচেয়ে বেশী যে তিনি একটি সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর সার্বিক বাংলা ব্যাকরণ লিখবেন, সেখানেও তিনি আমাদের আশা পূর্ণ করেন নি।' (দাশ ১৯৭৭ : ৩৫)। আমি জানি না তিনি "ভাষাপ্রকাশ" আদৌ পড়েছেন কিনা, পড়লে এমন মন্তব্য তিনি করতেন না। কারণ সুনীতিকুমারের ব্যাকরণই বাংলা ভাষার প্রথম সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ এবং এ যাবৎ প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ বাংলা ব্যাকরণ। একজন প্রবীণ ভাষাবিদের কাছ থেকে, সুনীতিকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, এমন রূঢ় মন্তব্য শোনার জন্য অনেকেই প্রস্তুত ছিলেন না। (মন্তব্য রূঢ় এবং সত্য হলে কোনো কথা ছিল না, তা ছিল সমস্ত শালীনতাবিরোধী।) যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির ব্যাকরণ পূর্ণাঙ্গ নয়—একথা সকলেই স্বীকার করবেন, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ব্যাকরণও পূর্ণাঙ্গ নয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেন যে তিনি তাঁর ব্যাকরণে বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছেন (ঠাকুর ১৯০৪)। অর্থাৎ উভয় ব্যাকরণই একদেশদর্শী। যে ব্যাকরণে বাংলা ভাষার সামগ্রিক বিশ্লেষণ, তার সমস্ত উপাদানের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা থাকবে, ভাষার নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা থাকবে (দ্রষ্টব্য ত্রিবেদী ১৯০১) তাকেই আমরা সার্বিক, সার্থক এবং খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ বলব। সুনীতিকুমারের ব্যাকরণ সেদিকে এক অসামান্য পদক্ষেপ, তাঁর এক অনন্যসাধারণ কীর্তি—একথা আমাদের ভুললে চলবে না। এতৎসত্ত্বেও, তিনি তাঁর নিজের ব্যাকরণের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষক ও পণ্ডিতদের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন গতানুগতিক ও চিরপোষিত নানা ধারণা যেগুলি যুক্তিসহ ইতিহাসসম্মত নয় সেগুলো পরিহার করে, বাংলা ব্যাকরণের চর্চায় নূতন দৃষ্টিভঙ্গির বিচারশৈলীর প্রবর্তনে ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন (চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৪)।

৪

সুনীতিকুমারের "ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ" পুনঃপ্রকাশ করার জন্যে প্রকাশককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এমন একটি জরুরি কাজ করেছেন বলে। এই ব্যাকরণের যেমন উপযোগিতা রয়েছে তেমন রয়েছে একটি পুরামূল্য সেই হিসেবে পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। তবুও বলব, সুনীতিকুমারের আহ্বানকে (চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৪) স্মরণ করেই এই গ্রন্থের একটি সম্পাদিত সংস্করণ (মূলকে অক্ষুণ্ণ রেখে) পেলেই ভালো হত। যেমন আমরা পেয়েছিলুম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৯৭১ এবং ১৯৭৪ সালে)। ইতিহাসের ব্যাপারে নোতুন তথ্য পাওয়া যায়, ইতিহাসকে নোতুনভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাকরণের সূত্রগুলি যদিও একই থাকে, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে অনেক নোতুন তত্ত্ব আসে, সেই তত্ত্বের আলোকে ব্যাকরণকে নব নব রূপে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করা হয়। তবুও আমাদের লাভ এটুকু যে পরিশিষ্টে প্রকাশক 'লেখকের অভিপ্রেত পরিমার্জনা' সংযোজন করেছেন। প্রকাশকের নিবেদনে জানতে পারি যে ভাষাচার্য 'তাঁর প্রয়াণের পূর্বে মূল গ্রন্থটির আমূল সংস্কার করেছিলেন।' বস্তুত, সুনীতিকুমার যা করেছিলেন, তা পরিমার্জনা মাত্র, আমূল সংস্কার নয়। আমূল সংস্কার হলে আমরা অন্য একটি গ্রন্থ হাতে পেতুম। এই পরিমার্জনার কিছু ফটোকপি থাকলে গ্রন্থটির মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেত বলেই মনে হয়। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো সংস্করণে তাঁরা

তা করবেন এবং সংশোধিত একটি সম্পাদিত সংস্করণের দিকে মনোযোগী হবেন ॥

উল্লেখপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পা.) ১৯৮৪ বাঙলা ভাষা। ১ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমি।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার ১৯৩৯ ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

—১৯৭৪ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একাশিতম প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতির অভিভাষণ'। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৯৭ 'উপসর্গের অর্থবিচার'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৪ : ৪. ২৪১-২৪৬।

—১৮৯৮ 'উপসর্গের অর্থবিচার'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৫ : ১. ১১২-১৩৭।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৫ 'বাংলা উচ্চারণ'। বালক ১ : ৬. ২৬৯-২৭৪।

—১৯০১ 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৮ : ৩. ১৩৭-১৫০।

—১৯০৪ 'ভাষার ইঙ্গিত'। ভারতী ২৮ : ৩. ২৬০-২৭১ ; ২৮ : ৪. ৩৪৮-৩৫৬।

—১৯৫৮ 'ব্যাকরণের ভূমিকা ॥ অন্যান্য নির্দেশ'। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৫ : ১. ৪৩।

ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর ১৯০১ 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৮ : ৪. ২০১-২২৯।

দাশ, শিশিরকুমার ১৯৭৭ 'ভাষাচার্য সুনীতিকুমার'। অমৃত ১৬ : ৪২. ৩৪-৩৮।

—১৯৮৫-৮৬ 'মুখের বাংলা, লেখার বাংলা'। ভাষা ৪ -৫. ২৭-৩৩।

নাথ, মৃণাল ১৯৮৬ 'ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়'। স্মরণাক্ষর ৩ : ৪. ৯-৩৭।

—১৯৮৮ 'রবীন্দ্রনাথ ও ভাষা-পরিকল্পনা'। চতুরঙ্গ ৪৯ : ৯. ২০-৩০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস ১৯৭৪ বাঙ্গালার ইতিহাস। ১ম, ২য় খণ্ড। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : নবভারত।

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর ১৯৮৮ কারক সমীক্ষা : প্রাচীন ও নতুন প্রেক্ষাপট। সাহিত্য পত্রিকা ৩১ : ৩. ৫৭-১০০।

রায়বিদ্যানিধি, যোগেশচন্দ্র ১৯১২ বাঙ্গালা ভাষা : প্রথম ভাগ (ব্যাকরণ)। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ ১৯৬৯ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ; প্রথম সংস্করণ ১৯৩৬। ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি।

শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ ১৯০১ 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ'। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৮ : ১. ১-৭।

সরকার, পবিত্র ১৯৮৩ক 'ইস্কুলের ব্যাকরণ কেমন হবে'। যুগান্তর ২০ মার্চ, ২৭ মার্চ, ৩ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল ১৯৮৩।

—১৯৮৩খ 'বাংলা কারক-বিভক্তি'। বিভাব ৬ : ৪. ১১৪-১২৩।

—১৯৮৮ 'স্কুলপাঠ্য বাংলা ব্যাকরণ : ব্যাধি ও প্রতিকার'। অকাদেমি পত্রিকা ১. ৩৫-৬১।

সেন, সুকুমার ১৯৭৮ 'বাংলা ব্যাকরণ কেমনটি হওয়া উচিত'। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা ১৬ : ৪. ২৮৫-২৯০।

—১৯৮৭ ভাষার ইতিবৃত্ত। পঞ্চদশ সংস্করণ। কলকাতা : ইস্টার্ন পাবলিশার্স।

নাটক

বিবিধের মাঝে মিলন

পঞ্চম জাতীয় নাট্যমেলা

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

নান্দী

নান্দীকারের পঞ্চম নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ৩রা থেকে ১০ই ডিসেমবর। গত চার বছর ধরে নান্দীকার নিজেদের সার্থকনামা বলে প্রমাণ করেছেন। সংস্কৃত নাটকের সূত্রধারের মতো তাঁরা এই চার বছরে শুধু ভারতবর্ষে বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক নাট্যের নান্দীপাঠই করেন নি, তাঁদের সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন পশ্চিম বাঙলার থিয়েটারকে। আজ তাই সমস্ত কলকাতার থিয়েটার-প্রেমীর কাছে নান্দীকার-নাট্যমেলা একটি বার্ষিক উৎসব, যার জন্য সারা বছর ধরে চলতে থাকে উন্মুখ প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষাশেষে সমস্যাদীর্ণ, শতধা-বিভক্ত বাঙলা নাট্যজগৎ অন্তত কয়েক দিনের জন্য জীবন্ত, প্রাণবন্ত নাট্য ও নাটকের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে; অস্তিত্বের জটিল সংকটের মধ্যেও খুঁজে পায় আশার চর।

প্রস্তাবনা

৩রা ডিসেমবর সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নান্দীকার প্রতিবারের মতো এবারও সংবর্ধনা জানালেন ভারতীয় থিয়েটারের পুরোধাদের—পশ্চিম-বাঙলার কুমার রায়, কেরালার কে. এম. পানিক্কর, দিল্লির রাজিন্দর নাথ এবং কর্ণাটকের গিরিশ কারনাড। প্রত্যেককে দশ হাজার এক টাকার সম্মানমূল্য দেওয়া হল, এই কথা ঘোষণা করে নান্দীকারের কর্ণধার শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত জানালেন যে, দশ হাজার টাকার জাতীয় পুরস্কারের আর্থিক মূল্য বৃদ্ধির আশায় ওই এক টাকার ইঙ্গিত; সংগীত নাটক আকাদেমীর পরিচালক হিসেবে শ্রীগিরিশ কারনাড এ কথা মনে রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সন্ধ্যার সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক উক্তিটি করলেন তিনি। জানালেন, এই নাট্যমেলায় এসে যথার্থ ভারতীয় থিয়েটারের একটি স্পষ্ট অবয়ব মূর্ত হয়ে উঠছে তাঁর চোখে।

১. প্রতিবেশী প্রযোজনা

এবার নাট্যমেলায় ভারতবর্ষের কয়েকটি রাজ্য এবং প্রতিবেশী দুটি দেশ তাঁদের প্রযোজনা নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। নাট্যমেলার সূচনা এবং শেষ হল এই দুটি বিদেশী প্রযোজনা নিয়ে। প্রথম দিন, ৩রা ডিসেমবর সকাল আর সন্ধ্যায় দুটি দল, "নাগরিক" এবং "থিয়েটার (ঢাকা)" যৌথভাবে পরিবেশন করলেন শেকসপীয়রের "ম্যাকবেথ" নাটকের বাঙলা অনুবাদ। কবি শামসুল হকের কলমে শেকসপীয়রের কাব্যনাটকের মৌল সত্তার তেমন কোনো হানি ঘটে নি, যদিও দু-একটি জায়গায় অতি-আনুগত্য সংলাপকে করেছে আড়ষ্ট। দৃষ্টান্ত হিসেবে দু-একটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেখানে ম্যাকবেথ গেছেন ডানকানকে হত্যা করতে, সেখানে উৎকণ্ঠিতা ম্যাকবেথ-পত্নী মূল নাটকে বলেন the attempt and not the deed, / confounds us। এর অনুবাদ হিসেবে 'করা নয়, করার চেষ্টাই তবে ভোবালো'—সংলাপের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য কেড়ে নেয়।

তেমনি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজা ম্যাকবেথ নিজের রাজকীয় অস্তিত্ব বিষয়ে মূলে যে মন্তব্য করেন, To be thus is nothing ; / But to be safely thus, তার আক্ষরিক বাঙলা অনুবাদ 'এটা হওয়া কিছু নয়, এটা হয়ে থাকাটাই কিছু' অভিনেতাকে বিব্রত এবং দর্শককে পীড়িত করে। অন্যদিকে Come sealing night / scarf up the tender eye of pitiful day (দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য)-র অনুবাদ হিসেবে 'এসো রাত, যে তুমি সেলাই করে দাও, চোখের পল্লব' শেকসপীয়রের কাব্যকে ছুঁতে পারে না। অথবা 'তোমার অভাব তার / স্বাস্থ্য যাতে আছে সমস্ত কিছুর-ঘুম', You lack the season of all natures, sleep" (তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য)-এর বাঙলা সংস্করণ যথার্থতায় পৌঁছতে পারে না। পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্যের বিখ্যাত Tomorrow and tomorrow and tomorrow সংলাপের অনুবাদ 'দিন পরে দিন পরে দিন' ও মূলের কাব্যকে ধারণ করতে অক্ষম। একইভাবে চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে পলাতক রস মাতৃভূমি সম্বন্ধে বলে, 'It cannot be called our mother, but our grave' ; তার বঙ্গানুবাদ 'স্কটল্যাণ্ড দেশ নয় আর, কবর শুধু' মাতৃভূমি ও কবরের পরস্পর-বিরোধী দ্যোতনা এনে দিতে অসফল। পোর্টারের অংশটি অনুবাদে যথেষ্ট পদ্যগন্ধী হয়ে ওঠে নি, অন্যদিকে ডাকিনীদের মন্ত্রে "গতর"-এর মতো কথ্য শব্দের পাশে "মণ্ডুক" শব্দটি অত্যন্ত বেমানান লেগেছে। অথচ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ডানকান বিষয়ে শ্রীমতী ম্যাকবেথের মন্তব্য 'যদি তার ঘুমন্ত মুখ না দেখাতো আমার পিতার মতন', মূলের Had he not resembled / My father as he slept, অথবা ওই একই দৃশ্যে ম্যাকবেথ যখন তাঁর রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বরুণের সাতটি সাগর পারবে কি এই রঙ ধুয়ে দিতে' তখন তা মূল Will all great Neptune's ocean wash this blood / clean from my hand ?-এর কাব্যিক ব্যঞ্জনা বহনে সক্ষম। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে ডাকিনীদের Fair is foul, foul is fair-এর সুন্দর অনুবাদ 'শুভ অশুভ, অশুভ শুভ'। চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যে স্ত্রী-পুত্রহীন ম্যাকডাফকে ম্যালকম যখন বলে, 'শোকের পাথরে তবে তরবারি শানিত করুন' তখন তা শ্রোতা-দর্শকের কাছে মূল Be this the whetstone of your sword-এর স্বাদ এনে দিতে সার্থক হয়। তাই সামগ্রিক বিচারে "ম্যাকবেথ"-এর মতো সূক্ষ্মব্যঞ্জনাময় নাটকের কাব্যানুবাদ হিসেবে শামসুল হকের অনুবাদটি কোনোমতেই অবহেলার যোগ্য নয়।

কিন্তু এই কাব্যানুবাদই অভিনয়ের দুর্বলতায় শুনিয়েছে কৃত্রিম, প্রাণহীন। দুর্লভ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ সময়েই অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এত বেশি সচেতন ছিলেন যে তাঁদের কাব্যনির্ভর সংলাপের ছন্দ বজায় রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় নাট্য হয়েছে অন্তর্হিত। কুশীলবদের প্রায় প্রত্যেকেই শব্দ সম্বন্ধে একেবারে অন্যমনস্ক। কোন্ শব্দের কতটা গুরুত্ব হওয়া উচিত, কোন্ শব্দে তৈরি হতে পারে কী ছবি—এ বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ অসচেতন। কোনো রকমে সংলাপ উদ্গার করে দিতে পারলেই যেন তাঁদের কর্তব্য শেষ। ম্যাকবেথের ভূমিকায় আলি যাকের এই প্রযোজনার দুর্বলতম অভিনেতা। ম্যাকবেথকে তিনি পুরোপুরি খলচরিত্রে রূপান্তরিত করতে সার্থক হয়েছেন। শেকসপীয়রের চরিত্রের যে ট্র্যাজিক দ্বন্দ্ব তা তাঁর রূপায়ণে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। অনভ্যাস বা প্রস্তুতি-হীনতার ফলে তিনি এবং অন্য কয়েকজন অভিনেতা বারবার সংলাপ বলতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছেন॥ লেডি ম্যাকবেথ হিসেবে ফেরদৌসী মজুমদার ঘুমের মধ্যে হাঁটার দৃশ্যে খানিকটা সফল হলেও অন্যত্র একেবারেই ব্যর্থ। ভালো লাগল ম্যাকডাফের ভূমিকায় তারিক আনাম খানকে। কিন্তু তাঁর আর ম্যাকবেথের তরবারি-যুদ্ধের অংশটি অত্যন্ত দুর্বল; প্রায় পাড়ার ক্লাবের প্রয়োজনার মানের। চিকিৎসকের ছোট্ট ভূমিকায় রামেন্দু মজুমদার পরিমিত অভিনয়ে সার্থক। সংলাপ নিয়ে তাঁকে অতটা বিব্রত মনে হল না। প্রথমা ডাকিনী হিসেবে সারা জাকের বেশ অভিনয় করেছেন। ডানকান এবং ব্যাঙ্কোর ভূমিকায় যথাক্রমে আবুল হায়াত ও আতাউর রহমান ব্যক্তিত্ববর্জিত, দর্শকের মনে ছাপ ফেলতে অসমর্থ। বাচিক অভিনয় বা অভিব্যক্তিতে অক্ষম হলেও নির্দেশকের গুণেই সম্ভবত অভিনেতাদের চলাফেরা ও অন্যান্য আঙ্গিকাভিনয় উচ্চমানের।

পরিচালক ক্রিস্টোফার স্যাণ্ডফোর্ডের নির্দেশনায় তেমন কোনো অভিনবত্ব বা মৌলিক চিন্তা না থাকলেও, প্রযোজনাটি সুপরিকল্পনার চিহ্ন বহন করে। মঞ্চসজ্জা স্বল্প অথচ ব্যঞ্জনাময়। শূন্য মঞ্চের বহিঃপরিধি ঘিরে সাতটি উঁচু

ফ্ল্যাট কিছুটা অন্তর ওপর দিকে হেলিয়ে বসানো, মাঝের ফাঁকা জায়গাগুলো কালো পরদায় ঢাকা—এই অঞ্চলগুলি কুশীলবরা প্রবেশ আর প্রস্থানের জন্য ব্যবহার করছিলেন। মঞ্চের একেবারে পেছনে, মাঝখানে, পরদা সরিয়ে একটি প্রবেশদ্বার তৈরি করা হয়েছিল যেটা দিয়ে সাধারণত রাজা এবং তাঁর অনুচরেরা প্রবেশ করছিলেন। এ ছাড়া অন্য যা কিছু রঙ্গবস্তু সবই অভিনেতারা দৃশ্যের ফাঁকে-ফাঁকে হাতে করে বয়ে আনছিলেন—ডাকিনীর জাদুকড়া, ম্যাকডাফের শিশুসন্তানের দোলনা বা বসার আসন। আলোর ব্যবস্থাও কৌশলে করা হয়েছিল। মঞ্চের একেবারে পেছনে মাঝের প্রবেশদ্বারের ওপর দুটি আলো বসানো হয়েছিল, এ ছাড়া মঞ্চের সামনে কিছু আলোর উৎস ও প্রেক্ষাগৃহের কয়েকটি আলো ব্যবহার করে চমৎকার আলো-আঁধারির সৃষ্টি নাটকটির রহস্যময় অন্ধকারের আবহকে মূর্ত করে তুলতে সার্থক হয়েছিল। ডাকিনীর দৃশ্যগুলিতে গন্ধকের ধোঁয়া, ডাকিনীদের কালো পোশাক আর চকখড়ির মত সাদা মুখ অমঙ্গলের উপস্থিতি তীব্রতর করে তুলেছিল। ডাকিনীদের সঙ্গে ম্যাকবেথের দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় যে আত্মারা আবির্ভূত হয় ডাকিনীদের আহ্বানে, তাদের রূপায়িত করতে মুখোশের ব্যবহার প্রশংসনীয়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাজপোশাকে বিদেশী ধরন এক্ষেত্রে অনিবার্য—ব্যাঙ্কোর প্রেত ও ডাকিনী-দের পোশাকে কিছুটা অভিনবত্ব ছিল। স্বল্প আয়োজনে রাজকীয় পরিবেশ সৃষ্টি নির্দেশকের পারদর্শিতার স্বাক্ষরবহ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য প্রয়োজনটির কম্পোজিশন আর ব্লকিং। মঞ্চের বিভিন্ন স্থানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছকমতো সাজিয়েছেন পরিচালক। সাজানো এই ছকে নাটকীয় প্রয়োজন এবং নান্দনিক সচেতনতা —দু-ই বিধৃত। সঙ্গীতের ব্যবহার পরিমিত কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখ্য নয়। পরিশেষে প্রযোজনা-পরিকল্পনা বিষয়ে কয়েকটি অভিযোগ—ব্যাঙ্কোর প্রেতকে ওইভাবে সরাসরি মঞ্চে আনার প্রয়োজন ছিল কি? দৃশ্যটির কেন্দ্রে ম্যাকবেথের অন্তরের যে অপরাধবোধ, যার প্রতিফলন ব্যাঙ্কোর অশরীরী আত্মা, তাকে কি কল্পনার স্পর্শে আরও সার্থকভাবে উপস্থাপিত করতে পারতেন না নির্দেশক? এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের "ম্যাকবেথ" প্রযোজনার এই দৃশ্যটি স্মর্তব্য। ডোনালবেনের চরিত্রাভিনেতার রাজার প্রহরী হিসেবে ফিরে আসা বড়ো চোখে লেগেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে শেকসপীয়রের এই ট্র্যাজেডি বিশেষ অর্থবহ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারত, কিন্তু বিদেশী পরিচালক বা বাংলাদেশী অভিনেতারা প্রযোজনায় সেরকম কোনো ব্যঞ্জনা আনার প্রয়াস করেন নি।

জাতীয় নাট্যমেলার শেষ রজনীতে (১০ই ডিসেমবর) অভিনীত হল নেপালের "স্টুডিও সেভন"-এর প্রযোজনা, ব্রেশটের "থ্রী পেনি অপেরা"। জার্মান নাটকটির ইংরেজি অনুবাদের ভিত্তিতে এই মঞ্চায়ন। দলটির মুখপাত্র বা স্মারকপত্রে কিংবা নান্দীকারের নাট্যমেলার স্মরণিকায় কোথাও উল্লেখ নেই ইংরেজি অনুবাদটি কার। শুনেও ঠিক বোঝা গেল না। অনুবাদের আলোচনায় না গিয়ে তাই সরাসরি প্রযোজনার প্রসঙ্গে চলে আসা যাক। পশ্চিম বাঙলায় ব্রেশট্ প্রযোজনার একটা লম্বা ইতিহাস আছে, বিদেশী নাট্যকারদের মধ্যে ব্রেশট্ই এই বাঙলায় সবচেয়ে বিতর্কিত। তার ওপর নান্দীকার একদিন এই "থ্রী পেনি অপেরা"-র রূপান্তর "তিন পয়সার পালা" মঞ্চস্থ করে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সব মিলিয়ে যাকে বলে ত্র্যহস্পর্শযোগ। ত্র্যহস্পর্শ ঘটেছে "স্টুডিও সেভন"-এর প্রয়াসেও। জার্মান পরিচালিকা ফরাসি, ব্রিটিশ, আমেরিকান, নেপালি ও ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে মঞ্চস্থ করলেন জার্মান নাটকের ইংরেজি অনুবাদ। আর এইসব ত্র্যহস্পর্শের যোগসাজসে ব্রেশটের 'এপিক থিয়েটার' হয়ে দাঁড়িয়েছে নাচে-গানে-আড়ম্বরে চোখ-ধাঁধানো ব্রডওয়ের তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ। প্রস্তাবনা অংশটি, স্বীকার করতে হবে, সুকল্পিত। নিঃশব্দে পরদা সরে যায়, সমস্ত স্টেজ জুড়ে মঞ্চ-সজ্জার ফাঁকে-ফাঁকে দাঁড়িয়ে থাকে ম্যানেকুইনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীরা—নানা ভঙ্গিতে, একপাশে স্টেজের ওপরের অংশ থেকে ঝুলন্ত কাপড়ের পুতুলটির অস্তিত্বে মঞ্চের জীবন্ত মানুষদেরও পুতুল বলে মনে হয়। স্টেজের বাঁদিকে সামনের অংশে সিনথেসাইজার ও বাস গিটারে বেজে ওঠে দ্রুত লয়ের সুর, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নড়েচড়ে ওঠেন, তারপর নাচের ভঙ্গিতে একে-একে বিদায় নিতেই মঞ্চের অন্যান্য আলো নিভে, জ্বলে ওঠে বাজনদারদের মাথার ওপরে একটি আলো। সেই আলোতে যে আধো-অন্ধকার সৃষ্টি হয় তাতে সেট্সের

বিভিন্ন অংশের পুনর্বিন্যাসে সৃষ্টি হয় মি. পিচামের বাড়ি তথা অফিসঘরের দৃশ্য। প্রতিবার সেট্‌স্ বদলের সময়েই হালকা সঙ্গীত বাজতে থাকে। স্লটেড অ্যাঙ্গেল নির্মিত মঞ্চসজ্জার একটা বড়ো সুবিধে স্বল্প অদলবদলেই তা বিভিন্ন আকার নেয়। একই ফ্রেম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভিন্ন তলের ইঙ্গিত সৃষ্টি করা যায়। তৈরি হয় খাবার টেবিল, শোবার খাট কিংবা জেলের সেল। কিন্তু সমস্ত সুবিধে আর অভিনবত্ব সত্ত্বেও এ প্রযোজনায় বড়ো বেশি সময় লাগে সেট্‌স্ বদলে—আকাদেমীর ছোটো মঞ্চ দেখায় আকীর্ণ। মঞ্চের তিনদিকে ওপর থেকে ঝোলানো ধূসর পট, পেছনেরটিতে লনডনের 'সোহো' অঞ্চলের ঘিনজি বাড়ি-ঘরদোর—আকাশে একটি গোল উজ্জ্বল চাঁদ। সমস্ত মঞ্চসজ্জার মধ্যে এই পশ্চাৎপটটিই সবচেয়ে ব্যঞ্জনাময় অথচ একমাত্র দৃশ্যের মাঝখানে ছাড়া অন্য কোথাও এই দৃশ্যপটটির যথাযথ ব্যবহার করা হয় না। মঞ্চ থেকে বাইরে যাতায়াতের পথ হিশেবে ব্যবহৃত হয় দুটি পটের মাঝখানের অংশ ও পশ্চাৎপটের মাঝের একটি ফাঁকা জায়গা। বাজনদারদের ওপর আলোটি ছাড়া প্রেক্ষাগৃহের আলোর উৎসগুলি ব্যবহৃত হয়; তাছাড়া মঞ্চের সামনে কয়েকটি ফুটলাইটও কাজে লাগানো হয়। এছাড়া প্রসেনিয়াম ফ্রেমের ওপর ও নীচের অংশ জুড়ে আছে সারিবদ্ধ রঙিন আলোকমালা—গানের অংশগুলিতে যেগুলি একসঙ্গে জ্বলে ওঠে। এই প্রযোজনার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পোশাক-আশাক চটকদার আর দামি। পারিসীয় মারি কী গার (?) পোশাক-পরিকল্পনায় য়ুরোপীয় পরিধানের ছাঁদ স্পষ্ট। নেপালি পোশাকের ধরন এখানে বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ব্রেশ্‌টের মূল নাটকের প্রায় সবকটি গানই প্রযোজনায় বর্তমান। মূল নাটকের তেমন কোনো সম্পাদনাও করা হয় নি প্রযোজনাটিতে। সঙ্গীতের ব্যবহার বহুল, ব্রেশ্‌ট্-সহকারী কুর্ট ভাইলের সাংগীতিক স্বরলিপি অনুসারী। কিন্তু গায়ক-গায়িকারা অনেক সময়েই বেসুরো। এই সুরহীনতা কি ব্রেশ্‌টের বিখ্যাত "অ্যালিয়েনেশন এফেক্‌ট্"-এর প্রয়োগ? গানের অংশগুলিতে নীল-লাল সবুজ বালব জ্বলে ওঠা আর সাদা সাহেবি পোশাক পরা সূত্রধারের প্রতিটি দৃশ্যের সূচনায় ঘটনার সারাংশ (মূলে যা দৃশ্যের শীর্ষনাম) প্রদান তো অন্তত ব্রেশ্‌টের থিয়েটারের প্রতি আনুগত্যের বিরল নিদর্শন বলেই মনে হল। তাছাড়া ম্যাক্‌হিথের ভূমিকায় পরিচালিকার অভিনয় এবং অন্যত্র নারী-চরিত্র অভিনেতাদের দিয়ে ও পুরুষের ভূমিকা অভিনেত্রীদের দিয়ে করানো হয়তো এই বিযুক্তিকরণের আরেক উপায়। বেশ্যালয়ের দৃশ্যটিতে অভিনেতাদের প্রকৃত অর্থে নারী সাজাতে গিয়ে নির্দেশিকা রুচিহীনতার পরিচয় দেখিয়েছেন। যদি অসংপৃক্তিই কাম্য, তাহলে শুধুমাত্র নারীর পোশাক বা মুখের প্রসাধনই কি যথেষ্ট হত না? একই অভিনেতা-অভিনেত্রীর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়—সংখ্যাল্পতার কারণে না বিযুক্তিকরণের, বোঝা গেল না। ইন্‌স্‌পেকটর স্মিথ, কনস্টেবল, বিবাহ অনুষ্ঠানে পাদ্রীসাহেব—চরিত্রগুলিকে দিয়ে অযথা ভাঁড়ামো করানো হয়েছে। বিবাহদৃশ্যে খাবার টেবিলে রবারের ট্রাউট মাছ বা লবস্টার আর কাগজের লেটুস পাতা চিবানো দৃষ্টিকটু।

সমস্ত নাটকে একমাত্র ভালো অভিনয়ের পরিচয় রেখেছেন সাবিনে লেহ্‌ম্যান। পিচাম খারাপ নন, কিন্তু শ্রীমতী পিচাম, টাইগার ব্রাউন, লুসি বা জেনির ভূমিকাভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অত্যন্ত নিম্নমানের অভিনয় করেছেন। এর মধ্যে শেষোক্ত চরিত্রাভিনেত্রী আকাদেমীর মতো ছোটো প্রেক্ষাগৃহেও দর্শকের শ্রবণাতীত হয়ে থাকেন। পনি পিচাম চরিত্রে জার্মান অভিনেত্রী লুডমিলা হুঙ্গার হুবার মন্দের ভালো। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অক্ষমতায় ব্রেশ্‌টের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ কোথাও-কোথাও পর্যবসিত স্থূল হাস্যরসে। প্রযোজনাটি একটিমাত্র জায়গায় ব্রেশ্‌টের সমালোচনার গভীরতাকে ছুঁতে পারে—ফাঁসিকাঠে যাবার আগে ম্যাক্‌হিম তার শেষ ভাষণে যেখানে বড়ো অপরাধী আর ছোটো অপরাধীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে। তারপরেই সেই বহুখ্যাত সমাপ্তি—পিচাম এগিয়ে এসে সরাসরি দর্শককে উদ্দেশ্য করে ভিন্নতর এক সমাপনের নির্দেশ দেয়—আসে ঘোড়ায় চড়া রাজপ্রতিনিধি—মুক্তি হয় ম্যাক্‌হিথের। এখানে বিযুক্তিকরণের সার্থকতায় পরিচালিকার বিশেষ ভূমিকা নেই, নাট্যকার নিজেই সমাপ্তিটিকে তাঁর উদ্দেশ্যের ও বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে দিয়েছেন।

জাতীয় নাট্যমেলায় জাতীয় সংহতির যে একটা অনুচ্চারিত অথচ স্পষ্ট নির্দেশ থাকে তা "স্টুডিও সেভন"-এর আগমনে একদিক থেকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত, কারণ এই দলটির সংগঠনে আর সদস্য-নির্বাচনে

আন্তর্জাতিকতার প্রতিফলন দেখা গেল। দুঃখ শুধু এই যে, কুড়ি বছরের আন্তর্জাতিক থিয়েটারের অভিজ্ঞতা নিয়েও নির্দেশিকা সাবিনে লেহ্‌ম্যান প্রযোজনাটিকে "আন্তর্জাতিক" মানের করে তুলতে পারলেন না!

২. লোকনাট্যের তিন ধরন

নান্দীকার জাতীয় নাট্যমেলার বৈচিত্র্যের ব্যাপ্তি স্বতঃপ্রমাণিত উদ্যোক্তাদের প্রযোজনা নির্বাচনে। "ম্যাকবেথ" বা "থ্রী পেনি অপেরা"-র মতো "বিদেশ"-গন্ধী, নাগরিক, আড়ম্বরপূর্ণ প্রযোজনার পাশাপাশি তাঁরা উপস্থিত করেছেন একেবারে দেশজ নিরাভরণ দুই নাট্যআঙ্গিক—মধ্যপ্রদেশের "পাণ্ডবানি" এবং মহারাষ্ট্রের "গোন্দড়" লোকনাট্য। এই দুই প্রযোজনাকে পরিপূর্ণ নাট্য হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু নাট্যের শৈশবাবস্থা বিধৃত এই পরিবেশনা দুটিতে। সব নাট্যপ্রেমী আর নাট্যোৎসাহীর কাছে নিঃসন্দেহে এ এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা—শহুরে প্রসেনিয়ামে নাট্যের আঁতুড়ঘর গড়ে তোলা। কোনো-কোনো নাট্যতত্ত্ববিদ বলেছেন মহাকাব্যের কথনের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল আদিনাট্য। "পাণ্ডবানি" আর "গোন্দড়ে"র সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী পরিবেশনা দেখতে দেখতে অনেক নাট্যদর্শকই নিশ্চয় এ তত্ত্বের সমর্থন খুঁজে পেয়েছিলেন। ৬ই ডিসেমবর সন্ধ্যায় ছত্তিশগড়ের সুদূর গনেয়ারি গ্রামের শ্রীমতী তিজনবাঈ উপস্থিত করলেন পাণ্ডবানি আঙ্গিকে "কর্ণার্জুনসংবাদ"। তিজনবাঈ এখন একজন স্বনামধন্যা শিল্পী, কলকাতার কিছু বিদগ্ধ দর্শক ইতিপূর্বে তাঁকে আরও দুবার এ শহরে ঘনিষ্ঠ সভায় পেয়েছেন। তবু আবারও তিনি কলকাতার দর্শকের মনোহরণ করলেন।

একেবারে শূন্য মঞ্চের মাঝখানে সাদা-চাদর-ঢাকা একটি ছোটো চবুতরা, তার ওপর বসেছেন বাজিয়ে আর সঙ্গতকারীরা। বাজনার মধ্যে প্রধান হারমোনিয়াম, ঢোলক, তবলা আর ব্যানজো। এছাড়া প্রধান দোহারের হাতে ছিল ট্যাম্বোরিন-জাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্র। এই চবুতরার সামনের জায়গাটুকুতে ঘুরে-ঘুরে নেচে-নেচে তিজনবাঈ উপস্থাপিত করলেন তাঁর শিল্পকলা। মনে হচ্ছিল যেন ওই কয়েক স্কোয়ার ফুট জায়গা নয়, সমস্ত মঞ্চ অধিকার করে রেখেছেন তিনি। দৃপ্ত পদক্ষেপ, তেজোদীপ্ত কণ্ঠ, উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে তিনি দর্শকের চেতনাকে ভরিয়ে তুলেছিলেন। আশ্চর্য হলাম তাঁর কণ্ঠের ব্যবহার আর মুখের অভিব্যক্তিতে। অত্যন্ত চড়া পরদা থেকে অতি সহজে খাদে নেমে আসে গলা, অনুরণিত স্বরে তিনি বিশেষ-বিশেষ নাটকীয় জায়গায় গায়ে-কাঁটা-দেওয়া মুহূর্ত সৃষ্টি করেন। চোখ কখনো আয়ত, কখনো করুণ, কখনো ধারালো, কখনো বা অর্ধনিমীলিত। সেই সঙ্গে আছে ভুরু আর ঠোঁটের ব্যবহার। নাটকীয় বিরামের (pause) এমন চমৎকার প্রয়োগ খুব কম দেখা যায়। গানের গলাটিও সুরেলা, যদিও সেই সন্ধ্যায় মাঝে-মাঝে দোহারের অতিরিক্ত সাহায্য নিতে হচ্ছিল তাঁকে। একই সঙ্গে কর্ণ, অর্জুন, ভীম থেকে শুরু করে কুন্তী, দ্রৌপদী চরিত্রের রূপায়ণ করছিলেন তিনি। বীরের দার্ঢ্য আর নারীর লালিত্য স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত তাঁর শরীরে। বাঁ হাতের লাল তম্বুরাটিকে ব্যবহার করছিলেন অদ্ভুত সাবলীলতায়—কখনো তা গাণ্ডীব, কখনো দরজা, কখনো ভীমের গদা, কখনো বজ্র বা ধনুকের ছিলা, কখনো রথের রশি অথবা বীরের শরীরের অংশ। অন্য হাতের সরু ধাতব তারটি শুধু তম্বুরা বাদনে নয়, অভিনয়েও ব্যবহৃত হচ্ছিল। কাহিনীকথনের মাঝে-মাঝে দোহারের কণ্ঠের "আইচ্ছা" ও "হোঁ" ধ্বনি পরিবেশনায় বিশেষ মাত্রা যোজনা করছিল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার, দোহারের গলাটি তীক্ষ্ণ আর চাঁছাছোলা। তার ধুয়ার সাহায্যে উপস্থাপনা আরও প্রাণময় হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে, হারমোনিয়ামের সুদক্ষ ব্যবহার বর্ণনার নাটকীয়তাকে করে তুলছিল কখনো ঘন, কখনো তীব্র।

পরিবেশনার কয়েকটি অংশ উল্লেখযোগ্য। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্‌কালে কৃষ্ণের পরামর্শে কুন্তী আর ছদ্মবেশী ইন্দ্র যখন একে-একে কর্ণের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেলেন পরশুরামের পাঁচ বাণ আর জন্মসূত্রে পাওয়া কবচকুণ্ডল, তখন সেইসব অসহায় মুহূর্তে "কর্ণদানী" রূপে তিজনবাঈয়ের অভিব্যক্তি অপূর্ব। ব্রাহ্মণের রূপধারী ইন্দ্রের বেগতিক কথকের ব্যঙ্গে হাস্যোদ্রেককারী। এই অংশে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করে নিতেও ছাড়লেন না

তিজনবাঈ—ইন্দ্রের মতো কলিযুগে যে অনেক "মেক-আপ ব্রাহ্মণ" পাওয়া যায় তা জানিয়ে দিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে যুদ্ধের দৃশ্যের রূপায়ণে শ্রীমতী তিজনবাঈ সিদ্ধহস্ত। 'স-ন-ন-ন' শব্দে বাণ কীভাবে আকাশ অন্ধকার করে তোলে বা 'ঘ-র-র-র' শব্দে রথ কেমন ঘুরে গেল, অথবা গরুড় কীভাবে পাখা বিস্তার করে কর্ণের বাণ নিবারণ করল—এইসব দৃশ্যকে শিল্পী প্রাণময় করে তোলেন কখনো শরীরের ভঙ্গিতে, কখনো দু-হাতের প্রসারণে, কখনো কথায়, কখনো গানে। বর্ণনা যখন চরম উত্তেজনার মুহূর্তে পৌঁছয় কিংবা গভীর আবেগবহ হয়ে ওঠে, তখন তিনি সহজেই চলে আসেন কথা থেকে গানে। ভীমের দুঃশাসনবধ আর দ্রৌপদীর রক্তস্নানের অংশটি দর্শকের চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে কুরুক্ষেত্র-জীবনের ঘটনাবলীকে। দুঃশাসনকে ভূপাতিত করে ভীম যখন তাঁর হস্ত উৎপাটিত করলেন তখন কেমন ঝলকে-ঝলকে তাঁর শরীর থেকে রক্তের ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে তা শিল্পীর হাতের মুদ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে দ্রৌপদী কীভাবে সেখানে পৌঁছোন তা তিজনবাঈয়ের দৃষ্টি, অভিব্যক্তি আর পদক্ষেপের যুগপৎ ব্যবহারে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কর্ণ যখন দুর্বাসার নীল বাণ নিক্ষেপ করলেন অর্জুনের দিকে তখন কৃষ্ণ কেমনভাবে ঘোড়াদের হাঁটু ভেঙে বসিয়ে, রথের মাথা নীচু করে তা ব্যর্থ করলেন, তা তিজনবাঈয়ের অভিনয়ে সুস্পষ্ট, জীবন্ত।

কাহিনীকথনে কর্ণের প্র ত একটি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আছে আর অর্জনের প্রতি আছে এক চাপা অবজ্ঞা। কর্ণের প্রকৃত প্রতিপক্ষ অর্জুন নন, শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁরই কৌশলে মৃত্যুমুখে পতিত কর্ণকে তিনি আশীর্বাদ করেন। লক্ষ করার বিষয়, লোকনাট্যের শিল্পী কেমন করে মূল মহাকাব্যের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন তাঁদের নিজেদের ঐতিহ্যবাহী কাহিনী-অংশ, মৌখিক সাহিত্যের গবেষকদের পক্ষে যা অনুসন্ধানের বিষয় হতে পারে। অর্জনের রথকে দুই পাদ পশ্চাদপসারণ করাতে বাধ্য করার মধ্যে কর্ণের বীরত্বের যা ব্যাখ্যান, তা লোকশিল্পীর নিজস্ব। তেমনি মৌলিক মুমূর্ষু কর্ণের কাছে কৃষ্ণের তাঁর দন্তপাটি প্রার্থনা বা কর্ণের শেষ ইচ্ছা কুমারী ভূমিতে চিতারোহণ এবং কৃষ্ণের নিজের হাতের তালুতে চিতা সাজানোর প্রতিজ্ঞা। কৃষ্ণের স্তবে শেষ হয় পাণ্ডবানির পরিবেশন।

নান্দীকারের দ্বিতীয় জাতীয় নাট্যমেলায় মধ্যপ্রদেশের আরেক পাণ্ডবানি শিল্পী পুনারাম নিশাদ এসেছিলেন তাঁর পরিবেশনা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি "পাণ্ডবানি" নামটি এই লোকনাট্য আঙ্গিকের বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে—পাণ্ডবের কাহিনী তথা পাণ্ডবানি। পুনারামের পরিবেশনা ছিল বসে, কখনো বা হাঁটুর ওপর উঁচু হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে—তাঁর পরিবেশনায় একই জাতীয় আকর্ষণ ছিল। দুঃখের বিষয়, সেবার কলকাতার দর্শক ওই শিল্পীর যথার্থ কদর করতে পারেন নি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন—নাট্যমেলায় এজাতায় প্রদর্শন কেন। আজ অন্তত পাণ্ডবানির প্রতি তাঁদের মনোভাব বদলেছে, অন্তত তিজনবাঈয়ের প্রযোজনায় তাঁরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। অথচ ৮ই ডিসেমবর সন্ধ্যায়, মহারাষ্ট্রের পরবনী জেলার একশ এক বছর বয়স্ক শিল্পীর কলাপ্রদর্শনে তাঁদের অসহিষ্ণু ও অশোভন ব্যবহার কলকাতার লজ্জা হয়ে উঠেছিল। প্রশ্ন জাগে, পাঁচটি নাট্যমেলার পরেও কি কলকাতার দর্শকের মন ভিন্ন প্রাদেশিক প্রতিভাকে গ্রহণে অপারগ? শতোর্ধ্ব শিল্পীর প্রতি সামান্যতম শ্রদ্ধাও তো তাঁরা দেখতে পারতেন প্রেক্ষাগৃহে থেকে উঠে না গিয়ে, প্রদর্শন চলার সময় গুঞ্জন বন্ধ করে। প্রসঙ্গত নান্দীকার গোষ্ঠী বিচক্ষণতার পরিচয় রেখেছেন এই দুটি পরিবেশনার আয়োজনে, প্রেক্ষাগৃহের আলো জ্বালিয়ে রেখে। এজাতীয় প্রযোজনায় দর্শকের সহভাগ অত্যন্ত প্রয়োজন, যতটা দর্শকের পক্ষে, ততটা শিল্পীর পক্ষেও বটে।

পাণ্ডবানি যেমন শুধুমাত্র মহাভারতের কাহিনীর পুনঃকথন, তেমনি গোন্দড় পুরাণনির্ভর আখ্যানের বিবরণ। রাজারাম ভউ তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে দুটি আলাদা কাহিনী বর্ণনা করলেন—"রাধাবিলাস" ও "জম্বুরা উপাখ্যান"। এক্ষেত্রেও মঞ্চ নিরাবরণ, শুধু মঞ্চের ডানদিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে অদ্ভুত এক ত্রিকোণাকৃতি চারদিক-খোলা মণ্ডপ, তার মধ্যে সম্ভবত অম্বাদেবীর ঘট ও ছবি। একপাশে পাটকাঠিতে এক বিচিত্র মশাল জ্বলছে। নান্দীকারের পক্ষ থেকে শ্রীমতী স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত পূজার ঘট থেকে সিঁদুরের টীকা শিল্পীদের সবার কপালে পরিয়ে দিলে অনুষ্ঠান শুরু হল। মঞ্চে রাজারাম ভউ ছাড়া ছিলেন আরও পাঁচজন। একজনের ভূমিকা শুধু মণ্ডপটির সামনে বসে থাকা। বাকি চারজন (এখানে বলে রাখা দরকার শিল্পীরা সবাই রাজারামের পরিবারভুক্ত

—কেউ ছেলে, কেউ ভাইপো, কেউ নাতি) সবাই প্রযোজনাটিতে যোগদান করলেন নেচে, গেয়ে, বাজিয়ে। রাজারাম ছাড়া অন্যদের সকলের হাতে ছিল কোনো না-কোনো বাদ্যযন্ত্র—খঞ্জনী, বাদকের গলায় ঝোলানো ঢাকজাতীয় যন্ত্র, দোতারা আর ট্যাম্বোরিন।

শুরুতেই গণপতিবন্দনা ও সম্প্রদায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অম্বার স্তুতি। তারপর মূল কথন। "রাধাবিলাস"-এর কথাবস্তু অভিনব। যশোদার কোলে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ ; যশোদা শিশু কৃষ্ণকে একা নিজের করে রাখতে চান, কিন্তু শ্রীরাধিকা খবর পেয়ে এলেন কৃষ্ণকে দেখতে—তাঁকে কোলে করে অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন তাড়াতাড়ি বড়ো হয়ে ওঠার জন্য যাতে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে প্রেমলীলায় মাততে পারেন। শেষ পর্যন্ত রাধা মন্দিরে গিয়ে ফুল এবং যথাযথ উপচার দিয়ে পূজা করলে শিশু কৃষ্ণ যুবকরূপ ধারণ করলেন। শ্রীরাধিকা আর কৃষ্ণের মিলন হল।

ঘুঙুর পায়ে, মাথায় বিরাট সাদা পাগড়ি চাপিয়ে, ধুতির ওপর ছোটো-ছোটো-কুঁচি-দেওয়া বিশাল ঘেরের আলখাল্লা পরে সঙ্গীতের সঙ্গে নেচেগেয়ে রাজারাম উপস্থিত করলেন এই কাহিনী। কোমরের চাদর মাথায় দিয়ে তিনি কখনো হলেন যশোদা, কখনো শ্রীরাধা। শ্রীরাধা সেজে আলখাল্লার একদিক উঠিয়ে, চাদরের আঁচলে জড়িয়ে আদল দিলেন শিশু কৃষ্ণের। তারপর তাকে কোলে নিয়ে দুলিয়ে-দুলিয়ে কত আদর, কত কথা আর গান। তিজনবাঈ সেজেছিলেন মহাভারতের বীর, তেজোদীপ্ত পুরুষ। একশ এক বছরের রাজারাম সাজলেন লাস্যময়ী তরুণী। জোড়া-ঢাক-বাদক বয়সে তরুণ, গলাটি পরিষ্কার, কথন এবং গায়নে রাজারামকে সাহায্য করছিলেন তিনি। অভিনয়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর হাতের জোড়া-ঢাকটি তিজনবাঈয়ের সঙ্গী হারমোনিয়ামের মতোই নাটকীয় মুহূর্ত-গুলিকে জীবন্ত করে তুলছিল। চাপান-উতোরে রাধাকৃষ্ণের কথোপকথন চলছিল রাজারাম আর এই প্রধান দোহারের মধ্যে। তিজনবাঈয়েব মতো এক্ষেত্রে শুধু ধুয়া ধরা নয়, সংলাপ বিনিময় সাথীদের সঙ্গে। অর্থাৎ এই কথকতা নাট্যের আরও এক ধাপ নিকট। গানের চমৎকার ছোটো-ছোটো কাজে নাচছিলেন রাজারাম—কখনো ঘুরতে-ঘুরতে ঘাগরার মতো আলখাল্লা চারপাশে ছড়িয়ে বসছিলেন মঞ্চের ওপর।

দ্বিতীয়ার্ধের "জম্বুরা উপাখ্যান" মহাভারতের চরিত্রদের কেন্দ্র করে রচিত। শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন হস্তিনাপুরে, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীসহ বনে বেড়াতে গিয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে ফল খেতে চাইলেন। ভীম পেড়ে আনলেন একটি জম্বুরা ফল। কিন্তু ফলটি দেখে শ্রীকৃষ্ণের (দ্রৌপদীর) মনে হল ফলটি আবার তার বৃন্তে ফিরে যেতে চাইছে। কৃষ্ণ জানালেন, পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর ভক্তি আর ইচ্ছাশক্তির জোরে তা সম্ভব। কিন্তু পাণ্ডবভ্রাতাদের কারও ইচ্ছাতেই ফল মাটি থেকে এক সওয়া হাতের বেশি উঠল না। অবশেষে দ্রৌপদীর ভক্তির জোরে তা প্রায় বৃন্তের কাছাকাছি গিয়ে থেমে রইল। দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণের কাছে স্বীকার করলেন—পঞ্চস্বামী বর্তমানে ক্ষণেকের জন্য কর্ণকে ভালো লেগে যাবার পাপেই এই ব্যর্থতা। দ্রৌপদীর অপরাধস্বীকারে সঙ্গে-সঙ্গে ফল গিয়ে বৃন্তে জোড়া লাগল, কিন্তু উলটো হয়ে—সেই থেকে জম্বুরা ফল বৃন্ত থেকে উলটো হয়ে ঝোলে। এই উপাখ্যান দ্বারা প্রমাণ হল দ্রৌপদীই শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ ভক্ত। অম্বাবন্দনা দিয়ে সমাপ্ত হল রাজারাম ভউয়ের পুরাণকথন।

এই অর্ধে কাঁধের রঙিন চাদরটি কোমরে ঘাগরার মতো বাঁধলেন রাজারাম, তার ওপর বাঁধলেন আর-একটি চাদর। দর্শক-শ্রোতাদের সুবিধের জন্য আর মারাঠি উপভাষায় নয়, যথাসম্ভব হিন্দিতে কথনের চেষ্টা করছিলেন রাজারাম আর তাঁর সঙ্গীরা। কিন্তু তাদের পরিবেশনার স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার কিঞ্চিৎ হানি ঘটছিল। তিজনবাঈ আর রাজারাম নাট্যশিল্পী হিসেবে এইজন্য আরও শ্রদ্ধেয় যে তাঁরা কখনোই দর্শকের আনন্দোপলব্ধির কথা ভুলে যান না। যারপরনাই চেষ্টা করে দর্শক-শ্রোতাকে মাতিয়ে রাখেন—কারণ সেখানেই তাঁদের শিল্পের সার্থকতা। পরিশেষে একটি মন্তব্য না করে পারছি না। বাঙলা থিয়েটারের শিল্পীরা এই প্রযোজনা থেকে শিখে নিতে পারেন সমবেত অভিনয় কাকে বলে ; প্রদর্শনের একটি বিশেষ মুহূর্তে রাজারাম যখন হঠাৎ কাশির দমকে অক্ষম, তখন তাঁর পেছন থেকে এগিয়ে এসে সঙ্গী বাজনদার নেচে-গেয়ে আসর মাত করলেন, অন্যদিকে প্রধান দোহার করে চললেন বর্ণন। সম্প্রদায়ের যৌথ নাট্য বোধহয় একেই বলে।

৯ই ডিসেমবর সন্ধ্যায় কলকাতার নাট্যপ্রেমীদের প্রিয় নাট্যপ্রযোজক হাবিব তনবির ও তাঁর ছত্তিশগড়ি

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংগঠন "নয়া থিয়েটার" অভিনয় করলেন লোককথাভিত্তিক "সোনে সাগর চন্দাইনি"। এ নাটকের বিষয়বস্তু সম্ভবত ছত্তিশগড়ি লোককথা থেকে আহৃত। হিন্দি রোমানটিক কাব্যধারার "লোর-চন্দ্রানী" পাঁচালিকাব্যের ছায়া আছে এর ঘটনাবলীতে। কাহিনীর মূলসূত্র লোককথার চির-পরিচিত বিষয়—যোগ্য পুরুষের নারীধন এবং গাভীধন প্রাপ্তি। লোককথায় মূল নারীচরিত্রের যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তা উপস্থিত এই কাহিনীটিতেও। হাবিব তনবিরের সাম্প্রতিক অন্যান্য প্রযোজনার মতো এই প্রযোজনাটিও ছত্তিশগড়ি লোকনাট্যনির্ভর—নাচে, গানে, বাজনায় ভরা।

মঞ্চের বাঁদিকে একেবারে সামনে একটা শতরনজির ওপর বসেন বাজনদারেরা—প্রধান বাদ্যযন্ত্র হারমোনিয়াম, ঢোলক, তবলা আর খঞ্জনী। বাজনদারদের মধ্যে কয়েকজন গানের কোরাসে গলা মেলান, আবার কখনো উঠে গিয়ে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয় শুরু হয় শিবের স্তব এবং গণপতিবন্দনা দিয়ে। তারপর প্রবেশ করে চন্দাইনি কাহিনীর কথক। বাজনার তালে-তালে সুদক্ষভাবে নেচে-গেয়ে তিনি কাহিনীর প্রথমার্ধের সারাংশ পরিবেশন করেন। সমস্ত নাটকে এই তাঁর একমাত্র ভূমিকা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তিনি আবার তাঁর আসর-জমানো নাচ-গান নিয়ে ফিরে আসেন ভনিতাটুকু উপস্থিত করতে। নাট্যাংশের বিবরণে এই 'চন্দাইনি-নর্তক'কে সাহায্য করতে আছেন দুজন সূত্রধার, যাঁরা নাটকে বারবার ফিরে আসেন—কখনো গল্পের সূত্রটুকু দর্শককে ধরিয়ে দিতে, কখনো বিশেষ কোনো চরিত্রে অভিনয় করতে। নাটকের শুরুতেই কাহিনীর আরম্ভ বর্ণনা করে তাঁরা ঠোকা লাঠি নিয়ে দুই প্রধান চরিত্র কাঠাইত ও কুভিয়া সেজে অভিনয় করতে শুরু করেন। এ ছাড়া, নাটকের অন্যান্য অংশে তাঁদের পাওয়া যায়—কখনো লাঠিয়াল রূপে, কখনো গৌণ চরিত্রে বা বিবাহের শোভাযাত্রায়। কাহিনীকথনে 'চন্দাইনি-নর্তক' ও সূত্রধার দুজনকে সাহায্য করেন নারী-পুরুষে মেলানো একটি ছোটো দল। এঁরা মূলত গানেই কাহিনী-অংশ বর্ণনা করেন। এঁদের মধ্যে থেকে অনেকে মাঝে-মাঝেই নাটকের চরিত্র হয়ে অভিনয়ে যোগ দেন। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, বা বলা ভালো ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে, এঁরাই দর্শককে নিয়ে যান তাঁদের গানের মাধ্যমে। নাট্যাভিনয় এবং কাহিনীবর্ণনের এই মিশ্রণটি অত্যন্ত আকর্ষক।

লোকনাট্যের অনাভরণ সারল্যের সঙ্গে এ নাটকের মঞ্চসজ্জা ছিল মানানসই—সামান্য কিন্তু কল্পনাসমৃদ্ধ। কয়েকটি ক্যাম্বিসের চৌকো খাটিয়া আর দু-তিনটি ট্রাঙ্কের অবস্থান অদল-বদল করে নিয়ে মঞ্চকে কখনো বাহির, কখনো অন্দরের রূপ দেওয়া হচ্ছিল। এর সঙ্গে ছিল ছোটখাটো ব্যঞ্জনাময় রঙ্গবস্তু যা সহজেই স্থানের একটি বিশিষ্ট রূপ নির্মাণে সাহায্য করছিল। চন্দার ঘরকে লোরিকের দু-ঘরের কুঁড়ের থেকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল, আবার বাওয়ানের বাড়িও যে সানওয়ারের বাড়ির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তা শুধুমাত্র মঞ্চসজ্জার সামান্য হেরফেরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মঞ্চসজ্জার সবচেয়ে কল্পনানির্ভর, ব্যঞ্জনাময় ও সার্থক ব্যবহার শেষ দৃশ্যে যেখানে মঞ্চের মাঝামাঝি একদিকে দুটি খাটিয়া ও আরেকাদকে কিছু তফাতে আরেকটি রেখে নদীর পাড় তৈরি হল। দর্শক সহজেই মেনে নিলেন মাঝের অংশটি নদী। পুরো আলোতে নাটকের চরিত্ররাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধান সূত্রধার দুজন, মঞ্চসজ্জার পরিবর্তন করছিলেন। সমস্ত নাটকটি উজ্জ্বল আলোতেই অভিনয় হয়েছে, কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত আর রাত্রির দৃশ্য ছাড়া আলোর তেমন কোনো কারুকাজ ছিল না। পোশাকে ছত্তিশগড়ি মানুষের দৈনন্দিন পরিধানের ছাপ। সমবেত নাচগানের সময় অভিনেতাদের পোশাকের রঙে সারা মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠছিল। নাচে এবং গানে হাবিবের অন্যান্য প্রযোজনার মতোই, ছত্তিশগড়ি লোকনৃত্য আর লোকগীতের প্রভাব। এর মধ্যে এমন একটা প্রাণ আছে যা সহজেই দর্শকের চোখ আর মন দুইই ভরিয়ে তোলে, যদিও ক্ষণিকের জন্য। "চরণদাস চোর"-এর মতো এ নাটকে নাচের আধিক্য ছিল না কিন্তু বিবাহের শোভাযাত্রায় দৃষ্টি-নন্দন আয়োজন ছিল, ছিল লাঠিখেলা। এই খেলায় ছত্তিশগড়ি চৈতরাম যতটা পারদর্শী শহুরে দীপক তেওয়ারি ততটা নন। সেটা বেশ চোখে লেগেছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে লাঠিখেলায় কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? এই প্রসঙ্গে বলা যায়, হাবিব তনবিরের কয়েকটি প্রযোজনা দেখে অনেক সময়ে মনে হয়েছে দর্শকের মনোরঞ্জনের দিকে তাঁর যতটা মনোযোগ, নাট্যবিষয়ের গভীরতার প্রতি তত নয়। এ নাটকে অবশ্য দু-এক জায়গায় ঘুষের

আদানপ্রদান, রাজারাজড়াদের অসততা বা সাধারণ মানুষের সারল্য বিষয়ে তির্যক মন্তব্য করার চেষ্টা রয়েছে, কিন্তু "চরণদাস চোর"-এ লোকনাট্যের সারল্য ও প্রাণবন্ত আঙ্গিকের সঙ্গে আধুনিক সমাজসমালোচনার যে মণিকাঞ্চনযোগ ঘটেছিল তা "সোনে সাগর"-এ অনুপস্থিত। এই প্রযোজনায় অভিনবত্বের অভাব নেই, শিঙ লাগিয়ে চাদর ঢেকে মানুষের মহিষ সাজা, পুরষদের নারীচরিত্রে অভিনয়, ছোট ছেলেকে সোনালি চাদর দিয়ে মুড়ে হাতের ওপর উলটো করে ধরে সদ্যোজাত বাছুর সাজানো, মঞ্চের ওপরই জামাকাপড় বদলে নিয়ে একটি চরিত্র থেকে অভিনেতার অন্য চরিত্রে পদার্পণ, মঞ্চের মাঝে গাছের গুঁড়ির কাটা অংশের ওপর দাঁড়িয়ে গাছে চড়ার ব্যঞ্জনা উঁচু কাঠের ব্লকে উঠে পাঁচিল টপকানো, বাওয়ানের উড়ন্ত বাণের গতি বোঝাতে জনৈক অভিনেতার বাণ হাতে করে ছুটে যাওয়া—কলকাতার দর্শকের নাগরিক-মন-মাতানো এরকম আরো কত উপাদান। কিন্তু অভিনয়শেষে এই প্রযোজনা আমাদের উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে কি? প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরোতে না বেরোতে চটকদার লোক-নাট্যের নতুনত্ব ফিকে হয়ে আসে না কি? তিজনবাঈ বা রাজারাম ভউ সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ওঠে না, কারণ তাঁরা লোকশিল্পী। কিন্তু যখন হাবিব তনবিরের মতো একজন আধুনিক নাট্যপ্রযোজক, যিনি সমকালীন জীবনের জটিলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন, লোকনাট্যের মাধ্যম ব্যবহার করেন তখন তাঁর কাছ থেকে আমরা আর-একটু বেশি কিছু নিশ্চয়ই আশা করতে পারি।

লোককথা-নির্ভর লোকনাট্যের সরলতায় অভিনয়ের বিশেষ সুযোগ থাকে না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আগেও যেমন এবারও তেমনি 'নয়া থিয়েটার'-এর শিল্পীদের অভিনয়ে মুগ্ধ হলাম। সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা, মঞ্চকে মনে হয় এঁদের ঘর-বাড়ি। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই এঁদের বলনে-চলনে, অভিব্যক্তিতে। স্বভাব অভিনেতার জাত এঁরা। এ প্রযোজনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাওয়ানের ভূমিকায় গোবিন্দরাম, চন্দার ভূমিকায় পুনম, বুড়ি বোধরাইনের ভূমিকায় চরণদাস চোরের প্রথম ভূমিকাভিনেতা আনেশ, একাধারে মউহার রাজার পরিচারক, বাধিয়া আর মন্দাইনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ ভুলুয়ার অভিনয়। অল্প আয়াসে এঁরা লোকনাট্যের চরিত্রগুলিকে করে তুলেছেন জীবন্ত। প্রযোজনার দু-একটি অংশে অভিনেতারা দর্শককে সরাসরি উদ্দেশ্য করে কথা বলে তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সৃষ্টি করেন। এইভাবে যোগাযোগসৃষ্টি অবশ্য ভারতীয় লোকনাট্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের লোকনাট্যে শহুরে থিয়েটারের মানুষদের মনকে যেটা সবচেয়ে বেশি টানে তা এর আঙ্গিকের তারল্য ও সহজতা। চন্দা ও লোরিক যখন গ্রাম ছেড়ে পালায় তাদের দীর্ঘ যাত্রাপথ শুধুমাত্র কয়েকবার মঞ্চকে এধার থেকে ওধার অতিক্রম করার মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কল্পনাশক্তির চরম ব্যবহার দেখা যায় দৃশ্য থেকে দৃশ্যে—কাপড়-ঘেরা কাঠের ফ্রেমকে পালকি হিসেবে উপস্থাপনার মধ্যে, গতিময় বাণকে ছুটন্ত মানুষের বয়ে নিয়ে যাওয়ায় কিংবা কোনো-কোনো অংশে বাস্তব উপকরণ বাতীত আঙ্গিকাভিনয়ে। লোকনাট্যের এই সজীবতাই "সোনে সাগর চন্দাইনি"-র মতো প্রযোজনার কাছ থেকে কলকাতার নাট্যোৎসাহী ও নাট্যকর্মীদের পরম প্রাপ্তি।

[শেষাংশ পরের সংখ্যায়

স্মরণে

রবীন সুর : পরিব্রাজকের প্রস্থান

কামাল হোসেন

খুব কাছের আর চেনা কোনো মানুষ হঠাৎ চলে গেলে শূন্যতাটুকু অনুভব করতেই অনেকখানি সময় চলে যায়। তখন শুধু পিছু ফিরে তাকানো। টুকরো-টুকরো স্মৃতি এবং অনিবার্য বেদনাবোধে আচ্ছন্ন থাকা ছাড়া আর কীইবা করা যায়।

রবীন সুর মারা গেলেন। ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৮। রাত ১টায়। এমন কিছু বয়স হয় নি। ৫৩ বছর। সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল। খুব একটা অসুখবিসুখে ভুগতেন না। মাঝরাত্তিরে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক। কিছুই করার ছিল না। নিজের বহু-ব্যবহৃত শয্যাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তিনি ছিলেন এই সময়ের বাঙলা ভাষার একজন উল্লেখ-যোগ্য কবি। বেশি চিৎকার-চ্যাঁচামেচি বা উৎকট আত্ম-প্রচার করতে তাঁকে কেউ কখনো দেখে নি। বরং তাঁর নিজস্ব স্বভাবের শান্ত, বিনয়ী ব্যক্তিত্বটুকু খুব সহজেই আকর্ষণ করত চারপাশের মানুষকে।

নিজের কবিতার ওপর ছিল অপার মমতা। সব কবিরই থাকে। কিন্তু আর-সকলের সঙ্গে রবীনের বড়ো পার্থক্য—আজকের এই মিডিয়া-নির্ভর সাহিত্যসাধনার রঙ্গমঞ্চে তাঁর নিজের সৃষ্টির ওপর ছিল অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা। এটুকু আত্মমর্যাদা নিয়েই নিজস্ব কবিকৃতির একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্মাণ করতে পেরেছিলেন তিনি।

মৃত্যুর পর এত কাছাকাছি সময়ে তাঁর কবিতার মূল্যায়ন নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। মহাকালের নির্মম কষ্টিপাথরে নির্বাচিত হওয়ার জন্য দরকার হয় কিছুটা সময়ের দূরত্ব। সাহিত্যের ভালো-মন্দ বিচারের প্রক্রিয়া বড়ো জটিল আর দুরূজ্ঞেয়।

তবু খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনার পরিসরে বলা যায়, পৃথিবীর অনেক ঋতুর জল-বায়ু, রৌদ্র-ছায়া অতিক্রম করে একটি স্বনির্মিত পথ ধরে তিনি হেঁটে আসছিলেন। স্মারকস্তম্ভে কোনো অমর অক্ষর লেখা হল কিনা, সেদিকে তাকানোর মতো অবকাশ কখনো পান নি। জানতে ইচ্ছে করে, অনন্তের সঞ্জীবনী সুধাভাণ্ডের সন্ধান কি তিনি পেয়েছিলেন? সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো এখুনি পাওয়া যাবে না। তবে একথা ঠিক, একজন সত্যিকারের সৃষ্টিশীল প্রতিভাবান মানুষের মতো তাঁর অন্তরে ছিল এক অপরিসীম তৃষ্ণা এবং অন্বেষণ। কোথাও তিনি পৌঁছতে চেয়েছিলেন। হয়তো প্রকৃতির কাছে। হয়তো মানুষের কাছে। কিংবা কোনো নৈরাশ্যের নির্বাণী প্রভাবে একমাত্র কবিতার মধ্যেই পেতে চেয়েছিলেন গন্তব্যের অভীষ্ট উত্তরাধিকার। ছন্দ এবং চিত্রকল্পের স্বকীয় প্রয়োগে তিনি ছিলেন সমসাময়িক কবিদের থেকে একেবারে ভিন্ন চরিত্রের।

প্রায় বছর কুড়ি ধরে তাঁর কবিজীবনে প্রকাশিত হয়েছে বারোটি কাব্যগ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য বইগুলির নাম: অন্তর্গত নদী, আনুষঙ্গিক আর্তনাদ, রাবণের সিঁড়ি, ল্যানটেনা ক্যামেরা, তেজস্ক্রিয় ঘেরাটোপ, শীতবসন্তের কবিতা, পুনর্জন্ম চাই, গোধূলি বারান্দার কুশীলব, মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি, পরিব্রাজকের ভিক্ষা। বেনজামিন মোলয়েজকে নিয়ে একটি কবিতাসংকলনের সম্পাদনা করেছেন। সামনের বইমেলায় দুটি কাব্যগ্রন্থ বেরোবার কথা আছে।

চতুরঙ্গের সঙ্গে রবীন সুরের সম্পর্ক ছিল খুব নিবিড়। মাঝে-মাঝে চলে আসতেন। খোলা গলায় অদ্ভুত সারল্য-মাখা কথাবার্তা আমাদের মুগ্ধ করত।

ভাটপাড়ায় থাকতেন। পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন। পারিবারিক জীবনে রেখে গেলেন স্ত্রী আর একমাত্র পুত্রকে।

তরুণ কবিদের সঙ্গে ছিল অভিন্নহৃদয়ে সম্পর্ক। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের লড়াকু সৈনিকদের একই যুদ্ধের সহযোদ্ধা ভাবতে ভালোবাসতেন। কবিতার আসরে তাঁকে পাওয়া ছিল এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। কফি হাউসের জমাটি আড্ডায় রবীন সুরকে অনেকের মনে থাকবে।

এই মুহূর্তে রবীনের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন বিশেষভাবে মনে পড়ছে:

> জীবন জানে কতটা মৃত কতটা আছি বেঁচে
> বাঁচাটা আজ বঞ্চনার কুটিল নাগপাশে:
> ফেনা উঠছে ক্লান্ত মুখে শিরদাঁড়াটা বাঁকা,
> তাও নিভলো দমকা হাওয়ার সমূহ সর্বনাশে!
>
> (জীবনের মুখ থেকে মৃত্যুসংবাদ)

KESHARI STEELS

(Mini Steel Plant & Steel Rolling Mills)

(A Unit of The Reliance Jute & Industries Ltd.)

Regd. Office : 9, BRABOURNE ROAD, CALCUTTA-700 001

Quality you can trust

TOR-40 & TOR-50

Manufacturers of

Torsteel Round Bars and Quality Steel Billets of Carbon & Alloy Steels

PLANT :
Industrial Area No. 1,
Agra-Bombay Road.
Dewas-455 001 (M.P.)
Tel. : 2160, 2213, 2835
Telex : 0732-220 KSRI IN
Gram : KESRISTEEL

BRANCH OFFICE :
Famous Cine Building,
20, Dr. E. Moses Road,
Mahalaxmi,
Bombay-400 011
Tel. : 4937908
4922710 (4 Lines)
Telex : 011-76259 CINE IN

SALES OFFICE :
(1) 64, Loharmandi,
Indore-452 001 (M.P.)
Gram : KESRISTEEL
Tel. : 60414, 62839
Telex : 0735-354 RELY IN

(2) B-4, Shiv Marg,
Bani Park,
Jaipur.

AGENTS :
Hindustan Dealers Ltd.,
Stringer Street,
Madras-600 018
and
Kempegowda Road,
Bangalore-560 009

Postal Regd. No. WB/CC-435 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57 প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা

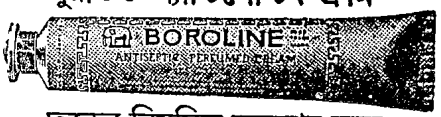
রোজই দেখি দাড়ি কামানোর শেষে চড়চড়ে
মুখ, মাঝে মাঝে টুকটাক কেটে যাওয়ার দাগ।
রোজই ভাবি—ভাগ্যিস্ বোরোলীন আছে।

রোজ সকালের সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরোলীন

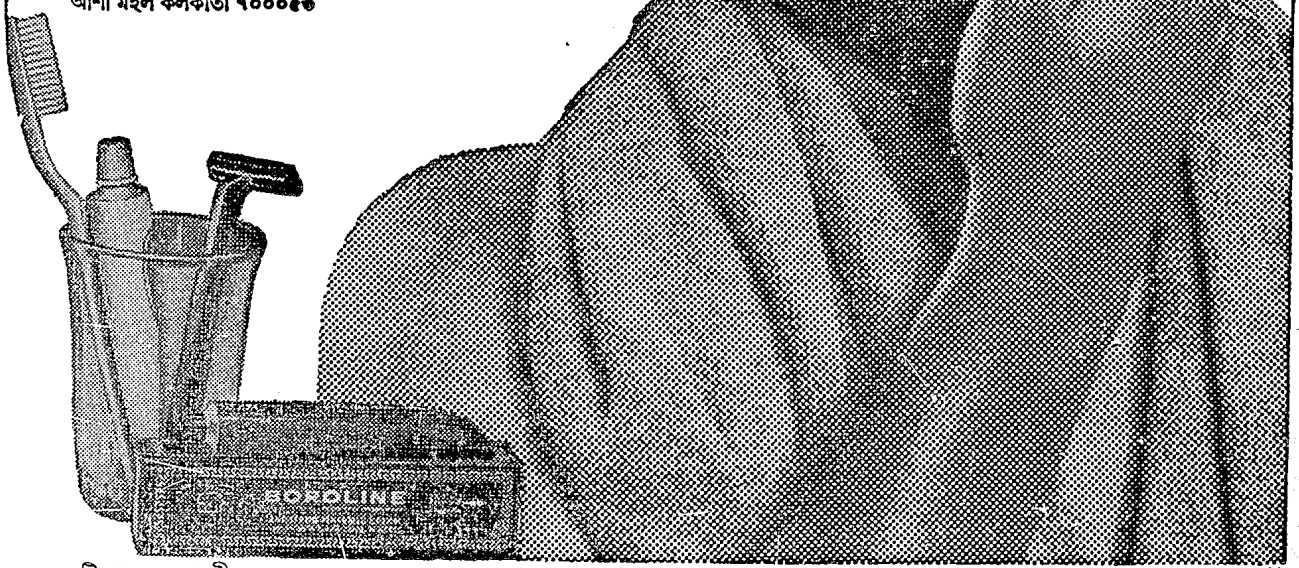
সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম



ত্বকের নিয়মিত সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম



জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩



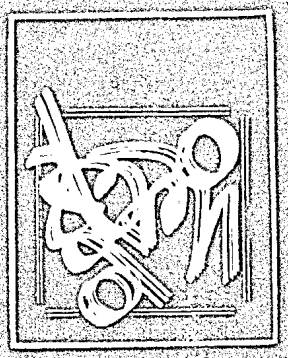
এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়।

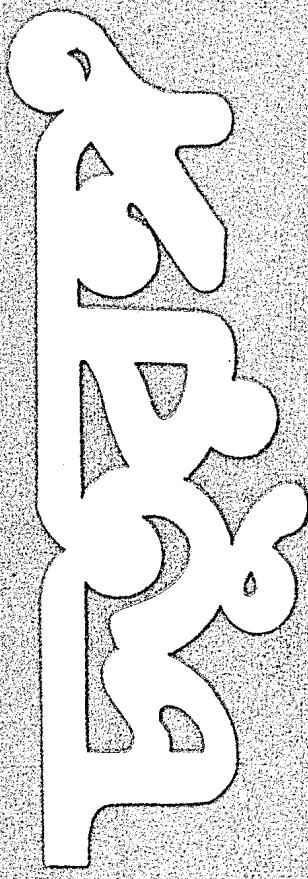
Response 1103

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ দশম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯





ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় (১৯৪৫-৪৭) নিয়ে প্রামানিক তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক সুনীল সেনের সারগর্ভ আলোচনা।

১৮৫৫ সালের বিদ্রোহের পর সাঁওতালদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার যেসব পরিবর্তন শুরু হয়েছিল "ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন" নিবন্ধে আলোচনা এবার তাই নিয়ে। ঝাড়খণ্ডীদের বর্তমান তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

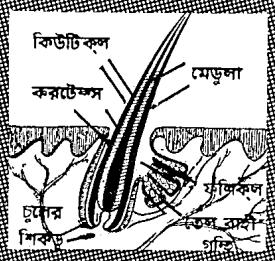
দেশের বিপুল শ্রমশক্তিকে অকেজো রেখে শিল্পকাঠামো এবং প্রশাসনের নানা স্তরে যেরকম দ্রুত হারে কমপিউটারের প্রয়োগ হচ্ছে তা অগ্রগতি না ঘটিয়ে কিভাবে দেশকে অধোগতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে কমলেন্দু ধরের "ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকসের প্রাসঙ্গিকতা" নিবন্ধে থাকছে তারই তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ।

প্রখ্যাত ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, সুলেখক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সামগ্রিক সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছেন সমীর ঘোষ।

আজহারউদ্দিন খানের গ্রন্থসমালোচনাভিত্তিক আলোচনায় থাকছে কাজী আব্দুল ওদুদের সৃষ্টির নূতন মূল্যায়ন।

অসমীয়া কবিতা নিয়ে ড. সৌমেন সেনের আলোচনা।

চুলের যত্নের



গোড়ার কথা

ত্বকের ভেতরের সূক্ষ্ম ধমনী এবং তৈলস্রাবী গ্রন্থিগুলো যখন আর ঠিকমত চুলের গোড়ায় পুষ্টি যোগাতে পারে না, তখনই দেখা দেয় চুলের নানা উপসর্গ। চুলের জেল্লা নষ্ট হয়ে চুল হয় ভঙ্গুর। যাঁদের চুল দীর্ঘ, তাঁদের চুলের ডগা ফাটতে শুরু করে।

চুলের সর্বাঙ্গীণ পরিচর্যায় ক্যান্থারাইডিন অতুলনীয়। এর বিশেষ উপাদান ক্যান্থারিস পতঙ্গের দেহচূর্ণ সেরা হেয়ার কন্ডিশনার হিসাবে বহুকাল ধরে সুন্দরীদের পছন্দ।

রোজ ঘষে ঘষে চুলে মাখুন ক্যান্থারাইডিন। এতে চুলের গোড়া পুষ্ট হবে, এক রাশ ঘন চুলে মাথা ভরে উঠবে। আর ত্বকের অনেক গভীরে গিয়ে মস্তিষ্ক সজীব ক'রে তুলবে বলে অনেক বয়স পর্যন্ত চুল পাকবে না।

ক্যান্থারাইডিন রোজ মাখুন, চুল সজীব সুস্থ রাখুন!



ক্যান্থারাইডিন

হেয়ার অয়েল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
(ভারত সরকারের উদ্যোগ)

ARTIG 671

With best compliments of

MINE SAFETY APPLIANCES LIMITED

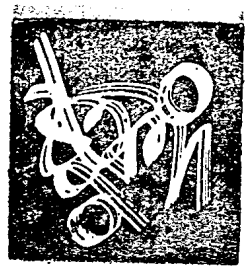
P-25, TRANSPORT DEPOT ROAD
CALCUTTA-700 088

Phones : 49-1707/45-9773/49-1657/45-6904
Telex : 021-8066 MSAI IN
Cable : MINSAF, Calcutta

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থ,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শীলা





বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ১০
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯
মাঘ ১৩৯৫

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুনীল সেন ৮৪৫
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৮৫০
বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি সুধীর সেন ৮৭০
ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা কমলেন্দু ধর ৮৮০
বিষয়: ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৮৯২

কেন সাজাও কিরণশঙ্কর মৈত্র ৮৬৬
ভাসান দেবী রায় ৮৬৭
পুরনো শব্দ অজয় নাগ ৮৬৮
পৃথিবী যখন হিরোশিমা হোসাইন কবির ৮৬৯

গ্রন্থসমালোচনা ৮৯৮
আজহারউদ্দীন খান, সৌমেন সেন, পরিমল চক্রবর্তী,
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, কামাল হোসেন

চিত্রকলা ৯১৬
চিত্রী-ভাস্কর দেবীপ্রসাদ সমীর ঘোষ

মতামত ৯১৯
অনিন্দ্য সেন, কল্যাণকুমার দত্ত

নাটক ৯২৪
বিবিধের মাঝে মিলন অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

While purchasing Hessian, Sacking, Yearn and Decorative Furnishing Fabrics & other Jute Products, please insist on quality product.

We are always ready to meet the exact type of your requirement.

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.

(*UNIT :* AUCKLAND JUTE MILLS)

"KANKARIA ESTATE"
6, Little Russell Street
Calcutta-700 071

Telephones : 29-2621
29-2623
29-7199
29-7698
29-7710

Cable : SWANAUCK, CALCUTTA
Telex : 21-2396 AUCK IN
Codes : BENTLEY'S SECOND

REGISTERED OFFICE & JUTE MILL AT **JAGATDAL**
24-PARGANAS, PHONES : BHATPARA 2757, 2758 & 2038

আমরা গড়বো বক্রেশ্বর

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ৩৯ বছর পার হলেও ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং অসম উন্নয়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমা হচ্ছে ক্ষোভ, মাথা তুলছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

এই প্রবণতা রুখতে পারে সুসম আঞ্চলিক বিকাশ। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের সংকল্পে অবিচল।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এই সংকল্পেরই প্রতীক। সপ্তম যোজনায় অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবু জনগণের রক্তে, ঘামে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কেবলমাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প নয়, এটি পশ্চিমবাংলার মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতীক।

সব বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা গড়বো বক্রেশ্বর……
এই হোক্ এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের সংগ্রামী শপথ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪৪৭ / ৮৯

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economical.

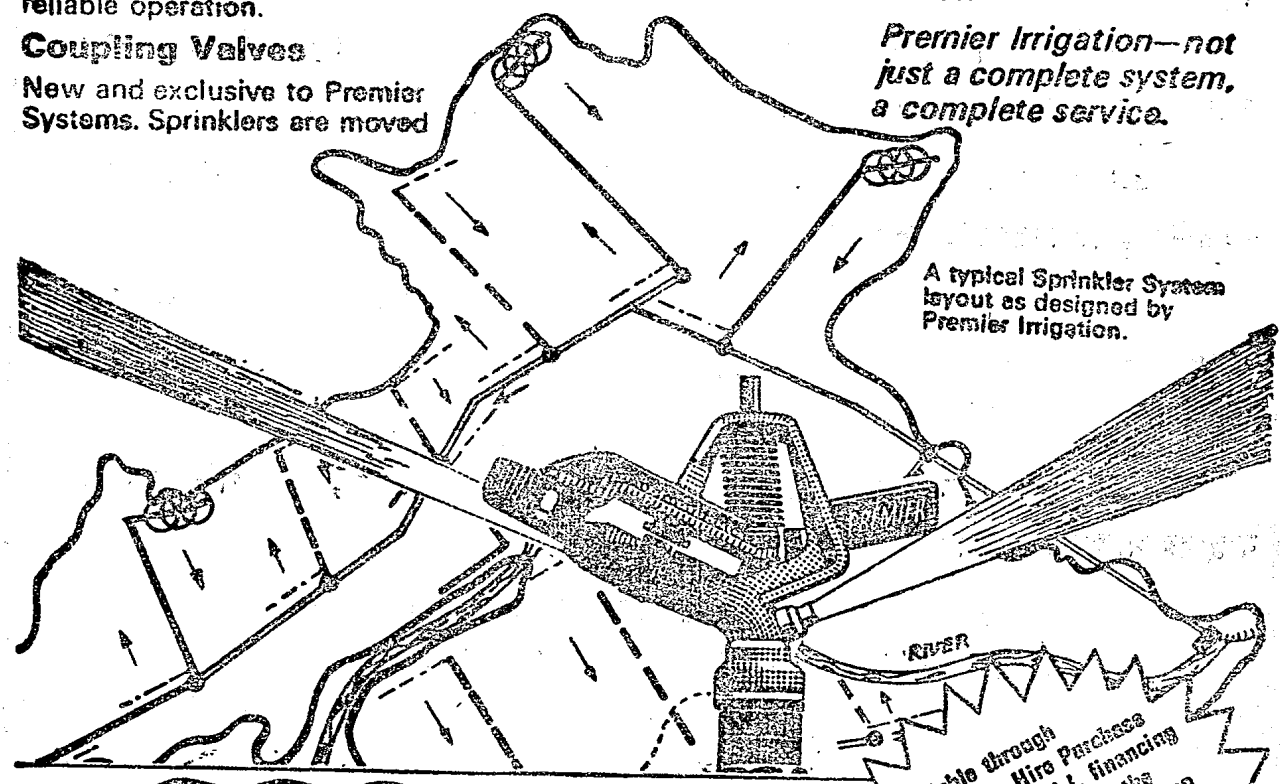
Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Premier Irrigation—not just a complete system, a complete service.

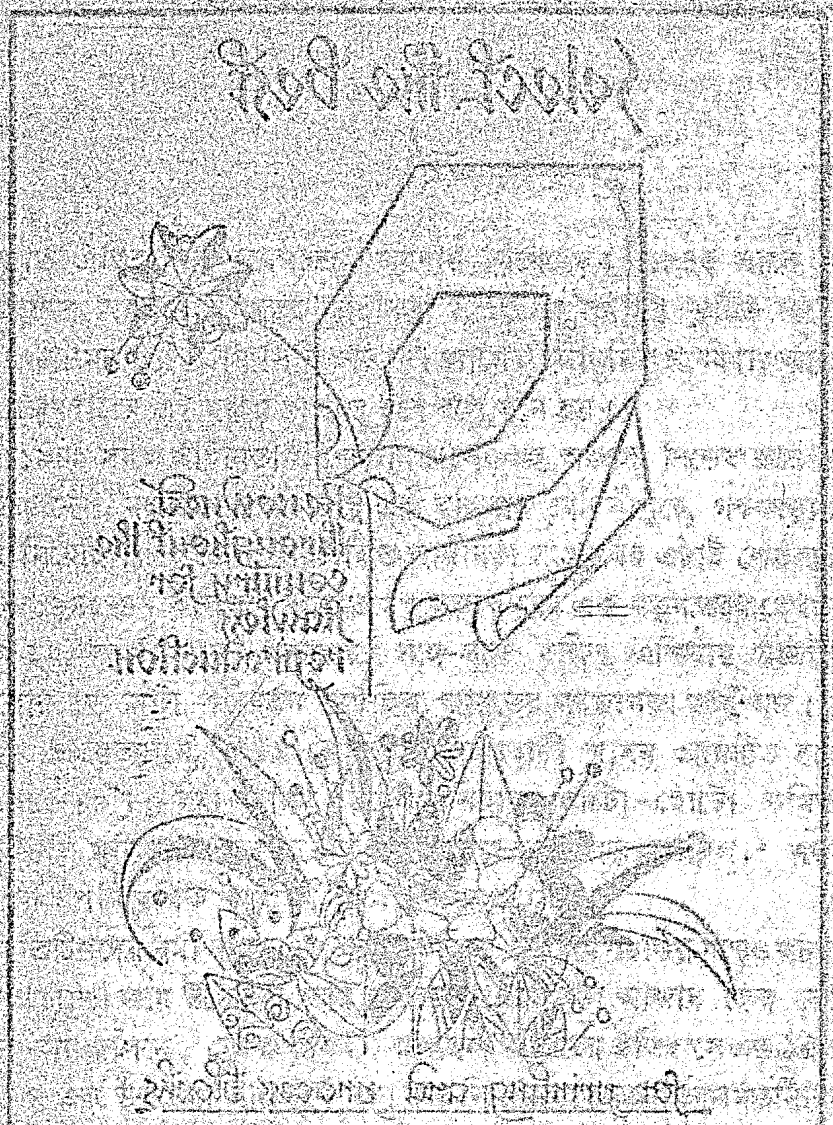


A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities. In addition to the normal annual I.T. depreciation deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302



D. T. M. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

59B CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA
Phone : 43-3093

Select the Best



Renowned throughout the country for flawless reproduction



for printing and process blocks

THE RADIANT PROCESS
PRIVATE LIMITED
REGD. OFFICE 6A, S. N. BANERJEE ROAD, CALCUTTA-700 013

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, ১৯৪৫-৪৭

সুনীল সেন

এক

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: '১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি সূচিত করেছিল, যে সংগ্রামের শুরু প্রায় সিকি শতাব্দী আগে।' আধুনিক গবেষণার আলোকে ড. মজুমদারের এই মন্তব্য অগ্রাহ্য হবে বলে মনে হয়।

১৯৪২ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন দেশের বহু অঞ্চলে, বিশেষ করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং বাঙলার মেদিনীপুরে, গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নিয়েছিল। কংগ্রেস-পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামের এটাই শেষ অধ্যায়। কিন্তু ১৯৪৫-৪৭ কালপর্বে ভারতে গণ-অভ্যুত্থানের এক নতুন তরঙ্গ দেখা গেল। মনে হয়, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক অবস্থার যে মৌল পরিবর্তন ঘটেছিল, ভারতের গণজাগরণ তার অঙ্গ। চীনে, উত্তর ভিয়েতনামে, উত্তর কোরিয়ায় সাম্যবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৯৪৬-৪৯); বর্মা-মালয়-ইন্দোনেশিয়ায় ছোটো-ছোটো কমিউনিস্ট পার্টিগুলি মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে নিজেদের স্থাপিত করেছিল।[১] শতাব্দীর পুরনো ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান তখন আসন্ন।

ব্রিটিশদের বর্মা দখল এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয় সত্ত্বেও জনমানসে যে প্রত্যাশা জমে উঠেছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেল আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি-আন্দোলনে। নেহরু ঠিকই লিখেছেন, ভারতের ইতিহাসে এত 'ঐক্যবদ্ধ আবেগ এবং উন্মাদনা' ইতিপূর্বে দেখা যায় নি। সম্প্রদায়জাতিদলমতনির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের সমাবেশ সত্যি অভূতপূর্ব। সেদিন দেখা গেল, বিভিন্ন সভায় ও মিছিলে সহস্র-সহস্র মানুষের যোগদান; তাদের মুখে "জয় হিন্দ" ধ্বনি। কংগ্রেস থেকে হিন্দু মহাসভা—সকল রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল। কলকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সুবিশাল জনসভায় একই মঞ্চে দেখা গেল নেহরু, প্যাটেল এবং শরৎচন্দ্র বসুকে।[২] নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিবিম্বিত গৌরব শরৎচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল। তিনি হঠাৎ হলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা।

২১ নভেমবর কলকাতায় আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবিতে ধর্মঘটের

আহ্বান জানাল বামপন্থী ছাত্রসংগঠন। সশস্ত্র বাহিনী ছাত্রমিছিল অবরোধ করল ধর্মতলা স্ট্রীটে; 'কদম-কদম বাড়ায়ে যা' গাইতে-গাইতে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় অবস্থান-ধর্মঘট শুরু করল। শরৎচন্দ্র বসু ধর্মঘটী ছাত্রদের আবেদন অগ্রাহ্য করে তাদের অবস্থান-ধর্মঘট প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন; কিরণশঙ্কর রায় ধর্মঘটকে নিন্দা করে বিবৃতি দিলেন; মুসলিম লীগও ধর্মঘটের বিরোধিতা করল। সন্ধ্যায় মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ চলল; নিহত হলেন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (কলেজের ছাত্র) এবং কদম রসুল (তরুণ শ্রমিক)। পরের দিন (২২ নভেমবর) কলকাতায় অনুষ্ঠিত হল সাধারণ ধর্মঘট। কংগ্রেস নেতৃত্বের সাধারণ বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসসেবী দুজন মহিলা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি (ব্রাহ্ম নেতা দ্বারকানাথের মেয়ে) এবং বিমলপ্রতিভা দেবী ছাত্রদের পাশে ছিলেন।[৩] মহীয়সী মহিলা জ্যোতির্ময়ী ছাত্রমিছিলের সঙ্গে যেতে-যেতে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন।

দমননীতির মুখে ছাত্র-আন্দোলন সাময়িকভাবে থেমে গেল। ১১ ফেবরুয়ারি (১৯৪৬) রসিদ আলি দিবসে আরো জঙ্গি বিক্ষোভ দেখা গেল। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তি দাবি করে মুসলিম ছাত্র লীগ ছাত্রধর্মঘটের আহ্বান জানাল; তাদের আবেদন সমর্থন করল কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ফেডারেশন। সুবিশাল মিছিল অগ্রসর হল ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে। সশস্ত্র বাহিনীর অবরোধের ফলে ছাত্রছাত্রীরা শুরু করল অবস্থান-ধর্মঘট। ১২ ফেবরুয়ারি শ্রমিক ধর্মঘট কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। রাঁচী থেকে একদল সশস্ত্র বাহিনী কলকাতায় এল। পুলিশের গুলিবর্ষণে ৮৪ জন নিহত হলেন। জনতা রচনা করল অসংখ্য ব্যারিকেড। দু দিন ধরে সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলেছিল। জনসভায় ভাষণ দিলেন গান্ধীবাদী নেতা সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মুসলিম লীগ নেতা সুরাবর্দী, কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী এবং ছাত্রনেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য। সুরাবর্দী স্বয়ং গভর্নর কেসিকে বন্দী ছাত্রদের মুক্তি দেবার অনুরোধ জানালেন। গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা পি. ই. এস. ফিন্নে কেসিকে জানালেন, মাটির নীচে ছাইচাপা আগুনের মতো বিক্ষোভ জমছে। এত গভীর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নি এই দেশে।[৪]

১৮ ফেবরুয়ারি বোমবাইতে শুরু হল নৌবিদ্রোহ। "তলওয়ার" জাহাজের ১১০০ ভারতীয় ন্যাভাল রেটিংদের (naval ratings) নিয়ে বিদ্রোহের শুরু। নৌবিদ্রোহ প্রসারিত হয় করাচী এবং মাদ্রাজে; বিদ্রোহী রেটিঙদের সংখ্যা হল বিশ হাজার। বোমবাইতে নৌবিদ্রোহের সমর্থনে সাধারণ ধর্মঘট হয়; ২১ থেকে ২৩ ফেবরুয়ারি রাস্তায়-রাস্তায় চলে ফৌজের সঙ্গে জনসাধারণের সংঘর্ষ; ২২৮ জনের মৃত্যু হয়; আহতদের সংখ্যা ১০৪৬। ১০টি পুলিশ চৌকি, ১০টি পোস্ট অফিস, ৯টি ব্যাঙ্ক ভস্মীভূত হয়। নিহত এবং আহতদের মধ্যে বেশির-ভাগই ছিল শ্রমিক। ১৯৪২-এর আন্দোলনে বোমবাইতে অসংখ্য বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল বটে, কিন্তু কোথায়ও ফৌজ আর জনসাধারণের সরাসরি সংঘর্ষ ঘটে নি।[৫]

নৌবিদ্রোহ জনমানসে গভীর ছাপ ফেলেছিল। কলকাতায় এবং শিল্পাঞ্চলে অনুষ্ঠিত হল শ্রমিকদের সভা। রাজকীয় বিমান বাহিনীর কর্মচারীরা ধর্মঘটে শামিল হলেন মাদ্রাজ, বোমবাই, কলকাতা এবং যশোহরে। দেশে এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি কোনোদিন দেখা যায় নি। জাতীয় নেতারা সেদিন "আইন-শৃঙ্খলা"র প্রতিনিধির ভূমিকায় অবতীর্ণ। প্যাটেল এবং পাতিল (পরবর্তী কালে যে এস. কে. পাতিল নেহরু সরকারের খাদ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন) প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। মুসলিম লীগের মুখ্য নেতা জিন্নাহ্ 'মুসলমান রেটিংদের' কাছে ধর্মঘট প্রত্যাহারের আবেদন জানান। একমাত্র সমাজতন্ত্রী দলের নেত্রী অরুণা আসফ আলি

মহাত্মাকে জানান, বোমবাইয়ে রাস্তার ব্যারিকেডে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য রচিত হয়েছে তা অভিনব (পরবর্তী কালে অরুণা সমাজতন্ত্রী দল পরিত্যাগ করে কমিউনিস্ট দলে যোগ দিয়েছিলেন)। শেষ পর্যন্ত নৌ-ধর্মঘট কমিটি আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। কমিটির এক ইশতাহারে লেখা ছিল: 'এই সর্বপ্রথম সেনা বিভাগে কর্মরত মানুষের রক্ত আর রাস্তার সাধারণ মানুষের রক্ত একসঙ্গে মিশে গেল এক অভিন্ন আদর্শের জন্য।'[৬]

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ বিপান চন্দ্র রজনী পাম দত্তের মত খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা নিয়েছিল ২২ জানুয়ারি, ১৯ ফেবরুয়ারি নয়; নৌবিদ্রোহ মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গ; সাধারণভাবে ভারতীয় সেনা ব্রিটিশ রাজের অনুগত ছিল।[৭] নৌবিদ্রোহ সম্বন্ধে গবেষণা অসম্পূর্ণ; আরো তন্নতন্ন করে এই অসাধারণ বিদ্রোহের আলোচনা হওয়া উচিত। তবু মনে হয় ড. চন্দ্রের মত গ্রহণযোগ্য নয়। ঐতিহাসিকের থাকবে 'long-range vision over the past and over the future'—(ই. এইচ. কার যেমন বলেছেন)। সত্যি কি ভারতীয় সেনার মানসিকতায় গভীর পরিবর্তন আসে নি? শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ধর্মঘট এবং প্রতিরোধ কি তাদের উন্নত চেতনার প্রকাশ নয়? যে পুলিশ বাহিনী ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সরকারের অবিচল সমর্থক ছিল, তাদের মধ্যে কি নৌবিদ্রোহ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি?

বিহারের পুলিশ ধর্মঘট প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। ১৯৪৭-এর মার্চের শেষ সপ্তাহে পাটনা, গয়া এবং মুঙ্গেরে পুলিশ ধর্মঘট শুরু হল। ট্রাকে করে বিদ্রোহী পুলিশ গ্রামদেশ পরিক্রমা করল; তাদের মুখে ধ্বনি: 'গোলি কা বদলা, গোলি সে লেঙ্গে।' গোর্খা বাহিনী নিয়োগ করে পুলিশ বিদ্রোহ দমন করা হল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী সরকারি কর্মচারী লিখেছেন: '...a police mutiny spread throughout the province and had to be put down by the military...'। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ দুঃখ করে বলেছিলেন, স্বাধীনতা যখন আসন্ন, তখন এই ধরনের বিক্ষোভ কেন? এর উশকানি দিয়েছে কমিউনিস্ট দল।[৮] আমরা পরে দেখব কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী দল, আর. এস. পি প্রভৃতি দলের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধিতা তখন তুঙ্গে।

দুই

১৯৪৬ সালের ২৬ জুলাই "ঈস্টার্ন ইকনমিস্ট" লিখেছিল: 'ধর্মঘটের ঢেউ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছে। তার আওতার মধ্যে এসেছে কলকারখানা—ওয়ার্কশপ, প্রেস, অফিস, ব্যাঙ্ক, স্কুল, ওয়াটার ওয়ার্কস, পাওয়ার-হাউস, রেলওয়ে, বাস, এমন-কী সরকারি বিভাগগুলি পর্যন্ত...।' রজনী পাম দত্তের মতে, শ্রমিক আন্দোলন তার শীর্ষে পৌঁছেছিল ১৯২৮ সালে, যখন শ্রমিকরা বার-বার ব্যবহার করেছিল তাদের শেষ অস্ত্র—সাধারণ ধর্মঘট। ১৯২৮-এ ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ২০০, ১৯৩৯-এ ৪০৬, ১৯৪৫-এ ৮২০ আর ১৯৪৬ সালে ১৬২৯ (ধর্মঘটে যোগদাতা শ্রমিকদের সংখ্যা ১,৯৪১,৭৪৮ জন)।[৯]

ভারতে ইতিপূর্বে এত অসংখ্য শ্রমিক-ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় নি। এই ব্যাপক ধর্মঘটের পটভূমিকা কলে-কারখানায় ছাঁটাই (বিশেষ করে অর্ডনানস ফ্যাক্টরি, ইনজিনীয়ারিং কারখানা, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, পাটকল), মুদ্রাস্ফীতি এবং সেই সঙ্গে মূল্যবৃদ্ধি, কালোবাজারির প্যারাডাইস এবং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি।[১০] সুকোমল সেনের হিসাবমতো, সারা ভারতে ছাঁটাই শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ।[১১] মনে রাখা দরকার, যুদ্ধের সময় কারখানায় মজুরনিয়োগ বৃদ্ধি

পেয়েছিল। শ্রমিক আন্দোলনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, দক্ষিণ ভারতীয় রেলে ধর্মঘট (২৫ অগস্ট, ১৯৪৬) অভিনব। ভি. ভি. গিরি রেলশ্রমিক ইউনিয়নের প্রথম সারির নেতা হলেও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কোনো কেন্দ্রে রেলওয়ে ধর্মঘট হয় নি। প্রধানত নীচুতলার কর্মচারীদের অবিরাম চাপের আঘাতে ডাক-তার বিভাগে অনুষ্ঠিত হল সর্ব-ভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট। ২৯ জুলাইকে বোধহয় বলা চলে শ্রমিক আন্দোলনের ক্লাইম্যাক্স। কলকাতায় সেদিনের সাধারণ ধর্মঘট অবিস্মরণীয়। জামশেদপুরে সাধারণ শ্রমিকদের চাপে ইস্পাত কারখানায় প্রতীক-ধর্মঘট হল। এই প্রথম টাটার মতো মালিক শ্রমিকদের কিছু দাবি মেনে নিয়ে সমস্যার মীমাংসা করলেন, যার ফলে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হল না।

দ্বিতীয়ত, ধর্মঘট সংগ্রামের অবিচল নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত ট্রেডই উনিয়ন কংগ্রেস। ১৯৪৭-এ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আই. এন. টি.-ইউ. সি গঠনের যে প্রস্তুতি চলেছিল (যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্যাটেল, ভি. ভি. গিরি, গুলজারিলাল নন্দ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ) তা আদৌ দৈবাৎ ঘটনা নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম স্বাধীনতার পরে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে ১৯২০ সাল থেকে যে শ্রমিক-ঐক্য গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে গেল।

তৃতীয়ত, বড়ো-বড়ো কারখানায় নারীশ্রমিকদের যোগদান তেমন চোখে পড়ে না। মরিস ডি মরিসের হিসাব থেকে জানা যায়, ১৯২৮-এ women labour force ছিল ১৬·৬ শতাংশ, ১৯৩৯ সালে ১৩·৯ শতাংশ আর ১৯৪৬-এ ১১·৮ শতাংশ।[১২] অর্থাৎ, ছাঁটাইয়ের অস্ত্র প্রথমে পড়েছে নারীশ্রমিকদের ওপর; বেশির-ভাগ ইউনিয়ন হয়ে পড়েছিল "পুরুষদের দুর্গ"। ইউনিয়নভুক্ত মেয়েদের সংখ্যা নগণ্য—১৯৪৪-এ ৪·১ শতাংশ, ১৯৪৫-এ ৪·৫ শতাংশ, ১৯৪৬-এ ৪·৯ শতাংশ, ১৯৪৭-এ ৬·৯ শতাংশ।[১৩] প্রভাবতী দাশ-গুপ্তা এবং সন্তোষকুমারীর মতো মহিলা-নেত্রী এই পর্বে দেখা যায় নি; মহিলা-নেত্রীদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য মৈত্রেয়ী বসু, সুধা রায়, বীণা দাস (পরে ভৌমিক), অহল্যা রাঙ্গনেকার, গোদাবরী পারুলে-কর (বোমবাই)। দার্জিলিঙ এবং ডুয়ার্সের চা-বাগানের নারীশ্রমিক ব্যতিক্রম। চা-বাগানে নিযুক্ত নারীশ্রমিক প্রায় ৫০ শতাংশ। ১৯৪৫-এ গঠিত হয় দার্জিলিঙ চা বাগান ইউনিয়ন। ১৯৪৬-এর আইন-সভার নির্বাচনে কিংবদন্তী নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণের বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে ১৭টি বাগানে গণ্ডগোল শুরু হয়। প্রায় একই সময় ডুয়ার্সের বাগানে মজুররা ইউনিয়ন গঠন করে জনসভায় ধ্বনি দিলেন: 'বিলায়েতি মালিক লনডন ভাগো।' দার্জিলিঙ এবং ডুয়ার্সে নারীশ্রমিকরা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন।[১৪]

অবিরাম শ্রমিকবিক্ষোভ ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির নতুন প্রবণতা সম্বন্ধে সজাগ করেছিল। ১৯৪৬-এর ৩১ জুলাই ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ডাক-তার ধর্মঘট এবং প্রস্তাবিত রেল ধর্মঘটকে 'symptoms of a serious political situation' বলে বর্ণনা করেছিল।[১৫] ওয়াভেল ভারত-সচিবকে এক তারবার্তায় জানালেন, এই মুহূর্তের প্রয়োজন হল কংগ্রেসের সমর্থন সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন; তাঁরা আশা কংগ্রেস 'কমিউনিস্টদের এবং নিজেদের দলের বামপন্থীদের' সংযত করতে পারবে।[১৬] ৫ অগস্ট আর-এক তারবার্তায় ওয়াভেল ভারতসচিবকে জানালেন, প্যাটেলের দৃঢ় প্রত্যয় যে কংগ্রেসকে সরকার গঠন করতেই হবে, অন্যথায় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা এবং 'শ্রমিক অসন্তোষ' বন্ধ করা দুঃসাধ্য।[১৭] ১৩ অগস্ট তিনি ভারতসচিবকে আবার লিখলেন, একমাত্র অন্তর্বর্তী সরকার শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।[১৮] সর্দার প্যাটেলের ভক্তরা হয়তো পুলকিত হবেন না, তবু ওয়াভেলের মন্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো গেল না: Patel is

strongly influenced by the capitalists and lives in the pocket of one of them, G. D. Birla।[১৯] ২ সেপটেমবর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। তার পুরোভাগে নেহরু।

সূত্রনির্দেশ

১. Crozier, South-East Asia in Turmoil, Penguin, 1965.

২. বিপান চন্দ্র এবং অন্যান্য (সং), India's Struggle for Independence, Viking, 1988, ৩৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩. আর. জি. কেসির ডায়েরি, ১৯৪৪-৪৫, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি; গৌতম চট্টোপাধ্যায়, Post-war Upsurge; জগন্নাথ সরকার এবং অন্যান্য (সং), India's Freedom Struggle, 1986.

৪. P. E. S. Finney's Note, কেসির ডায়েরি, ১৯৪৪-৪৫; চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। মিছিলে যোগদানকারী ছাত্রীদের নেতৃত্ব করেন গীতা মুখার্জি, অলকা মজুমদার প্রভৃতি।

৫. বি. সি. দত্ত, Revolt of the Ratings, N. R. Ray (সং), *Challenge*, 1984; N. Mansergh (সং), *The Transfer of Power*, vol. VI; বোমবাইয়ের প্রত্যক্ষদর্শী কর্মচারী লিখেছেন: 'The whole town of Bombay rose in a blazing crescendo of rioting in response to the mutiny···there were flights of bombers over the frigates···' V. G. Mathews, *Memoirs of Official Life*, 1931-47, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি।

৬. R. P. Dutt, India Today, 1947, পৃ ৪৭৩-৭৪। পাম দত্ত লিখেছেন, কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ ধর্মঘট, হরতাল ইত্যাদির আর প্রয়োজন নেই বলে বিবৃতি দেন।

৭. চন্দ্র, ঐ।

৮. Bihar Legislative Assembly Debates, vol. II, March, 1947। পুলিশ ও গোর্খা সেনার মধ্যে গুলি বিনিময় চলে। সরকারি বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন বিহারে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী এবং কমিউনিস্টরা অনেক রাজনৈতিক প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ ছিল। G. M. Ray, Memoirs of Official Life, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি। তিনি আরো লিখেছেন, শুধু পুলিশ নয়, জেলের ওয়ার্ডার এবং হাসপাতালের নার্সরাও ধর্মঘটে শামিলহয়ে ছিল।

৯. J. S. Mathur, Indian Working Class Movement, 1964, পৃ ৫২।

১০. বাঙলায় ধর্মঘটের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে রণজিৎ গুপ্ত, আই. সি. এস. কেসিকে বলেছিলেন, ব্রিটিশ মালিকরা ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হল না, ইউনিয়নের স্বীকৃতিদানেও তাদের অনীহা; বোমবাই-এর অবস্থা বাঙলার তুলনায় 'অনেক ভালো'। কেসির ডায়েরি, চতুর্থ খণ্ড।

১১. সুকোমল সেন, Working Class of India, 1979, পৃ ৪০২।

১২. M. D. Morris, Large-Scale Industry, Cambrige Economic History of India, vol. 2, 1983, পৃ ৬৪৫।

১৩. মাথুর, ঐ।

১৪. S. Bhowmik, Class Formation in the Plantation System, 1981, পৃ ১৪৬-৪৭। চা-বাগে মহিলা মজুরদের আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য বর্তমান লেখকের বই The Working Women And Popular Movements In Bengal, 1986, পৃ ৭৩-৭৪,।

১৫. ম্যানসারগ (সং), ষষ্ঠ খণ্ড, ফাইল নং ৯৪।

১৬. ঐ অষ্টম খণ্ড, ফাইল নং ৯৬।

১৭. ঐ ফাইল নং ১২১।

১৮. ঐ ফাইল নং ১৪৬।

১৯. ম্যানসারগ (সং) নবম খণ্ড, ফাইল নং ৫৬১

এই রচনার দ্বিতীয় কিস্তি মার্চে আর শেষ কিস্তিতে এপ্রিলে প্রকাশ্য।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৯.১১

১৮৫৫-র হুলের অভিজ্ঞতা থেকে সাঁওতালরা একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসে। তা হল সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ যথাসম্ভব বর্জনীয়। প্রতিরোধের পদ্ধতি পালটাল বটে; কিন্তু প্রতিরোধের পথ তারা বর্জন করে নি।

বস্তুত, সাঁওতালরা নানাভাবে আগের থেকেও অনেক বেশি বিপন্ন বোধ করছিল। সংগঠিত বিক্ষোভের মধ্যে তাই তারা পরিত্রাণের উপায় খুঁজেছে—যেমন, ১৮৬১, ১৮৬৫, ১৮৭১-৭২, ১৮৭৪-৭৫ এবং ১৮৮১-৮২ সালে।

এদের কারণ বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়। সংক্ষেপে উল্লেখ করব মাত্র।

হুলের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা তাদের পরম শত্রু মহাজনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। ফল হল উলটো। আগেই বলেছি, হুল সাঁওতাল সমাজে এবং তার অর্থনীতিতে কী নিদারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। মহাজনের শরণ তাই অপরিহার্য হল। নূতন চাষবাস তাদের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব ছিল—বিশেষ করে জমিদারি অঞ্চলে। জমিদার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাল না। তা ছাড়া, বিদ্রোহোত্তর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের ফলে সাঁওতাল অঞ্চলের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমেই দূর হয়ে যায়; ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় মহাজনরা আরো জাঁকিয়ে বসল।[১৭৫] মহাজনি শোষণের অজস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সরকার এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয় নি।

নতুন এক উপদ্রব—জমিদারি এলাকায় উত্তরোত্তর খাজনা বৃদ্ধি। পুরনো দস্তুর সম্পূর্ণভাবে ভেঙে নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে জমিদার খাজনা বাড়িয়ে চলল। বহু ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশেই তা করা হয়। খাজনা-বৃদ্ধিতে যাতে কোনো বাধা না আসে, সেজন্য জমিদার সাঁওতাল-মাঝিদের কী ভাবে অপসারিত করার চেষ্টা করে, তা আগেই উল্লেখ করেছি। সাঁওতালদের চিরাচরিত অরণ্যের অধিকার নানাভাবে সঙ্কুচিত করা হল। সমগ্র সাঁওতাল সমাজ এক অভূতপূর্ব সংকটের

সম্মুখীন হয়—সংকট শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়; সাংস্কৃতিকও। যে সমাজসংগঠনে সাঁওতালদের দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস এবং নৈতিক বোধ প্রতিফলিত হয়েছিল, তা বহু জায়গায় আস্তে-আস্তে ভেঙে পড়ছিল।

আগেই বলেছি, ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত সংগঠিত সাঁওতাল বিক্ষোভের একটা বৈশিষ্ট্য এর আঞ্চলিকতা। "আঞ্চলিকতা" কিন্তু আন্দোলনের সীমাবদ্ধ প্রসার অর্থেই প্রযোজ্য। এর অর্থ এ নয় যে, সাঁওতালরা শুধু বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ সমস্যার কথাই ভাবছিল। আঞ্চলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আন্দোলনের শুরু। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা যাই হোক, সমাধান-সম্পর্কিত চিন্তাধারণায় ১৮৮৫ সালের বিদ্রোহী মানসিকতার বিশিষ্ট ভঙ্গিগুলি বার-বার ফিরে-ফিরে এসেছে। তাই ভৌগোলিক ব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চেতনার দিক থেকে এ আন্দোলনগুলি ১৮৫৫-র হুলের সমগোত্রীয়।

এ চেতনার দুটি বিশিষ্ট দিক: সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, আর এর বাস্তব রূপায়নের জন্য অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কোনো নেতার ওপর নির্ভরশীলতা। এ দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য আন্দোলন নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাইরেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৬১ সালের বিক্ষোভ দুমকা সাবডিভিশনের হেণ্ডোয়া জমিদারিতে—য়ুরোপীয় ম্যানেজার বার্নসের খাজনা-বাড়ানোর নানা কৌশলের বিরুদ্ধে। আগের মতো এবারও সাঁওতালরা ভেবেছিল, স্থানীয় প্রশাসন সাঁওতালদের হয়ে হস্তক্ষেপ করবে। সাঁওতাল পরগনার সহকারী কমিশনর টেলরের কাছে তারা আর্জিও পেশ করে। টেলরের জবাব থেকে তাদের ধারণা হল, বার্নসকে দস্তুর-বিরোধী খাজনা বাড়ানোর চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। সাঁওতাল-পরগনার কমিশনার নিজেই স্বীকার করেছেন: 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সাঁওতালরা তার উপর বিশ্বাস হারিয়েছে···শুধু সাঁওতালরা নয়, অন্য জাতির লোকেরাওএকই কথা বলছে: নালিশ করা অর্থহীন; সাহেব সব সময় বলে, আগামী কাল এসো।'[১৭৬]

এ আশাভঙ্গ থেকেই তাদের বিক্ষোভের শুরু। প্রথমে তারা ভেবেছিল, কলকাতায় ছোটোলাটের কাছে আর্জি পেশ করলে হয়তো কিছু সুরাহা হবে। কিন্তু ফল কিছু হল না। তাদের তীব্র অসন্তোষের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলনের সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এর কয়েকটা দিক উল্লেখযোগ্য। 'হুলের' সময়ের মতো সাঁওতালরা নানা জায়গায় বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হল; পাঠানো হল তিন পাতার শালের ডাল। টেলরের ধারণা, তাদের প্রিয় নেতা কানুর এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে: 'ছ বছরের মধ্যে আবার এক বিদ্রোহ শুরু হবে; তাদের নেতা হিসেবে সে আবার ফিরে আসবে।'[১৭৭] আসলে হুলের সময় কানুর এ ধরনের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শোনা যায় নি। সম্ভবত, এটা নতুন প্রচার। কিন্তু সাঁওতালদের কাছে তার আকর্ষণ প্রবল। এ আন্দোলনের নেতা সুন্দর মাঝির উপর কোনো অলৌকিক ক্ষমতা আরোপিত হয় নি। সাঁওতালরা কানুর পুনরাবির্ভাবের কথাই বলেছে। হুলের শেষের দিকে কানুর অলৌকিক শক্তি সম্পর্কে বন্দী সাঁওতালদের কেউ-কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু পুরনো বিশ্বাস আবার ফিরে এল।

১৮৬৫ সালের আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাব আরো স্পষ্ট। উল্লেখযোগ্য, কোনো বিশেষ এলাকার সাঁওতাল-দের অভাব-অভিযোগ থেকে এ আন্দোলন শুরু হয় নি। সরকারি মহলেরও ধারণা, এর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না।

তবে সাঁওতালদের আচার-আচরণ প্রতিক্রিয়া থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, হুলের সময় থেকে সাঁওতাল মানসিকতায় কোনো-কোনো প্রভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। আগেই বলেছি, পরবর্তী যে-কোনো সংঘবদ্ধ প্রতি-রোধের সঙ্গে কতগুলো ধারণা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। যেমন, নেতা সাঁওতাল জনসাধারণ থেকে

স্বতন্ত্র ; দৈবীশক্তির অধিকারী। একটা মূল আদি-কল্প বার-বার ফিরে এসেছে। বস্তুত, সমাজ- ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তনের জন্য সাঁওতালদের গভীর আকুতি থেকেই এ বিশেষ নেতার আবির্ভাবে তাদের বিশ্বাসের জন্ম।

১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে সাঁওতাল পরগনার সহকারী কমিশনার জানতে পারেন, সাঁওতাল সমাজে আবার এক অস্থিরতা, চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। এর প্রধান রূপ : দলে-দলে সাঁওতালরা হাজারিবাগের দিকে যাচ্ছে ; কারণ গুজব রটেছে, হাজারিবাগের শ্রীরামপুর অঞ্চলে এক নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে। তার দর্শনলাভের জন্যই সাঁওতালদের এত অধীর আগ্রহ। এ নতুন দেবতা আর কেউ নয় : রামগড় সেনাবাহিনীর এক সৈনিক—কারু মাঝি। তখন অবশ্য সে আর সৈনিক ছিল না।

কানু-সিধুকে যে ধরনের দৈবীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বলে বিশ্বাস করা হত, এ ক্ষেত্রে তা হয় নি। বরং লৌকিক বিশ্বাসের কোনো-কোনো দিক এ সময়কার গুজবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন, দুরারোগ্য অসুখ সারানোর ক্ষমতা আছে কারু মাঝির ; সে অন্ধের দৃষ্টিশক্তি, বন্ধ্যা নারী আর গোরুর প্রজননক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে পারে।

দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ[১১৮] থেকে কারু মাঝি সম্পর্ক আরো কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এক কনস্টেবল রামসহায় রামকে ছদ্মবেশে পাঠানো হয়েছিল কারুর হাবভাব বোঝার জন্য। সে জানতে পারে, কারুকে সবাই 'গোসাঁই' বলে ভাবত। চাঁদ মাঝি বলে এক সাঁওতালও নানা গুজব শুনে কারুকে দেখতে যায়। দু আনা দিলে তাকে কাগজের চারটে চিরকুট দেওয়া হয়। তাকে বলা হয়, সবচাইতে বড়োটি সে যেন ঘরের মধ্যে রেখে দেয় এবং প্রতি মঙ্গলবার গ্রামে বেরুনোর সময় সঙ্গে রাখে ; এতে তার মঙ্গল হবে ; আর গ্রামে অসুখ-বিসুখের উপদ্রব হবে না।

কারু মাঝির কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে কিনা, এ প্রশ্নের উত্তরে রামসহায় একটা ঘটনার উল্লেখ করে। কারুর বাড়িতে সাঁওতালদের জমায়েতে একজন উত্তেজিত হয়ে "লম্ফঝম্ফ" শুরু করে দিল। এ ধরনের উত্তেজনা আর আচরণ নাকি গতবারের হুলের সময়েই দেখা দিয়েছিল। তাকে সতর্ক করে দিয়ে কারু বলে, সে যদি এরকম করতে থাকে, তাহলে তাকে বেঁধে হাজতে পোরা হবে। কারুর উদ্দেশ্য ঠিক কী ছিল জানা যায় না। তবে এ ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তার দর্শনার্থীর মধ্যে অন্তত কেউ-কেউ শুধুমাত্র আধিব্যাধির দাওয়াইয়ের জন্য যায় নি ; তারা অন্য ধরনের অসন্তোষের কথা জানাতে চেয়েছে ; তাদের আচরণের মধ্যে নিরুদ্ধ আক্রোশের স্ফুলিঙ্গ মাঝে-মাঝে ঠিকরে পড়ছিল।

১৮৭১ সালের বিক্ষোভে এরকম কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। এ বিক্ষোভের পটভূমিকা নানা এলাকায় আকস্মিক খাজনা বৃদ্ধি।[১১৯] হেণ্ডোয়ার জমিদার উদিতনারায়ণ সিংহ, বালানাতরার নতুন জমিদার গ্রানট, কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন শংকরার জমিদার, গোদার ইজারাদার, এবং আরো কেউ-কেউ সাম্প্রতিক কালে যথেচ্ছ খাজনা বাড়াচ্ছিল। প্রতিকারের জন্য সাঁওতালরা দুমকার সহকারী কমিশনারের কাছে আর্জি পেশ করে। কোনো প্রতিবিধান তো তিনি করলেনই না, নয়জন নেতৃস্থানীয় সাঁওতালকে দশ টাকা করে জরিমানা করলেন। কারণ হিসেবে বললেন, 'সাঁওতালরা জোট বেঁধে নালিশ করতে এসেছে।' বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা আদালতেও নালিশ করে ; কোনো ফল হয় নি। প্রশাসনের এ মনোভাবে সাঁওতাল-সমাজে এক তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা রটিয়ে দিল, আশু প্রতিকার না মিললে তারা ১৮৮৫ সালের মতো আবার বিদ্রোহ করবে। সরকারি প্রতিবেদন-মতে, ওই সময় থেকে চতুর্দিকে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। তাদের মূল কথা, বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা লুঠ-তরাজ শুরু করতে চলেছে। আসন্ন বিদ্রোহের সম্ভাবনায় দিখুসমাজে সন্ত্রাসের ভাব অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এমন-কী পরাক্রান্ত মহেশপুরের জমিদার গোপালচন্দ্র সিংহ বরকন্দাজের সতর্ক পাহারায় নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থেকে গেল। লুঠতরাজের ভয়ে অসাঁওতাল গ্রামবাসী চারদিকে পালাতে থাকে। সহকারী কমিশনারের জন্য যে পালকির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার জন্য কোনো বেহারা মিলল না, কারণ সবাই পালিয়ে গেছে।

ওখানকার সাঁওতালদের মানসিকতায় পরিবর্তনও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৮৫ সালে যা ঘটেছিল, এবারও তাই ঘটল। স্থানীয় দুটি নীলকুঠির সাঁওতাল শ্রমিক তাদের নেওয়া দাদন সঙ্গে-সঙ্গে ফিরিয়ে দিল। তাদের স্পষ্ট জবাব—এ মরশুমে তারা কোনো কাজ করতে পারবে না; কারণ তাদের হুলে যোগ দিতেই হবে।[১৮০]

৯.১২

১৮৭৪ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যেকার আন্দোলন অনেক পরিণত। ১৮৬১, ১৮৬৫ এবং ১৮৭১ সালের বিক্ষোভ থেকে তা স্বতন্ত্র তো বটেই, কয়েকটা দিক থেকে তা ১৮৮৫-র হুল থেকেও আলাদা। আমাদের পক্ষে প্রধান প্রাসঙ্গিক আলোচনা—এ সময় সাঁওতালদের ধর্ম আর রাজনীতি কী ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে।

মূল উদ্দেশ্যের দিক থেকে আগের আন্দোলনের সঙ্গে এ-সময়কার আন্দোলনের কোনো পার্থক্য নেই। স্বাধীন সাঁওতালরাজের স্বপ্ন এ আন্দোলনেরও মূল প্রেরণা। ১৮৮৫-র পর প্রায় দু দশকের মধ্যে সাঁওতাল অর্থনীতির উপর 'দিখু দুশমনদের' কর্তৃত্ব আরো পাকা হয়েছে। বিশেষ করে, ব্যাপক খাজনা-বৃদ্ধি, জমি আর অরণ্যে সাঁওতালদের ঐতিহ্যসম্মত নানা অধিকারের অবিরত সঙ্কোচন তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশাকে দুঃসহ করে তুলেছে। স্বভাবতই, আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপ আগের থেকে আরো স্পষ্ট হয়েছে।

১৮৬১-১৮৭১—এ দশকের আন্দোলনে এ রাজনৈতিক সুর খানিকটা প্রচ্ছন্ন ছিল। এর একটা প্রধান কারণ আমরা আগে উল্লেখ করেছি। নেতাদের আশঙ্কা ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের প্রকাশ্য ঘোষণা প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করবে, যার ফলে ১৮৮৫ সালের মতো নির্মম নিপীড়ননীতি গ্রহণ করা হবে। এ নিপীড়ননীতির ভয়াবহ ফল নেতারা ভোলে নি।

১৮৭৪ সালের আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র একেবারে গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট। এর নেতা ভগীরথ মাঝি ১৮৬৮ সাল থেকেই সাঁওতালদের নানা বিক্ষোভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ওই বছর তাকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়। সে নাকি রটনা করে বেড়াচ্ছিল, ব্যাপক এক সাঁওতালবিদ্রোহ আসন্ন-প্রায়।[১৮১] বাউসীর যে হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের "অভিষেক" হয়, সেখান থেকেই সে নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। সাঁওতাল-পরগনার উপ-কমিশনার বক্সওয়েল জানতে পারেন, সে জমায়েতে বহু সাঁওতাল বার-বার ১৮৫৫ সালের 'হুল, 'পুরোনো সুবা, ঠাকুর, রাজ' সম্পর্কে বলাবলি করেছে।[১৮২] এক খ্রীষ্টান মিশনারির সাক্ষ্য অনুযায়ী, বাউসীর মন্দিরে ভগীরথকে "রাজা" বলে ঘোষণা করা হয়; নতুন সাঁওতালরাজের সাফল্যকামনায় প্রার্থনাও করা হয়।[১৮৩] বাউসীর মন্দির থেকে ফেরার পর সাঁওতাল মানসিকতার আমূল রূপান্তর প্রসঙ্গে এ মিশনারির বিবরণ: তখনই ভগীরথের শিষ্যরা অনবরত বলছিল, তাদের সুদিন আবার শীগগির আসছে; তাদের রাজত্ব শুরু হয়ে গেছে; সাহেবদের সব খতম করা হবে, বা এ মুল্লুক থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে; এদেশী খ্রীষ্টানদের 'অন্যলোকে' নির্বাসন দেওয়া হবে।[১৮৪]

এসব প্রচারের মধ্যে রাজদ্রোহের আভাস পেয়ে স্থানীয় প্রশাসন ভগীরথ এবং তার এক ঘনিষ্ঠ অনুগামীকে গ্রেপ্তার করে। আন্দোলনের শক্তি এতে কমল তো নাই, বরং ভগীরথ-অনুগামীরা নতুন-নতুন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সাঁওতালদের উদ্‌বুদ্ধ করতে চেষ্টা

করে। বলা হল, তারা আর কোনো খাজনা দেবে না; ১৮৭৩-৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে সরকারি অনুদান (প্রধানত খাদ্যশস্য) তারা ফেরত দেবে না। খাজনা বন্ধের সিদ্ধান্ত জমিদারিব্যবস্থার বৈধতাকে অস্বীকার করা। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যাপারে সাঁওতালদের অভিযোগ গোড়া থেকেই। বস্তুত, বস্তুত, ভগীরথ নেতৃত্বে আন্দোলনের অব্যবহিত উপলক্ষ এ বণ্টনপ্রসঙ্গে প্রশাসনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সাঁওতালদের প্রতিবাদ। তাদের ক্ষোভের কারণ, মহাজন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোক সরকারের দেওয়া ধানচাল সহজেই পেয়ে যাচ্ছে; অথচ তাদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

তখন থেকেই সাঁওতালদের নূতন ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে করব। ভগীরথের গ্রেপ্তারের পর তার শিষ্য জ্ঞান মাঝি এক "দুঃসাহসিক কাজে"র পরিকল্পনা নেয়। সে পরোয়ানা মারফত সবাইকে বলে, খাজনার নূতন হার চালু না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতালরা কোনো খাজনাই দেবে না। সে আরো বলে, এ পরোয়ানা জারি করার অনুমতি তাকে দিয়েছে "বড়ো সাহেব" (অর্থাৎ কমিশনার)। জ্ঞান মাঝিকে সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হল। আন্দোলন কিন্তু অব্যাহত থাকল। নেতা হিসেবে এল ভগীরথের আর-এক শিষ্য ধোনা মাঝি। রাজমহলের বড়তলা অঞ্চলে সে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, সারা দেশে সাঁওতালরাজ কায়েম হয়েছে। তাকেও হাজতে পোরা হয়। এর পর আন্দোলন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে; তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে নানা জায়গায় চলতে থাকে।

এ সময় থেকেই সাঁওতালরাজের প্রতীক হিসেবে "খেরওয়ার" নামটির প্রচলন হল। স্বতন্ত্র উপজাতি হিসেবে এটাই ছিল তাদের আদি নাম।

১৮৮০-৮২-র আন্দোলনের রাজনৈতিক সচেতনতা আরো স্পষ্ট। সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার প্রচারে এখন কোনো গোপনীয়তা ছিল না। সরকার তাই এ আন্দোলন সম্পর্কে অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

এক খ্রীষ্টান মিশনারির প্রতিবেদনে[১৮৫] বলা হয়েছে, খেরওয়ার নেতারা সাঁওতালদের প্রকাশ্যে এসব কথা বলে বেড়াচ্ছিল: 'জমি আমাদেরই; আমরাই জঙ্গল কেটেছি; তাই কোনো খাজনা আমরা দেব না; একজোট হয়ে আমরা ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াব।' তারা আরো বলেছিল: 'সাহেব এবং খ্রীষ্টান গুটিকয়েক মাত্র; আমরা সাফা সাঁওতালরা সংখ্যায় কত বেশি, এ দেশ আমাদেরই হবে; এ রাজ আমাদের।'[১৮৫ক] সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার এ দুর্বার সংকল্পের সঙ্গে সে সময়কার বিদ্রোহী আইরিশ কৃষক-মানসিকতার সাদৃশ্য খুঁজে পান ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার। আইরিশ কৃষকদের মতো 'সাঁওতালদের-[ও] স্বপ্ন, এমন দিন আসবে, যখন তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে; কোনো খাজনা তাদের দিতে হবে না।' কমিশনারের সিদ্ধান্ত[১৮৬], 'একটা জিনিস আগে আমরা অত ভালো করে খেয়াল করি নি; বাইরের হাবভাব যাই হোক, ভেতরে-ভেতরে সাঁওতালরা তীব্র বিক্ষুব্ধ; বড়ো এক পরিবর্তনের জন্য তারা উন্মুখ। 'খেরওয়ার' নাম আসলে সম্পূর্ণ নূতন এক সংগঠনের ইঙ্গিত দেয়; বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী ধারণা তাদের সামাজিক তথা ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে মিলে গেছে; তাদের কাছে এর আকর্ষণ প্রবল; ফলে ব্রিটিশরাজ-বিরোধী একটা সংগঠন ধীরে-ধীরে গড়ে উঠেছে।'

১৮৮০ সালের অকটোবর থেকে এ আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উপলক্ষ আদমশুমারির জন্য সরকারি ব্যবস্থা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, আন্দোলনের প্রকৃতি জটিল; তার লক্ষ্য, অনেক সুদূরপ্রসারী। আদমশুমারির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে গোটা ব্রিটিশরাজ সম্পর্কে তাদের তিক্ততা, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ক্রমেই ফেনিল হয়ে উঠেছে।

স্থানীয় প্রশাসন তাদের মনোভাব বোঝার আদৌই চেষ্টা করে নি। তাদের ধারণা, আদমশুমারির

মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার জন্যই এ আন্দোলন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত নয়। সত্যিই আদম-শুমারি সংক্রান্ত নানা অনুসন্ধানের অর্থ সাঁওতালদের কাছে বোধগম্য ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিকের বিচার্য বিষয় : আদম-শুমারির বিরোধিতার কারণ হিসেবে তাদের নিজেদের যুক্তি, আর এ বিরোধিতার বিশিষ্ট রূপ।

এ বিরোধিতা ছিল আসলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এবং এক্তিয়ারের প্রশ্ন। সাঁওতালরা বহু জায়গায় খোলাখুলি বলেছে, তারা সবাই দুবিয়া গোসাঁই-এর শিষ্য; গোসাঁইজীর খাতায় তাদের নাম উঠে গেছে; তাদের নাম আবার নথিভুক্ত করার কোনো অধিকার সরকারের নেই। কেউ-কেউ স্পষ্ট বলেছে, তাদের গুরুর নির্দেশেই তারা আদমশুমারির কাজে বাধা দিচ্ছে।

এ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে দিখুদের সম্পর্কে তাদের অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাসও প্রতিফলিত হয়েছে। ওই সময়কার নানা গুজব বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।[১৮৭]

একটা গুজব ছিল, আলাদাভাবে প্রতি সাঁওতালের নামধাম লিখে নেওয়া এবং প্রতি পরিবারের ঘর-বাড়িতে চিহ্ন বসানোর একটিমাত্র উদ্দেশ্য—সরকার নতুন করে মাথাপিছু কোনো ট্যাকসো বসানোর ফন্দি আঁটছে। আরো একটা ধারণা ছিল, আদমশুমারি আসলে সাম্প্রতিক খাজনা-বৃদ্ধিকে বৈধ করে নেওয়ার কূটকৌশলমাত্র। আরেকটা গুজব ছিল—একবার যদি সরকারি খাতায় নাম ওঠে, তাহলে পরে যে-কোনো উদ্দেশ্যে সরকার এ-নথিকে কাজে লাগাতে পারবে। কোথায় কিভাবে তারা গতর খাটবে, তাও নির্ভর করবে সরকারি মর্জির উপর। এরকম একটা ভয় ছিল—জোর করে ধরে নিয়ে তাদের যুদ্ধে পাঠানো হবে। তখনকার এক যুদ্ধক্ষেত্র আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তারা শুধু জানত, এটা তাদের মুল্লুক থেকে অনেক দূরে, একবার সেখানে গেলে আর ফেরা হবে না। একটা ব্যাপক গুজব ছিল—সমর্থ জোয়ান সাঁওতালদের জোর করে আসামের চা-বাগানে কুলি হিসেবে পাঠানো হবে। আড়কাঠিরা ছোটোনাগপুরের যেসব উপজাতীয়দের ভুলিয়ে-ভালিয়ে চা-কুলি হিসেবে পাচার করে দিয়েছিল, তাদের উপর অত্যাচারের নানা কাহিনী লোকমুখে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। চা-কুলির কাজ তাই তাদের কাছে বিভীষিকাময় ছিল। চা-বাগানে গেলে পারিবারিক বন্ধন এবং সংহতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে এ আশঙ্কাও তাদের ছিল। একটা কথা রটেছিল, পুরুষ সাঁওতালদের একদিকে, এবং নারী আর শিশুদের অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনও গুজব ছড়িয়ে-ছিল, আদমশুমারির আসল উদ্দেশ্য তাদের খ্রীষ্টান বানানো। তারা প্রকাশ্যেই বলত, পাদরিসাহেব আসলে হাকিমদের গুরু; তাই পাদরি যা বলবে হাকিম তা শুনবে।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, আদমশুমারির বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিরোধের জায়গাগুলিতে আগে থেকেই সাঁওতালদের নানা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আন্দোলন চলার সময় তাদের অন্যান্য অভিযোগও এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। কোনো-কোনো জায়গায় অন্যান্য উপজাতিগোষ্ঠীও আন্দোলনে যোগ দেয়; তবে সংখ্যায় বেশি নয়।

তা ছাড়া, এ আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে "খেরওয়ার" ধর্মসংস্কার আন্দোলনেও নতুন উদ্দীপনা আসে। জামতাড়া সাবডিভিশনে সহস্র-সহস্র বেনামি চিঠিতে সাঁওতালদের বলা হয়, তারা যেন সঙ্গে-সঙ্গে তাদের শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলে। তখন থেকে দুবিয়া গোসাঁইয়ের নামও চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। অনেক দূর অঞ্চল থেকে সাঁওতালরা এসে হাজারিবাগে দুবিয়ার মন্দিরে জমায়েত হত। উল্লেখযোগ্য, যেসব অঞ্চল থেকে তারা আসত, তাদের মধ্যে ছিল ১৮৬১ সালের ব্যাপক প্রতিরোধের কেন্দ্র হেণ্ডোয়া পরগনা।

সাঁওতালদের আচার-আচরণেও তখন বাইরের অনেকেই এক গভীর পরিবর্তন লক্ষ করে। এক সরকারি বিবরণমতে[১৮৮], তাদের চোখেমুখে "বিষাদ" আর "উদ্বেগে"র চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট; তারা যেন বিশেষ কিছুর প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ছিল; তাদের পরম আনন্দের উৎসব দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান সে বছর হলই না। জামতাড়া ডিভিশনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সরকার-বিরোধী মনোভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। তারা প্রতিবাদ জানায়, আদমশুমারির সব ভার দেওয়া হয়েছে বাঙালি তালুকদারের বাছাই লোকেদের ওপর; এদের থেকে সাঁওতালরা কী নিরপেক্ষতা আশা করতে পারে! আদমশুমারির সঙ্গে যুক্ত মিশনারিদেরও তারা শাসায়। একজনকে তারা বলে, লোকগণনার জন্য যারা গ্রামে আসবে, তাদের সবাইকে তারা খুন করবে। অন্য এক মিশনারির ধারণায়: 'কথায় আর কাজে তারা সম্পূর্ণ বিদ্রোহী।'[১৮৯] লোকগণনার সঙ্গে মিশনারিরা আর কোনো সংস্রব রাখে নি। নারায়ণপুরে বহু সাঁওতালের এক সমাবেশে নেতারা ঘোষণা করে, ১৮৫৫-র হুলে এখানকার ঘাটোয়ালকে সাঁওতালরা যেভাবে কুপিয়ে হত্যা করেছিল, সেকথা যেন আদম-শুমারির লোকেরা মনে রাখে। কোনো-কোনো জায়গায় পুরনো নেতারাই এ আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়।

'হুলে'র পর থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত সাঁওতাল আন্দোলনে তাই কয়েকটা পর্যায় লক্ষ করা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে। সহিংস পন্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে তারা সন্দিহান হয়ে পড়লেও সাঁওতালদের রাজনৈতিক চেতনা ক্রমেই স্পষ্ট হয়েছে। তার প্রধান লক্ষণগুলি আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

এ আন্দোলনগুলিতে ধর্ম এবং রাজনীতির যোগও প্রত্যক্ষ এবং গভীর। কিন্তু ধর্মবোধ কিভাবে রাজ-নৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়কে নির্ধারিত করতে পারে, এ সম্পর্কে সাঁওতালরা তখন সম্পূর্ণ নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছে। এ দিক থেকে এ সময়কার আন্দোলন-গুলি বিশিষ্ট।

নতুন ধ্যানধারণার মূল রূপ এই গভীর বিশ্বাস যে কয়েকটা বিশেষ দিক থেকে তাদের সমাজ আর ধর্মের আমূল রূপান্তর ছাড়া তারা 'মহান এক জাতিতে' পরিণত হতে পারবে না, আর সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও অপূর্ণ থাকবে।

১৮৫৫ সালের আন্দোলনে এ ধরনের কোনো ধারণাই আমরা দেখি না। আগেই বলেছি, দেবতার আবির্ভাবের ঘটনার পর থেকেই সাঁওতালদের ধর্ম-চেতনায় নতুন লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে; যেমন, তাদের এ নিশ্চিত প্রত্যয় যে, ব্রিটিশবাহিনীর গোলাগুলি তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না; কারণ তাদের জয় ঐশীশক্তি-অভিপ্রেত। কিন্তু সাঁওতালদের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস, আচার, নীতিবোধ বা সামাজিক প্রথায় কোনো পরিবর্তন সিধু-কানু গুরুত্বপূর্ণ মনে করে নি। তারা শুধু বলত, নতুন ঠাকুরের পুজোর উপকরণ যেন অনাবিল হয়; অর্থাৎ তারা আচার-অনুষ্ঠানগত শুদ্ধতার উপর জোর দিত। যুদ্ধক্ষেত্রে সাঁওতালদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কারণ হিসেবে তারা শুধু বলেছে, তাদের অনুগামীদের কোনো 'অপরাধে'র জন্য এটা ঘটেছে। কী সে 'অপরাধ', তা তারা স্পষ্ট করে বলে নি।

সিধু-কানু হয়তো সাঁওতালদের চারিত্রিক শুদ্ধতার কথা ভেবেছিল। কিন্তু এ শুদ্ধতা অর্জনের উপায় সম্পর্কে তাদের কোনো নির্দেশ ছিল না। এ শুচিতার সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতির সংযোগ সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি। ১৮৬১-১৮৭১-এ দশকের আন্দোলনেও এ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল বলে মনে হয় না। ভগীরথ-পরিচালিত আন্দোলনেই (১৮৭৪-৭৫) সর্বপ্রথম এটা লক্ষ করা যায়। পরে তা ব্যাপক সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নেয়।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার বিষয়ে সাঁওতাল-অঞ্চলে বিপুল নতুন উদ্দীপনার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে স্থানীয় জমিদার,

মিশনারি এবং অন্যান্য কেউ-কেউ তাদের ধারণার কথা বলেছে। একটা বিষয়ে তাদের মতৈক্য লক্ষণীয়। তারা প্রায় সবাই বলেছে, সাঁওতালরা নাকি বিশ্বাস করত, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার ছাড়া তাদের বৈষয়িক উন্নতি এবং "রাজনৈতিক অধিকার অর্জন" সম্ভব নয়।[১৯০] নানা জনের সঙ্গে কথা বলে সাঁওতাল পরগণার সহকারী কমিশনারেরও ধারণা হয়েছে, তাদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্লেষ ও বিদ্রুপাত্মক মতব্য সাঁওতালদের মনে এক তীব্র গ্লানিবোধের সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুরা তাদের হামেশাই বলত, 'বংগা' (বন্য?) সাঁওতাল, 'বোকা' সাঁওতাল। এই হীনম্মন্যতার ভাব দূর করার জন্যই সাঁওতালরা ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের কথা ভেবেছিল।[১৯০ক] এ সংস্কারের আদর্শ হিসেবে তারা হিন্দুদের কোনো-কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার গ্রহণ করেছিল কেন —এ প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য উত্তর এই যে, একটামাত্র বিকল্প যে সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তা হল হিন্দু-সংস্কৃতি। তা ছাড়া, তাদের ধারণা ছিল, তাদের উপর হিন্দু-দিখুদের অব্যাহত প্রভুত্বের উৎস উন্নত হিন্দু-সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতিনীতি আর আচার।

নতুন এই ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের যে ব্যাখ্যা উপরে উল্লেখ করেছি, তা অংশত গ্রহণীয় মাত্র। এ আন্দোলনের অন্য এক ব্যাখ্যার বিচার-প্রসঙ্গে পরে আমরা এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানে এ আলোচনার পদ্ধতি সংক্ষেপে নির্দেশ করব মাত্র।

সংস্কার আন্দোলনের জটিলতা এবং বহুমুখিতা এ ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে নি। সাঁওতালদের সম্পর্কে হিন্দু-সম্প্রদায়ের অপমানকর উক্তি আর আচরণ সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নয়। তাহলে এ আন্দোলন এক বিশেষ সময় শুরু হল এবং বিকাশলাভ করল কেন? হিন্দুদের আচরণ ছাড়া অন্য কিছু কি ঘটেছিল, যা এ সংস্কার-প্রয়াসকে প্রভাবিত করেছিল? এ সংস্কারকে সাঁওতালদের বৈষয়িক উন্নতির প্রধান উপায় বলে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র এর মধ্য দিয়ে বৈষয়িক উন্নতি কী ভাবে সম্ভব?' এ সংস্কার আন্দোলন কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন কোনো ধারা? এর সঙ্গে সাঁওতালদের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্ক কী? যদি দেখা যায়, ক্রমবিকাশমান রাজনৈতিক চেতনা এ সংস্কার-প্রয়াসকেও প্রবলভাবে উদ্দীপিত করেছে, তাহলে এ সংযোগ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

এ সংস্কার আন্দোলনে হিন্দু ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। এর স্রষ্টা গোদা সাবডিভিশনের তালদিহা গ্রামের ভগীরথ মাঝির "রাজা" হিসেবে "অভিষেক" হয় ভাগলপুর জেলার বাউসীর প্রসিদ্ধ হিন্দু-মন্দিরে।[১৯১] মাতাদিন বলে এক উত্তর-ভারতীয় হিন্দু[১৯২] অভিষেকের অঙ্গ হিসেবে তার কপালে টিকা দেয়। অন্য এক মতানুযায়ী টিকা দেয় বৈষ্ণব গোসাঁই মঙ্গল দাস।[১৯২ক]

সমসাময়িক নানা বিবরণ থেকে জানা যায়, সাঁওতাল অঞ্চলে যেসব বৈষ্ণব গোসাঁই প্রচারের জন্য যেতেন, তাঁদের প্রভাবেই আন্দোলনের ভাবাদর্শ গড়ে উঠেছে। "বাবাজি", "গোসাঁই" বলে তাদের লোকে ডাকত। ১৮৬৫ সালে আন্দোলনের নেতা কারু মাঝিরও পরিচয় ছিল "গোসাঁই" বলে। সরকারি প্রতিবেদনমতে এ বৈষ্ণব প্রচারকেরা সবাই 'একেবারে নীচু জাতের হিন্দু'। সম্ভবত এজন্যই হিন্দু জাতিভেদ-প্রথা সম্পর্কে তাদের খানিকটা ঔদার্য ছিল। তাদের প্রচারে প্রীতি ও সৌভ্রাত্রের আদর্শও সাঁওতালদের আকর্ষণ করে।

সমসাময়িক বিবরণের ভিত্তিতে সাঁওতালদের নতুন ধর্মবিশ্বাস আর আচার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব।[১৯৩]

নতুন ধর্মবোধের মূলভিত্তি সাঁওতালদের উপাস্য নানা বোঙ্গার বদলে এক-ভগবানে বিশ্বাস। ১৮৮০ সালের এক সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গ্রামের মধ্যে প্রচারিত সহস্র-সহস্র বেনামি চিঠিতে

সাঁওতালদের বলা হয়েছে, আসন্ন বিপর্যয় এড়ানোর জন্য যেন প্রতিদিন ভগবানের নাম নেয়। সাঁওতাল মাঝিদের কেউ-কেউ বলত, ভগবানের একত্বে বিশ্বাস তাদের আদি ধর্মীয় ধারণার অঙ্গ ; বহু দেবতা আর বোঙ্গার পূজার প্রচলন হয়েছে পরে ; এটা তাদের আদি বিশুদ্ধ ধর্মচেতনার বিকৃতিমাত্র। এ মাঝিদের ধারণা অনুযায়ী, সৎ মানুষদের উপর বোঙ্গার কোনো কর্তৃত্বই নেই ; অসৎ মানুষদের জন্যই বোঙ্গারা সৃষ্টি করে নানা উপদ্রব, আধি-ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশা।

সাঁওতালদের আদি ধর্মবিশ্বাস যাই হোক না কেন, ১৮৫৫ সালের হুলের আগে এ ধরনের চিন্তার ব্যাপক অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। সিধুকানু যে ভগবানের কথা বলত, তা নিঃসন্দেহে আঞ্চলিক বোঙ্গা নয়। কিন্তু বোঙ্গা-উপাসনা বর্জনের কথা তারা প্রকাশ্যে বলেছিল কিনা জানা যায় না। এক-ভগবানে নতুন বিশ্বাস যদি সাঁওতালদের আদি বিশ্বাসের পুনরুজ্জীবনও হয়, তাও সাঁওতাল নেতাদের সচেতন প্রয়াসের ফল। বৈষ্ণব-প্রচারকদের সংস্পর্শ এক্ষেত্রে তাদের অবশ্যই প্রভাবিত করেছে।

সংস্কার আন্দোলনের অন্য দিকগুলির উপরও হিন্দু ধারণার প্রভাব অনস্বীকার্য—যেমন শুদ্ধ (সাফা) জীবনচর্যা। সাফা সাঁওতালদের কয়েকটা প্রধান করণীয় ছিল : যা কিছু অশুচি তা বর্জনীয়। নতুন বিশ্বাসমতে, শুয়োর আর মুরগি পোষা শুদ্ধাচার-বিরোধী ; তাদের আশু সংহার তাই অবশ্য কর্তব্য। সাঁওতালদের নানা প্রথাসম্মত খাদ্যও পরিত্যাজ্য, যেমন গোরু আর শুয়োরের মাংস ; নানা পালা-পার্বণে তাদের অতি প্রিয় পানীয় মদ্যকেও সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। নৈতিক চরিত্রেও সাফারা হবে শুদ্ধ, নিষ্কলুষ। রোজ স্নান করা ও শুচিবস্ত্র পরিধান শুদ্ধ জীবনযাত্রার অঙ্গ বলে গণ্য হত। সাফাদের কেউ-কেউ কপালে ফোঁটা নিত। ১৮৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক নতুন ধর্মীয় আচার পাকুড় জেলার সাঁওতালদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।[১৯৪] এর প্রচলন করে সাঁওতালপরগনা সীমান্তবর্তী মুর্শিদাবাদ জেলার বড়তলা অঞ্চলের এক বৃদ্ধ সাঁওতাল চাঁদ রায়। বহু শিষ্য জড়ো করিয়ে চাঁদ তাদের কপালে "বেলা-টিকা" পরিয়ে দেয় ; বৈচিজাতীয় এক ধরনের ফলের রসের সঙ্গে অন্যান্য উপকরণ মিশিয়ে টিকা দেবার জিনিস তৈরি করা করা হত। 'সাফা'দের মধ্যে কেউ-কেউ ব্রাহ্মণদের মতো উপবীত ধারণ করত। রবিবারে কোনো কাজ না করার অনুশাসন সম্ভবত মিশনারি-দের প্রচারের ফল। তা ছাড়া, সাঁওতাল গুরুরা বলেছিল, যে ডাইনি-প্রথা সাঁওতাল সমাজের ঐক্য আর সংহতিকে নষ্ট করে দিচ্ছে, তাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করতে হবে। বিভিন্ন জায়গায় সংস্কার-আন্দোলনের আরো নানা বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে।[১৯৪ক]

উল্লেখযোগ্য এই, শুদ্ধাচারের যে ধারণা সংস্কার-আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে, তা প্রধানত হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারণা। শুয়োর-মুরগি পোষা, গোরু আর শুয়োরের মাংস খাওয়া, মদ্যপান ইত্যাদিকে সাঁওতাল বা অন্য উপজাতিরা কখনো গর্হিত কাজ মনে করে নি, শুদ্ধাচারবিরোধী তো নয়ই। শুয়োর আর মুরগি পোষা তাদের জীবিকার একটা প্রধান অবলম্বন। মদ্যপান তাদের যৌথ সমাজ-জীবন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ। "পবিত্রতা"র নতুন ধারণা তাই সাঁওতাল সংস্কৃতি, সমাজ এবং অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতি-পূর্ণ নয়।

নতুন সাফা সাঁওতালদের কাছে এসব সংস্কার শুধুমাত্র বিশ্বাসের প্রশ্ন ছিল না; এগুলি ছিল দৈনন্দিন জীবনচর্যার অপরিহার্য অঙ্গ। শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলার সংঘবদ্ধ আন্দোলনের অতিদ্রুত বিস্তারকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়।[১৯৫] এ ধরনের ঘটনা আগে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটলেও, বাউসীর হিন্দু-মন্দিরে ভগীরথের অভিষেকের (২৪ জুলাই, ১৮৭৪) পর থেকে এ আন্দোলন সংঘবদ্ধভাবে শুরু হয়। ভগীরথের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনস্বীকার্য। পূর্ববর্তী সাঁওতাল গুরুর মতো তাকেও সাঁওতালরা অতিপ্রাকৃত শক্তির

অধিকারী বলে বিশ্বাস করত। প্রায় বারো শ সাঁওতালের জমায়েতে ভগীরথ এ শুদ্ধির কথা বলে। এক মিশনারির প্রতিবেদনমতে, যারা এভাবে "শুদ্ধ" হয় নি, তাদের বাউসীর মন্দিরে এবং তালদিহার নতুন সাঁওতালমন্দিরে উপাসনা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেওয়া হত না। সাধারণ সাঁওতাল পরিবারের পক্ষে শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু ভগীরথের নির্দেশ বহু জায়গায় মানা হয়।

এ বিষয়ে গোড়ায় সাঁওতালদের কোনো গোপনীয়তা ছিল না।[১৯৬] পরে যখন তারা দেখল, সরকার এটাকে সুনজরে দেখছে না, তারা সতর্ক হয়; লুকিয়ে-চুরিয়ে এসব কাজ চালিয়ে যায়; তবুও থানা-পুলিশের কাছে এ কাজ জানাজানি হয়ে গেলে তারা ওজর-অজুহাত দেখিয়ে নিস্তার পেতে চেষ্টা করে। স্বভাবতই, এ প্রাথমিক উদ্দীপনা পরে খানিকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে আবার তা ফিরে আসে।

'সাফা হোর'দের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন এ নতুন ধর্ম আর নীতিবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। বস্তুত, নতুন বিধিবিধান আর অনুশাসনের কঠোরতার জন্য সাফারা অন্য সাঁওতালদের থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল। কারণ সব সাঁওতাল নতুন আদর্শে সমানভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারে নি। দীর্ঘদিনের ধর্মবিশ্বাস এবং আচার বর্জন করা অনেকের পক্ষে সহজ ছিল না; কারণ বহুক্ষেত্রে এ বিশ্বাস আর আচার ছিল তাদের সমাজগঠনের মূল বনিয়াদ। তা ছাড়া, বহু জায়গায় কৃষি-উৎপাদানের অনিশ্চয়তার জন্য, শুয়োর-মুরগি না পুষলে তাদের সংসার চালানোই শক্ত হত, বিশেষ করে যখন জমির খাজনা অনবরত বাড়ছিল; আর তাদের দীর্ঘদিনের "অরণ্যের অধিকার" ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল।

সাফারা এসব বুঝতে চায় নি। "ঝুটা" সাঁওতালদের সম্পর্কে তাদের অসহিষ্ণুতা এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে।[১৯৭] সাফারা ঝুটাদের তাদের খাবার, বাসনপত্র এবং জল ছুঁতে দিত না; এক কুয়ো থেকে তারা জল তুলত না। সমসাময়িক এক বিবরণ থেকে জানা যায়, ব্রাহ্মণরা ডোমদের যে চোখে দেখে, সাফারা ঝুটাদের সেভাবে দেখত। এমনকী, কোনো-কোনো জায়গায় সাফারা "সাঁওতাল" বা "মাঝি" বলে তাদের উল্লেখ পছন্দ করত না; তারা বলত, তারা "খেরওয়ার, রামহিন্দু খেরওয়ার।" হিন্দুদের তারা সহ্য করত, কিন্তু ঝুটাদের একেবারেই নয়। ধর্মীয় আর সামাজিক অনুষ্ঠানে সাফা আর ঝুটাদের মধ্যে কোনো মেলামেশা ছিল না। কোনো রকম বৈবাহিক সম্পর্কও ছিল না। লক্ষণীয় এই যে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য এবং ব্যবধানের রূপও হিন্দুবর্ণপ্রথার আদলেই গড়ে উঠেছে।

৯১৩

সাঁওতালদের এ সংস্কার আন্দোলন এবং অন্যান্য উপজাতিদের ও সমধর্মী আন্দোলনের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।[১৯৮] বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে সবগুলির বিচার সম্ভব নয়। শুধু দুটি ব্যাখ্যার সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

প্রথম ব্যাখ্যা হার্ডিম্যানের[১৯৯]—গুজরাতের এক আদিবাসী গোষ্ঠী এবং অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে। দ্বিতীয়টির প্রবক্তা মার্টিন ওরান্স; বিষয়, সাঁওতালদের বিশিষ্ট আন্দোলনটি, যার বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি।

হার্ডিম্যান মনে করেন: সংস্কারের আদর্শ হিসেবে উপজাতিরা যে মূল্যবোধ অনুকরণ করে, তা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মূল্যবোধ; নিম্নবর্গের উপর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় এ মূল্যবোধের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে; ব্যাপকভাবে এ মূল্যবোধ গ্রহণ করাতে উপজাতিদের একটা সচেতন লক্ষ্য আছে—এতে এ মূল্যবোধের মাধ্যমে ক্ষমতাবান সম্প্রদায় তাদের প্রভুত্ব কায়েম করার সুযোগ হারাবে।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণীয় কিনা, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে এ মূল্যবোধ গ্রহণের লক্ষ্য সম্পর্কে উপজাতিদের নিজস্ব ধারণার উপর। এ সম্পর্কে উপজাতিদের ধারণা সঠিক কী ছিল, অন্তত হার্ডিম্যানের আলোচনা থেকে তা জানা যায় না। সংস্কার-আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে সাঁওতালরা স্থানীয় জমিদার, মিশনারি বা প্রশাসনের লোকদের নানা কথা বলেছে। কিন্তু তা হার্ডিম্যানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ওরান্সের আলোচনার বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র।[২০০] সভ্যতা আর সংস্কৃতির দিক থেকে ভিন্ন সাঁওতাল ও হিন্দু সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিকাশের রূপ বিশ্লেষণ তিনি করতে চেয়েছেন, বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজের উপর হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবের রূপ। এ প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন—কেন একটা বিশেষ সময়ে সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দুদের কোনো-কোনো মূল্যবোধ এবং আচার অনুকরণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

ওরান্সের মতে : "হুলে"র আগেই হিন্দু-সংস্কৃতির কোনো-কোনো দিক সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে। সাঁওতালদের ইতিহাসে হুল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শুধুমাত্র কয়েকটা অর্থনৈতিক অভিযোগ দূর করার জন্য তারা হুলে নামে নি ; তাদের লক্ষ্য ছিল, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আর গোষ্ঠী হিসেবে পদমর্যাদার উন্নয়ন (rank improvement)। হিন্দুদের থেকে নেওয়া কিছু-কিছু আচার থেকে এ উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়—যেমন উপবীত ধারণ, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে (ritual use) আতপ চাল, তেল, সিঁদুর আর গোবরের ব্যবহার। হুলের সর্বাত্মক ব্যর্থতা এ দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব নানাভাবে তখন বেড়ে যায়। এর একটা প্রধান কারণ, সাঁওতালদের নতুন উপলব্ধি যে সহিংস পথ বা অন্য কোনো রাজনৈতিক উপায়ে তাদের মূল লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। রাজনৈতিক পথ পরিহার করে তারা হিন্দুদের মূল্যবোধ এবং আচার অনুসরণের মধ্য দিয়েই তাদের পদমর্যাদা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হল। হুলের 'ঠিক পরেই' তাই খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু, যার মূল লক্ষ্য এ বিশেষ ধরনের উন্নয়ন সাধন। হিন্দুদের মূল্যবোধ গ্রহণের মাধ্যমেই এ উন্নয়ন সম্ভব। এ ধারণার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর অর্থ, সাঁওতালরা মেনে নিয়েছে, হিন্দু-দিখুরা পদমর্যাদায় উন্নততর, আর তারা নিকৃষ্ট। এ মেনে নেওয়াকে ওরান্স বলেছেন rank concession syndrome.

এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। ওরান্স সাঁওতাল সংস্কার-আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যই শুধু আলোচনা করেছেন। এর বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি এমনও বলেছেন, রাজনৈতিক পন্থার বর্জন অপরিহার্য হল বলেই হিন্দু মূল্যবোধের অনুকরণ সাঁওতালদের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ মনে হল।

হুলের ব্যর্থতার পর সহিংস উপায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাঁওতালদের অবিশ্বাসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তারা রাজনৈতিক পথকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করল। সংঘবদ্ধ হিংসা নানা রাজনৈতিক পথের অন্যতম মাত্র। রাজনৈতিক পথ সর্বতোভাবে পরিহার করার প্রশ্নই ওঠে না; কারণ সে সময়কার সাঁওতাল মানসিকতার মূল লক্ষণ এ দৃঢ় প্রত্যয় যে, স্বাধীন সাঁওতালরাজের প্রতিষ্ঠা না হলে দিখুদের প্রভুত্বের অবসান ঘটবে না। অর্থাৎ, যে দৃষ্টিকোণ থেকে সাঁওতালরা তখন দিখুদের সঙ্গে তাদের জটিল সম্পর্কের কথা ভাবছিল, তা একান্তভাবেই রাজনৈতিক। এটা সম্ভবত অনিবার্য ছিল। কারণ, সাঁওতাল সমাজ আর অর্থনীতিতে সংকটের রূপ তখন তীব্রতর হয়েছে ; দিখুদের কর্তৃত্ব আরো গভীরভাবে কায়েম হয়েছে।

হিংসার পথ সাঁওতালরা যথাসম্ভব পরিহার করল। কিন্তু বিকল্প রাজনৈতিক পথ সম্পর্কে তারা অনবরত ভেবেছে। শত্রুর উপর যদি সরাসরি আঘাত

হানা সম্ভব না হয়, তাহলে কিভাবে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করা যাবে? সাঁওতাল নেতাদের ধারণা ছিল, স্বাধীন সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে সংঘবদ্ধ প্রচার করতে হবে; তারা জানুক—এককালে তারা স্বাধীন "মহান জাতি" ছিল; তাদের হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে; বহু সাঁওতালকে যদি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়, তাহলে দিখুরা পুরনো কায়দায় চলতে সাহস পাবে না; কারণ সংখ্যার দিক থেকে দিখুরা নগণ্য। সাঁওতালদের অতীত ইতিহাসচেতনা জাগ্রত করার একটা উপায় হিসেবে নেতারা সাঁওতালদের পুরনো নাম "খেরওয়ার" কথাটা চালু করে। শুধু সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্পে দীক্ষিত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। অন্য ধরনের প্রস্তুতিও অপরিহার্য। যেমন, ব্যক্তি- ও সমাজ-জীবনে যা-কিছু গলদ, তা দূর করতে হবে; এক কথায়, ব্যক্তির নৈতিক রূপান্তর এবং নানা ধরনের সামাজিক কু-প্রথার বিলোপের মধ্য দিয়ে একটা নতুন সাঁওতাল সমাজ গড়ে তুলতে হবে। "সংস্কার-আন্দোলনে"র লক্ষ্য তাই শুধু "পদ-মর্যাদার উন্নয়ন" নয়; তা বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির একটা বিশেষ অঙ্গ মাত্র।

ওই সময়কার সাঁওতাল আন্দোলন সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাদের অনেকেই নতুন সংস্কার আন্দোলন (১৮৭৪-১৮৮২) এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে নিগূঢ় সংযোগের কথা বলেছেন। তাঁদের এ সম্পর্কিত কিছু মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করছি।

স্থানীয় রাজকর্মচারীদের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে ছোটোলাট টেম্পল এ সিদ্ধান্তে আসেন (৯ মার্চ, ১৮৭৫): 'প্রতিটি সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা প্রধান কারণ থাকে। বর্তমানে ক্ষেত্রে কারণটা হল খাজনা-বিরোধী এক ব্যাপক মানসিকতা'।[২০১]

সাঁওতাল পরগনার কমিশনার বার্লো[২০২] কাছে, সাঁওতাল আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব শুধুমাত্র সাম্প্রতিককালে নতুন খাজনার হারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য নয়। তাঁর ধারণা (৯ মার্চ, ১৮৭৫): 'শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ভগীরথের আন্দোলন শুরু হয়েছে কি হয় নি, তা আসল কথা নয়; গোড়া থেকেই এর সঙ্গে মিশে ছিল এক ধরনের আপত্তিজনক রাজনৈতিক বোধ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আন্দোলনের শুরুতে ভগীরথ নিজে বা তার নিকট অনুগামীরা বলত, এমন সুদিন আসবে, যখন "রাজ" এবং জমি হবে সাঁওতালদের; সবচাইতে বেশি খাজনার হারও হবে লাঙলপিছু আট আনা মাত্র।' কমিশনারের তাই সিদ্ধান্ত ছিল,[২০৩] যে নতুন সাঁওতাল মন্দিরকে ঘিরে সাঁওতাল সংগঠন গড়ে উঠেছে, তাকে ভেঙে দিতে হবে, এবং তার সাঁওতাল পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

এক খ্রীষ্টান মিশনারি কোল (Cole) প্রায় ন বছর যাবৎ সাঁওতালদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগের ভিত্তিতে লিখছেন—বাইরের প্রকাশ থাকুক বা না থাকুক, "খেরওয়ার" মানসিকতা এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের মতো; মাঝে-মাঝেই তাদের নিরুদ্ধ ক্ষোভের 'বিস্ফোরণ ঘটে; অতি সামান্য কারণেই তা ঘটেছে'।[২০৪]

যে উপলক্ষে খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু (১৮৭৪), তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন মহেশপুরের জমিদার গোপালচন্দ্র সিংহ। দুর্ভিক্ষের সময় (১৮৭৩-৭৪) ধার হিসেবে দেওয়া চালের দাম সরকার যখন আদায় করে নিচ্ছিল, তখন 'ভগীরথ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, এ চালের দাম তারা ফেরত দেবে না; কারণ এ শস্য তাদের পিতৃপুরুষদের সম্পত্তি; তাদের আদি নিবাসের অঞ্চল থেকে এ চাল আনা হয়েছে।'[২০৫]

খেরওয়ার আন্দোলনের অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে সাঁওতাল মানসিকতায় এক বিশেষ পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন পাকুড়ের জমিদার তরেশনাথ পাণ্ডে[২০৬]: 'খেরওয়ার সাঁওতালরা চেষ্টা করে, কী

ভাবে সবচাইতে বেশি রাজনৈতিক সুবিধাদি আদায় করা যায়; তারা বিশেষভাবে চায়, জমিদার বা সরকার কাকেও খাজনা দেবায় দায়দায়িত্ব তাদের থাকবে না; এ বিষয়ে তাদের যুক্তি হাস্যকর; তারা বলে, জমিদার বা সরকার কেউ তো জমি সৃষ্টি করে নি; জলসেচের কোনো ব্যবস্থা করে নি, বা জমিও চাষ করে নি···খাজনা ইত্যাদি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ব্যবস্থার পর থেকে হিন্দুদের সমান রাজনৈতিক অধিকার পাবার জন্য তাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই বেড়ে চলেছে; এমনকী তারা চাইছে, হিন্দুদের তুলনায় তাদের রাজনৈতিক অধিকার বেশি থাকুক।'

খ্রীষ্টান মিশনারি কোলের ধারণা, খেরওয়ার আন্দোলন 'আসলে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের আন্দোলন। [আয়ারল্যাণ্ডের] ফোনিয়ান আন্দোলনের সঙ্গে এর বহু বিষয়ে মিল; ধর্ম এখানে আবরণ মাত্র; খেরওয়ার দল-বহির্ভূত সাঁওতাল এবং [স্থানীয়] খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী-দের মতে, সাফাহোরেরা বলাবলি করে—'জমি আমাদের; আমরা জঙ্গল সাফ করেছি; তাই কোন খাজনা আমরা দেব না; আমরা একজোট হয়ে ইংরেজদের তাড়াব।'[২০৭]

জামতাড়ার আর-এক মিশনারি কর্নেলিয়সেরও ধারণা, খেরওয়ারদের আসল লক্ষ্য, 'সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করা'।[২০৮]

সাঁওতাল পরগনার সহকারী কমিশনার লক্ষ করেন[২০৯] কিভাবে ধীরে-ধীরে খেরওয়ার আন্দোলনের রূপান্তর ঘটল: 'গোড়ায় খেরওয়ার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র ধর্মসম্পর্কিত'। ভগীরথের আমলে 'তা এক রাজনৈতিক রূপ ছিল; আন্দোলনের নতুন শক্তি যোগাল খেরওয়ার স্বর্ণযুগের কল্পকাহিনী; যেখানে তারা পাবে তাদের মনোমত নেতা [শাসক], আর পাবে অপর্যাপ্ত জমি, যার জন্য কোনো খাজনা দিতে হবে না; হুমকি আর শাসানি দেবার জন্য থাকবে না কোনো হাকিম।'

কিভাবে এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে খেরওয়ার আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, সাঁওতাল পরগনা-প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত কোসেরাট তা ব্যাখ্যা করেন।[২১০] খাজনার হার নিয়ে সাঁওতালরা বরাবর বিক্ষুব্ধ ছিল। ১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় একজোট হয়ে তারা জমিদারের যথেচ্ছ খাজনা বাড়ানোর চেষ্টায় বাধা দেয়। সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য সরকার ১৮৭২ সালে এক আইন পাশ করে খাজনার নতুন হার ঠিক করার ব্যবস্থা নেয়। বহু জায়গায় ফল হল বিপরীত। সাঁওতালদের অসন্তোষ বেড়েই চলে। কোসেরাট লক্ষ করেন: 'এর ঠিক পরেই খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু···আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ···জমি ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যাপক উত্তেজনা আর অসন্তোষ না থাকলে আন্দোলন এত দ্রুত বাড়তে পারত না। খেরওয়ার আন্দোলনের গুপ্ত, পবিত্র [ধর্মীয়] লক্ষ্য কী ছিল জানি না; কিন্তু খোলাখুলি ভাবে রাজকর্মচারীদের কাছে বার-বার তারা যে লক্ষ্যের কথা বলেছে, তা হল এই যে, কোনো ধরনের ট্যাক্সো বা খাজনা তারা আর দেবে না; রাস্তাঘাট সারানোর জন্য তারা বেগার খাটবে না; সাঁওতাল পরগনায় এ ধরনের বেগার খাটা চাষীদের পক্ষে বাধ্যতামূলক···আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে ভগীরথ বলল, খাজনা ব্যাপারটাই থাকবে না; কিন্তু এ লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য সাঁওতালদের পুরনো ধর্মকে সম্পূর্ণ ছেড়ে হিন্দুধর্মের সমগোত্রীয় কোনো ধর্মকে গ্রহণ করে হবে।'

এ বিশেষ রাজনৈতিক মেজাজের জন্যই হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস আর আচারের কিছু-কিছু গ্রহণ করলেও সাঁওতালরা মনেপ্রাণে সাঁওতাল থেকে গেছে। বস্তুত, তারা হিন্দু হতে চায় নি; তারা শুধু বিশ্বাস করে-ছিল, হিন্দু মূল্যবোধ গ্রহণের ফলে দিখুদের প্রভুত্বের বদলে সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। সংস্কার-আন্দোলনের ফলে "সাফা" সাঁওতাল ও "ঝুটা" সাঁওতালদের মধ্যে নতুন এক ধরনের সামাজিক বৈষম্য আর ব্যবধানের সৃষ্টি হল। কিন্তু তা হিন্দুজাতিভেদ-

প্রথাপ্রসূত বৈষম্য বা ব্যবধান নয়। এ ব্যবধানের কারণ ঝুটাদের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে 'সাফা'দের তীব্র অসহিষ্ণুতা। তাদের ধারণা, ঝুটাদের সংস্কার-বিরোধিতা নতুন সাঁওতালরাজ সৃষ্টির পথে বড়ো এক অন্তরায়। সাফাদের কেউ-কেউ উপবীত ধারণ করেছিল; কিন্তু তাও হিন্দুবর্ণবৈষম্যের প্রতীক নয়; খেরওয়ার নেতারা কেউ কখনও বলে নি যে উপবীত ধারণের অধিকার সবার নেই। সাঁওতাল রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবেগ মন্থর হয়ে এলে বহু সাঁওতাল তাই আবার তাদের আদি ধর্মবিশ্বাসে ফিরে যায়। তা ছাড়া, সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাদের নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছিল বলে হিন্দু দিখুদের সম্পর্কে তাদের প্রকাশ্য বৈরিতা কখনও কমেনি। এ বৈরিতা শুধুমাত্র শ্রেণীবোধের ফল নয়; অর্থাৎ যে দিখু গোষ্ঠীদের তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ বলে ভাবত, শুধু তাদের ক্ষেত্রেই এ বৈরিতা সীমাবদ্ধ ছিল না। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। ডালটনের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (১৮৭২) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[২১১] হিন্দু পাচকের রান্না ভাত সাঁওতালরা কোনোরকমে খেতে রাজি হয়নি; এমনকী পাচক ব্রাহ্মণ হলেও নয়। অথচ ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সাঁওতালদের এ মনোভাব দেখা যায় নি। অনশনক্লিষ্টদের মধ্যে সরকার তখন যে খাবার বিলিয়েছে, তার সবটাই ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না।

সাঁওতাল মানসিকতার এ জটিলতা, বৈচিত্র্য এবং বহুমুখিতার দিকগুলি উপেক্ষা করলে সাঁওতাল আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণের কাজ অসম্পূর্ণ হবে।

[ক্রমশ

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১৭৫. Bengal Judicial Progs, Feb. 1867, No. 120; Deputy Commissioner, Santal Parganas to the Commissioner, Santal Parganas, 31 Jan, 1867. সহকারী কমিশনার একটা বিশেষ বাজার সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন: 'before the Santal Insurrection...there were only 10 or 12 mahajuns and petty traders in the Lohundia Bazar whereas now there are nearly 80, principally Bhojpooria Bhukots [Bhagats] coming from the district of Arrah.'

১৭৬. Bengal Judicial Progs, June 1861, No. 371. সাঁওতাল পরগনার অস্থায়ী কমিশনারের চিঠির (২৪ মে, ১৮৬১) Para 17.

১৭৭. Bengal Judicial Progs, May 1861, No. 524; Taylor, Assistant Commissioner, Santal Parganas to the Govt. of Bengal, 5 May, 1861. টেলর লিখেছেন, কানুর ফাঁসির আগের দিন সে নাকি টেলরকে এ কথা বলেছে; সাঁওতালরা নাকি তার এ কথা শুনেছে। টেলরের বিশ্বাস, কানুর এ ভবিষ্যদ্বাণী সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে।

১৭৮. Bengal Judicial Proceedings, July 1865, No. 72; Wilmot, Assistant Commissioner, Santal Parganas to Commissioner, Santal Parganas, 17 June, 1865.

১৭৯. Bengal Judicial Progs, July 1871, No. 163; Raja of Moheshpur to Deputy Commissioner, Santal Parganas, 3 July, 1871.

১৮০. Bengal Judicial Progs, July 1871, No. 165; Govt. of Bengal to the Govt. of India, 11 July 1871, Para 3.

১৮১. Bengal General (Misc) Proceedings, Sept 1875, File No. 133—1/4. Bhagalpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1874-75; Para 76.

১৮২. Bengal Judicial Progs, Nov. 1874, Nos. 1-3; Boxwell, Offg. Dy. Commissioner, Santal Parganas to the Commissioner, Santal Parganas, 1 Oct, 1874; Para. 19.

১৮৩. একই; The Rev. A. Stark, Church Missionary, to Barlow, Commissioner of the Bhagalpur Division, 2 Sept. 1874.

১৮৪. একই।

১৮৫. Bengal Judicial Progs, Aug. 1881 ; Nos. 39-40. Reply from the Rev. F. F. Cole, of Bahawa in Rajmahal, Church Missionary Society to Question No. 7 : 'What is the origin of the Kherwar movement... ?'

১৮৫ক. একই ; Reply from the Rev. A. stark of Taljhari in Rajmahal, Church Missionary Society : to Question No. 5 : "What do you think was the cause of the opposition to the Census,..." ?

১৮৬. একই ; Barlow, Commissioner of the Bhagalpur Division to the Govt. of Bengal, Judicial Dept. 8 June, 1881 ; Para 12.

১৮৭. একই ; Appendix A : 'Note by the Deputy Commissioner of the Sonthal Pargans : 'State of Affairs in the Santhal Parganas'. 16 March, 1881.

১৮৮. একই ; সহকারী কমিশনার Oldham-এর ভাষায় : 'the Sonthals appeared to be shy, gloomy, and either anxious or expectant...' ; Para 6.

১৮৯ একই ; যে মিশনারির কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে, তাঁর নাম Cornelius, Jamtara outpost, Para 8.

১৯০. একই ; Reply from Baboo Taresh Nath Pandey, Zemindar of Pakour to Question No. 7. (পাদটীকা নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য) : পাণ্ডের মন্তব্য : 'It was some seven or eight years ago that some of the ordinary Sonthals, struck with the disparity between theiro wn status and that of the Hindus about them, who were showing signs of life and improvement in every direction, were fired with a desire of bettering then own social and religious condition as preliminary to joining political rights'.

১৯০ক. একই ; Appendix C ; Reply from Captain Carnac, Assistant Commissioner, S.P. ; Answer to Question No. 8. Carnac-এর মন্তব্য : 'their [Santals'] inferiority to their neighbours must have been felt amongst them...the term 'Banga Sonthal' 'Boka Sonthals', so frequeutly used towards them by their Hindu neighbours, must have been very galling.'

১৯১. পাদটীকা নং ১৮১ দ্রষ্টব্য

১৯২. একই। এর নাম মাতাদিন। কমিশনার তাকে 'ex-mutineer of a cavalry regiment' বলে উল্লেখ করেছেন। ভাগলপুর জেলেই নাকি ভগীরথের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা হয়। ১৮৬৮ সাল থেকে তাদের এ ঘনিষ্ঠতা অব্যাহত থাকে। ভগীরথ-আন্দোলনের সময় বিদ্রোহী সিপাহি মাতাদিনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার কোনো ইঙ্গিত সরকারি দলিলে মেলে না।

১৯২ক. আদমশুমারি-বিরোধী আন্দোলনে মঙ্গল দাসের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

১৯৩. পাদটীকা নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য। ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার খেরওয়ার আন্দোলন সম্পর্কিত বারোটি প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য জমিদার, মিশনারি, প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত রাজকর্মচারীদের কাছে পাঠান।

১৯৪. Bengal Judicial Proceedings, March 1875, File No. 40-88. A Note of G. N. Barlow, Bhagalpur Commissioner, 'upon the course of events occurring in the Santal Perguanahs subsequent to 1872, which have led to the state of affairs at the present time ; date 9 March 1875 ; Para 8.

১৯৪খ. এ ধরনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। সাফারা ভগবানের একত্বের কথা বলত; কিন্তু হিন্দুদের নানা দেবদেবীর পুজোও করত (যেমন দুর্গা, কালী)। পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ঘি, দুধ এবং চালের ব্যবহার নানা জায়গায় দেখা গেছে। রুদ্রাক্ষের ('sacred beads') মালাও অনেকে পরত। কেউ-কেউ মাথায় টিকি রাখত। বৈষ্ণব গোসাঁইদের মতো অনেকে লম্বা চুল বা দাড়ি রাখত ; তাদের মতো বিশিষ্ট কায়দায় কাপড় পরত। সাফারা সাধারণত হাঁড়িয়া খেত না, কিন্তু তাদের গাঁজায় আসক্তির কথা অনেকেই বলেছে। এও সম্ভবত 'বাবাজী'দের প্রভাবের ফল। বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে তারা হিন্দুদের মতো মাটির বাসনপত্র ভেঙে ফেলে দিত। তারা শুয়োর আর মুরগি মেরে ফেলেছে। কিন্তু পায়রা, ছাগল এবং ভেড়া পোষাটা তাদের কাছে শুদ্ধাচারবিরোধী মনে

হয় নি। চাষের জন্য গোরু-টানা হালের ব্যবহারে অনেক সাফার আপত্তি ছিল। পোশাকে এক লক্ষণীয় পরিবর্তন—ল্যাংগুটির বদলে ধুতির ব্যবহার।

১৯৫. (১) Bengal Judicial Proceedings, Nov. 1874, Nos. 1-3 ; ভাগলপুর কমিশনার বার্লোর চিঠি (৭ অকটোবর, ১৮৭৪) ; Paras 6-7 ; (২) তাছাড়া, Bengal Judicial Proceedings, March, 1875, File 40-88 ; A Note by the Bhagalpur Commissioner, 9 March, 1875 ; Paras 3 & 8.

১৯৬. পাদটীকা নং ১৯৫(১) দ্রষ্টব্য। Letter from, Boxwell, offg. Deputy Commissioner, Santal Parganas, 1 Oct., 1874 Para 11.

১৯৭. শুয়োর-মুরগি মারার ব্যাপারে গুরুর নির্দেশ পালনে কোনো শিথিলতা সাফারা বরদাস্ত করে নি। এ সম্পর্কে এক সরকারি রিপোর্টে বিবৃত একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সাঁওতাল পরগনার সহকারী কমিশনার ক্যাপ্টেন Carnac লিখেছেন : 'I have known a kherwar in a fit of anger at the uncleanliness of a neighbour Santhal run amok in his poultry yard and kill three or four fowls before he could be stopped'. Bengal Judicial Proceedings, Aug. 1881, Nos. 39-40 ; Appendix C ; ভাগলপুর কমিশনারের ছয় নং প্রশ্নের উত্তর। সাফা ও ঝুটাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামাজিক ব্যবধান সম্পর্কে তথ্যের জন্য ভাগলপুর কমিশনার প্রেরিত ৬-৮ নং প্রশ্নের নানা উত্তর দ্রষ্টব্য। মূলসূত্র একই ; Appendix B.

১৯৮. দক্ষিণ গুজরাতের দেবী আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে এ ধরনের কয়েকটা ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন : David Hardiman, Adivasi Assertion in South Gujarat : the Devi Movement of 1922-23, in R. Guha (ed) : Subalterm Studies, III, (O.U.P., 1984), পৃ ২১১-২১৭। বিস্তৃত আলোচনার জন্য, D. Hardiman, *The Coming of the Devi ; Adivasi Assertion in Western India* (O.U.P., 1987) ; Ch. : 9.

১৯৯. David Hardiman, পূর্বোল্লেখিত ; 'Adivasi Assertion' in South Gujarat etc , পৃ ২১৭-২১৯

২০০. Martin Orans, *The Santal : A Tribe in Search of a Great Tradition.* (Wayne State University, Detroit, 1965 , পৃ ৩০-৩৯

২০১. পাদটীকা নং ১৯৫ ২) দ্রষ্টব্য ; File No. 40-89 ; Minute by the Lieutenant Governor of Bengal, 9 March, 1875 ; Para 3

২০২. একই ; File No. 40-88 ; A Note by G. N. Barlow, Commissioner of the Bhagalpur Division, 9 March 1875 ; Para 7. কমিশনারের মতে, খাজনা-বিরোধী আন্দোলন এবং ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে নিগূঢ় সংযোগ এ ক্ষেত্রে 'অনিবার্য'।

২০৩. পাদটীকা নং ১৮১ দ্রষ্টব্য। কমিশনারের নির্দেশ ছিল, মন্দিরটাকে ভেঙে এক পুলিশ ফাঁড়ি বানানো হোক। আসলে সত্যিকারের সম্পূর্ণ মন্দির ছিল না। কমিশনার জানতে পারেন : '...the Shrine was represented by a mere shed containing a few rough stones'। পাদটীকা নং ২০২ দ্রষ্টব্য। কমিশনারের চিঠির (৯ মার্চ, ১৮৭৫) Para 4.

২০৪. Bengal Judicial Proceedings, Aug. 1881, Nos. 39-40 ; Appendix B, ভাগলপুর কমিশনারের ৭ নং প্রশ্নের উত্তর। Cole লিখছেন : 'Kherwarism has periodical outbursts ; the least thing causes it to burst forth'.

২০৫. একই ; ৭নং প্রশ্নের উত্তর

২০৬. একই ; পাণ্ডের সিদ্ধান্ত : '...now they [kherwars] are a religious sect no less than a political body bound up by a strong unity, and holding themselves quite aloof from the non-kherwars in every branch of occupation and in all their social and religious dealings'.

২০৭. একই

২০৮. একই

২০৯. একই ; Appendix C ; ভাগলপুর কমিশনারের ৮নং প্রশ্নের উত্তর

২১০. একই ; Appendix C.

২১১. *Descriptive Ethnoiogy of Bengal* (Calcutta 1872)-এ উল্লেখিত Dalton-এর এ অভিজ্ঞতার বর্ণনা Marten Orans উদ্ধৃত করেছেন। পাদটীকা নং ২০০ দ্রষ্টব্য ; পৃ ৩৭

কেন সাজাও

কিরণশঙ্কর মৈত্র

কলাবতী, আমাকে সাজাও কেন এমন রসন-ভূষণে
শরীরে জড়িয়ে দাও আরামের ললিত আলো,
নিদাঘের শুকনো বাতাস হানে কঠিন ঝাপটা—
কমললতা, কেন সাজাও এমন রেশম আবরণে।

স্বর্ণলতা, আমার শরীরে দিয়ো না সোনার গন্ধ,
সুবর্ণরেখা বয়ে যাক পায়ের তলায় ঝিরিঝিরি—
কোমরে জেগে থাক অলৌকিক জ্যোছনা তোমার,
ছিনতাই ঘরের বাইরে, নীলাঞ্জনা, দিয়ো না সোনার ঝলক।

মাধবীমালা, চুলে লাগিয়ো না সযতনে ময়ূরপালক
উদাসীন আকাশ, ঈগলের ধারালো নখ ও চঞ্চু,
আমাকে পাঠিয়ো না খোলা বাজারে, সওদার—
কেড়ে নেবে সময় ও সুগন্ধ, রণক্ষেত্রে নিঃসঙ্গ-একক।

শুধু আস্তিনে জড়িয়ে দিয়ো ভালোবাসা—বকুল-গন্ধ,
কামিজে অপ্রতিম চুম্বন-চিহ্ন—উথাল-পাথাল,
পদতলে কতো সুবর্ণময় সিঁড়ি নতজানু; এসো,
দীঘির জলে ভাসাই ছোটো-ছোটো সুখ-দুঃখ, স্মৃতির-প্রদীপ।

ভাসান

দেবী রায়

মন যতো-ই ঊর্ধ্বগামী আগুন-পারা হুহু, তুমি কি ভাব
সবিশেষ একজন কেউ, পরনে তন্তুজ শিথিল কবরী ধীর পায়ে
সটান নেমে এসে খুলে দেবে দক্ষিণের রুদ্ধ-দরোজা? 'যাবো—'

ভাবছিলাম, শুধু সেই আহ্বানের অপেক্ষায়, ছিলামও গা বাঁচিয়ে
এতকাল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ভর করে উঁকি-মেরে কখনো বা লক্ষ করেছিলাম:
ওই ডাঁশা-পেয়ারা, ডালে ঝুলছিল ডাগর গৃধ্র চকচকে চোখ এড়িয়ে

সহসা মেঘ ঝুঁকে পড়ে···ছাখে: গাছ নয়—জলাশয়ে···শুঙ্গাটক, দাম
বহোৎ! অ-সময়ের ফল, যে কেউ ঠোকরাতে পারে···সরীসৃপ কিলবিলে
জলজ শিকড়ের আশপাশে ছোঁক-ছোঁক করে শ্যাওলা, শুধোয়: 'এলে'

তাহলে সেই তুমি-য়ো, কালামুখো? অলিগলি ছেড়ে, এ-তদূর? জানমান
সম্বল, ভিতরে কী এক অস্থির-গোঙানি···ছিপি-আঁটা নেশা মুশকিল আসান
সব? কে তাকে কাঁদায় অহোরাত্র?···কাউকে বলা যায়?
বুকের ভিতরে কার নিরবধি ভাসান!

পুরোনো শব্দ

অজয় নাগ

এক-একটা শব্দের অভিমান আমাকে স্পর্শ করে
ছেলেবেলায় যে শব্দ আমার সঙ্গী ছিল
তার মুখ মনে পড়ে কখনো বা—
যেমন হঠাৎ একা ঘরে অন্য এক আমাকে দেখতে পাই
তেমনি কোনো শব্দের চন্দনস্মৃতি
আমাকে পিছন দিকে ডাকে—

একদিন পথের ঘূর্ণি-হাওয়ায় পোশাক উড়ে যায়—
আমার নামের অক্ষর নির্জন হয়ে পড়ে···
আমি তখনই হারিয়ে-যাওয়া বন্ধুকে পাই
এবং ঝুমকোফুলের একঝলক
পুরোনো শব্দের এক-বুক ঘ্রাণ
লাজুক চোখে আমার দিকে চেয়ে হাসে—হাসতে থাকে

পৃথিবী যখন হিরোশিমা

হোসাইন কবির

কোথাও মৃত্তিকা নেই
মৃত্তিকা : কঠিন শিলা
মানুষ ও পাখির চোখ স্থির
হৃদয়ে টুংটাং ধাতব শব্দ

কোথাও জল নেই
মসৃণ পাথরের আস্তরণে
স্থির : জলজ উদ্ভিদ ও মাছের সংসার

শ্যামল-অরণ্য নেই ফুল নেই পাখি নেই
নেই কেউ দাঁড়িয়ে কোথাও
শুধু ধাতব শব্দে
লালরঙ রোদের মতো জ্বলছে মৃত্তিকার সংসার

মৃত্তিকা গর্ভবতী হলেই
রঙ বদলায় ফুল পাখি নারীর
আর পৃথিবীর জৈবিক অট্টালিকায়
জেগে থাকে চাঁদ—সারা রাত

কোথাও তো মৃত্তিকা নেই
ফুল পাখি নারী
লালরঙ পাথর হয়ে জ্বলছে মৃত্তিকার সংসারে।

বাংলাদেশ

বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি

সুধীর সেন

৪ : অজানার অভিযান

হঠাৎ আমার জীবনে এল এক বিরাট শূন্যতা, আর তার সঙ্গে এল তুমুল আলোড়ন। বৈপ্লবিক গবেষণা ক্ষান্ত হল, অধ্যয়নও রাতারাতি অবান্তর হয়ে দাঁড়াল। পদে-পদে মনে হত শিবদার কথা, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে হত, আমিও তো ছিলাম সাধুর কাছে বাগদত্ত, বড়দার অনুপস্থিতিতে মা-র বিহ্বলতার দিনে। মাথায় ঘুরতে লাগল আনন্দমঠ, বিবেকানন্দ; সন্ন্যাসধর্ম আর দেশসেবা বা জনসেবার আদর্শ—এ দুয়ের মধ্যে কল্পনায় মনে হল কোনো অন্তর্নিহিত সংঘর্ষ নেই, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা অসম্ভব হবে না, এবং তা নির্ভর করবে নিজের উপর। দ্বিধা, দ্বন্দ্ব আর ধাঁধার মধ্যে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। সেই অন্তর্দাহ হতে ধীরে-ধীরে দেখা দিল সংকল্প; অচিরে তা দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হল।

বোধহয় তখন ছিল ফাল্গুন মাস। ভোরের আলোর আভাস তখনো দেখা দেয় নি। চারিদিক নিঝুম, সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চুপিচুপি উঠে আমার বিছানা পরিপাটি করে ভাঁজ করে তুলে রাখলাম রোজকার মতো, তারপর একটি ছোটো পুঁটলি হাতে বেরিয়ে পড়লাম—মনে-মনে সবার আশীর্বাদ নিয়ে। শুরু হল আমার জীবনে নতুন অধ্যায়, অজানার অভিমুখে অভিযান; বিদ্রোহ নয়, আত্মনিগ্রহের পালা।

অন্ধকারে গলির রাস্তা ধরে মাইল খানেক হেঁটে পৌঁছলাম কুমিল্লা রেল স্টেশনে, তারপর রেললাইন ধরে হাঁটা শুরু করলাম। আমার গন্তব্য স্থান ছিল চাঁদ পুর—৪৬ মাইল দূরে। ঠিক করেছিলাম, সারা দিন হেঁটে সন্ধ্যা নাগাদ চাঁদপুরে পৌঁছব। ওখান থেকে গোয়ালন্দের জাহাজ ছাড়ত রাত আটটা-নটা নাগাদ। তাই সারাটা দিন আমার হাতে ছিল। হেঁটে গেলে খরচ কম, সে কথাও অবশ্যি ভুলি নি। তা ছাড়া, গৃহত্যাগী পরিব্রাজকের নতুন জীবনের সূচনায় দীর্ঘ

পথ পায়ে চলাই সমীচীন বলে মনে হয়েছিল।

সেদিন চল্লিশ মাইলের উপর হেঁটেছিলাম। মনে পড়ে রেলের পুলগুলির উপর দিয়ে যেতে কিছু ভয় হচ্ছিল, পা কাঁপছিল। তাই অতি সন্তর্পণে পার হয়েছিলাম। দুবার দুটি ছোটো-ছোটো স্টেশনে থেমে সামান্য টিফিন করেছিলাম। সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল তখনো চাঁদপুরে পৌঁছবার একটি স্টেশন বাকি ছিল, পা দুটিও মৃদু প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছিল, তাই চাঁদপুরের আগের স্টেশনে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাকি পাঁচ-ছ মাইল ট্রেনে করে গেলাম। যথাসময়ে জাহাজ ধরে গোয়ালন্দ হয়ে শিয়ালদা একসপ্রেস ধরে কলকাতা গিয়ে হাজির হলাম পরের দিন সন্ধ্যা নাগাদ।

শিয়ালদা থেকে হেঁটে চলে গেলাম মহানির্বাণ মঠে। তখন পথ এত সুগম ছিল না, বিশেষ করে ভবানীপুর অঞ্চলে অনেক অলিগলির ভিতর দিয়ে যেতে হত। তবে আমার বিশেষ অসুবিধা হয় নি, কারণ কাকা বছর তিনেক আগে, সম্ভবত ১৯১৭ সনে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেই মঠে গিয়েছিলেন। তখন ওই মঠে দিন তিনেক ছিলাম, সে এলাকার পথঘাটও আমার অনেকটা চেনা ছিল। আর সাধুদের অন্তত আট-দশ জন আমাকে ভালো করে চিনতেন। আমাকে দেখে তাঁরা বেশ খুশি হলেন।

গুরু শ্যামসুন্দরানন্দ আমার আগমনে বিস্মিত হন নি। বোধহয় ধরেই নিয়েছিলেন যে আমি অদূর ভবিষ্যতে আশ্রমে এসে হাজির হব, বিশেষ করে শিবদার সংসারত্যাগের পর। গুরু সবেমাত্র নিজের আশ্রমের গোড়াপত্তন করেছিলেন—নবদ্বীপ থেকে পাঁচমাইল দূরে মাধাইপুর গ্রামে, আনুমানিক পঞ্চাশ বিঘে জমি কিনে। তাই শিবদা এবং আরও দুই জন শিষ্য নিয়ে কলকাতায় মঠ ছেড়ে ওখানে চলে গিয়েছিলেন। আমার জন্য ব্যবস্থা হল—প্রথম মাস-তিনেক কলকাতায় থাকব, আশ্রমের নানা কাজে সাহায্য করব, তারপরে মাধাইপুরে গুরুর নতুন আশ্রমে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেব।

সাধুসেবা ও গোলাপঠাকরুন

আমার আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হল সাধুসেবা দিয়ে। তখন ওখানে ত্রিশ-চল্লিশ জন গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী থাকতেন। তা ছাড়া, রোজই নানা জায়গা থেকে শিষ্যরা এসে কিছুটা সময় কাটিয়ে যেতেন। ফলে আশ্রমে একটি বেশ বড়ো রকমের সংসার চালাতে হত। সাধুর সংসারেও নিতান্ত মামুলি কাজের প্রয়োজন কিছু কম ছিল না।

আমাকে করা হল রান্নাঘরের অ্যাসিস্ট্যান্ট্। তার সঙ্গে এল ভাঁড়ারের ভার। রোজ সকালে বিকেলে দুবার করে চালডাল, আটা-ময়দা, তেল-ঘি, মসলা ইত্যাদি সব ওজন করে বার করে দিতে হত। জিনিসের তালিকা আসত গোলাপঠাকরুনের কাছ থেকে। তাঁর উপরে ছিল রান্নাঘরের সব দায়িত্ব। আশ্রমের যাবতীয় রান্না তিনি একা নিজের হাতে করতেন। তাঁকে রান্নাঘরে নানা কাজে সাহায্য করার ভারও পড়ল আমার ওপর।

সেই মঠের কথা যখন ভাবি তখন সবার আগে মনে পড়ে গোলাপঠাকরুনের কথা। তাঁর ছবি আজও চোখের সামনে ভাসে। তিনি ছিলেন বিধবা সন্ন্যাসিনী, আয়তনে দীর্ঘ, স্থূলকায়া। তাঁর পরিচ্ছদ ছিল হালকা হলদে রঙের শাড়ি। গায়ের রঙ ছিল ধবধবে ফরসা, মাথায় চুল ছিল প্রচুর—সাদাকালোয় মেশানো। মুখের উপর সব সময়েই ছিল অকৃত্রিম লাবণ্য। তাঁর দৃষ্টিতে মনে হত যেন জড়ানো রয়েছে ধ্যান, স্নেহ আর করুণা। তিনি স্বভাবতই ছিলেন স্বল্প- ও মিষ্টভাষী। তাঁর লাবণ্যময় গৌরবর্ণ আর কোমল স্বভাবের জন্যই বোধহয় তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল গোলাপঠাকরুন। তাঁর কর্মকুশলতা ছিল অসাধারণ। এই স্নেহশীলা মাতৃতুল্যা সন্ন্যাসিনী মনে হল যেন কয়েক দিনের মধ্যেই আমার মায়ের স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন।

তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন, নিজ হাতে অনেক কাজ শিখিয়েছিলেন—আলুর খোসা ছাড়ানো,

তরকারি কোটা, আটা মাখা, চাকি-বেলুন দিয়ে রুটি বেলা, আর রোজ সকালে আশ্রমের ছোটো পুকুরে একগাদা বাসন মাজা। আমার শিখবার আগ্রহ আর তৎপরতা দেখে তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। আবার মাঝে-মাঝে আপন মনে খানিকটা দুঃখও প্রকাশ করতেন। আমি যে সংসার ছেড়ে এসেছি, এজন্য তিনি বেদনা বোধ করতেন। মুখে না বললেও বুঝতে পারতাম, তাঁর মতে গুরু এভাবে আমাকে সংসার থেকে ছিনিয়ে এনে ভালো কাজ করেন নি। তাঁর মনে-মনে কামনা আর প্রার্থনা ছিল যেন আমি শীঘ্রই আবার বাড়ি ফিরে যাই।

সকাল ছটা হতে রাত দশটা অবধি আমার কাজের অন্ত ছিল না। উপাসনার সময় অবশ্য মন্দিরে উপস্থিত থাকতাম সব সাধুদের মতো। সুযোগ পেলে এক ফাঁকে দিনের বেলা কোথাও একটু ঘুমিয়ে নিতাম। তখন গরম কাল, তাই জামাকাপড় বা বিছানার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। মনে পড়ে, অনেক রাত কাটিয়েছি মন্দিরের পশ্চিম দরজায় মার্বেলের উপর একটি গামছা পেতে বালিশ ছাড়া শুয়ে। কোনো কষ্ট বোধ করি নি।

সকালবেলায় বাসন মাজায় আমার প্রায় এক-ঘণ্টা কেটে যেত। কড়াই, সসপ্যান ইত্যাদি ঝামা দিয়ে ঘসে পরিষ্কার করতে হত। পেতল-তামার জিনিস একটু তেঁতুল লাগিয়ে মেজে ঝকঝকে করে তুলতাম। দেখে সবাই খুশি হতেন, বিশেষ করে গোলাপঠাকরুন।

তারপর ভাঁড়ারের জিনিস ফর্দমতো ওজন করে বার করে দিয়ে বসতাম একগাদা তরকারি নিয়ে। গোলাপঠাকরুন চটপট সব কুটে নিতেন। তাঁর পাশে বসে আরেকটা বড়ো বঁটিদা নিয়ে নিজে তাঁর দেখে-দেখে আলু, বেগুন, ফুলকফি, বাঁধাকফি ইত্যাদি কাটবার চেষ্টা করতাম। আমার সতর্ক মন্থর গতি দেখে তিনি মুচকি-মুচকি হাসতেন, বিশেষ করে আলুর খোসার সঙ্গে অনেকটা আলু চলে যেত বলে। তবে আমাকে হপ্তা দুয়ের বেশি অ্যাপ্রেনটিস থাকতে হয় নি। সব তরকারি তারপর একা নিজেই কুটে দিতাম। তার মধ্যে থাকত সের আড়াই আলু। বড়ো বঁটিতে বসে ঠিক গোলাপঠাকরুনের মতো আলুর খোসা ছাড়ানো তখন আমার অত কঠিন মনে হত না। এমনকী আমার দক্ষতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। একদিন উনি হেসে আমাকে বললেন, 'বাবা, আলুর খোসাতে আরেকটু বেশি আলু রেখো। ঠাকুরের ভোগের জন্য পাঁচ পদ রান্না করতে হয়। তার মধ্যে একটি হল চচ্চড়ি, তাতে সব সময়েই আলুর খোসাগুলি দিই।'

বিকেলবেলা ভাঁড়ার থেকে রাত্তিরের রান্নার জন্য আবার সব মালমসলা মেপে বার করে দিতাম। সন্ধে-বেলা মন্দিরে আরতি হয়ে যাবার পর রান্নাঘরে এসে গোলাপঠাকরুনের কাজ দেখতাম, আমার সাধ্যমতো সাহায্য করতাম। রোজই আড়াই সেরের মতো আটার হাত-রুটি করা হত। আটাতে ময়ান দিয়ে মাপমতো জল দিয়ে মেখে দেওয়া কঠিন ছিল না। তা সহজেই শিখে নিয়েছিলাম। ঠিকমতো লেচি বানানোও কঠিন মনে হয় নি। কিন্তু চাকিবেলুন দিয়ে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে রুটি বেলা আমার ক্ষমতার বাইরে ছিল। গোলাপঠাকরুন ডাল, তরকারি ইত্যাদি রান্না করতেন, আর আমি বসে-বসে চাকিবেলুন নিয়ে লড়াই করতাম, রুটি কিছুতেই ঠিকমতো বেলা হত না। সমানভাবে গোল না হয়ে বিকৃত হয়ে যেত। তিনি দেখে সস্নেহ হাসি হাসতেন আর আর আমাকে সব সময়েই উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'তুমি শীগগিরই ঠিক করে বেলতে পারবে, বাবা। কিচ্ছু ভেবো না।'

সব রান্না শেষ হলে তিনি রুটিতে হাত দিতেন। আমার বেলা নানা প্যাটার্নের তিন-চারটি রুটি আবার লেচি করে নিমেষে বেলে নিতেন। সব নিখুঁতভাবে গোল হত। তাঁর রুটি-বানানো দেখবার জিনিস ছিল। কয়লার উনুনে ছোটো তাওয়ায় একটির পর একটি রুটি চাপিয়ে নিপুণভাবে ওলট-পালট করে একসঙ্গে

চারটি রুটি সেঁকে নিতেন। তারপর একটি-একটি করে লোহার ফাঁকা হাতা দিয়ে উনুনের ওপর ধরতেন, আর এক মুহূর্তে প্রত্যেকটি রুটি প্রায় বেলুনের মতো ফুলে উঠত। তার উপর খানিকটা ঘি ছড়িয়ে তুলে রেখে আবার চারটি লেচি বেলে নিতেন।

আমার মাথায় ঢুকল, তাঁর চারটি রুটি সেঁকার সময়ের মধ্যেই আর-চারটি রুটি বেলে দিতে পারি কিনা। গোড়ায় দুটোর বেশি পারি নি, তারপরে তিনটে, মাসখানেক পরে দেখলাম চারটেই বেলে দিতে পারি ঠিকভাবে, একই সময়ের মধ্যে। মনে হল যেন মস্ত বড়ো পরীক্ষা পাশ করলাম। গোলাপঠাকরুন আমার কৃতিত্বে মুগ্ধ হলেন।

মাঝে-মাঝে আশ্রমে বড়ো রকমের উৎসব হত। তখন বাইরে থেকে লোক এনে খিচুড়ি, লাবড়া, বেগুনভাজা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি রান্না করা হত। আমি মন দিয়ে সেসব দেখেছি। চার-পাঁচ ফুট লম্বা হাতা নিয়ে মস্ত বড়ো গামলাতে নিজেও কিছু নাড়াচাড়া করেছি। উৎসবের সময় ভক্তরা দলে-দলে এসে প্রসাদ গ্রহণ করে যেতেন। সে দিনগুলো এলে আশ্রমে বেশ হইচই পড়ে যেত। মনে হত সাধুরাও যেন বেশ উৎসুকভাবে সে দিনগুলোর প্রতীক্ষায় থাকতেন।

কাজের ঘূর্ণিপাকে আমার তিন মাস বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেল। এবার গুরুর কাছ থেকে আদেশ এল মাধাইপুর যাবার। গোলাপঠাকরুনের কাছ থেকে মন সহজে বিদায় নিতে চায় নি। নিজেকে বোঝালাম, যে পথ বাছাই করে নিয়েছি সেখানে তো এজাতীয় মমতার স্থান নেই। তা ছাড়া, নিজের ঘরবাড়ি আপনজন ছেড়ে এসেছি, এই আশ্রমের সংসার ছেড়ে যেতে আপত্তি করলে চলবে কেন? গোলাপঠাকরুনকে প্রণাম করলাম। তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদ আর সকরুণ বাষ্পাকুল দৃষ্টি আজও ভুলতে পারি নি। আমি জানি তিনি মনে-মনে কী চেয়েছিলেন—যেন গুরুর নতুন আশ্রমে না গিয়ে নিজের পুরোনো বাড়িতে ফিরে যাই।

৫ : আশ্রমের কারাগারে

কলকাতা থেকে কী করে মাধাইপুরে গিয়েছিলাম এখন আর সঠিক মনে পড়ে না। মনে হয়, গুরু নিজেই একবার কলকাতায় এসেছিলেন, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তবে যেতে হত হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে নবদ্বীপ স্টেশনে, তারপর ওখান থেকে পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে রেললাইন ধরে মাঠের পাশ দিয়ে, কারণ সে অঞ্চলে তখন কোনো ভালো রাস্তা ছিল না। বলা বাহুল্য, সেসব জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর কথা কেউ তখন ভাবতেও পারে নি। তাই সন্ধে হয়ে গেলে কেরোসিনের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোতেই সব কাজ করতে হত।

আমরা যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধে হয়ে আসছিল। অল্প পরেই চারদিক অন্ধকারে ঢেকে গেল। সবার জন্যেই সামান্য কিছু আহারের ব্যবস্থা হল, তারপরেই এল শোবার সময়। তখনও হয়তো নটা বাজে নি, তবু চারদিক একেবারে নিঝুম। মনে হল আমিও যেন অতল অন্ধকারে ডুব দিলাম। গভীর ঘুমে সারা রাত কেটে গেল।

এবার শিবদাকে দেখলাম একেবারে রূপান্তরিত অবস্থায়—মুণ্ডিতমস্তক, পরনে গেরুয়া, কাছাকোচা-হীন, লুঙ্গির মতো করে পরা। তাঁর নতুন নাম হল সত্যানন্দ। বুঝলাম, সন্ন্যাসধর্মে তাঁর দীক্ষা বেশ দ্রুত গতিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। গুরু বোধহয় ভেবেছিলেন 'শুভস্য শীঘ্রম্', অন্তত এ ক্ষেত্রে। আর দুই গুরুভাইয়ের নাম পরমানন্দ (ডাকনাম—শচীন) ও চিদানন্দ (ডাকনাম—শিশু)। শচীন আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন। উনি গৈরিক ধারণ করেছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে। গুরু তাঁকে অনেকটা নিজের অ্যাসিসট্যানট বলে মনে করতেন আর সেইভাবে তাঁকে কাজের ভার দিতেন।

শিবদা আমাকে পেয়ে খুব খুশি হলেন, আমিও তাই। তাঁর কাছ থেকে এই সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের

দৈনন্দিন কাজ জেনে নিলাম। তারপর গুরুর নির্দেশ-মতো সেখানকার কাজে যথাসাধ্য তৎপরতার সঙ্গে যোগ দিলাম। এবার অযাচিতভাবে শুরু হল আমার এক অভিনব বন্দীজীবন আর তার সঙ্গে-সঙ্গে এক নিষ্ঠুর আত্মনিষ্পেশন।

গুরু বাছাই করে নিয়েছিলেন একটা পতিত জমি। তখনকার দিনে তার দাম ছিল নিশ্চয়ই যৎসামান্য। ভেবে দেখলে মনে হয়, অনেক সাধুর মতো রিয়ল এসটেটের দিকে আমাদের গুরুরও বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পোড়ো জায়গায় আশ্রম গড়ে তুললে ধীরে-ধীরে তার মূল্যবৃদ্ধি হবে, ফলে তা নিছক আধ্যাত্মিক ভাবে নয়, অর্থনৈতিকভাবেও ফলপ্রসূ হবে, সে সম্বন্ধে অনেক সময়েই তাঁদের বেশ টনটনে খেয়াল থাকে। সংসারত্যাগী এই সন্ন্যাসীর সাংসারিক বুদ্ধি কত প্রখর ছিল, তা তাঁর সান্নিধ্যে থেকে, তাঁর দৈনন্দিন কর্মধারা দেখে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করে-ছিলাম আর মর্মাহত হয়েছিলাম।

জায়গাটা ছিল মস্ত বড়ো খোলা মাঠের মতো। তার উপরের স্তরে মাটির চেয়ে বালির মাত্রাই ছিল বেশি। তার নীচে ছিল প্রায় পাথরের মতো শক্ত জমি। সবুজের চিহ্ন ছিল বিরল। এখানে-সেখানে কিছু দূর্বাঘাস দেখা যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তারা বহু কষ্টে নিজের সবুজত্ব রক্ষা করে চলেছে। দূরে নানা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল কয়েকটি পঙ্গু পলাশগাছ, পতিত জমির প্রকৃতিদত্ত মলিনত্ব জাহির করে। আর দূরে, মাঠের এক কোণে ছিল দুটি আধমরা খেজুরগাছ, তাদের গায়ে ঝুলছিল তিন-চারটে ছোটো শুকনো আধপাকা খেজুরের গোছা।

বেলা হবার সঙ্গে-সঙ্গেই গরম ধা-ধা করে বেড়ে যেত। আকাশ ধবধবে সাদা, মাঠে খাঁ-খাঁ করে রোদ, কোথাও মেঘের আভাসমাত্র ছিল না। কারণ তখন সেখানে গ্রীষ্ম চলেছিল পুরোদমে।

সবশুদ্ধ তিনটে ঘর তখন তৈরি করা হয়েছিল, মাটির ভিটি, বাঁশের বেড়া আর খড়ের চাল দিয়ে। একটা ঘর একটু বড়ো ছিল, সেখানে গুরুর গুরু নিত্যানন্দ ঠাকুরের ছবি বসানো ছিল। সেটাই ছিল তখনকার মন্দির বা ঠাকুরঘর; আরতি, উপাসনা, ভজন, কীর্তন—সব-কিছু ওখানেই হত। গুরু নিজে ওখানেই থাকতেন শিষ্য পরমানন্দকে নিয়ে। আমরা থাকতাম আরেকটি ছোটো ঘরে। তিনজনে মাটিতে শুতাম, জায়গা খুব বেশি লাগত না। পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো বালাই ছিল না। আমি নিজে পরতাম একটি ছোটো ধুতি আর গেঞ্জি, বিছানা ছিল একটি মাদুর আর একটি ইঁট, বালিশের বদলে। সে ঘরের সঙ্গে ছিল ছোটো একটি বারান্দা। সেটাই ছিল আমাদের খাবার জায়গা। হাত বিশেক দূরে ছিল ছোটো একটি রান্নাঘর, একটি মাটির উনুনসহ। আর তারি এক কোণে ছিল ছোট্ট একটি ভাঁড়ার।

জলের জন্য একটি কুয়ো খোঁড়া হয়েছিল। গ্রীষ্মের দিনে জল অনেক নীচে চলে গিয়েছিল, লম্বা দড়ি আর বালতি দিয়ে অনেকটা টেনে জল তুলতে হত। সে জলে রান্নাবান্না আর অন্যান্য কাজ চলত। চানের জন্য যেতাম গঙ্গাতে, অন্তত আধ মাইল দূরে। আর গঙ্গা থেকেই খাবার জল নিয়ে আসতাম। সে ভার ছিল শিবদা আর আমার উপর। মনে পড়ে, সেজন্য গোড়ার দিকে আমাদের কত রকম কসরত করতে হয়ে-ছিল। বেশ মোটা, সরুগলা ঘড়া, জল ধরত বিশ সেরের মতো। কিছুদিন বেশ কষ্ট করে থেমে-থেমে ঘড়া বয়ে নিয়ে আসতাম নানা ভাবে চেষ্টা করে, কখনো মাথায় গামছাকে বিড়ে করে তার উপর বসিয়ে, কখনো কাঁধে, কি কাঁখে করে। কিন্তু কিছুতেই যেন ঠিক সুবিধে হত না। হঠাৎ একদিন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ঘাড়ের উপর গামছা মোটা করে পেতে মাথা নীচু করে তার উপর জলের ঘড়া বসিয়ে চলা আরম্ভ করলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল, সেটাই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। তারপর থেকে না থেমে সারা পথ ঘড়া বয়ে সহজেই চলে আসতাম। মনে আছে আমাদের বুদ্ধির দৌড় দেখে দুজনেই কত

খুশি হয়েছিলাম।

রান্নাঘরের কাজ করতাম আমরা চারজনে পালা করে। কাঠসংগ্রহ, মশলা পেশা, রান্না করা—সবকিছুই অবশ্য নিজেদেরই করতে হত। বলা বাহুল্য, আমাদের "মেনু" ছিল একান্ত সাদাসিধে। মোটা চালের ভাত, পাতলা ডাল—(অড়হর, ছোলা, কি খেসারি)—আর পালঙশাক কি অন্য একটা সবজি। রাত্তিরে ভাতের বদলে হাতরুটি। গোলাপঠাকরুনের কাছে শিক্ষা আমার বিশেষ কাজে লাগত। তবে কলকাতার মঠের তুলনায় এখানকার কাজ একান্তই নগণ্য আর প্রাণহীন বলে মনে হত। সকালবেলা আমাদের বরাদ্দ ছিল মুড়ি বা খই, গুড় বা বাতাসাসহ। দুধ বা চায়ের কোনো বালাই ছিল না। মাঝে-মাঝে বিশেষ কারণে দইমিষ্টি জুটত, তখন সেটাকে উৎসব বলে মনে হত।

ঘরের সঙ্গেই কাঠা দুই জমিতে একটি ছোটো বাগানের গোড়াপত্তন করা হয়েছিল। তাতে নিজেদের সংসারের জন্য সামান্য শাকসবজি আর পুজোর জন্য সাধারণ ফুলের ব্যবস্থা হত। এ বাগানের কাজ অনেকটা গুরুজি নিজেই করতেন হাতখন্তি দিয়ে। জলের অভাবই ছিল সবথেকে বড়ো সমস্যা। রান্নাঘরের ফেলা জল আর কুয়ো থেকে তোলা জল দিয়ে কোনোমতে কাজ চালানো হত।

সকাল-সন্ধ্যায় দুবেলা সবাইকে ধ্যানস্থ হয়ে নিজেদের মন্ত্র জপ করতে হত। তা ছাড়া রুটিনের মধ্যে ছিল সন্ধেবেলা সবাইমিলে করতাল হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ কীর্তন করা ও ভজনগান করা, যথা—'বাসনা দুঃখের হেতু, হরিভক্তি মোক্ষসেতু, তাই বলি ভক্তিভরে হরিকে ভজো না; 'পাতকী বলিয়া কি গো পায়ে ঠেলা ভালো হয়'—ইত্যাদি।

আশ্রমের সবথেকে পরিশ্রমের কাজ সে সময়ে ছিল বাইরে। আমি ওখানে হাজির হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঠিক হল, সবটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা হবে। উদ্দেশ্য ছিল দুটো। আশ্রমের সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া আর বাইরের জীবজন্তু গোরু-বাছুরছাগল ইত্যাদিকে বাইরে রাখা। দূরের গ্রাম থেকে বোঝা-বোঝা কচাগাছ আনার ব্যবস্থা হল। সেগুলোকে পোঁতার ভার পড়ল শিবদা আর আমার উপর। তাই সকালবেলা আহ্নিক শেষ করে শাবল হাতে নিয়ে দুজনে চলে যেতাম অনেকটা দূরে কচাগাছ পোঁতার কাজে। ঘণ্টা চার-পাঁচ মাঠে কাজ করে ছুটি পেতাম খাওয়া আর বিশ্রামের জন্য। তারপর আবার বিকেলে কাজ শুরু করতাম। তখন রোজ অন্তত আট ঘণ্টা খোলা মাঠে খাঁ-খাঁ রোদে কাজ করেছি দিনের পর দিন।

কচাগাছগুলো ছিল সরু আর লম্বায় পাঁচফুটের মতো। প্রত্যেকটি গাছ পুঁততে হত ফুটখানেক গর্ত করে, লম্বা লাইন ধরে, ফুট দেড়েকের ব্যবধান রেখে। পাথরের মতো শক্ত মাটিতে, মামুলি ধরনের শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে-খুঁড়তে আমরা হাঁপিয়ে পড়তাম। ক্লান্ত হয়ে শাবলের উপর ভর দিয়ে কোনোমতে একটু জিরিয়ে নিতাম, মাঝে-মাঝে ঝিমিয়েও পড়তাম। দূর থেকে দেখতে পেলে গুরু হাঁক দিয়ে উঠতেন, 'কী হচ্ছে ওখানে? কাজ ফেলে রেখে কুঁড়েমি করলে চলবে না।'

মাঝে-মাঝে শাবল রেখে দশ-পনেরো মিনিটের জন্য মাঠের এক কোণে খেজুরগাছের নীচে গিয়ে ঢিল ছুঁড়ে খেজুর পেড়েছি। সেই শুকনো আধপাকা খেজুরকেই তখন উপাদেয় মনে হয়েছে। আমাদের এই কর্তব্যচ্যুতি গুরুজীর দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই খেজুর খাবার সঙ্গে-সঙ্গে বকুনিও খেয়েছি।

ঘরে বা তার আশেপাশে শিবদা আর আমি মন খুলে কথা বলার সাহস পেতাম না। আমাদের কথা বলার সবথেকে ভালো সুযোগ ছিল গঙ্গায় যাতায়াতের পথে, অবশ্য শচীন বা শিশু সঙ্গে থাকলে তা সম্ভব হত না। তা ছাড়া সুযোগ পেতাম দুজনে পাশাপাশি গর্ত খুঁড়ে কচাগাছ পোঁতার বেলা। অবশ্য তা-ও গুরুজীর দৃষ্টি এড়াত না। নীচু গলায় কথা বললেও

উনি ধরে নিতেন, আমাদের মধ্যে হয়তো কিছু "অধার্মিক" আলোচনা চলছে। তা ছাড়া কর্তব্যে শৈথিল্য যে সন্ন্যাসপথের অনুপযোগী, সে কথাও কঠোর স্বরে বার-বার মনে করিয়ে দিতেন।

আমাদের আলোচ্য বিষয় অনেক ছিল, আর প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে-সঙ্গে তা বেড়েই চলেছিল। দুজনেরই মনে হত সেই ময়নামতীর স্বপ্ন, দেশ-সেবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার কথা। তার সঙ্গে এ আশ্রমজীবনের তো বিন্দুমাত্র মিল নেই। আমরা চেয়েছিলাম দেশের মুক্তি, নিজের মুক্তি নয়। সারা দেশ জুড়ে বিরাট আন্দোলন চলেছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য, অথচ তার সঙ্গে আমাদের তো বিন্দু-মাত্র যোগ নেই। সে সম্বন্ধে একটি কথাও শুনতে পাই নে। যে পথে আমরা দৈবাৎ এসে হাজির হয়েছি সে যে নিতান্ত প্রাণহীন, অর্থহীন। এ পথ ধরেই কি আমাদের চলতে হবে? না, এই "মুক্তির পথ" থেকে নিজেকে মুক্ত করে আমাদের সেই পুরোনো স্বপ্নকে সত্য করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করব?

নানা কাজে আমরা ব্যস্ত থাকতাম সারাদিন, সন্ধ্যা-আহ্নিকও করে যেতাম যথারীতি, তাতেও কোনো ত্রুটি ঘটে নি। তবু মন বোঝাই করে ছিল সংশয়, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম। শিবদার সহজাত প্রেরণা আর আদর্শ তখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি। গেরুয়ার অন্তরালে তার স্পন্দন সহজে অনুভব করতে পারতাম। অথচ কোথায় গেলে আর কী করলে ভালো হয়, তখনো ভেবে কূল-কিনারা পাই নি। দিনগুলো তাই চলে যাচ্ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়।

"গু রো রা জ্ঞা হ্য বি চা র ণী য়া"

আমাদের মতো দুটি তরুণ আর তুখোড় শিষ্য সংগ্রহ করায় গুরু শ্যামসুন্দরানন্দের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল সন্ন্যাসী-মহলে আর নিজের ভক্তবৃন্দের কাছে। তবে এই ত্যাগধর্মপথে আমাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি বেশ সন্দিহান ছিলেন, আর সে সন্দেহ প্রবল ছিল বিশেষ করে আমার বেলা। শিবদার সঙ্গে যে আমার ঘনিষ্ঠ ভাব ছিল, আর তাঁর উপর আমার বিশেষ প্রভাবও ছিল—সেটা গুরুজীর অজানা ছিল না। সেটাকে তিনি কখনো সুনজরে দেখতে পারেন নি। সম্ভবত মনে-মনে তাঁর একটা ভয় ছিল যে, শিবদাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে আমি বিপথে নিয়ে যেতে পারি। সে-জন্যই আমাদের দুজনে নিরিবিলি কিছু আলাপ-আলোচনা হচ্ছে ঠাহর পেলেই হাঁক দিয়ে উঠতেন।

প্রায় গোড়া থেকেই আমার উপর গুরুজীর স্নেহ-আকর্ষণ দুই-ই ছিল। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ছিল খানিকটা রোষ আর আক্রোশ। তার কারণ অবশ্য তখন বুঝতে পারি নি। তবে পরে পশ্চাদ্‌দৃষ্টিতে তা সুপরিস্ফুট হয়ে গেল। গুরুর দাবি ছিল অন্ধভক্তি। তাঁর আদেশ নির্দেশ বিনা বিচারে, বিনা দ্বিধায় শিরোধার্য করতে হবে, এটাই ছিল তাঁর দাবি। কিন্তু সে দাবি আমি কখনো ষোলো আনা মেটাতে পারি নি, এমনকী নিজের উপর জবরদস্তি করেও। আমার তখন বয়স ছিল বারো-তেরো, কিন্তু সে তুলনায় আমার মেরুদণ্ডের নমনীয়তা তাঁর মাপকাঠিতে যথোচিত ছিল না। ফলে আমাকে নানাভাবে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে।

গুরুজী বলতেন, মানুষ হল কীটাণুকীট। তার একমাত্র কাম্য হল মুক্তি। সে মুক্তি মানুষ লাভ করতে পারে শুধু ভক্তি দিয়ে, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে। ভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে। তাই সর্বাগ্রে তাকে ত্যাগ করতে হবে অহমিকা। 'আমি কিছু করতে পারি' বলা বা ভাবার মধ্যেও রয়েছে অহমিকা। অধ্যয়ন আর জ্ঞানার্জনের বেলাও তাই। তার মধ্যেও রয়েছে নিছক অহঙ্কার, তাই তারা মুক্তিসাধনার অন্তরায়।

গুরুর এই দর্শন-নীতি কিছুতেই মেনে নিতে পারি নি, অথচ প্রতিবাদ করবার সাহসও আমার ছিল না। কাকা থেকে আরম্ভ করে অনেক বিজ্ঞ আর বয়স্ক লোক যে-সাধুর কাছে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে মাথা নত

করতেন, আমি সেখানে কী করে মুখ ফুটে তাঁর কথার প্রতিবাদ করব? তাই আমিও তাঁর কথা চুপ করে মেনে নেবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কৃতকার্য হতে পারি নি, পদে পদে আদর্শ থেকে বিচ্যুতি ঘটত।

কুমিল্লায় যখনি তিনি কাকার বাড়িতে এসে হাজির হতেন, তখনি সন্ধেবেলা তাঁর দর্শনের জন্য অনেক ভক্তের সমাগম হত। আমি হাজির হতাম একটু দেরিতে, থাকতামও অল্প সময়। সেটা তাঁর মনঃপূত হত না। এ নিয়ে তিনি অন্য ভক্তদের সামনেই ঠাট্টা করতেন আর মনে করিয়ে দিতেন যে, অধ্যয়নে অত আসক্তি থাকলে মুক্তিলাভ কখনো সম্ভব হবে না।

মনে আছে, একদিন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' তন্ময় হয়ে পড়ছিলাম। শেষ করে গুরুজীর কাছে যেতে বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। তিনি ব্যঙ্গস্বরে বললেন, 'কী হচ্ছিল এতক্ষণ, পণ্ডিতজী? আবার বুঝি সেই লেখাপড়া হচ্ছিল?' গুরুর দৃষ্টিতে লেখা-পড়াটা ছিল গুরুতর অপরাধ।

তাঁর আরও আদেশ ছিল,—'মেয়েদের দিকে কখনো চোখ তুলে তাকাবে না। চোখ থাকবে সব সময় তাঁদের পায়ের দিকে।' এ আদেশের কারণ কী ছিল আমার অজ্ঞতা-ভরা তরুণ জীবনে তা বোধগম্য হয় নি। অবশ্য গুরুর নিজের বেলা সেজাতীয় কোনো নিয়মের বালাই ছিল না। বরঞ্চ দেখেছি কত সাগ্রহে তিনি বিবাহিতা তরুণী শিষ্যাদের কাছ থেকে শ্রীচরণ-সেবা গ্রহণ করতেন। সাধারণত স্তিমিত নয়নে।

আশ্রমে আমার সবচেয়ে দুঃসহ মনে হত হাড়ভাঙা খাটুনি নয়, কৃচ্ছ্রসাধনও নয়, সেসব সহজেই অগ্রাহ্য করে চলেছিলাম। সবচেয়ে দুঃসহ ছিল গুরুর আদেশে একটানা অনধ্যয়ন। মনে হত এ আদেশে কোথাও যেন একটা অবিচার নিহিত রয়েছে।

কিছু দিনের মধ্যেই সে সংশয় দৃঢ়তর হল। কাকার নির্দেশে গুরু শিবদার সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন টোলের পণ্ডিত রেখে। ঠিক হল শিবদা আদ্য, মধ্য, উপাধি পরীক্ষার জন্য তৈরি হবেন। কাকা নিয়মমতো উদারভাবে আশ্রমে আর্থিক সাহায্য করতেন। কাজেই গুরু তাঁর মন জুগিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ষোলো আনা সচেতন ছিলেন। অধ্যয়ন যে অহমিকার পরিচয় আর মুক্তির অন্তরায়, গুরুজী শিবদার বেলা সে কথা সহজেই ভুলে গেলেন। তাঁর আচরণে এই পার্থক্য দেখে আমি মনে-মনে আহত হয়েছিলাম।

গুরু আমার কাছ থেকে চেয়েছিলেন অন্ধভক্তি। তখন বহুবার নানা উপলক্ষে শুনেছি—'বিশ্বাসে মিলায় কেষ্ট, তর্কে বহুদূর'। গুরুর আদেশ নির্বিচারে পালন করতে হয়। নিজের উপর জবরদস্তি করেও সে-মন্ত্র আমি মেনে নিতে পারি নি। অন্ধভক্তি ছিল আমার রীতের বিরুদ্ধে। শিবদা আর আমার প্রতি তাঁর আচরণে অত বড়ো পার্থক্য দেখে আমার ভক্তি আরো টলমল করে উঠল।

আসলে গুরু চেয়েছিলেন আমার আত্মবিশ্বাস, জ্ঞানলিপ্সা আর বিচারবুদ্ধি নির্মূল করে দিতে, ভক্তি আর মুক্তির রূপ বিকৃত করে আমাকে একরকম ক্রীতদাস করে রাখতে। এ জীবনে আমি বহুবার বহু বিপদ আর সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছি। তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন আর মারাত্মক বিপদ হল আমার সেই অর্ধস্ফুট যৌবনের আশ্রমজীবন। সন্ন্যাসের নামে সেখানে আমার সর্বনাশের সূচনা হয়েছিল। সেই মহাসংকট থেকে কিভাবে অব্যাহতি পেলাম ভাবলে আজো মনে বিস্ময় জাগে।

৬ : বড়দার কারামুক্তি ও নতুন জীবন

বিশ্বযুদ্ধ সাঙ্গ হল। ব্রিটিশ সরকার তরুণ রাজদ্রোহী-দের দলে দলে জেলখানা থেকে ছেড়ে দিলেন। এক-দিন বিনা সংবাদে বড়দা একটি ছোটো ট্রাঙ্ক হাতে নিয়ে কুমিল্লা জেলা থেকে বাড়ি ফিরে এলেন। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। তাঁকে বরণ করে নেবার জন্য

কোনো আনন্দ বা উৎসবের আয়োজন করা হয় নি। তবে মা-বাবা নিশ্চয়ই তাঁদের দৈনন্দিন পূজা-অর্চনায় বড়দার প্রত্যাবর্তনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর কল্যাণ আর সুমতির জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।

বড়দার আস্তানা হল উঠোনের দক্ষিণ দিকে টিনের ছাদওয়ালা একটি ছোটো ঘরে। সারা দিন প্রায় চুপ করেই কাটাতেন। চব্বিশ ঘণ্টায় হয়তো বড়ো জোর একশটি শব্দ ব্যবহার করতেন। মনে হত, এ যেন তাঁর অন্তরীণ জীবনেরই রূপান্তর মাত্র। তবে মস্ত বড়ো তফাত হল এই যে এবার তিনি স্বেচ্ছাবন্দী, নিজের বাড়িতে।

বড়দা কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন ১৯১৫ সনে। তারপরে ভর্তি হন ওখানকার ভিকটোরিয়া কলেজে আই-এ পড়ার জন্য। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয় ১৯১৬ সনে ১২ সেপটেমবর। জেলখানা থেকে ফিরে এসে তিনি ঠিক করলেন, ভিকটোরিয়া কলেজেই আই-এর জন্য পড়া শেষ করবেন। ইচ্ছা করলে অবশ্য এক বছর পরেও পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে পারতেন। কিন্তু সেটা তাঁর মনঃপূত হয় নি। তাই কয়েক মাস বিশেষভাবে খেটে পরীক্ষা দিয়ে ভালোভাবে পাশ করলেন। ফলের দিক দিয়ে একটি স্কলারশিপ তাঁর প্রাপ্য ছিল, কিন্তু পড়ায় ব্যাঘাত পড়েছিল বলে, অর্থাৎ অনিয়মিত ছাত্র বিবেচিত হয়েছিলেন বলে তিনি সেই বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন।

কিছুদিন পরে ঠিক হল বড়দা কলকাতায় গিয়ে বি. এ. পড়বেন। সেখানে সিটি কলেজে ভরতি হলেন, পড়াশুনাও নিয়মিত আরম্ভ হল। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই একদিন দুপুর রাত্রে বাড়িতে এসে হাজির হলেন নিজের ছাত্রজীবনের সামান্য সরনজামসহ। দেখে সবাই অবাক হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তার কারণ জানা গেল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ছাত্রসমাজের উপর মহাত্মাজীর বিশেষ নজর ছিল। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করা ছিল তাঁর প্রোগ্রামের এক প্রধান অংশ। তাঁর আহ্বানে স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্রের দল বেরিয়ে এল হাজারে-হাজারে। সে আহ্বান অগ্রাহ্য করা বড়দার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যে স্বদেশানুরাগের উন্মাদনা একদিন তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে, আত্মবিসর্জনের দিকে, সেই উন্মাদনাই আজ তাঁকে সবলে ঠেলে দিল অসহযোগ আন্দোলনের পথে। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল তাঁর জীবনে এক নতুন অধ্যায়।

বড়দা যোগ দিলেন কুমিল্লায় সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল স্কুলে স্বেচ্ছাসেবকরূপে। সেখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করলেন বিনা বেতনে; শীগগিরই তার একটি স্তম্ভ হয়ে দাঁড়ালেন। বড়দা এ-কাজ করেছিলেন বছর চারেক। সেই সময়েই তিনি বিশেষভাবে আরম্ভ করেন বাঙলা ছন্দের স্বরূপনির্ণয় আর বিশ্লেষণ, আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা।

বড়দার দৃষ্টান্তে আর প্রেরণায় বাড়ির আর সবাই স্কুলকলেজ ছেড়ে দিল। মেজদা (সুবোধ) কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অসহযোগের দিনে পরীক্ষা না দেওয়াই সাব্যস্ত হল। কুমিল্লা ছেড়ে তিনি চলে গেলেন কলকাতায়। সেখানে গিয়ে উঠলেন আমাদের পিসতুতো ভাই ধীরেন ঘোষের বাড়িতে। ধীরেনদা তখন ছিলেন শ্যামবাজারে পুলিশ ইনসপেকটর। তিনি অনেক বলে মেজদাকে রাজি করালেন পরীক্ষাটা দিতে। শেষ মুহূর্তে কুমিল্লা থেকে কলকাতায় সেনটার বদল করা হল। মেজদা বই-নোট ছাড়া শুধু মনের জোরে পরীক্ষা দিয়ে ডিসটিঙশন নিয়ে পাশ করলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি রাঁচিতে অ্যাকাউন্ট্স্ আপিসে কাজ নেন, সেখানেই সারা জীবন কাটান। তাঁর চাকুরি খুব উঁচু স্তরের ছিল না, যদিও পরে তাঁর কাজের গুণে অনেকটা পদোন্নতি হয়েছিল। আমাদের অস্বচ্ছল যৌথ পরিবারের ভার মেজদা বহু কাল সানন্দে বহন করে গেছেন।

সেজদা (প্রমোদ) প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করবার পর আর কলেজে প্রবেশ করেন নি, কলকাতায় গিয়ে একটি পরীক্ষা পাশ করে ঈস্ট ইনডিয়া রেল-

ওয়েতে কাজ নেন। বাবার একান্ত ইচ্ছায় কয়েক বছর পরে মোক্তারি পাশ করে কুমিল্লায় মোক্তার হন। সেজদা অনেক বছর সে কাজ করেছেন, তারপর স্বাধীনতা ও বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে কুমিল্লা ছেড়ে বিহারে ধানবাদে একটি চাকুরি নেন। সেজদার উপরেও পরিবারের দায়িত্ব অনেকখানি পড়েছিল। বিনাবাক্যে সে কর্তব্য তিনি বহু কাল পালন করে-ছিলেন।

আমার ছোটো ভাই কানু বোধহয় ষষ্ঠ শ্রেণীতে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে, তারপর আর পড়াশুনার সুযোগ হয় নি। তখন থেকে সে একটি ঘড়ির দোকানে কাজ নেয়। কাজে তার যথেষ্ট সুনাম হয়। পরে সে নিজেই একটি ঘড়ির দোকান চালাত। কুমিল্লার গণ্যমান্য লোকদের বলতে শুনেছি—'এখন মেরামতের জন্য ঘড়ি আর কলকাতায় পাঠাবার প্রয়োজন নেই, এই দোকানেই উৎকৃষ্ট সার্ভিস পাওয়া যায়।' ১৯৪৩ সনে একটা দারুণ রোগে আক্রান্ত হয়ে কানু কলকাতায় এসে মারা যায়। তখন তার বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর।

আমার বেলা অসহযোগ হল অন্য ধরনের,—স্কুলের সঙ্গে নয়, সংসারের সঙ্গে। আমার গৃহত্যাগের পর বেশ কয়েক মাস কেটে গেল। বাড়ির কারোর সঙ্গে কোনো যোগ ছিল না। সবাইকে ভুলে যাওয়াই ছিল তখন আমার "ধর্ম"। কিন্তু তাই বলে বাড়ি আমায় ভোলে নি, বরঞ্চ হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল।

বড়দা একদিন উদ্ব্যস্ত ছিলেন দেশোদ্ধারের জন্য, এবার তাঁর উপর এসে পড়ল অন্য এক উদ্ধারক্রিয়ার ভার—আমাকে আশ্রম থেকে ফিরিয়ে আনার।

[ক্রমশ

ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা

কমলেন্দু ধর

ইতিহাসের একটি ঘটনা—রুশ অভিযানে বিপর্যয়ের পর ভিলনার থেকে পারি ফিরলেন নেপোলিয়োঁ। সময় লাগল ৩১২ ঘণ্টা। দূরত্ব ছিল ১৪০০ মাইল। আজ ১৪০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে? রেলে বা বিমানে যথাক্রমে ২৫ বা ৪ ঘণ্টা, বা তারও কম। সময়ের ব্যবধানে এই যে পরিবর্তনটা ঘটে গেল, তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানের নিত্যনব আবিষ্কার, আর উন্নত থেকে উন্নততর প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রায়োগিক বিদ্যায়। এখানে আমরা শুধু উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার কথাই বললাম। সমান্তরালভাবে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির অগ্রগতির অন্য দিগন্তও যত প্রসারিত হয়ে চলেছে, মানবজাতির চলমান জীবনের গতিও তত দ্রুততর হয়ে পড়ছে, পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তন হচ্ছে শুধু মানবজাতির বহিরাবরণে নয়, মানসিক-মানবিক জগতেও। লক্ষ করলেই দেখা যাবে, মানবজাতির আর্থ - সামাজিক - সাংস্কৃতিক জীবনকেও বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি যেভাবে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে—তা এক কথায় বিস্ময়কর। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পর্বে জনজীবনে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির প্রভাব আরো বিস্ময়কর, অনেক বেশি গভীরে প্রোথিত।

এই পটভূমিতে সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের প্রচলন নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব। সাইবারনেটিকস বিজ্ঞান কী এবং কেন—তা বলব। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাইবারনেটিকস-এর ব্যবহারে ভারতীয় আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে কী কী রূপান্তর হয়েছে বা হয়ে চলেছে, তা-ই হবে আলোচনার বিষয়। অর্থাৎ, ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনাতেই আমরা বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছি। কারণ, সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানের চর্চা তথা গবেষণা ভারতবর্ষে এখনও একেবারেই প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। কিন্তু সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের সূত্রে উদ্ভূত প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রায়োগিক ধারায় ভারতীয় জনজীবনে কতগুলি মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেছে,

এবং ঘটে চলেছে। এই রূপান্তরগুলি গভীর পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তারই প্রাথমিক প্রয়াস এই লেখাটি।

আলোচনা শুরু করার আগে প্রথমেই একটি বিষয় আমাদের স্পষ্ট বুঝে নিতে হবে। তা হল—বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিজ্ঞানের মৌলিক পার্থক্যটি। অনেক সময়ই দেখা যায়, প্রযুক্তিজ্ঞানই বিজ্ঞানের মর্যাদা পেয়ে যায়। আসলে তো প্রযুক্তিজ্ঞান কখনোই, কোনো স্তরেই বিজ্ঞান নয়। বিজ্ঞানের কাজ হল কার্য আর কারণ (cause and effect) সম্পর্কে মৌলিক অন্বেষণ। অর্থাৎ, কোনো বস্তু বা প্রযুক্তি ব্যবহারের পেছনে যে নিয়মনীতি কাজ করে, তার স্বরূপ আবিষ্কার করা। যেমন, সুইচ টিপলে আলো জ্বলে—এ হল প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রায়োগিক ফল। কিন্তু কেন আলো জ্বলল—তার কার্য এবং কারণ আবিষ্কারই বিজ্ঞান। তা ছাড়া, বিজ্ঞানের কার্য আর কারণ সম্পর্কে যে তথ্য আর তত্ত্ব কাজ করে, তা নিয়ে বেশির ভাগ মানুষেরই কোনো কৌতূহল নেই, তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে তার কোনো প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। খুব সামান্যসংখ্যক মানুষই তা নিয়ে জড়িত, ভাবিত। কিন্তু বিজ্ঞানের সূত্রেই উদ্ভূত যে প্রযুক্তিজ্ঞান, তার সাথে অনেক বেশি মানুষ সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। কারণ, প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রয়োগে যে বস্তুরাশি উৎপাদন হয়, তা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে অতি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে। তাই দেখা যায়, কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জনজীবনকে যতটা সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক দ্রুত প্রভাবিত করে প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রায়োগিক অংশ। যেমন, সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের আবিষ্কার জনজীবনকে যতটা না প্রভাবিত করেছে তার কয়েক শত গুণ বেশি প্রভাবিত করেছে গণকযন্ত্র—যাকে আমরা কমপিউটার বলি। এই গণকযন্ত্রটি সাইবারনেটিকস বিজ্ঞানের পথরেখায় প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রায়োগিক ফসল। ভারতবর্ষেও সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানের গবেষণা ভ্রূণের পর্যায় রয়েছে। কিন্তু ধার-করা প্রযুক্তিজ্ঞানে তৈরি গণকযন্ত্রের সাথে আমদানি-করা গণকযন্ত্র মিলিয়ে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে এক বিচিত্র জটিল সঙ্কটের মুখো-মুখি করে তুলেছে।

১. সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান কী এবং কেন

এক কথায়, সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান হল, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। এবং তা যন্ত্রপাতি আর প্রাণিজগৎ—উভয়ের সম্পর্কেই প্রযুক্ত। ১৯৪৮ সালে আমেরিকার গণিতজ্ঞ নরবার্ট উইনার প্রথম সাইবারনেটিকস শব্দটি ব্যবহার করেন। সাইবারনেটিকস শব্দটি গ্রীক শব্দ Kubernetes থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হল : Steersman। বাঙলায় 'কর্ণধার' করা যেতে পারে। নরবার্ট উইনার তাঁর বই Cybernatics : on Control and Communication in the Animal and the Machine-এ সাইবারনেটিকস-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন, 'Cybernetics', as 'the entire field of control and communication theory whether in the machine or in the animal.' Wiener 1948, p. 19। ১৯৪৮ সালের পরবর্তী সময়ে উন্নত দেশগুলিতে সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা আর চর্চা হয়েছে, হচ্ছে। ১৯৬০ সাল থেকে জারমানিতে প্রকাশিত হচ্ছে 'Kybernetic' পত্রিকা। এ বিষয়ে আরো কয়েকজন উল্লেখযোগ্য গবেষকের নাম হচ্ছে Maron M. E., Ashby William R. এবং Shannon।

সাইবারনেটিকস বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Shannon তার "The Mathematical Thory of Communication"-এ গুরুত্ব দিচ্ছেন একটি "কোড"-এর ধারণার উপর। এবং তিনি দেখাতে চেয়েছেন, এই কোড ব্যবহারের ফলে কাজের দক্ষতা

কত বেড়ে যেতে পারে। এই কোড একটি সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি সংখ্যার সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য আমরা পেয়ে যাব। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক এই পদ্ধতিকে 'numerically controlled' বা সংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা বলা হয়। কারণ, কোড-এর নির্দেশ সংখ্যার সাহায্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন সর্বাধুনিক ব্যাঙ্কিঙ কাজকর্ম বহুলাংশেই এর সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কের একজন গ্রাহক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে নির্দিষ্ট একটি সংখ্যার মাধ্যমে তার ব্যাঙ্কিঙ লেনদেন চালাতে পারেন। ব্যাঙ্কও ওই নির্দিষ্ট সংখ্যাটির সাহায্যে নির্দিষ্ট গ্রাহকটির "অ্যাকাউনট" সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেয়ে যান। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, এই কাজের পুরো অংশটিই পরিচালিত হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। শুধু একজন মানুষের প্রয়োজন হচ্ছে যন্ত্রটি ঠিকমতো চলছে কিনা—তা পর্যবেক্ষণ করা।

সাইবারনেটিকস-এর আবিষ্কারের উৎসে কাজ করে মানুষের 'ব্রেন' আর 'স্নায়ুব্যবস্থা' (nerve system) যে কর্মধারায় প্রবাহিত আর ক্রিয়াশীল—তার পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ থেকে। সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত হন যে, মানুষের ব্রেন আর স্নায়ুব্যবস্থার "স্মৃতি-ধারণ" (memory reserve) করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুতরাং যন্ত্রও একইভাবে স্মৃতিধারণ করে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই সূত্রেই সাইবারনেটিকস তত্ত্ব-এর প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রায়োগিক ধারায় এখনও পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা সেরা উৎপাদিত বস্তুটির নাম গণকযন্ত্র বা কমপিউটার। যেজন্য অনেকেই গণকযন্ত্রকে "হিউম্যান ব্রেন" হিসাবেও ব্যাখ্যা করেছেন। তাই একজন সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানী বলছেন, 'The brain could be viewed as a complex communication, computer and automatic control system।' এখানে আরেকটি তথ্যও অবশ্যই উল্লেখনীয় যে, 'ডিজিটাল কমপিউটার' উদ্ভাবনের পর থেকেই সাইবারনেটিকস-এর চর্চা আর ব্যাপ্তি দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালে প্রথম ডিজিটাল কমপিউটার তৈরির কাজ শেষ হয়। তারপর থেকেই সাইবারনেটিকস-এর অগ্রগতি দ্রুততর হয়ে পড়ে। এবং কমপিউটারে তত্ত্ব, প্রযুক্তিজ্ঞান আর প্রায়োগিক বিদ্যা জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, গভীরে প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া, সময়ের অগ্রবর্তী ধারায় কমপিউটারের স্মৃতিধারণক্ষমতা যত বাড়তে থাকে, জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাবও ততই প্রসারিত হয়ে পড়ে।

এবার আমরা সাইবারনেটিকস-এর দুটি মূল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি।

(১) এই ব্যবস্থা মূলত স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ কোনো কারখানায় উৎপাদন-ব্যবস্থা মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেই পরিচালিত হতে পারে। এখানে মানুষের কাজ হল যন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, তাই লক্ষ রাখা। বিশেষ করে ইলেকট্রনিকস, পেট্রোকেমিক্যালস, তৈলশোধনাগারে এর বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন, কোনো দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হওয়া থেকে প্যাকিঙ হওয়া পর্যন্ত যে বিভিন্ন পর্ব রয়েছে—তা এখন যন্ত্রের সাহায্যেই করা সম্ভব। এ ছাড়াড়া, উপগ্রহ-উৎক্ষেপণ থেকে শুরু করে মহাকাশগবেষণা এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

(২) উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার যে প্রয়োজন রয়েছে—তাও নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এ ব্যবস্থাকে বলা যায়, 'provision for them to regulate themselves'। বিরাট কারখানার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন যন্ত্রে যে কাজ চলেছে, সুইচ টিপে তা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ঘরে বসে। এ ব্যবস্থাকে 'কনট্রোলরুম অপারেশন' বলা হয়। এই কনট্রোলরুমে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরদায়

ফুটে উঠছে কোথায় কী কাজ চলছে, কোন্ যন্ত্র কিভাবে কাজ করছে। কোনো যন্ত্র খারাপ হলে তাও পরদায় ফুটে উঠছে। এখানে উৎপাদনের পুরো অংশটাই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। মানুষ শুধু কনট্রোলরুমে বসে পর্যবেক্ষণ আর নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন, আমেরিকান মোটর কোমপানিতে পর-পর ৫০০টি যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দিষ্ট কাজ করে চলেছে। আর ৫০০টি যন্ত্র ঠিকমত কাজ করছে কিনা, একজন মানুষ কনট্রোলরুমে বসে তা লক্ষ রাখছেন। অর্থাৎ ৫০০টি যন্ত্রের উৎপাদনব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন একজনমাত্র মানুষ।

১৯৪৮ সালের পরবর্তী তিন দশকে সাইবার-নেটিকস-এর প্রসার আর ব্যাপ্তি জনজীবনের বিভিন্ন প্রবাহে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। তাই দেখা যায়, মনস্তত্ত্ববিদ্যা থেকে শুরু করে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাজনীতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান আর জীবনচর্চার বিভিন্ন ধারার সাথে সাইবারনেটিকস-এর সম্পর্ক গভীরতর হয়ে উঠেছে। এবং জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন আঙিনায় আলাদা-আলাদা ভাবে সাইবারনেটিকস-এর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যেমন "রাজনৈতিক সাইবার-নেটিকস", "সামাজিক সাইবারনেটিকস" ইত্যাদি। আধুনিক রাজনীতি-বিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক সাইবার-নেটিকস-এর সাহায্যে রাষ্ট্রব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ করছেন। তেমনি সমাজবিজ্ঞানীরাও সামাজিক সাইবারনেটিকসকে তাদের কর্মপ্রবাহে যুক্ত করেছেন।

একটি বিতর্ক

পরিশেষে, একটি বিতর্কিত বিষয়ের উল্লেখ করে প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করছি—যার বিস্তৃত আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। বিতর্কের বিষয়টি হল সাইবারনেটিকসকে বিজ্ঞান হিসাবে মেনে নেওয়া এবং অস্বীকার করা নিয়ে। কারণ, অনেকেই সাইবার-নেটিকসকে নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তাঁরা একে প্রযুক্তিজ্ঞানের অংশ হিসাবেই দেখতে আগ্রহী। আবার, কেউ-কেউ সাইবারনেটিকসকে শুধুমাত্র স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা (অটোমেটিক কনট্রোল সিসটেম) হিসাবেই গণ্য করছেন। তাঁদের ব্যাখ্যায়—মানুষকে সরিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণই হল এর বৈশিষ্ট্য। বিপরীতে আবার অনেকেই সাইবারনেটিকসকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর পৃথিবীতে একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হিসাবেই মেনে নিয়েছেন। তাঁদের মতে, সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞানের সাহায্যে জনজীবনের প্রতিটি স্তরের সমস্যা নিয়েই আলোচনা সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাও নির্দিষ্ট করা যায়। আমরা এখানে সাইবারনেটিকসকে বিজ্ঞান হিসাবে মেনে নিয়েই পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করছি।

২. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা

দেশ-কাল-সময়ের অগ্রবর্তী ধারায় বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিজ্ঞানের যে বিকাশ চলছে পৃথিবী জুড়ে, তার সাথে সাযুজ্য রেখে ভারতবর্ষও এগিয়ে চলুক—প্রত্যেক সচেতন ভারতবাসীই তা চাইবেন। বিজ্ঞানের নিত্যনব ধারার গবেষণা চলুক ব্যাপকভাবে, প্রযুক্তি-জ্ঞানের প্রায়োগিক বিদ্যায় ভারতবর্ষ সম্পদে প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক—সমগ্র ভারতবাসীর এ একান্ত কামনার বস্তু। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিজ্ঞানের কল্যাণ-ধারায় নিরন্ন কোনো ভারতবাসীর যদি দুবেলা পেট পুরে খাদ্য জোটে, কোনো নিরক্ষর মানুষ যদি শিক্ষার আঙিনায় পৌঁছতে পারেন, কোনো বেকার যুবক যদি চাকরি পান, সর্বোপরি, কারো যদি বৈজ্ঞানিক-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে—এর থেকে ভালো আর কী হতে পারে। আর সব ভারতবাসীর জীবনেই যদি তা বাস্তবায়িত হয়, তাহলে? কারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই তো বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিজ্ঞান।

ভারত সরকার বোধহয় এদিকে দৃষ্টি রেখেই বিজ্ঞান

আর প্রযুক্তিচর্চার গবেষণায় এবং প্রসারে সচেতনভাবে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন, অনেক কমিটি গড়েছেন, এবং বিপুল অঙ্কের টাকা প্রতি বছর ব্যয় করে চলেছেন। ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার খাতে ১৯৫০-৫১ সালে যেখানে ব্যয় করেছিলেন ৪.৬৮ কোটি টাকা, সেখানে ১৯৮৪-৮৫ সালে ব্যয় করেছেন ১,৮৯০.৫৮ কোটি টাকা। এবং ১৯৯০-৯৫ সালের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭,৫৩৫ কোটি টাকা। কেবল মহাকাশগবেষণার জন্যই ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেটে ৪৩২ কোটি ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এত বিপুল অঙ্কের টাকায় ভারতবর্ষের ১৩০০-র উপর গবেষণাকেন্দ্রে ৩০ লক্ষ কর্মী নিয়ত কাজ করে চলেছেন—ভারতবর্ষকে সর্বক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য। এই কারণেই ভারত সরকার প্রতিজন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্মীর জন্য বছরে ১.৫ লক্ষ টাকা খরচ করছেন। আরেকটি ঘটনা—কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটি 'An Approach to a Perspective Plan for 2001 AD' শিরোনামে তাঁদের পরিকল্পনা প্রধানমন্ত্রীকে পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি হল : 'The country should explore the possibilities of undertaking research and development project with other countries in selected industrial sections।' "যৌথ উদ্যোগে"র অনেক কাহিনী-কিংবদন্তীই আমাদের জানা আছে। এবার তীক্ষ্ণ নজর রাখবার বিষয় হবে এই "যৌথ উদ্যোগের গবেষণা" ভারতবাসীকে কোন্ পথে নিয়ে যায়। স্বয়ম্ভরতা, না, নতুন বিদেশী বন্ধন? যাক, গবেষণার নামে এই বিপুল অর্থ আর জনসম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, তার বিস্তৃত বিতর্কিত আলোচনায় প্রবেশ না করে আমরা ইনডিয়ান ইনসটিটিউট অব সায়েনস-এর অধ্যাপক এ. কে. এন. রেড্ডির একটি মন্তব্য তুলে ধরতে চাইছি। মন্তব্যটি হল, 'The goals of science in India are determined by western concept and not by what is relevant to the needs and conditions of the people who live in India's village. This mismatch makes research meaningless'। পরিশেষে বলা প্রয়োজন, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস বিজ্ঞান-এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে হলেও এই আলোচনায় বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাও কম-বেশি সম্পর্কিত হয়ে পড়বে। কারণ, সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান আজ মহাকাশগবেষণা থেকে শুরু করে উপগ্রহযোগাযোগব্যবস্থা, বৃহৎশিল্পসংগঠন এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য অনেক শাখার সাথেই জড়িয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে খুব সংক্ষেপে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বাস্তব একটি রেখাচিত্র আমাদের জানা থাকলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা বুঝবার পক্ষে সুবিধা হবে।

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রেখাচিত্র

ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রগতির রেখাচিত্রটি আমরা প্রায় রোজই পেয়ে যাই সরকারি প্রচার-মাধ্যমে বা সংবাদপত্রে সরকারের "প্রগতি"র বিজ্ঞাপনের সূত্রে। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সব ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি কত দুর্বার, তা পরিসংখ্যান তুলে সহজেই প্রমাণ করে দেওয়া যায়। আমরা জানি, স্বাধীনতার পর খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫০.৮ লক্ষ টন থেকে ১৪৬.২ লক্ষ টন ছাড়িয়ে গেছে, রপ্তানি-বাণিজ্য ৬০১ কোটি টাকা থেকে ১১,২৯৭.৩৮ কোটি টাকার উপর, ইস্পাতের উৎপাদন ১.৫ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৭.৪ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি। অথবা ১৯৬০-৬১ সালেও যেখানে বৈভব আর আভিজাত্যকে উশকে দেবার জন্য ২,৫৬,০০০ চারচাকার গাড়ি ভারতবর্ষের

রাস্তায় চলাফেরা করত, আজ তা ৮ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। এ-সমস্ত পরিসংখ্যানই দেশের অগ্রগতির স্মারক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আমরা গর্ব বোধ করতে পারি।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আর অগ্রগমনের এই পরিসংখ্যানের পাশাপাশি আরেকটি চিত্রও আছে যা কখনোই সরকারি প্রচারমাধ্যম অথবা "প্রগতি"র বিজ্ঞাপনে আমরা পাই না। এবার সেইটি তুলে ধরছি। এই চিত্রে ভারতবর্ষের ৩৬ লক্ষ গ্রামের ৩০ কোটির উপর মানুষ নিয়ত দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকে কোনোভাবে জীবনধারণ করে বেঁচে আছে। ৩৩ কোটি ৪ লক্ষ মহিলার মধ্যে ২০ কোটির উপর মহিলার দুবেলা পেট পুরে খাবার জোটে না। আজ দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৪০ কোটির উপর। অবশ্য দেশের এইসব মানুষের জন্য সামান্য খাদ্য, একটু পানীয় জল বা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা না গেলেও গ্রামে-গ্রামে প্রতিদিনই দূরদর্শনের প্রচারসূচী সম্প্রসারিত হচ্ছে, এবং স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন একসচেনজ বসছে।

১৯৫০-৫১ সালেও যে দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৩২,০৩ কোটি টাকা, আজ তা বেড়ে হয়েছে ১৯,০০১·৩৯ কোটি টাকার উপর। ১৯৭০ সালেও স্বনির্ভরতার নামে বিদেশের সাথে যেখানে মাত্র ১৮৩টি "কোলাবরেশন" চুক্তি হয়েছিল, ১৯৮৪-তেই তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪০-টিতে। খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর (!) এই ভারতবর্ষেই ১৯৮৫তে ঘটে যায় 'কালাহাণ্ডির' মতো ঘটনা—যাকে সহজেই "প্রগতি"র কলঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস

ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি গবেষণায় যে বিপুল অর্থ আর মানবসম্পদ নিয়োজিত রয়েছে তার যুক্তি হিসাবে ভারত সরকার অনেকগুলি কারণ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রধান দুটি হল : (১) ভারতবর্ষকে সবক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া, (২) বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটানো।

ভারত সরকারের এই যুক্তি কতটা ঠিক, এবং তার ফলে স্বনির্ভরতা আর ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা কতটা এগিয়েছি, তা দেখা যাক।

ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে ১৩০০-র উপর বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি গবেষণাকেন্দ্রে ৩০ লক্ষ মানুষ কর্মরত। এর মধ্যে ৫·৪১ লক্ষ গবেষক সরাসরি গবেগণায় যুক্ত। ভারতবর্ষের মোট জাতীয় উৎপাদনের (GNP) ০·৬৬% ব্যয় হচ্ছে গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য। কিন্তু এই-সমস্ত গবেষণাগার আর গবেষকরা জাতীয় শিল্প উৎপাদনে স্বপ্রযুক্তি হস্তান্তর (indigenous know-how transfer) করেছেন মাত্র ০·০৮%। ভারতবর্ষ-এর শিল্পমানচিত্রে এখন ৬১৩২-টির বেশি বৈদেশিক সহযোগিতা-চুক্তি রয়েছে। এক কথায়, প্রায় সমস্ত শিল্পক্ষেত্রেই বিদেশীদের একচেটিয়া ভূমিকা কার্যকর রয়েছে। যেমন, কৃষিযন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ৭০%, যানবাহন-শিল্পের ক্ষেত্রে ৬৫%, শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি-নির্মাণের ক্ষেত্রে ৪৫%, এবং ঔষধ এবং ঔষধ তৈরির ক্ষেত্রে ৩৫%। এ ছাড়া দেখা যাচ্ছে, একমাত্র ১৯৭৩ সালেই technological assimilation effort সবথেকে বেশি—যা ৩·১০ ভাগ। এরপর থেকে তা দ্রুত অবনতির দিকে।

এ ছাড়া ভারত সকার ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলছেন। কিন্তু শিল্পে উন্নত আমেরিকাতেও স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, উৎপাদনবৃদ্ধির প্রশ্নে বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তি মাত্র ৪০% সম্পর্কিত। বাকি ৬০% নির্ভর করছে মানবসম্পদের দক্ষতার উপর। বিশিষ্ট মারকিন অর্থ-নীতিবিদ কনড্রিক, সোলোন এবং এবং ডেনিসন তাঁদের প্রতিবেদনে বলছেন, বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তি গবেষণায় যত টাকাই ব্যয় করা যাক না কেন,

উৎপাদনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর অবদান ওই ৪০% মাত্র। এ তথ্যটি ড. এ. এস. গাঙ্গুলিও ১৫. ৫. ১৯৮৭-তে উল্লেখ করেছেন—হিন্দুস্থান লিভারের বার্ষিক রিপোর্টে। এখানে বলা প্রয়োজন যে ড. এ. এস. গাঙ্গুলি বহুজাতিক সংস্থা হিন্দুস্থান লিভারের ভারতীয় প্রধান, এবং প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা কমিটির একজন সদস্য।

উপরের আলোচনার সূত্রে দুটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি। এক, ভারত সরকার স্বনির্ভরতা এবং ব্যাপক উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য যে বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তির কথা বারংবার বলছেন—তা কতটা ভ্রান্ত এবং বিপথে চালিত। দুই, বিজ্ঞান বা উচ্চপ্রযুক্তি মানুষের কল্যাণের জন্য—অর্থাৎ সমস্ত ভারতবাসীর কল্যাণের জন্যও। ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তিকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এর অন্যথা হলে হিতে বিপরীত হবে। আর হচ্ছেও তাই। উচ্চপ্রযুক্তির নামে বিদেশ থেকে কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করে যে প্রযুক্তিজ্ঞান আমরা নিয়ে আসছি, তার ফলে না হচ্ছে উৎপাদনবৃদ্ধি, না হচ্ছে ভারতবর্ষের উদ্‌বৃত্ত শ্রমভাণ্ডারের যথাযথ ব্যবহার। যেমন, ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর ব্যবহার। আবার দেখা যাচ্ছে, একই শিল্পের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি গ্রহণ করছি। তর্ক না করে ধরে নেওয়া যাক, বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সেরা প্রযুক্তিই আমরা গ্রহণ করছি। কিন্তু এই বিভিন্ন প্রযুক্তির সামঞ্জস্য বিধান করে ভারতীয় পরিমণ্ডলে তার সদ্‌ব্যবহার তো আমাদেরই করতে হবে। তা হচ্ছে কোথায়? যেমন ইস্পাতশিল্পে। আমরা রাশিয়া, জারমানি, ব্রিটেন, জাপান এবং অন্যান্য দেশ থেকে নিয়ত প্রযুক্তি কিনে চলেছি। তার ফলেই কি ইস্পাতশিল্পে প্রতি বছর কোটি-কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছি? বিষয়টি ভেবে দেখবার সময় এসেছে। সময় এসেছে পুনর্‌মূল্যায়নের। বিজ্ঞান আর উচ্চপ্রযুক্তির নামে কেন আমরা হাজার-হাজার কোটি টাকা ব্যয় করব? সময় এসেছে বিশ্লেষণ করার, কেন স্বনির্ভরতার নামে আমরা প্রতিদিন আরো বেশি বিদেশী সহযোগিতার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ব?

এই প্রেক্ষাপটেই ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান গবেষণার বিষয়টি আমাদের বিচার করতে হবে। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস - বিজ্ঞানের গবেষণা ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এখন যা চলছে তা হল, বিদেশ থেকে আমদানি-করা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এবং কমপিউটারের বহুল ব্যবহার। অবশ্য বিদেশী প্রযুক্তি-সহযোগিতায় এদেশেও এজাতীয় কিছু-কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি শুরু হয়েছে। কেন, কোন্ পরিস্থিতিতে ভারত সরকার এই বিশেষ উচ্চ-প্রযুক্তিটি ভারতবর্ষে ব্যবহার করতে বাধ্য হলেন, তার জটিল আলোচনায় এখানে আমরা প্রবেশ করছি না। কেবল বলা যেতে পারে—ভারত সরকার যে দ্রুততায় এই কাজটি সম্পন্ন করে চলেছেন, তার তুলনা আজ পর্যন্ত অন্য কোনো ক্ষেত্রে আমরা পাই নি। ভারত সরকার এরই মধ্যে সমস্ত বৃহৎ শিল্পে আর সরকারি সংস্থায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার চেষ্টা করছেন। যত্রতত্র নির্বিচার কমপিউটার বসিয়ে চলেছেন। প্রতি বছর কমপিউটারের ব্যবহার কী ভাবে বাড়ছে তা জেনে নিলেই বিষয়টি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯৮৩-৮৪ সালে মাইক্রো-কমপিউটার ব্যবহার হয় ১,২০০টি এবং মিনি কম-পিউটার ২৯০টি। ১৯৮৪-৮৫ সালে যথাক্রমে ২,৬০০ এবং ৫৫০; ১৯৮৫-৮৬ সালে ১০,৩৫০ এবং ১,০৯৮। এখানে যে চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা হল, সাইবার-নেটিকস-বিজ্ঞান গবেষণার নামে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের কমপিউটারের ব্যবহার বাড়ছে—ব্যাপক-ভাবেই বাড়ছে। পরবর্তী পর্যায়ে 'সুপার কমপিউটার' সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চলছে—যেন ভারতবর্ষের সামগ্রিক অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে আছে, সুপার কম-

পিউটারের জন্য। সুতরাং ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনা মূলত কমপিউটার ব্যবহারের মধ্যেই এখনও সীমাবদ্ধ।

উচ্চপ্রযুক্তি তথা কমপিউটার ব্যবহার এবং কিছু প্রশ্ন

উচ্চপ্রযুক্তি তথা কমপিউটার ব্যবহারের ফলে ভারতবর্ষের জনজীবনে যে পরিবর্তনগুলি হয়ে চলেছে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিবর্তনগুলি গুরুত্বসহকারে পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে যে পরিবর্তনগুলি সূচিত হচ্ছে, এবার আমরা তা উল্লেখ করব।

১. উচ্চপ্রযুক্তি তথা কমপিউটার, না শ্রমনিবিড় প্রকল্প ?

বর্তমানে ভারত সরকার-ঘোষিত বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। তারপর রয়েছে অঘোষিত আরো কয়েক কোটি বেকার—অর্ধবেকার, গ্রামীণ বেকার, নথি-বহির্ভূত বেকার। এ ছাড়া, বিভিন্ন শিল্পে আর সরকারি সংস্থায় যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরাও বেকার হয়ে পড়ছেন শিল্পসংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অথবা ছাঁটাইয়ের কারণে। এই অবস্থায় ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন—সমস্ত বৃহৎ শিল্পে এবং সরকারি সংস্থায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করার—অর্থাৎ কমিপিউটার বসাবার। এবং দ্রুত সে সিদ্ধান্ত কাজেও পরিণত করে চলেছেন। কমপিউটারের ব্যবহার কী ভাবে দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তার পরিসংখ্যান আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। এর ফলে একদিকে যেমন বড়ো-বড়ো সংস্থাগুলিতে দ্রুত কর্মী-সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে নতুন এমন কোনো ক্ষেত্রও তৈরি হচ্ছে না যেখানে সদ্য-কর্মচ্যুত বেকারদের বা নতুন বেকার-বাহিনীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। যেমন, ভারতীয় রেলের কথা ধরা যাক। ভারতবর্ষে কর্ম-সংস্থানের দিক থেকে রেল সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটের সময় এই সংস্থায় কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২০ লক্ষ। আজ সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১৩ লক্ষে। ১৯৯২ সালের শেষে এই সংখ্যা হবে ৯ লক্ষ। অর্থাৎ বছরে গড়ে ৫০ হাজার করে কর্মী কমিয়ে আনা হয়েছে, এবং তা হবে আরও কয়েক বছর ধরে। রেলে এভাবে কর্মী-সংখ্যা কমিয়ে আনা হচ্ছে প্রধানত কাজের প্রতিটি বিভাগে স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা চালু করে বা কমপিউটার বসিয়ে। এ ছাড়া, পুরনো দেশীয় পদ্ধতি বাতিল করে বিদেশী প্রযুক্তি ব্যবহারও এর অন্যতম কারণ। রেল ছাড়া ব্যাঙ্ক, ইস্পাত, তেল, কয়লা সহ সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগেও এই ব্যবস্থা ক্রমশ ব্যাপক আকারে কার্যকর হচ্ছে। সরকারি সংস্থার সাথে-সাথে বিভিন্ন ছোটো-বড়ো বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে চলেছে এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে। যেমন, বিদেশী ব্যাঙ্ক-শিল্প সমস্ত কাজ পরিচালনায় স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এমনভাবে কার্যকর করেছে যে শুধু কর্মী-সংখ্যাই কমছে না, এর সাথে তাদের ব্যাবসাও বিপুলভাবে বাড়ছে। যেখানে সমস্ত ভারতীয় ব্যাঙ্ক-শিল্প ৫০,০০০ শাখা নিয়ে কাজ করছে, সেখানে বিদেশী ব্যাঙ্কের শাখা মাত্র ১৫০টি। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির অনেক শাখাতেই এখন ২৪ ঘণ্টা ব্যাঙ্কিঙের কাজ চলছে (round the clock banking functions)। তারা ATM (automatic teller system) ব্যবস্থা এমনভাবে চালু করেছে যার মাধ্যমে একজন গ্রাহক তাঁর কাজকর্ম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যেই করে নিচ্ছেন। আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে এই ব্যবস্থা তাদের সমস্ত শাখাতেই চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এমনকী সিটি ব্যাঙ্ক ATM ব্যবস্থা হাসপাতালে, রেল স্টেশনে, বিমান-বন্দরে চালু করার প্রস্তাব রেখেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে। এ ছাড়া, একটি শাখাতে অ্যাকাউনট থাকলে গ্রাহক সেই ব্যাঙ্কের যে-কোনো শাখা থেকে টাকা

সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। আপাতত এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট-শহরকেন্দ্রিক হলেও, ক্রমশ তা আন্তঃরাজ্য থেকে আন্তর্দেশীয় করার পরিকল্পনা বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির রয়েছে। সবশেষে, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি যে প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসছে তা হল, push-buttom banking service। এই ব্যবস্থা অনুসারে সরাসরি গ্রাহকদের অফিসের সাথে ব্যাঙ্কের যান্ত্রিক যোগাযোগের মাধ্যমেই কাজ চলবে। গ্রাহককে দৈনিক কাজকর্মের জন্য ব্যাঙ্কে আসতে হবে না। এর ফল হিসাবে, বিদেশী ব্যাঙ্কের গ্রাহকসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, বাড়ছে আমানতের পরিমাণ। গত ৩০ মাসে সিটি ব্যাঙ্কে NRI ডিপোজিট ২৭ কোটি টাকা থেকে ৪০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বিদেশী ব্যাঙ্ক-শিল্পের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-শিল্পও এক ব্যাপক স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এ পরিকল্পনার কিছু অংশ এরই মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে, বাকি অংশও দ্রুত বাস্তবায়িত হতে চলেছে। বর্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্ক-শিল্পে ৬ লক্ষ কর্মী রয়েছেন, কিন্তু ২০০১ সালের মধ্যে এই কর্মী-সংখ্যা মাত্র ৯০ হাজারে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা ভারত সরকারের রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বেশ-কিছু শাখাও বন্ধ করে দেবার চিন্তা ভারত সরকার করছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উচ্চপ্রযুক্তি, বিশেষ করে কমপিউটার ব্যবহারের ফলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পে এবং অন্যান্য সংস্থায় কর্মী-সংখ্যা দ্রুত হারে কমবে। এর সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলবে নতুন-নতুন বেকারবাহিনী।

কর্মসংকোচনের এই সমস্যাকে আড়াল করা হচ্ছে উৎপাদনশীলতার কথা বলে। বারংবার একই কথা উচ্চারিত হয়ে চলেছে যে নতুন-নতুন উচ্চপ্রযুক্তি এবং কমপিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে উৎপাদন বাড়াবার জন্য। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, উৎপাদনবৃদ্ধির প্রশ্নে উচ্চপ্রযুক্তি মাত্র ৪০ ভাগে জড়িত; বাকি ৬০ ভাগ মানুষের দক্ষশ্রমের উপর নির্ভরশীল। তা ছাড়া, উচ্চপ্রযুক্তি বিশেষ করে কমপিউটার ব্যবহারের প্রশ্নে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতও বিবেচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে ভারতবর্ষ সুলভ শ্রম-সম্পদে ভরপুর, যে ভারতবর্ষে কোটি-কোটি বেকার, সেখানে উচ্চপ্রযুক্তিনির্ভর প্রকল্প আমরা গ্রহণ করব, না, সুলভ শ্রমনির্ভর প্রকল্প—প্রশ্নটা এখানেই। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল—অবশ্যই শ্রমনির্ভর প্রকল্প। যেখানে উচ্চপ্রযুক্তি একান্ত প্রয়োজন, সেখানে অবশ্যই তা মেনে নিতে হবে। তাতে কোনো বিরোধও নেই। কিন্তু আমাদের সব সময়ই গুরুত্ব দিতে হবে নিবিড়শ্রমনির্ভর প্রকল্পে। যতদিন ভারতবর্ষে ভয়াবহ বেকারসমস্যা রয়েছে, যতদিন উচ্চপ্রযুক্তি আর কমপিউটার ব্যবহারের পরিবেশ না গড়ে উঠছে, ততদিন এর বিকল্প কোনো পথ অনুসন্ধান করা বৃথা চেষ্টায় পর্যবসিত হবে।

২. শ্রমিকশ্রেণীর নতুন মূল্যবোধ

উচ্চপ্রযুক্তি-নির্ভর নতুন-নতুন প্রকল্পে যাঁরা কাজ পাচ্ছেন, তাঁদের মজুরি স্বাভাবিক কারণেই বেশি। যেমন পেট্রকেমিক্যালস, নতুন বিদ্যুৎউৎপাদনকেন্দ্র। আবার পুরনো প্রকল্পেও উচ্চপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ব্যাপক হারে কর্মী কমে গিয়ে অবশিষ্ট যাঁরা থাকছেন তাদের আয়ও কিছু বাড়ছে। যেমন রেলে বা কোনো-কোনো সরকারি সংস্থায় বোনাস চালু হওয়া। যদিও এই বাড়তি আয় পণ্যমূল্যের সূচক অনুসারে অবশ্যই কম। উভয় ক্ষেত্রেই যাঁরা কর্মরত তাঁরা মূলত শ্রমিক। এই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নতুন কিছু মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে। কেবল আয়ের বৈষম্যের কারণেই তা গড়ে উঠছে না; তাঁরা যুক্ত হয়ে পড়ছেন "লোয়ার অ্যারিস্টোক্রেসি"র সাথে। ফলে, ছোটো মাঝারি এবং অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের সাথে তাঁদের এক দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। এই ব্যবধান যে আগে ছিল না তা নয়; তবে এখন তা আরো বাড়ছে—দ্রুত

হারে বাড়ছে। তাই শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক ঐক্যের প্রসার করে সমাজবিপ্লবের চিন্তা আর চেতনা বিভিন্ন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে সংগঠিত বৃহৎশিল্পে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা দ্রুতভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছে; তাঁরাও হয়ে পড়ছেন পণ্য-সমাজের অংশীদার।

এর সাথে আরো একটি বিষয় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি প্রয়োজন। তা হল: উচ্চ আয়ের (হাই-পেড) শ্রমিকরা ক্রমশ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শিল্পমূলধনের সাথে নিজেদের স্বার্থের সম্পর্ক দৃঢ়তর করে তুলছেন। এই শ্রমিকরাও আজ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনছেন। নিজেদের নামে না হলেও পরিবারের অন্য কারো নামে। এর বিভিন্ন ব্যতিক্রমী উদাহরণ অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে, তবে তা সংখ্যায় সামান্যই হবে। তাই কিছু প্রতিষ্ঠান সদম্ভে ঘোষণা করছে, আমাদের শেয়ারহোলডারের সংখ্যা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে ১০ লক্ষে পৌঁছল; পরবর্তী লক্ষ্য ২০ লক্ষে পৌঁছানো। এখানে লক্ষ করার বিষয় হল, কোনো প্রতিষ্ঠানের ভালোমন্দের সাথে ওই ৫, ১০ বা ২০ লক্ষ শেয়ারহোলডারের সম্পর্ক জড়িয়ে পড়ছে—শেয়ার-হোলডারদের অংশীদারির পরিমাণ যত কমই হোক। যদি কখনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে সরকারকে ঐ ৫, ১০ বা ২০ লক্ষ মানুষের বিপক্ষে যেতে হবে। কেন্দ্রীয় শিল্প-মূলধন এইভাবেই নিজদের স্বার্থে উচ্চআয়ের শ্রমিক-দের শিল্প-মূলধনের সাথে জড়িয়ে রাখছেন। আর আমরাও দেখতে পাচ্ছি এই শ্রমিকরা আজ শিল্প-মূলধনের পৃষ্ঠপোষক। আরো স্পষ্ট করেও বলা যায় যে, কেন্দ্রীয় শিল্প-মূলধনের স্বার্থরক্ষায় এই শ্রমিক-শ্রেণী আজ বড়ো বেশি সচেতন।

৩. কমপিউটারের সামাজিকীকরণ

ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক হারে কমপিউটারের ব্যবহার শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, জাতীয় স্বার্থের পরি-পন্থীও বটে। কিন্তু ব্যাপক হারে কমপিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে, কর্মরত শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন, নতুন কাজের সুযোগ আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। এর বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদের স্তর পেরিয়ে, দিন কয়েকের ধরনা বাদ দিয়ে সংগঠিত কোনো প্রতিবাদী আন্দোলন অনুপস্থিত। বরং আজ যাঁরা মৌখিক-ভাবেও প্রতিবাদ করছেন কাল তাঁরাই কমপিউটারের সপক্ষে "ঐতিহাসিক চুক্তি"গুলি সই করে আসছেন। কেন তাঁরা চুক্তিগুলি সই করতে বাধ্য হচ্ছেন?

কারণ, ট্রেড ইউনিয়নের "সাদা রঙের" শ্রমিক-প্রতিনিধিরা এর বিপরীত কিছু করার নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছেন। এবং বর্তমান শাসকশ্রেণীও নিজেদের স্বার্থে কমপিউটারের ব্যবহারের সামাজিকী-করণ করে ফেলেছেন। কেন তাঁরা নৈতিকতা হারালেন? কীভাবে শাসকশ্রেণীই বা সামাজিকী-করণ করে ফেললেন?

এর উত্তরে বলা যায়, একদিন ঔপনিবেশিক সরকার যে প্রথা-প্রকরণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজি ভাষার সামাজিকীকরণ করেছিলেন, সেই একই কায়দায় বর্তমান শাসকশ্রেণীও কমপিউটারের ব্যবহারকে সামাজিকীকরণ করে ফেলেছেন। যে কারণে অলিতে-গলিতে "ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল" গড়ে ওঠে, সেই একই কারণে এখন Computer Training Centre গড়ে উঠছে। ইংরেজি জানা যেমন আর্থিক উন্নতির সোপান হিসাবে ব্যবহৃত হত এবং হয়, তেমনি সমাজে ওজন ভারী (social poise) করবার প্রয়োজনও দরকার। এখন "কমপিউটার কালচার"-এর সাথে জড়িয়ে পড়াও একান্ত প্রয়োজনীয়—কারণ একই। আর্থিক উন্নতি ও সমাজে ওজন ভারী করা। এই জড়িয়ে পড়ার সুযোগটা গ্রহণ করছেন মূলত সমাজের সেই অগ্রসর শ্রেণী—যাঁরা মৌখিকভাবে এখনও ইংরেজিবিরোধিতা

করে নিজেদের সন্তানসন্ততিদের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলেই পড়ান। সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতা, সেই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি! ফলত, কমপিউটার ব্যবহারের বিরোধিতা করার নৈতিকতা আজ ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা হারিয়ে ফেলেন। তাদের ছেলেমেয়েরাও অনেকের আগে গিয়ে কমপিউটার কালচারের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। এইভাবেই শাসকশ্রেণীও কমপিউটারের ব্যবহারকে সামাজিকীকরণ করে ফেলেছেন।

এ ছাড়া দেখা গেছে ঔপনিবেশিক আমলেও ভারতবর্ষের সামগ্রিক অনগ্রসরতার, বিশেষ করে আর্থিক সংকটের কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল ভারতবর্ষের অন্ধকারময় সেই ভুবনকে, যেখানে ইংরেজি ভাষা নেই, পাশ্চাত্যের জীবনবোধ নেই, নেই পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিজ্ঞান। আজকেও দেশের সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে উচ্চপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রায়োগিক কৌশলের অভাবকে। যেন আজকের ভারতবর্ষের সামগ্রিক অধোগতির একমাত্র কারণ উচ্চপ্রযুক্তির অভাব। এবং ভাবখানা এমন, যেন এর দ্বারাই ভারতবর্ষের সব সমস্যার সমাধান সম্ভব। আসলে ওই সেই প্রহেলিকা—যার সাহায্যে আজকের শাসকশ্রেণীও সমস্যার মৌলিক কারণগুলি ঢেকে রাখতে চাইছেন। মূল সংকটকে আড়াল করার এই কৌশল শাসকশ্রেণী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই করে চলেছে। আর প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি এবং সংগঠিত বৃহৎ শিল্পের শ্রমিকরা তার দোসর হয়ে পড়ছেন।

৪. জীবনের গুণগত মান কমছে, কম হলেও বাড়ছে জীবনযাত্রার মান

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, বিভিন্ন বৃহৎ শিল্পে আর প্রতিষ্ঠানে যেসব সংগঠিত শ্রমিক কাজ করে চলেছেন তাঁদের অনেকেরই শ্রেণীচেতনা দ্রুতলয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়ে-যাওয়া শ্রেণীচেতনার পাশাপাশি গড়ে উঠছে ভিন্নতর মূল্যবোধ বা আদর্শ। এই ভিন্নতর মূল্যবোধ বা আদর্শকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে এইভাবে যে, ওইসমস্ত শ্রমিকদের জীবনে এখন মূল আদর্শ হল—পণ্যসমাজের আদর্শ, পণ্যসমাজের মূল্যবোধ। এখানে প্রথম আর শেষ কথা হলে কে কত বেশি পণ্য ভোগ করছে, কত দামি পণ্য ভোগ করছে, কত রঙবাহারি পণ্য ভোগ করছে। এই ভোগ্যপণ্যের সংখ্যায় আর ওজনে নির্ধারিত হচ্ছে জীবনযাত্রার মান। এই হিসাবে ভারতবর্ষের শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান বাড়ছে, সংখ্যায় তারা যতই অল্প হোক। শুধু ওই শ্রমিকশ্রেণীই নয়, তার সাথে আমরা যুক্ত করতে পারি ভারতবর্ষের আরও ১০ বা ১১ শতাংশ মানুষকে—যাদের জীবনযাত্রার মানও বাড়ছে। এরাই সমাজের সেই অগ্রসরশ্রেণী যারা উচ্চপ্রযুক্তির অংশীদার। এই ১২ বা ১৩ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান যে বাড়ছে তার প্রমাণ ভারতবর্ষে বিলাসবহুল ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়ছে। বাড়ছে চারচাকার গাড়ির উৎপাদন আর চলছে পাঁচতারা হোটেলের আয়োজন। পরিশেষে আমাদের মনে রাখতে হবে—এখন পর্যন্ত এই সামান্য-সংখ্যক মানুষই কিন্তু ভারতবর্ষের মূল নিয়ন্তা।

কিন্তু উচ্চপ্রযুক্তির অংশীদার এই শ্রেণীর জীবনের গুণগত মান (কোয়ালিটি অব লাইফ) কমছে। কোথাও-কোথাও গুণগত মান দ্রুতহারে কমছে। এখানে এ-বিষয়ের জটিল ব্যাখ্যায় আমরা প্রবেশ করছি না। জীবনের গুণগত মান যে কমছে তার সরল প্রমাণ সৃষ্টিকর্মের যে-কোনো আঙিনা থেকে নেওয়া যেতে পারে। বা প্রমাণ করা যেতে পারে আজকের চলমান রাজনীতির গুণগত মান থেকেও। যেমন, মূল্যবোধের রাজনীতি (value-based politics)। বর্তমান রাজনীতিতে "নীতি", "মূল্য-বোধ", "সততা" প্রভৃতি বিষয়গুলি অতীতের বিষয় হয়ে পড়ছে—একদম বিচ্ছিন্ন উদাহরণ ছাড়া।

ফিলমি পরদার নায়ক আজ ভারতবর্ষের রাজনীতির মঞ্চে উঠেছে। এখন রাজনীতির অর্থ, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। এও তো সত্যি যে তেলেঙ্গানার ঐতিহ্যে গরীয়ান অন্ধ্রপ্রদেশে পরদার 'এতো নায়ক' কত সহজে রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসেন। এ-ঘটনা রাজনীতির কোন্ গুণগত মানকে চিহ্নিত করে?

তথ্যসূত্র

১. Ashby, William R. (1968) An Introduction to Cybernetics.

২. Maron, M. E. (1965) On Cybernetics Information Processing and Thinking.

৩. Union Budget 1987-88; 1988-89 & Budget Speech.

৪. Census of India 1971 & 1981.

৫. The Economic Scene—January 1987.

৬. India—A Reference Annual. Different Years, Publication Division. Government of India.

৭. Fourth Survey Report on Foreign Collaboration by RBI & other sources.

৮. Govindarajula V.—Evaluation of Effectiveness of Indigenous R & D. Journal of Scientific & Industrial Research (Vol. 43).

৯. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা।

১০. ভারতীয় পটভূমিতে সাইবারনেটিকস।

১১. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিস প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন।

১২. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস—কিছু জিজ্ঞাসা।

১৩. ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস কেন?

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

(খ)

বহিঃপ্রাসাদের বিলাসকক্ষে আমোদপ্রমোদ লেট-ঠোন-ড' কথা

রাত্রিতে ছয়টি বেলোয়ারির ঝাড়, চব্বিশটি বড়ো মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোকে লেট-ঠোন-ড' স্বর্ণমণ্ডিত প্রাচীর ভাস্বর থাকিত। প্রত্যেক বাতায়নের সম্মুখে পুষ্পিত হাসনাহানা, রজনীগন্ধা ও চামেলির টব বসানো ছিল। গৃহতলে বহুমূল্য কার্পেট বিছানো ছিল; তাহার উপর কয়েকখানি ফরাসি-দেশীয় বার্নিশোজ্জ্বল কুর্সি, তাহাতে স্প্রিঙ্-দেওয়া মখমলের কুশন এবং রাজার জন্য ব্রহ্মদেশীয় সূত্রধরনির্মিত সুচারু কারুকার্যসম্পন্ন স্বর্ণপত্রমণ্ডিত কেদারা ছিল। প্রত্যেক কুর্সির সম্মুখে এক-একখানি আবলুশ কাঠের শিল্পকার্যময় পীঠিকা ছিল। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক কুর্সির নিকট ছিল এক-একটি রৌপ্যনির্মিত নিষ্ঠাবনী। চারি প্রাচীরে চারিখানি সুবৃহৎ দর্পণ; প্রতি দর্পণের দুই পার্শ্বে দুইটি স্বর্ণমণ্ডিত সিংহমূর্তি; তাহাদের শিরোদেশে এক-একখানি স্বর্ণনির্মিত থালা; তাহার উপর কতক-গুলি সুগন্ধির শিশি এবং ছোটো একটি স্বর্ণপাত্রে চন্দনের তরল প্রলেপ। বেলোয়ারি ছোটো-ছোটো ফুলদানে ছোটো-ছোটো কয়েকটি পুষ্পগুচ্ছ।

হস্তিদন্তের একখানি ক্ষুদ্র পর্যঙ্কে একটি ছোটো "জাহাজি কুকুর" বসিয়া থাকিত। কুকুরটি আনা হইয়াছিল মহারানী থুপিয়ালার জন্য। কিন্তু মহারানীর পারস্যদেশীয় বিড়ালীর সহিত জাহাজি কুকুরের সদ্ভাব না হওয়াতে, মহারাজ তাহাকে লেট-ঠোন-ড' কক্ষে স্থান দিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র তাহার মুখ; উজ্জ্বল তাহার সুবৃহৎ দুটি চক্ষু; অঙ্গে দুগ্ধফেননিভ দীর্ঘ রোমরাজি; আকারে ক্ষুদ্র একটি শূকর-শিশুর মতো; হৃষ্টপুষ্ট কোমল কলেবর ছিল। নরম গদি ভিন্ন অন্যত্র এ জাহাজি কুকুর শয়ন করিত না; দুর্গন্ধহীন চৈনিক প্লেট ভিন্ন অন্য পাত্রে অন্ন গ্রহণ করিত না; ব্রহ্মের রাজপ্রাসাদে আসিয়া সে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিয়া-

ছিল—নিরামিষ ভোজন করিত। পূর্বাহ্নে মহারাজার সহিত বেলা বারোটার পর নির্জলা উপবাস করিত; কুঙ্গী চাউংয়ে প্রার্থনার ঘণ্টা বাজিলেই জাহাজি কুকুর বিলাসকক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পুচ্ছ নত করিয়া সম্মুখের দুই পদ ঊর্ধ্বে তুলিয়া হা-আ-আ-আ শব্দে "স্তোত্রপাঠ" করিত। মহারানীর বিড়ালটির সহিত অদৃষ্টক্রমে সাক্ষাৎ হইলে পুচ্ছ আধুনন করিয়া, দেহ আকুঞ্চন করিয়া, যে মধুরভাবে সে বিড়ালীর সহিত প্রেম করিতে যাইত, বিড়ালীর তাহা মোটেই সহ্য হইত না। সে পৃষ্ঠদেশ রামধনুর মতো বক্র করিয়া, মোটা লেজটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া এমন এক বিকট মুখভঙ্গি করিত যে জাহাজি কুকুরের প্রেম তখনি বাষ্পীভূত হইয়া যাইত। তিব'র প্রতি মহারানীর আদেশ ছিল—'কুকুরকে অন্দরমহলে আনিও না।' কিন্তু মহারানীর মানভঞ্জনের রাত্রিতে মহারাজ তিব' এ আদেশ অমান্য করিয়া কুকুরটিকে মহারানীর কক্ষে লইয়া আসিতেন। কুকুর আর বিড়ালীর প্রণয়কলহে রাজদম্পতির দাম্পত্যকলহও 'লঘুক্রিয়া' হইয়া যাইত।

বিলাসকক্ষের দেওয়াল ছিল উজ্জ্বল পরিষ্কার দর্পণবৎ। কিন্তু রাত্রিকালে এক জেটিকা-দম্পতি কক্ষের স্নিগ্ধ আলোকে প্রাচীরের গাত্রে আহার অন্বেষণে আবির্ভূত হইত। মহারাজ তিব' দয়া করিয়া তাহাদিগকে 'আতে-সিন' উপাধি দিয়াছিলেন। 'আতে-সিন-মিন' উপাধি ছিল মহামন্ত্রী কিন-টন-মিনজীর। মিনডন মহারাজ-প্রদত্ত উপাধি; তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইত না। নারায়ণ মুখার্জি নামক এক সাধু-মহারাজ তিব'র দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন; উ-টিনকৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে নারায়ণ মুখার্জির আবির্ভাবের কথা লিখিত আছে। তিনি তিব' মহারাজকে বলিয়াছিলেন: 'টিকটিকিরা খনার বাচ্চা—গভীর রাজনৈতিক প্রশ্নের সরল সমাধান করিতে পারে—মনে সন্দেহ থাকে না।'

মহারাজ মিনডনের রাজদরবারে এক অলঙ্কার ছিল—তাঁহার বিদূষক। মহারাজ তিব'র সময়ে সে পেনশন লইয়াছিল। তাহার স্থানে কোনো বিদূষক নিযুক্ত হয় নাই। বিলাসকক্ষে একাব্বর মিন্‌তা বিদূষকের অভিনয় করিলেন, কিন্তু তাহা মধ্বাভাবে গুড়বৎ।

বিলাসকক্ষে একদিন বেশ আসর জমিল। ইয়ে-নাউং-মিন্‌তা, পাগান মিন্‌তা, একাব্বর মিন্‌তা, ও পিন্‌তা-মিন্‌তা প্রভৃতি সকল বন্ধুরাই সে রাত্রিতে বিলাসকক্ষে উপস্থিত ছিলেন। বেলোয়ারির পেয়ালায় ফেনশীর্ষ শ্যাম্পেন ক্ষণে-ক্ষণে পরিবেশিত হইতেছিল। অতুল আনন্দে, উন্মত্ত হাস্যে ও অর্ধজড়িত বাক্যে প্রমোদকক্ষ উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল।

পিন্‌তা মিন্‌তা বলিলেন—মান্দালয় পর্বতে আজ একটি খুব বড়ো তেহার। বড়ো-বড়ো কুঙ্গী আর অগণ্য পূজার্থীর সমাগম হইয়াছে।

একাব্বর—পূজার্থিনীর সংখ্যাই বেশি।

ইয়েনাউং—ব্যাপারটা কী?

তিব'—ব্যাপার—মং-ইয়ে নামক এক ভণ্ড সাধু মান্দালয়ে আসিয়াছে! সে বলিতেছে—প্রভু গজার মৎস্য আকাশপথে মান্দালয় পাহাড়ে উড়িয়া আসিবেন।

ইয়েনাউং—ব্যাটা ভয়ানক ফাঁকিবাজ বদমায়েশ। মহারাম মিন্‌ডনের সময়েও সে একবার আসিয়াছিল।

একাব্বর মিন্‌তা ডাঃ মার্কের বিদ্যালয়ে হ্যামলেট পড়িয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—There are things, Horatio, that your philosophers cannot dream। হয়তো তাহার কথা সত্যও হইতে পারে।

তিব'—সে বলিতেছে, বৈশালী শহরের অতি পুরাতন এক পানাপচা পুকুরে প্রভু গজার মৎস্য বাস করিতেন। এক ইংরেজ হুইশকি পান করিয়া প্রভুর গায়ে কুলকুচা করাতে তিনি অভিশাপ দেন যে তিনদিনের মধ্যেই কালার বাচ্ছার মৃত্যু হইবে। সত্যই তাহা হইল। তাহার পর প্রভুজী মংইয়েকে

স্বপ্নাদেশ দিলেন: 'আমি আর বৈশালীতে থাকিব না, মান্দালয় পাহাড়ে বাস করিব। তুই রাজধানীতে খবর দে।' ব্যাটা এই উপলক্ষে মান্দালয়ে এক মহাপর্ব খুলিয়া বসিয়াছে।

ইয়েনাউং—মহারাজকেও সে দর্শন দিয়াছিল নাকি?

তিব'—দর্শন দেয় নাই, কিন্তু দর্শন চাহিয়াছিল। আমি সম্মত হই নাই।

পিন্‌তা—মাছ কখনো শূন্যে উড়িতে পারে? ব্যাটা তো ভারি ধড়িবাজ।

তিব'—কোনো-কোনো মাছ পারে, কিন্তু গজারমাছ পারে না। পিন্‌তা মিন্‌তা—তোমার এঞ্জি?

ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া রাজসভায় আসা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পিন্‌তা-মিন্‌তার এঞ্জির পুরাতন এক অংশে এক ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল। ছিদ্রটিকে পিন্‌তা-মিন্‌তা বাম হস্তে আবৃত করিয়া কহিলেন—

—হুজুর, আমার এঞ্জির পকেট ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কাজেই কোট পাজো সবই এখন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। মহারাজের দয়া ভিন্ন এ ছেঁড়া এঞ্জি বদল করা যাইতেছে না।

ইয়ে নাউং মিন্‌তা হাসিয়া বলিলেন—যার গিন্নীর সংখ্যা রোজই বাড়িয়া যাইতেছে,—পিন্‌তার পকেট কেন, চুল পর্যন্ত ছিঁড়িয়া যাইবে।

তিব' ছিলেন খুব সদাশয় দয়ালু রাজা। তিনি তখনই বলিলেন—পিন্‌তা-মিন্‌তাকে মাসিক ত্রিশ টাকা জেয়াদা ভাতার জন্য মন্ত্রীদিগকে অনুরোধ করিবেন।

একাব্বর মিন্‌তা বললেন—মহারাজ, আমারও কিছু বেতনবৃদ্ধির আদেশ হউক। আমি জীবনবীমা করিয়াছি; প্রিমিয়ামের পয়সা জুটিতেছে না। কোম্পানি বলিতেছে—আমার দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

টাউঙ-টা-মান-লে-ছা বলিলেন—আমি আগেই বলিয়াছিলাম, তুমি এই জীবনবীমার ঝঞ্ঝাটে প্রবেশ করিও না।

তিব'—তুমি জীবনবীমা করালে কবে?

একাব্বর মিন্‌তা—আজ প্রায় তিনমাস। একদিন এক আমেরিকান কালা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে এক চামড়ার ব্যাগ, চোখে বড়ো-বড়ো চশমা, খুব লম্বা চেহারা আর পরনে খুব দামি পোশাক। আমাকে বলিল, আমি জীবনবীমা করিলে আমার মৃত্যুর পর তাহারা একলক্ষ টাকা দিবে।

পিন্‌তা—মনি অর্ডারে, না, তারে?

ইয়েনাউং—এখনো পরলোকে মনিঅর্ডার পাঠানোর ব্যবস্থা হয় নাই। তার অন্য বন্দোবস্ত আছে। যত খ্রীষ্টান মরিতেছে, তাহারা ইহলোক ত্যাগ করিয়া রেসারেকশনের জন্য পরলোকে জমা হইতেছে। সেখানে তাহারা বিপুল কারবার খুলিয়াছে। বড়ো-বড়ো ব্যাঙ্ক করিয়াছে। টাকার অভাব কী? একাব্বর মিন্‌তা সুদে-আসলে লক্ষ টাকা পাইবেন। তিনি ভালোই করিয়াছেন। সেখানে ছোটো গিন্নীর সঙ্গেও দেখা হইবে।

একাব্বর—আরে, তুমিও দেখিতেছি পাগল হইলে। আমি মরিলে টাকা পাইবে আমার স্ত্রী, আমি নই।

ইয়েনাউং—কোন্ স্ত্রী? বড়ো না মধ্যম?

পিন্‌তা—বড়ো স্ত্রীই তাহার মালিক হওয়া উচিত।

ইয়েনাউং—কিন্তু মধ্যমার বয়স অল্প; তাহারই টাকার দরকার বেশি।

তিব'—ধর্মতত্ত্বে বলিতেছে, সব স্ত্রীই সমান অংশ পাইবে। কিন্তু আমেরিকান কোম্পানি ধর্মতত্ত্ব মানিবে তো?

ইয়েনাউং—এক লক্ষ টাকা! দুই সতীনে লড়াই হইলে কোম্পানিই সে-টাকা হজম করিবে। কিন্তু টাকাটা দিবে কে?

একাব্বর—কোম্পানি দিবে।

ইয়েনাউং—কোম্পানি তো আমি কিছুই দেখিতেছি না। একজন ফেরেববাজ কালা, কোম্পানির নাম দিয়া বড়ো এক সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

তাহার বা তাহাদের না আছে জমি না বাড়ি। একদিন রেঙ্গুন হইতে চম্পট দিলে, একাব্বর মিন্‌তা হায়-হায় করিয়া মৃত্যুলাভ করিবেন। কোম্পানি কে?

টাউং-টামান—আমি চিরদিনই ওই কথা বলিয়া আসিতেছি।

তিব'—মাসে কত টাকা তোমাকে প্রিমিয়াম দিতে হয়?

একাব্বর—হাজার টাকা। আমার সব টাকা এই প্রিমিয়ামের জন্য খরচ করিতে হইতেছে।

তিব'—কতদিন এইরূপে প্রিমিয়াম দিতে হইবে?

একাব্বর—দশ বৎসর।

তিব'—দশ বৎসরে একলক্ষ বিশ হাজার টাকা দিতে হইবে। পাইবে তুমি এক লক্ষ। তাহাও দশ বৎসর পরে। ভালো ব্যাবসা বটে। কিন্তু যদি তুমি এতদিন না বাঁচ?

একাব্বর—কোম্পানি একলক্ষ টাকা দিবে।

তিব'—তাহারা তো কেহই রেঙ্গুনে নাই। যদি টাকাটা না দেয়?

পিন্‌তা—দিবে কি করিয়া মহারাজ! ধরুন, একাব্বর দুই বছরে ২৪০০০ টাকা জমা দিলে, তারপর তাহার মৃত্যু হইল—

দেওয়ালের উপর টিকটিকি অমনি বলিয়া উঠিল—ঠিক, ঠিক, ঠিক। তিব' মহারাজ চক্ষু বিস্তৃত করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিলেন—শুনিলে কি দৈববাণী?

সকলে বিস্মিত নেত্রে টিকটিকিদম্পতিকে দেখিতে লাগিলেন। একাব্বর মিন্‌তা বললেন:

—আমারও মনে সর্বদাই ওইরকম এক ভয় হইতেছিল, যেন বেশি দিন আর বাঁচিব না। সেই জন্য বীমা করিলাম।

ইয়েনাউং—আমিও রোজ স্বপ্ন দেখিতেছি—আমার জেল হইয়াছে। জেলের কোনো বীমা নাই?

তিব'—তোমরা হুইস্কি সেবা করো; তোমাদের ওরকম স্বপ্নের কোন মীনিং নাই। আমি দেখিতেছি, বীমা কোম্পানি করা একটি ভালো ব্যাবসা। কিন্তু কোম্পানির অংশীদার সব দেশী লোক হওয়া চাই, আর যাহারা বীমা করিবে তাহাদের স্বাস্থ্য খুব ভালো থাকা চাই।

ইয়েনাউং—মহারাজ, আপনি জ্ঞানী পুরুষ হইয়াও এমন এক অসঙ্গত কথা কহিলেন!

তিব'—অসঙ্গত কিসে?

ইয়েনাউং—আজ স্বাস্থ্য ভালো থাকিলে কাল যে মরিবে না এরূপ কিছু নিশ্চয়তা আছে? মরণটি সকলের চেয়ে বেশি নিশ্চিত হইলেও সবচেয়ে বেশি অনিশ্চিত।

তিব'—তা সত্য। যদি সকল বীমাকারীই একসঙ্গে অসময়ে মৃত্যুলাভ করে, তবেই কোম্পানির ক্ষতি, নতুবা—এ বেশ লাভের ব্যাবসা।

ইয়ে নাউং—মার্জনা করিবেন, মহারাজ, এ একটা ভয়ানক লেফাফা-দুরস্ত জুয়াখেলা। বিলাতি জুয়াচুরির খেলায় আমাদের যোগদান করার মতো বোকামি আর নাই।

তিব'—জুয়া বটে, কিন্তু এ জুয়াখেলায় কোম্পানির বেশি লোকসান হইবে না। যদি প্রত্যেক মাসেই নূতন-নূতন লোক জীবনবীমা করে, তবে তাহাদের টাকাতেই মৃত লোকের টাকা পরিশোধ করা যাইতে পারে।

টাউং টামাম—আমি এইরকম এক দেশী কোম্পানি খুলিতে চাই। যদি মহারাজ কিছু অর্থ সাহায্য করেন।

তিব'—কত জনকে অর্থ সাহায্য করিলাম তাহার অন্ত নাই। মনে আছে নারায়ণ মুখার্জির কথা?

ইয়ে নাউং—সে বেটা চোর, মহারাজার নিকট হইতে ৫০০০ টাকা লইয়া গিয়াছে, বলিয়াছিল ৫০,০০০ টাকার সোনা প্রস্তুত করিয়া দিবে।

পিন্‌তা—তাহার নেড়া মাথা, গায়ের নামাবলী আর কপালের লম্বা ফোঁটা দেখিয়াই আমি সন্দেহ করেছিলাম—বেটা চোরের শিরোমণি।

তিব'—কিন্তু লোকটা খুব বিদ্বান, পালি ও সংস্কৃত অনর্গল বলিতে পারে। হাত দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ ঠিক-ঠিক পাঠ করিতে পারে। গুপ্তধন দর্শন করিতে পারে। তাহার উপদেশেই আমি মান্দালয় পাহাড়ের নিকটে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূল্যের সোনা ও জহরত খুঁড়িয়া পাইয়াছিলাম।

টাউং টামান—ওরকম ক্ষমতা হয় লোকের যোগবলে।

পিন্‌তা—যোগের আশ্চর্য ক্ষমতা। শুনিয়াছি তিববতি যোগীরা শুদ্ধ যোগবলে মানুষকে অসাড় করিয়া রাখিতে পারে। হাতের বন্দুক হাতেই থাকিয়া যায়, ব্যবহার করা যায় না।

একাব্বর—বেশ কথা। এবার ইংরেজদের সহিত আমাদের যুদ্ধ বাধিলে এক গাড়ি তিববতি যোগী আমদানি করা হইবে। তাহারা ইংরেজের বন্দুক, কামান সব বন্ধ করিয়া দিবে। তাহার পর আমরা যুদ্ধে নামিব।

ইয়ে নাউং—এসব আমার বিশ্বাস হয় না।

পিন্‌তা—বিশ্বাস হয় না কী? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি মন্ত্রবলে বন্দুকের গুলি পায়ে লাগিয়া হটিয়া যায়।

তিব'—ওটা মরানছাউং ফৌজির ভেলকিবাজি।

পিন্‌ডা—এখানো অনেক লোক আছে, যাহাদের শরীর অভেদ্য।

তিব'—রক্তমাংসের শরীর কি অভেদ্য হইতে পারে? যোগীদের সূক্ষ্ম শরীরের কথা বলিতে পারি না। শাস্ত্রে বলে তাহা অভেদ্য।

ইহার পর কয়েক পেয়ালা মদ্যপান হইল।

টাউং টামাইং লে-জা বলিলেন—মহারাজ, আমি আর একটি বিবাহ করিব। এক সুন্দরী কন্যাকে আমি ভালোবাসিয়াছি।

ইয়ে নাউং—কে সে?

টাউং টামাইং—নামটি এখনো বলিব না। সে বলিয়াছে—আমার মতো সুন্দর, সুপুরুষ আর সে দেখে নাই।

ইয়ে নাউং—এত বড়ো মিথ্যা কথা যে বলে, তাহাকে বিবাহ করা বড়ো একটা ভুল হইবে। বিবাহ না হইতেই সে প্রবঞ্চনা করিতে শুরু করিয়াছে।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

তিব' বলিলেন—তোমরা কী করিয়া একজনের পর একজন সুন্দরী প্রণয়িনী সংগ্রহ কর, তাহা আমার ধারণা হয় না।

পাগান মিন্‌তা—মহারানী থুপিয়ালার মতো স্ত্রী যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই এরূপ কথা বলিতে পারেন। অন্যে বলিবে না, মহারাজ! আমি তো দেখিতেছি, আমারও অন্য একটি বিবাহ না করিলে চলিবে না। এ স্ত্রী লইয়া দিনরাত্রি একঘেয়ে জীবন সহ্য করা যায় না।

টাউং টামান—সত্যই মহারাজ, এরূপ জীবন অসহ্য। আমাদের মধ্যে ইয়ে নাউং মিন্‌তাই আদর্শ পুরুষ। ঘরে ৫২টি স্ত্রী, সকলেই অর্থবতী, সকলেই সুন্দরী, ভাগ্যবান মিন্‌তাকে খাওয়া-পরার চিন্তা করিতে হয় না।

ইয়ে নাউং—সকলেই সুন্দরী নয়, বন্ধু! আমি যেমন, তাহারাও তেমনি সুন্দরী। সকলেই সাদাসিধা স্ত্রীলোক। সুন্দরী যদি দেখিতে চাও, দেখিও মা-খিন্‌জীকে—লোকচক্ষুতে এমন সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

পিন্‌তা—আমি দেখিয়াছি, বন্ধু! সত্যই এমন রূপসী বালিকা ধরায় জন্মে নাই।

একাব্বর মিন্‌তা—হাঁ, মা খিন্‌জী সুন্দরী বটে; যেন একখানি দেবীমূর্তি।

ইয়ে নাউং মিন্‌তা—তা ছাড়া, লেখাপড়ায়? এমন পুস্তক নাই যাহা সে পাঠ করে নাই। ইংরাজিতে কন্‌ভেনটে সে বরাবর প্রথম স্থান পাইতেছে।

তিব'—কে সে কন্যা, বন্ধু?

ইয়ে নাউং—মন্ত্রী কানি মিনের কন্যা মা খিন্‌জী। রূপের তুলনা নাই, বিদ্যায়ও অতুলনীয়া; অত্যন্ত সরল ও সৎ-চরিত্রা বালিকা।

তিব'—বয়স কত ?

গান—ষোলো-সতেরো হইবে। এখন আর তাহাকে বালিকা বলা যায় না। মহারাজ তাহাকে দেখেন নাই ? সে মাঝে-মাঝে রাজপ্রাসাদেও আসে।

তিব'—আমি দেখি নাই।

খবর—চলুন, একদিন কন্‌ভেন্‌ট পরিদর্শন করিতে গেলে মা খিন্‌জীকে দেখাইব।

তিব'—কন্‌ভেন্‌টে না গেলে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না ?

ইয়ে নাউং—পাওয়া যায়। কিন্তু কানিমিনগঙ কন্যাকে খুব সাবধানে রাখেন। সে কখনই একাকী বাড়ির বাহির হয় না। [ক্রমশ

কাজী আবদুল ওদুদ এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

আজহারউদ্দীন খান্

কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই আমার আর-এক মনীষীর কথা মনে পড়ে যায়—যিনি নিজের জন্মভূমি ছেড়ে চলে গেলেন ঢাকায়, সেখানেই রয়ে গেলেন। ওদুদ সাহেব জন্মভূমি ছেড়ে এ বঙ্গে চলে এলেন এবং এখানেই রয়ে গেলেন। দুজনের যাবার উদ্দেশ্য পৃথক ছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যখন ঢাকায় গিয়েছিলেন তখন বাঙলাদেশ যে কোনোদিন ভাগ হবে, একদা কস্মিনকালেও কেউ ভাবে নি। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয়েছে—তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের লেকচারার, বেতন এত কম যে তাতে তাঁর বড়ো সংসার চলে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন শিক্ষকদের বেতন বেশি—অনেক অধ্যাপক কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে গেলেন। শহীদুল্লাহ সাহেবও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আগ্রহে ঢাকায় চলে গেলেন। সেই যে গেলেন, ওখানেই থেকে গেলেন। আর ওদুদ সাহেব তাঁর কয়েকটি সারস্বত কর্ম সমাধা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে থেকে গেলেন। ওপার-বাঙলায় ন্যাশনাল লাইব্রেরির মতো গ্রন্থাগার পাবেন না, প্রয়োজনীয় বই পাবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি এধারে থেকে গেলেন, এবং আরব্ধ কর্মগুলি মৃত্যুর আগে সমাধা করে গেলেন। ওদুদ সাহেব সারা জীবন রামমোহন, কামাল আতাতুর্ক, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ এবং গ্যেটের ভাবধারাতেই মানবতন্ত্রের পূজা করেছেন। সর্বদাই এবং সর্বক্ষেত্রে সংস্কারকে পরিহার করে জীবনকে এক মুক্ত আলোর মতো দেখতে চেয়েছেন—

> ধর্মকে যাঁরা আগাগোড়া মোহ বলেন তাঁদের মত আমরা গ্রহণ করি না, কেননা জীবনের সার্থকতা ধর্মবোধে, অর্থাৎ সত্যে অথবা কোন আদর্শে সমর্পিত-চিত্ততায়।...প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়কে মোহ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ধর্ম-প্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কি দেশের চিন্তাশীল কর্মীদের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়? (ব্যর্থতার প্রতিকার "শাশ্বত বঙ্গ", পৃ ১৯৫, ১৩৫৮)
>
> ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা নয়—জ্ঞান ও জাতীয়তা দেশের লোকদের শরণ্য হবে। (হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ)

শুধু গ্রন্থরচনা নয়, নিজের সাধ্যানুসারে "তরুণপত্র", "সঙ্কল্প" প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করে নিজের উদার মানবিক দৃষ্টিকে তিনি সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ওদুদ সাহেবের এই মুক্ত দৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৫ সালে তাঁকে বিশ্বভারতীতে নিজাম বক্তৃতা দেবার জন্য সাদর আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, 'এদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে-মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক-একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি।'

রবীন্দ্রনাথ যাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলেছিলেন তিনি আজ বিস্মৃত। তাঁর কোনো বই এ-বাঙলায় ছাপা নেই—বাংলাদেশ থেকে সম্প্রতি তাঁর "শাশ্বত বঙ্গ" পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (১৯৮৩)। তার আগে ১৩৭৬ সালে চট্টগ্রাম বইঘর থেকে "নদীবক্ষে" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল। লেখকের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বইপ্রকাশও বন্ধ হয়ে যায়—এরকম ঘটনা নতুন নয়, এটিই স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। ১৯৭০ সালের মে মাসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে তাঁর স্মরণসভায় তাঁর গ্রন্থাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ প্রকাশের একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। ওই প্রস্তাব প্রস্তাবই রয়ে গেছে, কাজের কাজ কিছু হয় নি। এ-জাতীয় প্রস্তাব সদ্য-সদ্য মৃতজনের স্মরণসভায় নেওয়া হয়ে থাকে—

কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ—সম্পাদনায় রশীদ আল ফারুকী। চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ সাহিত্য পরিষৎ, শ্রাবণ ১৩৯৪। ৪৫.০০

ফয়জন্নেছা চৌধুরানী—মনিরুজ্জামান। ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। ১৫.০০

চিরঞ্জীব নজরুল—মাহমুদ নূরুল হুদা। ঢাকা, সুবর্ণ, নভেম্বর ১৯৮৭। ৪০.০০

আন্তরিকতা থাকে না। তাঁর মৃত্যুতে পশ্চিমবাঙলার কয়েকটি পত্রিকায় কিছু-কিছু প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। সেই প্রবন্ধের একটি বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থে রয়েছে দেখতে পেলাম। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থের সমালোচনা ছাড়া তাঁকে নিয়ে একটি দীর্ঘ স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন একমাত্র আবুল ফজল সাহেবই। এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে ঢাকার "সমকাল" পত্রিকার প্রথম বর্ষ একাদশ-দ্বাদশ (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬৫) সংখ্যা এবং দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৬৫) প্রকাশিত হয়। পরে এই প্রবন্ধটি তাঁর "সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনা" গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৩৬৯)। ওদুদ সাহেবের মৃত্যুর দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষককেন্দ্র মিলায়তনে বাংলা একাডেমী আয়োজিত স্মৃতিসভায় আবদুল কাদির তাঁর সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন (১৯ মে, ১৯৭২)। প্রবন্ধটি বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা শ্রাবণ-পৌষ ১৩৭৯ সংখ্যায় বেরোয় (পৃ ১-৬২)। পরে এটি বাংলা একাডেমী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৯ মে ১৯৭৬), যার ভূমিকা লিখে-ছিলেন ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার ওই সংখ্যায় বশীর আল হেলালের "কাজী আবদুল ওদুদের মর্ম-পরিচয়" নামে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (পৃ ৯৩-১০৫)। বাংলা একাডেমীর জীবনী-গ্রন্থমালায় ১৯৮৭ ফেব্রুয়ারি মাসে খোন্দকার সিরাজুল হকের লেখা ওদুদ সাহেবের জীবনী বেরোয়। এই একই বছর কয়েক মাসের ব্যবধানে রশীদ আল ফারুকীর সম্পাদনায় "কাজী আবদুল ওদুদ প্রসঙ্গ" বইটি বেরিয়েছে।

আল ফারুকী-সম্পাদিত বইটি হাতে নিয়ে বেদনা অনুভব করেছি। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে ১৯৮৭ সালের ১৯শে ডিসেমবর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর পোশাকি নাম ছিল খয়ের উল বশর। তাঁর অবর্তমানে বইয়ের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সদাহাস্যময় মূর্তিটি চোখের সামনে ভাসছে। চট্টগ্রামে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টারে বসে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আড্ডার কথা মনকে ভারাক্রান্ত করছে। তাঁর সম্পাদিত বইটি ওদুদ সাহেবের ওপর নয় জন লেখকের সংকলন এবং গ্রন্থের পরিশিষ্টে "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ" নিজাম বক্তৃতা অংশ সংযোজিত হয়েছে।

কাজী আবদুল ওদুদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে মুসলিম সাহিত্যসমাজ ও বুদ্ধিমুক্তি আন্দোলনের কথা বলতেই হয়, কারণ তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন। সেজন্য গ্রন্থটির প্রথম প্রবন্ধ "মুসলিম সাহিত্য-সমাজ", লেখক আনোয়ার পাশা। ১৯২৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পৌরোহিত্যে মুসলিম সাহিত্যসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমাজের বার্ষিক মুখপত্র ছিল "শিখা"—যার মাথার ওপর সাহিত্যসমাজের মটো হিসেবে মুদ্রিত থাকত 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। সাহিত্যসমাজের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অধ্যাপকবর্গ। নেতৃত্ব দিয়েছেন আবুল হোসান, কাজী আবদুল ওদুদ, আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ। ইয়ংবেঙ্গলের যুগে নব্য হিন্দুসমাজ ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সংস্কারের বিরুদ্ধে লাগামহীন মন্তব্য করতেন, যার ফলে হিন্দুসমাজে প্রতিবাদের ঝড় উঠত; তেমনি সাহিত্যসমাজও মাঝে-মাঝে এমন দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছে যাতে মুসলমান সমাজে তীব্র সমালোচনা হয়েছে। ইয়ংবেঙ্গলের সঙ্গে সাহিত্যসমাজের তুলনা করে অকালপ্রয়াত প্রাবন্ধিক আনোয়ার পাশা (১৯২৮—১৯৭১) বলেছেন, 'ইয়ংবেঙ্গলদের অন্য অনেক দোষের কথা শোনা গেলেও তাঁদের সত্যবাদিতার খ্যাতি ছিল। কিন্তু অখ্যাতি ছিল ধর্মহীনতার।..... ধর্মহীনতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল মুসলিম সাহিত্যসমাজের বিপক্ষেও। এবং সাহিত্যসমাজের তথাকথিত ধর্মহীনতা বস্তুত তাঁদের অকুণ্ঠ সত্যপ্রীতিরই প্রকাশমাত্র। তাঁরা মানবমুখী চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং মানুষের মধ্যে মুক্তবুদ্ধিকে জাগ্রত করে সবল কাণ্ডজ্ঞানের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন।' (পৃ ৭) আনোয়ার পাশা এই ছোট্ট প্রবন্ধের (পৃ ১-৮) মধ্যে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল-কথাগুলো বেশ গুছিয়ে বলেছেন আর সম্পাদক ওই প্রবন্ধটি সংযুক্ত করে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আবদুল হকের "কাজী আবদুল ওদুদ" (পৃ ৯-২৫), নারায়ণ চৌধুরীর "ওদুদ-মানস" (পৃ ২৬-৩৪), আনিসুজ্জামানের "কাজী আবদুল ওদুদ' (পৃ ৩৫-৪১), আবুল ফজলের "মুক্তবুদ্ধির দিশারী : কাজী আবদুল ওদুদ" (পৃ ৪২-৪৭), খোন্দকার সিরাজুল হকের "বাংলার জাগরণ প্রসঙ্গে ওদুদ" (পৃ ৪৮-৫৫) মূলত ওদুদ-রচিত সাহিত্যসংস্কৃতিমূলক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ওদুদ সাহেবের অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মের শাশ্বত নীতির প্রতি তাঁর আনুগত্য, মনুষ্যত্বের পূর্ণ উদ্বোধনে তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রতিফলিত। আবদুল কাদির রচিত "কাজী আবদুল ওদুদ" গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়টি বর্তমান সংকলনে

'কাজী আবদুল ওদুদের রবীন্দ্রচর্চা' নামে সংকলিত (পৃ ৫৬-৬১)। এই সংকলনগ্রন্থের সবচেয়ে পরিশ্রমী লেখা হচ্ছে নূরুল আমিনের "কাজী আবদুল ওদুদ : প্রাসঙ্গিক তথ্য" (পৃ ৭৬-৮৪)। এই প্রবন্ধে ওদুদ সাহেবের জীবন এবং সাহিত্যের পরিচয় সাল-তারিখ দিয়ে বলা হয়েছে—পাঠক তাতে উপকৃত হবেন। এরকম গ্রন্থে এরকম একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধের প্রয়োজন ছিল। তবে ওদুদ সাহেব কিছু পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন, যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি—সেই তথ্য এখানে নেই।

ওদুদ সাহেব যে একদা কিছু গল্প-উপন্যাস-নাটক রচনা করেছিলেন—এ সত্য অনেকেরই অবিদিত। সম্পাদক সেই অনতিজ্ঞাত তথ্যের পরিচয় দিয়েছেন 'কাজী আবদুল ওদুদের কথাসাহিত্য' (পৃ ৬২-৭৫) প্রবন্ধে। তাঁর উপন্যাস দুটি "নদীবক্ষে" (১৯১৯), "আজাদ" (১৯৪৮), আর গল্পগুচ্ছও দুটি "মীর পরিবার" (১৯১৮) "তরুণ" (১৩৫৫)। ওদুদ সাহেব "মানববন্ধু" নামে একটি নাটিকা, "পথ ও বিপথ" নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে তাঁর নাটকের ওপর কোনো আলোচনা নেই। দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধগুলি কোন্ পত্রিকা বা গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে, তার উল্লেখ গ্রন্থ-মধ্যে কোথাও নেই। তৃতীয়ত, প্রবন্ধ-লেখকদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকা দরকার ছিল। চতুর্থত, অন্নদাশঙ্কর রায়, মুজফফর আহমদ (সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ) প্রমুখের রচনা থাকলে ভালো হত। এসব কথা আর কাকে বলব—সম্পাদক আমাদের মধ্যে নেই—ভবিষ্যতে কেউ যদি উদ্যোগী হয়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন তাঁদের জন্য কথাগুলো তোলা রইল।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে মুসলমান সমাজে এক অন্ধকার যুগ নেমে এসেছিল। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় তারা বিমুখ ছিল। যেখানে মুসলমান পুরুষ পিছিয়ে ছিল, সেখানে মহিলাদের অবস্থা কী যে করুণ ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আধুনিক বাঙলায় মুসলিম নারীজাগরণের অগ্রদূত ছিলেন ফয়জন্নেছা চৌধুরানী। মুসলিম মহিলা সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে তিনি শুধু পথিকৃৎ নন—সামগ্রিকভাবে তিনি ছিলেন অগ্রবর্তী। তিনি প্রথম মহিলা মুসলিম সাহিত্যিক যিনি মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা নিয়েছিলেন। এ পর্যন্ত তাঁর "রূপজালাল" নামে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে—এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে। দানে-ধ্যানে শিক্ষা-দীক্ষায় তিনি তাঁর সমকালে অনন্য ছিলেন। আরবি ফারসি ছাড়া সংস্কৃতেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি "রূপজালাল"-এর উৎসর্গপত্র সংস্কৃত ভাষায় রচনা করে-ছিলেন। প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না, তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন। পরদা-প্রথার বিধিনিষেধ সে সময় কঠোর ছিল। তবু তাঁর পিতামাতা তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষক দিয়ে উপযুক্ত-ভাবে গড়ে তুলেছিলেন। আরবি-ফারসি-উরদু অভিজাত পরিবারের মৌখিক ও অনুশীলিত ভাষা ছিল, এবং তার মাধ্যমেই শিক্ষাদান অভিজাত বলে গণ্য হত। কিন্তু তাঁর পরিবার প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন—বাঙলা সংস্কৃত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাল্যকাল তাঁর বেশ সুখেশান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পিতার মৃত্যুর পরই দুঃখযাতনা শুরু হয়। অর্থকষ্ট নয়—বিরাট জমিদার পরিবারে ত্রিপুরা জেলার পশ্চিম গাঁয়ে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁদের জমিদারি ত্রিপুরা থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল—তাঁরা ছিলেন দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের অমাত্য আগন খাঁর বংশধর। বিত্ত নয়—চিত্ত নানা আঘাতে জর্জ রত হতে থাকে। সতীনের ওপর তাঁর বিবাহ হয়, ফলে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হয় নি—বাপের বাড়িতে ফিরে এসে সমাজসেবার কাজ শুরু করলেন এবং জমিদারি পরি-চালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। অত্যাচারী জমিদার-রূপে নয়, প্রজাপালক জমিদাররূপে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ৪৫ বছর ধরে জমিদারি চালনা করেছিলেন। ১৯০৩ সালের ৩রা সেপটেমবর তাঁর মৃত্যু হয়। এই মহীয়সী মহিলা সারাজীবন নানা জনহিতকর কাজ করেছেন, নানা প্রতিষ্ঠানে দানধ্যান করেছেন। গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন, মহিলাদের জন্য পৃথক চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা করেছেন। প্রতিটি মৌজায় দীঘি-পুকুর খননের ব্যবস্থা করেছেন। মক্কা শরীফে হজ করতে গিয়ে জলের সঙ্কট দেখে মজে-যাওয়া খাল পুনঃখননের ব্যবস্থা করে-ছিলেন। মক্কায় দুটি ও মদিনায় একটি মাদ্রাসায় যথাক্রমে তিনশ ও একশ টাকা তিনি নিয়মিত সাহায্য করতেন। মানুষ চলাচলের জন্য একাধিক রাস্তাঘাট সেতু নির্মাণ করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য জমিদারির বিভিন্ন মৌজায় তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মসজিদের সংলগ্ন মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন, গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। নবাব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ যখন মুসলমান ছাত্রদের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের

শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করছেন তখন ফয়জন্নেছা অজ পাড়াগাঁয়ে বসে তাঁদের আগে ইংরাজি শিক্ষাদানের জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে সব জাতিরই প্রবেশের অধিকার ছিল। তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাকিলা-বিদ্যালয়ে কোনো মুসলমান নারী লেখাপড়া করে নি। প্রজাদের উন্নতিকল্পে নানা লোকহিতকর প্রকল্প রূপায়িত করার জন্য ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে তিনি 'নবাব' খেতাব পেয়েছিলেন। নিজে কবিতা গান লিখলেও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বরাবর। "বান্ধব", "সুধাকর", "ইসলাম প্রচারক", "ঢাকা প্রকাশ" প্রভৃতি পত্রিকাকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিষ্ঠিত "সখী সমিতি"র সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল—তিনি ওই সমিতিতে দু শ টাকা দান করেছিলেন। এই ক্ষণজন্মা মহিলার জীবনকথা এই প্রথম একটি গ্রন্থে গ্রথিত করলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান এবং জীবনী নির্বাচনে ফয়জন্নেছাকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা একাডেমী এক সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। ফয়জন্নেছা সম্পর্কে প্রথম আলোচনা করেন মুহম্মদ আবদুল হাই—তাঁর "বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত" (আধুনিক যুগ ১৯৫৬) গ্রন্থে। তারপর ড. আনিসুজ্জামান (মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ১৯৬৪) ড. মজীরউদ্দীন (বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা ১৯৬৭) এবং আরও অনেকে বিচ্ছিন্নভাবে তাঁর সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। ড. মনিরুজ্জামান সব কটি তথ্যকে একত্রিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রণয়ন করেছেন—যার মধ্যে ওই প্রথম ফয়জন্নেছার সঠিক পরিচয় পাওয়া গেল। যাঁরা তাঁর সম্পর্কে কিছু জানেন না, তাঁরা বুঝতে পারবেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে এরকম একজন জনহিতকামী মহিলার আবির্ভাব হয়েছিল, যাঁর সঙ্গে রানী রাসমণির তুলনা চলতে পারে; যিনি গণ্ডগ্রামে থেকে উনিশ শতকের নবজাগরণের বাণীকে নিজ অঞ্চলের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন। এই মহিলার জন্মসন নিয়ে এবং কৃতকর্মের যথার্থ ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে—মনিরুজ্জামান সাহেব বেশ ধীরগতিতে একটির পর একটি গ্রন্থিমোচন করে ফয়জন্নেছা চৌধুরানীকে আমাদের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। লেখকের এই কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয় দুটি কারণে—প্রথমত তাঁর সরলীকৃত বিন্যাস-পদ্ধতির সঙ্গে মনোগ্রাহী আন্তরিক বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ত, গ্রন্থের সারা অঙ্গে বিদগ্ধজনোচিত আবহরচনা।

"চিরঞ্জীব নজরুল" বইটি নজরুলের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাগ্রন্থ নয়। নজরুল ও নজরুল পরিবারের সঙ্গে লেখক মাহমুদ নুরুল হুদার দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল। ১৯৪২ সালে নজরুল যখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, তখন কবিকে অর্থসাহায্যের নামে কিভাবে সরকারি ও বেসরকারি মহলে টালবাহানা চলছিল, সাহায্যের নামে কবিপরিবারকে কিভাবে মাঝে-মাঝে বঞ্চনা করা হয়েছে, কবিকে সুস্থ করার বিষয়ে কিংবা খাওয়াপরার বিষয়ে কবিপত্নী ও কবিপুত্রদের কিরূপে উদ্বেগকাতর দিন কাটাতে হয়েছে, তার একটি চিত্র আলোচ্য গ্রন্থে হুদা সাহেব আমাদের দিয়েছেন। এখানে লেখক নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখেছেন এবং তাঁকে লিখিত কবিপত্নী ও কবিপুত্রদের চিঠিগুলি হুবহু ছেপে দিয়েছেন। এর ফলে বিষয়টি প্রামাণিক হয়ে উঠেছে। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭৬ অর্থাৎ কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত কবি ও কবিপরিবারের অর্থসাহায্য বাবদ যাবতীয় তথ্যাদি এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে এবং লেখক যে উদ্দেশ্য নিয়ে বইটি রচনা করেছেন তা সফল হবে এই কারণে, নজরুলের ভবিষ্যৎ গবেষকগণ কবিজীবনী লিখতে গিয়ে নজরুলের অন্তিমজীবনের দুঃখকষ্টের অনুপুঙ্খ বিবরণী পাবেন, কাগজপত্র ঘাঁটার দরকার হবে না। লেখক সবকিছু হাতের সামনে তুলে দিয়েছেন—গবেষকদের পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বদরুদ্দীন ওমর বইটির একটি ভূমিকা লিখেছেন। কবি ও কবিপরিবারের আলোকচিত্র ও যাবতীয় চিঠির ফটোস্টাট কপি থাকায় বইটির গুরুত্বও বেড়েছে।

অসমীয়া কবিতার সংকলন

সৌমেন সেন

কবিতাসংকলন নানারকম হতে পারে। কখনো দশক-শতকের, কখনো যুগভিত্তিক, কখনো বা আদি থেকে সাম্প্রতিক। এ ছাড়া তো বিষয়-নির্ভর আছেই—প্রেম, প্রতিরোধ ইত্যাদি। সংকলন কেমন হবে, নির্বাচনই বা কোন্ মাপে, তা অনেকটাই নির্ভর করে সংকলকের উদ্দেশ্য আর মরজির ওপর। অবশ্য আজকাল ব্যবসায়িক তাগিদও যে থাকে না, তা নয়। বস্তুত, ওই তাগিদটাই বোধহয় ইদানীং বেশি কার্যকর, নইলে বাঙলা কবিতার অন্তত হরেক-রকম সংকলন প্রকাশিত হত না।

অসমীয়া কবিতার সংকলন "সোণৰ সঁফুৰা", ভাবতে অবাক লাগে এখনো, এই যুগেও, নিতান্তই একজন কবিতা-প্রেমীর আবেগ-আগ্রহের ফসল। একজন প্রযুক্তিবিদ, সারা জীবন নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীল পদে ব্যস্ত থেকেছেন এবং অবসর-অন্তে কবিতার প্রতি ভালোবাসাতেই এই সংকলন প্রকাশ করেছেন। এই ভালোবাসা আর আবেগ যে নিতান্তই ব্যক্তিগত পছন্দের, তাও কিন্তু নয়; বোঝা যায়, একটি বিশিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল। হয়তো সময়ের অভাবে প্রকাশ-কাল সম্পাদকের অবসর-অন্ত।

অসমীয়া কবিতার সংকলন খুব বেশি নেই। অন্তত ব্যবসায়িক তাগিদ এখনো তেমনভাবে সংকলন-উদ্যোগ চালনা করে না। ফলে যে কটি সংকলন প্রকাশিত, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সংকলকের নিষ্ঠা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রতিনিধি-মূলক এবং সার্থক। দুটি উদাহরণ: একটি মহেশ্বর নেওগ সম্পাদিত ও সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত "সঞ্চয়ন" ও দ্বিতীয়টি নীলমণি ফুকন সম্পাদিত "কুড়ি শতিকাৰ অসমীয়া কবিতা"। প্রথমটি যেমন অ্যাকাডেমিক ও ঐতিহাসিক, অন্যটি একজন কবির নির্বাচন। অসমীয়া সাহিত্যের পাঠকের কাছে, অন্তত যিনি অসমীয়া ভাষায় রচিত কবিতার ধারা-বাহিক ইতিহাস জানতে চান তাঁর কাছে, মহেশ্বর নেওগ মহাশয়ের "সঞ্চয়ন" যে অবশ্যপাঠ্য, তা এই সংকলনের বহুল প্রচারেই প্রমাণিত। সম্পাদকের সুলিখিত ভূমিকা, 'অসমীয়া কবিতার কাহিনী' ও প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রধান কবিদের কবিতার সঞ্চয়ন সংকলনটিকে বস্তুতই বিশিষ্ট করেছে। মহেশ্বর নেওগের সংকলন যথার্থই অ্যাকাডেমিক এই অর্থে যে, যে-কোনো সাহিত্যপাঠকের কাছেই অসমীয়া কবিতার মর্মোদ্ঘাটনে এই সংকলন অবশ্য পাঠ্য। নীলমণি ফুকন আধুনিক কবিতার সংকলন করেছেন কবির বিচারে, তাই তাঁর নির্বাচনে কাব্য-পক্ষপাত থাকবেই। তা ছাড়া, তাঁর সংকলনের যুগসীমাও তো বিশশতক মাত্র। ইতিহাস এক্ষেত্রে প্রধান নয়, যদিও একশতকের ইতিহাসও তাঁর সংকলনে বিধৃত।

"সোণৰ সঁফুৰা"র সংকলক ভবকান্ত শইকীয়া ভিন্ন কোটির কবিতাপ্রেমিক। হয়তো বা 'দেশজ সংস্কৃতিপ্রেমিক' এই অভিধাটি তাঁর ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। লিখিত ও মুদ্রিত কবিতার পাশাপাশি লোককবিতার সংকলন এই প্রেমেরই নজির। শুধু ইতিহাসই যে তাঁর লক্ষ্য নয়, তার প্রমাণ অতি সম্প্রতি বইটি প্রকাশিত হলেও, আধুনিক কবিতার নির্বাচন চল্লিশের দশক পর্যন্ত। তার পরের কবিতা এই সংকলনে অনুপস্থিত।

সংকলক ভবকান্ত শইকীয়া জানাচ্ছেন প্যালগ্রেভের "গোলডেন ট্রেশারি" তাঁর আদর্শ। সংকলনের নাম "সোনৰ সঁফুৰা"ও তাই প্রমাণ করে। সে অর্থে ইতিহাস হয়তো তাঁর একটি লক্ষ্য—কিন্তু প্রধান নয়। আর আধুনিক কবিতার সাম্প্রতিক অংশে তাঁর মনোযোগ কেন নেই, তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। হয়তো বা সময় আর বীক্ষার অভাব। কিন্তু যে কারণে সংকলনটি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে, তা হল লোককবিতার প্রতি মনোযোগ। মহেশ্বর নেওগের "সঞ্চয়নে" এই অংশটি নেই। এবং শংকরদেব মাধবদেব প্রভৃতির কবিতার সংখ্যাও "সোনৰ সঁফুৰা"তে বেশি। অর্থাৎ অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতির যে প্রধান দুটি ধারা দেশজ চেতনার সাক্ষ্য—শংকর-মাধবের কাব্য-আদর্শ ও লোককবিতার প্রবাহ—তা এই সংকলনে উল্লেখযোগ্য মনোযোগ পেয়েছে। শংকরদেবের চোদ্দটি কবিতা আর দশটি গীত, মাধবদেবের ছটি কবিতা আর দশটি গীত যে আবহ তৈরি করে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন সংকলিত হয় ডাকৰ বচন, লোকগীত, বিহুগীত, বিহুনাম ও বিয়ানাম। এই সংকলনের বিশিষ্টতা এখানেই।

সংকলক ভবকান্ত শইকীয়াকে তাই অবশ্যই আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হয়। এই সংকলন প্রকাশের জন্য অসমীয়া কবিতার পাঠক ও অসমীয়া সংস্কৃতির অনুরাগীরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

সোণৰ সঁফুৰা—ভবকান্ত শইকীয়া। শ্রীমতী কমল কুমাৰী বৰুৱা চেরিটেবল ফাউণ্ডেচন্, মহাত্মা গান্ধী ৰ'ড, যোৱহাট। ১৯৮৬। ৪০ টকা।

কবিতার কথা

পরিমল চক্রবর্তী

১

'বারো সূর্যের মহড়ায়' গ্রন্থের 'মুখবন্ধ' থেকে জানা যায়, এটি বর্ষীয়ান কবি বিরাম মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচনাগুলিতে কবি হিসেবে তাঁর যে-চারিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, এক কথায় বলতে গেলে তাকে বলতে হয় বৈদগ্ধ্য। কেননা শাণিত বাক্‌চাতুর্য, তীক্ষ্ণ আঙ্গিকচেতনা, তীব্র ব্যঙ্গ-প্রবণতা—ইত্যাদি যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি একজন বিদগ্ধ কবির রচনায় আমাদের প্রত্যাশিত, সে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের প্রায় সব কটিই এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কম-বেশি মাত্রায় বিদ্যমান। সপ্রতিভ বাক্‌চাতুর্য বা smartness of diction-এর যে-ধারা আমাদের সাহিত্যের তিরিশের দশকের কয়েকজন প্রধান কবি (বিশেষভাবে বিষ্ণু দে ও সমর সেন) সৃষ্টি করে গিয়েছেন, কবিতার রচয়িতা হিসেবে বিরাম মুখোপাধ্যায় প্রধানত সে-ধারারই একজন সচেতন অনুসারী ; এবং এই ধারার অনুসৃতি তাঁর কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রবল। যেমন :

বাস্তবের চিন্তার ব্যায়ামে পরিক্লান্ত তবু খুঁজি
সুষুম্নার মৌল কেন্দ্রে ব্যতিক্রমী সূচনা-শিকড়
('পরা বাস্তবের মতো')

কিংবা

জীবনকে খুঁজে নিক ঝামাঘষা দিনানুদৈনিকে
জ্যা-মুক্ত ছিলার তীব্র গুণটান টংকারে-টংকারে
('অগ্নিবীণা : অন্ত্রিতে তন্ত্রীতে)

কিন্তু বাক্‌চাতুর্যের প্রতি এই আত্যন্তিক আকর্ষণ অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে এমন এক দুর্মর মোহের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে তাঁর কোনো-কোনো রচনা নিছক বাক্‌চাতুর্যের কসরতে পরিণত হয়েছে, ভাবসমৃদ্ধ কবিতায় পরিণতি পায় নি। এই প্রসঙ্গে 'দান অনুদানে নয়', 'ছেঁড়া-কাঁথার স্বপ্নে', 'অখণ্ড-মণ্ডলাকে', 'কলাবতী রাগে ২' কিংবা 'হৃদয় ভাঙলে' ইত্যাদি রচনার কথা বলা যেতে পারে।

বাক্‌চাতুর্যের আত্যন্তিকতার মতোই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাড়াবাড়িও এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় অত্যন্ত স্পষ্ট। 'জরিপ' কবিতার :

ইশ্‌কাপনের ছুরি তিরি
নয়, জলজ্যান্ত জোড়ায়-জোড়ায়
সাহেব বিবির ফ্যানাওঠা ফুর্তি ছাখো।

অথবা 'কাঠটগরের শাদা' কবিতার :

কিছু উঁচ্‌কপালে ও র‍্যাঁদাঘষা উটকো ধনীর
শখশিল্প ঝুল-বারান্দার টেরাকোটা টবে-টবে
টক্‌টকে ব্ল্যাকপ্রিন্স দেদার ফুটছে,—

কিংবা 'বৈশাখবলয়ে' কবিতার ;

নৃত্যনাট্যে নীবি নাভি চাটাপোছা উরুর মুদ্রায়
জুত্‌সই রতিরঙ্গ-গবেষণা—মহার্ঘ ঢৌকনে
ফাঁদ পেতে বাজীমাত, পুঁজিপতি ক্রীতদাস বাঁধে।

এবং এই গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'সিদ্ধির স্বরূপে'র প্রায় সমস্তটাই এই সিদ্ধান্তের সমর্থক দৃষ্টান্তরূপে স্মরণীয়।

তাঁর রতিমার্গী কবিতায় (প্রেমের কবিতা বলছি না এই কারণে যে সত্যিকারের প্রেমের কবিতা চৌষট্টি পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে একটিও নেই।) নারীপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা শুধু সকাম কিংবা শরীরীই নয়, তা একই সঙ্গে সতেজ ও সাহসীও বটে। অনুমান করি, যথার্থ জীবনসম্ভোগী কবি বলেই যৌনতার রগরগে দিকটা আয়ুর উপান্ত্যকালীন এই বয়সেও তাঁকে রীতিমতো আকর্ষণ করে, কেননা তাঁর কবিতায় এ-বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। মাত্র 'সিদ্ধির স্বরূপে' কবিতাটিরই এ-ধরনের ছটি অংশ :

॥ ১ ॥

বেহাত হবার আগে জিতে নিন জিদের নিলাম
অনির্বিঘ্ন নবনী দেহের
নিলাম ! নিলাম !
... ...

বারো সূর্যের মহড়ায়—বিরাম মুখোপাধ্যায়। নবার্ক, ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, কলকাতা-৫৯। ষোলো টাকা।

আউশছড়ার মরা মুখ—দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক ট্রাস্ট, ৩০/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দশ টাকা।

ধৃতাশ্ব-ভাববতী—মঞ্জুভাষ মিত্র। নবার্ক, ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, কলকাতা-৫৯। ষোলো টাকা।

লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা—জিয়া হায়দার। বর্ষ-মিহির প্রকাশনী, ইছামতী, ১১ রিং রোড, ঢাকা-১২০৭। বিশ টাকা।

॥ ২ ॥

কোরা-থানে
সকরুণ ক্ষুধিত বিধাতা
... ...

॥ ৩ ॥

সতীচ্ছদ ছেঁড়া কোনো হঠাৎ-জননী
যৌনতার অশৃঙ্খলা অশ্রাব্য কলহ
অর্থবহ বাতাসের কানে
কেউ কিছু ছুঁড়ছে রটনা :
... ...

॥ ৪ ॥

চোরনীর চোরাগোপ্তা খুচরো কামকেলি
টুস্‌কি অবয়বে, অমেয় আসব মেদপিণ্ডে
... ...

॥ ৫ ॥

টপ্‌নট ফ্রেঞ্চরোল খোঁপার বাহার
বাঁকাবে অ্যালানে এই পোক্ত নিপুণিকা,
আনগ্ন জানুতে আর আপত্তি কিসের !
... ...

॥ ৬ ॥

দর্শক-দর্শিকা-ঠাসা দমবন্ধ গ্যালারিকা শাদা
উরুর ঊর্মিল কারু-কসরতে আহ্লাদে গড়ায়।

এবং আরও অনেক কটি কবিতায় এ-রকম আরও অনেক কটি উদাহরণ ছড়ানো রয়েছে।

বিরাম মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শব্দনির্বাচনে ও প্রয়োগে আকস্মিক গুরুচণ্ডালী কোনো-কোনো ক্ষেত্রে রসাভাস ঘটালেও আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে, অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকাচিত্তে চমকসৃজনে প্রয়াসে প্রায়শ সার্থক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের (এবং সেই সঙ্গে কবিকেও) ভেবে দেখতে হবে 'ব্যতীপাত', 'নিখর্ব', 'হাড্ডাহাড্ডি', 'অনৃজু', 'কিঞ্জল', 'বিপর্যাস', 'অকৈতব', 'মাটামসই', 'উতোরপাড়া'; (উত্তরপাড়ার অপভ্রংশ ?), 'নির্বিণ্ণ', 'শমশান্তা', 'বৌড়ী'—ইত্যাদি শব্দের কোনো কাব্যমূল্য আদৌ আছে কিনা, কিংবা থাকলেও ততখানি আছে কিনা, যতখানি থাকলে কোনো শব্দকে নির্বিচারে কবিতায় স্থান দেয়া চলে ?

২.

পঞ্চাশের দশকের অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠ কবি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবতম কাব্যগ্রন্থ 'আউশছড়ার মরামুখ'। অপূর্ব সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ প্রচ্ছদের মতোই এই গ্রন্থে কলিত কবিতাগুলিও অপূর্ব লাবণ্যে ললিত। এবং এই লাবণ্য যত না রূপরীতিগত, ততোধিক ভাব বিষয়ক। কিন্তু এই ভাব-লাবণ্যের সঙ্গে অন্য যে-উপাদানটি পরিমিতরূপে সংমিশ্রিত হলে কবিতা শিল্পপদবাচ্য হয়ে ওঠে, সেই চিন্তার গাঢ়তা কিংবা মননের গভীরতাকে এই কবিতাগুলির কোনোটিতেই তেমন খুঁজে পাওয়া গেল না। অর্থাৎ, দর্শন যে সর্বদা কবিতার শত্রু নয়, বরং সর্বথা মিত্র এবং অবস্থাবিশেষে পরম মিত্র, কাব্যসাহিত্যের এই স্বীকৃত সত্যটি, মনে হয়, আলোচ্য কবির কবিতাভাবনায় হয় সম্পূর্ণ অস্বীকৃত, নয় আংশিকভাবে স্বীকৃত। তা না হলে যে-কবি লাবণ্যের প্রসাধনে তাঁর কবিতার দেহকে এতখানি শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে পারেন, সে-কবি তাঁর কবিতার আত্মাকে দর্শনের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারবেন না কেন ? অথচ তাঁর কবিতায় দর্শনের উদ্ভাসন সম্পূর্ণ দুর্নিরীক্ষ্য না হলেও নিতান্তই নগণ্য।

দেবীপ্রসাদ মূলত জীবনানন্দীয় কাব্যপরিমণ্ডলেরই অধিবাসী। কিন্তু জীবনানন্দের ঔদাস্যবিমিশ্র ইহরাগ তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। বরং তার স্থলে যা তাঁর কবিতায় সর্বদাই এবং তাঁর কবিতার সর্বত্রই উপস্থিত, তাকে বলা যেতে পারে অভিমানভারাতুর প্রকৃতিপ্রেম। এই অভিমানাতুর প্রকৃতিপ্রেমে আবিষ্ট হয়েই তিনি ছন্নছাড়া পথিকের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন আলুলায়িত গ্রামবাঙলার দূরবিসারী পথে-প্রান্তরে—লক্ষ করেছেন 'মরা রামধনু ছিঁড়ে পড়ে আছে, ভাঙা ঘাটলায় / থুবড়ে শুয়ে আছে গাব-লেপা দিশি নৌকো' (সূর্যাস্তের পর), 'স্তব্ধ দুপুরের গায়ে গ্রাম্য স্টেশনের মাল-গাড়ি / বোঝা করে নিয়ে চলে গোটা গ্রামখানা' ('জলরঙ'), 'জলে চক্র ওঠে একটু স্মৃতির ঘাই লেগে…' ('সব অনুভূতি ওরা জমিয়ে রেখেছে'), 'চতুরধারে সাজানো বাগান দৃপ্ত ডালিয়ায় আলোকিত হয়ে আছে।' ('ওরা'), 'কাটা ফসলের ডগা মাড়িয়ে হাঁটছে শেষ বেলা।' ('কার্তিকের মুখ') ; দেখতে পেয়েছেন 'ডেকখানা কালো হয়ে ঘুম দিচ্ছে উনুন নিবিয়ে।' …'বেলাটুকু ঝরাতে ঝরাতে উড়ে গেল টিয়ে ঝাঁক।' ('খেয়া'), 'তিরতির হামির জলে ডুবে যায়, সদাপ চিবুক'…'জল—শুধু জল—ঘোর-পাতা জল—মাথা-

জল—' ('জল'), সদ্যজায়মান ছন্দ ডালপালার লক্ষ হাতে হাতে / বিষকুঁড়ি দিয়ে ওঠে'···'দ্রুত হাতে কুলকুচি করে' ('সাপ'), 'মাঘবীথিকার চক্রবালে / কপিশ কুয়াশা'··· 'মাথার উপর দিয়ে ঝিঁঝির ঢেউয়ের পর ঢেউ—' ··'শাদা ফ্যাকফেকে চাঁদ' ('ঝিঁঝি') ; শুনতে পেরেছেন 'মাটি আর জল কথা-বলাবলি করছে।' ('খেয়া'), 'সারাটা রাত ফুঁসে বেড়ায় ফলের বিষ ; সারাটা রাত ছুটে বেড়ায় ঝোড়ো হাওয়ায় ঘোলাটে চাঁদ—' ('সারাটা রাত ছুটে বেড়ায়')।

জীবনানন্দের কোনো-কোনো কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দ-গ্রস্ত দেবীপ্রসাদের কোনো-কোনো কবিতাকে পাশাপাশি রেখে নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করলেই অনুভূত হয় যে জীবনানন্দের ঔদাস্যই দেবীপ্রসাদে পৌঁছে অভিমানে রূপান্তরিত হয়েছে। এবং এই অভিমানবোধ তাঁর মধ্যে যে কত তীব্র আর তীক্ষ্ণ, এই কাব্যগ্রন্থের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি কবিতার বিচ্ছিন্ন এই পংক্তি কটিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—'দেবতা, আমার যাচনা নেই, মনস্কাম নেই' ('বালিঘাত : স্বর্ণরেখায়'), 'মদ স্পর্শ করব না, চোখ ভরে দেখব মৃত্যুকে' ('মত্তশবর চর্যা'), 'আর আমায় অমন দু'হাত ভরে জড়িয়ে ধরো না···('আত্মঘাত'), 'না গো না, যাব না'—, ('রক্তকাশ'), 'আবার একদিন ফিরে যাব শেষরাতে, সবার চোখ এড়িয়ে খুব সঙ্গোপনে / আবার ফিরব ফিরব ঠিক, মনে রেখো, / খুব সঙ্গোপনে—' ('মনে রেখো')। এবং এই প্রত্যাবর্তনের কারণ স্বরূপেই যেন পরম অভিমানাহত হয়ে 'মুখোশ' কবিতায় তিনি স্বপ্নতাড়িতের মতো স্বগতোক্তি করছেন :

আমায় / সবাই ভুলে গিয়েছে শুধু অর্জুনগাছের পেছনের ওই আকাশ একদণ্ড ভোলেনি।

কবি হিসেবে দেবীপ্রসাদ শুধু শব্দসজাগ বা শব্দসচেতনই নন, তিনি শব্দনির্মাণক্ষমও। তাঁর শব্দনির্বাচন ও ভাষা-ব্যবহাররীতি নিঃসন্দেহেই লৌকিক ; কিন্তু তা সর্বাংশে গতানুগতিক নয়। ভাষাঘটিত ব্যবহাররীতিতে স্ব-উদ্ভাবিত নিত্য নূতন শব্দ ও বাক্যবন্ধ সংযোজনের মাধ্যমে বৈচিত্র্য আনার প্রয়াসী তিনি। এই লেক্সিক্যাল লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কোনো-কোনো শব্দকে তিনি প্রচলিত অর্থে ব্যবহারের পরিবর্তে ভিন্নার্থে ব্যবহার এবং অনেক অচলিত ও পরিত্যক্ত শব্দকে পরিত্যাগ না করে আধুনিকীকরণে প্রয়াসী হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই 'নিরুর্মি', 'শতার্চি', 'পন্থ আঁধা', 'অকামা', 'সময়যাপনী', 'আতাপ-অঢেউ', 'অনুদ্বেজে', 'নিস্পর্শ', 'আপাদচুলাগ্র', 'পত্‌ঝর', 'নির্বণ', 'ভ্রমণ-নিস্তাপ', 'আষ-নীরবতা', 'বর্ণিকাভঙ্গ', 'নিদ্যুট', 'গোর-পুরী', 'একাভেকা', 'দিশারা', 'আনভ', 'আলুল', 'নবত', 'আনেবানে', 'তাঁবা-ধরা', 'অফুর', 'তুরিত', 'অর্চা', 'রিষ', শুনী', 'ঠোলা-মালা', 'শতাক্ষ', 'ক্ষুভিত', 'বুহিত', 'আতাপা', 'আমাঠ', 'রঙ্গোলী', 'উরগ', 'অতিগ', 'নহর', 'মশারি-নিদ্যুট' —ইত্যাদি শব্দের উচ্ছ্রিত প্ররোগ লক্ষ্যের অগোচরে রাখা কোনোমতেই সন্তবপর নয়। তাঁর এই প্রয়াস মতই প্রশংসনীয়-পদবাচ্য হোক না কেন, শব্দ-সম্পর্কিত তাঁর এই মানসিক পশ্চাদপসারণে আধুনিক কবিতার আধুনিক পাঠক-পাঠিকারা কতখানি সহর্ষ সম্মতি জানাবেন, এ-সংশয় পোষণ করা কিন্তু আদৌ অবাস্তব অথবা অনুচিত নয়।

৩.

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো 'ধৃতাশ্ব-ভাববতী'র কবি মঞ্জুভাষ মিত্রও প্রচণ্ড অভিমানী। এই অভিমানের ছাপ তাঁর রচনায় প্রায়শ স্পষ্ট। তবে তাঁর ক্ষেত্রে অভিমানের স্বরূপ আর তার প্রকাশের ধরনটা স্বতন্ত্র। কবি হিসেবে মঞ্জুভাষের অভিমান প্রগাঢ় কামনা-সংরক্ত, অর্থাৎ প্যাশনেট ; আর, সেই অভিমানের প্রকাশটাও অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত চাপা। এবং চাপা হবার ফলেই সেই অভিমান যেখানটায় যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে, সেখানটায় ততটুকুই হয়েছে স্পষ্ট আর তীব্র। অর্থাৎ, অভিমান প্রকাশের চাপা ভাবটাই তাঁর অভিমানের প্রকাশকে প্রখর আর প্রবল করে তুলেছে। তাঁর অভিমানের কারণ সম্বন্ধে তিনি আমাদের অন্ধকারে না রেখে খোলাখুলিভাবেই বলেছেন, 'আমার মুখের ঢেউ / খুঁজত যাকে সে নেই আজ' ('সাগরবিলাস') এবং সেই অভিমান নিরসনের পন্থা হিসেবে জানিয়েছেন, 'মন করেছি শোক কমাতে সাগরতীরে চলে যাব'···'বালুর নিচে ঘুমিয়ে থাকবো···ফিরবো না আর ঘুমিয়ে থাকবো' ('পাথর')। আবার এই অভিমানবোধ ক্রমশ তীব্র হতে-হতে কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুচেতনায় নয়, নিছক মৃত্যুকামনায় পর্যবসিত হয়েছে, যেমন 'বিদায়' কবিতায় 'এবার আমাকে বিদায় দাও / সবুজ রুমাল নেড়ে দূরপথে যাত্রী মানুষকে যেভাবে বিদায় / দেয় ঠিক সেইভাবে, / আমাকে তুমি নীরবে চলে যেতে দাও / আমি আর ফিরে আসবো না / তোমাদের এই জলের দেশে 'মৃত্যু' নামক সাঁকোর উপর / তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না···' কিংবা 'ধৃতাশ্বের পথে হৃৎপিণ্ড ক্রমাগত'

'হে দুঃখলতা, ছায়াবাঁধনে আমার হাত পা বাঁধো, / প্রেতের মতো অগ্নিচক্রে আমাকে ছুঁড়ে ফেল, ভাসিয়ে দাও মৃত্যু নামক নদীর জলে।'

মঞ্জুভাষের কবিমনের একটা অংশ মর্বিড এবং বিশেষ-ভাবেই মর্বিড, যে কারণে তাঁর এই গ্রন্থের কোনো-কোনো অংশ মর্বিডিটির স্পষ্ট বিকারে অত্যন্ত উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ফলে, যখন 'বোহেমিয়াতে কিছু কোমলাঙ্গী অস্ত্র' কবিতায় তিনি নিবেদন করেন, 'আত্মদান করে যোদ্ধা যুবকদের কাছে / দৃশ্যবতী যুবতীর দল। ইজের অন্তর্বাস শাড়ি খুলে ঘাসের উপর / ঝরা শিশুর মতো ছড়িয়ে দেয় / এমন কি এক সময় নিজেরাও শুয়ে পড়ে।', 'মধুর, তুমি চলে গিয়েছ' কবিতায় উপলব্ধি করেন 'বিছানাই সৌন্দর্যবোধের কেন্দ্রস্থল', 'রূপনারায়ণ' এবং 'কালী' কবিতায় যথাক্রমে অবলোকন করেন, 'উলঙ্গ দেহ ভ'রে কুবলয় ফুটে ওঠে' এবং 'স্তনে স্তনে উত্তোলিত ভীম খড়্গ কামে আর্দ্র'…'ঋতুর প্রভাবকালে বিশুদ্ধ সুরের মতো আলিপ্ত যৌনতা', 'অভিজ্ঞতার গান' কবিতায় প্রশ্ন করেন 'নারী-আলিঙ্গিত নরের রূপ কেমন?' কিংবা জ্ঞাপন করেন, 'আমি আমার পুংলিঙ্গটি খুলে / একটি কাঠের বাক্সে রেখেছি'…'সুড়ঙ্গ খোঁড়া হচ্ছে আর প্রতি সুড়ঙ্গের তলদেশে / একটি করে যোনিযন্ত্র পাওয়া যাবে।' অথবা 'জলাশ্বের অধ্যুষিত নদী' কবিতায় অবিকল সমর সেনের ভঙ্গিতে 'পৃথিবী ছাড়ার আগে শেষবার রমণের সাধ'-অভিলাষে আর্তনাদ করে ওঠেন,—তখনই আমাদের মনে এক ধরনের বন্য বিবমিষা উদ্রিক্ত হয়, এক ধরনের তীক্ষ্ণ অস্বস্তিতে পাঠকচিত্ত সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

আলোচ্য গ্রন্থের কিছু সংখ্যক কবিতায় অলৌকিকের ছোঁয়া যেমন লেগেছে—('আজ রাতে…সিংহরাশির তৃষ্ণা ও হাহাকার শোনা যাবে / সিংহরাশির প্রভাবঅধীন দেবীমুখ দেখা যাবে' : 'পুতুল-নাচ'), ('আমার মধ্যস্থ মানুষটিকে প্রণাম করো' : 'সাগরতীরে দখিন বাতাস'), ('এখন সময় ঠিক থেমে আছে কুমারী চাঁদের নাভি-মণ্ডলীর নিচে॥' : 'হিপোপটেমাস'), ('ধূপের ডানায় পাড়ি দিল মূল-মণিপুরে যাবে / নাভির ভিতর দ্বিতীয় নাভির রহঃস্পর্শ পাবে।' : 'সন্ধ্যাবিহারে নগ্ন-নারীর অনুসন্ধান'), ('ভুটান দেশের নারী তুমি / তুমি চিত্রমদ / ধৃতাশ্বপথে ভাববতী কীর্তনের রূপে / স্ফীত হয়ে উঠেছে তোমার রঙ' : 'আত্মজিজ্ঞাসার শিল্প'), ('হৃদয়বাসী বনদেবতা এইরকম অভিপ্রায় করেছেন। তার বাঁশিতে মৃত্যু ও ভয় এই দু'রকম সুর বাজে॥' 'দ্বাদশ গোলাপ'), ('বনদেবী আজ রূপেশ্বরের পরমা এবং ঈপ্সিত / হয়েছেন বলে বৃক্ষের ত্বকে সঙ্গীতধ্বনি শোনা যায়' : 'দুর্গার দর্পণ'),—কোনো-কোনো কবিতায় কবির আত্মোপলব্ধির আভাও তেমনি জেগেছে—('সৌন্দর্য ও দর্শন পরস্পর জায়গা বদল করে॥' : 'সাগরতীরে দখিন বাতাস'), ('ফিরে যেতে হবে সহজের কাছে।' : 'এই গোলাপের মহাসুগন্ধ'), ('নির্জনতার চেয়ে বড় অভিশাপ নেই' : 'হিপোপটেমাস'), ('দীর্ঘদিন অত্যন্ত ভালো ও পবিত্র জীবনযাপন করে একঘেয়েমির শিকার হয়েছি। এবার খারাপ হয়ে যাবো, ভীষণ খারাপ হয়ে যাবো।' : 'সন্ধ্যাবেলা দরজা'), ('আমার স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন অবয়বের মধ্যে অবয়ব' : 'ভাববতীর উদ্দেশে রচিত পাঁচটি প্রণয়গীতি') এবং ('যেন মৃতের দেশ থেকে / ফিরে এসেছি নতুন করে জীবনের নিয়মসমূহ / অভ্যাস করবো বলে।' : ('নীল সিংহের অন্তর্বর্তী দেবতা') ইত্যাদি।

দু একটি কবিতায় কবির কাব্যভাবনার নিদর্শন বিদ্যমান—যেমন 'আত্ম-জিজ্ঞাসার শিল্প' কবিতায় 'প্রাচীন কবিতা পাঠের বিরল আনন্দ' তিনি প্রকাশ করেন, 'তিনধরিয়ার পথে' কবিতায় মহানদী ও মহাসূর্যের কাছেও কবিতার সন্ধান পেয়ে তাদের উদ্দেশে 'হে মহানদী / হে মহাসূর্য তোমার স্নিগ্ধ কাব্যগ্রন্থ পাঠ করা শেষ হ'ল' ব'লে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং 'মানবপুত্রী হারমোনিয়াম শোনো' কবিতায় 'এক বিশেষ ধরনের সংগীতই হবে কবিতার মূল উৎস'—কবিতার উৎস সম্পর্কে এই স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

'ধৃতাশ্ব-ভাববতী'র অধিকাংশ কবিতাই কামজারিত প্রেমের, তবু নাম-কবিতাটিতে যখন নিজের প্রেমিকাকে তিনি এই বলে বিশেষিত করেন—'তুমি মদ্যের অপেক্ষা আরো সাতগুণ উজ্জ্বল'—তখন তা কবির প্রেমিকার সর্বাঙ্গকে না হলেও অন্তত তাঁর প্রেমিকার গাত্রবর্ণকে সত্যিই বিশেষ-ভাবে মনে রাখার মতো হয়ে ওঠে বৈকি।

ফরাসি চিত্রশিল্পী সি.এফ.এল. গিরাদঁ-অঙ্কিত এই কাব্য-গ্রন্থের প্রচ্ছদচিত্রটি যত না ভাবোদ্দীপক তার চেয়ে ঢের বেশি কামোত্তেজক॥

৪.

জিয়া হায়দারের "লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা" গ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতাই একটি বিশেষ ভাবের দ্বারা তাড়িত, একটি নির্দিষ্ট চিন্তার দ্বারা জারিত। সেই ভাব

আর চিন্তা সাধারণ অর্থে স্বদেশপ্রেমের এবং বিশেষ অর্থে নিজের দেশ আর জাতির মুক্তিসংগ্রামের। বস্তুত 'সমর পোশাকে কোনো মানুষ যখনি মানবের মুক্তির সংগ্রামে নির্ভরচিত্ত, উৎসর্গিত তখন আনন্দ বিশাল আকাশ হয়ে যায়।' ('আনন্দ স্বরূপ')—এই উপলব্ধি এবং 'প্রয়োজন জনগণের ফুঁসে ওঠার, অ-বিপ্লবের সব কিছু কালনাগের মতো গিলে ফেলার ক্ষমতার, গরকির মতো সব জঞ্জালকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার প্রচণ্ডতার। প্রয়োজন দু'হাতে অস্ত্রধারণ করে দূষিত রক্ত ঝরানোর হিংস্রতার।' ('অক্ষমতা, তবু লিখে যেতে হয়')—এই স্বীকৃতিই এই কবিতাগুলি রচনা করতে কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে। এগুলি পাঠ করতে-করতে পাঠক-পাঠিকাচিত্তে চকিতে অনুভূত হয়, 'কোথাও ঘন কোথাও এলোমেলো···ঝোপঝাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে··· অনেকদিন থেকে, একটা মুক্ত প্রান্তরে পৌঁছনোর জন্যে' ('এমন কেউ নেই') দুর্মর এক অভিলাষ এই কবিতাগুলি রচনা করার সময় কবিচিত্তে বিশেষভাবেই জাগ্রত ছিল। এবং এই অভিলাষ যে তাঁর পক্ষে আদৌ ভাবালুতা-মাত্র নয়, এর আশু পূরণ যে তাঁর কাছে জীবন-মরণের সমস্যা সমাধানের মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক—এই বোধ তাঁর মধ্যে জ্বলন্ত বলেই ওই একই কবিতায় তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন তোলেন, 'সামনে এগোবার সড়ক নির্মাণ করতে কি পারবো কোনোদিন? এই জঙ্গলাকীর্ণ মাটি কি অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করে দেবার মতো একমুঠো বারুদ হয়ে যাবে না কোনোদিন?' কিন্তু শুধু ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন তুলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি; তাঁর সেই আর্ত প্রশ্নের উত্তর যে ইতিবাচক, সে-সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তরের ইতিবাচকতার হেতু সম্পর্কেও তিনি সম্যক সচেতন,—যে-কারণে এই গ্রন্থের প্রথম ও নাম-রচনা 'লোকটি ও তার পেছনের মানুষেরা' কবিতায় কবিতার লোকটিকে তাঁর মানসপ্রতিভূ হিসেবে কল্পনা ক'রে পরম প্রত্যয়ে তিনি জানিয়েছেন, 'তার সেই মনে হওয়াটা স্বপ্নের মতো ছড়িয়ে গেলো সবার ভেতরে'; এবং 'যেন সে স্থির বিশ্বাসে মনে করছে, তার পেছনে পাঁচ কোটি মানুষ।' অর্থাৎ, জাতীয় জীবনের চরম সঙ্কটের দিনে সমগ্র দেশের আপামর মানুষের সঙ্গে আত্মনাড়ীর সুদৃঢ় বন্ধনের গভীর এক অনুভূতি আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি রচনায় কবির অন্যতম প্রধান প্রেরণা।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই উপলক্ষ, যা কবির এই প্রেরণার বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কাজ করেছে? নিঃসন্দেহে জাতীয় সঙ্কটের সেই অন্ধ, মূক, বধির সময়পর্বই সেই উপলক্ষ যখন কবির মনে হচ্ছে, 'এখন বোধ করি এমনই একটা সময়—অতীত নিশ্চিহ্ন, বর্তমান অন্ধত্বের রূপকল্প, ভবিষ্যৎ অভিধান-বহির্ভূত।' ('আমার সামনে পেছনে'), যখন কবি অনুভব করছেন, 'সমস্ত শব্দাবলী বোবা হয়ে আছে—' ('প্রয়োজনের কথা'), যখন কবি বুঝতে পারছেন, 'দিনগুলো কেমন থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম। রাত-গুলো ফাঁকা রাস্তায় দৌড়ুচ্ছে, মাথায় ব্যাণ্ডেজ।' ('এই সময়') এবং যখন কবি বড়ো বেদনার সঙ্গে লক্ষ করছেন, 'ভেসে যাচ্ছে ছবির মতো গ্রামের নিসর্গ, জেলেদের মাছ, প্রকৃতি ললনাদের সতীত্ব, পৌরুষের গর্ব; ভেসে যাচ্ছে সমস্ত কৃতিত্বের খতিয়ান, আশ্বাসের দলিল, নদী-পয়োস্তির আকাঙ্ক্ষা।' ('এ কেমন ভাঙ্গন?') স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিচলিত বোধ করেছেন এই ছিন্নমস্তা সময়ের সুগভীর ষড়যন্ত্রে—ফলে 'এ কেমন ভাঙ্গন' কবিতায় তিনি বিমূঢ়ের মতো স্বগতোক্তি করে উঠেছেন, 'এ কেমন ভাঙ্গন!—শুধু ভেঙ্গেই চলেছে, ভেঙ্গেই চলেছে; কোনো চরের আবছা মানচিত্রও তো নেই।' এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ওই একই কবিতায় বিভ্রান্তের মতো আর্তকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন উঠিয়েছেন, 'এ ভাঙ্গন কি "বাংলার মানুষের আরো রক্ত চাই" বলে কোনো স্থপতি-প্রকৌশলীকে, নিদ্রায় অথবা জাগরণে, ডাক দিয়ে গেছে বর্তমান দুঃস্বপ্নের ভেতরে?' সঙ্গত কারণেই এই বিরূপ পরিস্থিতিতে তিনি অত্যন্ত অসহায় বোধ করেছেন, নিজেকে তাঁর মনে হয়েছে, 'আমি এমন একটা ঘুড়ি, বাতাসের আন্দোলনে উড়তে পারি না।' ('সংশয়িত উপমা')।

কিন্তু এই সময়কে যারা কলুষিত করেছে, যারা এই সময়কে বাজি রেখে রাজনীতির জুয়াখেলায় মেতে উঠেছে, তাদের প্রতি শাণিত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপেও কবি পিছুপা নন। সেই ভণ্ড রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গোক্তি—'শিকারের কাছাকাছি এসে বাঘেরা সন্তের পবিত্রতা ধারণ করে, ভালো ভালো হুংকার বলে, মহৎ গর্জনের ক্যাসেট বাজায়।' ('বাঘ ও শিকারের গল্প'), ব্যঙ্গচ্ছলে তাঁদের প্রতি তাঁর নিবেদন, 'জনগণ শুধু আপনাকে একটি খবর বলবে না—আপনার···আস্তিনের তলায় কিরীচটা কিভাবে শানিয়ে রেখেছেন।' ('আপনি ও আপনার জনগণ'), জাতির সমূহ সংকটে এদের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর বক্রোক্তি—'আর ওদিকে কৃষ্ণ কিনা রুক্মিণীহরণে কালাতিপাত করে

চলেছে!' ('পূর্বাভাস')।

আলোচ্য গ্রন্থের 'তৃতীয় মানবসন্তান' কবিতার 'বরফে ঢাকা গাছের পাতাগুলোতে হলদে চাঁদের শীতার্ত জ্যোৎস্না / গলে গলে পড়তে থাকলো।' এবং 'রাজা বাদশার গল্প' কবিতার 'বটগাছের ডালপালায় মস্ত বড়ো চাঁদের থালাটা কেমন আটকে গেছে' পংক্তিতে যেমন কবির নিসর্গ-চিত্রণ ক্ষমতা প্রকাশিত, 'এমন কেউ নেই' কবিতার 'নির্মাণ করতে করতে এগিয়ে যাবার সাধনায় কি যে বিষম পরিশ্রম!' 'এ কেমন ভাঙ্গন?' কবিতার 'নদীতে ভাঙ্গন এলে একদিকে নতুন চর জেগে ওঠে।' 'আনন্দস্বরূপ' কবিতার 'ক্ষেতের ফসল চপল শিশুর মতো নেচে ফিরলে কৃষকের বুকে লক্ষ্মীর ঝাঁপি;', 'সংশয়িত উপমা' কবিতার 'দীঘিতে কলসী ভাসালে সে কখনো হারিয়ে যাওয়া সুদূরে যেতে পারে না—' ইত্যাদি পংক্তিতে তেমনই তাঁর জীবনোপলব্ধির আভাস প্রতিভাত কিন্তু বিস্মিত হতে হয় গ্রন্থের শেষ কবিতায় ('অক্ষমতা, তবু লিখে যেতে হয়') যখন তিনি 'কবিতা দিয়ে কিছুই হয় না' বলে পৌনঃপুনিক ও প্রত্যক্ষভাবে কবিতার মূল্যহানি ঘটান, কেননা কবিতা সম্পর্কে এই মর্মান্তিকরূপে বিরূপ সিদ্ধান্ত কোনো কাব্যানুরাগীর পক্ষে কোনোক্রমেই গ্রহণীয় তো নয়ই, এমনকী বিন্দুমাত্র সমর্থনীয়ও নয়।

গ্রন্থটির মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা ত্রুটিশূন্য নয়॥

সুরম্য শব্দশিল্পের কবি

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর কবিতাকে শঙ্খ ঘোষ চিহ্নিত করেছিলেন পঞ্চাশের কাব্যধারার প্রাথমিক পর্বের 'শুদ্ধ ব্যতিক্রম' বলে। সেটা ষাটের গোড়ার দিককার কথা। যদিও অলোকরঞ্জন তখনো 'একলা স্বগতাকারে' মগ্ন এবং বলেন 'একটিমাত্র রাখাল যাক, / এ মাঠ একলা পড়ে থাক / নীরবে, আমি এ মাঠ ছাড়বো না।' তবু তিনি বাচনে, ছন্দে, দার্শনিকতায় কিংবা নিজস্ব শৈলীর নিপুণতায় পঞ্চাশের সাধারণ স্বভাবধর্ম এড়িয়ে গেছেন। পরবর্তী কালে আরো প্রত্যক্ষভাবে 'বিবর্তমান কবিস্বভাবে'র দাবি মেনেছেন, নিজেকে ভেঙেছেন এবং নতুনভাবে গড়েছেন বহুপ্রস্থ না হয়েও। তবু অন্তর্লীন এক ধারাবাহিকতাকে অস্বীকার করেন নি। প্রসঙ্গত, অলোকরঞ্জনের অননুকরণীয় গদ্যের দ্বারস্থ হয়ে আমার উচ্চারণকে দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করা যাক,—'এক জলে যে দুবার স্নান করা যায় না, গ্রীক দার্শনিকের সেই বিপজ্জনক বীক্ষা আমাকে এখনো দুর্মরভাবে আকর্ষণ করে। একই কবিতার ধ্রুবপদের পৌনঃপুনিকতা যদিও বা গ্রাহ্য হয়, কবিতা থেকে কবিতার সঞ্চারপথে পুনরুক্তিপ্রবণতা যথাসাধ্য খারিজ হতে দেখলেই খুশী হই। আমার বিশ্বাস তবু আমাকে বলে, সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যেও পারম্পর্য বলে কিছু আছে। স্রোতের ভিতরে ধ্রুবতার আদল ধরতে চাওয়ার মধ্যেও হয়তো কোনো তাৎপর্য রয়ে গিয়েছে।' অবশ্যই তিনি অনেক ধ্রুবপদ রচনা করেছেন আর তাতে ধ্রুবতার আদল ধরা পড়েছে নিখুঁতভাবেই, তবু 'পুনরুক্তিপ্রবণতা' খারিজ হয় নি সবসময়। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব এবং কথনশৈলীর দিব্যচারুতা নিশ্চয়ই মুগ্ধ করে কিন্তু কখনো-কখনো তাঁর নিজের ছায়াকে অনুসরণও লক্ষ্যগোচর।

প্রকাশিত দশটি কাব্যগ্রন্থের মোট ১১০টি আর অগ্রন্থিত আটটি নিয়ে সাকল্যে ১১৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠকবিতা'য়। নিসর্গ, ঈশ্বর, মা, প্রেমিকা, শিশু মোটামুটি এদের নিয়েই অলোকরঞ্জনের কবিতার জগৎ। যাকে সমাজসচেতন কবিতা বলে—যার ভাসাভাসা একটা চেহারা আমি প্রায়ই ধরতে ভুল করি—তেমন কিছু কবিতাও সংকলিত।

অলোকরঞ্জনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৯ সালে: নাম "যৌবনবাউল"। তাতে মোট কবিতা ছিল ১০৮টি। কিন্তু নির্বাচক কবি মাত্র পনেরোটি কবিতা বেছেছেন। অন্যগুলির মধ্যে অন্তত আরো পনেরোটি আমার খুবই প্রিয় কবিতা। এই নিষ্করুণ নির্বাচনে আমার মতো অনেক কবিতাপড়ুয়াই আহত হবেন, কিন্তু 'মিতায়ত পরিসরে'র কথা ভেবে বিদগ্ধ কবি নানা পর্বাঙ্গের প্রতিনিধিমূলক কবিতাগুলি সংকলিত করতে চেয়েছেন বলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। "যৌবনবাউলের" অনেক কবিতাই একদিন মুখে-মুখে ফিরত—যা আবেগী মানুষদের উদ্বেলিত করেছিল। প্রতারক স্মৃতির চোখ এড়িয়ে এখনো অনেকগুলি আমার সঙ্গী। সেই 'নির্জন দিনপঞ্জী'র ছিন্ন কবিতাগুলি মনে পড়ে ফিরে-ফিরে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা—নবার্ক, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৫৯। ১৯৮৫। কুড়ি টাকা

তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ "নিষিদ্ধ কোজাগরী"র ৭৮টি কবিতা থেকেও মাত্র ১৬টি কবিতা গৃহীত। তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে একটু বেশিই নেওয়া হয়েছে। বলতে চাইছি শতকরা হিসেবের পটভূমিকায়।

অলোকরঞ্জনের কবিতার উপকরণ 'শব্দ, পুরাণ, মুখচ্ছদ' (কবির একটি প্রবন্ধের শিরোনাম এটি)। 'শব্দ' প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জন লিখেছেন—'এক-একটি শব্দ, আজকের সময়ের বিশ্লিষ্ট মানুষের মতোই, এক-একটি ব্যঞ্জনাসঙ্কুল দ্বীপ'। বাচ্যার্থের দিকটি উপেক্ষা করে কবি শব্দকে 'ইঙ্গিতবঙ্কিম' করে তুলেছেন, প্রায়শই, সম্ভবত সবসময়ই। নানাদেশের, এদেশের বহুলপ্রচলিত মিথ যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি ব্যবহার করেছেন প্রখ্যাত পূর্বজ সাহিত্যিকদের সৃষ্ট চরিত্র কিংবা তাঁদের গল্পকবিতার নাম বা অংশ, কিন্তু এ সবই তাঁর ব্যবহৃত শব্দের ব্যঞ্জনা অথবা সম্পৃক্ত মাধুরী বাড়িয়ে দিতে। জীবনানন্দকে পুরাণপ্রয়োগের 'ত্রিকালজ্ঞ জাতিস্মর' বলেছেন অলোকরঞ্জন—তাঁর সে কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে ইচ্ছে হয়—তিনিও কম বড়ো জাতিস্মর নন। মূলত আধুনিক কবি যে mask বা 'মুখচ্ছদ ব্যবহার করেন তার পিছনে বর্ণাঢ্য ও জটিল অতীত রয়েছে।' সেই অতীতকে জেনে এবং সমসময়কে চিনে অলোকরঞ্জন অনুভবের সজলতার প্রেক্ষাপটে প্রজ্ঞা-শাসিত উপলব্ধির উন্মোচন ঘটিয়েছেন। আর এর সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর ছন্দ-নির্মাণের অবাক কুশলতার। বাঙলা কবিতায় ছন্দ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পরবর্তী পর্যায়ে এক অবিস্মরণীয় নাম। যাঁরা প্রবহমান গদ্যে নির্বাসিত ছন্দে লেখার পক্ষপাতী, তাঁদের অনেকেরই যুক্তি হল ছন্দ অনেকসময়ই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং যে শব্দটি ব্যবহার না করলে চলত, তাকে এনে ফেলতে হয় ছন্দের খাতিরে যা কবিত্বকে এবং কবিতাকে ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু অলোকরঞ্জন দেখিয়েছেন কেমন করে ছন্দ পোষা-বিড়ালের মতো তাঁর পায়ের কাছে ঘুরঘুর করেছে। শব্দ নির্মাণে ও ব্যবহারে অপরিসীম দক্ষতা তাঁকে এমনি-ভাবে এক বিরল প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: '…বন্ধুকে দস্তানা / বানিয়ে নিয়ে কেন আমি প্রচণ্ড রোদ্দুরে / টাঙিয়েছিলাম প্রকাণ্ড এক স্নিগ্ধ সামিয়ানা? / দেবদারুডাল রোমশ হাতে ছেঁড়ে আমার সুযোগশুরু ডানা॥ / কিংবা 'অতিথি, তবু মুখে ঈষৎ রুক্ষ রাঢ় বুলি / তোমাকে খুব সাজে, / তোমার সাজি ভরে দিলাম কলকাতার ধুলি / চোরে ও যুবরাজে / এ আন্ধারে ছিনিয়ে নেয় ভিখিরির মাদুলি / বৈরাগীর ঝুলি:' / অথবা 'আঁদ্রে জিদের জর্নালে দ্বিধা ছিল, / সংশয় থেকে সাহস পেলাম আমিও, / বুকে দুরুদুরু মৃদঙ্গ বিদারিল, / তথাপি সামনে এগিয়ে ছুঁলাম নীলাভ উত্তরীয়!'

পঞ্চাশের এই অন্যতম প্রধান কবির অলংকরণশৈলীর পটভূমিকায় একটি প্রশ্ন কিন্তু জাগেই। কেন তাঁর কথোপকথন এত সাজানো এবং সুচারু? তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য তাঁকে কি সহজভাবে কথা বলতে দেয় না? এটি হয়তো তাঁর সবলতারই দিক কিংবা এই জন্যেই তিনি শুদ্ধ ব্যতিক্রমী। তবু সমসাময়িক কবিতা কখন খুব প্রত্যক্ষ, বা বলা যায় রহস্য-ময়তার মোহিনী গুণ্ঠন কবিতায় উন্মোচিত হতে-হতে উপেক্ষিত, তখন অলোকরঞ্জনের মতো প্রতিভাময় কবির কাছে প্রত্যাশী হতে ইচ্ছে করে—সাংকেতিক সন্ধ্যাভাষা নয়—একেবারে সরাসরি সাধারণ ভাষায় লেখা কিছু কবিতা পেতে। ব্যক্তিগত আশা, আশাভঙ্গ, অপরাধবোধ এবং অজস্র অসম্পূর্ণতার জন্য যে যন্ত্রণা, তা উচ্চারিত হয় তাঁর কবিতায় অত্যন্ত পরিশীলিত আঙ্গিকে—কখনো-কখনো তা ভাঙাচোরা, এলোমেলো বিন্যাসের পক্ষপাতী হলে যেন ভালো লাগত। অলোকরঞ্জন কখনো নিঃশেষিত নন বলে তাঁর তন্ময় পাঠকের প্রত্যয়ও বিপুল।

চমৎকার প্রচ্ছদ করেছেন অপরূপ উকিল। তাঁকে অভিনন্দন।

এই সময়ের কবিতা : দ্রোহ, প্রতিবাদ, বিপ্লব ও আত্মসমর্পণ

কামাল হোসেন

ইস্তাহার সংকলন—মলয় রায়চৌধুরী। মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগনা। ১৯৮৫। পৃ ৫৩। দশ টাকা

কবিতা-সংকলন—মলয় রায়চৌধুরী। মহাদিগন্ত। ১৯৮৬ পৃ ৪৬। সাত টাকা।

মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর—মলয় রায়চৌধুরী। মহাদিগন্ত। ১৯৮৭। পৃ ৪৮। ছয় টাকা।

ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা—দেবী রায়। মহাদিগন্ত। পৃ ৪৮। সাত টাকা।

উন্মাদ শহর—দেবী রায়। ১৯৮৪। মহাদিগন্ত। পৃ ৪৮। সাত টাকা।

আবহ সংবাদ—রঞ্জিত সাহা। অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৯। ১৯৮৭। পৃ ৮০। নয় টাকা।

প্রতিবাদ যখন কবিতা—মঞ্জুষ দাশগুপ্ত, সুকুমার গরানী সম্পাদিত। সমন্বয়, ৪৪৬ পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা-৬০। ১৯৮৮। পৃ ৯৬। চোদ্দ টাকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবাদী কবিতা—অর্জুন গোস্বামী সম্পাদিত। সমীক্ষা, ২/৭৩ বিবেকনগর, কলকাতা-৭৫। ১৯৮৮। পৃ ৬০। দশ টাকা।

দামিনীকে রাখি ছেড়ে—সুভাষ ঘোষাল। প্রমা, ৫ ওয়েস্ট রেঞ্জ, কলকাতা-১৭। ১৯৮৬। পৃ ৩৫। ছয় টাকা।

পরিব্রাজকের ভিক্ষা—রবীন সুর। অরণি প্রকাশন, ভাটপাড়া, ২৪ পরগনা। ১৯৮৮। ই. ৬৪। দশ টাকা।

হাত ধুয়ে ফেলছি হাওয়ায়—প্রশান্ত রায়। মাঝি প্রকাশনী, ৭ সুকিয়া রো, কলকাতা-৬। ১৯৮৫। পৃ ৬৪। ছয় টাকা।

রং নাম্বার—শৈলেন্দ্র হালদার। গ্রন্থ গৃহ, এ ৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭। ১৯৮৮। পৃ ৪৮। বারো টাকা।

তুরের আগুন—শঙ্খচিল। ইসলামিক ব্লক সেন্টার, ২৭বি লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩। ১৯৮৬। পৃ ৬৮। নয় টাকা।

একশো পিদিম জ্বলে—পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। যুথিকা গঙ্গোপাধ্যায়, ৪ দোলগোবিন্দ সিংহ লেন, সালকিয়া, হাওড়া। ১৯৮৭। পৃ ৫৮। নয় টাকা।

প্রতিবাদী প্রতিদিন

ইংরেজ কবি জিওফ্রে চসার-এর "ইন দি সাওয়ার হাংরি টাইম" বাক্য থেকে 'হাংরি' শব্দটিকে ১৯৬১ সালে একটি নির্দিষ্ট অর্থে প্রথম চিহ্নিত করেন তরুণ কবি মলয় রায়চৌধুরী। ঐতিহাসিক অসওয়াল্ড স্পেংলার-এর সাংস্কৃতিক অবক্ষয়-কালীন সর্বগ্রাস তত্ত্বে তখন হাংরি-ভাবনার দ্যোতনা অন্বেষণ করে ফিরছেন মলয়। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন কয়েকজন স্বপ্ন-বিলাসী লড়াকু সৈনিক। এখন ভাবলে অবাক লাগে, এই স্বাধীন দেশেই ১৯৬৪ সালে প্রতিবাদী কবিতা লেখার জন্য ১২০ বি এবং ২৯২ দণ্ড সংহতির ধারায় মলয়কে হাতে হাতকড়া আর কোমরে দড়ি বেঁধে গ্রেফতার করা হয়। মনে রাখা দরকার, সে সময় এদেশে জরুরি অবস্থা জারি ছিল না।

কী বক্তব্য ছিল হাংরি আন্দোলনের সংগ্রামী যোদ্ধাদের? ১৯৬১ সালে তাঁদের এক বুলেটিনে মলয় লিখেছিলেন, 'কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধবল্মীক নয়, নিরলস যুক্তি-গ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমনভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোন অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্ম্যসিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী বিরোধিতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক। এ-ক্ষুধার একমাত্র লালনকর্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত কী আছে আর জীবনে!'

বলা বাহুল্য, বাঙলা কবিতার স্বনির্বাচিত পুরোহিতদের কাছে হাংরি আন্দোলনের এই বলিষ্ঠ বিদ্রোহ মোটেই সুখপ্রদ হয় নি। মলয়ের উপর মানসিক শারীরিক নানারকম অত্যাচার হয়েছিল। বস্তুত মলয় আর তাঁর দলবলের দুরন্ত বিদ্রোহ-বার্তায় তথাকথিত "অশ্লীলতা" নামক ট্যাবুতে আক্রান্ত আমাদের সাংস্কৃতিক কর্তাবাবাদের ভণ্ডামির মুখোশখানা চমৎকারভাবে খসে পড়েছিল।

এই আন্দোলনের সময়ে বিভিন্ন বুলেটিনে ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে প্রকাশিত ইশতাহারগুলি আজকের পাঠকের কাছেও প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। "মহাদিগন্ত" প্রকাশিত এই সংকলনগ্রন্থটি বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য একটি সংরক্ষণযোগ্য আকরগ্রন্থ।

মলয়ের কবিতার মধ্যে আমাকে চিরকালই মুগ্ধ করেছে তাঁর বিষতিক্ত বিদ্রূপ, ক্রোধ এবং অতৃপ্তিযন্ত্রণার তীব্র

আবেগ। খুব নিষ্ঠুরভাবে ভারতবর্ষের উদ্দেশে তিনি তাই লেখেন : 'আপনি খুনের বদলে খুন করেন আর আমরা করলেই যত দোষ / আমাকে বেড়ালের থাবা মনে করবেন না / নিজের হৃৎপিণ্ড খেয়ে নিজের সঙ্গে রফা করে নিলে কেমন হয় / ভারতবর্ষ, ধানখেত থেকে ১৪৪ ধারা তুলে নিন / পৃথিবীর সমস্ত মহৎগ্রন্থ পাঠিয়ে দিন ভিয়েতনামে, হোঃ হোঃ / দেখুন যুদ্ধ থেমে যায় কিনা / ভারতবর্ষ, সত্যি করে বলুন তো আপনি কী চান।' (কামড়)।

নারীর প্রেম আর বিশ্বাসভঙ্গের ইতিকথা নিছক কৌতুক আর ব্যঙ্গের মতো শিহরিত হয় এসব লাইনে : 'হায় স্ত্রীলোক থেকে থেকে স্ত্রীলোকের কাছে ছুটে গেলুম নিজের দুঃখকষ্ট চেপে রাখতে। প্রথম প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করে এলুম তার প্রসবকালীন ছুটিতে' (জখম)।

শব্দের তির্যক দৃষ্টিপাতে কুয়াশার গভীরে নখের আঁচড়ে প্রতিবিম্ব রচনা করে মলয় লেখেন : 'বিমর্ষ নিস্তব্ধ ফাঁকা জেহোভার ঈষদচ্ছ সার রগে নখে / আমাকে স্পর্শ করো ওই ঠোঁটে ডাকাডাকি আরো কিছুক্ষণ আসি' (অন্তরঙ্গ বহির্মুখ)। 'মেধার বাতানুকুল ঘুঙুর' বেরিয়েছে গত বছর বইমেলায়। প্রকাশ কর্মকারের ড্রইং এবং যোগেন চৌধুরীর মলাটে সমৃদ্ধ মলয়ের এ সংকলনটি রীতিমতো অভিজাত। একজন জীবন্ত সৃষ্টিশীল মানুষ কীভাবে পালটিয়ে যান, এ সংকলনটি তার একটি বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণ।

ক্রোধ, বিদ্রোহ এখন অনেকখানি শীতল। এসটাবলিশ-মেনটের অনিকেত অভিসারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে গেছেন মলয়, এমন কথা বলব না। তবু অভিজ্ঞতার সর্পিল পথ অতিক্রম করে পর্বতশিখরে অপার নীলিমায় চোখ রাখবার অবসর হয়তো অর্জন করে ফেলেছেন।

বস্তুত এই পর্বের কবিতাগুলি আমাদের রাগায় না, প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ করে না। শুদ্ধ চেতনার রহস্য প্রতিস্থাপিত করতে গিয়েই হয়তো নিছক গবেষকের হিমায়িত কণ্ঠস্বরে এখন তিনি বলেন : 'সৌন্দর্য-বিমূর্ত কাথে মাছির খোরাক হবে তুমি / সব জড়ো করে তবু তুমি নও / তুমি সে সময়ে রৌদ্রে ভাসমান / বুঝেছিলে মিথ্যে এই প্রারম্ভিক অধঃপতন।' (শুদ্ধ চেতনার রহস্য)।

"ধনতন্ত্রের ক্রমবিকাশ" লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মলয় বলেন : 'আমি চাই যে করেই হোক বেঁচে ওঠো / সমগ্র জীবন থাকো কথাহীন হয়ে।'

সেই একই আত্মসমর্পণের আওয়াজ শুনি : 'এবার রেহাই দিন তাড়াতাড়ি এই হ্যাপা শেষ করা হোক / কোথায় ঘোরাবো ঘানি কোন জেলে পাঠান সেখানে।' (নিক্তি)।

এই নির্লিপ্ত মোহময় জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে আবার প্রচণ্ড উৎসাহে বন্য ঘোড়ার কেশর ধরে এই নষ্ট বিধ্বস্ত সময়ের উপর দিয়ে মলয়কে ছুটে যেতে দেখলে আমার মতো অনেক পাঠক নিশ্চয়ই সুখী হবেন। হায়, সৃষ্টির গতিময় পাখি যে একই সরল রেখায় উড়ে বেড়ায় না।

হাংরি জেনারেশনের আর-এক সহযোদ্ধা ছিলেন দেবী রায়। দেবীর কবিতায় একটি নিজস্ব চরিত্র আছে। খুব উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে তিনি পছন্দ করেন না। বিবেকের কাছে অত্যন্ত স্পষ্টবাদী এই কবি তাঁর কবিতার মধ্যে এক বিশেষ ধরনের স্বাধিকার অর্জন করে নিয়েছেন। গতানুগতিক আশ্বাসে বিমুখ দেবীর অন্বেষণ সম্ভবত বিস্ফারিত দুটি আঁখির পিপাসাপীড়িত সন্নিধানে।

"ভ্রূকুটির বিরুদ্ধে একা" কাব্যগ্রন্থের "ম নে রে খো" কবিতাটিতে সেই একই অঙ্গীকার প্রকাশিত হয়েছে : 'সব যন্ত্রণাই, একদিন নদী হয়ে দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ··· / ততোদিন শুধু একমনে নিজেকে খোঁড়ো··· ॥'

কবিতার হা ড় গো ড় কবিতাটিতেও রয়েছে এক নির্বিঘ্ন নির্লিপ্তি : কবিতার হাড়গোড়, ঠিক একদিন তার আগাপাস্তলা —চিবিয়ে খাবে /' আমরা যারা শুধুই হৈ চৈ, মদ্যপানই সার / আমরা যারা শুধুই 'রেওয়াজ'—হয়তো তেমনভাবে 'রিয়াজত'।'

সময়ের এই বিষণ্ণ অবেলায় আনাচে কানাচে উঁকি মারে বিষাক্ত ছত্রাক। বিবিক্ত অস্তিত্বের চাবিকাঠি ছুঁয়ে ফিশফিশ করে দেবী উচ্চারণ করেন : 'সুখ নয়, ভিতরে তার অ-সুখ রয়েছে। খণ্ড-খণ্ড ইতস্তত, ছড়িয়ে রয়েছে / ছিন্নবিচ্ছিন্ন তুমি তাই ভয়ঙ্কর অসুস্থ—হয়ে পড়ো—' (কাতর—এক অস্থিরতা)।

"উন্মাদ শহর" কাব্যগ্রন্থে দেবীর কণ্ঠস্বর খুব একটা না পালটালেও কোথায় যেন খানিকটা বিদ্রূপের রেশ এসে মিশেছে। অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে আর কোনো সহানুভূতি খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। এক ধরনের অসহায় সহিষ্ণুতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে-যেতে তিনি লেখেন : 'এ কোথায় আমি চলে যাচ্ছি—কোথায়— / কেউ কোন উত্তর ছুঁড়ছে না কেন / সবি নিথর চুপচাপ—কেউ এখানে নেই' (কি এসে যায়)।

পৃথিবীর হাড়ে-হাড়ে অনুমিত খুন প্রকাশ পায়, দেবী তখন তাঁর বিদ্রূপশানিত চাঁচাছোলা গলায় বলে ওঠেন :

'মানিয়েছে— / দারুণ, দারুণ;—তোমার প্রেমিকাকে— পরস্ত্রীর চেহারায়' (তোমার প্রেমিকাকে)।

দেবীর এইসব সাম্প্রতিক কবিতায় মাঝে-মাঝেই নিরাসক্তির শীতল নগ্নতা প্রতিবেশে বড়ো বেশি বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায়। খুব ক্লান্ত গলায় তিনি বলেন: 'বনশ্রী; আমি আজ এখন অ-নেক শান্ত হয়েছি / দুপুর রৌদ্রে; টো-টো করে সেই একটানা ঘোরা— / অস্থির বাউণ্ডুলেপনা, একে-একে প্রায় সব ছেড়েছি' (তুমি ঐভাবে)।

দীর্ঘদিন প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রঞ্জিত সাহা। এতদিন পর তাঁর কাব্যসংলকন "আবহ সংবাদ" প্রকাশিত হয়েছে—এটা নিঃসন্দেহে একটা বড়ো খবর।

চারটি পর্বে কবিতাগুলিকে ভাগ করেছেন রঞ্জিত: স্বপ্ন, সময়, প্রত্যহ মানুষ করো, নিভৃত সংলাপ, বিচ্ছিন্ন আলাপ।

সময়ের এই ভ্রষ্ট লগ্নে সান্দ্র আলস্যে কবিতার শব্দ খোঁজেন না এই কবি। উপনিষদের শ্লোকে উচ্চারণের মতো মন্দ্রকণ্ঠে তিনি বলেন: 'বুকের শিলায় ভাঙছে সময় / চোখের মেঘে জমছে আগুন / এখন আমি দূরের বহুদূরের / ঢেউ নিয়ে খেলি' (স্বপ্ন ও সময়)।

তুলনামূলকভাবে "নিভৃত সংলাপ" পর্যায়ের কবিতাগুলি আমাকে রীতিমতো উৎসাহিত করে। প্রতিকূল বায়ুর শীৎকারে প্রজ্ঞার আহুতি বোধ করি সম্পূর্ণ হয়। একুশ শতাব্দীর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে-চলা মানুষকে ডেকে রঞ্জিত বলেন: 'কোথায় পালায় সব / পথভ্রষ্ট ছন্দছায়া— ঝড়ের তাণ্ডব / স্রোতস্বিনীর ছুটে যাওয়া, সাগর চলন / তরঙ্গের হাত ধরে বাঁধন ভাঙা / পথে পথে পাথর কুড়োনো' (কোথায় সব)।

শোকনিরপেক্ষ এক ভয়ঙ্কর পটভূমির নির্বর্তিত বিষাদ আমাদের অস্তিত্বের শেকড় ধরে টান দেয় এসব কবিতার লাইনে: 'কোথায় লুকোবে এই শব্দহীন বিলাপ / দুঃস্থ সময় ছেড়ে কত কাল থাকবে তুমি / আত্মমগ্ন তপস্বীর বেশে' (কোথায় পালাবে)। কিংবা 'বেশ বলেছ—উপভোগ্যা বসুন্ধরা / সন্তানেরা তবু হামাগুড়ি দিয়ে কাঁদে' (পৃথিবী এত অসুন্দর নয়)।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ও সুকুমার গরানী সম্পাদনা করেছেন 'প্রতিবাদ যখন কবিতা' সংকলনগ্রন্থটি। খুব সঙ্গতভাবেই তাঁরা বলেছেন: 'কবিতাকে শেষ পর্যন্ত কবিতা হতে হয়; তা প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, প্রেম বা আত্মাভিমানের বিষয় সম্পর্কিত হলেও। ক্রোধ, চীৎকার, হতাশা, দীর্ঘশ্বাস, আনন্দ, বঞ্চনা প্রভৃতি যে-কোনো বিষয় কবিতার পটভূমিতে কাজ করতে পারে; কিন্তু একটি রচনা কখন কবিতা হয়ে উঠেছে তা যে-কোনো সচেতন পাঠকই বলে দিতে পারেন। প্রতিবাদ যখন ক্রোধ কিংবা চীৎকার মাত্র, শ্লোগান কিংবা বিজ্ঞাপন, তখন সেই প্রতিবাদ কবিতা হয়ে উঠতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের রুচি, পছন্দ, আবেগ কিংবা মতাদর্শের ভিন্নতা সত্ত্বেও যে-কোনো কবিতাই শেষ পর্যন্ত কোনো-না-কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।'

বয়স্ক ও নবীন বহু বাঙালি কবিকেই এই সংকলনগ্রন্থে টেনে এনেছেন সম্পাদকরা। বাঙালি কবিদের বুকের ভিতরে অন্যায়ের বিপক্ষে কত প্রতিবাদ কত বিক্ষোভ জমা রয়েছে, বিবেকের কাছে তাঁরা কতখানি সৎ ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এ সংকলনগ্রন্থে চোখ বোলালেই তা বেশ বোঝা যায়। অনেকের কবিতা বেশ প্রচারধর্মী, অনেকের রীতিমতো ভালো কবিতা। আলাদা-আলাদা ভাবে আলোচনা না করে বেশ কিছু স্মরণ-যোগ্য পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি:

অমিতাভ দাশগুপ্ত: 'তুমি বলেছিলে: চাষ করো, ধান হবে। / মারী ও অপহ্নবে / জ্বলে গেল মাঠ, জল নীল হল বিষে, / মা লক্ষ্মী, দুটি রাতুল চরণ / এখন রাখবে কিসে?' (চাল)।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক: 'এইসব চেয়ারেরও মাতৃভাষা আছে। অপমান আর অভিমান। চেয়ারই আদেশ দেয়, স্বপ্ন দেখে, সাম্রাজ্য বানায়। চেয়ারই রাস্তায় হাঁটে, বই লেখে, বক্তৃতাও দেয়।' (দেখা)।

কৃষ্ণ ধর: "একুশ শতকের জন্য তার আকাঙ্ক্ষা আছে / জাতিসংঘের দরজার বাইরে / তারা প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে অপেক্ষা করছে' (মানুষের দুঃখী সহোদর)।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত: শবযাত্রার সঙ্গীরা সব চমকে ওঠে / এক বিপুল সাভানায় / একটা ভোর শিশু / জন্মাচ্ছে ' মগজ আত্মা চোখ আর হৃদয় নিয়ে…' (জন্মান্তর)।

দেবারতি মিত্র: 'কিন্তু মেলামেশা শক্ত, অসম্ভব বলা ভালো, / কেননা অভূত আলো জন্ম নেবে যার পেটে / সে মা নেই আজও।' (অমিলিন)।

ধূর্জটি চন্দ: 'নত হতে জানি, কিন্তু কার কাছে? তাছাড়া / কেবল কব্জি করে যে ছিন্নভিন্ন / ঐ ধোঁয়াশার ম্লান কিংখাব, চেহারা / ক্রমশ স্পষ্ট, কাগজের টুপি জীর্ণ।'

(ইস্তাহার)।

সুব্রত সরকার : 'আমি একটা বাজপড়া গাছের নীচে যতক্ষণ ইচ্ছে বসে থাকবো / এইসব সোনা-দানা, তপোবন ও উদাসীনতা আপনারা নিন' (আপনাদের জন্যে)।

মল্লিকা সেনগুপ্ত : 'দেখেছি শাদা কালো হলুদ রঙে তাকে / পিতৃভূমি তুমি আমাকে তৃণ ভাবো / শরীরে পলিমাটি আমার প্রিয় শাড়ি' (পিতার পৃথিবীতে)।

পূর্ণেন্দু পত্রীর মলাট এক কথায় লা-জবাব।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়ন মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। এবং এরই পাশাপাশি কালো মানুষদের রক্তঝরানো সংগ্রামের গৌরবময় ইতিকথাও আর-এক বাস্তব সত্য।

বস্তুত সংগ্রাম শুধু গণ-আন্দোলনের মিছিলে ময়দানে আবদ্ধ থাকে না, সংস্কৃতির বর্ণময় প্ল্যাটফর্মকেও ব্যবহার করতে হয়। "দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামের কবিতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধে ব্যারি ফিয়েনবার্গ বলেছেন : 'সংস্কৃতিগত সুযোগ সুবিধা আর বহিঃপ্রকাশের পথ না থাকা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রে চরম সেন্সর ব্যবস্থা সত্ত্বেও, আগামী দিনের দক্ষিণ আফ্রিকার কণ্ঠস্বরের ভ্রূণ দেখা দিয়েছে; একটি সুন্দর জীবনের স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিতে চলেছে।'

এভাবেই এগিয়ে এসেছেন সাংস্কৃতিক মঞ্চের সব ধরনের সৈনিকরা। কবিরাও।

সুখের কথা, সেখানকার শত-শত প্রতিবাদী কবিতার মধ্যে নির্বাচিত কিছু কবিতার অনুবাদ বাঙলায় প্রকাশিত হয়েছে অর্জুন গোস্বামীর সম্পাদনায়। বিভিন্ন কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন অশোয়াল্ড আর মিশেল, বেনজামিন মোলায়েজ, ইলভা ম্যাকে, জিনজি ম্যানডেলা, ডেনিস ব্রুটাস প্রমুখ।

অনুবাদগুলি কতখানি মূলের অনুসারী হয়েছে, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে বেশ কিছু কবিতার বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি খুব একটা পরিণত এবং প্রার্থিত মান অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। এক্ষেত্রে অনুবাদকের দায়িত্ব এবং ভূমিকা কতখানি, সেটাও যাচাই করা সম্ভব নয়।

তবে এই সুযোগে অন্তত বেশ কিছু যোদ্ধা-কবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল—এটাও কম সৌভাগ্যের নয়। নেলসন ম্যানডেলার কন্যা জিনজি ম্যানডেলার লেখা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন উদ্ধার করছি : 'অদূরে দাঁড়ানো শহীদেরা / নিঃশব্দে মাথা নিচু করে / অভিবাদন জানায় / শৃঙ্খলাবদ্ধ / তাদের যন্ত্রণায়-বেঁকে-যাওয়া শরীর / তারা বসতে জানে না / একটা রক্তাক্ত কুয়াশার ভেতর / পিছিয়ে যেতে যেতে / পিছিয়ে যেতে-যেতে / সমাহিত স্বাধীনতার ক্ষয়িষ্ণু কঙ্কাল / চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে বলে / আমাকে স্বাধীনতা দাও' (ম্যানডেলার প্রতিধ্বনি)।

কবি ও মেঘ

সুভাষ ঘোষাল এই সময়ের একজন পরিচিত কবি। "দামিনীকে রাখি ছেড়ে" কাব্যগ্রন্থে স্বরচিত কবিতার সঙ্গে কিছু অনুবাদ-কবিতাও জুড়ে দিয়েছেন। এটা তিনি কেন করলেন, ঠিক বোঝা গেল না। অনুবাদগুলিকে দিয়ে তো একটা আলাদা সংকলন প্রকাশ করা যেত।

দৃশ্যত এক অনুবর্ত্তী কৈবল্য স্বপ্নের কারাগারে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে ভালোবাসেন সুভাষ। তাই বোধ হয় রেখারিক্ত ভঙ্গিমায় শব্দ সাজিয়ে তিনি বলতে পারেন : 'এই বিপুল বাতাসের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে / আর কেউ না জানুক অন্তত আমি জানি / আত্মজীবনীর প্রতিটি পৃষ্ঠায় / আত্মা ছাড়া অন্য কোন বৈচিত্র্য নেই।' (অন্য কোন বৈচিত্র্য নেই)।

নাস্তি প্রত্যাখ্যাত ঐকান্তিক পরিশ্রমে সুভাষ ধ্যান করেন এক অসমৃপৃক্ত অধিদৈবতের। "সরস্বতী" কবিতায় খুব নাটকীয় গলায় তিনি উচ্চারণ করেন : 'নিজেদের অন্ধ জেনে আমাদের মতো যারা নবতম অন্ধকারে ঝরে / তাদেরই জন্য তুমি জলের ওপরে রাখো বীণার সজল প্রতিরোধ।'

অনুবাদপর্বে রয়েছেন উইলিয়াম ব্লেক (জন্ম : ১৭৫৭) ও এমিলি ডিকিনসন (জন্ম : ১৮৩০)। পুরোনো শতাব্দীর রোমন্থ স্বাদ কোনো মৌলিক বিদ্রোহ এনে দেয় না এই ছিন্ন-ভিন্ন উন্মার্গ পৃথিবীতে। তবু বুকের ভেতরে কোথায় যেন রস ঝরিয়ে দেয় ডিকিনসনের এইসব লাইন : 'আমি কেউ নই। কে তুমি বলো তো এবারে? / তুমিও কি কেউ নও? / তবে তো এখানে আমরাই এক জোড়া। / নির্বাক থেকো / জানলেই তারা পাঠাবে দ্বীপান্তরে।'

অতিদৈব বিশ্বের নৈমিষ শৈলশ্রেণী ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পথ হাঁটতে ভালোবাসতেন সদ্যঃপ্রয়াত কবি রবীন সুর। সময়ের প্রস্তরিত স্বপ্নদুঃস্থ ক্লৈব্য থেকে মুক্তিলাভের অভয়মন্ত্র অন্বেষণে

বোধহয় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন তিনি।

মৃত্যুর খুব কাছাকাছি সময়ে দাঁড়িয়ে কবির সৃষ্টির সমালোচনা নিঃসন্দেহে খুব কষ্টকর অভিজ্ঞতা। তবু বলতে হয়, স্বাবলম্বী চিত্রকল্পের বিচিত্র কোলাজ রচনা করতে রবীন ছিলেন রীতিমতো দক্ষ। জীবন এবং পৃথিবীর অন্বিত হিরণ্ময় পাত্রের প্রশ্রয়ী এক ধরনের সহজ দার্শনিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ সব সময় আমরা লক্ষ করেছি। এভাবেই তিনি বলেছেন: 'চাঁদকে নেভাবে কে? কে জলকে ঠেলে দেবে সমুদ্রের ঠিক বিপরীতে / বোধন ও বিসর্জনে স্থিতপ্রজ্ঞ কবি শুধু বাউল সন্ন্যাস।' (কবি ও মেঘ)।

শব্দের মোহময় সম্মোহন মাঝে-মাঝে তাঁকে আচ্ছন্ন করে দিত। চিরকালীন কিছু দুঃখ ও বিস্ময় প্রাণ ফিরে পায় এরকম কিছু ধ্বনিময় পংক্তিনির্মাণে: 'হাজার বছর রতিতৃপ্ত পর্বতের নুড়ি-নুড়ি দেহখানি। এখন ছড়িয়ে আছে অনাবৃত বুড়িগণ্ডকের যতদূর হাত-পা ছড়ানো।' (লুপ্ত প্রস্থান: নষ্ট প্রবেশ)।

প্রশান্ত রায়ের কাব্যগ্রন্থে আছে দুটি পর্ব: হাত ধুয়ে ফেলছি হাওয়ায় এবং ভাতের জন্য।

শব্দের নভস্তলে নিপুণ কারুকার্য ফোটানোয় দক্ষতা আছে প্রশান্তর। প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের গোধূলি উড়িয়ে ঘোড়া ছোটানোর তিনি পক্ষপাতী নন। মুগ্ধ চিত্রকল্পে টুকরো-টুকরো অনুভূতির পশরা সাজিয়ে গল্প শোনাতে তিনি ভালোবাসেন। গল্প মানে মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যক্তিগত পরাজয়ের, অবসাদের, ক্লান্তির কিংবা অলস কৌতূহলে দীর্ণ অভিজ্ঞতার গল্প।

নিজস্ব আইডেনটিটি খুঁজতে গিয়ে তাই হয়তো হতাশ গলায় তিনি বলেন: 'যুবক শব্দের পাশে কোনো পরিচয় বসে / হাটে-মাঠে-ঘাটে নদীর সহবাসে সবই অসম্পূর্ণ থাকে / আমিই আমার পরিচয়, এর বেশী নয়…' (পরিচয়)।

শৈলেন্দ্র হালদারের "রং নাম্বার" গ্রন্থটির ছাপা-বাঁধাই খুব সুরুচিপূর্ণ।

আসলে কবিতার রহস্যময় প্রতিবিম্বিত উপসাগরে সাঁতার কাটার উৎসাহ সব সময়েই প্রশংসাব্যঞ্জক। কোনো কবিকে নিরুৎসাহ করতে এই সমালোচকের সত্যিই ভালো লাগে না। শৈলেন্দ্র আরো লিখুন, লিখে যান। অনিবারণীয় ঋতুপরিবর্তনে একদিন তিনি নিশ্চিত খুঁজে পাবেন কবিতা-প্রতিমার নিঃশ্রেয়স নির্বাণ। আশা নিয়েই তো আমরা বেঁচে থাকি।

ঈশ্বর ও প্রত্যাখ্যান

ফুল পাখি প্রজাপতি প্রেমিকা কিংবা ঈশ্বর যে-কোনো বিষয় কবিতার ব্যথাস্তব্ধ প্রতিমার আত্মায় অধিষ্ঠান করতে পারে। সভ্যতার নির্ভার আবহে মানুষের ঈশ্বরচেতনা ও ধর্মবিশ্বাসের স্ফূর্ত সমারোহ যুগে-যুগে সব দেশের কবিতায় আমরা লক্ষ করেছি। চৈতন্যমুখর নাস্তির কিনারা অতিক্রম করে কোনো কবি নিবিড় ঈশ্বরপ্রেমের গান শোনাতেই পারেন। আমরা দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্বের গানে মাঝে-মাঝেই প্রেম এসে যায়। তাঁর ঈশ্বরপ্রেম আর নারীপ্রেমের মধ্যে খুব বেশি দূরত্ব খুঁজে পান নি আবু সয়ীদ আইয়ুবের মতো দার্শনিক রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ।

অন্য সব ধর্মবিশ্বাসের মতো ইসলামি দর্শনচেতনাকে কেন্দ্র করেও রচিত হয়েছে এক বিশাল বর্ণমুখর সাহিত্য এবং সৃষ্টির জগৎ। শ্রেয় ও প্রেয়র দুর্নিরীক্ষ্য আধ্যাত্ম সংঘাতে কবির কল্পনালতায় সংবৃদ্ধ হয়েছে ইসলামের নিবিড় বিশ্বাস।

ইসলামি সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে অধ্যাপক জেমস ক্রিট্‌জেক বলেছিলেন: 'Islamic literature, at any rate, a literature of contrasts. It is a literature of scepticism and blind faith. It is a literature of economy and lavishness. It is a literature of strict form and hackneyed theme. Within so supple and even unwieldy a literature, the uninitiated reader will want to proceed cautiously and in possession of some maps' (Introduction to Anthology of Islamic Literature).

দেশে-দেশান্তরে ইসলামি দর্শন-ভাবনায় পরিপুষ্ট সাহিত্যের নানাবিধ বৈচিত্র্য বিভিন্ন সময়ে আমাদের মুগ্ধ করেছে। বাঙলা কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম থেকে ফরুখ আহমদ পর্যন্ত এ ধারার একটি সজীব প্রতিশ্রুতি আমরা লক্ষ করেছি। সম্প্রতিকালে আল মাহমুদের মতো শক্তিমান কবির কবিতায় ইসলামের যে আধুনিক বীক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, অন্য ধর্মের মানুষের কাছেও তা সমান আকর্ষণীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বিষয়বস্তু যাই হোক, নির্মাণ এবং আঙ্গিকে কবিকে অর্জন করতেই হবে সমকালীন রচনারীতির

কুশলতা আর সম্ভ্রম। দুঃখের বিষয়, কবি শঙ্খচিলের কাব্য-প্রয়াস মহৎ হলেও শিল্পসৃষ্টির এই প্রাথমিক শর্তটুকু অনুসরণ করার চেষ্টা করেন নি। 'তূরের আগুন' হচ্ছে সেই আগুন যার মাধ্যমে তূর পর্বতে হজরত মুসার (বাইবেলের মোজেস) সঙ্গে ঈশ্বর বাক্যালাপ করেন। শঙ্খচিলের ইচ্ছে ছিল সেই অলৌকিক সাক্ষাৎকারের রেশটুকু কবিতার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার। অর্থাৎ কিনা কবিতার শ্রুতিময় অগ্নিনির্যাস থেকে এক অত্যাশ্চর্য ঐশ্বরিক অনুভূতি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

হায়, সাধ আর সাধ্যের মধ্যে বিরাট ফাঁকি থেকে গেছে। গুটি কয়েক ইসলামি শব্দ আর মিথ্যের ব্যবহার করলেই ইসলামি দর্শনকে কবিতায় স্থাপন করা যায় না।

আমরা জানি, সাহিত্যের উত্তরাধিকার বলে একটি বস্তু আছে। কিন্তু এখনো যদি কেউ তাঁর কবিতায় নজরুল ইসলাম কিংবা সত্যেন দত্তকে নির্বিবাদে গ্রহণ করেন, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কবির ছন্দের হাতও খুব দুর্বল। আধুনিক বাঙলা কবিতার উজ্জ্বল প্রেক্ষাপটে নিজেকে নতুনভাবে তিনি আবিষ্কার করুন—এ প্রার্থনা করি।

নন তিনি ননসেন্‌স

সুকুমার রায়ের একশো বছর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বেরিয়েছে পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ছড়াসংকলন "একশো পিদিম জ্বলে"। ভালো লাগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, মৃদুল দাশগুপ্ত, আনন্দ বাগচী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সামসুল হক, কার্তিক ঘোষ, কিন্নর রায়, মুস্তাফা নাশাদ, সুখেন্দু মজুমদার প্রভৃতিদের ছড়া। প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছড়াটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

যা লিখেছ
শুনতে আবোল তাবোল
নেই কো কোনো মানে,
মুক্তো হেন
গভীর কথাটুকু
লুকিয়ে আছে
তার যে মাঝখানে !!

চিত্রকলা

চিত্রী-ভাস্কর দেবীপ্রসাদ

সমীর ঘোষ

১৯৮৮ ২১শে ডিসেমবর থেকে ১৯৮৯ ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত বিড়লা একাডেমীতে অনুষ্ঠিত হল শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর চিত্র এবং ভাস্কর্যের প্রদর্শনী। শিল্পীর মৃত্যুর পর এই প্রথম এত বড়ো প্রদর্শনের আয়োজন হল যা এ পর্যন্ত ভারতে কখনো হয় নি। দেবীপ্রসাদের শিল্পী-ব্যক্তিত্ব যত বেশি প্রচারিত, ঠিক ততখানি তাঁর শিল্প প্রদর্শিত বা প্রচারিত নয়। প্রদর্শনী দেখে সেই কথাই নতুন করে মনে পড়ল।

এক দেবীপ্রসাদ নানা দেবীপ্রসাদে ছড়িয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, শিকারে পটু, বাঁশি বাজানোয় দক্ষ, সাহিত্যের উৎসাহী রচনাকার। ভাস্কর্য আর চিত্ররচনায়ও তিনি ছিলেন সমান দক্ষ। এত সব গুণের সমাবেশে অনেকাংশেই তিনি রোমাঞ্চের নায়ক হয়ে উঠে-ছিলেন। কিন্তু এই নানা বিকাশের বৈচিত্র্যে তাঁর শিল্পসৃজনের প্রকৃত তাৎপর্য প্রায়ই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অথবা মূল আলোচনা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে তিনি হয়ে ওঠেন রূপকথার নায়ক। বিড়লা একাডেমীর প্রদর্শনীতেও নানা দেবীপ্রসাদকেই উপস্থিত করার চেষ্টা ছিল। চিত্র এবং ভাস্কর্যের বাইরে তাঁর চিঠিপত্র, সাহিত্যসম্ভার, ব্যবহৃত জিনিসপত্র, নানান প্রশংসাপত্র, এবং নানা টুকিটাকি। তবে দু-একটি চিঠি ছাড়াও বেশ কিছু ফোটোগ্রাফ এবং পুরানো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শিল্প-সম্বন্ধীয় চিত্র-আলোচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান।

দেবীপ্রসাদের পূর্ব সময় পর্যন্ত ভাস্কর্যের চরিত্রনির্ণয়ে অনেকেই 'ঔপনিবেশিক' চিহ্নে চিহ্নিত করেন। এই সময়ের ভাস্কর্যের রূপারোপে স্থূলরুচির বাবুয়ানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিম্নমানের গ্রীসীয়-রোমক নকলনবিশি। বাড়ির অন্দর বা বাগান সাজানোর জন্যই এই মূর্তিগুলি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হত। এ ছাড়াও সাহেবদের প্রয়োজনে বড়ো-বড়ো শহরে শাসক এবং দেশী-বিদেশী কৃতী পুরুষদের আবক্ষ এবং পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপনের চল হয়েছিল। গত শতকে কিছু-কিছু ভারতীয় তরুণ ভাস্কর্য-শাস্ত্র হাতে-কলমে শিক্ষা করার জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। এঁদের কাজেও বিলাতি প্রথার অনুকরণের সঙ্গে মিশেছিল তীব্র আবেগ এবং বিলাসী সস্তা চাহিদার প্রভাব। স্বদেশপ্রেমের জোয়ারে "ভারতীয়" ভাবনার বিকাশকালেও কিন্তু নব্য ভাস্কররা ভারতীয় ভাস্কর্যের অতীত-গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি দেন নি। এমনকী অবনীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চায় ভারতীয় বোধ যেভাবে কাজ করেছিল, এবং সেই ভাবনার সোৎসাহ সমর্থন যেভাবে এসেছিল, ভাস্কর্যের নব্য নির্মাণের ক্ষেত্রে তা ছিল অনুপস্থিত।

দেবীপ্রসাদই ভারতবর্ষের প্রথম ভাস্কর যিনি শুধুমাত্র কর্মশক্তি নয়, মননধর্মিতাকে ভাস্কর্যে নানাভাবে প্রয়োগ করেছেন। প্রতিকৃতি ও স্মারক-ভাস্কর্য তুলনায় সংখ্যাধিক হলেও তাঁর ব্যক্তি-অনুভবের স্বীয় ভাবনার প্রকাশও রয়েছে কিছু সৃষ্টিশীল কাজে। দেবীপ্রসাদের পূর্বেও শক্তিমান ভাস্করের আবির্ভাব ঘটেছে ভারতে। বিশেষত বাঙালি ভাস্কর হিসেবে ফণীন্দ্রনাথ বসু, প্রমথ মল্লিক, হিরণ্ময় রায়চৌধুরীর কাজে শক্তি এবং অনুভব দুয়েরই সমন্বয় ঘটেছিল। কিন্তু দেবীপ্রসাদের কাজেই আমরা প্রথম পাই বিলেতি প্রথাগত নৈপুণ্যের পাশে আটপৌরে জীবনের স্বাভাবিকতার ছোঁয়া। মসৃণ পেলবতার পাশে আবেগের রূঢ় বুনন। শুধু রূপে নয়, ভালোবাসায় তিনি ধরতে চেয়েছিলেন ভাস্কর্যের গড়নকে।

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কাছেই দেবীপ্রসাদের ছবি আঁকার হাতেখড়ি। পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিত্রাঙ্কনের শিক্ষানবিশি হয় ইতালীয় শিল্পী বয়েসের কাছে। দেবীপ্রসাদের ছবির ক্ষেত্রে এই দুই গুরুর প্রচ্ছন্ন প্রভাব দৃষ্টি এড়ায় না। অবনীন্দ্রনাথের ছবির রঙ, বিষয়ের উপস্থাপনভঙ্গি এবং স্বপ্নকল্পময় আবহ নির্মাণ দেবীপ্রসাদের ছবিতেও এসেছে নানা সময়ে বিচিত্র রূপারোপে। আবার তথাকথিত 'বেঙ্গল স্কুল' ঘরানার পেলব কোমল কিঞ্চিৎ বিকৃতিকরণের বিপরীতে পাশ্চাত্য শরীর-সংস্থানের যথাযথ উপস্থাপনকে ভারতীয় জলহাওয়ার রোমানটিক মেজাজে রূপান্তর দেবীপ্রসাদের ছবির লক্ষণ-চিহ্নে চিহ্নিত। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রকরণের প্রভাবে যাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই অবনীন্দ্রনাথের সক্ষমতা বা শিল্পবোধের পূর্ণতা ছিল না। ফলে ভাব এবং

আঙ্গিকের বাহ্যিক অনুকরণ সম্ভব হলেও তাতে অস্তিত্বের স্বতন্ত্র সত্তাপ্রকাশ সম্ভব হয় নি। শুধুমাত্র কিছু দুর্বল ছবি ছিদ্রান্বেষী সমালোচকগণের উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে রয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথের নিন্দায় এগুলিই ব্যবহৃত হচ্ছে। দেবীপ্রসাদের ছবি এর ব্যতিক্রম। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তিনি বুঝে নিয়েই স্বীয় পরিমণ্ডলের বিষয়কে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। শিল্পী নিজেই বলেছেন, 'অবনীন্দ্রনাথ রাঁচি, দার্জিলিং মুসৌরী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। বহুদিন পরে সেখানকার কোনো নৈসর্গিক অনুভূতি কোনো এক ছবির বিষয়বস্তু হয়ে স্থান পেয়েছে। আমার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত। যখনই যা দেখি, মন যা নেয় তখনই তা ছবিতে ফুটে ওঠে। কোনো এক বর্ষণমুখর সকালে সারারাত বৃষ্টিতে ভেজা একটি কাকের অসহায় করুণ অবস্থা আমাকে বেদনা দিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তা ছবিতে এঁকেছি।'—এই উক্তির সত্যতা তাঁর বহু চিত্র-ভাস্কর্যেই ছড়িয়ে আছে। কাহিনী বা আখ্যান নির্ভর স্বকল্পনার ছবি যে তিনি আঁকেন নি তা নয়, কিন্তু সেখানেও বস্তুরূপের সাদৃশ্যধর্মিতা, রক্তমাংসের অনুভূতি অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল। বস্তুরূপের গঠন-দৃঢ়তা, আলো-ছায়ার মায়াবী উদ্ভাস, উজ্জ্বল বর্ণ এসবই নিছক ভারতীয় শৈলীর অন্ধ বা সংকীর্ণ বেষ্টনীতে আবদ্ধ থাকে নি, বরং তা ইউরোপীয় শৈলীর কথাও স্মরণে আনে। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতেও এ প্রভাব বেশ ব্যাপক।

প্রদর্শনীর বেশ কিছু কাজ দেবীপ্রসাদের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের যোগ্য পরিচয়বাহী। যেমন, Pilgrim (34), Musafir (14), Two Peacocks (35), Life in Huts (17), Mother and Child (15), A Man under a Bamboo Tree (13) প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে ১৭ নম্বর ছাড়া সবগুলিই জলরঙে আঁকা। অবশ্য সবগুলি একই পদ্ধতিতে নয়, বিভিন্ন প্রয়োগকৌশলে ভিন্ন-ভিন্ন মেজাজ তৈরি হয়েছে। কখনো ভিজে জমিতে রঙ ছেড়ে হালকা রঙের বিস্তারী আভাস এনেছেন, কখনো ধোয়া-পদ্ধতির প্রয়োগে বিভিন্ন টোন বা পরদায় বিন্যস্ত আবহে ছবির রোমানটিক মেজাজ তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, ধোয়া বা ওয়াশ ছবিতে তিনি বিষয়বস্তুকে অনাবশ্যক রঙের আবেশে তলিয়ে যেতে দিতেন না। বরং বিষয়ের প্রয়োজনে যথাযোগ্যতার প্রতি অনুগত হয়েই পরিবেশ রচনা করতেন। এতে বর্ণের মালিন্যের পরিবর্তে আলো-আঁধারি জাদু তৈরি হত। এরকম একটি ছবির প্রকৃষ্ট উদাহরণ "প্রবাসী" পত্রিকায় মুদ্রিত ছবি 'সুরের পরশ'। প্রদর্শনীতে অবশ্য মূল ছবিটি ছিল না। এমন অনেক ছবিই মূলের পরিবর্তে মুদ্রণের স্বাদেই তৃপ্ত থাকতে হয়েছে। কালো কালিতে আঁকা কিছু ছবি ছিল যা দেবীপ্রসাদের প্রকাশভঙ্গিমার স্বতন্ত্র পরিচয়ের বাহক। এগুলিতে শুধু গঠনদৃঢ়তাই নয়, জৈব সত্তার সোচ্চার প্রকাশও ঘটেছে। ৩৫ নম্বর ছবিতে দুটি ময়ূরের ভঙ্গির চিত্রায়নে জলরঙের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এই ছবির গঠনে যে নিবিড় সূক্ষ্মতা এবং বর্ণদ্যুতি প্রকাশ পেয়েছে তা অবশ্যই দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে দেবীপ্রসাদের বেশ কিছু কাজ বিষয় ও প্রয়োগগত দিক থেকে অনেকের কাছেই হয়তো অতিমাত্রায় আবেগ বা স্থূলতার ছায়া নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু তৎকালীন চিত্রচর্চার প্রেক্ষাপটে এই ছবি অবশ্যই সময়ের দলিল হিসেবে ভিন্ন মাত্রায় চিহ্নিত হবার যোগ্য। দেবীপ্রসাদের ছবির বাস্তবতা শুধু গড়নে নয়, বস্তুর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের প্রতিও ছিল সমান সজাগ। তেলরঙেও শিল্পী ছিলেন সমান দক্ষ। যদিও এই প্রদর্শনীতে জলরঙের তুলনায় তেলরঙের ছবির মান খুব ভালো ছিল বলে আমার মনে হয় নি। একটি কাজে তাঁর দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। At Rest নামের ছবি। এতে স্বল্প আয়োজনে নদীতে নৌকার অবস্থান এবং মাঝির বিশ্রামের চিত্র যেন শুধু বিষয়ে নয়, উপস্থাপনার সারল্যে এবং রঙ ব্যবহারের স্বতঃস্ফূর্ততায় আশ্চর্য হতে হয়। এই ছবিতে যেন ইম্প্রেশনিস্ট রীতি ছায়া ফেলে। শুধু বিচারের তাগিদেই বিদেশী রীতির তুলনা করছি না। আঙ্গিকের ব্যবহারে যে সাফল্য, তাতে তাঁর দূর-বিস্তারী ভাবনারই প্রশংসা করতে হয়। Puza (38) নামের ছবিতে 'বেঙ্গল স্কুলের' রীতিতে আঁকা ছবিটিও তাঁর বিচিত্র পদ্ধতিরই উদাহরণ। এই ছবিটি টেম্পারায় আঁকা। মিউরালধর্মী এই ছবিটিতে পাশ্চাত্য বাস্তবতার কঠিন নিয়ম না মেনে স্বাভাবিক সরলতাকেই তিনি ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্রানুগ বৈশিষ্ট্য থাকলেও বিষয়ের কারণে কোনো বস্তুই বিশেষ প্রাধান্য পায় নি। ফলে সমগ্র পটে একটা ছন্দময় ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। অথচ অঙ্কনের সারল্যেও বাস্তবতার দৃঢ় ভূমি ভেঙে পড়ে নি।

চিত্রের মতো ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও দেবীপ্রসাদ সমান রোমানটিক এবং নাটকীয়। আগেই বলেছি 'ভারতশিল্পে'র যে ভাবনা অবনীন্দ্র-ভাবুকদের নাড়া দিয়েছিল তার প্রভাব

বা ভাবনার লেশমাত্র ছিল না সমসময়ের ভাস্কর্যে। ফলে মানবিক আবেদন বা নাটকীয়তা থাকলেও বিষয়ের রূপারোপে বা উপস্থাপনায় এবং নির্মাণকৌশলে পাশ্চাত্য ভঙ্গির প্রভাব বেশ প্রকটই ছিল। দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্যের রূপারোপে দেশজ প্রকৃতি প্রথম প্রকাশ পায়। ভাস্কর হিরণ্ময় রায়-চৌধুরীর কাছেই তিনি ভাস্কর্যের পাঠ নিয়েছিলেন। আমার ধারণা, দেবীপ্রসাদ চিত্রচর্চার পথ বেয়ে ভাস্কর্যে আসেন বলেই হয়তো তাঁর ভাস্কর্যে চিত্রের গঠন ও আখ্যানভঙ্গির একটা ক্ষীণ প্রভাব বরাবরই কাজ করেছে। যদিও তাঁর কমিশনের কাজের সংখ্যাই বেশি এবং এর মধ্যে বেশির ভাগই পোরট্রেট, তবু যে-কটি কম্পোজিশন তিনি করেছেন তা অবশ্যই বিশিষ্ট। ভাস্কর্যের মধ্যে When Winter Comes, My Father, Triumph of Labour প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিষয় অনুযায়ী যে অভিব্যক্তি কাজটিতে আছে তার প্রত্যক্ষ আবেদন যেমন সাধারণ দর্শককে তৃপ্ত করে, পাশাপাশি এই অভিব্যক্তি প্রকাশে শিল্পের গঠনগত কৃৎকৌশলও লক্ষণীয়। শরীরসংস্থানের দৃঢ় গঠনের সঙ্গে আছে বাহুল্যবর্জনের চেষ্টা। সমগ্র গঠনে বাস্তবতার চূড়ান্ত লক্ষণগুলিকে রেখে বাকি অনাবশ্যক ডিটেল-গুলিকে তিনি বর্জন করেছেন যা এই প্রদর্শনীতে My Father নামের বিশিষ্ট কাজেই সম্পূর্ণ মেলে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে রঁ্যার প্রভাব মনে এলেও এখানে দেবীপ্রসাদের উপস্থাপনের স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। Triumph of Labour নামের বহুখ্যাত ভাস্কর্যের আখ্যান এবং উপ-স্থাপনার চমক প্রবল। এই ভাস্কর্যেও শিল্পী দেবীপ্রসাদ ভাস্কর দেবীপ্রসাদকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এই কম্পোজিশনে আবেগ যত ব্যাপক নাটকীয় আবহ যত নিবিড় সে তুলনায় শিল্পব্যঞ্জনা কম। অর্থাৎ শরীরী উপ-স্থাপনায় চূড়ান্ত ডিটেল যেভাবে ব্যবহৃত তা ক্ষেত্রবিশেষে বিষয়ের গাম্ভীর্যকে আহত করে। অবশ্য এসবই বর্তমান সময়-প্রেক্ষিতে রুচিভঙ্গির ভিন্নতা মাত্র। দেবীপ্রসাদের বিভিন্ন ভাস্কর্যের মধ্যেই কোনো না-কোনো ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল আগামী আধুনিক ভাবনার মুক্তি। ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্তের কথনে কিছুটা সত্যি অবশ্যই আছে। তাঁর মতে—'He did not either make any effort towards innovating a new synthesised formal image pertaining to the contemporary world. This may be due to fact that in his later period he was over-burdened with commission works of popular appeal which possibly distracted him from his creative path. This indeed is a national tragedy.' এ অপ্রিয় সত্য মেনে নিয়েও বলা যায়, একদিকে অবনীন্দ্রধারার বিশেষ রীতিপদ্ধতিকে তিনি এক স্বতন্ত্র যুক্তি ও রীতির দৃঢ়তায় শক্ত ভিতে দাঁড় করিয়ে-ছিলেন, অন্যদিকে ভারতীয় ভাস্কর্যের নব্য রূপায়ণে নতুন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর সাফল্য।

মতামত

১

গোরবাচেভের বিশ্বদর্শন

মিখাইল গোরবাচেভের "পেরেসত্রোইকা : আমাদের দেশ এবং পৃথিবীর জন্য এক নতুন চিন্তা" দুনিয়া জুড়ে এক আলোড়ন তুলেছে। তাঁর ঘোষিত বৈদেশিক নীতির সাফল্য 'আংশিক নিরস্ত্রীকরণ' ইরান-ইরাক যুদ্ধবিরতির ঘোষণার মধ্যে দিয়ে সূচিত হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই গোরবাচেভের বৈদেশিক নীতি আমাদের মনোযোগ দাবি করে, এবং অল্প কথায় হলেও এই নীতির পর্যালোচনা একটা জরুরি কর্তব্য হয়ে ওঠে।

দুনিয়াকে নতুন চোখে ফিরে দেখা

কীভাবে দেখছেন গোরবাচেভ গোটা দুনিয়াটাকে? তাঁর 'নতুন চিন্তা' অনুযায়ী—'বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত নতুন ধারণাটি ২৭তম পার্টি কংগ্রেসে বিশদ করে উপস্থাপিত হয়েছে···ধারণাটি হল বর্তমান বিশ্বে দেশগুলির মধ্যে সবরকম প্রগাঢ় (profound) দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও, সবরকম মৌলিক মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, দেশগুলি **আন্তঃসম্পর্কিত, পারস্পরিক নির্ভরশীল** এবং **বিশ্ব অখণ্ড**।[১] [মোটা হরফ লেখকের]

বর্তমান বিশ্বকে এইভাবে 'নতুন চোখে' দেখা কতটা বিশ্ববিকাশের মার্কসবাদী সূত্রায়ণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? সাধারণভাবে, দেশগুলির আন্তঃসম্পর্ক, নির্ভরশীলতা এবং অখণ্ড বিশ্ব-র ধারণা মার্কসবাদবিরোধী নয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, গোরবাচেভ কীভাবে এই অখণ্ডতাকে বোঝাতে চাইছেন? তিনি বিশ্বের বর্তমান দ্বন্দ্বসমূহ, মৌলিক মতপার্থক্যসমূহের বিপরীতে আন্তঃসম্পর্ক, নির্ভরশীলতা এবং অখণ্ডতাকে উপস্থাপিত করেছেন। যেন, দ্বন্দ্ব-পার্থক্য এসব গৌণ; এবং নির্ভরশীলতা, অখণ্ডতা এগুলো মুখ্য।

কিন্তু বিকাশের নিয়মে এই যে বর্তমান অখণ্ডতা, তা কি স্থায়ী? অথবা, বিশ্বের বর্তমান অবস্থানের মূল চালিকা শক্তি কী? দ্বান্দ্বিক বিচারে 'দুই বিপরীতের ঐক্য এবং সংগ্রামে' সংগ্রামই চালিকা শক্তি। ঐক্য অস্থায়ী, সাময়িক; সংগ্রাম শাশ্বত। সুতরাং, বিশ্ববিকাশের যেটি মুখ্য চালিকা-শক্তি, তার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে, তার মৌলিক বিরোধ-গুলিকে খাটো করে তার বর্তমান অবস্থানের ঐক্যের দিকটিকে অর্থাৎ বর্তমান 'অখণ্ড' অবস্থানের ওপর জোর দেয়া আদৌ দ্বন্দ্বপ্রগতিতত্ত্ব অনুযায়ী বিকাশের সূত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। বরং তার বিপরীতে, বিশ্ববিকাশের পরিবর্তে গোরবাচেভের 'নতুন চিন্তা' বিশ্বে বর্তমান অবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই ওকালতি করে।

কিন্তু কেন দুনিয়াটাকে বিকাশের মৌল-সূত্রের বাইরে রাখার প্রয়োজন হয়ে ওঠে গোরবাচেভের? কারণ, তাঁর নিজেরই কথায়, 'এর প্রধান কারণ হল, মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যাটি। এ-সমস্যায় আমরা জড়িয়েছি, কারণ নিউ-ক্লিয়ার অস্ত্রসম্ভারের বিকাশ এবং তা প্রয়োগ করার হুমকি মানবজাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।'[২]

সুতরাং, বিপন্ন অস্তিত্বের তাড়নায় গোরবাচেভ 'মানবতা'কে সবকিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিতে এবং 'সহজাত বুদ্ধি'-র অনুসারী হয়ে 'খোলামেলা' হতে বলেছেন।

তাঁর 'নতুন চিন্তা'র সারকথা—পৃথিবী আর-একটা যুদ্ধের ভার বইতে পারে না, কারণ নিউক্লিয়ার যুগে আর-একটি যুদ্ধের অর্থ-ই হল ধনে-প্রাণে-মানে সমূহ বিনাশ। বিনাশের হাত থেকে পৃথিবীকে তথা মানবসভ্যতাকে রক্ষার খাতিরে আমাদের পুরনো অনেক ধারণা প্রয়োজনে ত্যাগ করতে হবে। নতুনভাবে ভাবতে গেলে, যুদ্ধ-শান্তি-বিপ্লব সম্পর্কিত এত-দিনকার প্রচলিত ধারণাগুলিকে 'সেকেলে' বলেই ধরতে হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, গোরবাচেভের 'নতুন সূত্রায়ণে'র পেছনে কাজ করছে নিউক্লিয়ার-যুদ্ধ-ভীতি।

তাঁর এই ভীতির বনিয়াদ কতটা দৃঢ়? ১৯৪৫-এ আমেরিকা প্রথম পারমাণবিক বোমা ফেলে জাপানে। তারপর ৪৩ বছর কেটে গেছে। অনেক সংকট ঘনিয়েছে, অনেকবার এ-বিশ্ব পারমাণবিক যুদ্ধের উপান্তে পৌঁছেছে। কিন্তু পারমাণবিক যুদ্ধ হয় নি। ১৯৪৯-এ চীন দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিতাড়িত করে। ১৯৫০-এ কোরিয়া, ৬০-এর দশকে কিউবা, ভিয়েতনাম-এর মুক্তিকামী মানুষ মারকিন সাম্রাজবাদকে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে। পরাজিত মারকিন সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু কোথাও পারমাণবিক বোমা ফেলে নি, ফেলতে সাহস পায় নি।

বিশ্বযুদ্ধ আর-একটা বাধে নি সত্যি, কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে 'আঞ্চলিক যুদ্ধ'-র ধারাবাহিকতাতে কখনই ছেদ

পড়ে নি। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার নানা অঞ্চলে গোটা বিশ্বই আজও এক রণাঙ্গন। আর এ-সমস্ত 'আঞ্চলিক যুদ্ধে' সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও কাজ করছে। কিন্তু কোথাও কোনো নিউক্লিয়ার-শক্তিই তার তথাকথিত 'চরম মারণাস্ত্র' প্রয়োগ করছে না। কেন করছে না, তার অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন করেছিলেন বলেই মাও-সেতুঙ সাম্রাজ্যবাদকে 'কাগুজে বাঘ' বলতে দ্বিধা করেন নি।

মূলধনী ব্যবস্থা শ্রমিকের শ্রম নিঙড়ে উদ্‌বৃত্ত মূল্য আদায় করে যেমন, একই উদ্দেশ্য তাকে যেভাবে প্রয়োজন সেভাবে বাঁচিয়েও রাখে। ঠিক সেইভাবেই সাম্রাজ্যবাদ তার অতি-মুনাফার স্বার্থেই বিশ্বের বিশাল বাজারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না - কারণ, সেটা করার অর্থ তার নিজেরও অস্তিত্বের বিলোপ। সাম্রাজ্যবাদ আর যাই হোক বদ্ধ-উন্মাদ নয় যে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ-অস্তিত্ববিলোপে তৎপর হবে।

আরও এক দিক থেকে বিষয়টিকে দেখা যায়। পারমাণবিক বোমা যতদিন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত ছিল, ততদিন এটা দেখিয়ে গোটা দুনিয়াকে ব্ল্যাকমেল করা হয়তো-বা অনেকটাই সম্ভব ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে পারমাণবিক অস্ত্রে তাদের একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটল সেদিন থেকে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্ল্যাকমেল করার ক্ষমতাও আর রইল না। কারণ, বিশ্বের অনেক দেশই এখন একে অন্যের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়ার অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষমতা ধরে। বাস্তব এই অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থেকেও কি কেউ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনার জন্যে অন্যকে নিউক্লিয়ার অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানতে পারে?

গোরবাচেভের 'নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিপদ'-এর বিপরীতে প্রশ্ন ওঠে—এই বিপুল বিশাল অস্ত্রসম্ভার সাম্রাজ্যবাদের কাছেই আজ বুমেরাঙ হয়ে দাঁড়িয়েছে—কাঁড়ি-কাঁড়ি অর্থ আটকে আছে এক বদ্ধজলায়, যা মূলধন-বিনিয়োগকে সীমায়িত করছে; বিঘ্নিত হচ্ছে অতি-মুনাফার স্বার্থ। যদিও অর্থনৈতিক মন্দার সময়েই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি কিংবা মহাকাশ গবেষণা চাঁদে যাওয়ার ধুম পড়ে যায়। কিন্তু এর পিছনে যে বিপুল লগ্নি তা যদি উদ্দেশ্যই পূর্ণ না করে তবে আর কী লাভ? গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা এই অস্ত্রসম্ভারের আজ আর নেই। সুতরাং দাও এই অকেজো অস্ত্র নষ্ট করে। একসময়ে যেমন অতি-উৎপাদিত পণ্য মুনাফার স্বার্থে জাহাজ-বোঝাই করে ফেলে দেওয়া হত সমুদ্রের জলে। আর সেজন্যেই নিরস্ত্রীকরণের ঢক্কানিনাদ—বিশ্বশান্তি-টান্তি বাজে কথা।

বস্তুত গোরবাচেভ পশ্চিমি দুনিয়ার কাছে 'বিকাশের জন্য নিরস্ত্রীকরণ' (Disarmament for development)-এর যে তত্ত্ব ফেরি করেছেন, তার মূল সুর অনেকটাই ওপরের প্রশ্নটিকে যথার্থতা দেয়।

এই প্রসঙ্গে নিউক্লিয়ার-প্রযুক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার প্রশ্নটিও বিচার্য। শুধুমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রই নয়, পারমাণবিক-প্রযুক্তির তথাকথিত কল্যাণকর প্রয়োগ নিয়েও আজ গোটা বিশ্ব আলোড়িত।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দেশে-দেশে যেসব পরমাণু-চুল্লি নির্মিত হয়েছিল, তার উৎপাদনপ্রক্রিয়ার প্রভাবে আজ মানব-সভ্যতা আর-এক সংকটের মুখে। এই চুল্লিগুলোর বর্জ্যসমূহ (nuclear waste) তেজস্ক্রিয়তায় পরিপূর্ণ। সেই বিপজ্জনক আবর্জনা কীভাবে নষ্ট করলে রেহাই পাওয়া যায়, তা এখনও ঠিক-ঠিক জানা যায় নি। সবদেশেই এই আবর্জনা আপাতত মাটির নীচে চাপা দিয়ে পাহারা বসানো হয়েছে। এর আবর্জনা ওর রাজ্যে চাপা দেওয়া নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ বেধেছে। সম্প্রতি ওই দেশের থ্রি মাইল আইল্যাণ্ড এবং সোভিয়েতে চেরনোবিলের দুর্ঘটনা পারমাণবিক চুল্লির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় করে তুলেছে। চেরনোবিল দুর্ঘটনা মোকাবিলায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি, সেই সোভিয়েত বিজ্ঞানী লেগাসভ অন্তিম শয্যায় রুশ সাহিত্যিক আদামোভিচকে জানিয়েছেন—সোভিয়েতে আরও চেরনোবিল হতে পারে। কারণ, আরও চোদ্দটা চুল্লি আছে চেরনোবিলের নকশায়। আর বাস্তবে এই চুল্লিগুলোর নির্মাণকাজের ত্রুটির জন্য দুর্ঘটনা এড়ানোর কোনো নিরাপদ ব্যবস্থা সত্যি-সত্যিই নেই। এসবের ফলে এবং তীব্র জনরোষে অস্ট্রিয়ায় নিষিদ্ধ হয়েছে পারমাণবিক চুল্লি; ৮৬-র পর আমেরিকা নতুন কোনো চুল্লি তৈরি করে নি; ইওরোপ জুড়ে বরাদ্দ ছেঁটে দেওয়া হচ্ছে পরমাণু-গবেষণায়। তাই বলা যায়, আমেরিকা এবং পশ্চিম ইওরোপে আজ পারমাণবিক-প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেই এসেছে ভাটির টান। যে সময়ে পারমাণবিক-প্রযুক্তিরই এই দৈন্যদশা, সেই সময়ে 'নিউক্লিয়ার যুদ্ধাতঙ্ক' কি বাস্তব অবস্থার সঠিক প্রতিফলন ঘটায়?

নিউক্লিয়ার-যুদ্ধ প্রসঙ্গে সবশেষে যে কথাটা আসে তা হল—একটা 'বিশেষ প্রযুক্তি'র (নিউক্লিয়ার অস্ত্র) বিকাশ

কীভাবে গোটা সমাজের খোল-নলচে আমূল পালটে দিতে পারে! সমাজবিকাশের স্বাভাবিক উপাদানগুলোকে একেবারে নতুন চোখে' পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে? এবং অনেক 'পুরনো' ধারণাকেই বাতিল করে দিতে হয়?

সমাজবিকাশের ধারায় প্রযুক্তি এবং সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস থেকে উদ্ভূত সংগ্রামের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা কী? প্রযুক্তি, না শ্রেণীসংগ্রাম—কোন্‌টি সমাজবিকাশের চালিকা শক্তিরূপে নির্ধারক উপাদান?

গোরবাচেভ এসব প্রশ্নের উত্তর দেন নি। কিন্তু তাঁর উক্তি যেন অতীতের প্রতিধ্বনি। প্রযুক্তিকে প্রধান করে দেখার ফলে মূলধনী ব্যবস্থার প্রথম যুগে কারখানা ধ্বংস করার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। গান্ধী শিল্পবিকাশের বিরোধী ছিলেন। আর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা কাউৎস্কি প্রলেতারিয়েতকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন সংগ্রামে যেহেতু বিরোধী পক্ষ অস্ত্র-প্রযুক্তিতে অনেক বেশি শক্তিশালী। মানুষ-সৃষ্ট প্রযুক্তিকে মানুষের থেকে বড়ো করে দেখা, তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দানব বানানো বস্তুবাদী মূল্যায়নে মানুষের যে ভূমিকা তাকে নস্যাৎ করে। সামাজিক বিন্যাসে শ্রেণীসংগ্রামই যে বিকাশের নির্ধারক উপাদান, এ-ধারণাকে খারিজ করে। এক কথায়, ইতিহাসও যে একটা বিজ্ঞান—তার বিকাশের একটা নিজস্ব নিয়ম আছে—এই বস্তুবাদী মার্কসীয় তত্ত্বকে পরিত্যাগ করে।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, 'নিউক্লিয়ার যুদ্ধাতঙ্ক'র বাস্তব ভিত যথেষ্ট দৃঢ় তো নয়ই, বরং বেশ খানিকটা অমূলকই। অথচ এই ধারণারই বশবর্তী হয়ে গোরবাচেভ ক্লাউজেভিৎসের 'যুদ্ধ রাজনীতির ধারাবাহিকতা অন্য উপায়ে (হিংসাত্মক)' এই মূল্যায়নকে 'সেকেলে' বলেছেন। যে কথা তিনি বলেন নি তা হল, প্রথম মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ-সময়ে লেনিন এই মূল্যায়নকে সঠিক বলেই পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যুদ্ধ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করবে, এবং দেশে-দেশে বিপ্লবগুলোই শান্তির গ্যারান্টি হবে। এই মূল্যায়ন এমন-কী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালেও অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক বিশ্বেও নিউক্লিয়ার জুজুর মিছে ভয় থেকে রেহাই পেলে দেখা যাবে—হয় যুদ্ধ বিপ্লব আনবে, নচেৎ বিপ্লব যুদ্ধ প্রতিহত করবে—এই ধারণা এখনও বাস্তবসম্মত।

নতুন দুনিয়ায় শান্তি

নতুন দুনিয়াতে 'আর যুদ্ধ নয়' এই নতুন আহ্বানে অবশেষে গোরবাচেভ শামিল হতে বলেছেন ব্যবস্থা-নিরপেক্ষ সব ধরনের রাষ্ট্রনেতাদের। কারণ, তাঁর মতে, আজ শ্রেণী-উর্ধ্ব মানবতার ভিত্তিতেই নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং তিনি জানেন, 'পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে যৌথ-ভাবেই আমাদের নিরাপদ পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে।'[৩]

কিন্তু এটা কি সম্ভব? গোরবাচেভের মতে, অবশ্যই সম্ভব। কারণ—সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ কখনই আর সেই চরম রূপ নেবে না যা কিনা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মৌল কারণ। বরং আজ তারা 'শান্তিপূর্ণ' পথে দুনিয়াটাকে নতুন ভাবে ভাগাভাগি করছে; নিজেদের মধ্যে মেতেছে প্রযুক্তি-প্রতিযোগিতায়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রযুক্তিগত এবং সাংগঠনিক পরিকাঠামোর (infrastructure) পরিবর্তন তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর করছে, এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলোর মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসছে।

এই সূত্রায়ণে দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে যে প্রধান দ্বন্দ্বসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছিল, তার একটি অর্থাৎ সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিসমূহের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে খারিজ করা হল।

এরপর সমাজতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বকেও একেবারে নতুন চেহারা দিলেন গোরবাচেভ। তাঁর কথায়, সমাজতান্ত্রিক এবং মূলধনচালিত দেশগুলোর মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সম্ভব। অতীতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এ কথা প্রমাণিত হয়েছিল। আর এখন নিউক্লিয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে এটা তো খুবই দরকারি। এরপর তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন—মূলধন-আশ্রিত অর্থনীতি কি সামরিকীকরণ না করে টিকতে পারে?—তাঁর মতে, পারে। জাপান তার একটি উদাহরণ। এবং এখানেই তাঁর নিজস্ব উদ্‌ভাবন 'বিকাশের জন্য নিরস্ত্রীকরণ'-এর বাস্তব সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

তাঁর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ক্ষেত্রে যদিও অবস্থা একটু ভিন্ন—পাহাড়প্রমাণ বৈদেশিক ঋণ এবং নয়া-ঔপনিবেশিক শোষণ দেশগুলোতে একটা বিস্ফোরক অবস্থা তৈরি করেছে, তবুও এসব দেশেও বৈষয়িক উন্নতির প্রতি নজর না দিয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলোর কোনো উপায় নেই।

সুতরাং আজ গোরবাচেভের মতে মূলধনশাসিত দুনিয়ার

সঙ্গে একযোগে অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক কাজ করা দরকার। বিশ্ব-অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানো দরকার, যেখানে সমাজতান্ত্রিক, মূলধনী এবং অনুন্নত দেশগুলোর সবার স্বার্থ রক্ষায় ভারসাম্য থাকে। তবেই 'নিরাপদ পৃথিবী' গড়ে তোলা সম্ভব—সম্ভব সম্পদশালী পৃথিবীর বাস্তব রূপ দেওয়া।

এখন তাঁর এই নতুন ফরমুলা যে বাস্তবে শ্রেণী-আপস, তা বোধ করি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর দরকার নেই। শুধু আপস করেই গোরবাচেভ থেমে থাকেন নি। তিনি বলেছেন—সে দেশ যেমন খুশি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিতে পারে। সমাজতন্ত্র কিংবা ধনতন্ত্রের ভালোমন্দ ভবিষ্যতে দেশে-দেশে জনগণ ঠিক করবে। আমরা কোথাও সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য সচেষ্ট হব না। সবশেষে এই যৌথ কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে মূলধনশাসিত দেশগুলোর যাতে কোনোরকম সংশয় না থাকে, তাই গোরবাচেভ তাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন—তৃতীয় বিশ্বে কোনোরকম বিস্ফোরণ যাতে না ঘটে, তা পর্যবেক্ষণ করার যৌথ দায়িত্ব তাঁরা নেবেন। আর—

'আমি বারবার ব্যাখ্যা করে বলেছি পশ্চিমি-স্বার্থের প্রতি আমাদের আদৌ বিরূপ মনোভাব নেই। আমরা জানি, আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতিতে, বিশেষ করে কাঁচামালের যোগানক্ষেত্র রূপে মধ্যপূর্ব এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, তৃতীয় বিশ্বের অঞ্চলগুলো এবং দক্ষিণ আফ্রিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই সংযোগ ছিন্ন করতে আমরা কোনো-মতেই চাই না। ঐতিহাসিকভাবে গঠিত এই পারস্পরিক আর্থিক-বন্ধনের স্বার্থতে ভাঙন ধরাতে উশকানি দেওয়ার কিছুমাত্র অভিপ্রায় আমাদের নেই।'[৪]

এই একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে গোরবাচেভের সামগ্রিক বৈদেশিক নীতির প্রতিফলন খুব সুন্দরভাবে ঘটেছে। কী চাইছেন গোরবাচেভ আসলে?

এতদিন সোভিয়েতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত হত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি এবং ভারত আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু-কিছু দেশের সাথে। মিশর কিংবা ইরাকে যে বাণিজ্য-সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল তা এখন ক্ষীণ। সুতরাং দেশের অর্থনীতিকে চাঙা করতে গেলে বিদেশের বাজার আজ গোরবাচেভদের বিশেষ প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মেটাতে তাঁরা যতদূর প্রয়োজন যেতে প্রস্তুত। সে প্রয়োজন মেটানোর জন্যেই গোরবাচেভ আপসমূলক 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা' মধ্যে সমস্ত পরস্পরবিরোধী স্বার্থের (সাম্রাজ্য-বাদ-সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ-তৃতীয় বিশ্ব, পুঁজিপতি-শ্রমিক, ভূস্বামী-কৃষক) ভারসাম্য রক্ষার সূত্র খুঁজে পান। বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়ানোর গোরবাচেভের এই নতুন দাওয়াই আসলে শ্রেণী-আপসের আরও খোলাখুলি প্রয়াস।

গোরবাচেভের এই 'নতুন চিন্তা'র মধ্যে নতুন তেমন কিছুই নেই। এর মূলকথা বহু আগে ১৯৫৬-তে বলে গেছেন গোরবাচেভের পূর্বসূরী নিকিতা ক্রুশ্চভ। তবে গোরবাচেভ আরও অনেক খোলাখুলি, আরও স্পষ্ট।

বাস্তবে, গোরবাচেভের বিদেশ-নীতি বিশ্ব-পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বস্তুবাদী চিন্তা অনুসরণ করছে না। খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস-নীতি নিয়েছে। দেশে-দেশে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নিরুৎসাহিত করছে। অর্থাৎ পৃথিবীটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই যেন থাকে, আর এক পা-ও না এগোয়—এই গোরবাচেভের মনোগত বাসনা।

যে গোরবাচেভ স্বদেশের অর্থনীতির অচলাবস্থাকে দূর করতে অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রস্তাব করেন পেরেসত্রোইকা (এক নতুন বিপ্লব); সেই তিনিই আবার বহির্বিশ্বকে অচল করে রাখতে চান তাঁর দেশের অর্থনীতিরই স্বার্থে—এই বৈপরীত্য চোখে লাগে না কি!

অনিন্দ্য সেন
কলকাতা

সূত্রনির্দেশ:

১. October and Perestroika : The Revolution Continues – Novosty Press Agency, p 59.
২. Ibid
৩. Ibid, p 64
৪. Perestroika, Mikhail Gorbachev, Fontana p 178

[অনুবাদ লেখকের। যেসব অনুচ্ছেদে গোরবাচেভের মতামতের সারকথা দেওয়া সেগুলো সবই 'October and Perestroika The Revolution Continues' এবং 'Perestroika'—বই দুটি থেকে সংগৃহীত। ঋণ স্বীকার—পথিক গুহ, রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে (১ জানুয়ারি, ৮৯) তাঁর 'ড্রাগনের লেজ নিয়ে খেলা' এবং 'স্বার্থপরতা আর গোপনীয়তার আড়ালে' রচনা দুটির জন্য]

২

নভেম্বর মাসের "চতুরঙ্গ"-তে গ্রন্থসমালোচনা বিভাগে খাজিম আহ্‌মেদ "জিন্না : পাকিস্তান—নতুন ভাবনা"—এই নামের শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত বইখানির বিস্তারিত এবং সুন্দর একটি আলোচনার এক জায়গায় (পৃ ৬৪৩) বলেছেন যে লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রায় **'গেলাম, দেখলাম, জয় করলাম'**-এর মতো মানসিকতার দ্বারা চালিত হয়ে ক্ষমতা-হস্তান্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি 'অশোভনভাবে ত্বরান্বিত করেন'। অবশ্যই আহ্‌মেদ সাহেব **গেলাম**, দেখলাম, জয় করলাম' এই তিনটি কথাতে জুলিয়াস সীজারের বিখ্যাত **'Veni, vidi, vici'**—এই তিনটি লাতিন শব্দের অনুবাদ দিতে চেয়েছেন। এতে সামান্য একটু অসঙ্গতি ঘটেছে। ঐ লাতিন তিনটি শব্দের প্রথমটি অর্থাৎ 'veni' (উচ্চারণ 'ভেনি', অসতর্কভাবে 'ভিনি' বলা হয়ে থাকে) শব্দটি এসেছে লাতিন ক্রিয়াপদ venire (ভেনিরে) থেকে, যার অর্থ 'আসা' (to come), 'যাওয়া' (to go) নয়। সুতরাং আহমেদ সাহেবের 'গেলাম, দেখলাম, জয় করলাম' হবে **'এলাম**, ইত্যাদি'। জুলিয়াস সীজার তাঁর প্রতিপক্ষ Pharnaces কে সহজেই পরাজিত করে **ঘটনাস্থল থেকেই Roman Senate-এ খবরটি এভাবে পাঠান—Veni** (এলাম), Vidi (দেখলাম), Vici (জয় করলাম)।

কল্যাণকুমার দত্ত
কল্যানী, নদীয়া

নাটক

বিবিধের মাঝে মিলন

পঞ্চম জাতীয় নাট্যমেলা

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

[প্রথম অংশ গত সংখ্যায় প্রকাশিত]

৩. মারাঠি নাট্য : পরীক্ষামূলক ও পেশাদারি

"ঘাসিরাম কোতওয়াল", "কন্যাদান", "ডাকঘর", "ওয়াড়া চিরেবন্দী" ইত্যাদি প্রযোজনা দেখার পর মারাঠি থিয়েটার সম্বন্ধে বাঙলার দর্শকের একটা প্রত্যাশা জন্মেছে। নাট্যমেলার দ্বিতীয় দিন (৪ঠা ডিসেম্বর) সকালে বম্বের "রূপভেদ"-এর প্রযোজনা "আত্মকথা"-য় তা পূর্ণ হলেও ওই একই সন্ধ্যায় বম্বেরই দল "রঙ্গ-যাত্রী"-র "অগ্নিপঙ্খ" দেখে তা হতাশায় পর্যবসিত হল। পাশাপাশি "আত্মকথা" এবং "অগ্নিপঙ্খ"-এর অভিজ্ঞতা মারাঠি পরীক্ষামূলক এবং পেশাদারি থিয়েটারের মূল পার্থক্যগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে। একদিকে আধুনিক জীবনের জটিল স্তরগুলিকে বোঝার আন্তরিক প্রয়াস, বুদ্ধিমান আর সংবেদনশীল প্রযোজনাশৈলী, সংযমী অথচ মরমি অভিনয় ; অন্যদিকে সামাজিক সমস্যার সরলীকৃত রূপায়ণ, নিম্নরুচির অতিনাটকীয় উপস্থাপনা, উঁচু বাহ্যিক চরিত্রায়ণ। আশ্চর্য এই যে, সকালের প্রযোজনায় যে প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী অমন উচ্চমানের অভিনয় করলেন, সন্ধ্যার মঞ্চায়নে তাঁরাই কখনো মাত্রাধিক্যে, কখনো 'টাইপ'-অভিনয়ে দর্শককে দূরে সরিয়ে রাখলেন। এটাকে তাঁদের কৃতিত্ব বলেই মানতে হবে ; কারণ, একই সঙ্গে দুই থিয়েটারের দাবি তাঁরা মিটিয়ে চলছেন। একই ধরনের অনায়াস বিচরণ আধুনিক ভারতীয় সিনেমাতেও দেখা যাচ্ছে—আর্ট ফিলম আর কমারশিয়াল ফিলমের জগতে।

মারাঠি থিয়েটারের সঙ্গে বাঙলা থিয়েটারের একটা বড়ো ফারাক—প্রথমটিতে নাট্যকারের প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে পরিচালকের। আধুনিক মারাঠি নাট্যকারদের মধ্যে মহেশ এলকুঞ্চওয়ার একটি উজ্জ্বল নাম। কলকাতার দর্শক "ওয়াড়া চিরেবন্দী"-র মাধ্যমেই তাঁকে চিনেছিলেন, কিন্তু সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল "আত্মকথা"য়। এ নাটকের বিষয়বস্তুর বিন্যাসটি দ্বিস্তর। প্রাথমিক স্তরের কেন্দ্র মানবিক সম্পর্ক, দ্বিতীয় স্তরে জীবন আর শিল্পের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব। সত্তরোর্ধ্ব প্রতিষ্ঠিত লেখক রাজাধ্যক্ষের জীবন আর কর্ম বিষয়ে গবেষণা করছে তরুণী প্রদ্না (প্রড়না ? প্রজ্ঞা ?)। গবেষণার একটি অংশ রাজাধ্যক্ষের আত্মকথা লিপিবদ্ধ করা। প্রায় দুই প্রজন্মের দূরত্ব থেকে প্রদ্না এই প্রবীণ লেখকের জীবনের ভাঁজগুলো খুলে দেখতে চায়। আর তখনই উদ্‌ঘাটিত হয় রাজাধ্যক্ষের জীবনের কেন্দ্রীয় দুই নারীর সঙ্গে সম্পর্কগঠনে তাঁর ব্যর্থতা। স্ত্রী উত্তরা আর প্রেমিকা শ্যালিকা বাসন্তী দুজনেই রাজাধ্যক্ষকে ছেড়ে চলে গেছে। একজন গেছে অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে, অন্যজন রাজাধ্যক্ষেরই প্রতিদ্বন্দ্বী এক লেখককে ভালোবেসে। বাসন্তীর দ্বিতীয় প্রেমিক দেবদত্ত মৃত, কালের বিচারে সে এখন মহান লেখক। নিজের জীবনের এই যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা রাজাধ্যক্ষ ইতিপূর্বেই লিখেছেন এক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে, যে উপন্যাসে উত্তরা ঊর্মিলা, বাসন্তী বসুধা আর দেবদত্ত চারুদত্তে পরিণত। প্রদ্নার কাছে নিজের কথা বলতে-বলতে রাজাধ্যক্ষ বুঝতে পারেন মানুষ হিসেবে অপর মানুষের প্রতি দায়িত্বে তিনি যেমন ব্যর্থ, তেমনি ব্যর্থ শিল্পী হিসেবে জীবনের সত্য রূপায়ণে। কুড়ি বছর আগে লেখা আত্মজীবনীনির্ভর উপন্যাসে মূল মানুষগুলো তাঁরই অবচেতন কল্পনায় রূপান্তরিত। নিজের শিল্প এবং জীবন সংক্রান্ত এইসব সমস্যা নিয়ে তিনি যখন বিভ্রান্ত, তখনই তিনি আবিষ্কার করেন তাঁর প্রতি যুবতী প্রদ্নার দুর্বলতা। প্রদ্না যুবক প্রমোদের বাগ্‌দত্তা প্রেমিকা—অন্তত রাজাধ্যক্ষ

তাই জানতেন। এই আকস্মিক আবিষ্কারে রাজাধ্যক্ষ প্রচণ্ড আঘাত পান। প্রদ্‌নাকে ফিরে যেতে বলেন প্রমোদের কাছে। খোলা জানালার সামনে, তারাভরা অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রদ্‌নাকে তিনি বলেন—ওই গ্রহতারকাগুলি যেমন পরস্পর থেকে হাজার-হাজার আলোকবর্ষ দূরে স্থিত, মানুষও তেমনি পরস্পর থেকে ঠিক ততটাই দূরে অবস্থিত। তাই মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙতে নেই, গড়ে তুলতে হয়। প্রকৃত আত্মকথা লেখা যে তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, রাজাধ্যক্ষ তা ইতিপূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। এখন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রদ্‌না বিদায় নেবার পর তিনি স্ত্রী উত্তরাকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। ওদিকে উত্তরাও তখন তাঁকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন, তাঁদের তিনজনের অন্ধকার দ্বন্দ্বচ্ছিন্ন জীবনে একটিমাত্র আনন্দের বার্তা জানাতে—যে বার্তা তিনিও এইমাত্র জেনেছেন—বাসন্তীর গর্ভের সন্তান দেবদত্তের নয়, রাজাধ্যক্ষের। যোগাযোগ হয় না, হতাশ ক্লান্ত রাজাধ্যক্ষ যখন নিজের চেয়ারে নিদ্রাচ্ছন্ন (হয়তো মৃত্যুর ব্যঞ্জনাও আছে সেই গভীর নিদ্রায়) তখন উত্তরার সুসংবাদ বহন করে ফোন বেজেই চলে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধানে কোনো সংযোগের সেতু তৈরি হয় না।

শ্যাম ভুতকারের মঞ্চসজ্জায় বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। মঞ্চের দুই ধারে দুটি ভিন্ন বাসস্থানের আভাস—ডানদিকে রাজাধ্যক্ষের পড়ার ঘর, বাঁদিকে উত্তরার বসার ঘর। মাঝখানে শূন্য অনালোকিত অংশটি যেন সেই হাজার হাজার আলোকবর্ষের দ্যোতক, যা একজন মানুষকে আরেকজনের থেকে দূরে রাখে। এই মাঝের অংশটির একেবারে সামনে একটি অনতি-উচ্চ গোল চবুতরা। এখানেই ফ্ল্যাশব্যাকের চিরপরিচিত অথচ প্রয়োগের গুণে অভিনব উপস্থাপনা দেখা যায়, আবার অতীতের বাস্তবের পাশে উপস্থিত হয় শিল্পের কল্পিত বাস্তব। এই দুইয়ের দ্বান্দ্বিক পরিবেশনে শিল্প এবং জীবনের সম্বন্ধের জটিলতা যেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, মানবিক সম্পর্কের গভীর সংকটগুলিও তেমনি পরিস্ফুট হয়। আলোর ব্যবহারে কুমার সোহনী তিনটি পরিষ্কার বিভাজন করেছেন—তিনটি আলাদা রঙে তিনি বর্তমান, অতীত আর কল্পনার স্তরকে ধরেছেন। প্রযোজনাটিতে সঙ্গীতের ব্যবহার প্রায় অনুপস্থিত, শুধু নাটকের একেবারে শেষে যবনিকাপতনের মুহূর্তে টেলিফোনের বেজে-চলা আওয়াজ ছাপিয়ে বেজে ওঠে একটি মর্মভেদী সুর।

এ প্রযোজনার সবচেয়ে প্রশংসনীয় অংশ অভিনয়। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী এত সাবলীল সংবেদনশীল অভিনয় করেছেন যে সত্যিই ভ্রম হয় যে ঘটনাগুলি এই প্রথম দর্শকের চোখের সামনে ঘটে চলেছে। অভিনয়ের গুণে অসাধারণ কয়েকটি মুহূর্ত সৃষ্টি হয় প্রযোজনায়—দুই বোন, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘাতে, কিংবা যখন উপন্যাসের ঊর্মিলা আর বসুধা লেখকের কল্পনায় এসে উপস্থিত হয়—লেখক তাদের বাস্তবের উত্তরা ও বাসন্তী বলে ভুল করেন, কিন্তু তারা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দাবি করে (এই অংশটি প্রায় পিরান্‌দেলীয় বাস্তবজিজ্ঞাসার স্তরে উন্নীত হয়) অথবা যেখানে প্রদ্‌না আবেগপূর্ণ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে লেখককে আর সাপের ছোবল খাওয়ার মতো চমকে সরে যান রাজাধ্যক্ষ। তীব্র আবেগের সঙ্গে প্রবল সংযমের ব্যবহারে উত্তরার ভূমিকায় জ্যোতি সুভাষচন্দ্র অনবদ্য, রাজাধ্যক্ষরূপী শ্রীরাম লাগু সহজাত সাবলীলতায়, অভিব্যক্তি ও কণ্ঠের সার্থক ব্যবহারে কখনো তিরিশ বছর আগের মধ্যবয়স্ক লেখক, কখনো বর্তমানের প্রবীণ মানুষটি। সুহাস যোশীর অভিনয় বুদ্ধিদীপ্ত নিশ্চয়, কিন্তু তাঁকে যেন আরও ভালো লেগেছিল "কন্যাদান"-এ। প্রযোজনার কনিষ্ঠতমা শিল্পী শুভাঙ্গী সাওয়াই অনুভূতিপ্রবণ অথচ স্বাভাবিক অভিনয় উজ্জ্বল। প্রযোজনার প্রতিটি স্তরেই নির্দেশিকা প্রতিমা কুলকার্নি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সব অর্থে "আত্মকথা" একটি সার্থক নাট্যপ্রযোজনা, যা "ওয়াড়া চিরেবন্দী"-র মতো বহুদিন কলকাতার দর্শকের স্মৃতিকে ভরিয়ে রাখবে।

এক ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বিরতিহীন সংহত "আত্মকথা"র পর দু-ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের গড়িয়ে-চলা "অগ্নিপঙ্খ" দেখতে বেশ ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। প্রভাকর মায়করের নাটকটির উপজীব্য সামন্ততান্ত্রিক জমিদারশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের সঙ্গে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের আধুনিক মূল্যবোধের সংঘাত। বিষয়বস্তু অত্যন্ত সরলীকৃত এবং একমাত্রিক হলেও, কাহিনীটি জটিল এবং কখনো একঘেয়ে। নাটকের কেন্দ্রে ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য এবং অহঙ্কারের প্রতীক বাঈসাহেব, যিনি নিজের চিতপাবন বংশের উত্তরাধিকারকে মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেন না।

দুর্বলচরিত্র মদ্যপ স্বামী ও শহরে কলেজে-পড়া শিক্ষিত ছেলেমেয়ের ওপর তাঁর একাধিপত্য প্রশ্নাতীত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আঘাত আসে নতুন প্রজন্মের তরফ থেকেই, মেয়ে প্রেমে পড়ে তাদেরই পরিচারকের পৌত্রের সঙ্গে, আর ছেলে লুকিয়ে বিয়ে করে আনে কায়স্থ মেয়েকে। পুত্রবধূ সুনীতাই আচারবিরুদ্ধ আধুনিক ব্যবহারে শাশুড়ির ক্ষমতাকে অস্বীকার করে। অসাধারণ কূটবুদ্ধি আর ব্যক্তিত্বের সাহায্যে বাঈসাহেব একই সঙ্গে ব্যবসায়িক ও পারিবারিক সমস্যার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর আভিজাত্য আর অহঙ্কারের দুর্গ টিকিয়ে রাখেন। কিন্তু ইতিহাস এবং সময়ও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে—পুনের ব্রাহ্মণের হাতে গান্ধিজী খুন হওয়াতে যে দাঙ্গা লাগে, তার থেকে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ব্রাহ্মণ পরিবারের মতো বাঈসাহেবের পরিবারও রক্ষা পায় না। পরের প্রজন্মটি শহরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। চারপাশের ছড়িয়ে-পড়া আগুন যখন রাওসাহেব ও বাঈসাহেবের প্রাসাদ স্পর্শ করে, তখন অগ্নিপঙ্খ পাখির মতো বাঈসাহেব স্বামী-সহ সেই আগুনে আত্মাহুতি দেন। প্রযোজনার শুরুতে মনে হয়েছিল নাটকটি বুঝি জাতিভেদ-বিরোধী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের প্রতিনিধি বাঈসাহেবকে যেন ট্র্যাজিক নায়িকার পর্যায়ে উন্নীত করে। আসলে পুরো নাটকটাই একদিকে যেমন জাতিভেদসমস্যার সরলীকৃত রূপায়ণ, অন্যদিকে তেমনি বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

প্রযোজনার কোনো অংশেই কোনো গভীরতা নেই। বরং দু-এক জায়গায় দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য হাস্যরসের উপাদান রাখা হয়েছে। বাঈসাহেব যে রাওসাহেবের ওপর কর্তৃত্ব করেন—এই অবস্থাটিকে নিংড়ে কোথাও-কোথাও হাসি বার করবার প্রয়াস আছে। অন্যত্র পরিচারক রঘুকে কেন্দ্র করেও হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায়। ভি. জি. গড়সের মঞ্চসজ্জা অহেতুক আড়ম্বরে পূর্ণ। তাতে নেই কোনো কল্পনা বা বুদ্ধির স্পর্শ, শুধু আছে অতি-অলঙ্করণের প্রবণতা। এ ছাড়া মঞ্চপরিকল্পনার মধ্যে একটা গতানুগতিকতার ছাপ আছে। তবে ওরই মধ্যে বাঈসাহেবের চেয়ার ও পাশের প্রতীকী থামদুটি সামান্য দ্যোতনা আনে। ওইদিন সন্ধ্যায় আলো নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছে। শুরুতেই মঞ্চের পেছনের একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায় সাইক্লোরামাটি সারা নাটকে আর ব্যবহার করা যায় নি। কিন্তু বাধাবিপত্তি বাদ দিয়েও, আলোকপরিকল্পনা অত্যন্ত সাধারণ। নাটকের শেষে মঞ্চের নানা স্থানে ম্যাগনেশিয়াম ও সালফারের সাহায্যে ধোঁয়া আর আগুনের বিভ্রম সৃষ্টি করা শুধুমাত্র কল্পনাশক্তির দারিদ্র্যকেই প্রকাশ করে। এই প্রযোজনায় সঙ্গীতের বেশ ব্যাপক ব্যবহার আছে। নাটকের শুরুতে আর শেষে, যবনিকার উত্থান আর পতনের সঙ্গে সঙ্গে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার মাঝে, এমনকী ঘটনার বা সংলাপের গুরুত্ব কিংবা আবেগময়তা বোঝাতেও সঙ্গীতের ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সুখের কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেতার বা সরোদ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। সঙ্গীত প্রধানত রাগাশ্রিত। পোশাকে ঝকঝকে রঙ ব্যবহৃত হয়েছে।

পরিচালক হিসেবে কুমার সোহনীর ব্যর্থতা সবচেয়ে প্রকট অভিনেতাদের ক্ষেত্রে। রাওসাহেবের ভূমিকায় শ্রীরাম লাগুর অভিনয় অতিকৃত, যদিও এই চরিত্রের দুর্বলতা, স্বাভাবিক কোমলতা চিত্রনে তিনি সার্থক। বাঈসাহেবের চরিত্রে সুহাস যোশীর অভিনয় বড়ো একমাত্রিক, ব্যক্তিত্বের যথার্থ প্রকাশ থাকলেও, বয়সের ছাপ চরিত্রায়ণে অনুপস্থিত। অন্যান্য ভূমিকাভিনেতাদের মধ্যে ভৃত্য রঘুর ভূমিকায় বাজিরাও গোফলকার ও ম্যানেজারের ভূমিকায় মধুকর নাইকের নাম শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে।

অভিনয়ের মান থেকে প্রমাণিত হল যে এইসব পেশাদারি দলগুলিতে দু-একজন শিল্পীর বক্স অফিসের ওপর নির্ভর করে বাকিদের কাজ-চালানো গোছের অভিনয় করিয়ে নিলেই চলে। "ওয়াড়া চিরেবন্দী"-ও যতদূর জানি, মারাঠি পেশাদার মঞ্চেরই নাটক। অথচ শুধুমাত্র পরিচালকভেদে কতটা তফাত হতে পারে "অগ্নিপঙ্খ" তার প্রমাণ। তবু কোনো অভিজ্ঞতাই ফেলে দেবার নয়—এই বলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যেতে পারে। একটা ছোট্ট প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। অভিনয়ের শুরুতে ও বিরতির পরে প্রেক্ষাগৃহের বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটি ছাড়াও মঞ্চের ওপর একটি প্রকৃত পেতলের ঘণ্টা বাজানো হচ্ছিল। অভিনয় চলার সময় ঘণ্টাটি সারাক্ষণ কিছু ফুলসহ মঞ্চের সামনে বসানো ছিল। বাস্তবানুসারী প্রযোজনা, মঞ্চ, অভিনয় ইত্যাদি পাশাপাশি প্রাচীন

নাট্যরীতির ঐতিহ্যবাহী ঘণ্টা আর ফুল দেখে কৌতূহল হচ্ছিল জানতে যে ওটা কি পেশাদারি নাটকের কোনো সংস্কারের সঙ্গে জড়িত ?

৪. মূল্যবোধের নাটক

আলোচনার শেষ দুটি নাটকের মধ্যে ভাষাগত, বিষয়গত, আঙ্গিকগত বা প্রযোজনাগত কোনো মিল নেই। তবু এই নাটক দুটির মধ্যে একটি ক্ষীণ সংযোগ আছে। কারণ, দুটি নাটকই সামগ্রিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের নাটক। ৫ই ডিসেমবর সন্ধ্যায় অভিনীত "হত্যা এক আকার কি"-র প্রযোজক দিল্লির "অভিযান" নাট্যসংস্থা, লেখক ললিত সেহগাল ও নির্দেশক রাজিন্দার নাথ, যিনি এই নাট্যমেলায় সম্মানিত নাট্যব্যক্তিত্বদের একজন। নাটকটি "অভিযান" সংস্থার প্রথম প্রযোজনা—১৯৬৭ অর্থাৎ একুশ বছর আগে এটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

১৯৪৮ সাল। মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত চার যুবক। যাত্রারম্ভের মুহূর্তে তাদেরই মধ্যে একজন প্রশ্ন তোলে—এই হত্যা ন্যায়সঙ্গত কি না ? তার সংশয় কাটাতে বসে একটি কাল্পনিক বিচারসভা যেখানে সংশয়ান্বিত যুবকটিই গান্ধিজীর প্রতিনিধি। গান্ধিজীর বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, নির্দেশ এবং কাজ নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন তোলে প্রতিপক্ষ। গান্ধিজীকে অভিযোগের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে যুবক নিজেই যেন গান্ধিজীর সত্তার সঙ্গে মিলেমিশে যায়, গান্ধিজীর আদর্শের বাণীগুলিই উচ্চারিত হতে থাকে তার কণ্ঠ থেকে। প্রতিপক্ষের সাক্ষী, উকিল, মায় পক্ষপাতদুষ্ট বিচারপতি যখন পারেন না এই আদর্শের সঙ্গে লড়তে, তখন যুবকটিকে হত্যা করে তারা আরও একটি হত্যার চেষ্টায় নির্গত হয়। মৃত যুবকটি কিন্তু মরে না, মরে শুধু তার "আকার" তার কায়িক শরীর ; কিন্তু তার চেতনা, তার বিবেক, তার আদর্শ বেঁচে থাকে সমস্ত মানবজাতির বিবেক হয়ে। সমস্ত নাটকীয় অবস্থাটিই কল্পিত। এই বানানো বিচারসভা বসিয়ে নাট্যকার শুধু গান্ধিজীর হত্যার পক্ষ বা বিপক্ষের কারণগুলিই বিশ্লেষণ করেন না, এইজাতীয় "অন্ধ" রাজনৈতিক ঘৃণাকেই নিন্দাবাদ জানান। কুড়ি বছর আগের নাটক; তাই আজকের এই রাজনৈতিক দলাদলি আর ধর্মীয় মৌলবাদের যুগে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারত। হল না যে, তার প্রাথমিক কারণ নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয়ের দুর্বল উপস্থাপনা। সাধারণত নাটক তৈরি হয় সংঘাতের মাধ্যমে। সেই সংঘাতে যদি দুই পক্ষের সমতা না থাকে, যদি তা হয় একপেশে, নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি যদি না হয় নৈর্ব্যক্তিক, তবে তা কূটতর্ক বা বক্তৃতা হয়ে উঠতে পারে, নাটক হয় না। গান্ধিজীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয় সেগুলি বাস্তব রাজনৈতিক-সমস্যানির্ভর, অথচ এর উত্তর আসে সম্পূর্ণ বিমূর্ত আদর্শের স্তরে। রাজনীতিতে আদর্শের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে, কিন্তু বাস্তবের দাবি না মানলে তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক তত্ত্ব হয়ে ওঠে, সাধারণ জীবনে ব্যবহার্য হয় না। নাটকটিতে এমনভাবে গান্ধীজি আর তাঁর কর্মজীবনকে উপস্থিত করা হয়েছে যাতে মনে হয় তিনি আদর্শবাদী দার্শনিক হিসেবে সার্থক হলেও, রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে ব্যর্থ। আর বাস্তববাদী রাজনীতির পাশে আদর্শের বাণীগুলি মহৎ এবং জোরালো শোনালেও, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। পুরো নাটকটিতে গান্ধিজী আর তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আদর্শায়িত করা হয়েছে, রোমানটিসাইজ করা হয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয় নি। খ্রীষ্ট ও লিঙ্কনের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে মানবস্বার্থের শহীদ বানানো হলেও, তাঁর প্রকৃত মুল্যায়নের কোনো প্রয়াসই করা হয় নি। শুরু থেকেই গান্ধিজীর প্রতি অন্ধ পক্ষপাত নাটকের বক্তব্যকেই শুধু যুক্তিবিরহিত করে তোলে নি, তার নাট্যসত্তাকেও হীনবল করেছে।

প্রযোজনা নাটকটিকে কোনোভাবেই সাহায্য করে নি। নিরাভরণ মঞ্চের মাঝখানে একটি নীচু চবুতরা, বাঁদিকে উইংস বেয়ে উঠে গেছে একটি সিঁড়ি, এ ছাড়া আছে গোটাকয়েক চেয়ার আর একটি টুল। সিঁড়িটা মাটির তলার গোপন কক্ষের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেও, নাট্যক্রিয়ায় অন্য কোনো ভাবে প্রয়োজনীয় নয়। আলোর ব্যবহারে কোনো নতুনত্ব নেই, নেই তেমন কল্পনার স্পর্শও। সঙ্গীতপরিকল্পনা কিন্তু বেশ উন্নত মানের। পরদা খুলতেই পাখওয়াজ-জাতীয় কোনো বাদ্যযন্ত্রে গুম-গুম শব্দ একটা গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করে। ওই একই

ধরনের সঙ্গীত ব্যবহার করা হয় কল্পিত বিচার চলার সময়—বিচারের আবেষ্টনী থেকে বর্তমান বাস্তবে সরে আসা এবং ফিরে যাওয়া চিহ্নিত করতে। খটকা লাগে সাউনডট্র্যাকের ব্যবহারে—যে সাউনডট্র্যাকে বিচার-সভায় আগত সাধারণ মানুষের কণ্ঠ ভেসে আসে—অভিনয়ের ধরনে পরিষ্কার হয় যে তাঁরা উপস্থিত দর্শকবৃন্দ—সেই সাউনডট্র্যাকেই কী করে বাজে নাটকের একটিমাত্র গান (গানের ওরমুখী বোল কি সমকালীন কোনো প্রাসঙ্গিকতা বহন করে?) যে গানের করুণ সুরে গান্ধিজীর স্বপ্নের ব্যর্থতার দুঃখ ঝরে পড়ে? তা ছাড়া, দর্শককে যখন বিচারসভার মানুষ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে, অভিনেতারা যখন কিছু মন্তব্য তাঁদের দিকেই ছুঁড়ে দিচ্ছেন; তখন নেপথ্যকণ্ঠ ব্যবহার না করে, অন্য কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে দর্শকের মধ্যে বসিয়ে রাখলে সমস্ত নাটকীয় অবস্থাটাই আরো জীবন্ত হয়ে উঠত না কি? সেই দিনের প্রযোজনায় টেপরেকর্ডারটি বেশ কয়েকবার বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল।

অভিনয় খুবই সাদামাটা। সত্যি বলতে গেলে, অভিনেতাদের খানিকটা অপ্রস্তুত বলেই মনে হল। মহড়ার অভাব বা অনভ্যাসের ফলেই সংলাপ বলায় বা ধরতাই (cue) লুফে নিতে এমন ভুল হয়। নাটকটির সঙ্গে বিষয়বস্তুতে কাম্যুর "দ্য জাস্ট" ও আঙ্গিকে তেণ্ডুলকরের "জান্ততা কোর্ট চালু আহে"র সাদৃশ্য আছে। প্রযোজনার ধরনে ষাট দশকের নাট্যভাবনার প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু দুর্বল অভিনয়ের জন্য এটিকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযোজনার সমমানের বলে মনে হয়। এত জরুরি আর প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়ের এমন নীচুদরের উপস্থাপনা—নাটক এবং প্রযোজনা, দু ক্ষেত্রেই দেখে দুঃখ হয়।

নাট্যমেলার পঞ্চম দিনে, ৬ই ডিসেমবর সন্ধ্যায়, মঞ্চস্থ হল পশ্চিম বাঙলার সাম্প্রতিক প্রযোজনাগুলির মধ্যে অন্যতম "গান্ধার"-এর "নীলাম নীলাম"। আর্থার মিলার-এর ইংরাজি নাটক "দ্য প্রাইস" অবলম্বনে এই রূপান্তর করেছেন নাটকটির পরিচালক অসিত মুখোপাধ্যায়। রূপান্তরিত হলেই নাটক সবক্ষেত্রে জাতীয় জীবনে আত্মীকৃত হয়ে ওঠে না—ওঠে না যে তার ইঙ্গিত আমরা অতীতে বা অনতি-অতীতে কিছু কম পাই নি। "নীলাম নীলাম"-এর ক্ষেত্রেও অপরিচয়জনিত এই দূরত্ব থাকার সম্ভাবনা ছিল। তিরিশ দশকের যে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দার কথা আর্থার মিলারের মূল নাটকে বারবার তীব্রভাবে উচ্চারিত, সেই অর্থনৈতিক সঙ্কটের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয় নেই। য়ুরোপের বুকে ঘটে-চলা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের মার্কিনি অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতীয় অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতার কোনো সাযুজ্য নেই। অসিত মুখোপাধ্যায় এই সমস্যাটিকে সামলিয়েছেন প্রযোজনার উৎকর্ষে। তাই যুদ্ধকালীন বা যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের প্রকৃত অর্থনৈতিক রেখাচিত্রের সঙ্গে বিজয়নারায়ণ ও সঞ্জয়নারায়ণের বাবার ব্যবসায়িক ব্যর্থতা মিলিয়ে দেখার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে যায়, যেমন নগণ্য হয়ে যায় একমাত্রসন্তানসঙ্গবিচ্ছিন্ন মদ্যপ এস্থারের বদলে পাওয়া চানাচুর-আসক্ত অনীতাকে মেনে নেবার প্রাথমিক অসুবিধেটুকু।

বাতিল-হয়ে-যাওয়া কিছু পুরনো আসবাবপত্রের সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণের সূত্রে মুখোমুখি হন বহুদিন সম্পর্কচ্ছিন্ন দুই ভাই—স্বভাবগতভাবে সৎ, নিঃস্বার্থ, দায়িত্ববান, আদর্শবাদী অথচ জীবনযুদ্ধে অসফল পুলিশ ইন্সপেক্টর বিজয়নারায়ণ আর আত্মকেন্দ্রিক, বাস্তববাদী, কর্মতৎপর, সাফল্যের চূড়ায় অবস্থিত ডাক্তার সঞ্জয়নারায়ণ। যে বাড়িতে তাঁদের দেখা হয়, যে বাড়িটি দু-এক দিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মিউনিসিপাল করপোরেশনের বুলডোজারের তলায়, তা তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি। আর সে বাড়ির ওইসব প্রাচীন আসবাব তাঁদের উত্তরাধিকার। পুরনো দিনের স্মৃতিচারণের প্রসঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হয় দুজনের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিরোধী দুই দৃষ্টিভঙ্গি। কথায়-কথায় আলাদা দুই মূল্যবোধে, দুই জীবনবীক্ষায় সংঘর্ষ বাধে। উদ্‌ঘাটিত হয় এক কঠিন সত্য—জীবনযুদ্ধে পরাজিত যে বাবাকে সাহায্য করতে গিয়ে বিজয়নারায়ণ জীবনের সবচেয়ে ভালো সুযোগগুলি নষ্ট করেছেন, যে অসহায় বাবাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বলে সঞ্জয়নারায়ণকে তিনি দায়ী করেন, সেই বাবাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রবঞ্চনা করেছেন। কারণ তিনি ছিলেন অনেকটা তাঁর ছোটো ছেলেরই মতো—চতুর, স্বার্থপর, সুযোগ-

সন্ধানী। কিন্তু এই সমাজে টিকে থাকতে হলে এই ধরনের মূল্যবোধই বোধ হয় বেশি প্রয়োজন। বিজয়নারায়ণ আর সঞ্জয়নারায়ণের সংঘর্ষের পশ্চাৎপটে আছে আরও একটি মানুষ—পুরনো আসবাব-ক্রেতা শৈলমোহন সুর। পুরনো আসবাবের মতো পুরনো মূল্যবোধের বিনিময়মূল্য যে আধুনিক সমাজে সামান্যই, তা সে জানে। বিজয়নারায়ণকে সেকথা সে বোঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু কোথায় যেন তার নিজের প্রাচীনত্ব মিলে যায় বাতিল আসবাবগুলির প্রাচীনত্বে, তার বাতিল-হওয়া অস্তিত্ব এক হয়ে যায় বিজয়নারায়ণের বাতিল-হয়ে-যাওয়া মূল্যবোধগুলির সঙ্গে। তাই নাটকের অন্তিম মুহূর্তে, সস্তায় বিকিয়ে যাওয়া একঘর পুরনো আসবাব নিয়ে সে যখন হাসতে থাকে, তখন তার দুচোখের কোণ অশ্রুসিক্ত। এ নাটকের চতুর্থ চরিত্র অনীতা, বিজয়নারায়ণের স্ত্রী। মূল নাটকের থেকে রূপান্তরে তাঁর ভূমিকা হ্রাস পেয়েছে। বিজয়নারায়ণ আর সঞ্জয়নারায়ণের বৈপরীত্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রথমে স্বামীর ভালোমানুষিকে ধিক্কার দিলেও নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বুঝতে পারেন, সামাজিক ব্যর্থতার মধ্যেও নিজের বিবেকের কাছে মাথা তুলে বাঁচতে পারে মানুষ।

সত্তর দশকের পটভূমিতে লেখা রূপান্তরটি এই দশকে যেন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। নাটকের অন্তর্নিহিত শক্তি সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধগুলির নৈর্ব্যক্তিক রূপায়ণে। বিজয় বা সঞ্জয় কারোর দৃষ্টিভঙ্গিই অস্বীকার করার মতো নয়। "হত্যা এক আকার কি"-র সঙ্গে এ নাটকের প্রাথমিক তফাত এইখানেই, নাট্যকার কোনো পক্ষই অবলম্বন করেন নি। দুই দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিই সমশক্তির। নাটক দেখতে-দেখতে কে ভুল, কে ঠিক নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য সেটা প্রাথমিক। মূল্যবোধ-সংক্রান্ত যে জরুরি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় দর্শককে, তার একটা নিজস্ব উত্তর নির্ধারণ করতেই হয় তাঁকে। যদিও হয়তো বিজয় আর সঞ্জয়ের যুগপৎ সহাবস্থান তাঁর নিজের মধ্যেই।

প্রযোজনায় আয়োজন সামান্য। সাদামাটা, বিবর্ণ-হলদেটে রঙের ফ্ল্যাট সাজিয়ে করা পুরনো বাড়ির সেট, ইতস্তত ছড়ানো ভাড়া-করা পুরনো আমলের আসবাবপত্র—এইটুকুই শুধু মঞ্চসজ্জা। বাইরে থেকে ঘরে ঢোকার একটি দরজা বাঁদিকের দেওয়ালে। এ ছাড়া, ডানদিকে পেছনে অন্য আরেকটি ঘরে যাবার দরজা, যে দরজা দিয়ে ও-ঘরে জমানো কিছু পুরনো আসবাব চোখে পড়ে। দরজার পাশে পেছনের দেওয়ালের জানালার কাঁচের শার্সি-গুলোতে যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার চিহ্ন হিসেবে কোনাকুনি কাগজ আঁটা। আলোকপরিকল্পনা নাটকের এই বাইরের অনাভরণ চেহারার সঙ্গে সুসমঞ্জস। অথচ দু-এক জায়গায় তা প্রযোজনায় একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজন করে। আবহে সঙ্গীত বা ধ্বনির কোনো ব্যবহার নেই এ নাটকে। মঞ্চের ওপর একটি গ্রামোফোনে পুরনো একটি রেকর্ড দুবার বাজিয়ে শোনেন দুটি ভিন্ন চরিত্র।

বাঙলা থিয়েটারে অভিনয়কে বাদ দিয়ে চলার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল বেশ কিছুকাল ধরে। সুবিধেও ছিল—ব্রেশ্‌টের ধুয়ো তুলে নাচগানে আসর মাতিয়ে তোলা যাচ্ছিল। তারপর একসময় ধীরে-ধীরে বাঙলা থিয়েটার যেন সচেতন হল—বেছে নিল এমন কিছু নাটক যাতে আছে জীবনের জটিল প্রশ্নের উত্থাপন আর বিশ্লেষণ, যে জটিলতাকে রূপায়িত করার জন্য থিয়েটারকে আবার অভিনয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে হল। জীবনমুখী থিয়েটারের প্রাণ হল অভিনয়—"গান্ধার"-এর "নীলাম নীলাম" সেই সত্যই আবার আমাদের সামনে উপস্থিত করল। প্রত্যেকটি চরিত্রই অত্যন্ত সু-অভিনীত এই প্রযোজনায়। কিন্তু বিজয়নারায়ণের চরিত্রে অসিত মুখোপাধ্যায় ও সঞ্জয়নারায়ণের ভূমিকায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় যে বুদ্ধিদীপ্ত, সংহত অভিনয় করেছেন তাকে শুধুমাত্র "সার্থক" বললে কিছু বলা হয় না। স্বরবিন্যাস, দৃষ্টিক্ষেপ, চলনের গুণে চরিত্র দুটি আদ্যন্ত জীবন্ত হয়ে ওঠে। "আত্মকথা"-র মতো এই প্রযোজনার অভিনয় দেখতে-দেখতে মনে হয় সংলাপগুলি যেন লেখা হয় নি, এই প্রথম বলা হচ্ছে। শৈলমোহন চরিত্রে সুকুমার ঘোষের অভিনয় অত্যন্ত উঁচুদরের। চরিত্রের মজাদার দিকটির সঙ্গে তার অন্তর্লীন গভীরতা আর ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম তিনি। শিপ্রা লাহিড়ীর অভিনয় স্বচ্ছন্দ কিন্তু 'অনীতা' নামের পুরো মানুষটি, যিনি একসময় কবিতা লিখতেন, সন্তানবিচ্ছেদের কষ্টে কাতর যিনি, তাঁকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না তাঁর চরিত্রায়ণে। পেলে হয়তো সামগ্রিক অভিনয় আরো জোরালো হত।

নান্দীকারকে ধন্যবাদ—তাঁরা পঞ্চম নাট্যমেলার জন্য এই-বাঙলা থেকে এবার একটি যোগ্য প্রযোজনা নির্বাচন করেছেন। পেছনে তাকিয়ে মনে হয়, এর আগের নাট্যমেলাগুলিতে "রানীকাহিনী" বা "নাথবতী অনাথবৎ"-এর মতো প্রযোজনাকে বেছে নিয়ে বাঙলার ইদানীংকার নাট্যচর্চার প্রকৃত স্বরূপটির সঙ্গে বহিরাগত নাট্যশিল্পীদের পরিচিত হবার সুযোগ দিতে পারতেন তাঁরা।

যবনিকা

এবার নাট্যমেলায় একটাই অভাববোধ ছিল—দক্ষিণী নাট্যশিল্পের কোনো প্রতিনিধি-গোষ্ঠীর অনুপস্থিতি। ইতিপূর্বেই দক্ষিণী একটি গোষ্ঠী (স্পন্দনা, ব্যাঙ্গালোর) বাঙলার দর্শকসমাজকে মুগ্ধ করেছেন। আশা করা যায়, আগামী নাট্যমেলাগুলিতে দক্ষিণের প্রযোজনা দেখার সুযোগ হবে।

পাঁচ বছরের নাট্যমেলার অভিজ্ঞতার পর একটি প্রশ্ন বড়ো হয়ে ওঠে—এই নাট্যোৎসব কি আদৌ বাঙলার থিয়েটারকর্মী বা দর্শকদের কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে ? কোনো আদান-প্রদান কি ঘটেছে বাঙলা থিয়েটারের সঙ্গে অন্যান্য প্রাদেশিক নাট্যের ? নাকি পুরোটাই একটা উচ্ছ্বাস আর উন্মাদনার স্তরে থেকে গেছে ? যদি বার্ষিক নাট্যমেলার ঐতিহ্য নান্দীকার বজায় রাখতে পারেন, হয়তো এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে অদূর ভবিষ্যতে। কিন্তু তার জন্য দরকার আগামী কয়েক বছরের নাট্যমেলার আয়োজন যার সব দায়ভার একা নান্দীকারের কাঁধে না চাপিয়ে কলকাতার সমস্ত নাট্যোৎসাহীর এগিয়ে আসা প্রয়োজন। সামনের বছরগুলিতে আবারও পশ্চিম বাঙলার দর্শকের সামনে নান্দীকার নিয়ে আসুন উপমহাদেশীয় নাট্যের বৈচিত্র্যময় সম্ভার—এই আশার সুরে হোক এ আলোচনার যবনিকাপতন।

With Best Compliments from :

BENFED THE FARMER's FRIEND

BENFED is a familiar name among the farmers of West Bengal. Through its hundreds of Primary Co-operative Societies and 14 District Offices, BENFED comes closer to the farmers to fulfil their needs.

SOME OF BENFED's BUSINESS ACTIVITIES ARE :

* Distribution of Chemical fertilisers, quality seeds and pesticides.
* Distribution of Pumpsets and Shallow Tubewell Accessories.
* Marketing of Raw Jute & Jute Products.
* Marketing of Vegetables, Pulses, Spices and other Agricultural Products.
* Owner of the only Modern Rice Mill in West Bengal.

The West Bengal State Co-operative Marketing Federation Limited (BENFED)

Regd. Office :
4, GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA-700 013

Business Office :
18, RABINDRA SARANI (PODDAR COURT)
(Gate No. 3 & 4, 7th Floor)
CALCUTTA-700 001

KCI

IN THE SERVICE OF INDUSTRY & AGRICULTURE

PRODUCT RANGE INCLUDES—

- CAUSTIC SODA (Lye, Solid & Flakes)
- LIQUID CHLORINE
- HYDROCHLORIC ACID
- BENZENE HEXA CHLORIDE (Technical)
- STABLE BLEACHING POWDER
- PENTAERYTHRITOL (Technical & Nitration Grade)
- ACETALDEHYDE
- FORMALDEHYDE (Under construction)
- COTTON & SYNTHETIC BLENDED CLOTH
- COTTON & SYNTHETIC BLENDED YARN

KANORIA CHEMICAL & INDUSTRIES LIMITED

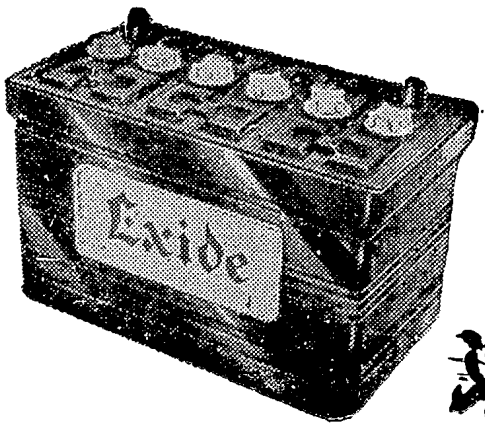
Corporate Office : "Park Plaza"
71 Park Street, Calcutta 700 016

Phone : 29-9472 (PBX)

Telex : 021-4484

• PERFORMANCE
• SERVICE
• DEPENDABILITY

That's what makes us No 1





THE HOWRAH MOTOR CO. LTD.

CALCUTTA, PATNA, DHANBAD, CUTTACK, SILIGURI AND GAUHATI

Postal Regd. No. WB/CC-435 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57 প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা

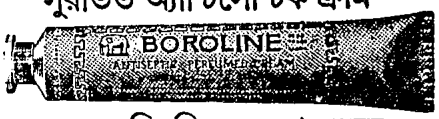
রোজই দেখি দাড়ি কামানোর শেষে চড়চড়ে
মুখ, মাঝে মাঝে টুকটাক কেটে যাওয়ার দাগ।
রোজই ভাবি—ভাগ্যিস্ বোরোলীন আছে।

রোজ সকালের সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরোলীন

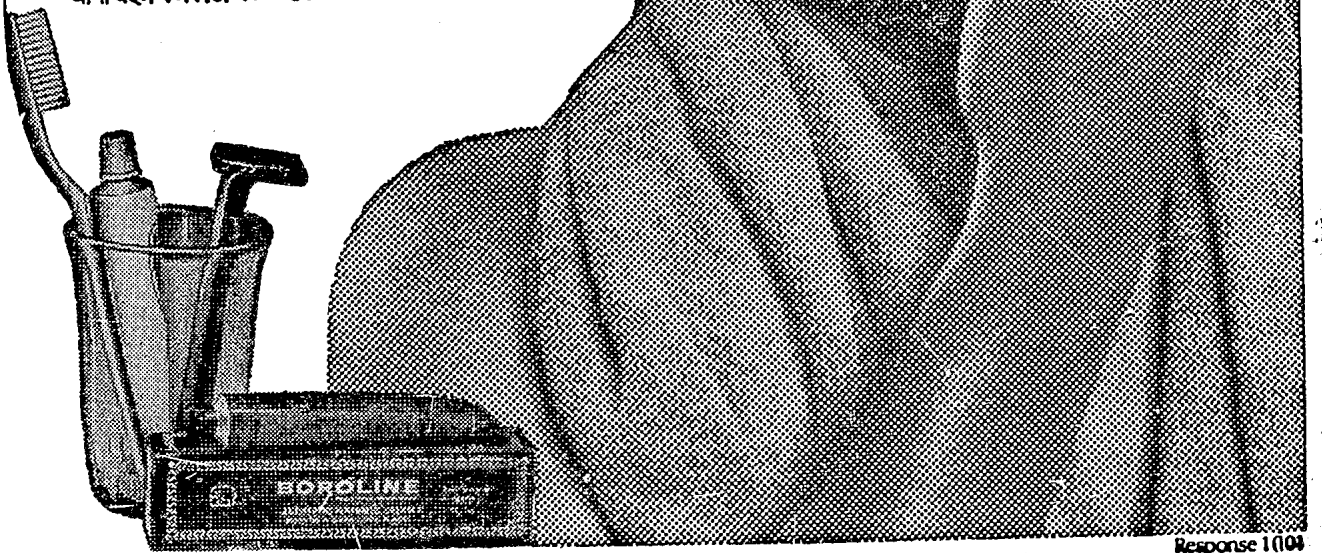
সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম



ত্বকের নিয়মিত সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম

GD

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩



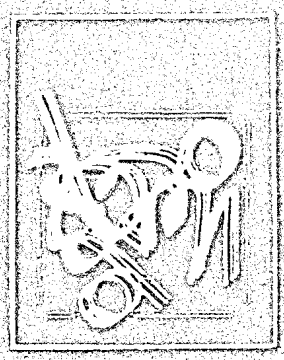
এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়।

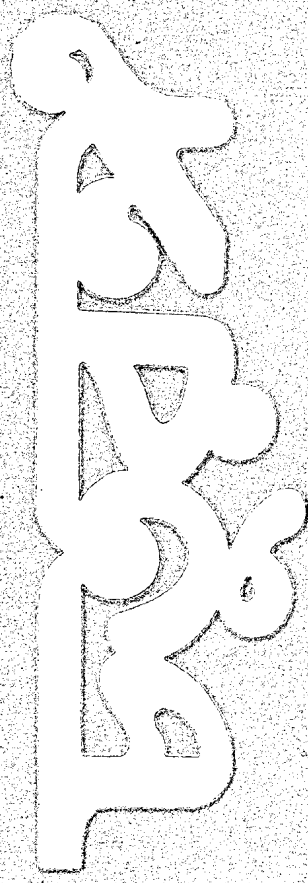
Response 1104

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ একাদশ সংখ্যা মার্চ ১৯৮৯





গান্ধীজীর প্রশ্ন, 'তোমরা কি হিংসার কাছে নতিস্বীকার করলে ?' জবাহরলালের জবাব, 'আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কাছে নতিস্বীকার করলুম।' মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায়ের "নেহেরুনামা" নিবন্ধে এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা এবং দেশভাগে নেহেরুর ভূমিকার বিশদ বিশ্লেষণ।

বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুইমুখী উদ্বাস্তু স্রোত আর জঙ্গি গণসংগ্রামের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ের তথ্যাশ্রিত ভিন্নধর্মী বিবরণ দিয়েছেন অধ্যাপক সুনীল সেন।

১৮৯৪ এবং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দুই পর্যায়ে ঝাড়খন্ডী আন্দোলনের অন্যতম অংশীদার মুণ্ডাদের বিদ্রোহের বর্ণনা এবং বিশদ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন ঐতিহাসিক বিনয় চৌধুরী।

হিন্দি সাহিত্যে প্রেমচন্দ যে ধারার প্রবর্তন করেন, অনেকের মতে, তার সার্থক উত্তরসাধক ইয়শপাল। গান্ধীবাদবিরোধী ইয়শপালের রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য।

ফরাসি উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হল ফরাসিভাষাবিদ লোকনাথ ভট্টাচার্যের ভিন্নস্বাদের কাব্যিক রচনা "নাচ অথবা একটি রহস্যের সম্ভব উদ্ধার।"

আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসবের কবিদের কলকাতায় কবিতাপাঠের আসর-সমাচার।

রোজই দেখি দাড়ি কামানোর শেষে চড়চড়ে
মুখ, মাঝে মাঝে টুকটাক কেটে যাওয়ার দাগ।
রোজই ভাবি—ভাগ্যিস্ বোরোলীন আছে।

রোজ সকালের সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

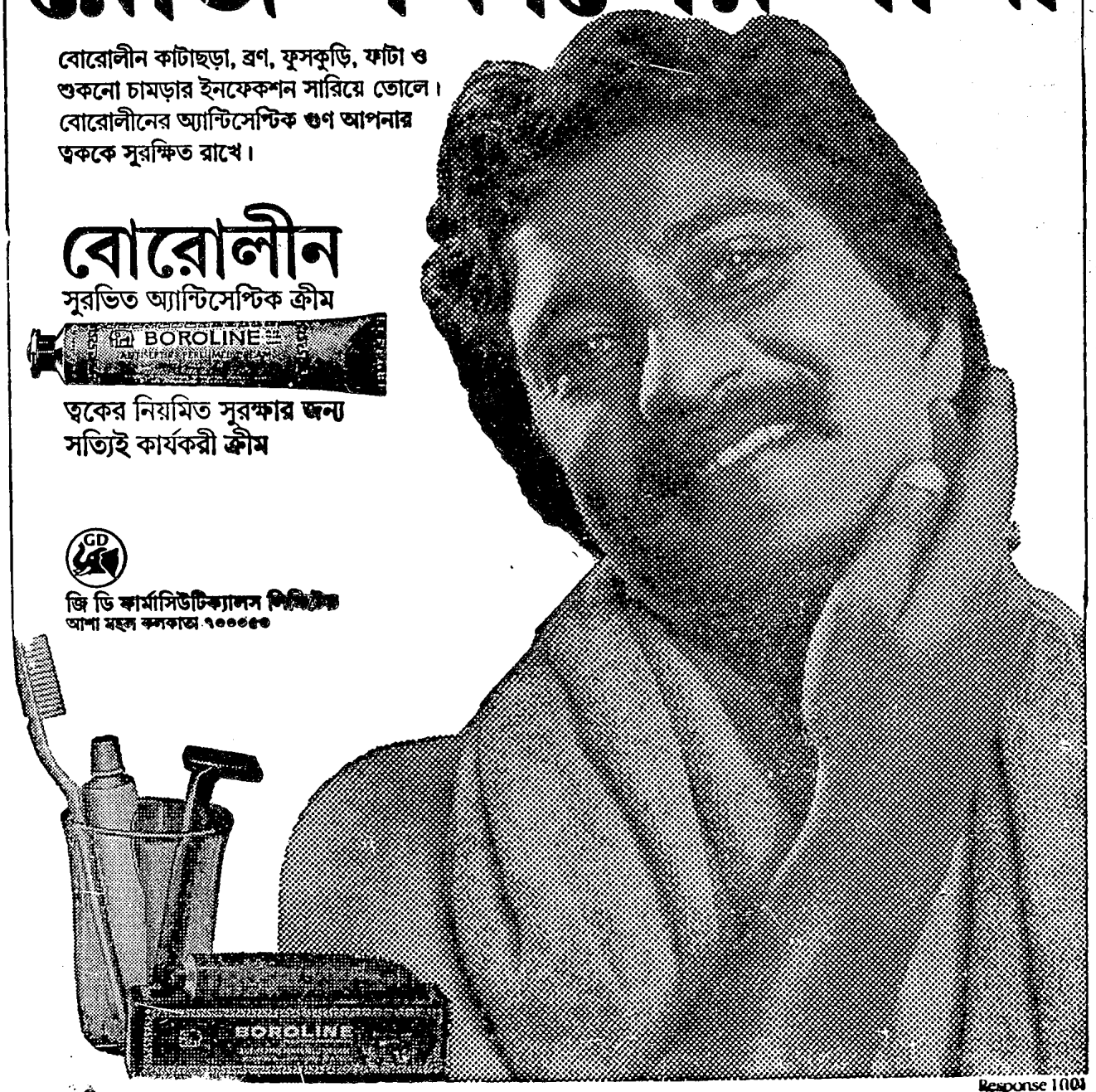
বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

ত্বকের নিয়মিত সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম

GD

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩



এটি প্রশাধন সামগ্রী নয়।

Response 1003

While purchasing Hessian, Sacking, Yearn and Decorative Furnishing Fabrics & other Jute Products, please insist on quality product.

We are always ready to meet the exact type of your requirement.

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.

(*UNIT :* **AUCKLAND JUTE MILLS**)

"KANKARIA ESTATE"
6, Little Russell Street
Calcutta-700 071

Telephones : 29-2621
29-2623
29-7199
29-7698
29-7710

Cable : SWANAUCK, CALCUTTA
Telex : 21-2396 AUCK IN
Codes : BENTLEY'S SECOND

REGISTERED OFFICE & JUTE MILL AT JAGATDAL
24-PARGANAS, PHONES : BHATPARA 2757, 2758 & 2038

.... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থ,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা





বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ১১
মার্চ ১৯৮৯
ফাল্গুন ১৩৯৫

নেহরুনামা অন্নদাশঙ্কর রায় ৯৩১
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুনীল সেন ৯৩৮
হিন্দি কথাশিল্পী ইয়শ্‌পাল : উপন্যাসে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ৯৫১
বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি সুধীর সেন ৯৬৬
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৯৮২

"নাচ", অথবা একটি রহস্যের সম্ভব উদ্ধার লোকনাথ ভট্টাচার্য ৯৪৪

প্রতিবেদন ৯৯৭
কলকাতার কবিতা-উৎসব অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রকলা ১০০১
বিড়লা অ্যাকাডেমির বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনী—১৯৮৯ সমীর ঘোষ

গ্রন্থসমালোচনা ১০০৪
সুজাতা মুখোপাধ্যায়, মৃণাল নাথ, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত সরকার

মতামত ১০১৪
বিভাস ভট্টাচার্য, মোঃ সানাউল্লাহ্

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেয়ারী এণ্ড পোলট্রি ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের একটি সংস্থা)

রেজিঃ অফিস—১৬নং নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল)

কলিকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং ঃ ২০-৯৪৩২, ২০-১৯৫৫ ও ২০-৪৮০২

ঃ কার্য্যাবলী ঃ

• ষ্ট্যাণ্ডার্ড দুধ সরবরাহ ; • পশুখাদ্য সরবরাহ ; • কল্যাণী ও শিলিগুড়িতে **'এপিক'** সুষম পশুখাদ্য কারখানা পরিচালনা ও বিক্রয় ; • মুরগীর ডিম ও মাংস বিক্রয় ; • মেদিনীপুর ও বর্ধমানে পশুখাদ্য কারখানা স্থাপন ; • ছোট খামারী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গো, মুরগী ও শূকরের উন্নয়ন ; • গাওয়া ঘি বিক্রয় ; • হাওড়া **'মিলটোন্'** কারখানা পরিচালনা ও বিক্রয়।

ঃ কারখানা ও শাখা ঃ

☐ কল্যাণী ফিড মিলিং প্ল্যাণ্ট, ডি ২৩, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এরিয়া, কল্যাণী, নদীয়া, ফোন নং কল্যাণী—৪৭৫ ;
☐ শিলিগুড়ি ফিড প্ল্যাণ্ট, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, জেলা—দার্জিলিং ; ফোন নং শিলিগুড়ি ২১১৩১ ;
☐ মিলটোন প্ল্যাণ্ট, ৬২, রোজমেরী লেন, হাওড়া-১ ; ☐ মকদমপুর, জেলা—মালদহ, ফোন নং ২৫৯৬ ;
☐ ৪৩নং অরবিন্দ সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০০৪ ; ☐ ৬/১, যশোর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৮।

☐ অনীক : পঁচিশ বছর ☐

অনীক-এর পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পরিকল্পিত দুটি সংকলনের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে গত পঁচিশ বছরে অনীক-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের বাছাই-করা সংকলন হিসেবে।

সংকলিত প্রবন্ধগুলির শিরোনাম : ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে জাতপাত ও শ্রেণীর ভূমিকা। সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে। কৃষক বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব। সৈয়দ আমির আলি। নৈরাজ্যবাদ ও মার্কসবাদ। মাওসেতুং : প্রথম দেখা। চীনের কৃষি ও মাও-এর অর্থনৈতিক চিন্তা। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ। অপারেশন বর্গা : প্রশাসন-নির্ভর সংস্কার। কৃষি প্রশ্ন ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ। ভোজপুরের কৃষক সংগ্রাম। ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে স্তালিন। প্রসঙ্গ : ইন্দিরা গান্ধী। এবং অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রণ্টের স্বরূপ ও সমস্যা (হেমাঙ্গ বিশ্বাস)।

দাম : ৪০ টাকা (রেজিঃ / ভিপি ডাকে ৭ টাকা অতিরিক্ত)।

যোগাযোগ : অনীক। ইন্দ্রপ্রস্থ। খাগড়া-৭৪১ ১০৩। মুর্শিদাবাদ জেলা।

কলকাতা পরিবেশক : পিপলস বুক সোসাইটি। ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

D. T. M. CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

59B CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA
Phone : 43-3093

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

KHAITAN (India) LTD

46C, J. L. NEHRU ROAD

CALCUTTA-700 071

চতুরঙ্গ পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিবরণী

১। প্রকাশ-স্থান : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

২। প্রকাশের ব্যবধানকাল : মাসিক

৩। মুদ্রক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়
ঠিকানা : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

৪। প্রকাশক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়

৫। সম্পাদক : নীরা রহমান, জাতীয়তা : ভারতীয়

৬। স্বত্বাধিকারীদের নাম-ঠিকানা : সাধনচন্দ্র দত্ত, পি ৫০৬এ কেয়াতলা মেন রোড, কলিকাতা-২৯ ; রঘুনাথ দে, ১১/২ চক্রবেড়িয়া রোড নর্থ, কলিকাতা-২৫ ; গৌরকিশোর ঘোষ, এস ৪, ই ২, বিধান-নিবাস, বিধান শিশু সরণি, কলিকাতা-৫৪ ; গৌরী আইয়ুব, ৫ পার্ল রোড, কলিকাতা-১৭ ; রনেনআয়ন দত্ত, ১/৪ ডোভার লেন, কলিকাতা-১৯ ; নীরা রহমান, ৮এ সামসুল হুদা রোড, কলিকাতা-১৭ ; নীহাররঞ্জন চক্রবর্তী, ৩৪ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৯।

আমি নীরা রহমান, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

নীরা রহমান

B. N. BOSE & CO.

Engineers and Ship-Builders

GHUSURI • HOWRAH

Phone : 66-5238

Hada Textile Industries Limited

Regd. Office :

4, GOVERNMENT PLACE NORTH, CALCUTTA-700 001

Telephone : 23-3942, 23-1679 Telex : 021-3417

Manufacturers of Quality Tere-Cot Yearn, Super-Combed Hosiery-Yearn and other Weaving Yearn in Hanks & Cones.

Factory :

DIAMOND HARBOUR ROAD, BISHNUPUR, 24 PARGANAS, WEST BENGAL

Telephone : 615-201

নেহরুনামা

অন্নদাশঙ্কর রায়

জবাহরলালের প্রসঙ্গ উঠলেই অমনি পার্টিশনের কথা ওঠে। প্রধানত তাঁকেই দোষী করা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই বোমবাইতে জবাহরলাল একটি প্রেস কনফারেন্সে এক বিস্ময়কর উক্তি করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্যাবিনেট মিশন স্কীম গ্রহণ করার পর কংগ্রেস প্রেসিডেনট নেহরু বলেন যে কংগ্রেস কনস্টিট্যুয়েনট অ্যাসেম্বলিতে শুধুমাত্র যোগ দিতে রাজী হয়েছে। আগে থেকে কোনো চুক্তির দ্বারা তার হাত-পা বাঁধা নয়। ভালো মনে করলে সে ওই স্কীম মডিফাই করতে পারবে। মৌলানা সাহেবের মতে এটি এমন একটি উক্তি যেটি ইতিহাসের গতি বদলে দিতে পারে।

নেহরুর যা স্বভাব, তিনি যার-তার যে-কোনো প্রশ্নের এমন এক-একটা মৌখিক উত্তর দিতেন যা ভেবেচিন্তে লিখিতভাবে দেওয়া চলে না। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে বেফাঁস উক্তির দরুন ইতিহাসের গতি বদলে গেল? নইলে অপরিবর্তিত থাকত? এটা মেনে নেওয়া শক্ত। ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অনুসারে যে সংবিধান তৈরি হতো তা ভারতবর্ষকে অবিভক্ত রাখলেও সেই অবিভক্ত ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করতেন তিনজনমাত্র মন্ত্রী। তাঁদের একজন চালাতেন প্রতিরক্ষা বিভাগ, একজন পররাষ্ট্র বিভাগ, একজন যোগাযোগ বিভাগ। সেই তিনজনের একজন সম্ভবত কংগ্রেসের প্রতিনিধি, আর একজন মুসলিম লীগের প্রতিনিধি, বাকী একজন শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ধরে নেওয়া যাক, জবাহরলাল, জিন্না সাহেব, বলদেও সিং। মন্ত্রীতে-মন্ত্রীতে মতভেদ হলে জবাহর ও বলদেও মিলে জিন্নাকে হারিয়ে দিতেন, জিন্না ও বলদেও মিলে জবাহরকে, জিন্না ও জবাহর মিলে বলদেওকে। তিনজনের আস্থাভাজন একজন রাষ্ট্রপতি খুঁজে পাওয়া শক্ত হতো। রাজনীতিক্ষেত্রে দলনিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি আমরা কোথায় পেতুম? রাষ্ট্রপতি হতেন হয়তো একজন খ্রীষ্টান অধ্যাপক বা পার্সি শিল্পপতি। সরকারকে জবাবদিহি করতে হতো কার কাছে? পার্লামেনট বা আইনসভা থাকত কি? সেখানে কি মেজরিটি মাইনরিটি থাকত না? ভোট কি সব সময় সরকারের পক্ষে যেত? বিরোধীপক্ষ বলে কিছু থাকত না? এক-এক প্রদেশে এক-এক দলের প্রাধান্য। এক-এক গ্রুপতেও এক-এক দলের। দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে কি কোনো কেন্দ্রীয় সরকার কল্পনা করা যায়? বড়ো জোর একটা কোয়ালিশন সরকার হতে পারে। কিন্তু সর্বস্তরে কোয়ালিশন না হলে কি কেবলমাত্র কেন্দ্রে কোয়ালিশন হতে পারত? সমস্তক্ষণ চলত

দলাদলি, দলবদল, দলত্যাগ, মন্ত্রীবদল। সেরূপ স্থলে একজন জবরদস্ত রাষ্ট্রপতি আবশ্যক। বিপদে আপদে তিনিই হাল ধরতেন। আর নয়তো প্রধান সেনাপতিই ক্ষমতা দখল করতেন। যেমন পাকিস্তানে।

কংগ্রেস চেয়েছিল পার্টি রুল। মুসলিম লীগও তাই। কংগ্রেস চেয়েছিল শক্তিশালী কেন্দ্র, অনুগত রাষ্ট্রপতি। মুসলিম লীগও তাই। উভয়েরই মনস্কামনা সিদ্ধ হয় ভারতবর্ষকে দুই ভাগ করে। একই কারণে বাঙলাদেশ ও পানজাবকেও দুই ভাগ করা হয়। মাউনটব্যাটেন নিমিত্তমাত্র।

ভারতভাগ গান্ধীজী চান নি, আজাদ চান নি, ওয়েভেল চান নি, মাউনটব্যাটেনও চান নি। ক্যাবিনেট মিশন যে চান নি সেটা তো তর্কাতীত। না, সেটা জিন্না সাহেবও চান নি। তাঁর ধারণা ছিল বড়োলাট ওয়েভেল তাঁকে আমন্ত্রণ করবেন ইনটারিম গভর্নমেনট গঠনকার্যে সাহায্য করতে। তা হলে তিনি প্রতিরক্ষা নিজের হাতে রাখতেন, স্বরাষ্ট্র দিতেন লিয়াকৎ আলী খানকে, পররাষ্ট্র জবাহরলালকে, অর্থ বোধহয় বল্লভভাইকে। ওয়েভেল কিন্তু তাঁকে আশা দিয়েও নিরাশ করেন। কারণ কংগ্রেস কিছুতেই একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে সঙ্গে না নিয়ে ইনটারিম গভর্নমেনট-এ যোগ দিত না। জিন্না সাহেব প্রধানমন্ত্রীর পদ দাবি করেন নি। বড়োলাটের পরিষদে তেমন কোনো পদ ছিল না। সদস্যরা সকলেই সমান। কেউ কারো আগে বা পরে নয়। জবাহরলাল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী পদের অভাবে ভাইস-প্রেসিডেনট পদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করেন। ভাইস-প্রেসিডেনট হতেন নামে না হোক কার্যত প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর যে ক্ষমতা ভারতে তাঁরও সেই ক্ষমতা। তা না হলে তিনি শুধুমাত্র একজন সদস্য হতে রাজি হতেন না। উদ্দেশ্য বড়োলাটকে ব্রিটেনের রাজার মতো ক্ষমতাশূন্য করা। বড়োলাট যে এতে খুশি হতেন তা নয়। কিন্তু তিনি ভালো করেই জানতেন যে তাঁর শাসন-পরিষদে আসতে জবাহরলাল অন্য কোনো শর্তে রাজি হতেন না। করতেই হতো তাঁকে ভাইস-প্রেসিডেনট বা প্রধানমন্ত্রী। বড়োলাটকে ক্ষমতাশূন্য রাজপ্রতিনিধিতে পরিণত করতে আর কেউ পারতেন কিনা সন্দেহ। তাঁকে এইজন্যেই মনোনীত করেছিলেন গান্ধীজী। বড়োলাট যদি ক্ষমতাশূন্য হতে রাজি হতেন, তা হলে তাঁকে যথাসময়ের আগে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিয়ে প্রস্থান করতে বলতেন না গান্ধীজী। 'কুইট ইনডিয়া' বলা হয়েছিল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে সংবিধান রচনা করতে অন্তত দু বছর লাগবে। তার পরেও যে রেপাবলিক ঘোষণা করা হতো তা নয়। রাজন্যরা রেপাবলিক পছন্দ করতেন না। তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের সংবিধানের আমলে আনা গান্ধীনীতি ছিল না। রাজাদের রেখে তাঁদের ক্ষমতাশূন্য করাই শ্রেয়।

ঘটনাগুলো ঘটে যায় অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে। জবাহরলালের বেফাঁস উক্তির জন্যে নয়, বড়োলাটের কথার খেলাপের জন্যেই জিন্না সাহেব ইনটারিম গভর্নমেনট তথা কনস্টিট্যুয়েনট অ্যাসেম্বলি বর্জন করেন এবং ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দেন। ফলে বল্লভভাই পেয়ে যান স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও বলদেও সিং-কে দেওয়া হয় প্রতিরক্ষা দপ্তর। মুসলিম লীগ যখন পরে বড়োলাটের অনুরোধে তাঁর পরিষদে যোগ দেয় তখন বল্লভভাই জানিয়ে দেন যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছাড়তে বললে তিনি সদস্যপদে ইস্তফা দেবেন। তিনি তল্পিতল্পা বাঁধতে শুরু করে দেন। কংগ্রেস হাইকমানডের চেয়ারম্যান বিদায় নিলে কংগ্রেসও অসময়ে বিদায় নিতে পারে। অগত্যা লিয়াকৎ আলী খান-কে দিতে হয় অর্থ দপ্তর। এর পরে দেখা গেল তিনি এমন ব্যবহার করছেন যেন তিনিও জবাহরলালের সমান এক প্রধানমন্ত্রী, পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে তাঁর স্বতন্ত্র ক্যাবিনেট। এই যে ক্যাবিনেট বিভাজন, এটাই হয় দেশবিভাজনের হেতু। দুই ক্যাবিনেট নিয়ে দুই ডোমিনিয়ন সরকার ভূমিষ্ঠ হয়। অকাল প্রসব। অজস্র রক্তস্রাব। তবু মুখে হাসি। স্বাধীন ভারত।

স্বাধীন পাকিস্তান।

পার্টিশন যদি হলো তো লোকবিনিময় হলো না কেন? এটাও নেহরুর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ। এর উত্তর, নেহরু বিশ্বাস করতেন না যে হিন্দু-মুসলমান দুই নেশন বা তাদের দুই হোমল্যানড। যেসব মুসলমান তা বিশ্বাস করতেন তাঁরা স্বেচ্ছায় ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যান, নেহরু তাঁদের বাধা দেন না। পক্ষান্তরে যাঁরা তা বিশ্বাস করতেন না তাঁদেরও তিনি বাধ্য করেন না। পাকিস্তান থেকে কেবল যে হিন্দুরা স্বেচ্ছায় চলে আসেন তাই নয়, কতক মুসলমানকেও স্বেচ্ছায় চলে আসতে দেখা গেছে। তাঁরা প্রধানত পাঠান। হয় খান আবদুল গফ্‌ফর খানের সহকর্মী, নয় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের সহসৈনিক। টোকিওর ভারতীয় দূতাবাসে সেরকম একজন পাঠানকে আমি দেখি। মুসলমানরা সবাই কিন্তু লীগপন্থী ছিলেন না। লীগ-পন্থীরাও সবাই পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলেন না। পাকিস্তান যখন একটা সেটলড ফ্যাক্ট হয়ে যায় তখন তাকে মেনে না নিয়ে ওপারে তাঁদের গতি ছিল না। এপারে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যদি এপারে থেকে যেতেন, কেউ তাঁদের বলপূর্বক উচ্ছেদ করত না। নেহরুর নির্দেশ ছিল মুসলমানদের গায়ে হাত না দেওয়ার। যারা দাঙ্গাবাজ বা গুপ্তচর তাদের কথা অবশ্য আলাদা।

নেহরু প্রশ্রয় দিলে লোকবিনিময় দুই বাঙলার বেলায়ও জোর-জুলুমের ভিতর দিয়ে ঘটে যেত, যেমন দুই পানজাবের বেলায়। তাতে কার কী সুবিধা হতো বোঝা শক্ত। জোর-জুলুমে অগ্রণী ছিল শিখরাই। মুসলমানদের মতো অত বড়ো শত্রু তাদের আর কেউ ছিল না। আজ কিন্তু তাদের অন্য মূর্তি। তাদের ছেলেরা যখন-ইচ্ছা-তখন পাকিস্তানে যাচ্ছে, তালিম নিচ্ছে, হাতিয়ার পাচ্ছে, ফিরে এসে 'লড়কে লেঙ্গে খলিস্তান' হাঁকছে। বাধা দিচ্ছে হিন্দুরা। সুতরাং হিন্দুরাই তাদের শত্রু। পাকিস্তানের মুসলমানরা মিত্র। সেদিন যাঁরা এঁদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন নেহরু ছিলেন না তাঁদের একজন। দিল্লীর মুসলমানদের ঘরবাড়ি ও মসজিদ থেকে তাদের বেদখল করাই ছিল শরণার্থীদের উদ্দেশ্য। তাদের সহায়ক বা সমর্থক হিন্দুর দলে নেহরু ছিলেন না। তিনি বাধা দেন। গান্ধীজী তো মরণপণ অনশনই করেছিলেন।

লোকবিনিময় স্বেচ্ছায় হলে কেউ রোধ করতেন না, করতে চাইলে পারতেনও না। কিন্তু লোকবিনিময় স্বেচ্ছামূলক হলে সর্বাত্মক হতো না। বিপুলসংখ্যক হিন্দু পাকিস্তানেই থেকে যেতেন। তেমনি বিপুল-সংখ্যক মুসলমান ভারতে। অন্তর থেকে এঁরা কেউ বিশ্বাস করতেন না যে এক-একটি ধর্মসম্প্রদায় হচ্ছে এক-একটি নেশন, এক-একটি নেশনের জন্যে চাই এক-একটি হোমল্যানড। সরকারি হুকুমে এঁদের ওপর জোর-জুলুম করা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান নয়। সমস্যাকে সমাধানের অতীত করা। ভারতের বরাত ভালো নেহরু ছিলেন তার প্রধানমন্ত্রী। অন্য একজন হলে বাংলাদেশে আজ এতগুলি হিন্দু থাকত না বা পশ্চিমবঙ্গে এতগুলি মুসলমান। এরই জন্যে বিপ্লবীরা প্রাণ দেন নি, সত্যাগ্রহীরা জেলে যান নি, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম গান লেখেন নি, পূর্বসূরীরা স্বপ্ন দেখেন নি। পার্টিশন মন্দ। মন্দ যে আরো মন্দ হয় নি এর জন্যে আমরা গান্ধী ও নেহরুকে ধন্যবাদ দেব। কোথাও-কোথাও যদি আরো মন্দ হয়ে থাকে তবে সেটা তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। আশ্চর্যের বিষয় একের পর এক প্রধানমন্ত্রী চল্লিশ বছর ধরে একই নীতি মান্য করে এসেছেন।

না পার্টিশন, না লোকবিনিময়, না পাঁচ লক্ষ নর-নারীর প্রাণনাশ ও এক কোটি নরনারীর 'যঃ পলায়তি স জীবতি' কোনোটাই ঘটত না, যদি ইংরেজরা আরো কিছুকাল থাকত। কিন্তু আরো কিছুকাল পরেও কি সেই একই রকম ঘটনা ঘটত না, যদি না ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একটা সমঝোতায় পৌঁছত আর সেই সমঝোতার ভিত্তিতে সারা ভারতবর্ষের

জন্যে একটা সর্বসম্মত সংবিধান রচনা করতে সমর্থ হতো? ইংরেজরা এসেছিল বাণিজ্য করতে, সাম্রাজ্যটা বাণিজ্যেরই স্বার্থে। বাঙলাদেশের শেষ গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ আমাকে বলেন, 'আমরা যদি রাজত্ব ছেড়ে যাই আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হবে। যেমন হয়েছে আয়ারল্যানডে।' এই যেমন লাট-সাহেবের কথা তেমনি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের কথা হলো, 'একদিন না একদিন তো যেতে হবেই, এখন যদি যাই তো যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে অনেক চাকরি খালি আছে, সহজেই পেয়ে যেতে পারি, পরে গেলে দেখব ভর্তি হয়ে গেছে।'

পলায়নের সিদ্ধান্তটা ইংরেজরাই নেয়, তার থেকেই আসে কোথাও হিন্দু-শিখের গণপলায়ন, কোথাও মুসলমানের গণপলায়ন। এ লজ্জা ইংরেজের নয়, এ লজ্জা হিন্দু-মুসলমান-শিখের। এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী একসঙ্গে বাস করেও পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারে নি। সবাই নয়, কতক লোক বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে নি। দাঙ্গাহাঙ্গামা থেকে এসেছে গণ অবিশ্বাস। আর দাঙ্গাহাঙ্গামা এসেছে জিন্না সাহেবের 'ডিভাইড অ্যানড কুইট' থেকে। আর জিন্না সাহেবের 'ডিভাইড অ্যানড কুইট' এসেছে গান্ধীজীর 'কুইট ইনডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি' থেকে। আর গান্ধীজীর 'কুইট ইনডিয়া' এসেছে যুদ্ধকালে ক্ষমতা হস্তান্তর না-করার ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত থেকে। গান্ধীজীর মতে যুদ্ধকালে ক্ষমতার হস্তান্তর একান্ত জরুরি। ব্রিটেনের ভাগ্যে কী আছে কে জানে! এই তো দেখা গেল ইংরেজরা মালয়-সিঙ্গাপুর-বর্মা রাখতে পারল না। তাদের ভাগ্যে পরাজয় থাকলে তো ভারতের ভাগ্যেও পরাজয়। ব্রিটেনের সঙ্গে ভাগ্য জোড়া থাকলে পরাজয়ের ভাগ তো ভারতকেও বহন করতে হবে।

সেই 'কুইট ইনডিয়া'ই হলো একদিন। একই কালে হলো সেই 'ডিভাইড অ্যানড কুইট'। গান্ধী বা জিন্না এক-একজন ব্যক্তি নন, এক-একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। খুঁটিনাটির বিচারে আমরা এটা ভুল, সেটা ভ্রান্ত বলতে পারি, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে গান্ধীজীও তাঁর দিক থেকে ঠিক, জিন্না সাহেবও তাঁর দিক থেকে। 'আগে তৃতীয় পক্ষ যাক, তার পরে দুই পক্ষের মধ্যে একভাবে-না-একভাবে মিটমাট হবে।' 'আগে দুই পক্ষের মধ্যে একভাবে-না-একভাবে মিটমাট হোক, তার পরে তৃতীয় পক্ষ যাবে।' কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, এ প্রশ্নের উত্তর, দুটোই একদিনে। পনেরো অগস্ট ১৯৪৭ সেই সন্ধিক্ষণ। এটা যেন ইতিহাসের দ্বারা নির্দিষ্ট। মাউনটব্যাটেনও একজন ব্যক্তি নন, একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। অ্যাটলির নির্দেশ ছিল ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে যে-কোনো একদিন। মাউনটব্যাটেন ইচ্ছা করলে ৩০ জুন ১৯৪৮ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সে-ইচ্ছা নির্ভর করছিল কংগ্রেস ও লীগের ইচ্ছার উপর। একমত হয়ে সংবিধান রচনার উপর। সেইটাই সবদিক থেকে ভালো হতো। কথাবার্তা চালিয়ে ম্যাউনট-ব্যাটেন উপলব্ধি করেন যে তার লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই। তা যদি হয় তবে তাঁর সামনে অপশন মাত্র দুটি। পার্টিশন ও বলকানীকরণ।

পার্টিশন অথবা বলকানীকরণ? পার্টিশন বলতে বোঝায় দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। হিন্দুপ্রধান ও মুসলিমপ্রধান। দুটোই ধর্মভিত্তিক। আর বলকানী-করণ বলতে বোঝায় বহুসংখ্যক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। কোনোটা ধর্মভিত্তিক, কোনোটা ভাষাভিত্তিক, কোনোটা হিন্দুপ্রধান হলেও মুসলিম নিজামশাসিত, কোনোটা মুসলিমপ্রধান হলেও হিন্দু মহারাজা-শাসিত, শিখপ্রধান না হলেও শিখ মহারাজাশাসিত, কোনোটাতে একটিমাত্র ভাষা, কোনোটাতে একাধিক ভাষা, কোনোটা প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী, কোনোটা প্রকৃতির অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত অথচ সামরিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেস ও লীগ ব্যতীত অন্যান্য দলও যে না ছিল তা নয়। পানজাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি। বাঙলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি। শিখদের কয়েকটি

দল। ক্যাবিনেট মিশন স্কীম মেনে না নিলে ম্যাউনট-ব্যাটেন প্ল্যান ; মাউনটব্যাটেন প্ল্যান মেনে না নিলে অপারেশন বলকান। মুসলিম লীগের হাতে অবিভক্ত বঙ্গ সমর্পণ, কিন্তু অবিভক্ত পানজাব কার হাতে সেটা অনিশ্চিত। মুসলিম লীগ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। ব্রিটিশ গভর্নরই শাসনভার স্বহস্তে নিয়েছিলেন। হিন্দু ও শিখ বিধায়করা প্রদেশভাগের প্রস্তাব তুলেছিলেন। কংগ্রেস রাজি, লীগ নারাজ।

শিখ নেতারা বলেন, 'আমরা দেশকে খণ্ড-খণ্ড করতে চাইনে, কিন্তু হিন্দুস্থান পাকিস্তান যদি হয় তবে শিখিস্তান বা খলিস্তানও হবে।' হলে হবে কোথায়? এমন একটি জেলাও তো নেই যেখানে শিখরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ। মাউনটব্যাটেনের এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন, 'লাহোরের মুসলমানদের অন্যত্র সরিয়ে তাদের জায়গায় অন্যত্র থেকে শিখ আনিয়ে লাহোরকে শিখপ্রধান করা হোক। তেমনি আরো কয়েকটি জেলাকেও। তারপর শিখদের জন্য শিখিস্তান বা খলিস্তান।' মাউনটব্যাটেন সে প্রস্তাব উড়িয়ে দেন।

শিখরাই কি লোকবিনিময়তত্ত্বের প্রথম উদ্‌গাতা? না, তাদের আগে জিন্না সাহেব। বিহারের দাঙ্গার পর তিনিই চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলিম লোকবিনিময়। বড়োলাট ওয়েভেল কর্ণপাত করেন নি। জিন্না সাহেবের নজির ছিল গ্রীক ও তুরস্কের মধ্যে লোক-বিনিময়। গ্রীকরা খ্রীষ্টান, তুর্করা মুসলিম। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা তারা ভিন্নভাষী। তা ছাড়া নৃতাত্ত্বিক জাতি হিসাবেও ভিন্ন। হিন্দু-মুসলমান নৃতাত্ত্বিক জাতি হিসাবে ভিন্ন নয়। প্রত্যেক প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানের ভাষা একই। হিন্দি উর্দু মূলত এক ভাষা। লোকবিনিময়তত্ত্ব ভারতবর্ষে খাটে না। কোনো সরকারই সে দায়িত্ব নেন না। বেসরকারি-ভাবে হিন্দু খেদানো মুসলিম খেদানো শিখ খেদানোর নাম লোকবিনিময় নয়।

বলকানীকরণকে নেহরু অঙ্কুরেই বিনাশ করেন নাউনটব্যাটেনের আদি পরিকল্পনা বানচাল করে। তাতে ছিল বাঙালি হিন্দু-মুসলমান একমত হলে বাঙলাদেশ অবিভক্ত থাকবে। স্বেচ্ছায় যদি হিন্দুস্থানে বা পাকিস্তানে যোগ না দেয় তো স্বাধীন ও সার্বভৌম তৃতীয় এক রাষ্ট্র হবে। নেহরুর ইচ্ছাই কংগ্রেসের ইচ্ছা। কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের হিন্দুরা একটা বলকান রাষ্ট্র পছন্দ করত না। অগত্যা মাউনটব্যাটেন প্ল্যান সংশোধন করেন। নেহরুর আশঙ্কা একটি বলকান হলে আরো দশটি বলকান হতো। হায়দরাবাদ, মৈশুর, ত্রিবাঙ্কুর, কাশ্মীর তো কংগ্রেসের বাধ্য নয়।

শেষে ভারতবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। হিন্দুস্থানকে নেহরু ইনডিয়া নাম দেন। ব্রিটেন মেনে নেয়।

একই তো অর্থ। যাঁহা হিন্দুস্তান তাঁহা ইনডিয়া। না, তা নয়। অর্থ এক হলেও অনুষঙ্গ বিভিন্ন। সিন্ধ থেকে হিন্দ, সেটা একটা দেশ। তার থেকে হিন্দু, সেই দেশের অধিবাসী। তার ধর্ম কী তা কে জানে? কিন্তু পরে যখন ইসলামধর্মবিশ্বাসীরা এদেশে এসে এদেশের অধিবাসী হন তখন তাঁরা হিন্দু নামে চিহ্নিত হতে চান না, দেশকে বলেন হিন্দুস্থান অর্থাৎ হিন্দুর স্থান। হিন্দুদের ধর্ম আলাদা। ধর্মটারও নামকরণ হয় হিন্দুধর্ম। তার আগে হিন্দুও ছিল, ধর্মও ছিল, কিন্তু 'হিন্দুধর্ম' ছিল না। বৈদিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম, এইরূপ বাছবিচার ছিল। বৈদিক ধর্ম ক্রমে-ক্রমে হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম। ধর্মবিশ্বাসের চেয়ে বড়ো হয় গুণ-কর্মবিভাগ। পরে আরো বড়ো হয় জন্মসূত্রে জাতিবর্ণ। ইসলাম এদেশে আসার আগে অন্তত তিন হাজার বছর ধরে ধর্মীয় তথা সামাজিক বিবর্তন ঘটে-ছিল। নীট ফল 'হিন্দু'ধর্ম ও 'হিন্দু'সমাজ। এর উপর নির্ভর করত 'হিন্দু' রাষ্ট্র। 'হিন্দু' রাষ্ট্রের অধিপতি একজন রাজা।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রের পর হিন্দু রাষ্ট্র ফিরিয়ে আনতে হলে হিন্দুস্থানই তার প্রথম পদক্ষেপ। সেই রাষ্ট্রের কাছে দেশ গৌণ, ধর্মই মুখ্য। ধর্মের ভিত্তিতে সংবিধান

রচনা করতে গেলে তাকাতে হতো বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত - মনুসংহিতার দিকে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানের দিকে নয়। ভিত্তিপাত সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে, আধুনিক যুগে নয়। গান্ধীজীর পিছুটান ছিল, এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও বর্ণাশ্রমের প্রতি মমতা তাঁর হৃদয় অধিকার করেছিল। পরে দূর হয়। তিনি আমূল সংস্কার চান। জবাহরলাল কিন্তু গোড়া থেকেই সামাজিক অন্যায়ের বিরোধী। তাঁর পিছুটান ছিল না। তিনি অন্বয় রক্ষা নিশ্চয়ই করতেন। যেমন প্রাচীন ভারতের সঙ্গে তেমনি ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে। তেমনি সঙ্গতি রাখতেন বিশ্বের আধুনিক চিন্তার সঙ্গে। তাঁর রাষ্ট্র হতো সর্বতোভাবে নতুন রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রে নিরীশ্বরবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীরাও সমান নাগরিক। সমান অধিকার হিন্দু ও মুসলমানের, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের, পুরুষ ও নারীর, পরবর্তী অধিবাসী ও আদিবাসীর। এমন এক রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হয়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হতে পারে না। অথচ ধর্মবিহীন নয়। সব ধর্মের স্থান আছে। শুধু স্থান নয়, সমান স্থান। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের তিনি একচ্ছত্র রাজা ছিলেন না, মুসলিম লীগের যেমন জিন্না। তাঁর সেকুলার স্টেটকে উপহাস করার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাও ছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি হিন্দু ভোটের উপর। ধর্মান্ধতার উপর। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের উপর। কাগজে-কলমে সেকুলার, অথচ কাজকর্মে সনাতন হিন্দু, এমন মন্ত্রী ও কর্মচারীর অভাব ছিল না। এখনো কি নেই?

তবু স্বীকার করতেই হবে যে ইনডিয়া স্বাধীন হয়ে হিন্দু রাষ্ট্র হয় নি। হতে পারত। হতে চাইলে কেউ বাধা দিত না। নেতারা তো প্রায় সকলেই হিন্দু। হিন্দু-ভোট না পেলে নির্বাচিত হতেন না। নেহরু একা কী করতে পারতেন? গান্ধীজী তো সংবিধান রচনাকালে ছিলেন না। আমার মতে ইনডিয়ান ইউনিয়ন তথা তার সংবিধানই নেহরুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ-দুটিকে আমরা দুই চক্ষের মণির মতো সযত্নে রক্ষা করব। তাঁর শতবার্ষিকীতে এই হোক আমাদের দুর্জয় সঙ্কল্প। পার্টিশন না হলে এ-দুটি সম্ভব হতো না। এটা অপ্রিয় সত্য। অপ্রিয় সত্যকে মেনে নিয়ে ভুলতে হবে ও ক্ষমা করতে হবে অতীতকে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দিলে জাতীয়তার জোর ভেঙে যায়।

বিয়াল্লিশ সালে বা তার একটু আগে একজন আইরিশ ক্যাথলিক পুলিস অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি মনে করেন তামিল ব্রাহ্মণ ও পানজাবি মুসলমান মিলে এক নেশন হতে পারে? এক টেবিলে খেতে পারে?' আমি জানতুম যে তামিল ব্রাহ্মণ তামিল অব্রাহ্মণের সঙ্গেও এক টেবিলে খায় না। আমার সহকর্মী কৃষ্ণ স্বামী আমাকে বলেছিলেন, "আপনি যদি ওদের দেখেন তো বুঝতে পারবেন যে ওরা এক রেস নয়।' অর্থাৎ আর্য, অনার্য। ধর্মের মিল থাকলে কী হবে, নৃতাত্ত্বিক জাতির মিল নেই। সেটা ছিল পানজাবি মুসলমানের সঙ্গে পানজাবি হিন্দু ও শিখের। বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে বাঙালি হিন্দু ও বৌদ্ধের। কেন তা হলে তারা এক নেশন হতো না!'

আমি উত্তর দিই, 'হাঁ, তামিল ব্রাহ্মণ ও পানজাবি মুসলমানও এক নেশন, কারণ তাদের একই অন্বিষ্ট। দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়? স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই তাদের মেলাবে। স্বাধীনতা পেলে স্বাধীনতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষাই তাদের এক নেশন করে রাখবে।' আমার সংশয় ছিল না যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই সবচেয়ে প্রবল শক্তি। নইলে খান আবদুল গফ্‌ফর খান প্রমুখ মুসলমানরা কেন গান্ধীজীর মতো ধর্মপ্রাণ হিন্দুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেন?

তখন সেই আইরিশ ক্যাথলিক পুলিস অফিসারের মর্মবেদনা আমি ঠাহর করতে পারিনি। তাঁর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও ক্যাথলিক প্রটেস্টাণ্ট নির্বিশেষে এক ও অভিন্ন ছিল। স্বাধীনতার লগ্ন যখন উপস্থিত হলো তখন প্রটেস্টাণ্টরা চেয়ে বসল দেশের উত্তরাঞ্চল। খণ্ডিত হলো আয়ারল্যানড। উত্তরাঞ্চল হলো ব্রিটেনের শামিল। অবশিষ্ট আইরিশ ফ্রী স্টেট। ক্যাথলিক ও

প্রটেস্টাণ্ট মিলে এক নেশন হলো না। তামিল ব্রাহ্মণ ও পানজাবি মুসলমান মিলে এক নেশন হতে পারে এটা তিনি বিশ্বাস করেন না। আমি করি।

স্বাধীনতার অন্য নাম রাজক্ষমতা। রাজক্ষমতা যখন হাতের নাগালে এসে যায় তখন ক্ষমতার বখরা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। অবিভক্ত আয়ারল্যানডে ক্যাথলিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। প্রটেস্টাণ্টরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। মেজরিটি মাইনরিটির চেয়ে সব সময়ই ভোটের জোরে শক্তিমান। নির্বাচনী বলপরীক্ষায় মাইনরিটি হারবেই। তাই আগেভাগে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাওয়া ও পাওয়া। নইলে গৃহযুদ্ধ বেধে যেত। আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারা গৃহযুদ্ধের ভয়ে দেশভাগে সম্মত হন। গৃহ-যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল। মহড়াও দেওয়া হচ্ছিল। মেজরিটিও মাইনরিটিকে ভয় করে, যদি হিংসা এসে ধর্মের সঙ্গে যোগ দেয়।

গান্ধীজী জবাহরলালকে সুধান, 'তোমরা কি হিংসার কাছে নতিস্বীকার করলে?' নেহরু জবাব দেন, 'আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার কাছে নতিস্বীকার করলুম।' তেমন নতিস্বীকার দুর্বলতা নয়। অপ্রিয় হলেও সত্যটা তো এই যে মুসলিম মাইনরিটি হিন্দু মেজরিটিকে রাজক্ষমতার সিংহের ভাগ দিতে অনিচ্ছুক। সে মাইনরিটি হলেও তাকে দিতে হবে প্যারিটি। প্যারিটি দিলে দাঁড়িপাল্লা সমান রাখার জন্যে বড়োলাটকে রাখতে হবে ও তাঁর হাতে দিতে হবে ভীটো। তার চেয়ে ছোটো মাপের পাকিস্তান ভালো। ফাইনাল সেটলমেনট।

স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়, ১৯৪৫-৪৭

সুনীল সেন

তিন

দেশে বিকাশমান বৈপ্লবিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি "শেষ সংগ্রামের দিকে এগিয়ে চলো" শীর্ষক প্রস্তাব গ্রহণ করে ৫ অগস্ট ১৯৪৬-এ। তাতে এক 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সংগঠিত করার কথা বলা হয়; কেন্দ্রীয় শ্লোগান ছিল 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সহ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারদের ভিত্তিতে এক সংবিধান পরিষদের জন্য জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা চাই, প্রতিটি জাতীয় গোষ্ঠীর পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ চাই।' আশু কর্তব্য হল 'সকল দেশ-প্রেমিক দলের (যেমন কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী পার্টি) এক 'ঐক্যবদ্ধ মোর্চা' গঠন। কংগ্রেস এবং লীগের 'আপস-নীতি'র কঠোর সমালোচনা করা হয়। কিন্তু আশা ছিল আন্দোলনের চাপে তাদের 'ঐক্যবদ্ধ মোর্চা'য় টেনে আনা যাবে। দলিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নি। দেশে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির পর্বে কৃষকসমাজ পিছনে পড়ে আছে। 'ভূস্বামী-প্রথা উচ্ছেদের জন্য' কৃষক-সংগ্রাম শুরু করার বিশেষ আহ্বান জানানো হয়। অনুমান করা হয় যে, 'বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান' অব্যাহত থাকবে; 'ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত আঘাতের' সম্ভাবনা বিদ্যমান।[১]

এই প্রসঙ্গে "অধিকারী থিসিস" (Adhikari thesis) আলোচ্য। ড. গঙ্গাধর অধিকারীর গবেষণার পরিণতি এই পুস্তিকায় সর্বপ্রথম ভারতের জটিল জাতিসমস্যা আলোচিত হয়েছিল; জাতীয় সংহতির স্বার্থে জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতির দাবি ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের উদীয়মান আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা পুস্তিকায় গুরুত্ব পেয়েছিল; সেই সঙ্গে 'rational kernel of Pakistan'-র পক্ষে যুক্তি ছিল। অনেকের মনে হয়েছিল, কমিউনিস্ট পার্টি লীগের পাকিস্তান দাবির সমর্থক। রজনী পাম

দত্তের আপত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগকে সমপর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। দুটো প্রতিষ্ঠানই 'বুর্জোয়া' এবং 'আপসপন্থী'।

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে বোঝা গেল, চল্লিশের দশকে লীগ কী বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের ৩০টি আসনের সবকটি এবং প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলমানদের ৪৮২টি আসনের মধ্যে ৪২৭টিতে লীগ জয়ী হয়। বাঙলায় ১২৩টি মুসলমান আসনের মধ্যে ১১৩টি পেল লীগ; ফজলুল হকের পার্টি মাত্র ৫টি। কৃষক-প্রজা দলে ভাঙন এসে গিয়েছিল ১৯৪৩-৪৪-এ; অনেকে লীগে যোগ দিলেন, কিছু অংশ (বিশেষ করে মৈমনসিংহ জেলায়) কমিউনিস্টদের সমর্থক হলেন। লীগের মন্ত্রিসভা গঠন করলেন সুরাবর্দি। কৃষক-প্রজা দলের প্রাক্তন নেতারা মন্ত্রিসভায় ছিলেন।[২]

ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। অনেকের ধারণা (এঁদের মধ্যে প্রধান আয়েষা জালাল), জিন্না দলের উগ্রপন্থীদের চাপে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ১৬ই অগস্ট কলকাতা প্রত্যক্ষ করল সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের এক বিরাট বন্যার সূচনা—ব্রিটিশ রাজের শেষ পর্বে যা সারা ভারতকে প্লাবিত করেছিল। দাঙ্গার বিবরণ দেওয়া এই প্রবন্ধের বিষয় নয়। দাঙ্গা কী ভাবে দেশের রাজনীতিকে এবং বিশেষ করে শ্রমিক-আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল, আমরা সেটা সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করব। প্রাদেশিক পরিস্থিতিকে চিত্রিত করাই হবে আমাদের মূল চেষ্টা। অবশ্য বলে রাখা ভালো, আরো তন্ন-তন্ন করে প্রত্যেকটি প্রদেশের পরিস্থিতির মূল্যায়ন বিনা ব্রিটিশ রাজের শেষ পর্ব উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য। শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর কার্যাবলী বর্ণনা করে এই পর্ব বিশ্লেষণের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মনে হয়।

কলকাতার হত্যাকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিবরণ দিয়ে স্টেট্‌সম্যান লিখেছিল: 'চারিদিকে মৃত্যু, ক্ষত, ধ্বংস। স্ত্রী-পুরুষ-শিশু সমেত ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে।' দাঙ্গার আগুন নেভাতে সুরাবর্দির ব্যর্থতার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছিল এই পত্রিকা। হাওড়া, হুগলী এবং চব্বিশ পরগনার কিছু শ্রমিক অঞ্চলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল; কলকাতায় মেটিয়াবুরুজ আদৌ অক্ষত ছিল না।[৩] কলকাতার পরে নোয়াখালির হত্যাকাণ্ড। এই তমসাময় পটভূমিকায় বাঙলায় শুরু হল তেভাগা আন্দোলন। ৭ই জানুয়ারি গান্ধী শুরু করলেন নোয়াখালিতে "এক রাত এক গ্রাম সফর"।

২৯ জুলাইয়ের কলকাতা আর ফিরে এল না বঙ্গে, কিন্তু শ্রমিক-আন্দোলন তখনো মুমূর্ষু হয় নি। ২১ জানুয়ারি শুরু হল ট্রাম-শ্রমিকদের ধর্মঘট, যে ধর্মঘট চলেছিল ৮৫ দিন। ৬ ফেবরুয়ারি পোর্ট শ্রমিকদের বৃহত্তম ধর্মঘটের শুরু, যে ধর্মঘট আংশিক জয় অর্জন করেছিল। ৫ ফেবরুয়ারি ভিয়েতনাম দিবসে কলকাতা ছাত্র আর শ্রমিক ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে উঠল।[৪] মার্চ থেকে অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। সরকারি বিবরণ অনুসারে, মাত্র পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যুক্ত ছিল। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১৮ মার্চ মূল দাবি দিবসের আহ্বান জানাল। কিন্তু সেদিন তেমন শ্রমিক-বিক্ষোভ দেখা গেল না। প্রদেশ ট্রেড-ইউনিয়ন-কংগ্রেস ২৮ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস এর বিরোধিতা করে বিবৃতি দিল। ২৭ মার্চ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দ্বিতীয় পর্ব। ২৮ মার্চ সৈন্য নামল রাজপথে।[৫] আবার রক্তাক্ত দাঙ্গা—যেটা চলেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের আগের দিন পর্যন্ত। গণসংগ্রাম চুর-চুর করে ভেঙে পড়ল।

কলকাতায় ছুটে এলেন সেই শক্তি। উগ্র বাম-পন্থীরা যাঁর সমালোচনায় এখনো পঞ্চমুখ। বেলেঘাটায় অবস্থান করে গান্ধী দাঙ্গা বন্ধের জন্য জীবন পণ করলেন। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য ভাষায় গান্ধীর জীবনের 'শেষ দীপ্ত অধ্যায়' তখন প্রতিভাত। কোনো সন্দেহ নেই, দ্বিতীয় দাঙ্গার পেছনে ছিল

বড়বাজারের মাড়োয়ারি গোষ্ঠী। গান্ধীহত্যার ষড়যন্ত্র তখন শুরু হয়ে গিয়াছে। তাঁর শেষ যাত্রা আসন্ন। ক্ষমতাহস্তান্তরের দিন মহাত্মার দৃষ্টি নিবদ্ধ দেশের বিষণ্ণ ভবিষ্যতের দিকে।

সংবাদপত্রে প্রচারের কল্যাণে নোয়াখালির দাঙ্গা হিন্দুদের চঞ্চল করে। বিহারে হিন্দুরা দাঙ্গা বাধায়। পাটনার জনসভায় নেহরু বক্তৃতায় বললেন, এটা হিন্দুদের 'মহা পাপ'। অমনি প্রস্তরবর্ষণ; জেলা-শাসক লিখছেন, পুলিশের সাহায্যে তাঁকে সভার বাইরে আনা হল।[৬] নেহরু সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন: 'উন্মত্ততার প্রতিযোগিতা চলছে।' উন্মত্ততা বন্ধের জন্য মহাত্মা স্বয়ং গেলেন বিহারে। ডিসেম্বর (১৯৪৬) থেকে অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। তার মূলে ছিল বকস্ত সংগ্রামের দ্বিতীয় তরঙ্গ আর কয়লা-খনি অঞ্চলে ব্যাপক ধর্মঘট। একমাত্র বিহারে সেদিন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, ফরওয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টি, এবং রায়পন্থীরা (র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাট) মিলিত হয়েছিলেন। ওয়াভেল লিখলেন: 'Jayprakash is reaching open rebellion'।[৭] মার্চ মাসে অসাধারণ পুলিশ ধর্মঘট। সত্যি, সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ বিহারে সেদিন বৈপ্লবিক আন্দোলন তুঙ্গে। সম্ভবত এর মূলে ছিল বামপন্থী ঐক্য।

তার অর্থ এই নয় যে, সারা ভারতে বামপন্থী ঐক্য গড়ে উঠছিল। বোমবাইতে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের সাম্যবাদ-বিরোধিতা ছিল হিংস্র। উত্তরপ্রদেশে আচার্য নরেন্দ্রদেব স্বয়ং কমিউনিস্ট-বিরোধী। বাঙলাদেশে সমস্ত বামপন্থী দল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। ঢাকায় প্রতিভাবান তরুণ সাহিত্যিক সোমেন চন্দের (যাঁর "ইঁদুর" গল্প অবিস্মরণীয়) নৃশংস হত্যা হয়তো অনেকের মনে পড়বে। মৈমনসিংহেও কমিউনিস্ট কর্মী ফণী চক্রবর্তী নিহত হয়েছিলেন "বিপ্লবী"দের হাতে। কংগ্রেসের দুর্গ উত্তর প্রদেশের তখন কী অবস্থা? হেইগ (ওঁর বাবা হ্যারি হেইগ ইউ. পি-র গভর্নর ছিলেন) লিখেছেন, ১৯৩৭-৩৯ এবং ১৯৪৬-এ কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক ভালো ছিল ('much of the best in India')। প্রজাস্বত্ব আইন উন্নত ছিল। ১৯৪৬-এ জমিদারি উচ্ছেদ বিল পেশ করা হয়েছিল। সাধারণভাবে 'আমরা ছিলাম কংগ্রেস-বিরোধী; মুসলমানদের আমরা একটু খাতির করতাম'। মোরাদাবাদে মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি; আবার মোরাদাবাদে গঙ্গার তীরে বসত জাঠ সম্প্রদায়ের বিশাল মেলা।[৮]

জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বৃহত্তম কেন্দ্র এই রাজ্য। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ কমিউনিস্ট —ড. কে. এম. আশরফ, ড. জেড. এ. আহ্‌মদ, সাজ্জাদ জাহির, মামুদাজফফর, অধ্যাপক হবিব, ড. নুরুল হাসান। এঁদের সঙ্গে নেহরুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। মাঝে-মাঝে এই রাজ্যে দাঙ্গা বাধলেও তা মারাত্মক হয় নি। উগ্রপন্থীদের কেন্দ্র আলিগড়। অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে ১৯৪১ সাল থেকে; মুসলমান আই.সি. এস কর্মচারীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা-বাদ দেখা গেল; তা প্রকট হল ১৯৪৬-এ। অনেকেই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে চলে গেলেন।[৯]

শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র কানপুর। শিল্প-পতিরা ভারতীয়। ১৯৩৯ সালের ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট জয়যুক্ত হয়েছিল; তার অন্যতম নেতা আর. ডি. ভরদ্বাজ। একাধারে বুদ্ধিজীবী আর শ্রমিকনেতা। লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-দিবসের পরেও কানপুর ধর্মঘটে উত্তাল। সরকারি বিবরণীর একটি অংশ এই-রকম: 'Labour is in an entreme state of ferment and the situation is being cynically exploited by the CPI for political ends'.[১০] ১৯৪৭ সালের ৬ জানুয়ারি কানপুর শ্রমিক মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ হয়; একজন মহিলা-শ্রমিক মারা যান। তারপর সাধারণ ধর্মঘট, যাতে যোগ দিলেন এক লক্ষ শ্রমিক। চরম দমননীতির ফলে আন্দোলন থেমে যায়।[১১] মার্চ থেকে পানজাব দাঙ্গার সূচনা;

তাঁর ধাক্কায় কানপুরের শ্রমিক আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সরকারি বিবরণে আছে : 'Civil war in Punjab has completely overshadowed everything'.[১২] কিন্তু তখনো শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা মহম্মদ ইউসুফ ; শ্রমিকদের অধিকাংশ হিন্দু। স্বাধীনতা পর্যন্ত আর কোনো বড়ো ধর্মঘট কানপুরে ঘটে নি। কয়েকটি জেলায় কৃষক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে এই আন্দোলনের কথা বলা হবে।

ব্রিটিশ রাজের শেষ অঙ্কে শাসকশ্রেণীর দৃষ্টি প্রধানত নিবদ্ধ ছিল পানজাবে। অবিরাম চেষ্টা চলেছিল অকালী দল এবং শিখদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট বিরোধী মোর্চা গঠন করা। প্রায় একই সঙ্গে চলছিল মুসলিম লীগের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার অক্লান্ত চেষ্টা। শিখদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়াতে যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি মেজর শর্ট। শর্টের রাজনীতিক জীবন বৈচিত্র্যময়।

মেজর জে. এম. শর্ট (১৮৯৭—১৯৬৯) প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শিখ রেজিমেনটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি পানজাবে চলে আসেন এক বিশিষ্ট কর্মচারীরূপে, তাঁর কাজ ছিল শিখদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা। ঠিক কী ভাবে তাঁর সঙ্গে সেকালের কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা অরুণ বসু, রমেশ চন্দ্র এবং রমেশ সিনহার পরিচয় হল, তা ঠিক পরিষ্কার নয়। ১৯৪২-এ তিনি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ছাত্র ফেডারেশনের বিশেষ সম্মেলনে ছিলেন এবং পি. সি. জোশীর সঙ্গে পরিচিত হন। এক মাসের মধ্যে সেনাবিভাগ থেকে তিনি পদচ্যুত হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তিনি অবশ্য অন্য কাজে নিযুক্ত হন এবং ভারতে শিখ বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। ১৯৪৫-এ তিনি ক্রিপসের নজরে পড়েন এবং ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আবার ভারতে আসেন তাঁর দুই বন্ধু—সর্দার বলদেব সিং এবং ভি. পি. মেনন। ইতিমধ্যে পানজাব রঙ্গমঞ্চে পেণ্ডারেল মুনের প্রবেশ। শর্ট, মেনন এবং মুনের মধ্যে পত্রবিনিময় চলে মাসের পর মাস। পানজাবের এই অধ্যায়ের জন্য আমরা নির্ভর করব শর্ট কালেকশন-এর উপর। যতদূর জানি, ভারতীয় পণ্ডিতরা এই কাগজপত্র ব্যবহার করেন নি।

শর্ট সঠিকভাবে শিখদের প্রধান স্বার্থের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর্বে সেনাবিভাগের এক-চতুর্থাংশ ছিল শিখ। তাদের অভিযোগ, সেনাবিভাগে শিখদের পুরনো আধিপত্য বিলীয়মান। সেই আশঙ্কা দূর করবার জন্য বিশেষ প্রচার-বাহিনী স্কুল-কলেজে এবং গ্রামদেশে পরিক্রমা করে; হাজার-হাজার ইস্তাহার এবং পোস্টার বিলি হয়। ১৯৪২-এ প্রায় চল্লিশ হাজার শিখ ভারতীয় সেনাবিভাগে যোগ দেন। 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন থেকে অকালী দলের নেতা মাস্টার তারা সিংহ সমর্থন প্রত্যাহার করেন। পানজাবে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আদৌ বিকশিত হয় নি। বিদেশ থেকে আগত বিখ্যাত "গদর" দলের নেতারা কমিউনিস্ট দলে যোগদান করেন; অকালী দল তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে পড়ে। অকালী দলের সামাজিক ভিত্তি কৃষক; এই দল কংগ্রেসবিরোধী এবং লীগ-বিরোধী। এক নির্ভেজাল সাম্প্রদায়িক দল। তারা সিং-এর দাবি—বড়লাটের কার্যনির্বাহক কমিটিতে একজন শিখ নেতাকে নিতেই হবে। শিখরা অনেক দল-উপদলে বিভক্ত; তবে দুজনের নক্ষত্র উদীয়মান—সর্দার বলদেব সিং এবং পাতিয়ালার মহারাজা।[১৩] ১৯৪৬-এর নির্বাচনে কমিউনিস্ট দলের সকল প্রার্থী পরাজিত হন। অকালীরা পুরোভাগে আসে।

শর্ট ছয় মাস বলদেব সিং-এর অতিথি হয়ে দিল্লীতে বাস করেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলদেব সিং সম্পর্কে শর্টের "গোপন চিঠির" একটি অংশ এই : '...he had decided that three things were essential to forward his aim—the liquidation of the INA—retention of

as many as possible of our military officers—the retention of anything and everything he could salve of India's military association with us……।[১৪] আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্রদের জানা থাকা উচিত যে, সাম্রাজ্যের আসন্ন ভাঙনের পর্বে শাসকশ্রেণীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য থাকে প্রাক্তন উপনিবেশের সঙ্গে সামরিক সম্পর্কের বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা। সেই খেলা মিশরে চলেছিল। সুয়েজ সংকটের (১৯৫৬) অন্যতম উৎস ব্রিটিশদের এই প্রচেষ্টা যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল নাসেরের দৃঢ়তার মুখে।

ইতিমধ্যে শরৎ বোসের সঙ্গে কংগ্রেসেব মধু-চন্দ্রিকা শেষ; তিনি আবার বামপন্থী শিবিরে। দক্ষিণপন্থীরা সজাগ এবং সক্রিয়। বামপন্থী আন্দোলনের পুরোভাগে কমিউনিস্ট পার্টি। ভি. পি. মেনন সাফল্যের মই বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেছেন। মেজর শর্টকে তিনি লিখছেন : '…if we do not support the Right-wing which is now in office, we will be swamped by the Left।'[১৫] নিঃসন্দেহে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য। মেনন তখন মাউন্টব্যাটেন এবং প্যাটেলের প্রিয়পাত্র।

মুসলিম লীগ এবারে নতুন সংকল্প নিয়ে আসরে নামল। তাদের উদ্দেশ্য খিজর হায়াৎ খাঁ মন্ত্রিসভার পতন। লীগের তীব্র আন্দোলনের মুখে খিজর মন্ত্রি-সভার পতন হল। পানজাবে শুরু হল দাঙ্গা, যার তুলনা বিরল। একদিকে অকালী দল এবং আর. এস. এস. (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ), অপর দিকে লীগ। ১৯৪৮-এর মার্চের মধ্যে ৬০ লক্ষ মুসলমান এবং ৪৫ লক্ষ হিন্দু নিহত হল।[১৬] পৃথিবীর কয়টি বড়ো যুদ্ধে এত মানুষ নিহত হয়েছে?

পানজাবের সেই ভয়ঙ্কর পর্বের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়েছেন ফ্রানসিস মুদি। খিজর হায়াৎ খাঁর পদত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে দাঙ্গার আগুন ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশ কর্মচারীদের মধ্যে মনোবল অন্তর্হিত হয়েছিল। এক বিশেষ বিমানে জেনকিনস সহ কর্তাব্যক্তিরা ভারত ছাড়লেন। তখন মুদি গভর্নর। লাহোরে প্রতিদিন আসছে লক্ষ-লক্ষ বাস্তুহারা, একদা যারা ছিল পূর্ব পানজাবের কৃষক। প্রায় ৬০ লক্ষ বাস্তুহারা পাকিস্তানে এসেছিল আর ৪০ লক্ষ গেছিল ভারতে। মুদির মন্তব্য : 'I had long been in favour of the Pakistan solution to India's future government।'[১৭] পেণ্ডারেল মুনও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শিখদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ অনেকদূর প্রসারিত হয়েছিল।

এই তমসাচ্ছন্ন পটভূমিকায় কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করবার চেষ্টা করেছিল। জয়প্রকাশও পানজাবে এসে জনসভায় বক্তৃতা করেন। শ্রমিকদের অন্যতম নেতা মির্জা ইব্রাহিম, যাঁর দুর্জয় সাহস দাঙ্গাবিধ্বস্ত পানজাবে সেদিন শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। কিন্তু হায়, তাঁদের সকল চেষ্টা বিফলে গেল।[১৮] ঘূর্ণীঝড়ের মতো দাঙ্গা সব গণ-আন্দোলন মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। অবিভক্ত ভারতের সমাধি রচিত হয়েছিল পানজাবে।

তথ্যনির্দেশ

১. People's Age, 11 August 1946। ২৩ জুলাই থেকে ৫ অগস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসেছিল। পি. সি. জোশীর For the Final Bid for Power, 1945 দ্রষ্টব্য।

২. যতীন দে, History of the Krishak Praja Party, 1929-47, অপ্রকাশিত পি. এইচ.ডি থিসিস, ১৯৭৭।

৩. Statesman, ২০ অগস্ট, ১৯৪৬; P. D. Mortyn, Memoirs of Official Life; M. M. Stuart, Memoirs। স্টুয়ার্ট লিখেছেন : 'Suhrawardy instead of being ashamed himself, demanded to know why I was only arresting and prosecuting Muslims'.

৪. Home / Poll, নং ১৮/২/৪৭।
৫. Statesman, 29 March 1947।
৬. H. B. Martin, Memoirs of Official Life।
৭. Mansergh, ঐ ফাইল নং ১৪৬।
৮. G. A. Haigh, Memoirs of Official Life।
৯. J. D. Shukla, Memoirs of Official Life।
১০. Home / Poll, নং ১৮.৮.৪৬।
১১. U.P. Legislation Assembly Debates, খণ্ড ২৬, জানুয়ারি ১৯৪৭। পুলিশ ৭২ রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করেছিল। তখন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস নেতা পন্থ।
১২. Home / Poll, নং ১৮.৩.৪৭।
১৩. Short Collections, 1940-48 ; ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি। অগস্ট, ১৯৪০ দ্রষ্টব্য।
১৪. ঐ, Very Personal Letter of Short to Alexander, 11 August 1948 শর্ট জানান দিল্লীতে চারজন ভারতকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে রাখতে সচেষ্ট : ভি. পি. মেনন, বলদেব সিং, মাউণ্টব্যাটেন দম্পতি। আইরিন হ্যারিসন লিখছেন : "At night Major Short came...there is much to be done in the background.' (Irene Harrison, Agatha Harrison, 1956, p. 120)।
১৫. ঐ, শর্টকে ভি. পি. মেননের চিঠি। ৭.১.৪৭, ফাইল নং ১৬/১৭।
১৬. Penderel Moon, Divide and Quit, 1961. পেণ্ডারেল মুনের পত্রাবলীর (১৯৪৬-৪৭) বিবরণ দেয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। বর্তমান লেখকের প্রত্যয়, ঐতিহাসিক হিসাবে পরিচিত মুন সেদিন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুনের মতো অনেক ব্রিটিশ আই.সি. এস ভারতবিভাগের পক্ষে ছিলেন।
১৭. Sir Francis Mudie, Memoirs of Official Life। উত্তর প্রদেশের রাজনীতির (১৯৩১-৪৭) উপর মুদির বিবরণ নতুন আলোকপাত করে। মুদির নেহরু-বিদ্বেষ প্রবল এবং অপ্রতিরোধ্য।
১৮. Home / Poll, নং ১৮.৩.৪৭।

"নাচ",
অথবা
একটি রহস্যের সম্ভব উদ্ধার

লোকনাথ ভট্টাচার্য

ফ্রাঁক আঁদ্রে জাম-কে

এক : নাচ

তাকেও শেষে চোখ রাঙাতে হয়, ব'লে উঠতে হয়, "কী, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?" বলে, ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তোমাদের ওপর।

সে, যে শান্তশিষ্টের চূড়ান্ত, কিছু চায়নি তোমাদের কাছে—তোমাদের গায়ে আঁচড়টি কাটারও অভিপ্রায় তার ছিল না। সে শুধু এসে বসে, গুটিসুটি হ'য়ে, একটু জায়গা ক'রে তোমাদেরই পাশে—কারণ একই ঘরের এটা-ওটা সামগ্রী তোমরা সবাই, এড়ানো যায় না। এড়াতে চায়ও নি সে।

আর তোমরা কী করলে? খপ্ ক'রে ধরলে ওকে, কেউ ওর হাত'টা, কেউ বা পা'টা, কেউ বা নাসারন্ধ্রের তলায় ভ্রমরের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসলে।

তবু অত সহজে ছাড়বার পাত্র তো তোমরা নও, তাই খেলা জমছে না দেখে তোমাদের হঠাৎ নাচতে ইচ্ছে হল, ওকে নাচাতে ইচ্ছা করল। আসন থেকে হিড়হিড় ক'রে টেনে, তাকে নামিয়ে আনলে ঘরের মধ্যিখানে—পরে, বৃত্তাকারে, একে-অন্যে হাতে হাত বেঁধে, ওকে নিয়ে শুরু করলে সাঁওতালি নাচ।

আমাদের ধারণা, ও তখন কাকুতি-মিনতি নিশ্চয় করে, বলে হয়তো, "ছেড়ে দাও ভাই, একটু একলা থাকতে দাও", বা হয়তো, "আমার ভালো লাগছে না।"

"ভালো তবে লাগাচ্ছি তোমায়", এই ব'লে অন্ধ আহ্লাদে তখন হয়তো তোমাদেরই কেউ-কেউ শুরু করলে ওকে সুড়সুড়ি দিতে, এই ওর বগলে, এই পায়ের তলায়, এই কুঁচকিতে। আর সে, ধেই-ধেই নৃত্যে উন্মাদ, অত্যাচারে জর্জর, কান্নার সমান হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে-হাসতে দম বন্ধ হ'য়ে এল তার।

তেমনই কোনো এক মুহূর্তে, যখন আর পারছে না, সে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে নিশ্চয়—এবার প্রভুত্বের পালা তারই, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে। সজোরে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে, এসে বসে সামনে। আদেশের সুরে বলে, তোমাদেরই কাউকে, "তুমি এবার এসো দেখি নিজের জায়গায়, হও মরুভূমির বালু।" বলে অন্যকে, "তুমি হও মিনার।" বলে তৃতীয় কাউকে, "তোমাকে আমি করলাম সূর্যাস্তের আকাশ।"

মুহূর্তেই, তোমরাও হ'য়ে দাঁড়ালে ঠিক সেই-সেই জিনিসটি—এতক্ষণ অত্যাচার করেছ ওর ওপর, এবার ওর অত্যাচার সহ্য না ক'রে যাবে কোথায়। তবু সহজে ছাড়বে না সে-ও, তাই বলল, "বাছাধন সব, এবার নাচো তো দেখি।"

অমনি ড্যাং-ড্যাড্যাং-ড্যাং, নাচতে থাকলে তোমরা, মিনার আর মরুভূমির বালু আর সূর্যাস্তের আকাশ।

সেই নাচই চলছে এখনো—ও ব'সে নিজের আসনে, চোখ রাঙিয়েই চলেছে। ওপরে-নিচে ওঠে-নামে সূর্যাস্তের আকাশ, ডাইনে-বাঁয়ে চরকিবাজি খায় মিনার। এত মত্ত লোকটা যে ওর হুঁশও নেই, ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছেও না যে আমরা এসে হাজির, নিমন্ত্রিতের দল, দাঁড়িয়ে আছি, স্তম্ভিত। সব ইতিহাস-শূন্য এই গ্রাম, এখানে মিনার কোত্থেকে এল, বিশেষত এই ঘরে, ঐ কোণটায়, যেখানে চিরকাল দেখে এসেছি বইয়ের তাক? মরুভূমির বালু যেটা এখন, সেখানে ছিল মেঝে, সূর্যাস্তের আকাশটা ছিল সামনের দেয়াল। ঘরের খুঁটিনাটি মুখস্থ আমাদের—আজই তো প্রথম আসছি না।

ওকে কি ফিরিয়ে আনব ওর আগের স্বাভাবিকতায়? নাকি নাচ চলতেই দেব, আমরা দাঁড়িয়ে থাকব?

নাকি ফিরেই যাই, যেমন এসেছিলাম, তেমনি অজান্তে?

বলা বাহুল্য, হেন প্রশ্ন পাড়ছি মুখ না খুলেই, কারণ ওর কথা তো বাদই দিলাম, মনে হচ্ছে উত্তর দেওয়ার ফুরসত তোমাদেরও নেই।

দুই : উদ্ধারের প্রচেষ্টা

আপনার সময় মহামূল্য। তার একটু নষ্ট করবেন এই লেখাটি প'ড়ে। অবশ্য "নাচ" যদি প'ড়ে থাকেন, তবেই।

"নাচ" কি কবিতা হয়েছে? জানি না। কারণ কবিতা কাকে বলে, জানি না। এই লেখাটির মতোই "নাচ"-ও হয়তো এক ধরনের লেখাই। একটা প্রয়াস, লম্ফঝম্প, অসারগর্বীর পট। তবু মনে হয়েছে, তার একটা ব্যাখ্যা হয়তো দেওয়া চলে, এবং সেই ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটা সূত্র-সন্ধান ঘটতে পারে, যা হবে পূর্ব-পরের পরম্পরার ইমারত গঠন। এক ঝলকের একটি দর্শন, পরে সেই দর্শিত বস্তুর অনুলিখন। সেই অনুলিখনে যা দেখা গিয়েছিল, তার কতটা রইল, কতটা রইল না, বা বর্ণনা করতে গিয়ে তা কী ক'রে অন্য বস্তু হ'য়ে গেল, তারই আবিষ্কারের প্রত্যাশা এই প্রয়াস।

এতই অসমর্থ আমি যে সে-প্রত্যাশা পূর্ণ হোক, হেন প্রার্থনাতেও ভয় আমার। সবচেয়ে বড় ভয় কথাকে, কারণ এত বড় মিথ্যা হয়তো আর নেই, আত্মহননের এত বড় অস্ত্র আর নেই।

আগেই আপনার ক্ষমা চেয়ে নিলাম, যদিও আপনি আমার সামনে এখন নেই। আমার সামনে আপনি কোনো কালেই ছিলেন না, হয়তো কোনো কালেই থাকবেন না। একলা ঘরে আমিই রয়েছি, যেমন চিরকাল ছিলাম। সর্বপ্রথমে ক্ষমা চাওয়া উচিত হবে তাই হয়তো নিজেরই কাছে, নিজের প্রতি নিজেরই ঔদ্ধত্যের জন্যে। পা পিছলেছে একবার, অনেকবার, না-হয় আরো একবার পিছলালো। আমার মুখটা থেঁতলে যাক, আপনি দেখুন বা নাই দেখুন।

যাই হোক, আপনি হয়তো নেই, হয়তো এ-দরজায় কখনো আসবেন না উঁকি মারতে। তবু ধ'রে নিচ্ছি, রয়েছেন, দরজার বাইরে বা ভিতরেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে হাজির আছেন। "নাচ" পড়লেন তো? অতএব শুনুন পূর্ব-কথা।

আমি একটা লোক, আমিই সহস্র লোক। এ-ঘর আমার, একলারই, এক কোণেরই, তবু সে-

ঘরও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমি বেরিয়ে যাই ঘর থেকে, ফিরে আসি ঘরে, ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধ'রে থাকি। আর তখন, কখনো-কখনো, বাহির থেকে আগত দিনের অল্প আলোয় বা রাত্রির অন্ধকারে, নীরবতায় বুঁদ হ'তে-হ'তে, আমি নিজেই হই গান, নিজেই গায়ক, নিজেই শ্রোতা। আমিই হই রঙ্গমঞ্চ, আমিই নাটক, আমিই অভিনেতা, আমিই দর্শক। একটিমাত্র দর্শক, বা দু'জন দর্শক, বা তিনশো-চারশো জন দর্শক। ঘরের চুটকো-চাটকা সামগ্রী যত, তাকের উপর কাত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকা বই বা কুলুঙ্গিতে কৌটো, বা দেয়ালে লটকানো হাতপাখা, তারাও তখন আমার সঙ্গে সৌভ্রাত্রে-মৈত্রীতে সামগ্রিক অর্কেস্ট্রায় হয় ভিন্ন-ভিন্ন যন্ত্র, নিজেরাই বাদ্য, নিজেরাই বাদন, নিজেরাই বাদক, তোলে ঐকতান।

হাঁটু মুড়ে তারা তখন এসে বসে আমার পাশে, কেউ হয় সূর্য, কেউ চন্দ্র, কেউ বা প্রিয়া। দূর-দূরান্ত হ'তে পাড়ি দিয়ে এসেছে যেন কত অতিথি-অভ্যাগত। অথবা যদি যুদ্ধ চলছে কোনো, ঘর সহসা পরিণত হয়েছে কুরুক্ষেত্রে, রক্তের প্লাবন বইছে মেঝেয়, শূন্যে ধাবমান তীরের শাঁ-শাঁ শব্দ, তো তারাই তখন হয়েছে মিত্র ও শত্রুপক্ষের দুই সৈন্যবাহিনী। আগুনের হলকা বেরোচ্ছে তাদের নাসাসন্ধ্র হ'তে, পায়ে দ'লে ছিন্নমুণ্ডের সারি তারা এগোচ্ছে-পিছোচ্ছে, দাঁত কিড়মিড়-করা মুখ হ'তে অভিশাপের হুমকি ছিটকে বেরোচ্ছে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রেরই মতো। কনুই-এর গুঁতোয়-গুঁতোয়, অসহ্য স্থিতিতে-গতিতে, পিষ্ট, ক্লিষ্ট মুহূর্ত। হু-হু হাওয়ার হুংকারে সে এক প্রলয়-নাচ।

নাচ? নাচই বটে। আসা যাক বর্তমান নাচের প্রসঙ্গে তবে।

একদিনের কথা।

বাইরে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেছি। দেখি, চেনা একটা লোক ঘরে ব'সে আছে, একলা। মুখে-চোখে ভয়ংকর রাগের ভাব, যেন কিছু একটা ঘটেছে যাতে সে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে। তাই অমন দাঁতে দাঁত চেপে ব'সে রয়েছে, নিজেরই আসনে। যেন রাজা বসেছে তার সিংহাসনে, এবং এখন হাতের ওঠা-নামায়, শাসনের ভঙ্গিতে, ওঠ্-বোস্ করাচ্ছে তার সভাসদদের। সভাসদ অবশ্য কথার কথা, কারণ সে ভিন্ন ঘরে অন্য প্রাণী নেই। শুধু তার আশেপাশে যে-দুটো জিনিস নজরে না প'ড়ে উপায় নেই, তার একটা হল সূর্যাস্তের আকাশ, যেন পটের বিবি কোনো, রঙে-ঢঙে সাজগোছে সব বেশ্যাকে হার মানায়; অন্যটা এক মিনারের মতো বস্তু কিছু, যেন পুরাকালের কোনো বিজয়স্তম্ভবিশেষ, বা তার ধ্বংসাবশেষ, তার অর্ধাংশ কি সিকি অংশ।

এবং দুয়েরই অবস্থা অতীব কাহিল, অন্তত দেখেশুনে সেটা মনে হবেই। মিনারটা চরকিবাজি খাচ্ছে লোকটার চারিপাশে, এই কাত হ'য়ে, এই দাঁড়িয়ে উঠে। যদি মানুষ সে হত, বা জীবজন্তু-জানোয়ার, তো বলতাম তার দম বন্ধ হ'য়ে এসেছে, সে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। তার ইঁট বা পাথরের পাঁজরা ভেদ ক'রে যেন সেই করুণ আর্তনাদই উঠছে। এবং পটের বিবি সূর্যাস্ত? হায়-হায়, সে-বেচারীর দৈন্যদশা কিছু কম নয়। সে ওঠে আর নামে, এই কড়িকাঠে, এই মেঝেয়। তারও পাঁজরা যদি কিছু থাকত, থাকত হাত-পা-কনুই, বা কোনো পাছা বা মাথা, কোনো ক'ড়ে-আঙুল বা বুড়ো-আঙুল, তো এ-ঝঞ্ঝা শেষ হ'লে, শান্তি নামলে, তাকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে উপায় থাকত না।

আর লোকটা? সে কটমট ক'রে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। কখনো ঘাড়টা হয়তো একটু বেঁকাল, বাঁয়ে-ডাইনে বা ডাইনে-বাঁয়ে, ঐ মিনারের চরকিবাজিটা দেখতে। কখনো-বা মাথাটা ওঠাল-নামাল, একটু মাত্রই, ঐ সূর্যাস্তের ওঠ-বোসের নিরীক্ষণে। রাগে তার চোখ এখনো লাল, তবু কেমন

এক আত্মতৃপ্তির ভাবও যেন সেখানে।

নাকে যেন পাচ্ছি কী এক বালুরও গন্ধ, এক শুকনো খটখটে বালু, হয়তো মরুভূমিরই। তবে সেটাও উড়ছে এই হাওয়ায়-হাওয়ায় ?

এই দৃশ্য দেখলাম এক ঝলকে। এবং তা তখনো দেখছি, এসেছি কতক্ষণ জানি না। এবং দেখছি আমি একলাই নয়, যেন আমার সঙ্গে রয়েছে আমাদের এই গ্রামের পরিচিত, অল্প-পরিচিত, আরো কেউ-কেউ, যারাও দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমারই মতো, চলৎশক্তিহীন, স্তম্ভিত। লোকটা কিন্তু একেবারেই দেখছে না আমাদের দিকে, বহিরাগত কেউ যে এসেছে, এই বিচিত্র দৃশ্য দেখছে, সে-সম্বন্ধে তার কোনো সম্বিৎই নেই, এতই মগ্ন সে এই নৃত্যের উৎসবে, সে-নৃত্য যে সে পরিচালনা করছে এমন সর্বশক্তিমত্তার ভাবে, তা নিয়ে এতই দম্ভ তার। আরো মজা যা, তা হল আমরা যে এসেছি, সেটাও হুট ক'রে নয়—এসেছি, কারণ ও-ই আসতে বলে আমাদের, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সাদরে নিমন্ত্রণই করে, হয়তো ওর একলা মুহূর্তের কিছুটা গল্পে-গুজবে কাটানোর জন্যে, বা ওর কিছু খবর দিতে, বা আমাদেরই কিছু খবর নিতে। বা হয়তো গিয়েছিল কোনো বিদেশে, সেখান থেকে এনেছে কিছু, সেটা আমাদের দেখাবে।

এভাবে নিমন্ত্রণ ক'রে বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে এখন এসব কী কাণ্ড ? নাকি আমাদের নিয়ে একটু রসিকতাই করতে চেয়েছিল লোকটা ?

ঘটনাটা হল এই। এখন আমাদের প্রশ্ন অনেকগুলি। প্রথমত, এ-ঘরে যেহেতু আমরা এই প্রথম আসছি না, আগেও অনেকবার এসেছি, তাই ঘরে কোথায় কী আছে না-আছে, তা চোখ বুঁজেও ব'লে দিতে পারি সেখানে এখন অনেক অদলবদল দেখছি—এই যেমন, কুলুঙ্গিটা নেই, তাই কুলুঙ্গিতে যত্নে রাখা কৌটোটাও নেই, নেই সামনের দেয়ালটা, নেই বইয়ের তাকটা, নেই আরো কত জিনিস। উল্টে, নাকে পাচ্ছি মরুভূমির বালুর গন্ধটা, দেখছি কোত্থেকে সূর্যাস্তের গোটা একটা আকাশও এসে হাজির হয়েছে, সে যেন পড়া মুখস্থ করেনি ব'লে এখন দুর্বিনীত কোনো ছাত্রের মতো মাস্টারের উদ্যত বেত্রদণ্ডের সামনে কান ধ'রে ওঠ্-বোস্ করছে। চরকিবাজি খেয়ে চলেছে কোথাকার কোন্ একটা মিনারও। অতীব ভুতুড়ে ব্যাপার।

আমাদের শস্যশ্যামল দেশ, মরুভূমির কথা শুধু পড়েছি ভূগোলের বইয়েই, তবে ঐ বালুর গন্ধটা পাচ্ছি কোথা থেকে ? আর মিনার, বা বিজয়স্তম্ভ ? হায়-হায়, কোনো রাজা এখানে কোনো যুদ্ধ করেছে ব'লে শোনা যায়নি, কে তুলবে বিজয়স্তম্ভ, কার কীর্তি ঘোষণা করতে ? সেরকম কোনো ইতিহাস এ-গ্রামের কখনো ছিল না। বেশ, না-হয় এসেছেই—এবং এসেছে যে, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি—কিন্তু কথা হচ্ছে, এল কী ক'রে, এই বন্ধ ঘরে ? ঘরে জানালা আছে ঠিকই, একটা নয়, তিন-তিনটে জানালা, কিন্তু তাদের কোনোটাই এত বড় নয় যে তা দিয়ে বিজয়স্তম্ভটা ঢুকে পড়তে পারে, গোটা ঐ সূর্যাস্তের আকাশের প্রসঙ্গটা না-হয় বাদই দিলাম। তাছাড়া, যে-জানালা আছে, তাও ভিতর থেকে বন্ধ, ছিটকিনি দেওয়া, শুধু শার্সির কাঁচ দিয়ে বাইরের কিছু আলো এসে পড়তে পারে, অর্থাৎ, আলো যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই, মানে দিনের বেলা। এবং এটা দিনের বেলাই। অন্তত আসি যখন, তখন অপরাহ্ণই ছিল। তারপরে দশ মিনিটই যাক, কি বিশ মিনিটই যাক, তবু সন্ধ্যা নামার তো কথা নয়।

নাকি সন্ধ্যা নেমে গেছে, বাইরের পথ-ঘাট-অরণ্যে অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে নেমে এসেছে, এবং তা সত্ত্বেও ঘরে চলছে এই সূর্যাস্তের ভেল্কি ?

নাকি যেভাবে আমরা নিজেরাই ঢুকি, আগে বাইরের ভেজানো দরজা, পরে সেটা ঠেলে সর্পিল সিঁড়ি, পরে সিঁড়ি ভেঙে আরো এক ভেজানো দরজা, শেষে সেই দরজা ঠেলে এই ঘর, সেই একইভাবে পথ ক'রে নিয়েছে ঐ মিনার, ঐ সূর্যাস্তের আকাশ? পরে, ঘরে জায়গা হচ্ছে না দেখে, তারা ঐ একই পথে বনবাসে পাঠিয়েছে এ-ঘরেরই কিছু-কিছু সামগ্রীকে, যাদের দর্শন আমরা আর পাচ্ছি না, যেমন আগে বহুবার দেখা অতি পরিচিত সেই কুলুঙ্গিটা, বা কুলুঙ্গির কৌটোটা, বা বইয়ের তাকটা? এমন-কি ঘরের মেঝেটাও? কারণ সে-মেঝে আর নেই, সেখানে এখন মরুভূমির থই-থই বালু।

কী জানি। কেমন এক আতঙ্কে শিরশির ক'রে ওঠে আমাদের গা। আসি নিছক নিমন্ত্রণ-রক্ষার তাগিদে, কিন্তু এসে যে হেন কাণ্ডকারখানা দেখতে হবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল? অথবা এমন যদি হয়, আসলে বাইরে থেকে কিছুই আসেনি, কেউই নেয়নি কারুরই জায়গা, শুধু ঘরেরই কিছু-কিছু জিনিসের রূপান্তর ঘটেছে? অর্থাৎ, বইয়ের তাকটাই হয়েছে মিনার, মেঝে হয়েছে মরুভূমির বালু, সামনের দেয়ালটা হয়েছে সূর্যাস্তের আকাশ?

ভাবতে গিয়ে মনে হয়, হয়তো এই শেষের সম্ভাবনাটাই সত্য হ'তে পারে। কিন্তু তেমন একটা অঘটন কেন ঘটতে গেল? একটা কারণ তো থাকা চাই। তার ওপর ঐ রাগ-রাগ ভাবটা লোকটার, ঐ শাসনের ভঙ্গি তার, সেটার পিছনেও বা কোন্ যুক্তি থাকতে পারে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার যেন ধরতে পারছি, কী হ'য়ে থাকতে পারে। বলব? শুনবেন?

আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু আমরা বিলক্ষণ জানি, খামাখা এমন রেগে যাবে, হেন স্বভাব এই লোকটির নয়। তাই তাকে এভাবে রাগিয়ে তোলার মতো অস্বাভাবিক নিশ্চয় কিছু ঘটেছে। তার এই ঘর থেকে সে হয়তো একটু বাইরে যায়, ফিরে আসে, পরে চুপচাপ নিজের নীরবতায় ব'সে থাকতে চায়, একটু ছোট্ট জায়গা করে কোথাও, ঘরের কোনো সামগ্রীকে এতটুকু বিরক্ত ক'রে নয়, তাদের এড়িয়েও নয়। এবং এড়াতে যাবেই বা কেন, বা কী ক'রে? এটা যেমন তার ঘর, তেমনি সামগ্রীদেরও ঘর। সে যেমন থাকে এখানে, তেমনি সামগ্রীরাও থাকে। এ-ঘরের যে-মুহূর্ত তার, তা সেই সামগ্রীদের সঙ্গে এক ঐক্যের সুরে মিলিত হ'য়েই।

কোনো একটি কারণে, সেই ঐক্যে ভাঙন ধরে নিশ্চয়, এবং সে-ভাঙন ঘটায় সামগ্রীরাই, লোকটা নয়। আমাদের চোখ খুলে যাচ্ছে, হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি কীভাবে কী ঘটে। ঐ লোকটা এসে বসল, তার প্রশান্তির স্বপ্নে বুঁদ হ'য়ে। আর তখন কোন্ খেলায়, কোন্ ছিনালিপনায় ভূত ঘাড়ে চাপল কিছু-কিছু সামগ্রীর, হয়তো সেরকম ষড়যন্ত্র আগে থেকেই ক'রে রেখেছিল তারা নিজেদের মধ্যে। কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসল লোকটার কোল, কেউ ধ্যানে নিমগ্ন মুনির মাথায় কাকের মতন আসীন হল তার কেশগুচ্ছে, ঠোকরাতে থাকল তার কপাল। কেউ-বা তার নাসারন্ধ্রের চারিধারে গুনগুন ক'রে ঘোরা শুরু ক'রে দিল ভ্রমরের মতো।

অস্বস্তিতে কেঁপে ওঠে লোকটি, হাতের চালনায় এই দূরে তাড়ায় ভ্রমরটাকে, এই সামলায় কাকের ঠোকর। তবু তখনো সে গ্যাঁট হ'য়ে ব'সেই থাকে, খুব একটা বিচলিত হচ্ছে ব'লে মনে হয় না। অতএব খেলাটা আরো একটু জমানো চাই, আরো উৎপাত করতে হবে লোকটাকে। তাই তাকে হিড়হিড় ক'রে টানতে-টানতে ঘরের মধ্যিখানে আনা, তাকে নিয়ে শুরু করা সাঁওতালি নাচ। এবারে লোকটার করযোড় কাকুতি-মিনতি, ঐ সামগ্রীদেরই প্রতি: "আমাকে ছেড়ে দাও ভাই, দয়া করো। আমার

ভালো লাগছে না।"

"ভালো লাগছে না? হাঃ-হাঃ", এই ব'লে হাসিতে ফেটে পড়ে সামগ্রীরা তখন, তাকে কাতুকুতু দিতে শুরু করে, বগলে, কুঁচকিতে, পায়ের তলায়। এবার হাসির পালা লোকটারই, হাসতে-হাসতে তার দম বন্ধ হ'য়ে আসার যোগাড়। এ-হাসি কান্নারই শামিল, কান্নার চেয়েও ভীষণ। কী যন্ত্রণা, কী অত্যাচার!

ব্যস, সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেল লোকটির। সে তো জানে, তার ক্ষমতাও কম নয়, যদিও সে-ক্ষমতা সে ফলাতে চায় না কখনো। কিন্তু এখন আর উপায় নেই, সে সম্পূর্ণ অসহায়। এতক্ষণ যারা তাকে বেঁধে রেখেছিল, তারই আত্মীয়-প্রতিম সেই সামগ্রী সব, একই ঘরে তার সঙ্গী সেই বাসিন্দাদের দল, এবার তাদের অত্যাচারের কবল থেকে সে এক প্রবল ঝটকায় নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয়, ফিরে আসে তার পূর্বের আসনে, তার অত্যাচারীদের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে ব'লে ওঠে: "তোমাদের যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!" বলে কুলুঙ্গির কৌটোকে: "ফিরে যাও নিজের জায়গায়!" হঠাৎ থমকে-যাওয়া ঘরের শূন্যতায় তার সেই একই আদেশ ধ্বনিত হয় বইয়ের তাকের প্রতি, দেয়ালে লটকানো হাতপাখার প্রতি, অন্য এ-সামগ্রী ও-সামগ্রীর প্রতি।

একটু কান খাড়া করলেই যেন আমরা এখনো শুনতে পাচ্ছি ওর সেই আদেশের বজ্র-নির্ঘোষ। কী, আপনি শুনছেন না?

এক জাদু ঘটে আগে, এবার তার চেয়ে আরো বড় জাদু ঘটতে শুরু করল। সামগ্রীরা সহসা যেন নেংটি ইঁদুরেরও অধম, ভয়ে ও লজ্জায় মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ফিরে এল যে-যার জায়গায়। আর জানেনই তো, যারা খুব শান্তশিষ্ট প্রকৃতির, তারা যদি একবার ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে তো কী ঘটতে পারে। আমাদের বন্ধুটিও তাই তার প্রভুত্বের ঘোষণায় আরো দূরে এগিয়ে যায়, আগুন ছুটতে থাকে তার চোখ হ'তে, সামগ্রীদের কাউকে সে বলে, "তোমাকে পরিণত করছি আমি সূর্যাস্তের আকাশে, এবার মেঘে-মেঘে নিয়ে লালের ছটা হাজির হও চোখের সামনে।" অন্য কাউকে বলে, "আর তুমি, যে হাত দাও আমার কুঁচকিতে, তোমাকে আমি করলাম মরুভূমির বালু।" বলে তৃতীয় কোনো সামগ্রীকে, "তুমি হও মিনার।"

তার যেমন তথা তেমনি কাজ। এক মুহূর্তেই সামগ্রীদের কেউ রূপান্তরিত মরুভূমির বালুতে, কেউ মিনারে, কেউ সূর্যাস্তের আকাশে। তবু এইখানেও তো ক্ষান্ত হওয়া চলবে না, কারণ সাঁওতালি নাচেরও একটা ঘটনা ঘটে আগে, তাই এদেরও নাচাতে হবে, নইলে প্রতিশোধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই আবার চোখ রাঙানো, আবার আদেশ: "বাছাধন সব, এবার নাচো তো দেখি!"

কেমন, ঠিক হয়েছে? মিলে যাচ্ছে তো সব কিছু? আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাই আজ আপনিও দেখুন এই নাচ, যা এখনো চলছে। বলুন তো, কী চরকিবাজিটা খাচ্ছে মিনার, কী ওঠ্-বোস্টাই না করছে সূর্যাস্তের আকাশ। অবশ্য, শুধু কাতুকুতুটা ও দিতে গেল না কোনো সামগ্রীকে, অত নীচে ইচ্ছে ক'রেই নামল না।

এত বোঝার পরেও, নিজেদের নিয়ে কী কর্তব্য এখন, সে-বিষয়ে আমরা অনিশ্চিত। পা টিপে-টিপে যাবো কি ওর কাছে, গিয়ে ওর গায়ে টোকা মারব, চেষ্টা করব ওর হুঁশটা ফিরিয়ে আনতে? অথবা নাচ যেমন চলছে, তেমনই চলুক, এবং আমরা দাঁড়িয়েই থাকি? কিম্বা যেমন এসে হাজির হই ওর অজান্তে, এখন সেইরকমই গা-ঢাকা দিয়ে ফিরে যাই যে-যার পথে?

কিন্তু ও যে আমাদের আসতে বলেছিল, তাই ওকে না জানিয়ে ফিরেই বা কী ক'রে যাই?

নাচ চলছে, আর এই প্রশ্নগুলোও চলছে আমাদের ভিতরে-ভিতরে।

প্রশ্ন তো সব নিয়েই। আপনি হয়তো বলবেন, আমাদের এত অনুমান, পূর্ব-পরের পরম্পরার এই সযত্ন নির্মাণ, এর সবই বৃথা, আসলে কিছুই ঘটেনি, এবং কিছুই ঘটবে না। আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক; কারণ ভুল নিয়েই আমার কারবার, যে-আমি একটিমাত্র লোক, যে-আমি সহস্র লোক। যে-আমি ঘর; ঘরের বাসিন্দে; ঘরের অতিথি, ঘরের সামগ্রী।

অতএব, "নাচ" কি কবিতা হল, না হল না? হায়, আপনি দেখছি সেই একই প্রশ্নে। কী মর্মন্তুদ দুঃখের কথা, আপনার ও আমার পক্ষে।

হিন্দি কথাশিল্পী ইয়শ্‌পাল : উপন্যাসে

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

॥ এক ॥ হিন্দি কথা-সাহিত্যে ইয়শ্‌পালের স্থান

হিন্দি সাহিত্যে ষোড়শ শতকের কবি[১] তুলসীদাসের পরে স্মরণীয় লেখক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (১৮৫০-৮৫), হরিশ্চন্দ্রের পরে প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬)। প্রেমচন্দের মৃত্যুর পরে অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে, হিন্দি সাহিত্যে আজ লেখকসংখ্যা প্রচুর। এঁদের মধ্য থেকে ভালো, মন্দ, মাঝারি বাছাই করা কষ্টসাধ্য না হলেও প্রেমচন্দের উত্তরসূরীরূপে কোনো একজনকে চিহ্নিত করা সহজ নয়। আসলে, বাঙলায় যেমন শরৎচন্দ্রের পরে এক নয়, একাধিক লেখকের কথা মনে জাগে, প্রেমচন্দের পরে হিন্দি সাহিত্যের অবস্থাটাও ঠিক তেমনি। অনেকগুলি নামের মধ্যে কয়েকটি : জৈনেন্দ্রকুমার, নাগার্জুন, ভগবতীপ্রসাদ বাজপেয়ী, ফণীশ্বরনাথ রেণু, অজ্ঞেয়, উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক্‌, ভগবতীচরণ বর্মা, ইলাচন্দ্র জোশী এবং ইয়শ্‌পাল। জনৈক প্রবীণ সমালোচক[২] হিন্দি ভাষার উপন্যাস সৃষ্টির গোড়া[৩] থেকে শুরু করে বর্তমান শতকের সত্তর দশক পর্যন্ত যে 'সর্বেক্ষণ' (survey) করেছেন, তাতে প্রথম নাম দেবকীনন্দন খত্রী (১৮৬১--১৯১৩) এবং শেষ তথা দ্বাদশ নাম ইয়শ্‌পাল (১৯০৩-৭৬)। একশ্রেণীর পাঠক ও সমালোচকের মতে প্রেমচন্দ-উত্তর যুগের মুখ্য হিন্দি কথাকার জৈনেন্দ্র-কুমার, কিন্তু অপর এক দলের মতে—ইয়শ্‌পাল।[৪]

॥ দুই ॥ প্রেমচন্দ ও ইয়শ্‌পাল

প্রেমচন্দ ও ইয়শ্‌পালের তিরোধানের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান (১৯৩৬ এবং ১৯৭৬)। কিন্তু প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রকাশের দিক থেকে তাঁদের কালগত ব্যবধান আরও কম—মাত্র ২৩ বছর। প্রেমচন্দের "সৈবাসদন" প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে এবং ইয়শ্‌পালের "দাদা কামরেড"-এর প্রকাশ-কাল ১৯৪১। শুধু কালের ব্যবধান নয়, দৃষ্টিভঙ্গির

পার্থক্যটাও মনে রাখার মতো। সন্দেহ নেই যে, প্রেমচন্দের হাতেই হিন্দি কথাসাহিত্য রোম্যান্সের জগৎ থেকে বাস্তবতার জগতে পদার্পণ করে। প্রেমচন্দ যে ধীরে-ধীরে সংস্কার ও আদর্শবাদী চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, তা তাঁর "প্রেমাশ্রম" (১৯২২) ও "গোদান" (১৯৩৬) উপন্যাস দুখানি পাশাপাশি রেখে পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রেমচন্দ-প্রবর্তিত এই বস্তুবাদী উপন্যাসপরম্পরায় ধারক ও বাহকদের মধ্যে ইয়শ্‌পালের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ না হোক সর্বপ্রথম। একথা নিশ্চিত যে প্রেমচন্দ-উত্তর হিন্দি কথা-সাহিত্যে সর্বাধিক বিতর্কিত লেখক ইয়শ্‌পাল।

প্রেমচন্দের উপন্যাসে গান্ধীযুগের ছবি, ইয়শ্‌পাল-এর উপন্যাসে গান্ধী-উত্তর যুগ চিত্রিত। প্রেমচন্দের অধিকাংশ রচনায় গান্ধীবাদের প্রশংসা, ইয়শ্‌পালের সমগ্র রচনায় গান্ধীবাদ কঠোরভাবে ভর্ৎসিত। প্রেমচন্দের উপন্যাসে যে সংঘর্ষ তা সামাজিক—উচ্চ ও নিম্নবিত্তের, অথবা বলা যায়, রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ। ইয়শ্‌পালের উপন্যাসে সংঘর্ষটা মূলত রাজনৈতিক—কংগ্রেসি, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট প্রভৃতির দ্বন্দ্ব। যে কয়জন হিন্দি উপন্যাসকারের রচনায় রাজনৈতিক চিন্তাধারা খোলাখুলি প্রকাশ পেয়েছে, ইয়শ্‌পাল তাঁদের অগ্রণী।[৫]

॥ তিন ॥ ইয়শ্‌পালের জীবন-বৃত্ত

ইয়শ্‌পালের উপন্যাস নিয়ে আলোচনার আগে তাঁর জীবন-বৃত্ত সম্পর্কে দু-চার কথা বলা দরকার। জন্ম ১৯০৩ সালে, পানজাবে পাহাড়ি অঞ্চলের এক ক্ষুদ্র পল্লিতে। কিন্তু উত্তরকালে তাঁর সাহিত্যজীবন কাটে স্থায়ী নিবাস লখনউতে। তাঁর মা কিছুটা লেখাপড়া জানতেন। তিনি ছিলেন আর্যকন্যা-পাঠশালা-গোষ্ঠীর শিক্ষিকা—কখনো নৈনীতালে, কখনো লাহোরে, কখনো অন্যত্র। সাত বছর বয়সে ইয়শ্‌পালের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় হরিদ্বার থেকে মাইল পাঁচেক দূরে স্বামী দয়ানন্দের আদর্শে গঠিত প্রসিদ্ধ কাংগড়ী গুরুকুলে। এখানে সাত বছর থাকার পরে ১৪ বছর বয়সে গুরুকুল ত্যাগ। মা তখন লাহোরে শিক্ষিকা। লাহোর থেকে ফিরোজপুর। এইভাবে ১৯২০ সালে ইয়শ্‌পালের প্রবেশিকা (বর্তমান স্কুল ফাইন্যাল বা মাধ্যমিক) পরীক্ষা। প্রবেশিকা পাস করে ভর্তি হন পানজাবের প্রসিদ্ধ দেশসেবক লালা লাজপত রায় স্থাপিত লাহোর ন্যাশনাল কলেজে। এবং সেখান থেকেই বি. এ. পাস।

ছাত্রজীবনে ইয়শ্‌পালের সুযোগ হয়েছিল উত্তর-কালের অমর শহীদ ভগৎ সিং ও সুখদেবকে সহপাঠী রূপে পাওয়ার। কলেজজীবনে পাঠ্যতালিকার বাইরে ইয়শ্‌পাল যেসব বই পড়ার সুযোগ পান, তার মধ্যে ছিল বঙ্কিমের "আনন্দমঠ", প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল (১৮৯৩-১৯৪৫)-রচিত "বন্দী জীবন" প্রভৃতি। এইভাবে একদিকে গড়ে ওঠে বৈপ্লবিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ, অন্যদিকে ছিল তাঁর ডিগ্রি লাভের প্রয়োজনীয়তা।

বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদ এক জিনিস না হলেও সে যুগে কথা দুটি সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার রেশ এখনও কাটে নি। বিপ্লবী-মাত্রেই ছিল সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির সদস্য। তৎকালীন কিছু বাঙালি লেখকের মতো ইয়শ্‌পালও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। কলেজজীবন থেকেই তিনি ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতেন ভগৎ সিং (১৯০৭-৩১) এবং চন্দ্রশেখর আজাদ (১৯০৫-৩১)-এর মতো বিপ্লবীদের সঙ্গে। তখন বিভিন্ন প্রদেশে বিপ্লবীদের বিভিন্ন নাম। বাঙলায় যেমন ছিল অনুশীলন সমিতি, উত্তর ভারতে তেমনি কুড়ির দশকে গড়ে ওঠে 'হিন্দুস্তান সমাজ-বাদী প্রজাতন্ত্র সেনা'। বাঙলার বাইরে এইটিই ছিল বিপ্লবীদের বড়ো সংস্থা। ১৯২৬ সালে দিল্লীতে ব্রিটিশ ভাইসরয়ের ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার যে ব্যর্থ চেষ্টা হয়, তার সঙ্গে ইয়শ্‌পালও জড়িত ছিলেন।

কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ দেখা দিলে সংস্থার ভাঙন শুরু হয়। ইয়শ্‌পালের ক্ষেত্রে বিচ্যুতির অন্য একটি কারণ ছিল—প্রকাশবতী নামে একটি বিপ্লবী মহিলার সঙ্গে অবৈপ্লবিক মেলামেশা। পরে অবশ্য তিনি তাঁকে পত্নীরূপেই বরণ করেছেন, কিন্তু বিপ্লবীর পক্ষে ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য জলাঞ্জলি দেওয়া কেবল লজ্জাকর আচরণ নয়, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ; যার চরম শাস্তি মৃত্যু। ইয়শ্‌পালকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে চন্দ্রশেখর আজাদের উপর। পরে আমরা দেখব এই ঘটনার কেমন ছায়াপাত ঘটেছে "দাদা কামরেড" (১৯৪১) উপন্যাসে। দাদা কামরেড আর কেউ নন, চন্দ্রশেখর আজাদ। আর নায়ক হরীশ লেখক স্বয়ং। চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যুর পরবর্তী বছরে (১৯৩২) ইয়শ্‌পালের গ্রেপ্তার ও ১৪ বছরের জন্য কারাদণ্ড। কিন্তু ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার ফলে অন্যান্য অনেক রাজবন্দীদের সঙ্গে ইয়শ্‌পালের মুক্তি হয় ১৯৩৮ সালে, তার আগে ১৯৩৬ সালে জেলের মধ্যেই প্রকাশবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহকার্যটি সম্পন্ন হয়।

॥ চার ॥ ইয়শ্‌পালের সাহিত্য : রাজনীতি ও মার্কসবাদ

জেল থেকে বেরিয়ে ইয়শ্‌পালের নতুন জীবন শুরু। রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে এবার তিনি সাহিত্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৮ সালেই লখনউ থেকে প্রকাশ করেন "বিপ্লব" পত্রিকা এবং নিজের বই প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "বিপ্লব কার্যালয়"। পরের বছর প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ "পিঞ্জড়ে কী উড়ান" নামে গল্পসংগ্রহ।

ইয়শ্‌পাল রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করলেও রাজনীতি কিন্তু তাঁর সাহিত্যকে ছেড়ে দেয় নি, বরং বলা যায় প্রায় সর্বত্র ছায়ার মতো অনুগামী। এই কারণেই বোধ হয় কিছু-কিছু হিন্দি সমালোচক সাহস করে বলতে পেরেছেন যে, রাজনৈতিক উপন্যাস রচনায় এমন সিদ্ধহস্ত লেখক ভারতীয় সাহিত্যেও বিরল। উক্তিটি বিতর্কমূলক হলেও আপাতত আমরা সে বিতর্কে প্রবেশ না করে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, হিন্দি সাহিত্যে রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রবর্তক ইয়শ্‌পাল। শরৎচন্দ্র লিখেছেন মাত্র "পথের দাবী", কিন্তু ইয়শ্‌পালের প্রায় সব কটি উপন্যাসে (সংখ্যায় ডজন খানেক) রাজনীতির রঙ চড়া। সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস কতদূর হয়েছে সে বিচার স্বতন্ত্র।

"দাদা কামরেড"-এর কথাই ধরা যাক। দেশ তখনও স্বাধীন হয় নি। একদিকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো সশস্ত্র বিপ্লব—এই সময়কার কাহিনী "দাদা কামরেড"। কাহিনীর আরম্ভ বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে। বোমার মামলায় ফেরারি কয়েদি হরীশ রাতের অন্ধকারে জেল থেকে পালিয়ে অতর্কিতে এসে আশ্রয় নেয় অপরিচিত যশোদার গৃহে। একটা অচেনা লোককে শীতকালের গভীর রাতে ঘরে ঢুকতে দেখে যশোদা ভয়ে ও বিস্ময়ে আগন্তুকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই হরীশ কোটের ডান পকেট থেকে পিস্তল বের করে যশোদার মুখের সামনে ধরে বলল—'চুপ, নহীঁ তো গোলী মার দুংগা।' চোরও নয়, ডাকাতও নয়, বিপ্লবীদলের সদস্য; কাল ভোর না হতেই সে চলে যাবে। যশোদাকে অভয় দিয়ে বলল, 'আমরা কেবল দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি।' বস্তুত পরদিন প্রভাতী দৈনিকগুলিতে ফেরারি কয়েদির খবরই প্রধান খবর।

এ-হেন হরীশকে নিয়ে দলে আলোড়ন দেখা দিল। তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ দুটি : একটি নৈতিক, দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক। দলের মহিলা সদস্য শৈলর সঙ্গে হরীশের মেলামেশা একটু দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। শৈলকে দেখে হরীশ প্রথম-প্রথম ভাবত—সে নারী নয়, যুবতী নয়, কেবল পার্টির সহায়ক সদস্য।

কালক্রমে তার স্বগতোক্তি থেকেই পরিবর্তনটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে—'শৈল, তুমি কেবল বিপ্লবের যন্ত্র নও, তুমি মানুষ।'[৬] দলের কর্তা দাদারাম (যাঁর নামানুসারে গ্রন্থের নাম 'দাদা কামরেড') একদিন শৈলর কাছেই অভিযোগ করছেন—'হরীশ কা কাম অব কেবল সিগারেট পীনা, লম্বী লম্বী বাতেঁ করনা, ঔর লড়কিয়োঁ কী পার্টি বনানা রহ গয়া হ্যায়।'

দ্বিতীয় অভিযোগটি গুরুতর। বিপ্লবীদলের নব-যুবক সদস্যরূপে হরীশের পূর্ণ আস্থা ছিল দাদারামের কর্মকাণ্ডে—সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবে। কিন্তু ধীরে-ধীরে তার মোহভঙ্গ ঘটে, বুঝতে পারে সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থতা। হরীশের দীর্ঘ বক্তব্যের সারমর্ম: ডাকাতি করে কী লাভ হয়? জনসাধারণ থেকে আমরা কেবল বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের সহানুভূতি থেকেও বঞ্চিত।

এই অবস্থায় হরীশকে কেবল দল থেকে বহিষ্কার নয়, পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন (বিপ্লবী-দের এই অমানবিক, অতিনৃশংস কর্মধারা ষাট বছর পরে আজও অব্যাহত) এবং সেই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে দলের কর্তা স্বয়ং দাদারাম। কিন্তু সকলেই আর দাদার অনুগামী নয়। তরুণ বিপ্লবীরা ধীরে-ধীরে কমিউনবাদের প্রতি আকৃষ্ট বোধ করছে। কেউ কেউ তো (যেমন রফীক) পুরো কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। দাদারামের মতো প্রবীণ বিপ্লবীরা তরুণদের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন বুঝতে পারে না। তাদের মতে—কমিউনিস্টরা নিজেদের পার্টি মজবুত করবার জন্য জাপানি ফার্মের টাকা খেয়ে হরতাল করিয়ে দেশী মিলের ক্ষতি করেছে। দাদার ভাষায়—'য়হ রোজ কী সালী নয়ী রাজনীতি কুছ সমঝ মেঁ নহীঁ আতী। সোশলিজ্‌ম্‌ ভী চলতা হ্যায়, দেশভক্তি ভী চলতী হ্যায়। এক নঈ থিয়োরী রোজ নিকল আতী হ্যায়।' আদর্শগত মতভেদের ফলে সংগঠন ভেঙে গেল, আর এই ভাঙা দলের মধ্যে থেকেই কম্যুনিজ্‌ম্‌-রূপ নবাঙ্কুরের সৃষ্টি। ক্রান্তিকারী আন্দোলন ক্রমশ সমাজবাদী আন্দোলনের দিক মোড় নেয়। এই সন্ধিক্ষণের কাহিনী "দাদা কামরেড"। শ্রমিক আখতারের খুপরিতে বসে হরীশ যে ভাবছে—'মজদূরোঁ কী ইস বিশাল শক্তি কো—জো আকাশ মেঁ গরজনেওয়ালী বিজলী কী তরহ দুর্দমনীয় হ্যায়—ক্যায়সে সংগঠন কে তার দ্বারা ক্রান্তিকে উপয়োগ লায়া যা সকতা হ্যায়'—হরীশের এই ভাবনার মধ্যেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। ব্যক্তিগত জীবনেও লেখক ১৯৩৮ সাল নাগাদ সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের পথ থেকে সমাজবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিপ্লবীদের রাজনৈতিক পরিবর্তন দেখানোই "দাদা কামরেড"-এর শেষ লক্ষ্য।

"দাদা কামরেড" রচনার পরে লেখকের নৈতিক দায়িত্ব হল ১৯৪২ সালে কংগ্রেস-প্রবর্তিত অগস্ট (বা "ভারত ছাড়ো") আন্দোলনকালে কমিউনিস্টদের যে ভূমিকা ছিল সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি লিখলেন "দেশদ্রোহী" (১৯৪৩)। জনসাধারণ সেদিন (এবং হয়ত আজও) যে দলকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি, তাদের কথা মনে রেখেই যেন গ্রন্থের এই নামকরণ। নায়ক ভগবান দাশ খান্না কমিউনিস্ট। প্রথমে কিন্তু সে কোনো রাজনীতির মধ্যে ছিল না। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়ে ইংরেজ সরকারের ফৌজি ডাক্তার হয়ে চলে যায় উত্তরপশ্চিম সীমান্তে—ব্রিটিশ সেনাশিবিরের হাসপাতালে ১৯৩১ সালে। সেখান থেকে তাকে একদিন অপহরণ করে পশুর মতো টেনে নিয়ে যায় ওজিরীস্থানের বিদ্রোহী ওজিরীদল, যাদের নিজস্ব ভাষা পশ্‌তু হলেও ভাঙা-ভাঙা হিন্দিও তারা জানে। ডাক্তারের স্ত্রী রাজ (রাজদুলারী বা রাজবতী) তখন দিল্লীতে।

অতঃপর দেখানো হয়েছে খান্নার জীবনে বহু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা—নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে গজনী থেকে সে প্রবেশ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এবং সেখানকার সমাজবাদী ব্যবস্থা দর্শন করে সে

নিজের দেশেও সেই ব্যবস্থা কায়েম করবার সংকল্প নেয়। ভারতে প্রত্যাগত খান্না প্রথমে 'ডাক্তার বর্মা' নামে বোম্বাই শহরে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করার পরে চলে আসে কানপুরে। খান্নার স্ত্রী রাজ সুদীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় থেকে অবশেষে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। পরে তাকে দেখা যায় দিল্লীর ছোটখাটো কংগ্রেস-নেতা বদ্রীবাবুর পত্নীরূপে। রাজের দিদি চন্দা (চাঁদ)-এর স্বামী পুঁজিপতি ঠিকেদার রাজারাম তখন কানপুরে।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত। রুশ-জর্মান অনাক্রমণ চুক্তির জন্য ফ্যাসিস্টবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কমিউনিস্ট দল প্রথম দিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিছু যায় জেলে, কিছু হয় ফেরার। জর্মান কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হলে (২২ জুন, ১৯৪১) ভারতীয় কমিউনিস্ট দলের নীতি যায় বদলে, তারা 'জনযুদ্ধ'-এর স্লোগান তোলে। ফলে কমিউনিস্ট দলের উপর ইংরেজ সরকারের 'প্রতিবন্ধ' (নিষেধাজ্ঞা) তুলে নেওয়া হয় এবং কমিউনিস্টরা মুক্তি পেয়ে ইংরেজদের সহযোগিতা করতে থাকে। অন্যদিক অগস্ট আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস বেআইনি বলে ঘোষিত।

খান্নার প্রাক্তন সহপাঠী গরিবের ছেলে শিবনাথ আজ বামপন্থী কংগ্রেসি অর্থাৎ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট। যুদ্ধ ও জাতীয় আন্দোলনের প্রশ্নে তাদের চিন্তাধারায় বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে খান্নার উক্তি : 'ইংরেজ সরকারের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের দাবি আমাদেরও। আমরা সে দাবি আদায় করবই। তবে আজ অন্য শত্রু জাপান আমাদের উপর চড়াও হচ্ছে। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আমরা যদি এই নতুন শত্রুপক্ষের কবজায় পড়ে যাই, তাহলে তার পরিণতি কী হবে? স্বাধীনতা তো পাবই না উলটে নতুন শত্রুর আক্রমণে আমাদের দেশ বিনষ্ট হবে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ।'[৭]

এ যুক্তিতে সাধারণ লোকের মন ভিজল না। তারা দেখল জাতীয় মুক্তির জন্য লড়াই করছে কংগ্রেস, আর সেই কংগ্রেসের বিরোধিতা করছে কমিউনিস্ট। সুতরাং তারা দেশদ্রোহী নয় তো কী?[৮] কমিউনিস্ট-দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী লোকেরাও বিস্মিত হয়ে গেল। রাশিয়ার জন্য নিজেদের দেশকে বলিদান করা আর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের হাতে পুতুল হওয়াই কি কমিউনবাদের শেষ লক্ষ্য?

এ তো গেল রাজনৈতিক স্তরের কথা। ব্যক্তিগত স্তরে খান্নার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল চন্দার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের জন্য। খুবই স্বাভাবিক যে চন্দার স্বামী রাজারাম কমিউনিস্টদের ছেড়ে কথা বলবে না—'যার কোনো ধর্মকর্ম মানবার দরকার নেই, সে যেন কমিউনিস্ট হয়। মেয়েদের তো কমিউনিস্ট হতে ভালোই লাগে। তাতে না আছে কোনো বন্ধন, না কোনো ভয়ডর, না আছে লজ্জা-শরম। যখন যাকে ভালো লাগে, তার সঙ্গে বেরিয়ে গেলেই হল।' কিন্তু এর চেয়েও কঠোর ভৎর্সনা খান্নাকে একদিন শুনতে হল চাঁদের সামনেই রাজারামের মুখে—'চুপ ধূর্ত, দেশদ্রোহী, বদমাশ! দূসরোঁ কে ঘর অগ লগাকর তমাশা করনেওয়ালে বেশরম!'[৯]

মৃত্যুকালে খান্নার স্বগতোক্তি যেন তার শেষ জবানবন্দি। পাহাড়ের কঠিন পাথরে ঘা-খেয়ে ভূতলশায়ী খান্নার মনে হল, সে যেন চন্দার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। বিড়্‌বিড় করে বলছে—'চাঁদ, মঁ্যায় দেশদ্রোহী নহীঁ হুঁ।' 'উনসে কহনা মঁ্যায় দেশদ্রোহী নহী হুঁ।' এখানেই গ্রন্থ শেষ। সমাপ্তি কিছু অসঙ্গত হয় নি। কিন্তু গ্রন্থের প্রথম ভাগের একটা বড়ো অংশ জুড়ে নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্য দিয়ে খান্নাকে মস্কো ঘুরিয়ে আনার কোনো প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। আমাদের দেশে যাঁরা কমিউনিস্ট নেতা হয়েছেন তাঁদের মস্কো যেতে হয় নি। পরে হয়তো কেউ কেউ তীর্থযাত্রা করে এসেছেন।

পার্টির দুজন নায়কের কথা শুনলাম। এবারে

একজন নায়িকার কথাও শোনা উচিত। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপন্যাস "পার্টি কামরেড" (১৯৪৬)-এর গীতা বোম্বাই শহরে পার্টি সাহিত্য ও পার্টির পত্রপত্রিকা বিক্রি করে। আবার চাঁদা আদায়ও করে। কাহিনী-কাল ১৯৪৬—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নৌসেনাদের বিদ্রোহ। শহরের কুখ্যাত গুণ্ডা পদম্‌লাল ভাত্তারিয়া গীতার সংস্পর্শে এসে মদ ছেড়ে দেয়, পার্টির ছোট ছোট বই ও পত্রপত্রিকা পড়ে, পার্টি তহবিলে চাঁদাও দেয়। একদিন কমিউনিস্ট মিছিলে কংগ্রেসিদের হামলা হলে ভাত্তারিয়া সকলকে মেরে ভাগিয়ে দেয়। পরদিন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে ছাপা হয়—কমিউনিস্ট মেয়ে গীতার জন্য গুণ্ডাদের মধ্যে মারপিট। আর-একদিন নৌবিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাই শহরে হরতাল—পথে-পথে কমিউনিস্টদের মিছিল এবং যথারীতি কংগ্রেসিদের আক্রমণ। এবারে আর ভাত্তারিয়া অক্ষত রইল না, প্রতিপক্ষের আঘাতে ঘায়েল হয়ে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে মারা যায়। যে ভাত্তারিয়া ছিল কমিউনিস্টদের পরমশত্রু, কালক্রমে গীতার প্রভাবে সে কমিউনিস্টদের প্রবল সমর্থক হয়ে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হল না—এই হল "পার্টি কামরেড"-এর প্রতিপাদ্য।

ইয়শ্‌পালের রচনা যে মার্কসবাদ-প্রভাবিত সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। কোন্ ব্রানডের (brand) মার্কসবাদ তা নিয়ে আমাদের মতো অদীক্ষিত পাঠকের পক্ষে মতামত দেওয়া সুকঠিন। আজকাল চারিদিকে এই জনপ্রিয় মতবাদের যে বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করছি—বিশেষ করে এই পেরেসত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের যুগে—তাতে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। সমকালীন সামাজিক উপন্যাসে তো বটেই, সুপ্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসেও তিনি ইতিহাস ও চরিত্রগুলিকে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার চেষ্টা করেছেন।[১০] বৌদ্ধকালীন ভারতীয় সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় রচিত "দিব্যা" (১৯৪৫) উপন্যাসের নায়িকা শোষিত, নিপীড়িত ভারতীয় জনতার প্রতীক। ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে চার্বাক দর্শনই নাকি মার্কসবাদের কাছাকাছি—ভোগবাদী, বস্তুবাদী ও প্রত্যক্ষবাদী। "দিব্য" উপন্যাসের নায়ক মারিশ চার্বাক দর্শনের অনুগামী। নাস্তিক চার্বাক-পন্থী মারিশের স্মরণীয় উক্তি : 'বৈরাগ্যে সন্তোষ ভীরুর আত্মবঞ্চনা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গই জীবনের শ্রেষ্ঠ পথ।' সুদূর বৌদ্ধযুগের চরিত্র হলেও মারিশকে আধুনিক মার্কসবাদী বলে চিনতে ভুল হয় না।

॥ পাঁচ ॥ ইয়শ্‌পালের কমিউনিজম্ ও প্রচারধর্মিতা

এর পরেও যদি প্রশ্ন তোলা যায়—'ইয়শ্‌পাল কি কমিউনিস্ট ছিলেন?' তবে তা নিতান্তই অবান্তর বলে মনে হতে পারে। লেখকের জীবনী থেকে জানা যায়, তিনি কখনো পার্টির কার্ড-ধারী সদস্য ছিলেন না, এমনকী আনুষ্ঠানিকভাবে পার্টিতে যোগদানও করেন নি। না করার কারণ, ইয়শ্‌পালের মতে রাশিয়ায় তথা কমিউনিস্ট পার্টিতে বাক্-স্বাধীনতা নেই। তবে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সুষম ধনবণ্টনের প্রতিশ্রুত ব্যবস্থার জন্য তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করতেন। এ-সম্পর্কে ১৯৭২ সালে ইয়শ্‌পালের স্বীকারোক্তি: I am in favour of maximum individual liberty for all. I do not consider Soviet economic order a model for our country. I want much more scope for individual initiative. I do not consider Marxism as absolute truth. I think it to be a great step which helped in breaking the obstacles created by the decaying feudalism and capitalism to further growth.[১১]

লেখকের এই স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে আর পুরোপুরি কমিউনিস্ট বলে মেনে নেওয়া যায় না। তা না যাক, হিন্দি সাহিত্যে তিনি মার্কসবাদী

চেতনার প্রথম উপন্যাসিকরূপেই পরিচিত হয়ে থাকবেন। তাঁর সমকালীন অন্যান্য হিন্দি লেখক (জৈনেন্দ্রকুমার, ভগবতীচরণ বর্মা প্রমুখ) ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। ইয়শ্‌পালের মার্কসবাদ খাঁটি না মেকি (কেউ-কেউ বলেছেন 'অধ-কচরী') —হিন্দি সমালোচকদের এই বহু আলোচিত বিতর্ক সম্পর্কে লেখকের প্রতিক্রিয়া ছিল এইরকম: প্রথমে তাঁর উপন্যাসগুলিকে খুব প্রগতিশীল বলে প্রচার করা হত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো দলভুক্ত না হওয়াতে প্রগতিবাদী মহল তাঁকে প্রতিক্রিয়াবাদী বলে চিহ্নিত করে। বাঙলাতেও তারাশঙ্কর থেকে সমরেশ বসুর সাহিত্য সম্পর্কে এইজাতীয় উলটো পুরাণ গাইতে শোনা গেছে। ব্যাপারটা কিছু অসাধারণ নয়।

সাহিত্যিক দৃষ্টিতে আমাদের অভিযোগ স্বতন্ত্র। সাহিত্যকে বাস্তবমুখী এবং মতবাদ প্রচারের বাহন করে তোলার আগ্রহে তিনি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পাসত্তাকে বিসর্জন দিয়েছেন। হিন্দি সাহিত্যেরও কিছু শিল্পানুরাগীর রচনায় উত্থাপিত এ অভিযোগ দুটি সম্পর্কে তিনি যে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর আত্মসমর্থনসূচক বক্তব্য থেকে। প্রথম উক্তি বাস্তবতার পক্ষে: 'বস্তুকে বস্তুরূপে দেখাকে, বাস্তব ছবি সৃষ্টি করাকে প্রচার বলা ঠিক নয়। বন্দর কো বন্দর, হাথী কো হাথী, ঔর গধে কো গধে কহনা প্রচার হ্যায় ইয়া নহীঁ"। দ্বিতীয় উক্তি মতবাদ প্রচার সম্পর্কে: আমার বিরুদ্ধে কলা-প্রেমিকদের একটা বড়ো অভিযোগ এই যে আমি কলাকে গৌণ এবং মতবাদপ্রচারকে মুখ্য স্থান দিয়ে থাকি।...জীবনে আমার সাধ কেবল বেঁচে থাকাই নয়, বরং জীবনের পূর্ণতা লাভ। তাই শিল্পকলায় যুক্ত হয়ে আমি 'কেবল শিল্পের জন্যই শিল্প' কথাটা বুঝতে পারি না। আমার মতে শিল্পের উদ্দেশ্য জীবনের পূর্ণতাপ্রাপ্তি।[১২] 'শিল্প-কলার উদ্দেশ্য জীবনে পূর্ণতাসাধন' এই মহৎ ঘোষণার সঙ্গে কারও বিরোধ থাকা উচিত নয়। কিন্তু শিল্পের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে জীবনের পূর্ণতাসাধন সম্ভব কিনা সে প্রশ্নটা থেকেই যায়।

॥ ছয় ॥ গণশক্তি ও ইয়শ্‌পাল

গণশক্তির জাগরণে ইয়শ্‌পালের বিশ্বাস বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রকট। 'ঝুঠাসচ' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ("দেশ ঔর ভবিষ্য", ১৯৬০) ডাঃ প্রাণনাথ কংগ্রেসি নেতা সুদ-কে বলছে: 'জনতা নির্জীব নহীঁ হ্যায়। জনতা সদা মূক ভী নহীঁ রহতী। দেশ কা ভবিষ্য নেতাওঁ ঔর মন্ত্রিয়োঁ কী মুট্‌ঠী মেঁ নহীঁ, দেশ কী জনতা কে হী হাথ মেঁ হ্যায়।' এই জনসাধারণকে কীভাবে সংগঠিত করতে হবে তা নিয়ে একটি জরুরি বিতর্ক রয়েছে "দাদা কামরেড" উপন্যাসে। বিপ্লবী হরীশের বক্তব্য—'মজুরদের আর্থিক সুবিধার প্রশ্ন অবশ্যই তোলা যেতে পারে, কিন্তু তাদের সামনে মুখ্য প্রশ্ন রাখা উচিত রাজনৈতিক অধিকার লাভের, কারণ সেই ক্ষমতা পেলেই আমরা দলিত ও শোষিত শ্রেণীর দুর্দশা দূর করতে পারব।' কম্যুনিস্ট রফীকের মত ভিন্ন: 'মেহনতি জনতার সামনে সবচেয়ে বেশি দরকার তাদের 'রোজমর্‌রা' (দৈনন্দিন) জীবনের অসুবিধার সমস্যা তুলে ধরা; রাজনৈতিক প্রশ্নে তাদের সংগঠিত ও সচেতন করা সম্ভব নয়। যে সমস্যাগুলি ওদের জীবনে একান্ত বাস্তব, সেগুলির সমাধান করবার চেষ্টাতেই ওদের শক্তি ও চেতনা জাগ্রত হবে। মজুরদের সংগঠিত করতে হলে ওদের পেটের প্রশ্ন ছাড়া পথ নেই।' এই জনজাগরণের প্রশ্নে গান্ধীজীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বামপন্থী গিরিধারীলাল বলছে—'বিপ্লবের পথই আসল পথ, আর সব বুজরুকি ও বেইমানি।' কংগ্রেসের লোকাল কমিটির সেক্রেটারি অমরনাথের বক্তব্য: 'গান্ধীজী দশ বছরে [কাহিনীর ঘটনাকাল ১৯৩০] দেশে যে জাগরণ ঘটিয়েছেন, বিপ্লবীরা এক শতাব্দীতেও তা করতে পারবেন না।'

॥ সাত ॥ ইয়শ্‌পাল ও শরৎচন্দ্র

অর্ধশতাব্দীব্যাপী হিন্দি উপন্যাসের আলোচনায় যে বাঙালি লেখকের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে বার-বার এসে পড়েছে, তিনি শরৎচন্দ্র। হিন্দি সমালোচকদের মোটামুটি বক্তব্য এই যে, শরৎচন্দ্রের রচনায় যে সংযম, নৈপুণ্য ও শিল্পসুষমা, ইয়শ্‌পালে তা দুর্লভ। অথচ ইয়শ্‌পালের বিভিন্ন উপন্যাস থেকেই আমরা জানতে পাই, তিনি যে শরৎসাহিত্য কেবল ভালো করে পড়েছেন তাই নয়, শিল্পী হিসাবেও বাঙালি লেখকের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। লেখকের আত্মজীবনী[১৩] থেকে একটি অংশ—'একদিন বীরভদ্র তিওয়ারী আমাকে তার বিছানার উপর বসতে বলল। আমার হাতে ছিল শরৎবাবুর "অরক্ষণীয়া"।[১৪] বীরভদ্র আমার হাত থেকে বইখানি নিয়ে 'অ' অক্ষরটি আঙুল দিয়ে চেপে ধরল।' তাৎপর্য এই যে দলের সঙ্গীরা তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে তিনি এখন 'রক্ষণীয়া' (রক্ষণীয়)। "দাদা কামরেড" উপন্যাসে যশোদার স্বামী অমরনাথ মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে যে কৌতুকাবহ মন্তব্য করেন তাতে পাই—'মেয়েদের লেখাপড়া আর কতটুকু দরকার? কেবল বাপের বাড়ি থেকে আসা চিঠিপত্র পড়ে তার উত্তর দেওয়া এবং কখনো যদি শরৎবাবু বা প্রেমচন্দের উপন্যাস হাতে এসে যায়, তবে তা পড়ে বুঝতে পারা—ব্যস্ এইটুকু হলেই যথেষ্ট।' "ঝুঠাসচ" উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে দেখি অভিজাত ঘরের মেয়ে এম.এ. পরীক্ষার্থিনী কনক ভালোবেসেছে অতিদরিদ্র ইস্কুল মাস্টারের ছেলে উঠতি লেখক জয়দেবকে। একদিন জয়দেবের বাড়িতে গিয়ে তাদের হতশ্রী গৃহস্থালি দেখে মুষড়ে পড়ে কনক। ফিরতি পথে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়—হোক না গরিব, বলা তো যায় না একদিন হয়তো এই জয়দেবই শরৎচন্দ্রের মতো ভারতজোড়া সাহিত্যকীর্তির অধিকারী হবে। শরৎচন্দ্র "পথের দাবী" (১৯২৭) উপন্যাসে বিপ্লবীদের জীবন ও আদর্শ সম্পর্কে যে চিত্র উপস্থিত করেছেন ইয়শ্‌পাল তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। আর পারেন নি বলেই তিনি নিজের বৈপ্লবিক জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা "দাদাকামরেড" উপন্যাসে "পথের দাবী"-র উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। সে উত্তর কতটা বস্তুনিষ্ঠ হয়েছে, আমরা তা নিয়ে মতামত প্রকাশের অধিকারী নই। তবে যে বিষয়টি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হল সব্যসাচীর আদলে নায়ক হরীশের বহুরূপী রূপ। আসলে সে শিখ, জেল থেকে পালাবার পরে নাম নিল হরীশ। কখনো সে সুলতান, কখনো জে. আর. শুক্লা, কখনো বা জি. এস. মিরাজকর। কিন্তু সব্যসাচীর মতো শক্তিধর না হওয়াতে দুর্বলচেতা হরীশের রূপবৈচিত্র্য পাঠকের মনে কোনো রেখাপাত করে না।

॥ আট ॥ ইয়শ্‌পালের চরিত্রসৃষ্টি

হিন্দি সমালোচকবৃন্দ যে-সকল গুণের জন্য শরৎ-সাহিত্যের গুণগান করেন, তার একটি হল চরিত্রসৃষ্টি। ইয়শ্‌পাল শরৎচন্দ্রের অনুরাগী পাঠক হয়েও বাঙালি লেখকের সাফল্যের মূল রহস্য অনুধাবনে বা অনুসরণে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তাঁর উপন্যাসে চরিত্রের পরিবর্তে ঘটনার প্রাধান্য। এর একটা কারণ শরৎচন্দ্র কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেখাতে চাইতেন নরনারীর আভ্যন্তরীণ জীবনের ছবি, ইয়শ্‌পালের বিষয় লাহোর-লখনউ-কানপুর-বম্বের কিছু-কিছু মানুষের রাজনৈতিক জীবন। বহির্জীবনের কাহিনী রচনায় চরিত্র অপেক্ষা ঘটনার প্রাধান্য কিছু অস্বাভাবিক নয়। প্রেমচন্দের উপন্যাসেও "গোদান"-এর হোরী, রঙ্গভূমি-র অন্ধ ভিখারি সূরদাস প্রভৃতি কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্রকে আমরা ব্যতিক্রম বলেই গণ্য করি। মুন্‌শী প্রেমচন্দের কাহিনী-গ্রন্থনেও যে বিশেষ মুন্‌শীয়ানার পরিচয় আছে আমাদের তা মনে হয় না। ইয়শ্‌পাল সম্পর্কেও সেই একই কথা। পরিস্থিতি ও সমস্যার কথা বলায়

তাঁর যতটা মনোযোগ ও উৎসাহ, চরিত্রচিত্রণে তা নেই। ফলে তাঁর উপন্যাসে যেমন অভাব বিশ্লেষণের তেমনি অভাব চিন্তাশীল চরিত্রের।

নারীচরিত্রসৃষ্টিতে ইয়শ্‌পালের কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রয়োজন। লেখকের মতে পুঁজিবাদী সমাজে নারী ভোগবিলাসের বস্তু, তার কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, তার একমাত্র পরিচয়—সে কারও কন্যা বা পত্নী বা মাতা। ইয়শ্‌পালের উপন্যাসগুলিতে মুখ্যভাবে নারীজীবনের সমস্যাই চিত্রিত। আমরা শৈল ("দাদা কামরেড") ও দিব্যা ("দিব্যা") এই দুটিকে ইয়শ্‌পালের প্রতিনিধি নারীচরিত্র মনে করি বলেই তাদের দুজনের দুটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। শৈল বলছে: 'পুরুষদের বোঝা উচিত নারীরও ব্যক্তিত্ব বলে একটা পদার্থ আছে।' দিব্যার উক্তি আরও চমকপ্রদ: 'কুলবধূ ও কুলমাতা হওয়ার চেয়ে নর্তকী হওয়া ঢের ভালো, কারণ সে স্বাধীন।' দুটি উক্তির মধ্যেই নারীজীবনের উদগ্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত।

কিন্তু শৈল ও দিব্যা যে স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়েছে, আমাদের মতো পাঠকের পক্ষে তা আদৌ প্রীতিকর নয়। দিব্যা কালক্রমে মথুরার শ্রেষ্ঠা নর্তকীরূপে সম্মানিত হলেও (অথবা হয়েছে বলেই?) জীবনে তার অরুচি এসে গেছে। সব পুরুষই নারীকে এক চোখে দেখে—নারী আর কিছু নয়, কেবলমাত্র ভোগ্যা। মহাপণ্ডিত দেবশর্মার পৌত্রী ব্রাহ্মণকন্যা দিব্যা ভালোবাসল কিনা দাসপুত্র বৌদ্ধভিক্ষু পৃথুল সেনকে। প্রেমের ফলে দিব্যা বিবাহের আগেই গর্ভবতী। ওদিকে নাস্তিক দার্শনিক চার্বাকপন্থী মারিশও দিব্যার অনুরাগী। ধর্মে নারীর স্থান কোথায়—দিব্যার এই প্রশ্নের উত্তরে পৃথুল সেন যখন নির্বিকার চিত্তে ঘোষণা করল: 'ভিক্ষুর ধর্ম নির্বাণ, আর নারী হল প্রবৃত্তির পথ। ভিক্ষুধর্মে নারী পরিত্যাজ্য', তখন নাস্তিক মারিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া দিব্যার আর কোনো উপায় রইল না।

বিবাহের পূর্বে গর্ভসঞ্চার হয়েছিল শৈলেরও। বিত্তবান লালা ধ্যানচাঁদ পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল তার মেয়ে শৈলকে। গান্ধীবাদী অমরনাথের স্ত্রী যশোদাকে মোটেই সেকেলে বলা যায় না। কিন্তু সেই যশোদার চোখেও শৈল 'বিলকুল হী নয়ে ঢংগ কী থী।' শৈল তার অতীত জীবনের কথা—একাধিক পুরুষের সঙ্গে প্রেম ও দেহদানের কথা—বিপ্লবী হরীশের কাছে অকপটে স্বীকার করে বলছে: 'মঁ্যায় বড়ী বদমাশ হুঁ।' হরীশের উত্তর: 'যে নারীর মধ্যে এত সাহস সে কখনো নীচ হতে পারে না।' এ হেন শৈলকে দিয়ে আর যাই হোক, নতুন সমাজ গড়ার কথা ভাবা যায় না। শৈলকে নিয়ে সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে গেছে, লালা ধ্যানচাঁদের কিছুই অগোচরে নেই। বাপের কাছে শৈল সাফাই গাইছে—'পিতাজী, মেরা মার্গ সাধারণ প্রথা কে মার্গ সে অলগ রহা হ্যায়। মঁ্যায় অপনে কিসী কাম কে লিয়ে অপনী বুদ্ধি কে সামনে লজ্জিত নহীঁ হুঁ। মুঝে পছ্‌তাওয়া ভী নহীঁ হ্যায়।' হরীশের ফাঁসির হুকুম হয়েছে শুনে দাদারাম এসেছে শৈলর সঙ্গে দেখা করতে, হয়ত বা তাকে সান্ত্বনা দিতে। শৈল অকপটে বলল সে হরীশের পত্নী, আভাসে জানাল তার গর্ভে হরীশের সন্তান। অতঃপর দাদারাম শৈলকে অভয় দিয়ে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যপীড়িত দাদারাম বলে—'প্রদীপের আলো নিভে আসছে।' শৈল বলে—'দাদা, জোত (=জ্যোতি) নহীঁ বুঝতী। হম চলেংগে, জোত কো জারী রখেংগে। মুঝে লে চলো।' বেশ একটা বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের মধ্যে গ্রন্থের সমাপ্তি।

"মনুষ্য কে রূপ" (১৯৪৯) উপন্যাসের নায়িকা সোমা আর-একটি উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্র। জীবনের পথে চলতে-চলতে একটি সামান্য বিধবা পাহাড়ি মেয়ে কীভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে বম্বে সিনেমা জগতের প্রখ্যাত চিত্রতারকা হয়ে গেল, সোমার মধ্যে

নারীর সেই বিবিধ রূপের চিত্র অঙ্কিত। ঐ একই উপন্যাসে উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের মনোরমা হাসপাতালে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কমরেড ভূষণের মৃত্যুতে বিচলিত হয়ে দোতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মঘাতিনী হতে উদ্যত হলে পার্টি সেক্রেটারি জোশী [পূরণচন্দ ?] তাকে বাধা দিয়ে বললেন—'সাথী, ইসসে বড়ে কাম কে লিয়ে তুম্‌হেঁ জিন্দী রহনা হ্যায়।' কথাটি সামান্য, কিন্তু এই সামান্য কথার মধ্যেই মনোরমা জীবনের অসামান্য তাৎপর্য খুঁজে পেল।

"মেরী তেরী উসকী বাত" (১৯৭৪) উপন্যাসের পটভূমি লখনউ বলে এই গ্রন্থে স্বভাবতই বহু বাঙালি চরিত্র এসে গেছে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রধান প্রফেসর মুখার্জা, ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ ড. সামন্ত, তাঁর মেয়ে রত্না, নায়িকা ঊষার বান্ধবী মায়া ঘোষ—যার বাবা বাঙালি ক্রিশ্চান এবং মা মুসলমান, ডাক্তার বোস, ডাক্তার প্রফুল্ল বেনার্জী, পূর্ণিমা বেনার্জী, সুরমা বেনার্জী, ফাদার স্যামুয়েল চ্যাটার্জী প্রভৃতি। সংখ্যায় এরা কম নয় বটে, কিন্তু কোনো বাঙালি চরিত্রই স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নি।

॥ নয় ॥ ইয়শ্‌পালে অশ্লীলতা

ইয়শ্‌পালের উপন্যাসে অশ্লীলতা নিয়ে আলোচনা করার প্রবৃত্তি আমাদের নেই। কিন্তু সংক্ষেপে একটু আভাস না দিলে লেখকের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই বাদ পড়ে যাবে। "দাদা কামরেড"-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায়—মন্‌সূরীতে (মুসোরীতে) বসে বিপ্লবী হরীশ বলছে শৈলকে—'আমি একবার নারীর আকর্ষণী শক্তিকে পূর্ণরূপে দেখতে চাই।' রোমাঞ্চিত শৈলর প্রশ্ন : 'কীভাবে ?' 'তুম্‌হেঁ বিনা কপড়োঁ কে দেখনা চাহতা হুঁ।' গ্রন্থের একাধিক স্থলে শৈল-হরীশের দেহমিলনের বর্ণনা যদি কাব্যগুণেও সার্থক হয়ে উঠত, তবু একটা মানে হত। ইয়শ্‌পালের রচনায় মার্কসবাদ ও ফ্রয়েডবাদের মিশ্রণ সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের কৈফিয়তটা আরও মারাত্মক : 'মেরী রচনাওঁ মেঁ যৌন প্রসঙ্গ অধিক হ্যাঁয়, ইসকা কারণ হ্যায় সমাজ কে অধিক পাঠক যৌনাক্রান্ত হ্যাঁয়।' পাঠক সমাজ সম্পর্কে লেখকের ধারণা অনুসারেই যে লেখকের রচনার মান নির্ণীত হয়, ইয়শ্‌পালের সাহিত্যই তার প্রমাণ।

॥ দশ ॥ শ্রেষ্ঠ উপন্যাস—ঝুঠাসচ

এখানেই নিবন্ধের পূর্ণচ্ছেদ টানলে ইয়শ্‌পালের প্রতি খুব অবিচার করা হবে। হিন্দি সাহিত্যে তো বটেই, আমাদের মতে ভারতীয় সাহিত্যেও একখানি বিশিষ্ট উপন্যাসরূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য তাঁর "ঝুঠাসচ্‌"-এর প্রথম খণ্ড 'ওয়তন ঔর দেশ' (জন্মভূমি ও মাতৃভূমি, ১৯৫৮)। দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পানজাবে বিবদমান সম্প্রদায় পরস্পরকে দলিত-মথিত-নিশ্চিহ্ন করবার যে পৈশাচিক খেলায় মেতে উঠেছিল, চল্লিশ বছর আগেকার সেই দুর্দিনের কথা নিয়ে রচিত প্রায় সাড়ে পাঁচশ পৃষ্ঠার এই উপন্যাসে লেখকের সবচেয়ে বড়ো কীর্তি হল লাহোরের চরিত্রচিত্রন—যে লাহোর সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলশ্রেণীর পানজাবির মধ্যে একটা বিশেষ গৌরব ও মমত্ববোধ ছিল এবং র‍্যাডক্লিফ ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত যে-লাহোরকে ছেড়ে যাওয়ার কল্পনা কারও মনে জাগে নি। একদিন যাঁরা লাহোরে ছিলেন, তাঁদের তো কথাই নেই, আমরা যারা কলকাতার অধিবাসী—আমাদের চোখেও লাহোর যেন তার বড়ো-বড়ো রাজপথ, ছোটোখাটো গলি, অজস্র নোংরা বস্তি, আবার তারই পাশে নব-নির্মিত অভিজাত পল্লী, হাটবাজার, কাফে-রেস্তোরাঁ নিয়ে স্পষ্টভাবে জেগে উঠেছে। মাল রোড, নিস্‌বত রোড, আনারকলী, গোয়ালমণ্ডী, অমৃতধারা, মডেল টাউন, ডব্বীবাজার, রঙমহল, পরীমহল, দেবনগর, রাজগড়, ডঙ্গীগলি, পাপরমণ্ডী, মচ্ছীহাটা, সৈয়দ

মিট্‌ঠা প্রতিটি অঞ্চলের উল্লেখেও বর্ণনার হারানো লাহোরের প্রতি লেখকের অফুরন্ত দরদ ও সহানুভূতি।

ওরই মধ্যে মুখ্য স্থান পেয়েছে রঙমহল এলাকার কাছাকাছি ভোলা পাঁধের গলি, আর সেই গলির কয়েকঘর হিন্দু ও শিখ পরিবার। এখানকার এক নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের ছেলে জয়দেব ও তার বোন তারা—এই উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি ভাইবোনের মধ্য দিয়েই লেখক উপন্যাসের সমগ্র ঘটনা ও সমস্যাগুলিকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা এইরকম :

জয়দেব গ্র্যাজুয়েট, কিন্তু তার স্থায়ী উপার্জন কিছু নেই। যোগ্যতার মধ্যে আছে খানিকটা লেখার শক্তি আর সেই সূত্রে পানজাবের সাহিত্যিক-সাংবাদিক মহলে অল্প কিছু পরিচিতি। বাবা সামান্য ইস্কুল-মাস্টার, পরিবারের গুরুদায়িত্বে লিপ্ত। ১৯৪৩ সালে জয়দেব যখন এম.এ. ক্লাসের ছাত্র, তখন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাকে জেলে যেতে হয়। তখন পরিবারের আর্থিক অবস্থায় তার হৃদয় ব্যথিত হলেও দেশমাতৃকার আহ্বানেও সে সাড়া না দিয়ে পারে নি। জেলে যাওয়ার সময়ে তার বিশ্বাস ছিল—তাদের মুক্তি হবে স্বাধীন ভারতবর্ষে। আর তখন দেশের দুঃখের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের দুঃখও অবশ্য দূর হবে। জয়দেবের আশা ছিল এম্. এ.-টা পাশ করে কোনো কলেজের অধ্যাপক হয়ে বসবে আর সেই সঙ্গে চলবে সাহিত্যচর্চা। কিন্তু তার কোনোটাই পূর্ণ হল না। জেল থেকে সে বেরিয়ে এল ১৯৪৫ সালের মে মাসে—তখন থেকেই বলা যায় কাহিনীর সূচনা। আর শেষ হল ১৯৪৭-এর অগস্টে—স্বাধীনতার রক্তস্নানের মধ্যে। এই সময়ে জয়দেবের বয়স ২৫ থেকে ২৭। ছোটবোন তারা প্রথম বিভাগে ইনটারমিডিয়েট পাশ করে বি. এ. পড়বার স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু পিতৃদেবের বক্তব্য—তারার ভাবী বর সামরাজ সাহনী যখন বি. এ. ফেল, তখন তারার পক্ষে আর লেখাপড়ার কী দরকার? কিন্তু জয়দেবের আগ্রহে ও চেষ্টায় ঋণের টাকা দিয়ে তারাকে যথারীতি ভর্তি করা হল। আর জয়দেব তাকে এই বলে আশ্বাস দিল : 'বাজে চিন্তা না করে তুমি পড়াশুনোয় মন দাও। আমাদের চারিদিকে বড়ো-বড়ো পরিবর্তন হয়ে চলেছে, মা-বাবার দৃষ্টি সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। বিয়েই তো জীবনের সব কিছু নয়। যখন তুমি চাইবে, যোগ্য ছেলের এমন কিছু আকাল হবে না।' দাদার কথায় বোনের কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে—যদি বিয়ে কখনো করি খুব বিদ্বান ও প্রভাবশালী পুরুষকেই বিয়ে করব। নিজের চেয়ে হীন ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে? ছিঃ!

এই যখন অবস্থা তখন জয়দেব ও তারা উভয়ের জীবনে সাথী খুঁজে নেওয়ার পালা। জয়দেব একসঙ্গে পেল উর্দু দৈনিক 'পৈরোকার' পত্রের সাব-এডিটরি আর পেল নয়া হিন্দ পাবলিকেশনের মালিক পণ্ডিত গিরিধারীলালের মেজো মেয়ে কনককে হিন্দি পড়াবার সুযোগ। কনক উর্দু ও পানজাবি ভাষায় চোস্ত্ হলেও হিন্দিতে বড় কাঁচা। এই সময়ে পাঞ্জাবের হিন্দু পরিবারে হিন্দি শেখার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। এম্. এ. ক্লাসের ছাত্রী কনক আগে থেকেই জয়দেবের সাহিত্যপ্রতিভার অনুরাগী। ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ জন্মাতে তাই দেরি হল না। জয়দেবের মন তো বাঁধা হয়ে গেল। কিন্তু বোন তারা? সে-ও তার মনকে বাঁধল। ছেলেটি এম. এ. পাশ করেছে। এখন তার সামনে সমস্যা—অর্থোপার্জনের। ভাবছে, 'ল' পাশ করে গুরুদাসপুরে গিয়ে প্র্যাকটিস করবে। তাহলে যে লাহোর ছেড়ে যেতে হয়। তারা খুব জোরের সঙ্গে—অনেকটা যেন অধিকারের ভঙ্গিতে—বলে ফেলল—'লাহোর ছাড়া চলবে না।' ছেলেটি তাই লাহোরেই থাকে এবং কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করে। যোগ্য ছেলে সন্দেহ নেই, কিন্তু তারার পক্ষে তাকে বিয়ে করা—অন্তত বাপ-মায়ের সম্মতি নিয়ে করা অসম্ভব। কারণ ছেলেটি মুসলমান, নাম তার

অসদ। ভাই-বোন দুজনেই যখন এমনি করে জড়িয়ে পড়েছে, তখন একদিন তারা ও তার মায়ের সংলাপ :

—মা, দাদার জন্য কোথাও বিয়ের সম্বন্ধ কোরো না। মেয়ে না দেখেশুনে দাদা কোথাও বিয়ে করবে না।

—মেয়ে দেখাবার জন্য তো ওরা এক পায়ে খাড়া। ইস্কুলে পড়তে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখে নিলেই হল। তুইও তো দেখতে পারিস।

—এ তুমি হাসালে মা। কথা নেই, আলাপ-সালাপ নেই, একে কি দেখা বলে? আজকাল তো বিয়ের আগে কত দেখাশোনা আলাপ-পরিচয় হয়।

—পোড়ারমুখী, সেটা কি বিয়ে না আশনাই? ওসব চলে আনারকলী, গোয়ালমণ্ডী, মালরোডে। এখানকার গলিমহল্লার লোকে শুনলে ভাববে কী?

অবশেষে একসময়ে মায়ে-ঝিয়ে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে প্রকৃত রহস্য বেরিয়ে পড়ে।

—কেমন ঘরের মেয়ে রে?

—খুব ভালো ঘরের মা। বড়লোক তারা। দত্তা।

—দত্তা? হায়, দত্তা তো বামুন। বামুনের মেয়ের সঙ্গে খত্রী ছেলের বিয়ে কেউ কখনো শুনেছে?

তারা সুকৌশলে নিজের প্রসঙ্গটি এনে ফেলল—বলছ কী মা? আজকাল তো হিন্দু-মুসলমানেরও বিয়ে হচ্ছে। মহাত্মা গান্ধীর ছেলে বৈশ্য হয়ে বিয়ে করেছে বামুনের মেয়েকে। জওহরলালের মেয়ে ব্রাহ্মণ হয়েও বিয়ে করেছে পারসি ছেলেকে। হিন্দু-পারসি-শিখ-মুসলমানে কী তফাত? মানুষ সব এক।

—সে, আমি কি তা জানি না? তবে কি জানিস? ওসব হচ্ছে বড়োলোকের ব্যাপার। আমরা এই গলি-মহল্লার ভাই-বিরাদরি ছেড়ে কোথায় যাব বল্।

ভাই-বিরাদরি পরোয়া না করে জয়দেব কনককে বিয়ে করতে পারত, কিন্তু ইতিমধ্যে তার সংবাদপত্রের চাকরিটি গেল। অন্য কোনো কারণে নয়, রাজনৈতিক মতভেদের জন্য। নীচুতলার জয়দেব উঁচুতলার কনকের কাছে পৌঁছবার জন্য যে সিঁড়ি তৈরি করছিল অকস্মাৎ তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। জয়দেবের অন্য পথও ছিল—তার লেখা। কিন্তু ইতিমধ্যে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এমন দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে যে পানজাবের, বিশেষ করে লাহোরের, জনজীবন একটা চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হল। জয়দেব প্রেমপীড়িত হলেও তার সামনে বড়ো হয়ে দেখা দেয় তার নিজের অক্ষমতা। পরিবারের দায়িত্ব, তারার দায়িত্ব এবং সবচেয়ে বড়ো কথা—কনকের যোগত্যা অর্জনের দায়িত্ব। কোনোটাই পালন করা যাচ্ছে না। বেকার জয়দেব তাই লেখার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু সাহিত্য রচনার মূল্য কী? বড়ো জোর দশ-বিশ টাকা। তার চেয়ে অর্থকরী হল পাঠ্যপুস্তক রচনা। 'অদায়রা মুনব্বর'-এর মালিক গাউস মুহম্মদের পরামর্শে জয়দেব ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক লিখতে শুরু করে। তিনশ পৃষ্ঠার বই দু মাসে শেষ করে দিতে পারলে পাঁচশ টাকা। রোজ কিছু-কিছু করে লিখছে। লেখা ছাড়া সম্প্রতি তার দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে শহরের শান্তিরক্ষা আন্দোলন।

ভালোবাসা—বিশেষ করে রমণীর প্রেম—বোধ করি প্রতিকূল পরিবেশে আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে। তাই জয়দেবের দীর্ঘ অদর্শনে ব্যাকুল কনক একদিন নির্ভীকচিত্তে পথে নামল। চৈত্রের প্রখর মধ্যাহ্নে লাহোরের উত্তপ্ত পথে কনক যেভাবে জয়দেবের সন্ধান পেল তা বিশেষভাবে স্মরণীয় :

—নমস্তে, কোথায় যাচ্ছেন? দেখতেও কি পান না?

—নমস্তে, আপনি? দেখতে চাইব না কেন?

আট পৃষ্ঠা ধরে লেখক কনক-জয়দেবের এই মধুর সাক্ষাতের কথা বলেছেন। ম্যায়ক্লোড রোডের ভেনাস রেস্তোরাঁয় বসে কনক জানতে চাইল দেড়মাস যাবৎ তাকে এইভাবে এড়িয়ে চলার কারণ কী?

—আমি তোমার যোগ্য হতে পারি নি বলেই কাছে আসতে সাহস পাই নি। চেষ্টা করছি যাতে আবার তোমার কাছে যেতে পারি।

—যদি আমাদের বিয়ের পরে চাকরি চলে যেত তাহলেও কি তুমি ছেড়ে যেতে, এড়িয়ে চলতে?

—আগে বিয়ের যোগ্য তো হই।

—তুমি তো আমার হাত ধরেছ তবে আর পাণি-গ্রহণের বাকি কী রইল? যোগ্য-অযোগ্যর প্রশ্ন তার আগেই ভাবা উচিত ছিল। সেদিন কনক কিছু টাকা দিতে চাইলেও জয়দেব তা গ্রহণ করে নি। ফিরতি পথে টাঙায় বসে কনক ভাবছিল—বিয়ের পরে যখন আমরা দুজনে রোজগার করব, তখনও কি ওর টাকা আর আমার টাকার পার্থক্য থাকবে?

এই ভেনাস রেস্তোরাঁয় আর-একদিন এল আর একজোড়া তরুণ-তরুণী তাদের জীবনের পথ বেছে নিতে। অসদ ও তারা। ততদিনে সাম্প্রদায়িক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। টেবিলে দুই পেয়ালা কফি রেখে গভীর আলোচনায় মগ্ন দুটি বিসদৃশ নরনারী —ঝড়ের অন্ধকারে যেন আশ্রয়-আতুর দুটি পাখি।

—আমাকে কোথায় রাখবে বলো। আমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছি।

—তার মানে?

—বিয়ের সব প্রস্তুত। আর সেই সোমরাজ সাহনী শাসিয়ে বেড়াচ্ছে—এ-বিয়েতে যদি আমি অমত করি কিংবা বাইরে কারো সঙ্গে মেলামেশা করি, তবে সে প্রকাশ্যে আমায় বে-ইজ্জত করবে। আমাকে কোথাও নিয়ে চলো—লাহোরের বাইরে কোথাও।

অসদ এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারল না। নারী হয়ে তারা যে বিপদের সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছে না, অসদের কাছে তা স্পষ্ট। সে জানে, চারিদিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে—এ বিপদ কেবল ব্যক্তির নয়, গোষ্ঠীর। সেদিন আঠারো ঘণ্টায় নব্বইটি প্রাণ চলে গেল। অসদ দেখেছে হাতের মেহেন্দি ঘোচে নি এমন মেয়েকেও বিধবা হতে হল।—শোনো তারা। আজ ধৈর্য হারালে চলবে না। আমাদের দুজনকে অপেক্ষা করতে হবে। কতদিন জানি না। কিন্তু এ দুর্যোগ আমাদের পার হতেই হবে।

অসদের কোনো কথাই আজ তারাকে আশ্বাস দিতে পারছে না। প্রথম অন্তরঙ্গতার মুখে অসদ একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল—'তারা, তুমি কি পারবে সম্প্রদায়ের গণ্ডি ডিঙিয়ে আসতে?' উত্তরে তারা বলেছিল—'পারব যদি তুমি হাত বাড়িয়ে আমাকে সাহায্য করো।' কিন্তু কই, অসদ তো আজ পিছিয়ে যাচ্ছে। তবে কি……

তারার অশ্রুমেশানো কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে অসদ বলল—'আমায় ভুল বুঝো না তারা। আমার চিরকাল মনে থাকবে তোমার অশ্রুভরা আঁখি। আর আমাকে শক্তি যোগাবে তোমার ওই সজল চোখে হাসি ফোটাবার আশা।'

এক দিকে পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্য, অন্যদিকে লাহোরের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি জয়দেব ও কনককে, অসদ ও তারাকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে রাখল। এবং দিনে-দিনেই সে ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠল। জয়দেব খুব মন নিয়ে ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তক রচনায় নিবিষ্ট হল। তারপরে একদিন সমস্ত পাণ্ডুলিপি নিয়ে গাউস মুহম্মদের দোকানে যাওয়ার পথে বন্ধু মসউদের কাছে শুনতে পেল—গাউস দাঙ্গায় নিহত। জয়দেবের চোখের সামনে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হয়ে এল। তিন মাসের পরিশ্রম, স্বপ্ন ও আশা গেল ধূলিসাৎ হয়ে। সমস্ত লাহোর আজ তার চোখে বিবর্ণ।

ভোলা পাঁধের গলির দরিদ্র মানুষগুলি জল্পনা করছে—লাহোর যদি পাকিস্তানে পড়ে তবে কী হবে? কে একজন বেদনাভরা কণ্ঠে বলল—'ভাই, দুনিয়ার যেখানেই যাও পেট ভরাবার ব্যবস্থা একটা হবেই। কিন্তু লাহৌর লাহৌর।' ধনী লোকগুলি কিন্তু এই ভাবুকতার মূর্খতাকে প্রশ্রয় দেয় নি। তারা লাহোর থেকে পালাতে শুরু করল পূর্বপানজাব ও উত্তর-প্রদেশের নানা শহরে। কনকদের পরিবার চলে গেল নৈনীতালে। সেখান থেকে কনক লিখছে জয়দেবকে —'আমাদের দুজনের মিলন-পথে কোনো বাধাকেই

বাধা বলে মানব না। তুমি চলে এসো এখানে। যদি না আস, তবে আমাকেই লাহোরে ফিরে যেতে হবে। আমি কী চাই জান? আমি চাই আমাদের মিলন হোক নৈনীতালের এই মনোরম পরিবেশে—এখানকার এই ঠাণ্ডা হাওয়া, চোখ-জুড়ানো ঝিল, সুন্দর পাহাড় ···তুমি তা ভাবতেও পার না। এই সঙ্গে কিছু টাকা পাঠালাম। রাগ কোরো না। টাকা তোমারই।'

জয়দেবের সমস্যা যেন একটা সমাধানের পথ খুঁজে পেল। কিন্তু তারা? পরিবারের মধ্যে সহায় ছিল একমাত্র দাদা। কিন্তু যেদিন সে টের পেল তারা-অসদের গোপন সম্পর্কের কথা, ক্ষমা করতে পারে নি বোনকে। জয়দেব আলাপ-আলোচনায় বক্তৃতায় বলে থাকে—'হিন্দুস্তান-পাকিস্তান যাই হোক না কেন, হিন্দু-মুসলমানকে বাস করতে হবে একই সঙ্গে।' কিন্তু তাই বলে তার বোন বিয়ে করবে কোনো মুসলমান ছেলেকে এটা সে ভাবতে পারে না। ভাবতে ভালো লাগে না। সুতরাং বি. এ. পরীক্ষায় নকল-করা সেই উদ্দীপ্ত যুবক সোমরাজ সাহনীর সঙ্গেই তারার বিয়ের ব্যাপারটা সুনিশ্চিত হয়ে উঠল। সাম্প্রদায়িকতার নরকাগ্নির মধ্যেও ভোলা পাঁধের গলিতে জেগে উঠল মেয়েদের কণ্ঠে মধুর পানজাবি মঙ্গলগীত—'তেরে সামনে বৈঠকে রোণা, তে দুখ তৈনূ নহীঁ দস্‌সণা'—তোমার সামনে বসে-বসে কাঁদব, কিন্তু কখনও তোমায় বলব না আমার দুঃখের কথা।

কাহিনী সংক্ষেপ করে বন্দীশিবিরের কথা বলছি। এই বন্দীশিবিরে একদিন তারা ও অসদের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ। পার্টি অফিসে খবর পেয়ে ভারতীয় ও পাকিস্তানি মুক্তিসেনার প্রহরায় অসদ এসেছে বন্দী নারীদের উদ্ধারকল্পে। কিন্তু এখানে তারাকে দেখতে পাবে আশা করে নি।

—তারা, তুমি এখানে? কেমন করে? কীভাবে···

ব্যাকুল অসদের কোনো প্রশ্নের উত্তরই শোনা গেল না। বন্দী মেয়েরা মুক্তি পেয়ে আশ্রয় পেল ডি. এ. ভি. কলেজের উদ্‌বাস্তু শিবিরে। সেখানে আছে নানা জায়গা থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত শত-শত রমণী। উপযুক্ত 'কনভয়' পাওয়া গেলে এখান থেকে এদের নিয়ে যাওয়া হবে অমৃতসর। একবার একটু সুযোগ পেয়ে অসদ তারাকে শেষ বারের মতো বলল—'তারা, লাহোর থেকে হিন্দু-শিখ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তোমাকে যদি এই শহরে থাকতে হয়, হিন্দু পরিচয়ে থাকা তো আর সম্ভব হবে না। তুমি এখন কী করবে বলো।·····আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে চাইছ না। তোমার মন এখন বিক্ষিপ্ত। তুমি বিশ্রাম করো, ভেবে ছাখো। আমি বিকেলের দিকে আবার আসব।'

সৌভাগ্যক্রমে অমৃতসরের কনভয় পাওয়া গেল আশাতীতভাবে। শরণার্থী সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল দ্রুত তৈরি হয়ে নিতে। শিবিরে যেন প্রাণ ফিরে এল। সর্বত্রই ব্যস্ততা, চাঞ্চল্য। একমাত্র তারাই স্থির নীরব। কী করবে সে? বাপ-মা-ভাই-বোন সকলের কাছে সে মৃত। শ্বশুরবাড়ির তো কথাই নেই। হিন্দুস্তানে গিয়ে কার আশ্রয়ে সে উঠবে? তার চেয়ে এখানে অসদের কাছে থাকাই বোধকরি মঙ্গলজনক তার পক্ষে। কিন্তু একদিন যখন উপযাচিকা হয়ে আশ্রয় চেয়েছিল অসদের কাছে, সেদিন সে রাজি হয় নি। যদি হত, তবে হয়তো এই পরিণামের হাত থেকে রক্ষা পেত তারা। দ্বিধাগ্রস্ত তারাকে শেষ মুহূর্তে জোর করে তুলে দেওয়া হল অমৃতসরের গাড়িতে। অসদ আসবে সেই বিকেল পাঁচটার সময়ে। সে যে অনেক দেরি·····

গাড়ি এসে অমৃতসরে পৌঁছলে দলের অধিনায়িকা কৌশল্যাদেবী সকলকে সম্বোধন করে বললেন—'বহনো, তোমরা ওয়তন হারিয়েছ, কিন্তু এসে গেছ নিজেদের লোকের মধ্যে, দেশের কোলে। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।' ওয়তন আর দেশ—তারার মাথার মধ্যে ওই দুটি কথাই ঘুরতে থাকে। কোনো কিছু ভাববার শক্তি তার নেই। ঐ যে 'ফাফিলা' (যাত্রীদল) যাচ্ছে লাহোরের দিকে, ওরাও ওয়তন ছেড়ে যাচ্ছে

দেশের দিকে। তাহলে কি মানুষের দেশ হল ধর্মের দেশ ?

এই শ্রেণীর উপন্যাসে যে-প্রসঙ্গটি খুবই প্রত্যাশিত তা হল সাম্প্রদায়িক ঐক্যের আলোচনা। সুখের বিষয় লেখক তা নিয়ে কোথাও মহাভারত রচনা করেন নি। মাঝে-মাঝে আভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন যে সাম্প্রদায়িক ভাবটা আমাদের মধ্যে খুবই প্রবল। তরুণ প্রগতিশীল সমাজে যাঁরা উদারপন্থী বলে পরিচিত, তাঁরাও এ রোগ থেকে মুক্ত নন। জয়দেব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—যে জয়দেব মুসলিম সম্প্রদায়ের যোগ্য সন্তান অসদের প্রতি নিজের ভগিনীর ভালোবাসাকে সমর্থন জানানোর পরিবর্তে বিয়ের নামে সোমরাজ শাহনীর মতো একটি হিন্দু দুর্বৃত্তের হাতে তাকে সঁপে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছোটোখাটো রীতিনীতি আচার-ব্যবহার পারস্পরিক মিলনের পথে যে কতটা প্রতিবন্ধক, লেখক সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বইটি পড়তে-পড়তে মনে হয় আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়-চীন-শক-হূণ-পাঠান-মোগল নিয়ে কবিকল্পিত অখণ্ড ভারতীয় সত্তা গড়ে উঠতে কি একবিংশ শতাব্দীও পার হয়ে যাবে ?

সূত্রনির্দেশিকা

১. ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তুলসীদাস তাঁর মহাগ্রন্থ রামচরিতমানস রচনা শুরু করেন।

২. নগেন্দ্র, হিন্দী সাহিত্য কী প্রবৃত্তিয়াঁ, ১৯৮০। উক্ত গ্রন্থের 'হিন্দী উপন্যাস' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৩. পানজাবের প্রসিদ্ধ সমাজসেবী ও ধর্মোপদেষ্টা শ্রদ্ধারাম ফুল্লোরী রচিত 'ভাগ্যবতী' (১৮৭৩) উপন্যাস এক সময়ে হিন্দি পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। তবে হিন্দি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে পরিচিত লালা শ্রীনিবাস দাসের (১৮৫১-৮৭) 'পরীক্ষাগুরু' (১৮৮২)। কিন্তু উপন্যাস পাঠের প্রতি হিন্দি সমাজের দৃষ্টি প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেন সর্বপ্রথম দেবকীনন্দন খত্রী (১৯৬১-১৯১৩) তাঁর 'চন্দ্রকান্তা' (১৮৯১) উপন্যাস দিয়ে। হিন্দি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুক্ল মনে করেন সাহিত্যের দৃষ্টিতে হিন্দির প্রথম ঔপন্যাসিক বলা উচিত কিশোরীলাল গোস্বামীকে (১৮৬৫-১৯৩৪), যদিও দেবকীনন্দন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : 'পহলে মৌলিক উপন্যাস লেখক, জিনকে উপন্যাসোঁ কী সর্বসাধারণ মেঁ ধূম হুঈ, কাশী কে বাবু দেবকীনন্দন খত্রী থে।'

৪. শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদীর উক্তি : প্রেমচন্দ কী তিরোহিত প্রতিভা কী তরুণ শক্তি ইয়শ্‌পাল।

৫. সমশ্রেণীর অন্যান্য লেখক রাংগেয় রাঘব, ভৈরবপ্রসাদ গুপ্ত, নাগার্জুন প্রভৃতি।

৬. তূ কেবল ক্রান্তি কী ম্যাশিন নহীঁ, মনুষ্য হৈ।

৭. দেশদ্রোহী, ৫ম সং, ১৯৫৮, পৃ ২৩৭

৮. ঐ, পৃ ২৪৪

৯. ঐ, পৃ ২৯৭

১০. ইয়শ্‌পাল-রচিত দুখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দিব্যা' (১৯৪৫) ও 'অমিতা' (১৯৫৬)-র মধ্যে প্রথমখানিই সফল রচনা।

১১. Corrinne Friend, Yashpal Looks Back, Vikas Publishing House, 1981, p 211

১২. কলাপ্রেমিয়োঁ কো মেরে প্রতি এক শিকায়ত হ্যায় কি মঁ্যায় কলা কো গৌণ ঔর প্রচার কো মুখ্য স্থান দেতা হূঁ। ...জীবন মেঁ মেরী সাধ কেবল জীবনযাপন হী নহীঁ বল্‌কি জীবন কী পূর্ণতা হ্যায়। ইসী প্রকার কালা সে সম্বন্ধ জোড়কর মঁ্যায় কলা কো কেবল কলাকে লিয়ে নহীঁ সমঝ সকতা। মেরে বিচার মেঁ কলা কা উদ্দেশ্য জীবন মেঁ পূর্ণতা কী প্রাপ্তি হ্যায়।

১৩. 'সিংহাবলোকন' নামে তিনখণ্ডে প্রকাশিত। উল্লেখিত অংশটি দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

১৪. ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'অরক্ষণীয়া'র হিন্দি অনুবাদ বেরোয় ১৯২৭ সালে অর্থাৎ ইয়শপাল তাঁর আত্মজীবনীতে যে সময়ের কথা বলেছেন তার কিছু আগে।

১৫. 'পথের দাবী' (১৯২৭) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইখানির উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয় এবং শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরাধিক কাল পরে ১৯৩৯-র মার্চ মাসে ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বকালে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। মনে হয় 'দাদা কামরেড' (১৯৪১) রচনার অব্যবহিত সাহিত্যিক প্রেরণা ছিল 'পথের দাবী'।

বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি

সুধীর সেন

১ : উদ্ধারপর্ব

(১) 'আ শ্র ম পু ণ্য স্থা ন'

রোজকার মতো সেদিনও মাঠে কাজ করছিলাম। বেলা এগারোটা নাগাদ গুরু আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'তোমার দুই দাদা এসেছেন তোমার মাকে নিয়ে। তাঁরা বোধহয় তোমাকে ফিরিয়ে নিতে চান।'

আমি চুপ করে রইলাম, গুরু আর কী আদেশ বা উপদেশ দেন শুনবার জন্য। একটু বাদে তিনি বললেন, 'দেখো, তোমরা যাই কর, আশ্রমের বাইরে গিয়ে করবে। এখানে যেন কোনো গোলমাল না হয়। আশ্রম পুণ্যস্থান। এখানে যেন কিছুতেই পুলিসকে ঢুকতে না হয়।'

একটু দূরে বড়দা, সেজদা আর মা অপেক্ষা করছিলেন। আমি গিয়ে তাঁদের প্রণাম করলাম। বড়দা বললেন, 'তোমাকে নিতে এসেছি, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।' আমি রাজি হলাম, শুধু তৈরি হয়ে আসার জন্য কয়েক মিনিট সময় চাইলাম। হাতের মাটি ধুয়ে ছোটো একটি জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম ছোটো একটি পুটলি হাতে। তাতে ছিল আমার যথাসর্বস্ব, অর্থাৎ আর-একখানি ছোটো কাপড় আর জামা। সেই শিশু-কুলির পরিচ্ছদেই তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করলাম—খালি পায়ে।

কারো মুখে কোনো কথা নেই। নীরবে রেল স্টেশনের দিকে রওনা হলাম। আশ্রম ছাড়ার আগে শিবদার সঙ্গেও কোনো কথা হয় নি। যে আশ্রম-জীবনের উপর আমার আকর্ষণ দিন-দিন ক্ষীণ হয়ে আসছিল, হঠাৎ যেন তাই আবার কল্পনায় রঙিন হয়ে উঠল, দুর্লভ স্থান বলে মনে হল। সংসারের মায়া ত্যাগ করে আশ্রমে এসেছিলাম, এতদিনে এই শূন্য শুষ্ক আশ্রমের উপরেও একটা মায়া এসে মন দখল করেছিল। তা ছাড়া এখানে শিবদা রয়েছেন, তাঁকে ফেলে এভাবে চলে যাই কী করে? একদিন ত্যাগের

পথ বাছাই করে নিয়েছিলাম, সে পথ কি এমনি করে এক মুহূর্তে ত্যাগ করে চলে যাব? বার-বার মনে হতে লাগল—না, না, তা হতে পারে না। আমাকে জোর করে কেউ নিতে পারবে না। এসেছিলাম নিজের ইচ্ছায়। যদি আর কোথাও যেতে হয় তবে যাবও নিজের ইচ্ছায়।

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে!

সেদিন মনেপ্রাণে সে ব্যথা অনুভব করেছিলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল অদৃষ্টের খামখেয়ালির কথা। মা-ই তো একদিন আমাকে সাধুর কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে বলেছিলেন—'আমার এ ছেলেকে সাধু করে নিয়ে যাও।' আজ সে মা-ই এসেছেন অত কষ্ট করে অতখানি পথ বেয়ে আমাকে সাধুর কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে। তবে আমরা রক্তমাংসের মানুষ, যুক্তিতর্কের নই। তাই মা-র ব্যবহারে অসামঞ্জস্য দেখে বিন্দুমাত্র অবাক হই নি বা সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে তাঁর মনে আঘাত দিই নি। জানতাম মা-র পক্ষে এই ব্যবহারই স্বাভাবিক। তাঁর অব্যক্ত মনোভাব আমার কাছে ফুটে উঠেছিল সেই অবিস্মরণীয় প্রশ্নে:

শুধু কি মুখের কথা শুনেছ দেবতা,
শোন নি কি জননীর অন্তরের ব্যথা!

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম, সেখান থেকে ট্যাকসি নিয়ে সবাই গিয়ে উঠলাম শ্যামবাজারে পুলিসের ঘাঁটিতে, ধীরেনদার আস্তানায়। বড়ো, পুরোনো দোতলা বাড়ি, নীচে ছিল পুলিসের আফিস। ধীরেনদা থাকতেন দোতলায়। তখন ওখানে ছিলেন তাঁর বিধবা মা আর স্ত্রী, অর্থাৎ আমাদের পিসি আর বউদি। বউদি অনেক আদর-যত্ন করে আমাকে খাওয়ালেন। আমি বিশেষ কিছু বলি নি, তখন চুপ করে থাকাই ছিল আমার রীতি। তবু তাঁর সস্নেহ-করুণ দৃষ্টি আর স্নিগ্ধ ব্যবহার আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। মনে হল যেন তা আমার সেই বিমূঢ় অবস্থায় এক নূতন চেতনা জাগিয়ে দিল, যদিও অল্প সময়ের জন্য।

বড়দা আর সেজদা ঠিক করলেন পরের দিন সকালে শিয়ালদা স্টেশনে গোয়ালন্দ একসপ্রেস ধরে কুমিল্লায় রওনা হবেন। আর আমার মাথায় ঘুরছিল কেবল একটি চিন্তা—কী করে ওখান থেকে বেরিয়ে আবার আশ্রমে ফিরে যেতে পারি। কিন্তু কী করে বার হব? এ যে পুলিসের আস্তানা। মনে হল আমি যেন এক দুর্গে বন্দী।

সন্ধে হয়ে এল। দাদারা সব বাইরে। আর কেউ তখন ওখানে নেই, শুধু পিসি আর আমি লম্বা করিডোরে পায়চারি করছিলাম। করিডোরের ঠিক মাঝখানে ছিল নীচে যাবার সিঁড়ি। পিসি আমাকে বোঝাচ্ছিলেন কেন আমার কুমিল্লায় ফিরে যাওয়া উচিত, মা-বাবার মনে কষ্ট দিতে নেই। তা ছাড়া এভাবে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা একেবারেই উচিত নয়। তারপরে ভয় দেখালেন, 'এখান থেকে কিন্তু পালাবার চেষ্টা কোরো না, নীচে পুলিশ আছে, ধরা পড়লে তোমায় আটকে রাখবে, তখন গোলমাল হবে। আমরা পুলিসকে বলে রেখেছি। আমি তো আর মিছে কথা বলছি নে!'

পিসির শেষ কটি কথা বিশেষভাবে আমার কানে লাগল। চমকে উঠলাম, বুঝলাম—পুলিশকে কিছু বলা হয় নি। পিসি আমাকে মিছে কথা বলে মিছে ভয় দেখাচ্ছেন।

আমরা একই সঙ্গে করিডোরে একই দিকে আস্তে-আস্তে পায়চারি করছিলাম। এবার আমি খানিকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দুজনে উলটো দিকে চলার ব্যবস্থা করলাম। একবার পিসি যেই সিঁড়িটা পেছনে রেখে সামনে এগিয়ে গেলেন, আমি তক্ষুনি তর্‌তর্‌ করে নীচে নেমে একেবারে রাস্তায় চলে গেলাম। কোনো পুলিশ দরজায় দেখতে পাই নি। তবু মনে-মনে ভয় ছিল, যদি কেউ পেছন থেকে এসে আমায় ধরে ফেলে। তাই রাস্তায় এদিক ওদিক

করে লোকজনের মধ্যে যথাসম্ভব লুকিয়ে হনহন করে চললাম। কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, ধরমতলা, চৌরঙ্গী দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলে।

দারোয়ান আমাকে দেখে একগাল হাসি হেসে বলল, 'বাবু তো অনেকক্ষণ হল চলে গেছেন।' আমি বললাম, 'তা তো হবেই, রাত নটা নাগাদ কী করে কাজ করবেন? আমি এ সময় এসেছি আজ তোমার কাছে থাকব বলে।' শুনে সে একটু অবাক হল, তার-পরেই আবার একগাল হাসি হেসে খাবার আর শোবার ব্যবস্থায় লেগে গেল।

বিহার বা উত্তরপ্রদেশের দারোয়ান, তাই আমাদের কথা চলত বাঙলা-হিন্দি মিশিয়ে। তার সঙ্গে আমার চেনা হয় কয়েক মাস আগে, প্রথম যখন বাড়ি ছেড়ে কলকাতার মঠে চলে আসি। সে সময়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে ইটপাটকেলের কাজ চলছিল পুরোদমে। আমাদের এক গুরুভাই সুবোধবাবু (তাঁর পদবী ছিল খুব সম্ভব মিত্র) সেখানে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম পরিচয়েই তাঁর সঙ্গে আমার একটা ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। তিনি ছিলেন একান্ত বিনয়ী, ধার্মিক ও স্নেহপরায়ণ। আমাকে তাই ছোটো ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। ওখানকার যন্ত্রপাতি কাজকর্ম আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঘুরে-ঘুরে দেখিয়েছিলেন। তাই থেকে দারোয়ানের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়। আর সুবোধদার মতো সে-ও আমাকে আপনজন বলেই মনে করত।

দারোয়ান কিছুটা আটা বার করল, তারপর জল দিয়ে সেটা ভালো করে মাখল। সেই মাখা-আটা একটা বাসনে রেখে হাতের মুঠোর উলটো দিক দিয়ে চেপে-চেপে কিছু হালকা অসমান গর্ত বানাল। তাতে কিছু জল ছড়িয়ে মাখা-আটাকে আবার ভিজিয়ে রাখল।

বাইরে দরজার পাশেই ছিল একটি ছোটো মাটির উনুন। তাতে কয়লা আর ঘুঁটে দিয়ে আগুন ধরাল। তারপর এক কোণ থেকে কিছু তরকারি বার করল। যত দূর মনে পড়ছে সে তরকারি ছিল বেগুন, ভিণ্ডি আর আলু। এবার দারোয়ান তরকারি কাটতে বসে গেল। আমি বললাম আমাকে একটা দা বা ছুরি দিতে। সে একটু অবাক হল। তারপর একটু হেসে একটা বঁটিদা দিল। তরকারি কাটায় এমন সঙ্গী আর সহকর্মী পেয়ে সে বেজায় খুশি হল।

ততক্ষণে উনুন ভালোভাবেই ধরে গিয়েছিল। সেটাকে ঘরে নিয়ে এল। তারপর সরষের তেলে কিছু বেগুন আর ভিণ্ডি ভাজল। বাকি তরকারি দিয়ে একটি ডালনার মতো খাবার বানাল। এবার রুটি তৈরির পালা। সেই জলে-ভেজানো আধমাখা আটা এবার ভালো করে মাখল। ততক্ষণে আটা সবটা জল শুষে নিয়েছিল। সেই নরম আটা দিয়ে বেশ বড়ো লেচি বানাল, গোটা ছয় হবে। এক-একটা লেচি হাতে নিয়ে একটু চেপে চ্যাপটা করে দুহাতের পাতা দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ করে বেশ বড়ো করে ফেলল। তারপর চাকি-বেলুন দিয়ে আরো একটু বড়ো আর সমানভাবে গোল করে নিল। বেলার পর্ব শেষ হলে সেঁক দেবার পালা। প্রত্যেকটি রুটি তাওয়ায় উলট-পালট করে, আগুনের আঁচে ধরল, আর তা ফুলে গোল হয়ে উঠল। নামিয়ে তার উপর চামচ দিয়ে একটু ভয়সা ঘি ছড়িয়ে দিল।

এমন নরম আর উপাদেয় হাতরুটি আগে কখনো খাই নি, বানাতেও দেখি নি। সেদিন সেই নৈশভোজন সব দিক দিয়েই আমার অপূর্ব মনে হয়েছিল। আমি যে পুলিশের শিবিরে নেই, দারোয়ানের কুটিরে—সেটাও ছিল তার একটা বড়ো কারণ।

দারোয়ান তার পাশেই আমার জন্য একটা মাদুর পেতে দিল। রাত্তিরে হিজিবিজি অনেক স্বপ্ন দেখে-ছিলাম, তবু সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় নি। ভোর হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম ভাঙল। বেশ তাড়াতাড়ি দিনের আলো ফুটে উঠল। এবার আমার ছুটি নেবার পালা। আমার অতিথিবৎসল দারোয়ান বন্ধুকে অনেক সুক্রিয়া জানালাম। বললাম, বাবু কাজে এলে যেন তাঁকে

বলে যে আমি ওখানে রাত কাটিয়ে গেছি, মঠে গেলে আমার সঙ্গে দেখা হবে। দারোয়ান 'ফের আইয়ে' বলে হাত জোড় করল।

সার্কুলার রোড ধরে ভবানীপুর দিয়ে মঠে ফিরে গেলাম। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা হল। তাঁদের একে-একে প্রণাম জানালাম। আবার কলকাতার মঠে এসেছি দেখে তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমি কোথা থেকে কিভাবে কেন এলাম, তা অবশ্য তাঁদের বলি নি।

তারপরে গেলাম আমার সবথেকে প্রিয় সেই গোলাপঠাকরুনের কাছে। তিনি রান্নাঘরের সামনেই ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করলাম। আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন 'তুমি ভালো আছ তো' বলে। তাঁর দৃষ্টিতে, কথায় আর সুরে এবার অনেকটা দূরত্ব মনে হল। তাই খানিকটা বিস্মিত আর ব্যথিত হলাম, তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই করুণাময়ী রমণী কিছুতেই আমার উপর নিষ্করুণ হতে পারেন না। তবে তাঁর এই কবোষ্ণ ভাব কেন? কল্পনায় মনে হল, তিনি হয়তো ভাবছিলেন, 'তুমি আবার এখানে কেন?' আর সঙ্গে-সঙ্গে হয়তো প্রার্থনা করছিলেন,—'ঠাকুর, তুমি বাছাকে সুমতি দাও যেন মা-বাবার কাছে ফিরে যায়, আর যেন আশ্রমে না আসে।'

বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে ধীরে-ধীরে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার সে কল্পনাই সত্য ছিল। গোলাপঠাকরুন আশ্রমে এসেছিলেন অসহায় বালবিধবা হিসেবে। নিজেকে তাই ঠাকুরের কাছে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দিয়ে জীবনে শান্তিলাভের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজে যা চেয়েছিলেন তা পান নি, কিন্তু অন্য কেউ সংসারের সুখ আর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হোক, তা তিনি চাইতেন না। তাই আমার মতো কিশোর বালককে আশ্রমে দেখে তিনি খুশি হতেন না, বেদনা বোধ করতেন। ভাবতেন আমার ভবিষ্যতের কথা, আর সঙ্গে-সঙ্গে যে পরিবার ছেড়ে এসেছি তার বিচ্ছেদ-বেদনার কথা। তাই নিজে সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সন্ন্যাসকেই জীবনের সবচেয়ে আদর্শ বলে মনে করেন নি। সে আধ্যাত্মিক দম্ভ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি।

তার সঙ্গে ছিল আরেকটা কারণ, নিতান্ত মামুলি ধরনের। দিনের পর দিন আশ্রমে থেকে তিনি ভালো করেই জানতেন সেখানকার সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিকতায় কী পরিমাণ ভেজাল মিশ্রিত ছিল। দ্বন্দ্ব, বিবাদ, প্রতিযোগিতা, বৈষয়িকতা, স্বার্থপরতা, অনাচার—শোনা যায় এমনকী ব্যভিচার—কিছুরই অভাব ছিল না। তাই তিনি মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন আমার মুক্তি, সংসার থেকে নয়, সন্ন্যাসীর কবল থেকে।

গোলাপঠাকরুনের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। তবু সেই দরদি, দূরদর্শী বালবিধবা সন্ন্যাসিনী আমার মনোজগতে রয়েছেন চিরবিদ্যমান।

(২) 'তার আগে কি মরণ নেই?'

দু দিন পরে আবার ফিরে এলাম মাধাইপুরে। সবশুদ্ধ বাইরে ছিলাম মাত্র তিন দিন। তবু মনে হল যেন এক বিরাট অভিযান সম্পন্ন করে ফিরে এসেছি। সেই তিন দিনের কাহিনী কাউকে বলি নি, বলার প্রয়োজনও মনে করি নি। নিজের অন্তর্দাহ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।

আশ্রমে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই পুরোনো সংশয় এসে মনকে আক্রমণ করল। তিন দিন আগে অনিচ্ছাকৃত বিদায়ের বেলা আশ্রমের প্রতি যে আকর্ষণ হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা আবার উধাও হয়ে গেল। এই সংকীর্ণ প্রাণহীন জীবনযাত্রার উপর অনাস্থা দিন-দিন দৃঢ়তর হয়ে চলল।

গুরু একদিন দূরের মাঠ থেকে একটা মস্ত বড়ো ভুঁইফোড় নিয়ে এলেন; ধবধবে সাদা, আধ ইঞ্চি খানেক মোটা। আমরা ছোটোবেলায় একে ব্যাঙের ছাতা বলতাম, তাকে অখাদ্য বলে মনে করতাম। গুরু বললেন, এটি বিশুদ্ধ, বিষাক্ত নয়। নিরামিষাশীদের

পক্ষে আমিষের শামিল। তিনি নিজ হাতে তা কেটে তারপর কিছু সাঁতলিয়ে নিয়ে গরমমশলা ইত্যাদি দিয়ে ডালনা বানালেন। সবাই মিলে তা খেলাম। তবে তার উপর গুরুর অতটা লোভ দেখে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। মুক্তিকামী সাধকের পক্ষে তা শোভনীয় বলে মনে হয় নি।

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল যে সাধুরা যখন কুমিল্লায় কাকার বাড়িতে যেতেন তখন কোনো শুভদিন উপলক্ষে শরবত বানানো হত গামলা ভরে—দুধ, বাদাম, চিনি ইত্যাদি দিয়ে। তার সঙ্গে গুঁড়ো করে মেশানো হত বেশ খানিকটা ভাঙ, তবে 'ভাঙ' শব্দটি ব্যবহার করা রীতিবিরুদ্ধ ছিল। তার বদলে সে পানীয়কে বিশুদ্ধ নাম দিয়ে বলা হত—'সিদ্ধি'। সেই সিদ্ধি ছিল অন্তত সাময়িক সিদ্ধিলাভের একটি প্রধান উপায়। কারণ এই বিশিষ্ট পানীয়ের সাহায্যে কীর্তন-ভজনে 'ভাবের আবির্ভাব' অনেক সহজেই হত। মাধাইপুরের আশ্রমে তখনও সিদ্ধির চলন হয় নি—ছোটো জায়গা, অল্প লোক আর একান্ত শিশু-প্রতিষ্ঠান বলে। পরে তার প্রচলন হয়েছিল কিনা বলতে পারি নে।

জীবন চলছিল একঘেয়েভাবে আগেরই মতো রুটিন-মাফিক। গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাজল বয়ে আনা, পালা করে রান্নাঘরের কাজ করা, আর দিনের পর দিন সেই প্রখর রোদে কচাগাছ পোঁতা। একদিন একটা মনিঅর্ডার এল আমার নামে। শুনে অবাক হলাম। দেখা গেল বাড়ি থেকে দশ টাকা পাঠানো হয়েছে, মার নাম করে, যেন তা দিয়ে আমি নিজের জন্য কাপড় কিনে নিই। গুরুর আদেশ কী জানতে চাইলাম। তিনি বললেন গ্রহণ করতে।

একটি কলম আনা হল নাম সই করবার জন্য। বহু মাস পরে সেই প্রথম কলম হাতে নিলাম। তার দিকে তাকাতেই চোখ যেন ছলছল করে উঠল। মনে হল, ছোটোবেলা থেকে যাকে আমার প্রিয় সঙ্গী করে নিয়েছিলাম তার থেকে আমি কত দূরে চলে গেছি। এখন আমার কাজ হল কলম নিয়ে নয়, শাবল নিয়ে।

মার দৃষ্টিতে আমার চাষী- বা কুলি-জনোচিত পরিচ্ছদই সব থেকে পীড়াদায়ক মনে হয়ে থাকবে, তাই অন্তত তার প্রতিকারের ব্যবস্থা তিনি করলেন। সে টাকা দিয়ে কেনা হল একজোড়া ছোটো লাল-পেড়ে ধুতি। বোধহয় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের। আর একটি সাদাটে হাতকাটা জামা।

ঝুড়ির নীচে গোখরো সাপ

একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে গেলাম জ্বালানি কাঠের ঝুড়িটা আনতে, বাইরে থেকে কিছু কাঠ সংগ্রহ করে আনব বলে। ঝুড়িটা ছিল তিনটি ইঁটের উপর বসানো। তুলেই দেখি, ইঁটের মাঝখানে একটি কুচকুচে-কালো-হলদে-ছিট-ওয়ালা গোখরো সাপ বিড়ে পাকিয়ে শুয়ে আছে। আমি তার উপর চোখ রেখে অতি নিঃশব্দে পা টিপে-টিপে ঝুড়ি হাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম, আর দরজার পাশেই ঝুড়ি রেখে ছুটে গেলাম গুরুকে খবর দিতে। সেদিন দৈবাৎ ওখানেই কিছু বাইরের লোক উপস্থিত ছিল, তাদের দুজন ছুটে এল। প্রথম কয়েকটা আস্ত ইঁট তুলে ছুড়ে মারল সেই কুণ্ডলীটার উপর। তখন সাপটা হাতখানেক ফণা তুলে ফোঁস-ফোঁস করে উনুনের পাশে, বেড়ার গায়ে বিষাক্ত ফেনা ছড়িয়ে ছোবল মারতে লাগল। যখন বোঝা গেল যে তার মেরুদণ্ডটি ভেঙেছে, তখন লম্বা ডাণ্ডা দিয়ে মেরে তাকে ঠাণ্ডা করা হল।

সাপটি ছিল বেশ পুষ্ট, হাত পাঁচেক লম্বা। দূরে, মাঠের এক কোণে কাঠের চিতা বানিয়ে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হল। ফিরে এসে অনেক জল দিয়ে ধুয়ে রান্নাঘরের বেড়াকে বিষমুক্ত করতে হল।

ভাবি, সেদিন কত সহজেই একটা অঘটন ঘটতে

পারত। ঝুড়িটা নিঃশব্দে দুহাতে ধরে তুলেছিলাম বলেই সাপের নিদ্রাভঙ্গ হয় নি। তার গায়ে একটু লেগে গেলেই আর উপায় ছিল না। ভয়ে বা চমকে উঠে তার গায়ে ঝুড়ি ফেলে দিলেও আর রক্ষে ছিল না। সেদিন অদৃষ্ট আমার সহায় ছিল সন্দেহ নেই।

কয়েক সপ্তাহ চলে গেল। শিবদার সঙ্গে আমার কথাবার্তা চলত আগের মতোই অগোচরে। যখনি সুযোগ পেতাম। আমার মন প্রায় বারো আনা ঠিক হয়ে এসেছিল যে এ আশ্রম আমার স্থান নয়, আমাকে এখান থেকে বিদায় নিতেই হবে। শিবদা আমার কথায় সায় দিতেন। তাঁরও প্রাণ ঠিক ওখানে ছিল একেবারেই বলা চলে না, তবে তিনি জানতেন যে তাঁর পক্ষে আশ্রম ত্যাগ করা সম্ভব নয়, কারণ তাঁর বাধা ছিল শুধু গুরু নয়, কাকাও। তা ছাড়া, তাঁর স্বভাব ছিল কোমল আর দুর্বল, বিদ্রোহের ধাতে তা তৈরি হয় নি।

মাঠে কাজ করছিলাম দুজনে মিলে। তখন গুরুর ডাক এল জরুরি কারণে। শাবল রেখে তাঁর কাছে গেলাম। বললেন—'তোমাকে নেবার জন্য আবার তোমার দাদারা এসেছেন। তুমি যাও তাঁদের সঙ্গে। তবে জোর করে কি কেউ কাউকে নিতে পারে? কেউ তা পারে না, সে কথা মনে রেখো। তার আগে কি মরণ নেই?'

গুরুর শেষ কটি কথা তীরের মতো গিয়ে মনে বিঁধল।

খানিকটা দূরে বড়দা আর সেজদা অপেক্ষা করেছিলেন। এবার মা আসেন নি, তার বদলে ছিলেন একটি অচেনা লোক—শ্যামবর্ণ, দেখতে ছোটোখাটো আর রোগা, ধারালো দৃষ্টি, মুখে সামান্য হাসির আভা। সেজদা আমাকে নীচু গলায় বললেন, 'উনি জুজুৎসুতে ওস্তাদ, আর ওঁর গায়ে ভীষণ জোর। পেশীগুলো লোহার মতো শক্ত।' পরে শুনলাম তাঁকে বলা হত "ডাক্তারবাবু", শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'-র নায়কের অনুকরণে। তিনি এক সময়ে বিপ্লবী ছিলেন তা ধরে নেওয়া যেতে পারে, আর সে সময় বোধ হয় বড়দার অনুগত অনুচর ছিলেন।

আবার সেই পুটলি হাতে রওনা দিলাম চারজনে নবদ্বীপ স্টেশনের দিকে। আমার মাথায় ঘুরতে লাগল গুরুর শেষ কথা—'তার আগে কি মরণ নেই?' এতে রয়েছে আত্মহত্যার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। গুরু কি সত্যি তবে তাই চান? না, না, আমি তো মরতে চাই নে। তবে আমাকে জোর করে কেন ধরে নিয়ে যাবে? তা আমি কিছুতেই হতে দেব না। সেখানে গুরুর সঙ্গে আমার একটা মিল এসে গেল। সেই বিমূঢ় বেপরোয়া অবস্থায় ঠিক করলাম যে আমি আবার আশ্রমে ফিরে যাব যেমন করেই হোক। ওদের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেব। আর তাতে যদি মরণ আসে তবে তাই হোক।

ডাক্তারবাবু আমার দিকে একটু বক্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে এবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' আমি চুপ করে রইলাম। বড়দা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কেন আমার বাড়ি গিয়ে পড়াশুনা করা উচিত। কিন্তু আমার তখন অবুঝ আর অন্যমনস্ক অবস্থা দেখে আর কিছু বললেন না। সেজদা বললেন, 'মা তোমার জন্য পথ চেয়ে আছেন।' আমার মাথায় ছিল শুধু একটি ভাবনা—কী করে এঁদের তিনজনের হাত থেকে ছাড়া পাব। জানতাম তাঁদের এড়ানো সহজ হবে না। তাই নিরুপায় হয়ে অনিচ্ছায় তাঁদের সঙ্গে পা ফেলে-ফেলে চললাম। ডাক্তারবাবুর সজাগ দৃষ্টি, শিকার যেন কিছুতেই না পালায়। পারলে বোধহয় তক্ষুনি আমাকে হাতকড়া দিয়ে আধ্যাত্মিক কয়েদি হিসেবে নিজ হাতে ধরে নিয়ে যেতেন। তবে অত বাড়াবাড়ি করার সাহস পান নি। হয়তো প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

এবার কলকাতায় আমায় নিয়ে যাওয়া হল সুকিয়া স্ট্রীটে, এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতির বাড়িতে। ছোটো দোতলা বাড়ি, উপরের তলায় আমার থাকবার

ব্যবস্থা হল একটি ছোটো ঘরে। ফলে হলাম গৃহ-বন্দী অথবা রুমবন্দী। বলা বাহুল্য, সেটা ঠিক সলিটারি সেল ছিল না, ঘরে এবার সব সময়েই একজন থাকতেন, কোনো-কোনো সময়ে তারো বেশি। এমন-কী বাথরুমে গেলেও আমার উপর সতর্ক নজর থাকত। ডাক্তারবাবু আশেপাশেই থাকতেন, যে-কোনো সময়েই জুজুৎসুর প্রয়োজন হতে পারে মনে করে। নীচের তলায় বাড়ি থেকে বেরুবার দরজা সব সময়েই তালাচাবি দিয়ে আটকানো। সতর্কতার ব্যবস্থা এবার একেবারে নিখুঁত। তাই আমারো আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

দিন দুই সুকিয়া স্ট্রীটে ছিলাম। আদরযত্নের বিন্দু-মাত্র ত্রুটি ছিল না। আহারের ব্যবস্থাও চিত্তজয়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। বাহ্যত আশ্রমের তুলনায় এ জায়গাটা ছিল স্বর্গতুল্য। কিন্তু তা আমার কাছে গ্রাহ্য বলে মনে হয় নি। "স্বর্গ" চাই নি বলেই তো আশ্রমে গিয়েছিলাম, সে কথা ভুলব কেমন করে?

মাঝে-মাঝে আত্মীয়স্বজন এসে আমাকে দেখে যেতেন, বয়োজ্যেষ্ঠরা যথারীতি উপদেশ দিতেন। তবে সেসব আমার কানে ঢুকলেও বেশি দূর অগ্রসর হত না। আমার অধিকাংশ সময় কাটাবার উপায় ছিল নিদ্রা আর ধ্যান, আর নিষ্ক্রমণের প্ল্যান।

এবার কুমিল্লা যাবার দিন স্থির হল। সুকিয়া স্ট্রীট হতে ট্যাকসি করে শিয়ালদা স্টেশনে গেলাম রাত আটটা নাগাদ। সঙ্গে বড়দা-সেজদা আর ডাক্তার-বাবু। আমার এমন নিরীহ আত্মসমর্পণ দেখে ডাক্তার-বাবু বোধহয় খুব খুশি হন নি, কারণ তাঁকে নিজের কেরামতি দেখাবার কোনো সুযোগ দেওয়া হল না।

গাড়িতে বেশ ভিড় ছিল। আমরা যাচ্ছিলাম তৃতীয় শ্রেণীতে। একসঙ্গে চারজনে বসবার জায়গা পেলাম না, তবু যথাসম্ভব কাছাকাছি বসলাম তিনটে বেঞ্চির উপরে। গাড়ি হুইশল্ দিল, ঝকঝক করে চলতে লাগল, তারপর ছুটল পুরোদমে, ঊর্ধ্বশ্বাসে। এ সময় চোখ বুজে নিদ্রাই সমীচীন মনে হল। তবে মাঝে-মাঝে চোখের এক কোণ দিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম, আর তিনজন কী অবস্থায় আছেন। সেজদা ঘুমুবার সুযোগ পেলে সহজেই তার সদ্ব্যবহার করতেন, চলন্ত গাড়িতে তো কথাই নেই। বড়দার দৃষ্টি নিশ্চয়ই আমার উপর ছিল, তবে সঙ্গে ডাক্তারবাবু থাকায় কিছুক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

রাত তখন হবে হয়তো তিনটে। গাড়ি এসে একটা স্টেশনে দাঁড়াল, বোধহয় রাজবাড়ির আগের স্টেশনে। আমি দেখলাম ডাক্তারবাবুর মাথাটা ঢুলে পড়ছে। স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়ে দিল, তখনো তাঁর মাথা ঢুলছে। গাড়ি স্টেশন পেরিয়ে গেল, তার গতিও বাড়া শুরু হল। বাইরে একেবারে অন্ধকার। তখন আমি চটপট উঠে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম গাড়ির গতির দিকেই, তবে রেল লাইন থেকে যতটা দূরে সম্ভব। গাড়ি হুড়হুড় করে চলে গেল, আর সঙ্গে নিয়ে গেল আমার প্রহরী ডাক্তারবাবুকে।

কয়েক মিনিট রেল লাইনের পাশে ঘাসের উপর বসে রইলাম। মনে হল, 'তার আগে কি মরণ নেই?' বুঝলাম অন্তত এ-যাত্রা সত্যি আমার মরণ নেই। এমনকী জখমও হইনি, শুধু সামান্য চোট পেয়েছিলাম। দেখা গেল, এবারও অদৃষ্ট আমার সহায় ছিল। তার-পর ধীরে-ধীরে উঠে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে স্টেশনে গেলাম। সেখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বেঞ্চির উপর ঘুম দিলাম।

মনে হল যেন একটা মস্তবড়ো সংগ্রাম জয় করে এসেছি। কিন্তু সে জয়ে কোনো আনন্দ পাই নি, পেলাম শুধু অবসাদ। এভাবে লড়াই করে কতদিন কাটাব? এই প্রশ্ন এবার মনকে নির্মমভাবে আক্রমণ করল। আর যে-আশ্রমজীবনের জন্য আমার এ দুরন্ত সংগ্রাম, তা-ও যে দিন-দিন শুষ্ক হতে শুষ্কতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে কতদিন আর থাকতে পারব? থাকার মানেই বা কী? এই প্রশ্ন মনকে অস্থির করে ভুলল। আর সেই অস্থিরতা নিয়েই দিন দুই বাদে আশ্রমে ফিরে গেলাম।

(৩) মো হ ভ ঙ্গ

আমাকে দেখে গুরু প্রসন্ন হলেন বলে মনে হল না। মনে-মনে হয়তো আমায় বিদায় দিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর মনোভাব বোঝা খুব কঠিন ছিল না। আশ্রম হল পুণ্যস্থান, আর সেখানে আমি হলাম শান্তিভঙ্গের প্রধান কারণ। তা ছাড়া, আশ্রমের জন্য কাকা করেছেন পুত্রদান ও অর্থদান। আমার মা পুত্রদান করেও আবার সে দান ফিরিয়ে নেবার জন্য ব্যস্ত হলেন। আমি অবশ্য শ্রমদান করেছিলাম প্রায় অর্ধানশনে। সেটা গুরু ধর্তব্যের মধ্যে বলে মনে করেন নি, কারণ সেটা হল দুষ্প্রাপ্য মুক্তিলাভের ন্যায্য মূল্যের এক কণামাত্র।

তা ছাড়া তাঁর মনে-মনে নিশ্চয়ই একটা ভয় ছিল যে আমার কুমন্ত্রণায় শিবদার ধর্মজীবন কলুষিত হতে পারে, এমন-কী সন্ন্যাসব্রতও ভঙ্গ হতে পারে। আমাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য অত টানাটানি করলে শিবদার পক্ষেও তা হানিকর হতে পারে—সে ভাবনাও হয়তো তাঁর মনে ছিল। তাই খুব সম্ভব মনে করেছিলেন, এ আপদ যত তাড়াতাড়ি দূর হয় ততই ভালো।

শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে-খুঁড়তে হাতে ফোসকা পড়ে গেল, কয়েকটা গলেও গেল। তার উপর বালি পড়ে হাতের অবস্থা এমন হল যে শাবলও ঠিক-মতো ধরতে পারতাম না। কিন্তু তারো চেয়ে দুরবস্থা ছিল তখন আমার মনের। বারবার মনে হত "বিসর্জনে"র জয়সিংহের কথা, গুরুভক্তি ও কালীভক্তির মধ্যে বিরোধ, শেষ সমাধান আত্মবলিদানে। ভাবতাম, আমারও কি পরিণতি তাই হবে?

খবর এল, গঙ্গায় কুমির দেখা দিয়েছে। আরও শুনলাম আমরা যে জায়গায় স্নান করতাম প্রায় সেখান থেকেই জনা দুই লোক অদৃশ্য হয়েছে। কুমির নাকি তাদের টেনে নিয়ে গিয়ে গলাধঃকরণ করেছে। গুরু আদেশ দিলেন, আমরা যেন গঙ্গায় নেমে কয়েক হাতের বেশি দূরে না যাই; তারি মধ্যে কোনোমতে তাড়াতাড়ি চান করে যেন চলে আসি। তখন আমার মধ্যে চলছিল সেই বিরোধ আর অন্তর্দাহ, জীবন-মরণের তফাত প্রায় লোপ পেয়ে এসেছিল। গুরুর এ আদেশ মানবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি নি।

সকালবেলা তখন বেশ রোদ উঠেছে। একা গেলাম গঙ্গায়, সেখানে সাঁতার কেটে ওপারে চলে গেলাম। তারপর কয়েক মিনিট থেমে আমাদের ঘাটের দিকে রওনা দিলাম। মাঝনদীতে আসার সঙ্গে-সঙ্গে দেখি গুরু এসে উপস্থিত হয়েছেন, পার থেকে চেঁচিয়ে বললেন, 'ফিরে এসো, ফিরে এসো। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ফিরে এসো।'

ফিরে এলাম। মোহাবিষ্ট অবস্থায় জল ছেড়ে পারে উঠলাম। গুরু ঝেড়ে বকতে লাগলেন, 'আমি নিষেধ করেছিলাম দূরে যেতে, তবু কেন গেলে? এখানে কুমির আছে জান। শেষে কি কুমিরের কাছে মারা যাবে? আর সঙ্গে-সঙ্গে আশ্রমের দুর্নাম করবে?' বুঝলাম, আমার বাঁচা-মরা তাঁর কাছে প্রায় সমান। বড়ো কথা হল, আশ্রমের যেন কোনো দুর্নাম বা ক্ষতি না হয়।

আমি সাঁতারকাটা শিখেছিলাম বড়দার কাছে। তাঁর শেখাবার পদ্ধতিও ছিল খুব সহজ। মনে আছে কয়েক ভাই মিলে যেতাম বালিকা বিদ্যালয়ের পুকুরে। সে পুকুরটা ছিল ছোটো, বেশ গভীর; ভালো উঁচু পাড় চারদিকে, বাঁধানো ঘাটলা। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল তালপুকুর, কিন্তু সেটা মস্ত বড়ো দীঘি বলে সাঁতার শেখার পক্ষে সুবিধেজনক মনে হয় নি। মনে আছে, খুব ছোটো-বেলায় ঘাটলায় দাঁড়িয়ে বড়দা আমাকে একটা পুটলি করে অনেকটা দূরে ছুঁড়ে ফেলতেন। তারপর নিজে জলে ঝাঁপ দিয়ে আমার থেকে কয়েক হাত দূরে-দূরে সাঁতার কাটতেন। কিছুক্ষণ আমার হাবুডুবু খাওয়া, সঙ্গে-সঙ্গে জল খাওয়াও হয়ে গেলে হাত বাড়িয়ে দিতেন আর আমাকে ঘাটলায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন। একে বলা যেতে পারে ডিরেকট

মেথড অথবা লারনিঙ বাই ডুয়িঙ। অল্প সময়ের মধ্যেই সাঁতার দেওয়া শিখে গেলাম। তারপর বহু কাল নানা জায়গায় সাঁতার কেটেছি—পুকুরে, দীঘিতে, নদীতে, সরোবরে, সমুদ্রে। ঢাকায় বুড়িগঙ্গা এপার-ওপার করেছি। তবে আমার সাঁতারে কোনো আর্ট ছিল না। কোন্ স্ট্রোককে কী বলে তাও জানতাম না, জানবার চেষ্টাও করি নি। পূর্ববঙ্গে জলা জায়গায় জন্ম, তাই অনেক মাছ খেতাম আর মাছেরই মতো সাঁতার কাটতাম।

মনে হয় ভবসাগরে সন্তরণও আমি একই পদ্ধতিতে শিখেছিলাম, পরিচালক ও পরিচালনা বিনা। তাই এখানেও আমার হাবুডুবুর অন্ত ছিল না। ভবসাগরে সন্তরণ আজো চলেছে, তবে অনেক মন্দ গতিতে।

সেই গঙ্গাপারের পর থেকে গুরু সম্ভবত ভেবে-ছিলেন আমাকে আশ্রম থেকে কিভাবে পার করা যায়। আমার মনও আশ্রম আর ওখানকার ধর্মজীবন থেকে অনেকটা দূরে সরে গিয়েছিল। হয়তো বাড়ি থেকে আমাকে জোর করে নেবার চেষ্টা না করলে আগেই ওখান থেকে চলে যাবার সঙ্কল্প করতাম। বাড়ির টান আসায় দোটানা বেড়ে গেল আর দীর্ঘতর হল। ঠিক সে সময়েই এমন একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে এক মুহূর্তে সেই মর্মঘাতী সংগ্রামের অবসান হল, সঙ্গে-সঙ্গে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আপাতদৃষ্টিতে সে ঘটনাটি ছিল সামান্য। তবু সেই সন্ধিক্ষণ হতে আমার জীবন মোড় ফিরে দৃঢ় পদক্ষেপে চলল সম্পূর্ণ অন্য দিকে। তাই মনে হয় যেন তার মধ্যে নিহিত ছিল বিধাতার অসামান্য আশীর্বাদ।

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে রান্নাঘর থেকে কিছু থালাবাটি-গেলাস নিয়ে যেতাম কুয়োর ধারে, সেগুলো মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য। রান্নাঘরের বালতিতে কিছু জল থাকত। সেটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতের পাতায় থালার উপর বাটি-গেলাস বসিয়ে নিয়ে যেতাম। এভাবে রান্নাঘর থেকে কুয়োয় যাওয়া আমার বেশ অভ্যেস হয়েছিল। তাই কোনো ভয়ের কারণ আছে বলে মনে করতাম না। একদিন মাঝপথে বাঁ হাতের বাসনগুলো ফসকে মাটিতে পড়ে গেল। চার-পাঁচটা পাথরের বাটি গেলাস ভেঙে গেল।

শব্দ শুনে গুরু ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। রাগে গরগর করতে-করতে বললেন, 'এই বুঝি তোমার কাজ! যাও, তুমি ফিরে যাও সংসারে, এ পথ তোমার জন্য নয়। ফিরে যাও সংসারে, ওখানে গিয়ে বিয়ে-থা করো, ছেলেপিলের জন্ম দাও। ফিরে যাও, এ পথ তোমার নয়, ফিরে যাও।' তাঁর সেই কর্কশ, কুৎসিত, অমানুষিক কথাগুলো আজো আমার কানে বাজে। জীবনে আগে বা পরে এ-জাতীয় কথা আর কখনো শুনি নি।

গুরুর রাগ দেখে আর তাঁর কথা শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। মনে হল যেন দুর্বাশার মতো অভিশাপ দিয়ে সম্ভব হলে আমাকে তক্ষুনি ভস্মে পরিণত করে দিতেন। কিন্তু গুরুজী আমায় ভুল বুঝেছিলেন। তাঁর প্রাণপাণ প্রয়াস সত্ত্বেও আমার ব্রহ্মাগ্নি ভস্মীভূত হয় নি, ভস্মাবৃত ছিল মাত্র। এবার তা আবার সব ছাই ঠেলে ফেলে দিয়ে নূতন করে জ্বলে উঠল। আরো মনে হল হঠাৎ যেন চোখের পরদা সরে গেল, ফলে গুরুর আসল স্বরূপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠল। শ্যামসুন্দরানন্দের সেই রূপে কোনো দিক দিয়ে সুন্দরের স্পর্শ আছে বলে আর মনে হল না।

গুরু আশ্রম করেছেন সংসারে তাঁর বিরক্তি বলে। সামান্য কটি বাটিগেলাসের উপর তবু তাঁর অত আসক্তি কেন? তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর ধর্মে কি দয়া, করুণা, মার্জনার স্থান নেই? আর তাই যদি সত্য হয়, তবে এ কী-জাতীয় ধর্ম? আশ্রমে হাড়ভাঙা খাটুনির প্রতিদানে আমার প্রাপ্য কি শুধু ভর্ৎসনা আর অভিশাপ? যে সংসারকে গুরু অবমাননা করেন, হয়তো নরকতুল্য বলে মনে করেন, সেখানে তো পদে-পদে উদার মনুষ্যত্বের বহু উদাহরণ দিনের পর দিন দেখেছি। আশ্রমে কি তার

কোনো স্থান নেই? আর মনুষ্যত্ব বর্জন করে চলাই কি আশ্রমের আদর্শ? তার ধর্ম? এই প্রশ্নগুলো সেদিন আমার মনকে নির্মমভাবে আক্রমণ করল। ফলে সেদিন ভাঙল শুধু বাটি-গেলাস নয়—এই আশ্রম এবং সন্ন্যাসজীবনের উপর আমার অবশিষ্ট মোহটুকুও।

গুরুর তিন শিষ্য পাশে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখল, গুরুর উদ্ভট ভর্ৎসনা শুনল। ঘটনাটি তাদের কাছেও নিতান্ত অপ্রিয় মনে হয়েছিল সন্দেহ নেই। আমার প্রতি তাদের সমবেদনাও যথেষ্ট ছিল বলে মনে করি। শিবদার বেলা তো কথাই নেই। কিন্তু তারা তো গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছিল, গুরুর আদেশ যাই হোক না কেন, তা নির্বিচারে মেনে নিতে হবে—এই মহামন্ত্র তারা নির্বিচারে গ্রহণ করেছিল, তাই গুরুকে যথেচ্ছারের অধিকারও নির্বিবাদে দিয়ে দিয়েছিল।

আমি নিজে মনের উপর বহু অত্যাচার করেও তাকে অতখানি নত করতে পারি নি। অন্যায় আর মিথ্যা যে পাপ এবং অধর্ম—তা একান্ত ছোটোবেলা থেকেই আমার মজ্জাগত ছিল। তাকে গেরুয়া দিয়ে আবৃত করলে তো বিশুদ্ধ হয় না বা তার চরিত্র বদলায় না, তাতে বাড়ে শুধু ভণ্ডামির মাত্রা। আমি চোখ বুজে মন্ত্র জপ করতে শিখেছিলাম দুই হাতের দশ আঙুলে প্রাচীন প্রথাগত নিবিষ্ট চিত্তে গুনে-গুনে। কিন্তু আমি তো অন্যায়কে গ্রহণ করতে শিখি নি। রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন দুটি বোধ হয় তার আগেই আমার মনে খোদাই হয়ে গিয়েছিল:

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

ভাঙা বাটি-গেলাসের টুকরোগুলো নিঃশব্দে মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলাম। সেগুলো ফেলে দিয়ে এলাম আবর্জনার পীঠস্থানে, তারপর উঠোনের দূষিত জায়গা পরিষ্কার করলাম ঝাড়ু আর জল দিয়ে। রান্নাঘরের বাকি সব কাজ সেরে গেলাম শোবার ঘরে ও নিঃশব্দে আমার ইট-মাদুরের শয্যা গ্রহণ করলাম। বাইরের শান্ত ভাব মুহূর্তের জন্য বিচলিত হয় নি। গুরুকে বা গুরুভাইদের একটি কথাও বলি নি। কিন্তু মনের মধ্যে বইতে লাগল একটা প্রচণ্ড ঝড়। কেরোসিনের আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। সেই অন্ধকারে আমার মনের মধ্যে যেন জ্বলে উঠল নতুন করে আরেকটা আলো।

গুরু চেয়েছিলেন ধীরে-ধীরে আমাকে ঠেলে দিতে আত্মবিসর্জনের দিকে। এবার আমার আসল গুরু 'হৃদিস্থিত হৃষীকেশ' এসে তাঁকে সবলে সরিয়ে দিয়ে আমার অন্তরের সিংহাসন দখল করে নিলেন। এবার গেরুয়াধারী গুরুকে আমি দিলাম বিসর্জন। সে রাত্তিরে ঠিক করলাম এই "পুণ্যস্থান" হতে আমি চলে যাব যত সত্বর সম্ভব, সন্ন্যাসের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছিন্ন করে, গুরুর নাগালের বাইরে।

বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এসে গায়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে পরিপাটি করে আমার মাদুর-ইট এককোণে তুলে রাখলাম। মনে হল যেন এক সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্ন হঠাৎ কেটে গেল, কে যেন বুক থেকে এক জগদ্দল পাথর ঠেলে ফেলে দিল। বহুকাল পরে মনে হল আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন, আর এত হালকা যে আমি যেন হাওয়ায় উড়ে যেতে পারি।

এবার মনে রইল শুধু একটি প্রশ্ন: কোথায় যাব, কবে, কিভাবে। একেক বার একটা তাড়না আসছিল আবার এক নূতন অভিযান শুরু করার জন্য, অজানার উদ্দেশে। সবরমতী ও গান্ধীজীর আশ্রম—থেকে-থেকে মন যাচ্ছিল সেদিকে। আমি যদি পরিব্রাজক সেজে বেরিয়ে পড়ি, সুদীর্ঘ পথ পায়ে চলে তাঁর আশ্রমে গিয়ে বলি, 'আমি এখানে এসেছি মহাত্মাজী, দেশের কাজ করব বলে, তুমি কি তার সুযোগ দেবে?' তা হলে তিনি কি আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করে আমার এ আর্জি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন? মন বলছিল বারে-বারে, 'না, তা কিছুতেই হতে পারে না। গান্ধীজী আমাকে সানন্দে গ্রহণ করবেন।'

আবার মনে হচ্ছিল সেই ময়নামতীর কথা, যে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তখন আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যে কথা শিবদা, রেবতী আর গিরীনকে বার-বার বলেছিলাম। বাড়ি ফিরে গিয়ে একমনে সাধনা আরম্ভ করতে পারি সে স্বপ্নকে নিজের জীবনে সত্য করে তোলার জন্যে—সঙ্গী ছাড়া, একা, শুধু অন্তরের আলোকেই সম্বল করে। শেষ পর্যন্ত জয় হল ময়নামতীরই।

শিবদাকে চুপে-চুপে বললাম, 'আমি শীগগিরই আশ্রম ছেড়ে যাব, আর ফিরব না।' কোথায় যাব তা তখনো বলি নি। কয়েকদিন পরই বড়দা আবার এসে হাজির হলেন আমাকে নিয়ে যেতে। সঙ্গে সেজদা আর সেই ডাক্তারবাবু। দাদাদের চটপট প্রণাম করে আমি বললাম, 'এক্ষুনি আসছি কয়েক মিনিটের মধ্যে।' আমার তৎপরতা দেখে ওঁরা নিশ্চয়ই একটু বিস্মিত হয়েছিলেন।

আবার সেই পুটলি হাতে বেরিয়ে এলাম। শিবদাকে বললাম, 'এবার তবে চলি।' তিনি তাকিয়ে রইলেন গম্ভীর মুখে, উদাস দৃষ্টিতে। আমাদের অনেক দিনের নিবিড় বন্ধন এবার ছিন্ন হল। ময়নামতীর স্বপ্ন শিবদার জীবন থেকে বিলীন হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। আমার জীবনে শুরু হল এক নূতন অধ্যায়, স্বাধীনতা আর সাধনার অপূর্ব সংমিশ্রণে।

৮ : প্রত্যাবর্তন

বড়দাকে আমি বললাম, 'এবার আমি বাড়ি যাব, এখানে আর ফিরব না।' শুনে তিনি একটু বিস্মিত হলেন, নিশ্চিতও হলেন। কারণ বড়দা ভালো করেই জানতেন যে আমি কখনো মিছে কথা বলি নে বা ফাঁকি দিই নে। সেজদা ভাবলেন, আমার কথা যদি সত্যি হয় তবে তো বাঁচা যায়।

ডাক্তারবাবু একটু দমে ছিলেন, এখনও পর্যন্ত তাঁর জুজুৎসুর কসরত দেখাবার কোনো ফুরসত পান নি বলে। তার উপর হঠাৎ আমার এমন সুমতি হয়েছে জেনে যেন আরো হতাশ্বাস হলেন। তবু আশা একেবারে ছাড়েন নি। কে জানে, বন্দীর পক্ষে অমন সুবুদ্ধি আবার পালাবার একটা নূতন ফন্দিও তো হতে পারে। তাই আমার উপর কড়া নজর রাখাই তিনি সমীচীন মনে করলেন, সাবধানের মার নেই এই নীতি অনুসারে।

কলকাতা এসে উঠলাম আবার সেই সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে। এবার আমার চালচলন আর কথা-বার্তার ধরন অনেকটা স্বাভাবিক দেখে সবাই যেন সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তবু পাহারায় কোনো শৈথিল্য ছিল না। নীচে বাইরে যাবার দরজায় সব সময়ই তালা লাগানো থাকত, যদিও আমি বলে দিয়েছিলাম যে তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার কথা তাঁদের বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি। দুবার সবাইকে এড়িয়ে চলে গিয়েছিলাম। তৃতীয় বারও যে যাব না —তা তাঁরা সহজে ভাবতে পারেন নি।

আবার সেই শিয়ালদা স্টেশনে এলাম, সন্ধে-বেলা। গোয়ালন্দ একসপ্রেসে উঠলাম। ভিড় যথেষ্ট থাকলেও ভালোভাবে বসবার জায়গা পেলাম। এবার আর জেগে ঘুমুবার প্রয়োজন ছিল না। তাই ভালো করেই ঘুম দিলাম। অনেক ঘণ্টা পরে গাড়ি এসে একটা বড়ো স্টেশনে থামল, বোধ হয় রাজ-বাড়িতে। ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ডাক্তারবাবু বসে আছেন, সজাগ অবস্থায়। তাঁকে বললাম, চলুন একটু নীচে থেকে ধাঁ করে ঘুরে আসি। উনি ইতস্তত করে রাজি হলেন। স্টেশনে ওয়েটিং রুমে গেলাম। স্টেশনের চারদিকে বেশ অন্ধকার ছিল। ওঁর সঙ্গে দুষ্টুমি করে একটু লুকোচুরি খেললাম। একবার উনি আমাকে হারিয়ে ফেললেন, সন্ত্রস্ত হয়ে ডাকাডাকি করে ছুটো-ছুটি শুরু করে দিলেন, স্টেশন-ঘরের চারিদিকে। তখন আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালাম, হেসে বললাম, 'এই যে আমি। চলুন এবার গাড়িতে গিয়ে উঠি। ডাক্তারবাবু হাঁফ ছেড়ে

বাঁচলেন। বুঝলেন, এবারও শিকার পালাতে পারত, যদি চাইত। তাই নিশ্চিন্ত হলেন যে বন্দী এবার সত্যি কোনো ফন্দি করে নি, সে ঠিকই আর আশ্রমে ফিরে যেতে চায় না। তখন হতে আমার উপর তাঁর কড়া দৃষ্টি সহৃদয় আকার ধারণ করল।

বড়দা আর ডাক্তারবাবু জানতেন যে আমি তাঁদের মতো কোনো বিপ্লব সমিতিতে যোগ দিই নি। তবে আমাকে আশ্রম থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন যে বেপরোয়া বিপ্লবী হবার পদার্থ আমার মধ্যেও যথোচিত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

গোয়ালন্দ পৌঁছে জাহাজে গিয়ে উঠলাম। যথা-রীতি নঙ্গর তুলে হইহই করে জাহাজ তার যাত্রা শুরু করল। অনেকক্ষণ ডেকে দাঁড়িয়ে নদী আর পারের দৃশ্য দেখলাম। তারপর আবার ঘুম দিলাম। আশ্রম-জীবনের সব ক্লান্তি অতদিন পরে যেন আমাকে চেপে ধরল আর ডেকের উপর ঘুম পাড়িয়ে দিল। সঙ্গীরাও ঝিমুলেন বা ঘুমুলেন। যথাসময় খাবার ব্যবস্থা করা হল। বাবুর্চি উপাদেয় জিনিস এনে হাজির করল। আশ্রমত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে সেখানকার জীবনযাত্রার পদ্ধতিও এক নিমেষে বর্জন করলাম। আচারবিচার সবই আবার ফিরে এল আমার নিজের হাতে। আমিষ-নিরামিষের ভেদাভেদও তাই চলে গেল। আশ্রমের সেই কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য বিরচিত ক্ষীণ "মেনু" পরিত্যাগ করতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় নি। তা ছাড়া, এখন তো আর দুধের সাধ ঘোলে, বা আমিষের স্বাদ ভুঁইফোড় দিয়ে, মেটাবার কোনো প্রয়োজন নেই। বাবুর্চির রান্নাকরা সব কিছু অমৃততুল্য মনে হল। লোভকে প্রশ্রয় দিতে কোনো দ্বিধা না করে সবই খেয়ে গেলাম মনের আনন্দে।

দাদাদের সঙ্গে কিছু-কিছু কথাবার্তা হয়েছিল, তবে খুব বেশি নয়। আমার আশ্রমজীবন সম্বন্ধে তাঁরা কোনো প্রশ্ন করেন নি। কেন গেলাম, কেনই হঠাৎ ফিরে আসা ঠিক করলাম, সে সম্বন্ধে তাঁদের মনে কৌতূহল থাকলেও কিছু না জিজ্ঞাসা করাই তাঁদের কাছে বোধ হয় সঙ্গত মনে হয়েছিল। তা ছাড়া, তাঁদের মনে ছিল শুধু একটি চিন্তা: আমাকে কোনোমতে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া ও সেখানে আবার যথাসম্ভব শীঘ্র আমার মন বসানো। তাই তাঁরা স্বভাবতই অতীতকে আর ঘাঁটতে চান নি।

কিন্তু আমি তো এই তরতাজা অতীতকে মন থেকে ঠেলে দিতে পারি নি। তার বিচিত্র, দুর্বিষহ স্মৃতি প্লাবনের মতো এসে বারবার আমাকে অভিভূত করে দিচ্ছিল। বছর খানেক আগে ঠিক এই পথেই যাত্রা করেছিলাম, তবে একা, উলটো দিকে, অজানার অভিযানে। তখন কল্পনা করতে পারি নি যে আমার এই ধর্মপ্রণোদিত অভিযান এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, জীবনমরণ সমস্যায় পরিণত হতে পারে। থেকে-থেকে মনে পড়ছিল সেই শেষ ঘটনার কথা—গুরুর সেই ভয়ংকর মূর্তি আর রসনার কশাঘাত, কয়েকটি বাটিগেলাস হাত থেকে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল বলে। গুরু যে নিজে অনেক বেশি গুরুতর অপরাধে অপরাধী তা কখনো ওঁর মাথায় বা অন্তরে প্রবেশ করে নি। আমি ভেঙেছিলাম দৈবাৎ কয়েকটি বাটি-গেলাস, আর উনি ভেঙে চলেছেন জ্ঞাতসারে, নিজের সাধ্যমত অন্যের সংসার! বহুকাল পরে, অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখায় পড়েছিলাম—

তেলের শিশি ভাঙলো বলে
খুকুর উপর রাগ কর,
তোমরা যে সব বুড়োখোকা
ভারত ভেঙে ভাগ কর—
তার বেলা?

এই লাইন কটি পড়ে বিশেষ আনন্দ আর আত্ম-প্রসাদ লাভ করেছিলাম। আমার সেই গুরুজীর বেলাও একই ধরনের প্রশ্ন ওঠে। আমার হাতে বাটি-গেলাস ভাঙা উনি সইতে পারলেন না আর নিজে চললেন অন্যের সংসার ভেঙে!

জাহাজে দিন প্রায় শেষ হয়ে এল। এবার ফিরে যাচ্ছি নিজের বাড়িতে, চেনা জায়গায়, পরিচিত পরিবেষ্টনে। তবু মনে হচ্ছিল এ-ও যেন এক নূতন অভিযান অজানা ভবিষ্যতের দিকে। আমার সেই গৃহপ্রত্যাবর্তনের দিনের মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলতে পারি—

আশ্রমের যত আবর্জনা
পড়ে থাক সেই গঙ্গাতীরে।
তাকাস নে ফিরে,
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে, অকূল আলোতে।

জাহাজ এসে পৌঁছল চাঁদপুরে। আমরাও ভিড় ঠেলে নেবে বেরিয়ে এলাম। তারপর ওখান থেকে গিয়ে রেল স্টেশনে গাড়িতে বসলাম। মনে পড়ে গেল এক বছর আগে আশ্রমের দিকে যাত্রা করার বেলা কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত প্রায় সবটা পথ হেঁটে এসেছিলাম; ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ১২ ঘণ্টা লেগেছিল। এবার আর হাঁটবার বালাই নেই। গাড়িতে যথাসম্ভব গুছিয়ে বসলাম। ঘণ্টা দুই বাদে এসে পৌঁছলাম কুমিল্লা স্টেশনে। তারপর চারজনে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে এসে হাজির হলাম তালপুকুরের পাড়ে, নিজের বাড়িতে।

হারাধনের প্রত্যাবর্তনে মা এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বাবার বেলাও তাই হবে, তবে মনোভাব সহজে প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব ছিল না। বলা বাহুল্য, হারাধন এবার টিঁকে থাকবে। কেনা, না তাকে আবার হারাতে হবে, সে ভয় বা আতঙ্ক তাঁদের মনে তখনো প্রবল ছিল। সংসার ত্যাগ করার বেলা আমার একটা দুমনা ভাব ছিল, কিন্তু আশ্রম ত্যাগ করার বেলা তার লেশমাত্রও ছিল না। সেখানকার মরুময় জীবনের উপর দৃঢ়হস্তে সমাপ্তির যবনিকা টেনে দিয়েছিলাম চিরদিনের জন্য। কিন্তু আর কারোর তো তা জানবার উপায় ছিল না।

বড়দা বুঝেছিলেন যে-কোনো কারণেই হোক আমি আশ্রম আর গুরুজীর উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলাম। আর সেই আমূল পরিবর্তনই হল আমার স্বেচ্ছায় গৃহপ্রত্যাবর্তনের আসল কারণ। তাই তিনি জানতেন যে আমি আর আশ্রমে ফিরে যাব না। এমনকী ডাক্তারবাবুও তা বুঝতে পেরেছিলেন। সুতরাং তাঁর পাহারা দেবারও আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। দিন দুই সবার সঙ্গে কাটিয়ে তিনি কলকাতা ফিরে গেলেন।

পুনঃপ্রতিষ্ঠা

সবশুদ্ধ বাড়ির বাইরে ছিলাম বড়ো জোর এক বছর। কিন্তু মনে হল সেটা যেন ছিল এক যুগ। ঘটনাবহুল দিনগুলি আর দুর্বিষহ অন্তর্দাহ মিলে যেন বছরকে যুগে পরিণত করেছিল। বারবার মনে হল যেন এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। সে পরীক্ষায় দগ্ধ হতে পারতাম। কিন্তু বেরিয়ে এসেছি বিদগ্ধ হয়ে।

ধীরে-ধীরে আবার নূতন করে আমার পুরনো জীবনযাত্রা আরম্ভ করলাম। বাড়ির নানা কাজ আগেও করতাম। এখন তার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলাম, বিশেষ করে গোড়ার দিকে।

বাড়ির সব উঠোন শক্ত ঝাড়ু দিয়ে সকালবেলা ঝাড়ু দিতাম। এবারও ঝাড়ু চেয়ে নিয়ে সে কাজে হাত দিলাম। বাবা বুঝলেন, আমার স্বভাব বদলায় নি, বরঞ্চ কাজে পরিপাটি আগের চেয়েও বেড়েছে। দেখে খুশি হলেন।

এবার তরকারি কাটায়ও হাত দিলাম। মার কাছ থেকে ছোটো একটা বঁটিদা নিয়ে, নানা রকমের তরকারি নিয়ে বসে গেলাম। এরকম কাজে আমার অত উৎসাহ দেখে মা একটু অবাক হলেন। আরো অবাক হলেন আমার কাজের নমুনা দেখে। অমন নিপুণভাবে আলুর খোসা ছাড়াতে পারব বঁটিদা দিয়ে

মাটিতে বসে—মা তা কল্পনাও করতে পারতেন না।

হঠাৎ মা'র চোখ পড়ল আমার পিঠের উপর, জামার নীচে। চমকে উঠে বললেন : 'এ কী! তোর পিঠে অত ময়লা কেন?'

আমি বললাম, 'তাই নাকি? আমি তো জানিনে। পিঠে তো আমার চোখ যায় না।'

মা আরো জোর দিয়ে বললেন, 'অনেকটা জায়গা জুড়ে, বালিমাটি লেপে দেবার মতো। কী করে হল?'

এবার বুঝতে পারলাম কী করে হল। বললাম, আশ্রমে সেই শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে দিনের পর দিন কচাগাছ পোঁতার কথা। খালি গায়ে মাঠে কাজ করতাম। সেই শাবলের মাটিই পিঠের উপর জমে রয়েছে, গঙ্গাস্নানেও তা ধুয়ে যায় নি। সেদিন গরম জল, ঝামা আর সাবান দিয়ে মা আমার পিঠ পরিষ্কার করে তেল মালিশ করে দিলেন। মনে হল সেই সঙ্গে যেন অন্তরের গ্লানিরও অনেকটা উপশম হল।

শীগগিরই হাতরুটি করার প্রয়োজন হল। এ কাজের ভারও মা'র কাছ থেকে চেয়ে নিলাম। তাঁর কাছে এটা একরকম অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। আটা মাখা, ডলা, লেচি করা—সবই ঠিকমতো হচ্ছে, মাঝে-মাঝে এসে দেখে গেলেন। তারপর এসে চাকি-বেলুন নিয়ে বেলবার পালা। মা বুঝলেন এ কাজ তো আমাকে দিয়ে হবে না। তাই নিজেই সেটা করতে চাইলেন। আমি বললাম, 'চেষ্টা করে দেখি পারি কিনা।' সেজদা পাশেই ছিলেন, তাকিয়ে রইলেন চোখ ছানাবড়া করে। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সমান গোল করে এভাবে বেলতে পারব, তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। বললেন, 'ঠিক মা'র মতো।'

কসবা-গুরুহিত থেকে কুমিল্লা ফিরে আসার পর থেকেই আমি বাড়িতে বাগানের কাজ করতাম, প্রায় প্রতিদিন অন্তত কিছুক্ষণের জন্য। শাকসবজি আর নানা রকমের ফুল চাষই ছিল আমার বিশেষ পছন্দ-সই। আবার সে কাজেও হাত দিলাম। কোদাল, হাতখন্তি নিয়ে কাজ করায় আমি ছোটোবেলা থেকেই অভ্যস্ত ছিলাম। গ্রামের জীবনে প্রথম তার সূচনা হয়। তারপরে বাড়িতে আর আশ্রমে সে কাজে আরো হাত পাকে। ফুলের মধ্যে গোলাপ, গন্ধরাজ, বেল, যুঁই আমার খুব প্রিয় ছিল। কিন্তু সুগন্ধ ফুল বলে এগুলো বাবা ঠাকুরঘরের কাজে ব্যবহার করতেন না। "বিলিতি" ফুলও ব্যবহার করা বারণ ছিল। কাজেই তাঁর জন্য ব্যবস্থা ছিল অন্য ফুলের, যথা জবা, গাঁদা, পদ্ম, ঝুমকা। বাড়ির উঠোনেই সুন্দর শেফালি ফুলের গাছ ছিল। শীতের দিনে কিছুকাল সে গাছ থেকে প্রচুর ফুল পাওয়া যেত।

শীগগিরই মা-বাবা লক্ষ করলেন যে আমি সংসারের অনেক কাজই খুব মন দিয়ে করি সুষ্ঠুভাবে। বাজার করাও তার মধ্যে ছিল। বেশ দামাদামি করে মাছ, তরিতরকারি, ফল, এমনকী চাল পর্যন্ত কিনে আনা সহজেই করতে পারতাম, সাগ্রহে করেও যেতাম। কিন্তু ভুলেও যেতাম না ঠাকুরঘরের দিকে। তাঁরা ভেবেছিলেন আমি আশ্রম থেকে ফিরে এসে সন্ধ্যা-আহ্নিক, উপাসনা-আরাধনা বেশ ভক্তি-সহকারে করে যাব, তবে সংসারে থেকেই। সেদিকে আমার অমন ঔদাসীন্য দেখে বাবা একটু আশ্চর্য হলেন, ভাবিতও হলেন। আমার আধ্যাত্মিক পেনডুলাম এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেছে, কিছুতেই মাঝামাঝি জায়গায় থাকতে রাজি নয় দেখে মনে-মনে সম্ভবত অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিলেন। তবে সামনেই ছিল বড়দার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি নিজেকে প্রকাশ্যেই নাস্তিক বলতেন,—কোনো পূজা-অর্চনার ধার ধারতেন না, ভক্তিমার্গের প্রতি তাঁর একটা জন্মগত বিতৃষ্ণা ছিল। বাবা বুঝলেন আমিও চলেছি সে পথেই। তাই দুঃখের সঙ্গে মনে-মনে তা মেনে নিলেন।

ধর্মের প্রতি আমার অনাসক্তি দেখে মাকে বিন্দুমাত্র ভাবিত মনে হয় নি। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে, সেটাই ছিল তাঁর কাছে সবথেকে বড়ো কথা। সে যেন আবার উধাও হয়ে না যায়—তাই

ছিল আমার বেলা তাঁর একমাত্র চিন্তা।

বাড়ি ফিরবার পরদিনই কাকার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। কাকা মাথায় হাত রেখে ভগবানের নাম করে আশীর্বাদ করলেন। তারপর আমার কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলেন। আশ্রমের বা শিবদার কথা একেবারেই তুললেন না। আমার দুজনে এক সঙ্গে থাকতাম, তারপর প্রায় একই সময় আশ্রমে গেলাম। অথচ ফিরে এলাম একা শিবদাকে ফেলে। কাকা তাতে নিশ্চয়ই প্রসন্ন হতে পারেন নি। তবে তাঁর মনের ভাব প্রকাশও করেন নি। তাঁর ধারণা ছিল, বড়দা আশ্রমে গিয়ে সেখান থেকে আমাকে জোর করে ধরে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছেন। ফিরে আসার পেছনে আমার তরফ থেকেও যে কোনো কারণ থাকতে পারে, সে কথা কাকার মনে হয় নি। সব জড়িয়ে তিনি নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিলেন যে আমার এই গৃহপ্রত্যাবর্তন জীবনের মহত্তম আদর্শপথ থেকে একটা বড়ো রকমের স্খলন। শিবদার বেলা যে এজাতীয় আদর্শবিচ্যুতি ঘটে নি, সে কথা ভেবেই তিনি মনে-মনে সান্ত্বনা লাভ করলেন।

নতুন উষা

আমি ঈশ্বর পাঠশালায় নবম শ্রেণীতে উঠেই চলে গিয়েছিলাম। সপ্তাহ দুই বাদে আবার স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করলাম। সবশুদ্ধ আমি কামাই করেছিলাম এক বছর। একই শ্রেণীতে আবার যোগ দিলাম, তবে সহপাঠীরা সব বদলে গেল।

বাড়িতে তখন ছাত্র আমি একা। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন দেশে তখনো বেশ প্রবল ছিল। তা সত্ত্বেও আমার স্কুলে পড়া সম্বন্ধে কেউ আপত্তি করেন নি। এমনকী বড়দাও নয়। বরঞ্চ সবাই বেশ আগ্রহে সায় উৎসাহ দিলেন। সংসারের সঙ্গে আমার অত বড়ো অসহযোগিতার পরে সবাই চেয়েছিলেন তার সঙ্গে আমার যোগ যেন দৃঢ়তর হয়ে উঠে। তাই সবারই ইচ্ছে ছিল যেন আমি স্কুলে গিয়ে আবার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করি।

তবে ঈশ্বর পাঠশালা ছাড়াও আমার ছিল আরেকটা বিশেষ উঁচু দরের স্কুল, একান্তই প্রাইভেট, একটিমাত্র ছাত্রসহ। সেটা ছিল বড়দার স্কুল। তিনি নিয়মমতো ন্যাশন্যাল স্কুলে পড়াতেন, আর আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিতেন স্কুলের বাইরে অনেক কিছু পড়বার আর শিখবার। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল বাঙলা ছন্দ, তা নিয়েই আমাদের অনেকটা সময় কাটত। তা ছাড়া, বড়দার প্রেরণায়, তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসও অনেক পড়েছিলাম, আর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল সংস্কৃতচর্চা।

স্কুলের পড়া, বড়দার সঙ্গে পড়া আর নানা রকমের আলোচনা, সংসারের নানা খুঁটিনাটি কাজ—সব জড়িয়ে আমার দিন কাটাতে অসুবিধে হত না। তবু কিছুতেই যেন আমার মানসিক স্থৈর্য খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার বাইরের শান্তভাব দেখে কারোর তা বুঝবার উপায় ছিল না। শিবদার কথা বার-বার মনে হত। তাঁর সঙ্গেই ছিল আমার ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ, অন্তরের বন্ধুত্ব। অথচ ভালো করেই জানতাম যে আমাদের সে সম্বন্ধ চিরদিনের মতো বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ফুরায় যা দে রে ফুরাতে,
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাস্‌নেক কুড়াতে।

আপন মনে বহুবার সেকথা বলেছি, শুধু শিবদার বেলা নয়, আরো অনেক ক্ষেত্রে নানা উপলক্ষে। কিন্তু অবুঝ মন বুঝেও বুঝতে চায় না।

শিবদাকে আশ্রমে হারিয়ে এলাম। রেবতী-গিরীশও অসহযোগআন্দোলনের তরঙ্গে ভেসে কোথায় চলে গেল। এদিকে স্কুলে আমার পুরনো ক্লাসে সবই নতুন সহপাঠী। ফলে নিজেকে মনে হত একান্ত একেলা। মনের এই শূন্যতা পূরণের জন্য আর আশ্রমে নির্যাতিত মনকে আবার সুস্থ সবল করবার জন্য তখন নানা উপায় অবলম্বন করি। সবচেয়ে বড়ো উপায়

মনকে নানা কাজে যথাসম্ভব ব্যাপৃত রাখা। তা ছাড়া, বড়দার কাছে ছন্দে হাতেখড়ির সঙ্গে-সঙ্গে আমি নিজের হাতেখড়ি দিই কবিতা লেখায়, কাউকে কিছু না বলে, একান্ত গোপনে। সে রচনার উদ্দেশ্য ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, পুঞ্জীভূত বেদনাকে ছন্দের স্রোতে ঢেলে দিয়ে নিজের মনকে হালকা করা। আমার এ অভিনব চিকিৎসা অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে ফলপ্রসূ হয়েছিল।

সে সময়ই আবার নতুন করে গভীরভাবে আরম্ভ করি রবীন্দ্রসাহিত্যচর্চা, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে। তবে বলা বাহুল্য যে তাতে বড়দারও পুরোপুরি সায় ছিল। তখন রোজ রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করতাম, আপন মনে আওড়াতাম। ভোরবেলা একা বেরিয়ে পড়তাম প্রাতর্‌ভ্রমণে, সেটাই ছিল আবৃত্তি করার প্রকৃষ্ট সময়, তখন পদে-পদে মনে হত আমার জীবনে যেন নতুন প্রভাত এসেছে নতুন আশার বাণী নিয়ে। তাই দুটো কবিতা আমার বিশেষ প্রিয় ছিল প্রেরণার উৎসরূপে :

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত-পাখির গান।
না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।

কী জানি কী হোলো আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ—
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান

* * * * * *

ওরে চারিদিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর,
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা, আঘাতে আঘাত কর্‌।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।

মনে হত "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" যেন আমার মোহ-ভঙ্গেরই অনুরূপ, হঠাৎ যেন আমারো এক সুদীর্ঘ দুঃস্বপ্নের অবসান হল। কারাগার থেকে মুক্তি পেলাম, নতুন আলো এসে চারিদিক উদ্ভাসিত করে দিল, দূর ভবিষ্যতের আহ্বান প্রাণে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করে দিয়ে গেল।

দ্বিতীয় কবিতাটিরও মর্মার্থ ছিল একই ধরনের :

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নূতন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়॥

কল্পনায় ভাবতাম যেন সেই জ্যোতির্ময় অস্ফুট প্রত্যূষে আমার দুয়ারে এসে অন্তরের জীর্ণতা দৃঢ়হস্তে বিতাড়িত করে নবজীবনের সূচনায় আমার কপালে তাঁর আশীর্বাদচুম্বন রেখে গেলেন।

তবু অত চেষ্টা করেও ভুলতে পারি নি আশ্রমের সেই শরশয্যার কথা। মনে হত কতগুলো শর যেন স্থায়িভাবে আমার মর্মস্থল বিদ্ধ করে রয়েছে, যেন এক পুঞ্জীভূত বেদনা জমাট বেঁধে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে। সে ভার থেকে কিছুতেই তাকে যেন মুক্ত করতে পারছিলাম না।

[ক্রমশ

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণে ধারাবাহিক "বিষয় : ব্রহ্মদেশ" এই সংখ্যায় ছাপা সম্ভব হল না বলে আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৯.১৪

১৮৫৫ থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত সাঁওতালদের ধর্ম এবং রাজনীতির সংযোগ সম্পর্কে আমাদের মূল সিদ্ধান্তগুলি আবার সংক্ষেপে নির্দেশ করব।

(ক) ১৮৫৫ সালের হুলের উপর প্রধান প্রভাব ছিল দেবতার আবির্ভাবের ঘটনা। হুল দিব্যশক্তি-নির্দেশিত; তাই সাঁওতালদের জয় অনিবার্য—এ বিশ্বাস অল্প সময়ের মধ্যে গোটা সাঁওতাল অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের মূল প্রেরণা এবং সংগঠনের প্রাণশক্তি এ বিশ্বাস।

যে ধর্মীয় ধারণা এ বিশ্বাসের উৎস, তা আগেকার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আর অখণ্ড সাঁওতাল উপজাতিসত্তা সম্পর্কে যে বোধ বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তাও পুরনো বিশ্বাসমাত্র নয়।

সাঁওতালদের জয় অনিবার্য, এ নৈতিক বিশ্বাস ব্রিটিশ বাহিনীর অবিরত সাফল্যে এবং নিজেদের অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতিতে সম্পূর্ণ ভেঙে গেল। এক তীব্র হতাশাবোধ এবং বিভ্রান্তি বিদ্রোহীদের সংস্কৃতি-বোধকে দুর্বল করে দেয়। পাগলপন্থী আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা যা বলেছি[২১২] তা এখানেও খাটে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে বিদ্রোহীদের সচেতনতা থেকে এ বিশিষ্ট ধর্মবোধের জন্ম নয়। জয় অনিবার্য, এ বিশ্বাসের বলেই তারা হুলে নেমেছিল। এবং এ বিশ্বাসের উৎস এক বিশেষ ধর্মচেতনা। পরাজয়ের রূঢ় অভিজ্ঞতা থেকে তারা সঠিক বুঝতে পারে—ব্রিটিশ শক্তির তুলনায় তারা কত হীনবল।

(খ) ১৮৬১-১৮৭১—এ দশকে সাঁওতাল মানসিকতায় এক পরিবর্তন আসে। তারা সহিংস পন্থায় বিশ্বাস হারাল। কিন্তু ১৮৫৫ সালের আগের মতো প্রধানত সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে তারা তাদের অভিযোগের প্রতিকার খোঁজে নি। 'হুলে'র নানা প্রতীক, অনুষঙ্গ তাদের চেতনায় গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল—যেমন স্বাধীন সাঁওতাল-

রাজের স্বপ্ন, উপজাতি হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে নূতন বোধ ; এর সঙ্গে সম্পৃক্ত এক ইতিহাসচেতনা, এবং বিশেষক্ষমতাসম্পন্ন নেতার উপর নির্ভরশীলতা। একান্ত আঞ্চলিক আন্দোলনেও নূতন চেতনার এ লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট ছিল।

(গ) ১৮৭৪ থেকে ১৮৮২—এ পর্বে ধর্ম আর রাজনীতির সংযোগে নূতন দিক দেখা যায়। সাঁওতাল-রাজ প্রতিষ্ঠায় ধর্মের ভূমিকা নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা হল। সিধু-কানু নূতন আবির্ভূত দেবতার পুজোয় শুদ্ধ উপকরণের কথা শুধু বলেছিল। সাঁওতাল-রাজ সৃষ্টিতে তাদের পুরনো ধর্মবিশ্বাস বা আচারে পরিবর্তনের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কিছু বলে নি। খেরওয়ার আন্দোলনেই প্রথম ধর্ম এবং রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য যোগের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়। বহু পুরনো বিশ্বাস, সামাজিক আর ব্যক্তিগত আচার, রীতি নির্মমভাবে পরিত্যাগ করে নূতন বিশ্বাসে দীক্ষিত সাঁওতালরা। এখানেও দেখতে পাই, প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে তারা অনেক দূর সরে এসেছে। খেরওয়ার আন্দোলনের ভাবাদর্শের ভিত্তি বৈষ্ণব গোসাঁইদের ধর্মীয় (ও সমাজ-) দর্শন, যার মূল কথা এক ভগবানে বিশ্বাস এবং 'শুদ্ধ' জীবনচর্যা। আসলে 'শুদ্ধতা'র ধারণা মূলত হিন্দু উচ্চবর্ণের ধারণা।

কিন্তু নূতন ভাবাদর্শের প্রভাবে সাঁওতালরা উপজাতি হিসেবে তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ হারায়নি। বরং এ বোধ প্রখরতর হয়েছে ; কারণ নূতন ভাবাদর্শ গ্রহণের মূল প্রেরণা রাজনৈতিক। এ রাজনীতির মূল লক্ষ্য সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের রূপায়ণ। এর প্রভাব সাফা সাঁওতালদের সংগঠনেও সুস্পষ্ট। সাফারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মোটেই ছিল না। কিন্তু এক গভীর বিশ্বাসের প্রেরণা ছিল নূতন সংগঠনের প্রাণশক্তি। স্থানীয় প্রশাসনও অকপটে স্বীকার করেছে[২১৩], স্বভাবে, আচারে, আচরণে, সাফারা অন্য সাঁওতালদের থেকে অনেক উন্নত। 'ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারা যত্নবান ও নিয়মনিষ্ঠ' ; কোনো প্রকার শিথিলতা তাদের চরিত্রে দেখা যেত না। 'নিঃসন্দেহে তারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান'। 'তাদের মধ্যে ঐক্যের বাঁধন সুদৃঢ় ; যেভাবে ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে তারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে পেরেছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। সাম্প্রতিক আন্দোলনের সময় বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছে নিপুণভাবে'।

কিন্তু সব সাঁওতাল সাফাদের কঠিন অনুশাসন মানতে পারে নি। এর ফল সাফা আর ঝুটা সাঁওতালদের মধ্যে ক্রমপ্রসারমাণ সামাজিক ব্যবধান এবং দূরত্ব। আন্দোলনের গতিবেগ যখন স্তিমিত হয়ে এসেছে, তখনও কিন্তু এ ব্যবধান কমে নি ; বরং গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা আরো প্রকট হয়েছে।[২১৪]

১০

মুণ্ডা আন্দোলনে ধর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা দেখতে পাই এর একেবারে শেষ পর্যায়ে—অগস্ট ১৮৯৫ থেকে জানুয়ারি ১৯০০ পর্যন্ত। তখনকার আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা বীরসা মুণ্ডা ; এর প্রধান প্রেরণা তার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, তার নূতন ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ভাবাদর্শ। ১৯০০ সালের পর ব্যাপক সংগঠিত মুণ্ডা আন্দোলন আর দেখা যায় নি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজীর প্রভাবে আবার নূতন করে সাড়া জাগে ; মুণ্ডারাজের স্বপ্ন আবার তাদের উদ্দীপিত করে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। তা ছাড়া ১৮৯৫-১৯০০—এ সময়কার আন্দোলনের সঙ্গে তা মোটেই তুলনীয় নয়।

বীরসার আন্দোলন কিন্তু মোটেই আকস্মিকভাবে শুরু হয় নি। যে বিশেষ মুণ্ডা মানসিকতার পরিমণ্ডলে এ আন্দোলনের বিশিষ্ট রূপটা বিকাশলাভ করে, তার কিছু-কিছু উপকরণ আগেই তৈরি হয়েছিল। তাই আগের কয়েক দশকের মুণ্ডা ইতিহাসের মূল

প্রবাহ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তবে বীরসার নেতৃত্ব ছাড়া মুণ্ডা আন্দোলন এ রূপ নিতে পারত না। যে ধর্ম মুণ্ডা প্রতিরোধ আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল তা তাদের প্রাচীন ধর্ম নয়। এর মূলধারণাগুলির উৎস নানা ধরনের। বীরসাই প্রথম বিক্ষিপ্ত উপকরণগুলিকে এক সুসংবদ্ধ দর্শন হিসেবে মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচার করে।

বীরসা আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণে ১৮৯৫-এর আগের চার দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক। এর ধারাবাহিক বিবরণ[২১৫] বর্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন। এ আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে যে মুণ্ডা মানসিকতার বিকাশের কথা আগে উল্লেখ করেছি, তার সৃষ্টিতে এ সময়কার ইতিহাসের বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এর কয়েকটা প্রধান দিক শুধু নির্দেশ করব।

চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (ক) নানা ঘটনার সংঘাতে তখন মুণ্ডাদের এ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, জমিতে তাদের দীর্ঘকালের প্রথাসঙ্গত অধিকারের উপর বহিরাগতদের[২১৬] অবিরত আক্রমণ প্রতিহত করার একটিমাত্র উপায় মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা। (খ) এ প্রত্যয়ের মূল ভিত্তি ছিল একটা নূতন ধারণা—তা হল, ব্রিটিশ আইনকানুন, আদালত-কাছারি, প্রশাসনের উপর নির্ভর করা অর্থহীন। এ বোধ এ সময় ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুণ্ডা মানসিকতার এ দিক কিন্তু জটিল। স্বাধীন রাজের স্বপ্ন মুণ্ডাদের সব প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু ব্রিটিশরাজের সম্পূর্ণ অপসারণ বা বিনাশের কথা তারা স্পষ্টভাবে তখনো বলেনি। (গ) খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের থেকে নূতন এক ধরনের নেতৃত্বের আবির্ভাব তখন ঘটে। শুধু নূতন নেতা নয়; মুণ্ডাদের অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন ধারণা তাদের অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করে। মিশনারিদের প্রভাব যেভাবে কার্যকর হয়, তাও জটিল। বীরসা আন্দোলনের আগে এ প্রভাবের যা রূপ, পরে তা আমূল পালটে যায়। মিশনারি প্রচারের মধ্যই বীরসা খুঁজে পেয়েছিল এ বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দর্শনের বীজ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু মিশনারিরা কখনো বাইবেলের বাণী প্রচার করে নি। (ঘ) সাঁওতাল ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব মুণ্ডা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বীরসার ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাতে এ প্রভাব সুস্পষ্ট।

আলাদা-আলাদা ভাবে এ দিকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

(ক) স্বাধীন রাজনৈতিক ক্ষমতা না পেলে 'জমিদারদের[২১৭] মুণ্ডা-পীড়ন কখনও বন্ধ করা যাবে না, মুণ্ডাদের এ ধারণার পটভূমিকায় রয়েছে বহিরাগত-দের প্রভুত্বের ক্রমাগত প্রসার। অথচ মুণ্ডারা বুঝে উঠতে পারে নি, কোথায় এর শেষ। বৈধ উপায়ে এর কোনো প্রতিকার মেলে নি। মুণ্ডারা তাই ভাবল, বিক্ষিপ্তভাবে কোনো বিশেষ জমিদারকে বাধা দিয়ে স্থায়ী কোনো ফল হবে না; স্থায়ী প্রতিকারের উপায় জমিদারগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অপসারণ'। মুণ্ডারাজপ্রতিষ্ঠা ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

'জমিদারি' প্রভুত্বের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল। ফলাফলের দিক থেকে বিচার করলে কোলবিদ্রোহকেও সাঁওতাল দলের মতো আত্মঘাতী প্রয়াস বলা যেতে পারে। এ বিদ্রোহের ফল একটা বড়ো বিপর্যয়ের মতো। সরকারি মহলেও নিশ্চিত ধারণা, বিদ্রোহের পরই মুণ্ডাদের শত্রুরা ব্যাপকভাবে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে নেয়। বস্তুত, সিপাহি বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত মুণ্ডারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় নি। বিদ্রোহের সময় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সাময়িক বিলোপের পূর্ণ সুযোগ নেয় জমিদারেরা। কিন্তু মুণ্ডারাও মাথা তুলে দাঁড়ায়। নূতন খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের নেতৃত্বে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুণ্ডা আন্দোলনে মিশনারিদের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা পরে আবার আলোচনা করব। সিপাহি বিদ্রোহের শেষে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে প্রশাসন মুণ্ডাদের প্রতিরোধদমনে ব্যবস্থা নেয়। আসলে, জমিদার-বিরোধী পরবর্তী আন্দোলনের ব্যর্থতারও প্রধান কারণ এ ধরনের পুলিশি হস্তক্ষেপ।

এর অনিবার্য ফল—জমিদারি কর্তৃত্বের প্রসার।

বর্তমান প্রবন্ধের প্রয়োজনে এ প্রসারের প্রধান রূপগুলির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করলেই চলবে। (১) গ্রাম-পত্তনকারী মুণ্ডা পরিবারের বংশধরদের 'ভুঁইহারি'[২১৮] জমি জমিদার নানা কৌশলে এবং অছিলায় আস্তে-আস্তে গ্রাস করে নিয়ে নিজেদের খাস জমি "মাঝি-হাসে"র অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে মুণ্ডাদের তীব্র সংঘর্ষের নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এক তদন্তের ব্যবস্থা করে। উদ্দেশ্য গ্রামের কোন্ জমি সত্যিকারের ভুঁইহারি, তা ঠিক করা।[২১৯] মুণ্ডাদের অভিযোগ, এ তদন্তে তাদের কোনো উপকার হয় নি। হারানো জমি সম্পর্কে কোনো তদন্তই হয় নি। তাই সেগুলি ফেরত পাবার প্রশ্নই ছিল না। তারা আরো বলে, তদন্তকারীদের সঙ্গে জমিদারের গোপন যোগসাজসে তাদের দীর্ঘকালের স্বীকৃত ভুঁইহারি জমিও মাঝিহাস বলে নথিভুক্ত হয়ে যায়। প্রায় দু দশক ধরে 'সর্দারি লড়াই'য়ের এটাই হল পটভূমি। (২) মুণ্ডাদের "রাজহাস"[২২০] জমিতে খাজনার হার অনবরত বেড়ে যাচ্ছিল। (৩) শুধুমাত্র খাজনা চুকিয়ে দিলেই জমিদারদের কাছে মুণ্ডাদের দায়দায়িত্ব শেষ হত না। জমিদার নানা ধরনের বেগার শ্রম দাবি করত।[২২১] ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এ শ্রমের পরিমাণ নানা কারণে বাড়তে থাকে। সিপাহি বিদ্রোহের সময় জমিদারবিরোধী আন্দোলনের একটা প্রধান কারণ ছিল এটা। তখন অনেক কৃষি-পণ্যের মতো শ্রমের মূল্যও বেড়ে যায়। শ্রমবাবদ বাড়তি খরচ বাঁচানোর জন্য জমিদার এ বেগারির পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা করে। পরবর্তী কালে এ ধরনের চেষ্টার কারণ ভিন্ন। আগেই বলেছি, মাঝিহাস জমির পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছিল। তা ছাড়া, কৃষিপণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য জমিদার চাইত এসব খাসজমি প্রজা-বিলি না করে নিজেদের তত্ত্বাবধানে চাষ করিয়ে নিতে। বেগারির একটা রূপ ছিল—বিশেষ-বিশেষ মরশুমে চাষের কাজের জন্য জমিদার নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম মুণ্ডাদের থেকে আদায় করে নিত। এখন এর পরিমাণ না বাড়ালে তাকে মজুরি দিয়ে প্রয়োজনীয় শ্রম যোগাড় করতে হত। কোনো-কোনো অঞ্চলে অতিরিক্ত শ্রমের দাবি না মিটলে খাসজমির চাষাবাদ কঠিন হয়ে পড়ছিল। কারণ জোতজমা হারিয়ে এবং অন্য কারণে অনেক মুণ্ডা গ্রাম ছেড়ে চলে যায়; ফলে, গ্রামে শ্রমের সামগ্রিক যোগান কমে যায়।

খাজনা, বিশেষ করে বেট-বেগারির বোঝা, মুণ্ডা-দের কাছে ক্রমেই দুর্বহ হয়ে উঠছিল। জোতজমা হারানোর ফল আরো ভয়াবহ। এর অর্থ শুধুমাত্র জীবিকা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নয়; যে ধর্মীয় পরিমণ্ডলে হৃতসর্বস্ব মুণ্ডা এতদিন লালিত-পালিত হয়েছে, তার সঙ্গে ঘটল পরিপূর্ণ বিচ্ছেদ। সে একে অধিকতর বিপর্যয় মনে করত।[২২২] মুণ্ডারা বিশ্বাস করত, মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে তাদের সংযোগ নানাভাবে অব্যাহত রয়েছে। একটা যোগ, যে গ্রামে পূর্বপুরুষেরা দীর্ঘ-কাল বাস করেছে, যেখানে তাদের কবর, যার মাটিতে তাদের পূতাস্থি প্রোথিত রয়েছে, সেখানেই মৃত্যুর পর সব বংশধরদের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। জোতজমা হারিয়ে দূরে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার অর্থ এ আত্মিক যোগের বিনাশ।

জমিদারি ক্ষমতার অব্যাহত বিস্তার প্রতিহত করার কোনো উপায় মুণ্ডাদের ছিল না। এ পট-ভূমিকায় মুণ্ডামানসিকতায় নূতন এক লক্ষণ প্রকাশ পেল; তাদের নিশ্চিত এ প্রত্যয় জন্মাল যে, সরকার এবং তাদের মধ্যে যে বিরাট মধ্যবর্তী গোষ্ঠী ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে, তার সম্পূর্ণ অপসারণ ছাড়া তাদের মুক্তি নেই। সরকারের কাছে নানা আর্জিতে এবং অন্যভাবে তাদের এ বিশ্বাস এবং সংকল্পের কথা তারা বারবার বলেছে। প্রশাসনেরও শেষ সিদ্ধান্ত তাই এই ছিল যে, দুই বিবদমান গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনোরকম আপোস সম্ভব নয় যদি না 'আমূল কোনো পরিবর্তন' ঘটে।[২২৩]

মুণ্ডারা তাদের অধিকার সম্পর্কে নানাজনের সঙ্গে

পরামর্শ করেছে। এমনকী, কলকাতার এক আইন-জীবীর সঙ্গেও তারা যোগাযোগ করেছিল।[২২৪] তাঁর মত তারা সরকারকে সরাসরি জানিয়েছে। তাঁর মত ছিল, মুণ্ডারাই জমির আসল মালিক, কারণ তাদের শ্রমের ফলেই জমি চাষযোগ্য হয়েছে। মুণ্ডারা অবশ্যই জানত, তারাই পতিত জমিতে ফসল ফলিয়েছে, তারা নূতন-নূতন গ্রাম পত্তন করেছে। আইনজীবীর মত তাদের এ ধারণা দৃঢ় করল মাত্র ; বিশেষ করে তাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় তারা বুঝেছে, শুধুমাত্র মুণ্ডা-সমাজের প্রাচীন প্রথার কথা আদালত কানে নেয় না ; আদালতকে বোঝাতে হবে, আইন কী বলে।

মুণ্ডারা তাই এখন ভাবল, আলাদাভাবে কোনো মুণ্ডার বা কোনো অঞ্চলের অভিযোগের প্রতিকার খোঁজার চেষ্টা অর্থহীন। স্থানীয় রাজপ্রতিনিধিদের তারা খোলাখুলি বলেছে,[২২৫] এ ধরনের চেষ্টায় তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ; তাদের একমাত্র লক্ষ্য "সত্তর পুরুষ" আগে মুণ্ডাদের যা অধিকার ছিল বলে তাদের বিশ্বাস, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। রাজপ্রতিনিধিরা তাদের বোঝাতে চাইল—জমিদার, ঠিকাদার ইত্যাদি মধ্যবর্তী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব এবং নানা অধিকার সরকারি আইনে স্বীকৃত, এ একান্ত বাস্তব ঘটনাকে সরকার কিভাবে উপেক্ষা করবে? উত্তরে মুণ্ডারা বলেছে[২২৬], তারাই জমির আদি মালিক ; জমিদার ইত্যাদি এসেছে পরে, তাদের অধিকারের নৈতিক কোনো ভিত্তি নেই। মিশনারিদের এক প্রতিবেদনে[২২৭] বলা হয়েছে, মুণ্ডারা মনে করে, তাদের প্রবঞ্চিত করেই জমিদারেরা জমিতে অধিকার কায়েম করেছে ; এসব বহিরাগতদের সঙ্গে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক কোনো যোগ নেই।

মুণ্ডারা তাই প্রশাসনকে বলেছে, এদের সঙ্গে কোনো সংস্রব তারা রাখবে না ; যদি খাজনা দিতেই হয়, তাহলে তারা তা সরকারকে দেবে। ১৮৮১ সালে 'চোদ্দ হাজার খ্রীষ্টান মুণ্ডা'র এক আর্জিতে[২২৮] বলা হয়, জমিদার এবং ছোটনাগপুরের রাজার সঙ্গে তারা সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চায় ; যৌথ গ্রামীণ সমাজ ('village community') তারা গড়ে তুলতে চায় ; এর মধ্য দিয়েই তারা সরকারের সঙ্গে যোগা-যোগ রাখবে। খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের মধ্যে কেউ-কেউ আরো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভাবে। 'ব্যাপ্টিস্ট জন'-এর নেতৃত্বে 'মেইলের সন্তান' ('Children of Mael') বলে এক নূতন দলের প্রতিষ্ঠা হয়। ছোট-নাগপুর রাজার পূর্বেকার রাজধানী দইসা (Doisa)তে তারা এক নূতন 'রাজে'র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। এটা ছোটো 'ধর্মীয় গোষ্ঠী' ছিল বটে ; 'কিন্তু লোহার-ডাগার মুন্সেফকে তারা শাসানি দিয়ে হুকুমনামা পাঠাত।[২২৯]

১৮৮৬ সালের এক আর্জিতে[২৩০] খ্রীষ্টান মুণ্ডারা আরো স্পষ্টভাবে তাদের লক্ষ্যের কথা বলে। তারা বলে, গোটা ছোটোনাগপুর অঞ্চল মুণ্ডাজাতির খাস এলাকা ; অলঙ্ঘ্য এ মৌলিক অধিকার ; সরকারি কোনো আইন তাকে খর্ব করতে পারে না। তবে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব তারা চুকিয়ে দেবে। তাদের প্রস্তাব. ছোটোলাটের চূড়ান্ত নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এ রাজস্ব তারা লোহারডাগার (রাচী) সরকারি রাজকোষে জমা দেবে। ছোটোনাগপুরের উপ-কমিশনার তাদের এ অনমনীয় মনোভাব দূর করার চেষ্টা করেন। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারিতে মুণ্ডাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। ফল কিছু হল না। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য : তারা কোনো যুক্তির ধার ধারে না। প্রথমে তারা বলে, ভারত সরকারের এ মর্মে এক 'ডিক্রি' তারা পেয়ে গেছে যে, তারাই [ছোটোনাগ-পুরের] জমির মালিক, সরকার ছাড়া অন্য কাকেও তারা খাজনা বা রাজস্ব দেবে না।[২৩১]

১৮৮৭ সালের মার্চ মাসে জার্মান লুথারপন্থী মিশনারিদের কাছে এক আর্জিতে তাদের মনোভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়।[২৩২] তারা বলে : 'আমরা চাই না, রাজা (ছোটোনাগপুর রাজপরিবার) এবং জমিদার এদেশে রাজত্ব করুক; আগে তো রাজরাজড়া

ছিল না; কোত্থেকে তারা এল আমরা জানি না; আমাদের পূর্বপুরুষরা রাজা বা জমিদারকে কোনো রাজস্ব দেয় নি; দিত পাড়াপ্রধানকে···এটা কি উচিত যে একশ জন ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাবে, আর হাজার জন থেকে যাবে দুঃস্থ? প্রতিটি জাতির নিজস্ব সরকার আছে, নেই শুধু মুণ্ডা আর ওরাওঁদের···'

স্থানীয় প্রশাসনকে তারা এমনও বলে, খোদ মহারানী পর্যন্ত ডিক্রি জারি করে বলেছে[২৩২], তারাই জমির আসল মালিক; অথচ প্রশাসন এ সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থাই নিচ্ছে না। তারা প্রকাশ্যে তাদের এক সন্দেহের কথা বলে—মিশনারিদের মধ্যে কেউ হয়তো এসব ডিক্রি চেপে দিয়েছে। মিশনারিদের সম্পর্কে তাদের এ সন্দেহ ও অবিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে যায়। ১৮৮৭ সালের মে-জুন মাসে প্রশাসন জানতে পারে, নানা জমায়েতে তারা তাদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করেছে। দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব তারা নেয়—তাদের কেউ চার্চের কোনো অনুষ্ঠানে আর যোগ দেবে না; আর জোর করে "মাঝিহাস" জমি কেড়ে নিয়ে তারা চাষ করবে। তারা বহুবার আগে বলেছে, এ জমি এককালে তাদেরই ছিল। হিংসার পথে তারা যাবে কিনা, প্রশাসন জানতে পারে নি। তবে একটা জমায়েতে তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র—যেমন, তীর, ধনুক, কুড়োল, বুলওয়া (যুদ্ধে ব্যবহার করার কুড়োল)—নিয়ে হাজির হয়েছিল। তামার পরগনার একটা জমায়েতে সর্দাররা নাকি বলেছিল[২৩৩], 'দু শ মাইল বিস্তৃত এলাকার মুণ্ডারা একজোট হয়েছে; তারা মহারানীর কাছে অনুমতি চাইবে, তারা যেন দেড় দিন সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করতে পারে; কোনো খাজনা তারা ছোটোনাগপুর রাজাকে দেবে না; যদি রাজার লোকজন তাদের জ্বালাতন করে, তাহলে তাদের সবাইকে খুন করবে।' মহারানীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা সংক্রান্ত গুজব রাঁচীর পশ্চিমাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।

মাঝিহাস জমি কেড়ে নেবার আন্দোলন শুরু হয় ১৮৮৭ সালের মাঝামাঝি কোনো সময়; তবে বিক্ষিপ্তভাবে। তিলমা গ্রামে এ ধরনের এক ঘটনা থেকে মুণ্ডাদের তখনকার মেজাজ পরিষ্কার বোঝা যায়।[২৩৪] ছজন খ্রীষ্টান মুণ্ডা জমিদারের লোকজনকে মাঝিহাস জমি চাষে বাধা দেয়। জমিদার নালিশ করলে আদালত থেকে সমন আসে; তাদের বলা হয়, এ অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার পুরো দায়িত্ব তাদের। মুণ্ডারা সে সমন ফিরিয়ে দেয়। গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ এলে তারা কিন্তু বাধা দেয় নি; বলে, নেতার নির্দেশে তারা এ কাজ করেছে। রাঁচীর আদালতে তারা গোটা ব্যাপারটাই অস্বীকার করে। পালটা অভিযোগ আনে, সবটাই সাজানো, জমিদারের সঙ্গে যোগসাজসে পুলিশ এসব করেছে। বিচারে তাদের কারাদণ্ড হয়। আন্দোলন কিন্তু থামে নি। তামার পরগনার বারোটা গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ে। নেতৃত্ব ছিল "পঁয়ত্রিশ সর্দারের" এক গোষ্ঠীর হাতে। পুলিশি দাপটের জন্য আন্দোলন আর বেশি ছড়াতে পারে নি।

এ আন্দোলন বিক্ষিপ্তভাবে ঘটলেও তার নির্দেশ এসেছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে। আসলে দু ধরনের আন্দোলন একই সঙ্গে চলছিল। মহারানীর কাছে আর্জি পাঠানোর ব্যবস্থাদি করতে একটা দল তখন কলকাতায় ছিল। গ্রামের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চিঠি-বিনিময়ও হত। এ ধরনের দুটো চিঠি পুলিশের হাতে পড়ে।

মুণ্ডাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস ছিল—মহারানীর 'ডিক্রি' আসবে; তবে তাদের নিশ্চেষ্ট হলে চলবে না; ঠিক-ঠিক লোক মারফত মহারানীর কাছে আবেদন পাঠাতে হবে; আবার নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কলকাতার উচ্চ-আদালতে মামলাও চালাতে হবে। চাঁদা তুলে এ কাজ চালাতে হত বলে প্রশাসন সব আন্দোলনটার নাম দেয় "চাঁদা আন্দোলন"। অবশ্য সঙ্কীর্ণদৃষ্টি প্রশাসনের ধারণা ছিল—নেতারা কাজের-কাজ কিছুই করছে না, আসলে তারা অর্থলোলুপ; আন্দোলনের নামে ভাঁড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ-

সিদ্ধি করছে মাত্র।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় থেকে বীরসা আন্দোলনের শুরু পর্যন্ত মুণ্ডা আন্দোলন তাই প্রায় নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে চলেছে। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কেও একটা সুস্পষ্ট ধারণা তখন গড়ে উঠেছে। তা হল—বহিরাগতদের প্রভুত্ব তারা মোটেই মানবে না; তাদের সঙ্গে কোনো আপোস বা সমঝোতা সম্ভব নয়; তাদের সম্পূর্ণ অপসারণ ছাড়া মুণ্ডাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

(খ) মূলত এটা স্বাধীন মুণ্ডারাজের ধারণা। মুণ্ডারা ব্রিটিশরাজকে মেনে নিয়েছে; কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে বার-বার বলেছে, ব্রিটিশরাজের কাছে তাদের একটিমাত্র দায়দায়িত্ব। তা হল, নির্দিষ্টপরিমাণ রাজস্ব দেওয়া। ব্রিটিশরাজের অন্য কোন প্রশাসনিক কর্তৃত্ব মানার কথা তারা বলে নি। সম্ভবত তাদের ধারণা ছিল, বহিরাগত গোষ্ঠীর প্রভুত্ব বিলুপ্ত হলে ব্রিটিশরাজের কর্তৃত্বও ক্রমে শিথিল হবে, এবং মুণ্ডা সমাজ ও অর্থনীতিতে তার কোনো ভূমিকা থাকবে না। তাদের ধারণা যাই হোক, জমিদার ইত্যাদি শোষকগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ অপসারণের দাবি আসলে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ; কারণ এ গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের প্রধানতম ভিত্তি ব্রিটিশ আইন-কানুন, বিচার ও শাসনব্যবস্থা। মুণ্ডাদের আদি অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এর কাঠামোয় সম্ভব নয়। তারা বলেওছে, তাদের মৌলিক অধিকার অলঙ্ঘনীয়, তা ব্রিটিশ আইনকানুনের আওতায় আসে না।

তাদের এ ধারণার ভিত্তি স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তারা দেখেছে, তাদের মূল সব অভিযোগ সরকার বরাবর উপেক্ষা করেছে, অথচ তাদের শত্রুরা নানা কায়দায় নিজেদের ক্ষমতা কায়েম করে নিয়েছে। কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য।

১৮৭৬ সালে খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের পক্ষে মিশনারিদের আবেদন ছোটোলাট টেম্পল সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন।[২৩৫] তাঁর মতে, মুণ্ডাদের দাবি 'অসংগত অযৌক্তিক', তা মানার অর্থ অন্যশ্রেণীদের প্রতিষ্ঠিত অধিকার বাতিল করে দেওয়া; ঠিকাদারদের 'জুলুম' বলে মুণ্ডারা যা বলছে, আসলে তা 'বৈধ খাজনা আদায়' মাত্র, মুণ্ডাদের যদি এ বিষয়ে আপত্তি থাকে, তাদের জন্য আদালতের পথ তো খোলা আছে; সেখানেই সব ফয়সালা হবে। টেম্পলের কাছে নাকি প্রশাসনের লোকজন বলেছে, 'কোলরা দিব্যি আরামে আছে'।

ভুঁইহারি জমি সম্পর্কে কত ঘটা করে সরকারি তদন্ত চলল, প্রায় এক দশক ধরে। ফল কিছুই হল না। তদন্ত শুরু হবার আগে জমিদারেরা যেসব জমি গ্রাস করে নিয়েছে, সরকার তা সম্পূর্ণ মেনে নিল। তা ছাড়া তদন্তকারীরা চেয়েছিল, মুণ্ডারা তাদের দাবির সমর্থনে কিছু নজির দেখাক। মুণ্ডারা কাগজে-কলমে কিছুই দেখাতে পারল না; তারা শুধু তাদের পুরনো 'প্রথা'-'ঐতিহ্যে'র কথা বলল। তদন্তকারীরা এসব মানতে নারাজ। এর পূর্ণ সুযোগ নিল জমিদারেরা।

ভুঁইহারি তদন্তের ফলাফলে এবং অন্যান্য কারণে বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা বারবার সরকারকে বলেছে, সরকার তাদের প্রতি সুবিচার করুক। কিছুই করা হয় নি। আসলে, মুণ্ডারা যে সত্যিই বিক্ষুব্ধ, প্রশাসন তা মেনে নেয় নি। মুণ্ডা নেতাদের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ এনে বলেছে, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা 'বিক্ষোভ' জীইয়ে রাখছে।

১৮৮১ সালে চোদ্দ হাজার খ্রীষ্টান মুণ্ডা স্বাক্ষরিত এক আর্জি সম্পর্কে বাঙলা সরকার বলে, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই সাজানো; তা 'দু-এক জন কুমতলবি বিক্ষোভকারী'র কীর্তি; আসলে মুণ্ডাদের মধ্যে 'সত্যিকারের অসন্তোষ' বলতে কিছু নেই।[২৩৬] ১৮৮৬ সালের আর-একটা আর্জি সম্পর্কে সরকারি প্রতিক্রিয়া ছিল একই: 'মুষ্টিমেয়' কয়েকজন খ্রীষ্টান মুণ্ডা এভাবে লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছে; নানা জায়গা থেকে টাকাপয়সা তুলে তারা কলকাতায় পাঠায়

সেখানকার আইনজীবীদের নিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নেয়, আর মুণ্ডাদের সই যোগাড় করে।[২৩৭] সরকারের ধারণা, নেতারা সৎ নয়; 'গত কয়েক বছরের বিক্ষোভে তাদেরই স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে; তারা একেবারেই চায় না যে আন্দোলন থামুক'।[২৩৮] ফলে, আন্দোলন শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই স্থানীয় প্রশাসন তা দমিয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়েছে।

মুণ্ডারা স্বাধীন রাজের কথা বলেছে; কিন্তু তারা তখন বুঝে উঠতে পারেনি, কিভাবে তাদের শত্রুকুলের বিনাশ ঘটবে। সহিংস আন্দোলন প্রায় সবক্ষেত্রেই নিষ্ফল; বরং পুলিশি পীড়নে তাদের মনোবল ভেঙেছে। তাই বারবার তারা নির্ভর করেছে সরকারি 'ডিক্রী'র উপর। যদি বাঙলা সকারর তা না জারি করে, তাহলে ভারত সরকার করবে; ভারতসরকারও যদি না করে, তাহলে স্বয়ং মহারানী থেকে 'ডিক্রী' আসবে—এ হল তাদের বিশ্বাস।

এ প্রত্যাশা যদি অপূর্ণ থাকে, তাহলে মুণ্ডাদের করণীয় কী হবে? এ বিকল্পের কথা মুণ্ডা নেতারা তখনও পরিষ্কার করে ভাবে নি। এ বিষয়ে বীরসার চিন্তায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তার নিশ্চিত ধারণা ছিল, একমাত্র সংঘবদ্ধ প্রতিরোধেই শত্রুগোষ্ঠী পর্যুদস্ত হবে; শুধু তাই নয়; ব্রিটিশরাজের অবসান না ঘটলে মুণ্ডা-রাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না; তাই ব্রিটিশশক্তির নানা বনিয়াদের উপর আঘাত হানতে হবে। আমরা পরে দেখব, সহিংস পন্থা সম্পর্কে বীরসা সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না। কিন্তু তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

(গ) এ সময়কার নানা আন্দোলনে খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের ভূমিকার উল্লেখ আগেই করেছি। সরকারি মহল কোনো-কোনো ক্ষেত্রে খোলাখুলি বলেছে, মিশনারি-দের প্রচার ছাড়া এ আন্দোলন এত ব্যাপক এবং সংগঠিত হতে পারত না। তাহলে, মুণ্ডা আন্দোলনের বিকাশে এবং বিস্তারে মিশনারি প্রচারের আসল ভূমিকা কী?

মিশনারিরা অসত্য কিছু বলেনি। মুণ্ডাদের নানা অভিযোগের যথার্থতা তারা স্বীকার করেছে, বহুবার সরকারের কাছে এর প্রতিকারের জন্যও বলেছে। কিন্তু প্রতিকারের উপায় হিসেবে সংঘবদ্ধ আন্দোলন কখনও অনুমোদন করেনি। তাছাড়া, আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে তারা স্পষ্টভাবে বলেছে, তা সম্পূর্ণ অবাস্তব। আন্দোলনে ব্রিটিশরাজবিরোধী কোনো মেজাজ তারা বরদাস্তই করে নি। কয়েকটামাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৮৬৭ সালে খ্রীষ্টান মুণ্ডারা এক আর্জিতে সরকারকে জানায়, ছোটোনাগপুরের রাজা তাদের নানাভাবে নির্যাতন করছে; আর অবৈধ দাবি আদায়ে 'ঠিকাদারেরা' জোরজুলুম চালাচ্ছে। তাদের প্রস্তাব, তারা যেন সরকারি কোষাগারে তাদের খাজনা জমা দিতে পারে। তারাই জমির মালিক—কলকাতার এক আইনজীবীর এ মতও তারা সরকারকে জানায়।[২৩৯] এ আর্জির কথা জানাজানি হয়ে গেলে বিব্রত ছোটনাগ-পুর মিশন সঙ্গে-সঙ্গে সরকারকে জানায়, এ ব্যাপারে তাদের কোনো দায়িত্ব নেই; সর্বসাকল্যে কুড়ি জন খ্রীষ্টান মুণ্ডা এ আর্জিপেশের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত; তাদেরও চার্চের সঙ্গে কোন সংস্রব আর নেই; আর্জিতে যেসব অভিযোগের উল্লেখ আছে, সেগুলি সব ভিত্তিহীন। অথচ একই চিঠিতে মিশন লিখছে: 'সহস্র-সহস্র ভুঁইহার তাদের জমি হারিয়েছে; সর্বস্বান্ত হয়ে তারা কুলি, ভবঘুরেতে পরিণত হয়েছে।[২৪০]

১৮৭৬ সালে ছোটোনাগপুরের জার্মান মিশন মুণ্ডা-আন্দোলন সম্পর্কে তাদের মনোভাব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে।[২৪১] ছোটোনাগপুরের আদিবাসী হিসেবে এখানকার জমির মালিক মুণ্ডারাই—মুণ্ডানেতাদের এ দাবি মিশনের মতে 'অলীক স্বপ্ন' বই কিছু নয়; গুটিকয়েক 'প্রভাবশালী কোল' স্রেফ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এ আন্দোলন চালাচ্ছে; এতে সরকার-বিরোধী প্রবণতা আরো অবাঞ্ছিত; পরিণামে তা কোলদের সর্বনাশ ডেকে আনবে; মিশন যে মাঝে-মাঝে সরকারের কাছে মুণ্ডাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে, তা মুণ্ডা-আন্দোলনকে উৎসাহিত করার জন্য

নয়; সময় থাকতে সরকার যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করে, তাহলে তা মুণ্ডাদের আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করবে—এটাই মিশনের ধারণা; মিশন আরো বলেছে সুযোগ পেলেই তারা মুণ্ডাদের ব্রিটিশরাজের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেয়।

স্বভাবতই, স্বাধীনরাজপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সংকল্প বিদ্রোহী মুণ্ডা এবং সর্বপ্রকার সংঘবদ্ধ আন্দোলন-বিরোধী মিশনারিদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে চলে। মিশনারিদের সম্পর্কে মুণ্ডাদের অবিশ্বাস-সন্দেহের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এ তিক্ততার চরম প্রকাশ দেখা যায় বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনে (ডিসেমবর ১৮৯৯—জানুয়ারি ১৯০০); যার শুরু বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় (২৪শে ডিসেমবর) চার্চে প্রার্থনারত খ্রীষ্টান সমাবেশের উপর আক্রমণের মধ্য দিয়ে।

মুণ্ডা-আন্দোলন এবং তার লক্ষ্য সম্পর্কে মিশনারিদের মনোভাব যাই হোক, এ আন্দোলনে চার্চের কিছু-কিছু শিক্ষা এবং খ্রীষ্টান-মুণ্ডাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মুণ্ডানেতা হিসেবে বীরসার আবির্ভাব পর্যন্ত মুণ্ডা-আন্দোলনের উপর মিশনারিদের ধর্মীয় প্রচারের প্রভাব একান্তই গৌণ। পরে আমরা দেখব, বাইবেলের বাণী বীরসা যেভাবে গ্রহণ করেছে, তার ধ্যান-ধারণাকে তা যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, মিশনারি প্রচারের মূল লক্ষ্যের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই।

মুণ্ডা-আন্দোলনে মিশনারিদের ধর্মীয় ধারণার কোনো প্রভাব না থাকার কারণ, মিশনারিদের প্রচারে মুণ্ডাদের ধর্মবিশ্বাসে কোনো পরিবর্তনই আসে নি।[২৪২] যা-কিছু পরিবর্তন তা একান্তই বাহ্যিক যেমন, নির্দিষ্ট সময়ে চার্চে জড়ো হওয়া, নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। বিশ্বাস- বা চিন্তাগত পরিবর্তন সাধনের জন্য যে নিরন্তর প্রয়াসের দরকার, মিশনের সীমাবদ্ধ জনবল দিয়ে তা দীর্ঘদিন ধরে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে করা সম্ভব ছিল না। মুণ্ডারা বলত, খ্রীষ্টান হবার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটামাত্র অনুষ্ঠানের কথা তারা জানে; যেমন, তাদের চুল কেটে ফেলতে হত; সামান্য জল হাতে নিয়ে পাদরিসাহেব বিড়বিড় করে কী-সব আওড়াত, আর সে জল মুণ্ডাদের গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হত। খ্রীষ্টান বানানোর এ সহজ-সরল ব্যবস্থাকে সবাই বলত "চুল কেটে ফেলার আন্দোলন।"[২৪৩] মাঝে-মাঝে এমনও ঘটেছে, খ্রীষ্টান মুণ্ডারাই গ্রামে-গ্রামে গিয়ে অন্য মুণ্ডাদের চুল কাটিয়ে খ্রীষ্টান বানাত; পাদরির কোনো ভূমিকাই তাতে ছিল না।[২৪৪]

মিশনারিদের সঙ্গে সংযোগ মুণ্ডা-আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে অন্যভাবে। এ প্রভাবের উৎস মিশনারিদের সম্পর্কে মুণ্ডাদের এক গভীর বিশ্বাস। তা হল এই যে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে 'পাদরি-সাহেবরা' আন্তরিকভাবে আগ্রহী এবং সচেষ্ট। এ বিশ্বাস মাঝে-মাঝে ভেঙেছে; কিন্তু মিশনারি প্রচারে আবার তারা আকৃষ্ট হয়েছে, বিশেষ করে তাদের কোনো সঙ্কটের মুহূর্তে।

খ্রীষ্টান মুণ্ডারা অকপটে বলেছে, তারা এ বিশ্বাসে খ্রীষ্টান হয়েছে যে এতে তাদের সুদিন আসবে; জমিদারি জুলুম, বেট-বেগারির বোঝা কমবে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ১৮৮৭/৮৮ সাল নাগাদ জার্মান মিশন সম্পর্কে মুণ্ডাদের মোহ ঘুচেছে। পরের বছর রোমান ক্যাথলিক মিশন যখন প্রচারে নামে, তখন দলে-দলে মুণ্ডারা খ্রীষ্টান হতে থাকে; শুধু তাই নয়, মুণ্ডা-আন্দোলনে হঠাৎ নতুন এক সাড়া জাগে। এর কারণ সম্পর্কে সরকারি তদন্তের সময় মুণ্ডারা তাদের মনের কথা বলে। একজনের সাক্ষ্য ছোটোনাগপুরের কমিশনার নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেন[২৪৫]: বেশির ভাগ মুণ্ডাই নাকি একই ধরনের কথা বলেছে। খেতুয়া খেরিয়ার এ সাক্ষ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি: '...আমি লেভিয়েন্স সাহেবের চার্চের সঙ্গে যুক্ত। আমি খ্রীষ্টান হই...কিন্তু আমার স্ত্রী এবং চার সন্তান হয় নি। আমি খ্রীষ্টান হয়েছি কারণ গজধর দেওঘরিয়া (জমিদার) আমাকে বড্ডো জ্বালাতন করত; প্রত্যেকটা দিন আমাকে বেট-বেগারি দিতে হত;

যেন আমি এক ধাঙড়। লেভিয়েন্স সাহেব আমাকে বলে, খ্রীষ্টান হলে আমাকে আগের নিয়মানুযায়ী বেট-বেগারি দিতে হবে না; আমার বেট-বেগারি কিন্তু কমল না; তাই বড়ো অশান্তিতে আছি। আমি শুধু ক্রুশের চিহ্ন দেখাতে শিখেছি; আর কিছু না। আমাদের [ধর্ম সম্পর্কে] শেখানোর জন্য কেউ আসে নি। আমার সমাজ আমাকে এখনও একঘরে করে নি, কারণ আমি নামমাত্র খ্রীষ্টান।'

কমিশনারের মতে, সব মুণ্ডা মোটামুটি এ ধরনের কথা বলেছে। পরিবারের কর্তাই শুধু খ্রীষ্টান হয়েছে, স্ত্রী এবং সন্তানাদি হয় নি। এর কারণ হিসেবে কমিশনার বলে, খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপারটা খুবই তড়িঘড়ি করে সারা হয়েছে। এ সম্পর্কে খোঁজ করতে গিয়ে কমিশনার মুণ্ডাদের মধ্যে এক ব্যাপক বিশ্বাসের কথা জানতে পারে: 'জমিদারের অত্যধিক দাবিদাওয়া···প্রতিরোধ করার সুযোগ অন্যদের তুলনায় খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের অনেক বেশি।[২৪৬]

এ ধারণা এক বিশেষ পরিবেশে গড়ে উঠেছে। বাইরের নানা গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র মিশনারিরাই তখন নিপীড়িত মুণ্ডাদের সম্পর্কে আন্তরিক সহানুভূতি দেখিয়েছে। সর্বব্যাপী কলুষ—'জমিদার'গোষ্ঠীর প্রবঞ্চনা, শঠতা, গৃধ্নুতা; আইন-আদালতের ভণ্ড চতুরালি; প্রশাসনের উঁচুমহলের নিষ্করুণ ঔদাসীন্য, এমনকী উপজাতি সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা—এর মধ্যে বিদেশী মিশনারিদের সহৃদয়তা মুণ্ডাদের গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। জমিদারি উৎপীড়ন বন্ধ করার উপায় হিসেবে সঙ্ঘবদ্ধ মুণ্ডা-আন্দোলনকে তারা সমর্থন করে নি, কিন্তু জমিদারের কার্যকলাপকে তারা অবৈধ, অন্যায্য এবং নীতিবোধবর্জিত বলে সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছে। সরকারের কাছে মিশনারিদের বহু আবেদনে তাদের এ কার্যকলাপ, আর মুণ্ডা-স্বার্থরক্ষায় পুলিশ, আইন-আদালতের ব্যর্থতাকে মুণ্ডাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। মুণ্ডাদের সঙ্গে তাদের সংযোগ ছিল অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ। মিশনারিদের এ মনোভাবের কথা তারা ভালো জানত। এমন নয় যে মিশনারিরা তাদের বর্তমান অবস্থার কারণ হিসেবে নূতন কিছু বলেছে। কিন্তু দুটো দিক থেকে মিশনারিদের সমালোচনা তাদের নিজস্ব ধারণাকে সুস্পষ্ট করেছে। বৃহত্তর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে মুণ্ডা সমাজের উপর বহিরাগত গোষ্ঠীর প্রভুত্ববিস্তারের রূপই মিশনারিরা বোঝাতে চেয়েছিল; শুধুমাত্র একান্ত প্রত্যক্ষ বর্তমান বা বিচ্ছিন্ন মুণ্ডাগ্রামের দুর্গতি নয়। সামগ্রিকভাবে মিশনারি-প্রভাবিত অঞ্চলের মুণ্ডাসম্প্রদায় এখন অনেক পরিষ্কার করে বুঝল, দীর্ঘদিন ধরে তাদের অধিকার কী ভাবে সংকুচিত হয়ে আসছে। দ্বিতীয়ত জমিদার-মুণ্ডা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জটিলতার জন্য নূতন-নূতন আইন-কানুনের ব্যবস্থা হল। মুণ্ডারা তাদের পুরনো প্রথা, অলিখিত নিয়ম ইত্যাদি বুঝত; কিন্তু আইন-কানুনের ভাষা, তাদের অনড় নির্দিষ্টতা, উকিল, মোক্তার বা আদালতের ব্যাখ্যা তাদের বিভ্রান্ত করত। ধরতে গেলে, অলিখিত প্রথার প্রয়োগক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। ১৮৮৯ সালে রোমান ক্যাথলিক মিশন মুণ্ডাদের বোঝান: খাজনা, বেগারি ইত্যাদি বিষয়ে জমিদারের নিত্যনূতন দাবি মানতে তারা বাধ্য নয়, কারণ এসব দাবি ১৮৭৯ সালের আইনের বিরোধী।[২৪৭] অবশ্য বিদ্রোহী মুণ্ডাদের মতো মিশনারিরা কখনো বলে নি যে জমিদারগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করতে হবে। কিন্তু জমিদার সম্পর্কে মুণ্ডাদের তিক্ততা তখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে শুধুমাত্র সাম্প্রতিক আইনের লঙ্ঘন রোধ করে তারা নিশ্চিত হতে পারেনি; জমিদারি প্রভুত্বের সম্পূর্ণ অবসান না হলে এ অনিশ্চয়তা অনিবার্য।

খ্রীষ্টান হলে তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর হবে, মুণ্ডাদের এ ধারণার ভিত্তি আরো ব্যাপকতর। তাদের বিশ্বাস ছিল—তাদের দুর্দশা দূর করার যথোপযুক্ত ক্ষমতা মিশনারিদের আছে। তাদের কাছে মিশনারিরা শুধুমাত্র 'পাদরি' নয়, 'পাদরি সাহেব'; তারা সাদা চামড়া

জাতের লোক; আর সাদা চামড়া জাতের লোক মানেই রাজার জাতের লোক; তাদের রাজার ক্ষমতা আছে; এ ক্ষমতা খাটালে তাদের শত্রুদের ক্ষমতা খর্ব হবে, পঙ্গু হবে। মিশনারিদের যে ক্ষমতা আছে বলে মুণ্ডারা বিশ্বাস করত ছোটোনাগপুর কমিশনার তাকে বলেছেন "the great secular powers"[২৪৮] কমিশনার মুণ্ডাদের সঙ্গে এক কথোপকথনের উল্লেখ করে। হঠাৎ মুণ্ডারা দলে-দলে খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছে কেন, কমিশনার তাদের এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে: কমিশনারের হুকুমে। বিস্মিত কমিশনার বলে, এরকম কোনো হুকুম তার কাছ থেকে যায়নি। মুণ্ডারা তখন বলে, সে হুকুম এক 'হাকিমের'। মিশনারিরা তো 'হাকিম' নয়, কমিশনারের এ কথার জবাবে তারা বলে: 'তারা কালো চামড়ার লোক; সাদা চামড়ার লোক মাত্রেই তাদের কাছে হাকিম'।[২৪৯]

মিশনারিদের সঙ্গে সংসর্গ এবং তাদের প্রচারের প্রভাবে ক্ষুদ্র এক মুণ্ডাগোষ্ঠীর আবির্ভাব হল, যারা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। কমিশনারের ভাষায়, তারা অনেক বেশি 'স্বাধীন-চেতা'; নিজেদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন; মুণ্ডাদের বর্তমান অবস্থার কারণ সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট; সাধারণভাবে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল; তারা কলকাতার উচ্চ-আদালত, তার আইনজীবী সম্প্রদায়, ব্যারিস্টার ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক খবরাখবর রাখত; আইন-জীবীদের কেউ-কেউ হয়তো তাদের ঠকিয়েছে। মিথ্যা আশ্বাসে প্রলুব্ধ করেছে; কিন্তু নূতন বিচারব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল; বিশালসংখ্যক মুণ্ডাদের স্বাক্ষর যোগাড় করতে পারলে সরকারের কাছে তাদের আর্জি যে অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে, এ বাস্তববোধ তাদের ছিল। মনে হয়, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এ আর্জি পাঠানোর ব্যাপারে মিশনারিদের উদ্যোগ ছিল। কিন্তু মুণ্ডা-আন্দোলনের এ গুরুত্বপূর্ণ দিকের ইতিহাস আমাদের অজানা। আর্জি ইত্যাদি বৈধ উপায়ের ব্যর্থতার ফলে তাঁরা মিশন কর্তৃপক্ষের অননুমোদন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অন্যধরনের সংঘবদ্ধ আন্দোলন সংঘটিত করে। জমিদার-গোষ্ঠী, মাঝে-মাঝে প্রশাসনও বলেছে, এ আন্দোলন প্রধানত খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের নিয়েই গড়ে উঠেছে। তা মোটেই ঠিক নয়। ক্ষুদ্র এক খ্রীষ্টান মুণ্ডাগোষ্ঠীর নেতৃত্বে খ্রীষ্টান এবং অন্য মুণ্ডাদের এ আন্দোলন।

(ঘ) মুণ্ডা আন্দোলনের উপর অন্যতম বিশিষ্ট প্রভাব সমসাময়িক সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলন। এর 'রাজনৈতিক' প্রভাব ক্ষণস্থায়ী। এর একটা কারণ, আদমশুমারিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ব্যাপক সাঁওতাল আন্দোলনও (১৮৮১-৮২) পুলিশি পীড়নের জন্য বেশিদিন চলতে পারেনি। কিন্তু সাঁওতাল 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী। বীরসার চিন্তা-ভাবনার কোনো-কোনো দিক সম্ভবত এ আন্দোলন দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। প্রাক-বীরসা মুণ্ডা আন্দোলনে অনুরূপ কোনো চিন্তার নজির মেলে না।

এ দুই ধরনের প্রভাবের উৎস দুবিয়া গোসাঁই-এর প্রচার এবং ব্যক্তিত্ব।[২৫০] তাঁর প্রচারকেন্দ্র ছিল ছোটোনাগপুর অঞ্চলে তাঁর নিজের গ্রামে। সাঁওতাল পরগনার যেসব অঞ্চলে খেরওয়ার আন্দোলন দাঁড়িয়ে-ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটা ছোটোনাগপুর-সংলগ্ন ছিল।

মুণ্ডাদের উপর দুবিয়ার ব্যাপক প্রভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে [ছোটনাগপুর কমিশনার] কয়েকটা কারণের উল্লেখ করে[২৫১] সাঁওতাল পরগনার মতো এখানেও আদমশুমারিকে ঘিরে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, কারণ "নিরক্ষর এবং নির্বোধ" জনসাধারণ আদম-শুমারি ব্যাপারটাই ভুল বুঝেছিল; তবে উত্তেজনার প্রধান কারণ 'কুখ্যাত ফকির দুবিয়া'র 'নানা ভবিষ্যদ্বাণী এবং অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ'। এ অঞ্চলে তার নামডাক আগে বড়ো একটা ছিল না; "সাধারণ ফকির" বলেই লোকে তাকে জানত; কিন্তু সে পরে

বলে বেড়ায়, অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা তার আছে; 'সরলমতি' স্থানীয় লোকদেরই শুধু সে প্রতারিত করেনি; শহুরে বিত্তশালীদের কেউ-কেউ তার প্রচারে বিশ্বাস করে; ছাতরার এক মহাজন তাকে বলে, যদি তার অলৌকিক ক্ষমতার বলে মহাজনের পুত্রসন্তান লাভ হয়, তাহলে সে তাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে। তার পর তুবিয়া নানা ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকে; সে বলে, যারা তার নির্দেশমতো কাজ করবে, তাদের সব ইচ্ছা পূর্ণ হবে; তার নাম দিয়ে নানা চিত্র প্রচার করা হয়; সবাইকে বলা হয় শুয়োর, মুরগি ইত্যাদি সব মেরে ফেলতে হবে; তবে সাঁওতাল পরগনার মতো ওখানে অত ব্যাপকভাবে তার নির্দেশ মানা হয় নি; 'শুদ্ধি-আন্দোলন' সংক্রান্ত অন্য সব প্রচারও ওখানে ব্যাপকভাবে হয়; 'অন্তত কিছু দিনের জন্য সাধারণ মানুষের উপর তার বিপুল প্রভাব দেখা গেছে, তার সংস্থানের জন্য ভিক্ষা এবং অন্যান্য দান অবিরত এসেছে'; তার গ্রেপ্তারের পর এ প্রভাব কমতে থাকে।

তুবিয়া সম্পর্কে কমিশনারের অবিশ্বাস এখানে স্পষ্ট। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ যে, মুণ্ডা এবং অন্যান্য আদিবাসীদের কথা আমরা এর থেকে জানতে পারি। তুবিয়ার প্রভাব এত ব্যাপক ছিল যে জমিদার এবং সরকার সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা তার কাছে জমি, খাজনা ইত্যাদি বিষয়ে পরামর্শের জন্য অনবরত যেত।[২৫১] হারানো জমি ফিরিয়ে দেবার আশ্বাসও নাকি তুবিয়া দিয়েছিল। 'এর ফলে একটা এলাকায় কোলরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়; তারা বলে এ খাজনা কোলরাজের প্রাপ্য'। দুঃসাহসী মুণ্ডাদের গ্রেপ্তারের পর এ 'ষড়যন্ত্র' বন্ধ হয়।

খেরওয়ার 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি দিনস্থায়ী হয়েছিল বলে মনে হয়। 'শুদ্ধি' সম্পর্কে তুবিয়ার প্রচার এখানে সাঁওতাল পরগনার মতো অত কার্যকর হয় নি। কিন্তু সাঁওতাল-গুরুদের মতো বীরসাও নূতন মুণ্ডাসমাজগঠনের উপায় হিসেবে শুদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। বীরসার উপর অন্য একটা প্রধান প্রভাব খ্রীষ্টের বাণীর সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। তুবিয়া ছাড়া অন্য কোনো ধর্মগুরু মুণ্ডাদের এ ধরনের কথা বলে নি। ডাইনিপ্রথা সম্পর্কে তীব্র অসহিষ্ণুতা মাঝে-মাঝে দেখা গেছে। লোহারডাগার (রাঁচী) উপকমিশনার ১৮৯০ সালের এক ঘটনার বিবরণ দেয়।[২৫২] দুজন বিধবাকে ডাইনি বলে ঘোষণা করা হয়; 'প্রথমে তাদের জুতোপেটা করা হয়; তারপর তাদের চুল কেটে ফেলা হয়; নীচুজাতের লোকের রান্না ভাত জোর করে খাওয়ানো হয়; পানীয় হিসেবে দেওয়া হয় তাদের নিজেদের মূত্র; সবশেষে তাদের গ্রাম থেকে বার করে দেওয়া হয়।' এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের কাজ। নূতন রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানরা অন্যদের খ্রীষ্টান করার জন্য মাঝে-মাঝে জোরও খাটাত। এ ঘটনা তাদের এ ধরনের অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়। কোনো 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে এটা করা হয় নি।

[ক্রমশ

সূত্রনির্দেশ :

২১২. এ প্রবন্ধের ৭·৬ অংশ দ্রষ্টব্য।

২১৩. Bengal Judicial Progs.; Aug. 1881, Nos. 39-40; Appendix C; Reply from Captain Carnac, Assistant Commissioner; Question No. 8

২১৪. খেরওয়ার আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাসের জন্য (বিশেষ করে ১৯০৮-এর পর থেকে) P. O. Bodding, 'The Kharwar Movement Among the Santhals' *Man in India* Sept. 1921 দ্রষ্টব্য। খেরওয়ারদের তিনটি প্রধান গোষ্ঠীর কথা এখানে আলোচনা করা হয়েছে—Sapai, Samra এবং Babaji। দুটি জিনিস এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়: সাঁওতাল অনুষ্ঠানের নানা নূতন বিশ্বাস এবং ধ্যানধারণা মিশে গেছে।

২১৫. K. S. Singh, *Birsa Munda and his*

Movement, 1874-1901 (O. U. P., 1983); প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। S. C. Roy, *The Mundas and their Country* (First Edition, Calcutta, 1912)। এই দুটি বইয়ের কোনোটাতেই এ সময়েয় ইতিহাসের আলোচনা পর্যাপ্ত নয়।

২১৬. S. C. Roy. উপরে উল্লিখিত : এখানে বিভিন্ন বহিরাগত গোষ্ঠী সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে 'জমিদার' কথাটার প্রয়োগ প্রচলিত অর্থে মোটেই নয়। মুণ্ডা ও এবং ছোটনাগপুর রাজার মধ্যবর্তী যে গোষ্ঠীরা আস্তে-আস্তে মুণ্ডাদের প্রাচীন অধিকার খর্ব করে নিজেদের কর্তৃত্ব নানাভাবে কায়েম করে, তাদের সবাইকে বোঝানোর জন্য 'জমিদার' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর কর্তৃত্বের রূপও ভিন্ন। ঠিকাদার, জায়গীরদার, ইলাকাদার, জমিদার ইত্যাদি নানা নামে তারা পরিচিত ছিল। বর্তমান প্রবন্ধে মুণ্ডা অঞ্চলের ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি।

২১৭. 'জমিদার' শব্দটি কী অর্থে ব্যরহার করা হয়েছে, তা এর আগের পাদটীকায় বলেছি।

২১৮. প্রথম গ্রামপত্তনকারীর বংশধরদের জমি।

২১৯. ১৮৬৮ সালে এ তদন্তের প্রস্তাব সরকার অনুমোদন করে। পরের বছর এর জন্য নূতন এক আইন পাস করতে হয় (Chotanagpur Tenures Act, II [Bengal Council] of 1869)। ১৮৮০ সালের মার্চ পর্যন্ত তদন্তের কাজ চলে।

২২০. যেসব জমির জন্য নির্দিষ্ট হারে খাজনা দিতে হত, তাদের রাজহাস বলা হত।

২২১. স্থানীয় ভাষায় এর নাম বেট-বেগারি। শুধুমাত্র চাষের কাজের জন্য জমিদার এ বেগারি দাবি করত না। জমিদারের নানা প্রয়োজনে মুণ্ডাদের বাধ্যতামূলকভাবে খাটতে হত।

২২২. Bengal General Miscellaneous Progs.; Oct. 1880; Nos. 39-41; Chotanagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1879-80, 12 July 1880। কমিশনার রাঁচী অঞ্চলের ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে এক সরকারি রিপোর্টের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন : 'He [a Kol] may have left one village and settled elsewhere, but his lands in that, where his forefather's bones were laid, are held by others in trust for him.' [Para 148]. নানা তথ্যের ভিত্তিতে কমিশনারের মন্তব্য : '...The Kol has a strong hereditary attachment to the village where his forefathers first settled, and where his ancestral burying place is situated. He thinks that, as he has an undoubted right to be buried there...he has also a right to get land there..." [Para 149]

২২৩. একই; কমিশনার এক অধস্তন রাজকর্মচারীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন : 'He [Rakhal Das Haldar, who was associated with the official enquiry into bhumihari lands] shows clearly how desperate the antagonism between Aryan *elaquadar* and aboriginnl ryot has been for the last fifty years or more... The malcontents are described by him as irreconcilable, whom nothing short of an impossible revolution will satisfy.' [Para 148] 'ইলাকাদারের আসল অর্থ একটা অঞ্চলের পুলিশি ব্যবস্থার তদারকি যে করত; এখানে বোঝানো হচ্ছে এক বহিরাগত গোষ্ঠী।

২২৪. India Legislative Dept. Progs.; March 1869. No. 18; Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 30 Sept. 1868, Para 2.

২২৫. Bengal General Miscellaneous Progs.; Oct. 1894; No. 21; Chotanagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1893-94, 29 June, 1894. 'The claim of the Munda and Oraon cultivators is that because their forefathers came into the country and cleared the jungal at a time when there were no rajas or zamindars, they are in no way bound to pay rent through any intervener but direct to Government.' [Para 133]. ধরতে গেলে এর (১৮৯৪) এর আগেও প্রায় ত্রিশ বছর ধরে মুণ্ডারা একই কথা বলেছে।

২২৬. ছোটনাগপুরের জার্মান মিশনের Rev. H. Onasch এবং আরো পনেরো জন বাঙলা সরকারকে লেখে (১৭ মে, ১৮৭৬) : 'The Kolhs [Kols] cannot

but see in these *tikadars [thikadars]* their born and sworn enemies—men who rob them of the lands of their forefathers, men who are opposed to them politically and religiously, whose life and manners have nothing in common with their primitive customs, men who despise them...' *Papers Relating to the Agrarian Disputes in Chotanagpur* [No date], Vol. I, P. 66.

২২৭. একই *(Papers Relating to Agrarian Disputes* etc) : Vol. I পৃ ১১৩ ; Govt. of Bengal to Govt. of India, Home, Revenue and Agricultural, 22 Feb. 1881. এ চিঠি মূল আর্জি থেকে নানা অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছে ; Paras 1-3.

২২৮. একই (*Papers* etc.) Vol. I ; পৃ ১২৫ ; Chotanagpur Divisional Commissioner to the Govt. of Bengal ; 19 Nov. 1887 ; Para II.

২২৯. একই ; Para 10 ; তা ছাড়া দ্রষ্টব্য : Govt. of Bengal to Govt. of India, Revenue and Agricultural Dept, 17 May, 1886. Paras 3-4. [একই, *Papers*] Vol. I ; পৃ. ১১৯

২৩০. একই ; পৃ ১২৬

২৩১. একই ; পৃ ১৩০-১৩১ ; Para 26

২৩২. একই (*Papers* etc.), Vol. I. পৃ ১৪১ ; Chotonagpur Commissioner to Govt. of Bengal. 30 Nov. 1889 ; Para 4. কমিশনারের ধারণা : 'Encouraged by advisers in Calcutta, they asserted the existence of a decree from the Viceroy or the Queen-Empress which restored to them their old inheritance.

২৩৩. একই (*Papers* etc.), Vol. I, p 129 ; Chotonagpur Commissioner to Government of Bengal, 19 Nov. 1887 ; Para 23.

২৩৪. একই ; Para 25.

২৩৫. একই ; (*Papers*) Vol. I, পৃ ৭৩ ; Minute by the Lieutenant Governor of Bengal, 5 July, 1876. টেম্পল মুণ্ডাদের দাবিকে 'extravagant and unreasonable claims' বলেছেন। (Para 7)

২৩৬. একই ; পৃ ১১৩ ; Govt. of Bengal to Govt of India, 22 Feb. 1881 ; বাঙলা সরকারের মতে নেতারা 'mischievous' এবং 'there is no...real and genuine discontent'. (Para 3)

২৩৭. একই ; পৃ ১১৯ ; Govt. of Bengal to Govt. of India, 17 May, 1886 ; (Para 4)

আর্জির ভাষা পরীক্ষা করে বাঙলা সরকারের নাকি মনে হয়েছে, পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর দেখিয়ে আর্জি-লেখক সরল-বিশ্বাসী মুণ্ডাদের ধোঁকা দিতে চেষ্টা করেছে। ('imposing on a primitive people by a show of learning and argument.')

২৩৮. একই ; পৃ ১৩২ ; ছোটোনাগপুরের কমিশনার লেখেন (১৯ নভেম্বর ১৮৮৭) ; 'They have for years been deriving profit from the agitation, and are certain to dislike giving it up'. (Para 33)

২৩৯. গণেন্দ্রমোহন ঠাকুর। ভুঁইহারি জমি সম্পর্কে তাঁর মত : '...the Bhooinharee lands, as in the case of the Jews, are, in one sense, inalienable, except to the village or the community in its aggregate capacity. I therefore fail to see the application of the law of limtation to such holdings.' India Legislative Progs, March 1869, No. 18. 'Petition of 14,000 Native Christians residing in the territory of the Rajah of Chotonagpur.' 21 September, 1867

২৪০. একই (India Legislative Progs. etc.) ; The Senior Missionary of the Chotonagpur Mission to the Deputy Commissioner, Lohardugga, 15 Nov., 1867 ; Para 6.

২৪১. Papers Relating to Agrarian Disputes etc. (পাদটীকা নং ২২৬ দ্রষ্টব্য), Vol. I, পৃ ৬৮ ; Rev. H. Onasch and 15 other to the Lt. Governor of Bengal. 17 May, 1876.

২৪২. Bengal General Miscellaneous Progs. ; Oct., 1890, File 149—1. Chotonagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1889-90 ; 1 July, 1890. একদল মুণ্ডার সঙ্গে কথোপকথনের

পর কমিশনারের মন্তব্য : '...while the speakers were avowedly Christians, they still retained their old sentiments in respect to demons...there is hardly a family that cannot boast a ghost or an ancestral shade in proof of its antiquity. Besides the family apparitions, there is the ghost of those who are drowned. ...of the witches and of the dwarfs, as remarked my informant village Pahu [*Pahan*, the village priest]. ...when asked if he had ever seen the *bhuts* [ghosts]. the Pahu replied in the affirmative, and on my enquiry what they were like, he added that they were very small and went about at night with wide cavernous jaws and caused all the sickness.' [Para 6]

২৪৩. একই ; এ বিষয়ে এক তদন্তের উল্লেখ করে কমিশনার লিখছে : The enquiry established the fact thet convergions to Christianity were effected by the the rough and simple process of depriving the new convert of his topknot.' (Para 149)

২৪৪. *Papers relating to Agrarian Disputes in Chotonagpur* [No date] ; Vol. I ; পৃ ১৩৬। Chotonagpur Divisional Commissioner to the Deputy Commissioner of Lohardugga, 13 Nov. 1889. (Para 1)

২৪৫. একই ; [*Papers* etc.] ; Vol. 1 ; পৃ ১৪২। Chotonagpur Divisional Commissioner to Govt. of Bengal, 30 Nov. 1889. (Para 8-9)

২৪৬. একই ; Para 12. এ সম্পর্কে কমিশনারের সিদ্ধান্ত : এ ছাড়া খ্রীষ্টান হবার অন্য কোনো কারণ নেই। "On no other hypothesis can the extensive conversions to the Roman Catholic faith be explained for on the evidence adduced it is impossible to believe that they have accepted those beliefs from religious convictions.'

২৪৭. একই (*Papers etc.*) ; Vol. I ; P. 138 ; Chotonagpur Commissioner to the Govt. of Bengal, 28 Nov. 1889 ; Para 1. মিশন কর্তৃপক্ষ যে মিশনের নীতি হিসেবে এসব বলত, তা নয়। বিশেষ কোন কোন মিশনারি মুণ্ডাদের এ ধরনের পরামর্শ দিত। প্রশাসন এ ধরনের পরামর্শকে অনধিকারচর্চা বলে মনে করত। ছোটোনাগপুরের কমিশনারের মতে, এটা হল 'injudicious meddling with the land question.'

২৪৮. একই ; (*Papers* etc.) Vol. I ; কমিশনার বিশ্বাস করে' নি যে '...they [missionaries] have ever intentionally given the Kols reason to attribute to them the great secular powers with which they have been credited...' (Para 37)

২৪৯. পাদটীকা নং ২৪২ দ্রষ্টব্য ; কমিশনরের রিপোর্টের Para 6. জার্মান মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক যখন প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে, মুণ্ডারা তখন একই কথা বলত। এক মিশনারি সর্দারদের প্রতারক বলাতে বীরসা নাকি বলে : 'সাহেব, সাহেব, এক টোপী হ্যায়'। K. S. Singh, *Birsa Munda and His Movement, 1874-1901* (O. U. P., 1983) পৃ ৪০।

২৫০. বীরসা মুণ্ডার উপর বৈষ্ণব প্রভাব সম্পর্কে, K. S. Singh, পূর্বোল্লেখিত ; পৃ ৪১।

২৫১. Bengal General Miscellaneous Progs., Aug. 1881, Nos. 5-6 ; Chotonagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1880-81 ; 12 July, 1881 ; Para 192.

২৫২. একই ; Paras 36-37.

প্রতিবেদন

কলকাতার কবিতা-উৎসব

অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা কখনো কম যায় না। ভূপালে অনুষ্ঠিত বহু-প্রচারিত বিরাট কবিসম্মেলনের সমকক্ষ কোনো কাব্যোৎসব না হলেও, এই শহরেই সেই উৎসব উপলক্ষে আহূত তিনজন বিদেশী কবি আর এ-বাঙলার অগ্রগণ্য কবি অরুণ মিত্রকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হল সারাদিনব্যাপী এক কাব্যপাঠের আসর। উদ্যোক্তা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনডিয়ান সেনটার ফর কালচারাল রিলেশনস।

সোমবার, তেইশে জানুয়ারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যখন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মঞ্চের ওপর গাইছে, 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে', তখন বাইরে দাঁড়িয়ে জনৈক অধ্যাপক বলছিলেন যে অ্যালান গিনসবার্গের পরে তেমন আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন সমকালীন বিদেশী কবি কলকাতায় আসেন নি। আর গিনসবার্গের কবিতা-পাঠের আসরে উপচে পড়েছিল ভিড়। গিনসবার্গের মতো ভিড় হয় নি এবার। কিন্তু শ্রোতার উপস্থিতি নেহাত কম ছিল না। আসরের মাঝে দেড় ঘণ্টার দীর্ঘ বিরতি সত্ত্বেও দুই পর্বেই সমসংখ্যক কবিতাপ্রেমী উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তাদের কৃতিত্ব যে তাঁরা প্রায় শতাধিক কবি এবং ততোধিক পত্রপত্রিকা-সম্পাদক, অধ্যাপক এবং কবিতাভক্তের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।

যাদবপুরের ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা সুরুচিপূর্ণ পোস্টারে সাজানো প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান শুরু হল। পৌরোহিত্য করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শঙ্কর সেন। প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি বললেন, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সঙ্গে কলা আর শিল্পের দূরত্ব ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এই দূরত্ব মানুষ এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে বিরাট অন্তরায় হয়ে উঠেছে। হয়তো কবিরাই এই বিপদ থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙালি পাঠকের কাছে বিভিন্ন দেশের কবিতা পৌঁছে দেবার প্রয়াসে যিনি আজ প্রায় বিশ বছর ধরে ব্যাপৃত। উপস্থিত চার কবির মধ্যে অরুণ মিত্রই বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই প্রথমেই আহ্বান জানানো হল তাঁকে। এই বাঙালি কবির কবিতাপাঠ যেন স্বাগত-সম্ভাষণ করল বিদেশী অতিথিদের।

প্রচুর কবিতা পড়লেন এই আশি বছরের তরুণ কবি। তাতেও অবশ্য শ্রোতাদের মন ভরল না। বিদেশী কবিদের জন্য, একটি বাদে, প্রতিটি কবিতার ইংরেজি তর্জমা আবৃত্তি করে শোনালেন অরুণ মিত্র। আর যে কবিতাটি শুধুই বাঙলায় পড়লেন, তাও যেন ভাষার বাধা ডিঙিয়ে পৌঁছে গেল বিদেশীদের মর্মে। তাঁর মৃদু অথচ সংবেদনশীল পাঠ বহুপরিচিত কবিতাগুলিকে—"পোল পার হওয়ার সময়", "আবার", শূন্যতার বিরুদ্ধে", "একসঙ্গে", "নিসর্গের বুকে", "শুধু রাতের শব্দ নয়"—নতুন করে ভালো লাগাল। বিশেষ করে "নিসর্গের বুকে"—যেখানে 'পারার দম্ভ' ধীরে পরিণত হয় 'না পারার হতাশায়'—সমবেত শ্রোতৃবর্গের বোধ আর চিন্তায় আলোড়ন তুলল।

অরুণ মিত্রের কবিতায় আধুনিক মননের দুঃখবোধ আর হতাশার তলায়-তলায় বয়ে চলে অন্তঃসলিলা আশার স্রোত। এইরকম এক অভিজ্ঞার স্পষ্ট উচ্চারণ "শুধু রাতের শব্দ নয়"। 'সন্তান-সন্ততির মুখ / তুমুল জলের উপর ঝুঁকে থাকে, / আমি কি তাদের যন্ত্রণার ছাঁচে দেখি ?' —এই কাতর জিজ্ঞাসার পরেই কবি বলেন, 'তারা আমার মমতায় সংলগ্ন। সেখানে কোনো আশা কখনো মরে না। ···আমি নিশ্চিত শুনি ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন / আমার শেষ সমুদ্রে।'

কবি অরুণ মিত্রের পর কবিতা পাঠ করতে উঠলেন নাইজেরিয়ার কবি গাব্রিয়েল ওকারা। শুরু করার আগে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন তাঁর নিজস্ব কবিতাভাবনার। ঐতিহাসিক বিচারে নাইজেরিয়া ছিল ভারতবর্ষের মতোই ব্রিটিশ উপনিবেশ। দুই দেশেরই ব্রিটিশ শাসকদের মাধ্যমে পশ্চিমের সঙ্গে পরিচয়। এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির সঙ্গে সংঘাতে আপন সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার দীর্ঘ প্রয়াস। পারিপার্শ্বিক কারণে মাতৃভাষার তুলনায় ইংরেজি ভাষার সঙ্গেই ছোটোবেলা থেকে কবির বেশি পরিচয়। তাই তিনি লেখেন ইংরেজিতে। কিন্তু দেশজ সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনকে প্রতিফলিত করে তাঁর ভাষা, যা আর ব্রিটিশের ইংরেজি নয়, সচেতনভাবে গড়ে তোলা নাইজেরিয়ার কালো মানুষের ইংরেজি। কবিতাপাঠের ভূমিকার শেষে তৃতীয় বিশ্বের প্রতিবাদী সাহিত্যের দায়িত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন নাইজেরীয় কবি।

গাব্রিয়েল ওকারার জন্ম ১৯২১-এ। যৌবনে তিনি আমেরিকায় সাংবাদিকতার পাঠ নেন। ষাটের দশকে তিনি নাইজেরীয় গৃহযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে শামিল হয়েছিলেন। পরে নতুন সরকারের হয়ে সংবাদপত্র আর টেলিভিশনে কাজ করেন। ওই দশকেই তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "ব্ল্যাক অরফিউস" কবিতাপ্রেমীদের মধ্যে ঝড় তোলে। কবিতা ছাড়াও তিনি লিখেছেন "দ্য ভয়েস" নামে একটি বিতর্কিত উপন্যাস।

ওকারা বেশ কিছু কবিতা পড়লেন মূল ইংরেজিতে। ওকারার কবিতায় এক ধরনের আপাতসারল্য আছে। অন্যদিকে তাঁর কবিতায় আছে তাঁর দুই সত্তার—আফ্রিকি দেশীয় মানস আর আধুনিক পশ্চিম-অনুকারী শহুরে অভিজ্ঞতার—কখনো সমান্তরাল, কখনো দ্বান্দ্বিক স্রোত। তাঁর "মিস্টিক ড্রাম" কবিতায় মৌল আফ্রিকি চেতনা এসে মিলে যায় আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আর সভ্যতায় দীক্ষিত মননে। এই কবিতাটির সুন্দর অনুবাদ করেছেন মল্লিকা সেনগুপ্ত। ওকারা আরওপ ড়লেন "দ্য এক্সপেনডেবল্ নেম", "দ্য স্পিরিট অব দ্য উইনড", "দ্য ক্রস অন দ্য মূন"। শেষোক্ত কবিতাটি নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সমসাময়িক, যে যুদ্ধে কবি নিজে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রোতৃবর্গের মন কেড়ে নিল তাঁর তীব্র যন্ত্রণাকাতর "ওয়ান্স আপন এ টাইম" কবিতাটি—'তাই আমি অনেক কিছু শিখে গিয়েছি, ছেলে আমার / শিখেছি কেমন ক'রে পরে নিতে হয় অনেক মুখ / পোশাকের কতো··· / কিন্তু বিশ্বাস করো ছেলে আমার। / আমি হতে চাই যেমনটা আমি ছিলাম / যখন আমি ছিলাম তোরই মতো, ·····' (অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অপরাহ্ণপর্বের প্রথম কবি ছিলেন জুডিথ রডরিগেজ। জুডিথ পেশায় অধ্যাপিকা। পড়াতে তিনি ভালোবাসেন, লেখার মতোই। আর শুধু অধ্যাপিকা বা কবি নন, তিনি একজন চিত্রশিল্পীও বটে। কাঠখোদাইয়ের কাজে তিনি সুদক্ষ। তাঁর অনেক কবিতার বই-ই তাঁর নিজস্ব

চিত্রশিল্পে অলঙ্কৃত।

রডরিগেজের কবিতায় তাঁর সুতীক্ষ্ণ আধুনিক মনস্কতার ছাপ স্পষ্ট। তাঁর কবিতা শুনতে-শুনতে বোঝা যায় : এই অনুভূতিপ্রবণ মহিলার নারীমানস কীভাবে কাজ করেছে আপন ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে। পুরুষের প্রতি তাঁর বক্রোক্তি নীচু ব্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ পায় "এপিগ্রাম" কবিতায় : '(যেন এই পুরুষ-কবি মনে করেন তাঁর অনেক বেশি / আগ্রহ পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে) / এই কবি আমার খাতায় সবচেয়ে বেশি নম্বর পাবেন / যৌনতা বা বাণীর জন্য নয়, না পড়ে তুলে রাখার জন্য।' (অনুবাদ : দীপ্তোষ মজুমদার)। "এ ওয়াইট রুম" কবিতায় কবির অন্তরতর কণ্ঠস্বরটি শোনা গেল : 'আমি এখন তোমার কাছে খুব নীচু গলায় কথা বলছি / তোমার মনো-ভঙ্গির ভিতরে কুঁকড়িয়ে ঢুকে / অনুভব ক'রে যা যোগাযোগ ওখানে হ'লো / তা কখনো উলটে যাবে না।' (অনুবাদ : প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)। "ড্রাউনিং" কবিতায় তাঁর কথনের গুণ ও চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য নজর কাড়ে! "এ লাইন অব নোট্‌স্"-এ সঙ্গীতের মধ্যে তিনি ছুঁতে চান তাঁর ছোটো ছেলেকে, একই সুরে বেজে উঠতে চান তার সঙ্গে, অন্যান্য মানুষের সঙ্গেও : 'বড়ো-মাথাওয়ালা অর্ধস্ফুট সুরের হে ভ্রূণ / আমাকে এক সুরে আমার পুত্রের সঙ্গে বেঁধে নাও / আমাদের আলাপ-মহাভোজ বেঁধে নাও,বেঁধে নাও / গোটা অপেরা।' (অনুবাদ : দীপ্তোষ মজুমদার)।

কবিতা-উৎসবের শেষ কবি ছিলেন পঁচাত্তর বছর বয়স্ক নিকানোর পার্‌রা। সাদা কেশরের মতো মাথাভর্তি চুল—এই প্রবীণ কবি পেশায় পদার্থবিদ। নেরুদা-পরবর্তী চিলিতে তিনি প্রথম সারির কবি। পার্‌রার কবিতায় ক্রোধ, ব্যঙ্গ আর হাসির হর্‌রা মিলেমিশে যায়। মানুষের সম্বন্ধে গভীর মমত্ববোধ ঠাট্টার মোড়কেও জানান দেয়। ভাষার দৃঢ়বদ্ধতা আর ধার পার্‌রার কবিতার বৈশিষ্ট্য। তিন বিদেশী কবির মধ্যে তিনিই সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাস-সচেতন ও রাজনীতিমনস্ক।

প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা কবিতা পড়লেন পার্‌রা। কবি অরুণ মিত্রের মতো তিনিও বারবার শ্রোতৃবৃন্দের সাধুবাদে ভূষিত হলেন। পার্‌রা পড়ছিলেন মূল স্প্যানিশ কবিতাগুলি, সঙ্গে পড়া হচ্ছিল ইংরেজি বা বাঙলা অনুবাদ। তিনি শুরু করলেন, "ইনডিভিজুয়াল অ্যানড দ্য সলিলোকি" দিয়ে। অন্যান্য কবিতার মধ্যে ছিল "১৯৩০", "রাইট্‌স্", "স্পট্‌স্ অব দ্য ওয়াল"। "এলিটানি ফর দ্য লিট্‌ল্ বুর্জোয়া" কবিতার ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা চমৎকার ফুটে উঠল জয়দেব বসুর অনুবাদে। "দ্য সারমন্‌স্ অ্যানড প্রিচিংস্ অব দ্য ক্রাইস্ট অব এলকি" কবিতামালার কয়েকটি অংশ জোরালো উচ্চারণে ছিঁড়ে দিল মধ্যবিত্ত মানুষের কপটতার মুখোশ : "দেখি তোমাদের কত সাহস / প্রথমে স্বীকারোক্তি না ক'রে যাও ধর্মীয় ভোজসভায় / দেখি তোমাদের কত সাহস / প্রার্থনার সময় টানো দেখি চুরুট / তোমরা ভীরু-ডরপোকা / দেখি তোমাদের কত সাহস / ছিঁড়ে নাও তো দেখি বাইবেলের একটা পাতা / যখন বাজার থেকে টয়লেট পেপার সব উধাও / দেখি তো দেখি তো তোমাদের কেমন বুকের পাটা / চিলের জাতীয় পতাকায় থুতু দাও তো দেখি' (অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পার্‌রা তাঁর দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব আর কবিতা নিয়ে কলকাতার মানুষের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন।

অনুষ্ঠানের হোতা হিসেবে কবিতাপাঠের শেষে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় প্রশ্নোত্তরের আসর বসিয়েছিলেন এই আশায় যে বিদেশী কবিদের সঙ্গে সমবেত বাঙালি কবি এবং

কাব্য-অনুরাগীদের একটি আদান-প্রদান সম্ভব হয়ে উঠবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তেমন কোনো প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠে এল না শ্রোতাদের মধ্যে থেকে। সারাদিনের রসঘন কবিতাপাঠের পর কবিতা-অ-কবিতা-প্রতিকবিতা নিয়ে শুকনো তাত্ত্বিক কচকচি ক্লান্তিকর মনে হচ্ছিল। সুদক্ষভাবে সেই আলোচনার ইতি টেনে ড. অমিয় দেব বিচক্ষণ শ্রোতার কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন।

'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'—কবি হয়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত বোধহয় গভীরভাবে বাঁচতে পারা। সেদিন মঞ্চে আসীন চারজন কবির কবিতায় এই সত্যই বারবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল যে এঁরা প্রত্যেকে, নিজের নিজের দেশে, কালে, অভিজ্ঞতায় নিজের মতো করে বেঁচেছেন। তাই তাঁদের বার্তা এত সরাসরি স্পর্শ করছিল—ভাষা কিংবা স্থানকালের দূরত্ব পেরিয়েও। আশার কথা, আজকের এই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে কবিতা এখনও মানুষকে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে বেঁধে দেয়, দিতে পারে।

পাঠকদের প্রতি আবেদন

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি প্রকাশন সংক্রান্ত সব জিনিসেরই অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির চাপে বাধ্য হয়ে আগামী মে ১৯৮৯ সংখ্যা (বাঙলা নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা) থেকে "চতুরঙ্গে"র মূল্য প্রতি কপি পাঁচ টাকার পরিবর্তে ছয় টাকা না করলে পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ আমাদের নিরুপায় অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন এবং আগের মতোই তাঁদের সহানুভূতি-লাভে আমরা বঞ্চিত হব না।

চিত্রকলা

বিড়লা অ্যাকাডেমির বার্ষিক চিত্র-প্রদর্শনী—১৯৮৯

সমীর ঘোষ

অ্যাকাডেমির দ্বাবিংশ বার্ষিক প্রদর্শনী গত ৯-২৯ জানুয়ারি ১৯৮৯ অনুষ্ঠিত হল। কর্তৃপক্ষের ঘোষণা-মতো মোট ৬৯৫টি শিল্পকর্মের মধ্যে ১০৪টি ভারত-শৈলী-সহ বিভিন্ন রীতির চিত্রকর্ম, ৩৭টি ছাপের ছবি আর অঙ্কন এবং ২৪টি ভাস্কর্য প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ নির্বাচক ও বিচারকগণের অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতাস্বরূপ যে বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন, তাতে 'প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়াশীল শিল্পী'র অর্থ বোঝা গেলেও 'শিল্প অধ্যাপকে'র তাৎপর্য অস্পষ্টই রয়ে গেল। আরো একটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেছে; তা হল শিল্পকর্ম নির্বাচনের ক্ষেত্রে গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে। ৬৯৫টি কাজের থেকে ১৬৫টি কাজ বাছাই করা অবশ্যই দুরূহ; কিন্তু নির্বাচিত কাজের মিশ্র-মানের মধ্যে থেকে বিচারকগণের দৃষ্টিভঙ্গির কোনো স্বচ্ছ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভারতীয় শৈলী বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছেন অজয় ঘোষ। তথাকথিত বেঙ্গল স্কুলের ধারায় ১৯৮৯ সালেও একই চর্চার সার্থকতা ছবিটি দেখে বোঝা গেল না। "প্রথাসিদ্ধ" বা "ঐতিহ্যবাহী" রীতির পরিচয়ে যে বিভ্রান্তিকর অবস্থা "ভারতীয় শিল্পে" চলেছে, অজয় ঘোষের ছবি তারই করুণ পরিণাম। সে তুলনায় নীলিমা দত্তের "আলেখ্যদর্শন" (৭৩) অনেক বেশি উপভোগ্য ছবি। সাবলীল রেখায় শরীরী রূপারোপে যদিও নন্দলালের প্রভাব আছে, কিন্তু উপস্থাপনায় বাহুল্যবর্জন এবং নির্মাণদক্ষতা অনস্বীকার্য। অশোক ভৌমিক ভারতীয় শিল্পী এবং এই প্রদর্শনীর সকলেই ভারতীয়, অথচ এঁদের ছবির মাধ্যম তেলরঙ বলেই কিংবা ভারতীয় শৈলীর নির্দিষ্ট চিহ্নরেখা না থাকার জন্য এঁরা আপাতত অভারতীয়!

ছবির প্রসঙ্গে আসি। অশোকের "ফ্লোটিঙ মাস্ক্" নামের ছবিতে গল্পকথা বা আখ্যানের মধ্যে আছে তীব্র এক জিজ্ঞাসা। বিষয় প্রাধান্য পেলেও অশোক ভৌমিকের ছবিতে কখনো কৌতুক, কখনো প্রতিবাদী শ্লেষ, আবার কখনো শূন্য আত্মম্ভরিতা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু বিষয়কে তিনি নির্মাণের অসম্ভবতায় বা প্রতীকী প্রকল্পনায় কিছুটা রহস্যে নিয়ে যেতে যান। এক সময়ের ধূসরতায় কীটপতঙ্গসদৃশ মানুষ-মানুষী চরিত্রেরা আস্তে-আস্তে আমাদের চেনা জগতে পা বাড়াচ্ছে। তার সঙ্গে আসছে পার্থিব বস্তু আর তার নিজস্ব রঙ। তবে বর্তমান ছবিটির ভাসমান মুখোশে রঙের স্পষ্ট উজ্জ্বলতা সামনের মানুষীকে কিঞ্চিৎ বিব্রত করেছে। অর্থাৎ সামনের বস্তুপুঞ্জের সঙ্গে ভাসমান বস্তুপুঞ্জের বর্ণের ভারসাম্য না থাকাতে সংঘাতের পরিবর্তে দর্শনের বিভ্রান্তি কিঞ্চিৎ পীড়া-দায়ক হয়ে উঠেছে।

অশোকের পাশাপাশি যে ছবিটি আমাকে ভাবিয়েছে, তা চঞ্চল মুখার্জীর "ফিশারমেন" (১২৯)। কাজটির বৈশিষ্ট্য নানাবিধ। যদিও ভারতীয় সমকালীন চিত্রধারায় এই রূপারোপ কিছুটা ভিন্নধর্মী, তবু শিল্পীর উপস্থাপনদক্ষতায় বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে। ছবির সামগ্রিক চরিত্রচিত্রণে যান্ত্রিক গঠনবিন্যাসের ধারা বর্তমান। দাদা (ড্যাড্যা), সুররিয়ালিস্ট বা পপ চিত্রের গঠন-কাঠামোয় বাস্তবতার সঙ্গে যেমন কল্পচেতনার যান্ত্রিক মিশ্রণ ঘটতে দেখা যায়, এই ছবিও প্রায় সেই ভাবনার অনুগামী। চিত্রনির্মাণের নিপুণতার সঙ্গে আছে উজ্জ্বল নাটকীয়তা। মৎস্যজীবী, জাল বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সকল বস্তুই কঠিন যন্ত্রকঙ্কালে পরিণত। রূপারোপে বিকৃতিকরণের

নাটকীয়তাই প্রয়োগের দক্ষতায় চোখকে আকর্ষণ করে। উজ্জ্বল রঙের দ্যুতিতে সংঘাতের অনিবার্যতা থাকলেও পাশাপাশি ভারতীয় জলহাওয়ার প্রভাবেই হয়তো জলজ গুল্মতন্তুতে ছড়িয়ে আছে প্রাণময় আবেগ।

অলোক ভট্টাচার্যের কাজের রীতি বাস্তবসদৃশ। কিন্তু এবারের কাজে বক্তব্য যত আবেগময়, সে তুলনায় ছবির গঠন যেন দ্বিধাচ্ছন্ন। "দি বার্থ সেনটিনারি" (২২)-এ আখ্যানের আবেগময়তা ক্যানভাসের চতুঃসীমায় অবস্থিত পাত্রপাত্রীর আধিক্য এবং উপস্থাপনে যথাযথ ছন্দ না-থাকায় কেমন যেন অসংলগ্নতাদোষে দুষ্ট মনে হয়। রূপায়ণে সাদৃশ্য এবং ইঙ্গিতের মধ্যে ভারসাম্য না-থাকায় দুর্বল আবেগই একমাত্র মুখর হয়ে ওঠে, এবং ছবির গঠনছন্দকে ব্যাহত করে; অর্থাৎ ছবির বিষয়ের সঙ্গে নির্মাণপরিকল্পনায় ধরা আর ছাড়ার মধ্যে ভাবনার সাযুজ্য না-থাকায় সবই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে।

পুষ্পেন্দু দাঁর "ল্যানডস্কেপ" (১) এবং (২) নামের দুটি টেম্পারার কাজে প্রকৃতিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিল্পী শুধু প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্যকেই দেখেন নি—নতুন ভাবনায় প্রকৃতিকে নকশার মধ্যে আরোপিত করেছেন। ফভিস্টদের উজ্জ্বলবর্ণ এবং শিশুর সারল্যে প্রকৃতির গঠনবিন্যাসের ছন্দকে সুনিয়ন্ত্রিত জ্যামিতিতে ভেঙেছেন। রেখা আর রঙ ছবির জমিতে যে ছন্দ সৃষ্টি করছে, তা সদৃশাত্মক না হয়েও পরিচয়ের আভাসবাহী।

প্রবীর গুপ্তের "বাফেলো" (৯৫) ছবিতেও বস্তু-রূপকে ছন্দময় জ্যামিতিক গঠনে বাঁধার লক্ষণ স্পষ্ট। পটের সীমাকে বর্ণের সংঘাতময়, টুকরো-টুকরো আকারের সমন্বয়ে বাঁধার ফলে সাদৃশ্যের পরিবর্তে এসেছে বিমূর্ত দ্যোতনা আর গতিময়তা। আসলে, এ ধরনের ছবির প্রধান গুণ সদৃশাত্মক বিষয় নিয়েও শিল্পী চিত্রপটে রেখা-রঙের বাঘ-বন্দী খেলা খেলতে পারেন। অবশ্য অমিতব্যয়ী খেলায় পতনের সম্ভাবনাও খুবই বেশি।

ওয়াশিম কাপুরের ছবি "হেল্প" (১০৩) বক্তব্য-প্রধান এবং উপস্থাপনার ভঙ্গিও খুব স্থূল। প্রশান্ত কোলের জলরঙ "নেচার" (১০৫) ছবিতে প্রকৃতির জটিল ঘেরাটোপে আলো-আঁধারির খেলা নয়নশোভন হলেও বড়ো বেশি গণেশ হালুইয়ের ছায়াবৃত্তে বন্দী। অথচ গণেশ হালুইয়ের অভিজ্ঞতা এবং সংযমী প্রজ্ঞা এঁর ছবিতে মেলে না। ছবির গঠনভাবনার পরিবর্তে শুধুই রঙের উপরিতল মাদকতায় আচ্ছন্ন। বিশ্বপতি মাইতির "ক্লু" (III) নামের টেম্পারার কাজে বেড়ালের রূপারোপে বিষয়ের সারল্যের সঙ্গে মিশেছে নির্মাণের জটিল অলংকরণ। নানা বুটিদার নকশায় বুনোটের নিয়ন্ত্রিত খেলায় এক কৌতূহলী আমেজ সৃষ্টি করেছে। আবার এই আরোপিত বুনোটের পারস্পরিক আকর্ষণ ও সংঘাতে তৈরি হয়েছে মৃদু গতি যা বিষয়ের সারল্যকে অন্যমাত্রা দিয়েছে।

ছাপের ছবির মধ্যে পুরস্কারপ্রাপ্ত কাজ সলিল সাহানীর "টেরিফায়েড" (V) নামের লিথোগ্রাফ। শুধুমাত্র কালো রঙের ব্যবহারে একটি বসা-ভঙ্গির হনুমান এঁকেছেন তিনি। বিষয় বা উপস্থাপনে চমক নেই, কিন্তু তুলির সাপট টানে সাদৃশ্যের মৌলিক গঠন যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা সংযমী সারল্যের উদাহরণ। তবে লিথোচকের পরিবর্তে লিথোকালি ব্যবহারে পটচিত্রের প্রচ্ছন্ন ছায়াপাত ঘটলেও লিথো-পাথরের অনুভূতিশীল ত্বকের সূক্ষ্ম দানার মজা এখানে অনুপস্থিত।

তপন মিত্রের সেরিগ্রাফে মাধ্যম ব্যবহারের কৌশলদক্ষতার সঙ্গে মিশেছে বিষয়ের গাম্ভীর্য। পটের আড়াআড়ি ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম স্তরবিন্যাসের মধ্যে বাঁদিকে শূন্য কেদারা এবং ডানদিকের উপর সংলগ্ন রেখায় বৃত্তের ভারসাম্য আখ্যানের পাশাপাশি গঠনবিন্যাসেও সার্থক।

স্বপন দাসের "লকআউট" (৬৪) এচিংটির বিষয়-

মাহাত্ম্য অপেক্ষা করণ-কৌশলের সাযুজ্যে উপস্থাপনার জ্যামিতিক নির্মাণ আকর্ষণ করে। বর্ণের বুনোটে রেখার সুচতুর ব্যবহারে বিষয় সহজেই আকারের ছন্দময়তায় মিশে গেছে। চন্দন দাসের "ওপন টারগেট" (৫৬) নামের এচিংএর করণ-দক্ষতা, গঠনের সারল্য কিন্তু বিষয়ের কারণেই কিঞ্চিৎ আবেগশূন্য, আরোপিত মনে হয়।

বেলা পুরোহিতের একটি ড্রইঙ (১৪৩) উল্লেখ-যোগ্য। কলাভবনে লোডশেডিঙের অন্ধকার এবং এই পরিবেশে কোনো এক ছাত্রের উদাত্ত-গানের যে অদৃশ্য আবহ, তাকেই বেলা চাপ-চাপ কালো রঙে এঁকেছেন। নামকরণের সঙ্গে আকারের সাদৃশ্য খোঁজা অবশ্যই বিড়ম্বনার। কারণ যে অনুভবের ক্ষণিক তাড়নায় শিল্পী আপ্লুত, চিত্রপটে তা গঠনের ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা অসম্ভব। ফলে সাদৃশ্যসূচক ইঙ্গিতের অভাব অনেক ক্ষেত্রেই দর্শকের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। তবু শিল্পী আবেগের সততার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েও এর গড়নের জ্যামিতিক বলিষ্ঠতা আমাদের মুগ্ধ করবে।

ভাস্কর্য বিভাগের কাজে বৈচিত্র্যহীনতা সত্যি পীড়াদায়ক। ভাস্কর্যের মাধ্যমের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অথচ মৌলিক 'রূপবন্ধ' সম্বন্ধে অন্বেষার অভাব, ভাবনার পরিবর্তে চটকদার স্থূল পুতুল-প্রতিমার ক্রম-বর্ধমান প্রসারে ভাস্কর্যের বেধ এবং আয়তনিক গাম্ভীর্য লুপ্ত হতে চলেছে। ফলে মাধ্যমে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের চেয়েও নানা মিশ্র-মাধ্যমের সংযুক্তিতে ভাস্কর্য হয়ে উঠেছে দৃষ্টিসুখের পিণ্ডরূপ মাত্র।

বিমল কুণ্ডর পুরস্কারপ্রাপ্ত "স্টিল-লাইফ" নামের ভাস্কর্যটি গঠনকৌশলে উল্লেখযোগ্য। মূল ত্রিভুজাকৃতি কাঠের ঘনত্বকে বিভিন্ন কৌণিক রেখায় ও মধ্যবর্তী অংশে তলবিন্যাসে আলোছায়ার সংঘাতময়তা এবং কাঠের মসৃণ শরীরের পরিবর্তে দানাদার বুননে মনোহর আবহ সৃষ্টি করেছে। আর উপরি সমতল রেখার একঘেয়েমিকে ভেঙেছে একটি পাখি।

তারক গড়াইয়ের "ফনডনেস I" (৮১) নামের কাঠখোদাই ভাস্কর্যে আফ্রিকার আদিম ঐতিহ্যের রূপকল্প আধুনিক রূপারোপে নব্য-গড়ন-সম্পন্ন। লোকশিল্পের সরল গঠনবৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি আধুনিক বিকৃতিকরণের যে জ্যামিতিক বিভঙ্গ, তা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বহু খ্যাত-অখ্যাত শিল্পীকেই প্রভাবিত করেছে। তবে এক্ষেত্রে রূপের বাহ্যিক গড়নকে মোহ-মুগ্ধের মতো অনুকরণ না করে অন্তঃস্বরূপকে আধুনিক ভাবকল্পনায় প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তারক গড়াইয়ের কাজে আয়তন আর ভার—দুইই উপস্থিত।

গোপালপ্রসাদ মণ্ডলের "অঙ্কুর" পাথর-খোদাই —এক ওজনদার কাজ। কিন্তু মাধ্যমের ভারের পাশাপাশি খোদাইয়ের বিমূর্ত রূপারোপ এতই চাপা যে অবতলের রেখার বিন্যাস আলোয় ঠিক ধরা পড়ে না।

শ্যামল রায়ের টেরাকোটার কাজে পানিক্কর এবং রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের মিশ্র প্রভাব এখনও বর্তমান। দৃষ্টিনন্দন করার জন্য রঙের ব্যবহার ভিন্ন মাত্রা যোগ করে না, বরং সুলভ খেলনা মনে হয়। অথচ শ্যামলের কাজের এমন কিছু গুণ আছে, যা ভাস্কর্যের প্রকৃত নির্মাণভাবনার সঙ্গে মিশে ভিন্নমাত্রা যোগাতে সক্ষম। এই গুণ হল একদিকে আধুনিক রূপারোপের ভারসাম্য-বোধ এবং সূক্ষ্ম সংবেদনশীল কারুকৃতি।

বিড়লা অ্যাকাডেমির বার্ষিক প্রদর্শনীতে পশ্চিম-বঙ্গের প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন চিত্রী এবং ভাস্করের কাজ ছিল সম্ভবত আমন্ত্রিত। এঁরা ধারাবাহিক সৃজনে আজ যেখানে উপস্থিত হয়েছেন সে ক্ষেত্রে এঁদের কাজের সামগ্রিক প্রেক্ষার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন নির্মাণ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রায় অর্থহীন। এই প্রদর্শনীর ভালো-মন্দ নানা বিতর্কে মতান্তর থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের সমসাময়িক চিত্রচর্চার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আংশিক পরিচয়ও অন্তত মেলে। সে পাওয়াই বা কম কিসে।

"সাবালটার্ন" ইতিহাসচর্চা

সুজাতা মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য প্রবন্ধসংকলনটির যুগ্ম সম্পাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভক 'সম্পাদকীয়' অংশে লিখেছেন—ঔপনিবেশিক ভারতে "সাবালটার্ন" শ্রেণীর সংগ্রামের বিভিন্ন দিককে পাঠকের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তাঁরা এ পর্যন্ত প্রকাশিত পাঁচ খণ্ডের "সাবালটার্ন স্টাডিজ" গ্রন্থাবলী থেকে প্রবন্ধগুলিকে বাছাই করে নিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে, "সাবালটার্ন" ধারণার মূল উৎস ইতালির কমিউনিস্ট নেতা তথা মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিক আন্তোনিয়ো গ্রামশ্চির লেখা। বস্তুত, গ্রামশ্চি তাঁর বিখ্যাত "প্রিজন নোটবুক"-এ 'সুবলতের্নো' শব্দটি ব্যবহার করেছেন দ্বিবিধ অর্থে: ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 'সুবলতের্নো' বলতে শ্রমিকশ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। তবে ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, সামাজিক ইতিহাসের অন্যান্য পর্বে, "সাবালটার্ন"-এর প্রয়োগ করেছেন সামাজিক প্রভুত্বের অধিকারী ডমিন্যান্ট্ শ্রেণীর বিপরীতে অবস্থিত অধীন শ্রেণী অর্থে। এই বৃহত্তর অর্থেই সম্প্রতি ভারতের ঔপনিবেশিক পর্বের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে "সাবালটার্ন" শ্রেণীর ধারণাকে নতুনভাবে প্রয়োগ করেছেন সংকলিত প্রবন্ধগ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক তথা প্রবন্ধকার অধ্যাপক রণজিৎ গুহ এবং সমভাবাপন্ন অন্যান্য গবেষকরা।

রণজিৎ গুহ তাঁর "On Some Aspects of the Historiography of Colonial India." প্রবন্ধে সাবালটার্ন ঐতিহাসিকদের অনুসৃত বিশ্লেষণপদ্ধতির নতুনত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতের ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতিতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুটি জগতের অস্তিত্ব বরাবর বজায় ছিল—একটি "এলিট" বা উচ্চবর্গের জগৎ, অপরটি সম্পূর্ণ বিপরীত চেতনার বিন্দুতে অবস্থিত নিম্নবর্গের জনগণের জগৎ। এর অস্তিত্ব প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগেও ছিল। এই দুটি জগতের সম্পর্ক ছিল পরস্পরবিরোধী, এবং জনগণ বা নিম্নবর্গের রাজনৈতিক আদর্শের মূলকথা ছিল উচ্চবর্গের প্রভুত্বের (ডমিনেশন) বিরোধিতা করা। ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনীতিতে এই দুটি জগতের স্বতন্ত্র সহাবস্থান ছিল ঠিকই, তবে কোনো-কোনো সময়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে দুই জগৎ যুক্ত হয়েছে। উচ্চবর্গের নেতারা যখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন পরিত্যাগ করে আপোসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তখনই এই যুগ্ম প্রয়াস ভেঙে গিয়েছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দোলনের উপর নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনার ছাপ পড়েছে, এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন জনতার স্বতঃস্ফূর্ত চেতনার চাপে বিস্ফোরক আকার ধারণ করেছে। এই সাবালটার্ন বা নিম্নবর্গের জনতার স্বতন্ত্র রাজনীতির জগতের অনুসন্ধান, তার বিভিন্ন মাত্রার বিশ্লেষণই সাবালটার্ন ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়।

তাঁর অপর প্রবন্ধ, "Prose of Counter Insurgency"-তে রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ভারতের কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাস রচনার এ পর্যন্ত প্রচলিত ধারাগুলির বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের রচনায় শুধু নয়, বর্তমানের র‍্যাডিকাল গবেষকদের লেখাতেও কৃষকচেতনার বিভিন্ন মাত্রাগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয় না। যেমন, ধর্মবিশ্বাস কিভাবে কৃষকদের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সামগ্রিকভাবে, নিম্নবর্গের চেতনার নিজস্ব জগৎ—তাদের ধর্মবোধ বা সাংস্কৃতিক জীবন, আঞ্চলিকতাবোধ কিভাবে তাদের বিদ্রোহী মানসকে গতিপ্রকৃতি দিয়েছে, অথবা সীমাবদ্ধতায় আক্রান্ত করেছে, তা বিশ্লেষণ না করলে ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসকে যথাযথভাবে আবিষ্কার করা যায় না। প্রচলিত ইতিহাসচর্চার এই সীমাবদ্ধতাকে দূর করার প্রয়াসে যত্নবান হয়েছেন "Selected Subaltern Studies"-এর প্রবন্ধকারগণ।

'সাবালটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত, জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে লিখিত দুটি প্রবন্ধ এখানে স্থান

'Selected Subaltern Studies'
Eds, Gayatri Chakraborty Spivak and Ranajit Guha. Oxford University Press.
Rs. 95,

পেয়েছে। "Peasant Revolt and Indian Nationalism" প্রবন্ধে তিনি উত্তর প্রদেশে কৃষকদের মধ্যে থেকে বিকশিত কিষাণসভার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেস রাজনীতির সম্পর্কের বিশ্লেষণ করে ঔপনিবেশিক এবং জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের নির্ধারিত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ব্যবহৃত উপাদানগুলিরই পুনর্মূল্যায়ন করে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে কংগ্রেস রাজনীতি তালুকদার আর জমিদার তথা উচ্চবর্গের স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কৃষক-সংগ্রামের স্বতন্ত্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়েছে। মাজিদ সিদ্দিকি প্রমুখ ঐতিহাসিক কর্তৃক বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনের খাতিরে কংগ্রেসের কৃষক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণের ভূমিকার মূল্যায়ন জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে খণ্ডন করেছেন। উনিশ-শো বিশের দশকে অযোধ্যার কৃষকের মনে গান্ধীজী এবং স্বরাজ সম্পর্কিত যে ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল, তা জাতীয় কংগ্রেসের পাশ্চাত্য-শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত চেতনার থেকে স্বতন্ত্র বিন্দুতে অবস্থিত ছিল—এই মন্তব্য করলেও লেখক তা তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণের মধ্যে যান নি।

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডের অপর মূল্যবান প্রবন্ধ "Encounters and Calamities : The History of a North Indian Qasba in the Nineteenth Century"। এখানে তিনি পূর্ব উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার অন্তর্ভুক্ত মুবারকপুর বলে ছোটো একটি শহরের ইতিহাস তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তিন ধরনের উপাদানের সাহায্য নিয়েছেন—সরকারি কাগজপত্রের বিবরণ, স্থানীয় উচ্চবর্গের লিখিত বিবরণী, আর নিম্নবর্গের প্রতিনিধি একজন মুসলমান তাঁতির দিনপঞ্জী। অষ্টাদশ শতকে এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে মুবারকপুর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্র-উৎপাদনকেন্দ্র। জনগণের একটি বড়ো অংশ ছিল মুসলমান তন্তুবায় সম্প্রদায়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শক্তির ক্রমবিস্তার এবং বাণিজ্যিক প্রাধান্য ব্যাপ্ত হওয়ার প্রভাব মুবারকপুরের জনসাধারণের জীবনযাত্রাকে নিঃসন্দেহে ব্যাহত করেছিল। নিম্নবর্গের জনগণের চেতনায় কিভাবে এই যুগপরিবর্তন ধরা দিয়েছিল, তার ইতিহাসকে যতদূর সম্ভব পুনর্গঠন করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। জনগণের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই নতুন ধরনের উপাদান সংগ্রহ আর ব্যবহার করেই সরকারি কাগজপত্রের উপর ভিত্তি করে রচিত ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবী সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় "উচ্চবর্গে"র ইতিহাসচর্চায় অবহেলিত অথবা সামান্য-স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চারজন বিদ্রোহীর ভূমিকার পর্যালোচনা করেছেন গৌতম ভদ্র তাঁর প্রবন্ধে (Four Rebels of Eighteen Fifty-Seven)। এঁদের পরিচয়—ক্ষুদ্র জমিদার, সম্পন্ন চাষী, দরিদ্র আদিবাসী আর মৌলভী। গবেষকের মতে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহে যারা যোগ দিয়েছিল, এরা সেই অগণিত সাধারণ বিদ্রোহীদের প্রতিনিধিস্বরূপ। এরা বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের সূচনায় ও সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এদের ভূমিকা পর্যালোচনা করে নিম্নবর্গের বিদ্রোহী মানসের বিভিন্নতা বোঝা সম্ভব। এদের সংকল্পের দৃঢ়তাই বিদ্রোহকে আপসবিমুখ এবং তীব্র করে তুলেছিল, আবার একই সঙ্গে প্রাত্যহিকতা এবং আঞ্চলিক চেতনার ঊর্ধ্বে বৃহত্তর বোধে উত্তরণের ব্যর্থতা বিদ্রোহের ব্যাপ্তি এবং সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ এবং দুর্বল করে ফেলেছিল। অবশ্য এদের সবাইকে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি আখ্যা দিলে "সাবালটার্ন" শ্রেণীর সামাজিক স্তরবিন্যাসকে অনেক ব্যাপক বলে ধরতে হয়।

দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধে (Conditions for Knowledge of Working Class Conditions : Employees, Government and the Jute Workers of Calcutta, 1890-1940') আলোচনা করেছেন সরকারি বিবরণে কেন চটকল শ্রমিকদের জীবনযাপনের ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। তাঁর মতে, এর সঙ্গে পাটশিল্পের অনগ্রসর প্রযুক্তির সংযোগ রয়েছে, যার ফলে শিল্পপতিরা শ্রমিকশ্রেণীর কার্যক্ষমতা এবং শৃঙ্খলাবৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান ছিল না। ফলে, তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয় নি। চটকলের অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর উপর 'সর্দার'-এর সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের ফলে—যা শিল্পপতির স্বার্থরক্ষার খাতিরে বজায় রাখা হত এবং যার কর্তৃত্ব প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্বের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত—লিখিত বিবরণীতে বহুসময় সত্যের অপলাপ করা হত। প্রাবন্ধিকের মতে, সর্দারি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হওয়ার মূলে ছিল প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক জীবনের সামাজিক মূল্যবোধ—যার ধারক আর বাহক ছিল সর্দার স্বয়ং এবং শ্রমিকশ্রেণীও।

ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিকতাবিরোধী জাতীয় সংগ্রামে

গান্ধীজীর ভূমিকাকে নতুন আলোয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে শহিদ আমিনের "Gandhi as Mahatma" প্রবন্ধটিতে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে গান্ধীর অগণিত সাধারণ অনুগামীর মনে গান্ধীসম্পর্কিত নানা ধরনের গুজব গান্ধীজীর কী ধরনের প্রতিচ্ছবি তৈরি করে কিভাবে তাদের নিজস্ব সংগ্রামের পন্থা নির্দেশ করেছিল, তার অসাধারণ বিশ্লেষণ রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তিনি দেখিয়েছেন যে গান্ধী বা তাঁর বাণী সম্পর্কে জনমানসে প্রতিফলিত ধ্যানধারণার সঙ্গে কংগ্রেস দলের মধ্যবিত্ত নেতৃবৃন্দের প্রচারিত গান্ধীর ভূমিকার মূল্যায়নের এবং এমনকী গান্ধীবাদের মূল আদর্শগুলির সঙ্গেও অনেক সময় যে অমিল ছিল শুধু তাই নয়, পরস্পরবিরোধিতাও ছিল।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি ("More on Modes of Power and the Peasantry) তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে লেখক উৎপাদনপদ্ধতি ও ক্ষমতাকাঠামোর সম্পর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং এক উৎপাদনপদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতিতে ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষমতাকাঠামোর পরিবর্তন, কৃষকের অবস্থান প্রভৃতির বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথাসিদ্ধ মার্কসবাদীরা প্রবন্ধের শেষাংশে এসে বিচলিত বোধ করতে পারেন।

সংকলনের শেষ প্রবন্ধটি ডেভিড আর্নল্ড-এর লিখিত Touching the Body : Perspectives on the Indian Plague। ১৮৯০-এর দশকে প্লেগ ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর মহামারীর আকারে দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার সে সময় প্লেগ দমন করতে যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। সরকারের তরফে রোগের চিকিৎসার প্রয়োজনে জোর করে রোগীর শরীরের উপর অধিকার প্রয়োগ, হাসপাতালে রোগীকে স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় হয় নি; অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিবাদ দাঙ্গার আকার পর্যন্ত নিয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে মধ্যবিত্তদের প্রতিক্রিয়ার কথা যত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, শুধুমাত্র 'সাবালটার্ন' শ্রেণীর নিজস্ব পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি এবং চেতনার আলোচনা তত গুরুত্ব পায় নি।

'সাবালটার্ন' ইতিহাসচর্চা বিকল্প ইতিহাস রচনার ধারাকে—যাকে 'history from below' বলা হয়—এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পাশ্চাত্যে এই ধরনের ইতিহাসচর্চা অবশ্য অনেক আগেই শুরু হয়েছে। কার্ল মার্কস থেকে শুরু করে গ্রামশ্চি, অন্যদিকে সর্বাধুনিক ইওরোপের স্ট্রাকচারালিস্ট ও পোস্ট-স্ট্রাকচারলিস্ট চিন্তাবিদ রোলাঁ বার্থ, ডেরিডা, ফুকো, লুই আলথুসার এবং ঐতিহাসিক ই.পি. থমসন, এরিক হবস্‌বম প্রমুখ সকলের চিন্তাশৈলীর প্রভাব সাবালটার্ন ইতিহাসচর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে দিয়ে দু ধরনের উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা হয়েছে—একদিকে এ পর্যন্ত প্রচলিত ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন ধ্যানধারণাকে আক্রমণ করে অসার প্রমাণ করা, অন্যদিকে নিম্নবর্গের সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ এবং রাজনীতিক সচেতনতাকে তুলে ধরা। এই দুটি কাজই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ভাবে ভারতের প্রচলিত ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক জগৎকে ধরতে হলে উচ্চবর্গের রাজনীতির জগৎ থেকে একে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে নিলে আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না, যেহেতু দুটি জগৎ অনেক সময় পরস্পরসম্পৃক্ত থেকে পরস্পরকে কিভাবে প্রভাবিত করে, তাও জানা দরকার।

আধুনিক ভাষাতত্ত্বের একটি সামগ্রিক আলোচনা

মৃণাল নাথ

বাংলা ভাষার ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক বই-এর সংখ্যা খুবই নগণ্য যদিও একথা আমরা জানি যে এই ভাষায় ভাষাচর্চা শুরু হয় আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে। ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রথম বই আমরা পাই শ্রীনাথ সেনের কাছ থেকে ১৯০০ সালে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণই (১৯০৯ প্রমাণ করে তার জনপ্রিয়তা। এই বই-এর দ্বিতীয় খণ্ড বেরোয় ১৯১০ সালে। বইটির নাম 'ভাষাতত্ত্ব' হলেও, ভাষাচর্চায় যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তার খুবই অভাব অনুভূত হয় বইটিতে। অথচ তাঁরও বহু পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ। বাংলা একাডেমী—ঢাকা। একশত পঁচাত্তর টাকা॥

ভাষাবিষয়ক বিভিন্ন রচনায় আমরা এক অসামান্য বিজ্ঞান-মনস্কতা দেখি। হেমন্তকুমার সরকার ১৯১৬ সালে যে বইটি ('ভাষাতত্ত্ব ও বাংলা ভাষার ইতিহাস') লেখেন তা শ্রীনাথ সেনের বই-এর সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচারে অনেক বেশি মূল্যবান। তিনি ভাষাচর্চার বিভিন্ন দিক আলোচনাই করেন নি তাঁর পুস্তকে, বাংলা বাক্যতত্ত্ব বিষয়ে অতি সংক্ষেপে তিনি প্রথমবারের মতো আলোকপাত করেন, ঐতিহাসিক বাগর্থ-বিষয়ক (semantics) আলোচনাও ছিল সে পুস্তকে। এর পর ভাষাতত্ত্বের পুস্তকের ক্ষেত্রে রীতিমতো এক ধূসর যুগ গেছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ভাষাবিষয়ক বিস্তর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও, ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক কোনো পুস্তক আমরা পাইনি যতদিন না অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর শীর্ণকায় 'ভাষার ইতিবৃত্ত' আমাদের উপহার দিলেন ১৯৩৯ সালে। এর পরেও বাজারে ভাষাতত্ত্ব-নামধারী বহু বই বেরিয়েছে, তার অধিকাংশই নোটবই, অথবা বিষয়ের আলোচনায় অনধিকারচর্চা অথবা অশিক্ষিতপটুত্ব। পুস্তকাকারে ভাষাতত্ত্বের পদ্ধতিগত আলোচনা প্রথম পেশ করেন বাংলাদেশ থেকে রফিকুল ইসলাম, তাঁর বই 'ভাষাতত্ত্ব' (১৯৭০)। বইটির আলোচনার পরিধি অত্যন্ত সীমিত হলেও, আধুনিক ভাষাতত্ত্বের কিছু কিছু ক্ষেত্র নিয়ে যে আলোচনা তিনি করেছেন, ইংরেজি-উদ্ধৃতিবাহুল্য সত্ত্বেও, তা মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে রামেশ্বর শ'হ্-র 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৯৮৪) বইটিও উল্লেখের দাবি রাখতে পারে। বস্তুত, ভাষাতত্ত্বের এই চূড়ান্ত বিজয়ের যুগে, ভাষাতত্ত্বের যাবতীয় বিষয়কে যখন নোতুন করে দেখা হচ্ছে, তাকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে নোতুন তত্ত্বের আলোকে, তখন আমাদের কাছে এমন কোনো বই ছিল না যার দ্বারা এই আধুনিক ভাষা-তত্ত্বকে আমরা চিনতে পারি, জানতে পারি। এমন বইও হাতের কাছে ছিল না যার দ্বারা সাধারণ পাঠক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে পারেন, ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হতে পারেন। এমন সময়েই আমরা হাতে পেলুম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' নামে বইটি। তিনি অবশ্য এর আগেও ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক আরেকটি বই দিয়েছিলেন, 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব (১৯৭৫) নামক, তা ছিল কেবলমাত্র ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

অধ্যাপক মোরশেদের ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক বইটি আয়তনে বৃহৎ—পৃষ্ঠাসংখ্যার হিশেবে ৬০০-রও অধিক। বাংলায় ভাষাতত্ত্বের আলোচনার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্য সংযোজন। একথা বলার কারণও আছে। এতকাল অবধি আমরা জানতুম যে ভাষাতত্ত্বের বই মানেই ভাষা-সম্পর্কিত কিঞ্চিৎ আলোচনা, কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং উদাহরণ, কিছু ধ্বনিসূত্রের বর্ণনা (তা-ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে, যেমন বর্গের প্রথম বর্ণের স্থানে তৃতীয় বর্ণ হয়, ইত্যাদি), ঐতিহাসিক বাগর্থের অন্তর্গত কিছু শব্দের অর্থগত বিশ্লেষণ, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বর্ণনা এবং বাংলা ভাষার ইতিহাস আলোচনা। ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দিক তাতে একেবারেই উপেক্ষিত, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কথা তাতে বলা হলেও, কী করে তা 'পুনর্গঠন' (reconstruction) করতে হয়, তা বলা নেই; সাদৃশ্যের (analogy) আলোচনা থাকলেও পণ্ডিতজনেরা এ সম্পর্কে যে সমস্ত সূত্র আবিষ্কার করেছেন তা একেবারেই অনুপস্থিত, বাগর্থতত্ত্বের mechanism সম্বন্ধেও পুস্তক-প্রণেতারা নীরব। এ সম্পর্কে ভাষাবিদেরা যে সমস্ত আলোচনা করেছেন তা অনুপলব্ধ। অর্থাৎ তাঁদের বই-এর নাম ভাষাতত্ত্ব হলেও, তা মূলত শব্দশাস্ত্র (philology)-ঘটিত। অধ্যাপক মোরশেদই সম্ভবত প্রথম যিনি তাত্ত্বিক দিকের অভাব বোধ করেন, এবং ভাষাতত্ত্বের একটি সার্বিক তথা সামগ্রিক আলোচনা পাঠকজনসমক্ষে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে হাজির করেন।

আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বলতে যা বুঝে থাকি তা দুই মলাটের মধ্যে কোনো একজনের পক্ষে ধরা এক অসাধ্যসাধন কাজ। ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা এবং সহোদর বিদ্যার সম্যক্ দখল তাতে অপরিহার্য। অধ্যাপক মোরশেদ তাঁর পুস্তকে ভাষাতত্ত্বের সমস্ত শাখার বা স্তরের বিবরণ দিয়েছেন, সহোদর প্রায় সমস্ত বিদ্যার পরিচয় দিয়েছেন সংক্ষেপে। তিনি ভাষা কাকে বলে তার বিস্তৃত আলোচনা সেরে, ভাষাতত্ত্ব বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। ভাষার বিভিন্ন স্তরের (যেমন ধ্বনিতত্ত্ব, রূপমূলতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং বাগর্থতত্ত্ব) পরিচয় দিয়েছেন, এবং অতি সংক্ষেপে নৃতত্ত্বার ভাষাতত্ত্ব (anthropological linguistics) সমাজ-ভাষাতত্ত্ব (sociolinguistics), মনস্তত্ত্বীয় ভাষাতত্ত্ব (psychological linguistics) গাণিতিক ভাষাতত্ত্ব (mathematical linguistics ইত্যাদির বিবরণ রেখেছেন।

তাঁর বইটি ভূমিকা নিয়ে মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

এই নয়টি অধ্যায়ে তিনি ভাষাতত্ত্বে যে সমস্ত প্রধান এলাকা পর্যালোচনা করেছেন তা হল ঐতিহাসিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব-রূপান্তর ভাষাতত্ত্ব, (এবং বাগর্থবিদ্যা), এবং ভাষাচর্চার ইতিহাস। আমার মতে বইটির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে ঐতিহাসিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এলাকা (পৃষ্ঠা ১৬ থেকে ২২৪), যদিও তা চারটে পৃথক অধ্যায়ে বিভক্ত যথাক্রমে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (পৃষ্ঠা ১৬ থেকে ৭৩), ভাষার শ্রেণী-বিন্যাস (পৃষ্ঠা ৭৪ থেকে ১৩১), উপভাষাতত্ত্ব (পৃষ্ঠা ১৩২ থেকে ২০৮) এবং লিখনরীতি (পৃষ্ঠা ১৮৯-২২৪)। পৃষ্ঠা-সংখ্যা থেকেই বোঝা যাবে প্রতিটি বিষয়ের প্রতিই তিনি অত্যন্ত সুবিচার করে আলোচনা বেশ দীর্ঘ করেছেন। যদিও আলোচনার দৈর্ঘ্য বিচারের মাপকাঠি নয়, একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, তা তন্নিষ্ঠ এবং তথ্যসমৃদ্ধ। এবং অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জিত। যদি এ সব বিষয়ই তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের আওতায় আসে, তবে পৃথক অধ্যায়-বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা কী ছিল সে প্রশ্ন উঠতে পারে। বর্তমানে তুলনামূলক-ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের এলাকা যেমন বিস্তৃত-সম্প্রসারিত-পরিবর্তিত হচ্ছে, বিভিন্ন ধারণার বদল ঘটেছে, তেমনি কিছু কিছু তার আওতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিশেবে মর্যাদা পাচ্ছে, যেমন উপভাষাতত্ত্ব, ভাষার শ্রেণীবিন্যাস (language typology), লিখনরীতি (grammatology)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই এম. ফিল. পর্যায়ে ভাষাতত্ত্বের একটি পত্র উপভাষাতত্ত্ব। উপভাষাতত্ত্ব আজ এমন উন্নত পর্যায়ে উঠেছে যে তা একটি স্বতন্ত্র শাখার দাবি করে। এখন উপভাষাতত্ত্ব কেবল গ্রামীণ উপভাষার পর্যবেক্ষণেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, শাহরিক উপভাষাতত্ত্ব সেখানে সমান দাবিতে নিজের আসন করে নিয়েছে। এবং তিনি তাঁর অধ্যায়-বিভাজন এমনভাবে করে সমস্ত বিষয়গুলির প্রতি সুবিচারই করেছেন। প্রতিটি অধ্যায়ই এমনভাবে লিখিত যে কোনো একটি ইংরেজি ভাষাতত্ত্বের বই-এ এমন সুন্দর এবং সাবলীল আলোচনা মিলবে না। তিনি তুলনামূলক ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব অধ্যায়ে, এর অন্তর্গত যাবতীয় বিষয়কে ধরেছেন, আরেকটি বিষয় অন্তর্গত হলে একটু ভালো হত—তা হল ধ্বনিপরিবর্তনের সামাজিক প্রেষণা (social motivation of sound change) এবং শাব্দিক ব্যাপন (lexical diffusion)। প্রথম বিষয়টি যেমন সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত, তেমনি ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বেরও। পরবর্তীটি নব্য ব্যাকরণবিদ্‌দের মূল ধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়—'সব ধ্বনি যান্ত্রিকভাবে একই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়' একথার বিরোধিতা করে এখন পণ্ডিতেরা বলেন ধ্বনি-পরিবর্তন ধীর-দ্রুত-দ্রুত-ধীর গতিতে ভাষার বিভিন্ন শব্দে তার ব্যাপন ঘটে থাকে। কোনো এক কাকডাকা সকালে সমস্ত ধ্বনির পরিবর্তন যান্ত্রিকভাবে হয় না। এটি বর্তমানে ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। উপভাষাতত্ত্বের অধ্যায়টি এমনি একটি আলোচনা যা ফলিত ভাষাতত্ত্বের প্রতিটি ছাত্র-গবেষকের পক্ষে অপরিহার্য। তাতে তিনি উপভাষা-বিষয়ক সাধারণ আলোচনা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, উপভাষার ক্ষেত্র-সমীক্ষা কীভাবে করতে হবে তারও হদিশ দিয়েছেন, এমনকি টেপরেকর্ডার ব্যবহার সংক্রান্ত tips-ও দিয়েছেন। উপভাষা-চর্চাকারীরা এর থেকে উপকৃত হবেন কারণ আমাদের দেশে উপভাষা-চর্চা এখনো আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে, আধুনিক উপভাষা-চর্চা যে অনেক এগিয়ে গিয়েছে, কীভাবে তার চর্চা করতে হবে, তা তিনি তাঁর দীর্ঘ অধ্যায়ে সবিস্তারে উপস্থাপিত করেছেন। উপভাষাতত্ত্ব বিষয়ক বাংলায় এমন আলোচনা কোথাও দেখিনি বলেই মনে হয়।

ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়টিও তেমন গভীর অনুসন্ধিৎসার প্রতিফলন। তাতে যেমন রয়েছে phonetics-এর বিস্তৃত আলোচনা, তেমনি রয়েছে phonemics বা ধ্বনিমতত্ত্বের (বা মূলধ্বনিতত্ত্বের) ওপর আলোকপাত। বাংলায় এ বিষয়ে অনেক অধিকারী থাকলেও, তেমন কোনো আলোচনা আমার নজরে আসে নি যা এখানে উল্লেখ করতে পারি। এই অধ্যায়ে phonetics এবং phonemics-এর অন্তর্গত সমস্ত বিষয়ই যথাযোগ্য মর্যাদায় উপস্থিত। এমনকি acoustic phonetics-এর মতো দুরূহ বিষয়ও তিনি এই অধ্যায়ে অন্তর্গত করেছেন সহজবোধ্য ভাবে। এই অধ্যায়ে যে বিষয়টি থাকলে আরো ভালো হত তা হল সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের (generative phonology) একটু পরিচয়। তিনি এখানেই স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের (distinctive features) কালানুক্রমিক বিবর্তনের ধারাটি ক্রবেৎসকয় থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে দেখিয়েছেন। ঐ বিষয়ে সম্পর্কে আলোচনা থাকলে পাঠকদের সুবিধে হত কারণ ধ্বনিগত পরিবর্তনের উদাহরণ-

তিনি সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের পদ্ধতিতেই ব্যাখ্যা করেছেন।

উপরি-উক্ত অধ্যায় এবং পরবর্তী তিনটি অধ্যায়ে ভাষাতত্ত্বের মোট চারটি স্তরের একটি সামগ্রিক পরিচয় উপস্থাপিত। শেষের তিনটি অধ্যায়ে রয়েছে রূপমূলতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং বাগর্থতত্ত্ব। তিনি এই তিনটি বিষয়ে অন্ধের হস্তীদর্শন করেন নি, বরং গঠনমূলক (structeral) এবং আধুনিক রূপান্তর (transformational) ব্যাকরণ কাঠামোর কীভাবে বিচার করা হয় তা তিনি নিরপেক্ষভাবে দেখেছেন। বাক্যতত্ত্বের অধ্যায়ে রূপান্তরী ব্যাকরণের ব্যাখ্যা তিনি তিনটে পর্যায়ে প্রসারিত করেছেন : প্রথমত তিনি রূপান্তরী ব্যাকরণের প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন, দ্বিতীয়ত তিনি রূপান্তরী ব্যাকরণের গঠন সম্পর্কিত কয়েকটি প্রধান সূত্রের বিশ্লেষণ করেছেন এবং সবশেষে রূপান্তরী ব্যাকরণের সূত্রের সাহায্যে বাংলা বাক্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন, এবং তা তিনি অশেষ নিপুণতায় সম্পন্ন করেছেন। এমনকি trace (বা অনুসরণ সূত্র) সম্বন্ধেও খুবই সংক্ষেপে অধ্যাপক মোরশেদ আলোচনা করেছেন, কোনো এক স্বনিযুক্ত 'বাঙালি চমস্কি' বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক লিখলেও এ বিষয়ে লিখেছেন বলে জানি না। একই কথা বলা যায় আধুনিক বাগর্থতত্ত্ব সম্পর্কে। এ বিষয়ে এযাবৎ কেউ বাংলায় লেখার তেমন সাহস করেও উঠতে পারেন নি। বর্তমান লেখক এ বিষয়টি বেশ সহজ করেই হাজির করেছেন।

বইটির আরেকটি অধ্যায় আছে। তা হল ভাষাচর্চার ইতিহাস। আমার মতে এবিষয়টি সবশেষে থাকলেই ভাল হত। তাতে তিনি ধরেছেন প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভাষাচর্চার একটি আনুপূর্বিক ইতিহাস। আধুনিক কালের ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন প্রস্থানের (school) পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি দিয়েছেন ভাষাতত্ত্বে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের অবদানের কথা।

বস্তুত, ভাষাতত্ত্বের এমন একটি বই-এর অভাব অনেক দিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। অধ্যাপক মোরশেদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তা আমাদের কাছে হাজির করিয়াছেন। তার জন্য তাঁর অনেক সাধুবাদ প্রাপ্য। বিষয়ের ওপর দখল থাকলেই যে কোনো বিষয়কে সহজভাবে উপস্থাপিত করা যায়। এই বইটি পড়লে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্যের কথাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে বইটির দু-একটি ত্রুটির কথা বলি। গ্রন্থশেষে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিটি অপূর্ণ, গ্রন্থমধ্যে এমন অনেক লেখকের নাম রয়েছে যাঁদের প্রবন্ধ বা গ্রন্থের উল্লেখ শেষের তালিকাতে নেই। একটি পরিভাষার তালিকা এবং নির্ঘণ্ট থাকলে আরো ভালো হত। গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ কথা' থেকে জানতে বইটি অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে ছাপানো, তার জন্যই হয়তো ত্রুটিগুলো রয়ে গেছে। আগামী সংস্করণ বইটির হবেই, তাতে এ সমস্ত সংযোজিত হলে এবং অপূর্ণতা সংশোধিত হলে আমরা খুশি হব। এই ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থটির মর্যাদা কোনো অংশেই হানি হয় নি—বরং অনেক কালের একটি অভাব পূরণের জন্য বাঙালি পাঠক তাঁর কাছে অসীমভাবে ঋণী হয়ে রইল। ভাষাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু পাঠক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে বইটি অপরিহার্য এবং অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি এদেশে এবং ওদেশে॥

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

বাঙলা ভাষাকে সাম্প্রদায়িক বিচারে ভাগাভাগি করার বিতর্কে একদা রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়, 'বাঙলা ভাষা যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আপন তার স্বাভাবিক প্রমাণ ভাষার মধ্যে প্রচুর রয়েছে।' রবীন্দ্রনাথ একথা বলছেন ১৯৩২ সালে। সে সময় এদেশে 'কম্যুনাল বিরোধ·· যে কিম্ভূতকিমাকার রূপ' ধরেছিল তার ধাক্কা বাঙলা ভাষাতেও পড়েছে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল 'আর মান থাকে না।' রবীন্দ্রনাথ যখন একথা বলছেন তখন প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ের চর্চার খবর অনেকখানি জানা হয়ে গেছে। কিন্তু ১৮৭৩-৭৪ সালে "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় যখন বলা হচ্ছে, 'বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে···

মাঘনিশীথের কোকিল—আজহারউদ্দীন খান। সাহিত্যশ্রী। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। তিরিশ টাকা।

তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না··· ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন না জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।' তখন সমসাময়িক অবস্থার বিচারে সে অনুযোগ যথার্থই ছিল। এবং তখনও প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ের চর্চার খবর প্রায় কিছুই জানা ছিল না। যে তথ্যের ভিত্তিতে বঙ্গদর্শনের মন্তব্য (সম্ভবত স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের) এবং রবীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে, সে তথ্য প্রধানত যাঁর জীবনপণ পরিশ্রমের বিনিময়ে পাওয়া গেছে, সেই মুন্‌শি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্বন্ধে খুব বেশি জানা নেই অনেকেরই। আজহারউদ্দীন খান যদিও, 'বাংলা সাহিত্যের লেখক এবং পাঠকদের কাছে আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদের নাম অপরিচিত নয়' এইরকম একটি ভরসাজাগানো বাক্য দিয়ে তাঁর গ্রন্থ শুরু করেছেন, তথাপি এ ব্যাপারে সন্দেহপ্রকাশের অবকাশ আছে। বিশেষত সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম বাঙলায় সাহিত্যবিশারদের কথা কজনেই বা স্মরণ করে থাকেন। ঢাকা থেকে প্রধানত মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং আহমদ শরীফের চেষ্টায় সাহিত্য-বিশারদ প্রসঙ্গে নানা প্রবন্ধ, গ্রন্থ এবং পরিচিতি রচিত হয়েছে বটে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এ বিষয়ে আজহারউদ্দীন খানকেই পথিকৃৎ এবং প্রধান বলে স্বীকার করতে হয়। তাঁর "মাঘনিশীথের কোকিল" (অগস্ট ১৯৮৬) গ্রন্থে মুন্‌শি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জীবন আর কৃতি প্রসঙ্গে যে বিশদ তথ্য সমাহার করা হয়েছে তাতে গ্রন্থটি একটি প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। ১৩৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায় 'জীবন-জ্যোতি' সাহিত্যবিশারদের জীবন-বৃত্তান্ত। দ্বিতীয় অধ্যায় 'আলোকের পাখী' তাঁর সাহিত্য-জীবনের বিবরণ। তৃতীয় অধ্যায় 'ফসলের খতিয়ান' মূলত সাহিত্যবিশারদের রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, সম্পাদিত গ্রন্থ এবং সাহিত্যবিশারদ সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের প্রায়-নিঃশেষ সূচী। এই সূচী প্রণয়নে আজহারউদ্দীন দুই বাঙলায় প্রকাশিত রচনাসমূহ উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ অধ্যায় 'শেষ পারানির কড়ি'-তে সাহিত্যবিশারদের তিনটি রচনা বা ভাষণ সম্পূর্ণত মুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটির নামকরণে বা অধ্যায়ের শিরোনামে কিঞ্চিৎ কাব্যস্পর্শ থাকলেও গ্রন্থে তথ্যসংকলনে কোথাও অসতর্ক ভাববিলাস বা কল্পনার আভাস নেই। তবে ভাষাকে আরও বিষয়োপযোগী করা যেত মনে হয়। আর কয়েকটি সাময়িক বিরোধের প্রসঙ্গ অনুক্ত থাকলে ক্ষতি হত না। সাহিত্যবিশারদ প্রসঙ্গে এটিই আজহারউদ্দীনের প্রথম প্রয়াস নয়, "বিলুপ্ত হৃদয়" গ্রন্থে একটি প্রবন্ধে তিনি শুরু করেছিলেন সাহিত্যবিশারদ-চর্চা, সে প্রবন্ধটি পরবর্তী কালের বহু গবেষকের বিশেষ সহায়স্থল ছিল। তবে বর্তমান গ্রন্থটি সাহিত্যবিশারদ প্রসঙ্গে এক আকরগ্রন্থ হয়ে উঠেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্যসাধক চরিতমালায় সাহিত্য-বিশারদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা বহুদিনের। আজহারউদ্দীন খানের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি তো আর চোখে পড়ে না।

একদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবদুল করিম-সম্পাদিত "রাধিকার মানভঙ্গ" পুথি দেখে লিখেছিলেন, 'মনে হয় যেন কোনো 'জার্মান এডিটর' এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।' এদেশে পুথি বা গ্রন্থ সম্পাদনার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বিশেষ চোখে পড়ে না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যাঁর কাজে জার্মান এডিটরের ছাপ দেখেছিলেন, তিনি বোধ করি আজও এদেশে পুথি সম্পাদনায় আদর্শ সম্পাদকরূপে বিবেচিত হতে পারেন। আবদুল করিম যে-কোনো রচয়িতার বিষয়ে কীভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনা করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় আজহারউদ্দীন-প্রদত্ত আলাওল-সম্পর্কিত সাহিত্য-বিশারদের প্রবন্ধের তালিকায়। এই প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে ৫০ বছরের উপর কাল জুড়ে। গবেষণা এবং সম্পাদনার কাজে যেখানে সাহিত্যবিশারদের আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে, সেখানে অধুনাকালের শিথিলতা এবং অযত্ন কোনোক্রমেই মার্জনা করা যায় না। আজহারউদ্দীন-রচিত গ্রন্থটি হাতে নিয়ে একথাই বারে বারে মনে হয়।

আজহারউদ্দীন তাঁর গ্রন্থে পুথিসংগ্রহকারী এবং পুথি-সম্পাদক সাহিত্যবিশারদের যে পরিচয়টি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন, তার পাশাপাশি আবদুল করিমের জীবনের আপাত অকিঞ্চিৎকর নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মানুষটির প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন। আবদুল করিম কক্সবাজার মহকুমার প্রথম মুসলমান যিনি এনট্রান্স পাস করেছিলেন। এবং তিনিই বোধহয় প্রথম মুসলমান ঘরের ছেলে যিনি পাঠ্যবিষয় হিসেবে সংস্কৃত পড়তে শুরু করেছিলেন। পুথিসংগ্রাহক আবদুল করিমের জীবনে এক শোকাবহ ঘটনায় তাঁর লেখনীতে যে কবিতা রচিত হয় আজহারউদ্দীন সেটিও উদ্ধার করে দিয়েছেন। ১৯২১ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আবদুল করিমকে

গ্রন্থাগারিকের পদে আহ্বান করা হয়েছিল। তাঁর গ্রাম সুচক্রদণ্ডীতে ক্ষিতিমোহন সেন, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জনার্দন চক্রবর্তী এবং দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য গিয়েছেন পুথিচর্চা উপলক্ষে। মানুষটি আক্ষরিক অর্থে বইয়ের পোকা ছিলেন। প্রায় চল্লিশটি পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হয়েছিলেন তিনি। নিজে ১১০টির উপর পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তাঁর নিজের গ্রন্থসংগ্রহ এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহভুক্ত। এমন বহু তথ্য আজহারউদ্দীনের গ্রন্থে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে।

আজহারউদ্দীনের গ্রন্থে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল শেষ দুটি অধ্যায়। যে যত্নসহকারে আজহারউদ্দীন গ্রন্থ- ও রচনা-সূচীটি প্রণয়ন করেছেন, তার সূত্র ধরে বহু গবেষক উপকৃত হবেন বহু কাল ধরে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের তিনটি ভাষণ মুদ্রিত করেও আজহারউদ্দীন পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আবদুল করিম সৃজনশীল সাহিত্য-সেবক নন। কারণ তিনি মনে করতেন, 'সাহিত্যের ইতিহাস ও মূল ধারার সঙ্গে পরিচিত না হইয়া···দুই চারিটি কবিতা বা প্রবন্ধ কিম্বা গল্প উপন্যাস বা নাটক লেখা যায় না তাহা নহে। কিন্তু এইভাবে সাহিত্যস্রষ্টা কখনো হওয়া যায় না। হওয়া যায় না ফেরদৌসী বা গ্যেটে, শেক্সপীয়র বা বার্নাড শ, ইকবাল বা নজরুল ইসলাম অথবা মধুসূদন কি রবীন্দ্রনাথ। ···আমার তরুণ বন্ধুরা জানিয়া রাখুন, সাহিত্যে কোন short cut নাই, কোন made easy নাই, কোন ফাঁকি চলে না এখানে।' আজহারউদ্দীন তাঁর গ্রন্থটিতে সাহিত্যবিশারদের এই সতর্কবাণীই অন্তরে গ্রহণ করেছেন বলে তাঁর কাছে বাঙালি গবেষকবৃন্দ কৃতজ্ঞ থাকবেন।

পাঁচখানি গল্পগ্রন্থ

সুব্রত সরকার

বইগুলি আলোচনার জন্যে দেওয়ার সময় সামান্য দ্বিধা ছিল সম্পাদকের। কারণ, একটি বাদে বাকিগুলির সব লেখকই মুসলমান। ফলে পাঠকেরা মুসলিম লেখকদের গল্পগ্রন্থ একত্রে আলোচিত হওয়ার এই কাকতালীয় ঘটনাটির সম্পাদনার এক গভীর পরিকল্পনা মনে করবেন কি-না, এ সন্দেহ ছিল। অথবা বাংলাদেশের লেখকদের সঙ্গে এই নির্ভেজাল পশ্চিম-বঙ্গীয় গল্পকারদের কেউ যদি মিশিয়ে ফেলেন, এ আশঙ্কাও ছিল।

ঘটনাটি জানানো প্রয়োজন মনে করছি এ কারণে, সম্পাদক তাঁর গ্রন্থ-সমালোচনার বিভাগটি সম্পর্কে কত সতর্ক তার উদাহরণ হিসাবে। এবং এ কথা বলা বাহুল্য বইগুলি নেহাতই ঘটনাচক্রে একই সময়ে চতুরঙ্গ দপ্তরে সমালোচনার অপেক্ষায় জমা হয়ে ছিল।

বইগুলি সংগ্রহের পর মনে পড়ল, একবার কোনো সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলাম, বাংলাদেশের লেখকদের সাহিত্যের ভাষা ধীরে-ধীরে এপার-বাঙলার সাহিত্যের ভাষা থেকে সরে গিয়ে অন্য বাঁক নিচ্ছে। এখনই হয়তো তা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু পাঠক হিসেবে এটা আমার উপলব্ধিতে ছোঁয়া দিয়েছে। এ বিষয়ে ভাষা-গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। সে সময় আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু প্রশ্ন তুলেছিলেন, হিন্দু সংস্কারে লালিত বলে আমার এমনটি মনে হয়েছে কি? এই গভীর জিজ্ঞাসাটিকে কিন্তু গুরুত্ব না দিয়ে পারি নি। এ কারণে উৎসুক হয়ে ছিলাম এপার বাঙলার কিছু মুসলিম লেখকের লেখা একসঙ্গে পড়ার সুযোগের অপেক্ষায়। এখন দ্বিধাহীন হয়ে বলতে পারি, ধর্ম নয়—দুই ভিন্ন রাষ্ট্রের একই ভাষার সাহিত্যিকেরা তাঁদের দেশাচার ও অন্যান্য পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের মৌলিক অস্তিত্বের সন্ধান করে নিচ্ছেন। এবং বাঙলা ভাষার পক্ষে এটি নিশ্চয় এক সুখবর।

সৈয়দ আবদুল বারি একজন সুপরিচিত প্রবীণ সাহিত্যিক। তাঁর লেখার সঙ্গে ইতিপূর্বে পাঠকের কমবেশি পরিচয় হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'রাউনড স্টোরি' অর্থাৎ নিটোল গল্প—বারিসাহেব তেমনটি লিখতেই পছন্দ করেন।

ছেড়ে যাওয়া বন্দর—সৈয়দ আবদুল বারি। শিল্পকলা, কলকাতা-৭। দশ টাকা।

মাটি ছেড়ে যায়—আবুল বাশার। রূপা, কলকাতা-৭৩। পঁচিশ টাকা।

প্রতিকূলে একজন—আবদুর রাকিব। শিল্পকলা, কলকাতা ৭। দশ টাকা।

অনন্ত শেখরের ছাতি—সুমন্ত্র ভট্টোপাধ্যায়। শ্রুতি প্রকাশনী, কলকাতা-৭৫। আঠারো টাকা।

হিসেব নিকেশ—এ. মান্নাফ। প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯। বারো টাকা।

ছোটোগল্পের ফর্মের কোথাও আঘাত না করে পাঠককে কাহিনী উপহার দিতেই তিনি গল্প লিখেছেন। অবশ্য প্রতিটি গল্পের অবসানে পাঠক কোনো সত্যের মুখোমুখি হন। সে সত্য মানুষকে ভালোবাসার। এইদিক থেকে বিচার করলে "ছেড়ে আসা বন্দর" এক ভালোবাসার গল্পের সংগ্রহ। পাঠককে আবিষ্ট করে গল্প শোনানোর এক সহজাত দক্ষতা তাঁর রয়েছে। 'লণ্ঠন' বা 'ছোটবাবু'—যে গল্পই পাঠক পড়তে শুরু করবেন, শেষ না করে উপায় নেই। পাঠকের মধ্যে এই কৌতূহল উশকে দেবার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের সজীবতা, যা এখনকার অনেক লেখকের মধ্যেই দেখি না। কোথায় যেন প্রাণময়তা বা আন্তরিকতার ঘাটতি থেকে যায়। বারি সাহেবের গল্পগুলি পাঠকের ক্লেশের কারণ হয়ে ওঠে নি। সম্প্রতি কিছু বইতে হুঁচোট খেয়ে এসে আলোচকের এ কথা মনে হল।

কালো মেয়ের নাম রাখা হয়েছিল নূরী। সব কালোতেই চেকনাই ধরে না। লিখেছেন আবুল বাশার। লেখেন তো অনেকেই। কিন্তু এক-আধজনের লেখা পড়লে পাঠক টের পান—এ হচ্ছে আলাদা জাতের। বস্তুত, আগামী দশকগুলিতে বাঙলা ছোটগল্প যাঁদের দক্ষিণ হস্তের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে ওঠার অপেক্ষায় রয়েছে, বাশার তাঁদের অন্যতম। তাই তাঁর কাছে যেন আমাদের প্রত্যাশা কিঞ্চিৎ বেশি। "মাটি ছেড়ে যায়" ছোটোগল্পের সংকলন। মোট দশটি গল্প রয়েছে। গল্পগুলি তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের রচনা। তখন তিনি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পান নি। একদিকে আর্থিক অনটন, অন্যদিকে স্বল্প-প্রচারিত পত্রিকায় গল্পগুলি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠকের কাছে ধীরে-ধীরে পরিচিত হচ্ছেন। স্বভাবত এ লেখার মধ্যে যে আর্তি ও জন্মমুহূর্তের চিৎকার রয়েছে, তা পরবর্তী কালে খুঁজলে পাওয়া যাবে না, পাওয়া উচিত নয় বলেই।

কী গল্প লিখেছেন বাশার এ গ্রন্থে? প্রথম গল্প 'মাটি ছেড়ে যায়'-এর শেষ দিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পটি স্মরণে আসে। বাশার অবশ্য অন্য লেখায় মানিকবাবুর প্রতি আসক্তি দেখান নি। এবং এটাই প্রত্যাশিত। আমার ব্যক্তিগতভাবে 'চঙ' গল্পটি অপূর্ব লেগেছে। মীর গাছের উপরে চঙ-এ থাকে। সাধারণের প্রতিদিনের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে তার অবস্থান। মীরের আকাঙ্ক্ষা ও লেখকের ভাষার আগুনে গল্পটি যেন দাউদাউ করে ধরে উঠেছে। 'সিংহ ও শশকের গল্প' হিতোপদেশের কাহিনীর সাম্প্রতিক সংস্করণ। পড়তে মজা। 'কুটম্ব' আর-একটি অসাধারণ গল্প। এই দেউলিয়া সমাজের যাবতীয় সম্পর্কে আজ কতখানি সময়ের বিষ ঢুকে গেছে তা তিনি যেন এই গল্পের আয়নায় দেখালেন। এমনকী মা ও ছেলের চিরন্তন সম্পর্ককেও কামড়ে ধরতে রেয়াত করে নি এই সময়। 'নিশি-কাজল' লেখাটিতে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার পিছনের অন্ধকারে লেখক যেন টর্চ জেলে দেখিয়ে দেন—'যারা দাঙ্গা করবে, তারা কারা? মুসলমানেরও কেউ না। হিন্দুদেরও কেউ না'। আর এর মধ্যে সাচ্চা কমিউনিস্ট কর্মী মহিম—'পোস্টার পড়তে পড়তে পার্টির ভাষায় সে দেখে সুবিধাবাদী কী মারাত্মক চাতুরি। হিন্দুকে খুশি করে। মুসলমানকে খুশি করে তারা। ভোট আসে ভোট যায়।' বাশার এই খুশি করার পথটি নেন নি। তাই তাঁর সব লেখা ভালো না লাগলেও তিনি আমাদের আগ্রহ টেনেছেন।

আবদুর রাকিব একজন সুপরিচিত কথাশিল্পী। তাঁর গল্পের সরল পরিণতির টান অনেক পাঠকেরই মনকে আকর্ষণ করেছিল এক সময়। "প্রতিকূলে একজন" পড়ে সে উজ্জ্বলতার সন্ধান পাওয়া গেল। এত সহজ সমাধান হয়তো অনেক পাঠকের কাম্য না হতে পারে, তবু জীবনের সামান্য ঘটনার মধ্যে অসামান্যের হঠাৎ-হঠাৎ আভাস তাঁর লেখাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর ভাষা কাব্যময়, উপমাখচিত। পড়তে ভালো লাগে। এটা খুব কম কথা নয়। ইদানীং বাক্যগঠনের সরল ভঙ্গিমাটুকু জোর করে ঠেলে সরিয়ে যে কাঠিন্য আনা হচ্ছে, তা গল্পের আবেশ অনেক সময় নষ্ট করে বলে আমার ধারণা। আবদুর কিন্তু এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তাঁর দুটি উপমা ব্যবহার এখানে উল্লেখ করছি। 'বুলার মা কিংবা পান্‌সী গা ধোয়ার আগেই সিক্ত হয়ে উঠেছে জরিনার কথার তরল ধারায়। তার দু' এক ফোঁটা চল্‌কে এসেছে মমতাজের কানে' (অগ্রবর্তিনী) বা 'মনসুরের হাসির দমকে হেলালের ক্রোধ, ভীতি আর বিস্ময়ও ঝরে পড়ছিল পর্ণমোচী গাছের পাতার মত' (বালুচর)। এমন নয় এসব অপ্রত্যাশিত উপমা। বরং বহু-ব্যবহৃত উপমাকেই তিনি প্রতিটি গল্পের পাতায়-পাতায় খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে গল্পগুলি কবিতা হয়ে ওঠে নি, গল্পই মনে হয়েছে। শুধু কিঞ্চিৎ সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে লেখকের স্বভাবকবিত্বে।

সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায় অন্য ধরনের গল্প লিখতে চেয়েছেন। বেশ বোঝা যায়, গল্পের ফর্ম নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ফর্মের জন্যে নয়, তাঁর গল্প উতরে গেছে মানবিক উৎসারণের যে গোপন আবেগ তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর লেখায়, সেই নিহিত উপলব্ধিতে। মোট ছয়টি গল্প এই গ্রন্থে আমরা পেলাম। প্রতিটি গল্পেই তিনি চড়চড় শব্দে ছিঁড়ে দিয়েছেন আমাদের সামাজিক সম্পর্ক, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠানের আদবকায়দা। ভোগ্যপণ্যের মতো মানুষ মানুষকে ব্যবহার করে আসছে সভ্যতার প্রথম দিনটি থেকে। ক্রমে নানা কলাকৌশলে তা আমাদের সমাজে শিকড়-বাকড় চালিয়ে বিশাল মহীরুহ হয়ে উঠেছে। শুষে খাচ্ছে আমাদের হৃদয়ের রস, আনন্দ। যে প্রয়োজনে সমাজ একজন খুনীকে সৃষ্টি করে সেই প্রয়োজনে তার বাজার-দরও কমে যেতে থাকে। 'বারিশের ছুরি' গল্পের বারিশ তা টের পায়। এই কনজিউমার সোসাইটিতে রমণ আর ধর্ষণ ছাড়া স্ত্রী-পুরুষ কেউ কারো হাত ধরে না। এক প্রতিযোগিতার প্রদর্শনী। এখানে সবাই সকলকে সন্দেহ করে। তবু পরস্পরের দূরত্ব বেড়ে গেলে আবার একা হয়ে যায়, ভয় পায়, চোখে জল এসে পড়ে এবং ভোর হলে পাখি ডাকে। আমি ব্যক্তিগতভাবে 'বারিশের ছুরি' গল্পটিকে এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ লেখা বলে চিহ্নিত করলাম।

লেখক লিখেছেন, প্রতিদিন অজস্র গল্প প্রকাশিত হচ্ছে, ভালোমন্দ বিচারের তেমন কোনো যন্ত্র নেই। সাধারণভাবে যে গল্প পাঠকের মনের দখল নিতে পারে, সেই গল্পই ভালো। এ. মান্নাফ 'হিসেব নিকেশ'-এ পাঠকদের মনের দখল নিতে সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন। এই অর্থে তিনি একজন কমিটেড লেখক। নিছক আনন্দদানের জন্যে তিনি গল্প লেখেন না। আর এটি করতে গিয়ে তাঁকে গল্পের শিল্পের দিকটি অবহেলা করতে হয়েছে। ফলে গল্পগুলি পড়তে গিয়ে কখনও স্থূল মনে হতে পারে। বা অশ্লীল। তবু শেষ পর্যন্ত পড়তে ভালো লাগে। এটাই বা কম কথা কী।

ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত ভ্রম-সংশোধন

ভারতবর্ষে সাইবারনেটিকস-এর প্রাসঙ্গিকতা

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৮৮৮	২৭	"লোয়ার অ্যারিস্টোক্রেসি"	"লেবার অ্যারিস্টোক্রেসি"
৮৯০	২১	ওই	এও
৮৯১	৫	"এতো নায়ক"	"এক নায়ক"

মতামত

১

ধর্ম ও যুক্তি

"চতুরঙ্গে'র ডিসেমবর ১৯৮৮ সংখ্যায় অম্লান দত্তের নিবন্ধ "ধর্ম ও যুক্তি" প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য। শিরোনামে শব্দ-দুটির পাশাপাশি ব্যবহার প্রথম থেকেই কেমন গোলমেলে মনে হয়। তদুপরি, যখন 'যুক্তি'র আগে 'ধর্ম'কে বসতে দেখি, তখন লেখকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খটকা জাগে। এর পর মনীষীদের জীবন, লেখাপত্র থেকে খাপছাড়া দৃষ্টান্ত টেনে দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিতুলনা নিয়ে নানা কথা বলার উপসংহারে লেখক মন্তব্য করেন, 'ধর্মের নামে প্রবঞ্চনার নিদর্শন তো ইতিহাসময় ছড়িয়ে আছে। তবু যে মানুষ ধর্মের কাছে ফিরে-ফিরে গেছে, সেটাকে কেবলই কুসংস্কার বললে মানুষের প্রতি অন্যায় করা হয়।' লেখকের পরিকল্পনায় ছকটা এটা থেকেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

এদিক-ওদিক থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি দৃষ্টান্ত বাছাই করে এবং কতগুলি মনগড়া কথার ওপর লেখক তাঁর নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জুড়ে বলতে চেয়েছেন, ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় আনার কথা। লেখক এমন বিবৃতি দিতে ভালোবাসেন যা বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টি বা বৈজ্ঞানিক যুক্তির বাইরেই থেকে যায়। সেজন্য 'মানুষ ধর্মের কাছে ফিরে-ফিরে গেছে'—বাক্যটি নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করেছেন, যেহেতু রাসেল, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দ্বন্দ্ব-সংশয়ের কথা জানিয়েছেন। এখনও যখন এদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মকেন্দ্রিক নানা আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেছেন, লেখকের মতে, তার মানে তাঁরা ধর্মের দিকে ফিরে-ফিরে গেছেন। অর্থাৎ ধর্মের প্রয়োজন আছে; আর ধর্মের প্রয়োজন মানে ভগবান বা ঈশ্বরের প্রয়োজন রয়েছে। তাই বিজ্ঞানও থাকুক, কুসংস্কারও থাকুক পাশাপাশি। লেখক চান এভাবেই ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে। কেননা তথ্য হিসাবে তিনি এও জেনে গেছেন যে, মার্কস-বাদীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নাকি রাষ্ট্রকর্তৃক আইনের শাসন। এ তথ্য কোথায় পেয়েছেন তা জানান নি। যদিও আমরা জানি, মার্কসবাদ চূড়ান্ত পর্যায়ে অর্থাৎ কমিউনিজমের স্তরে রাষ্ট্রের অবলুপ্তির কথা বলেছে, যার মুদ্রিত প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে ভূরি-ভূরি।

আরেক জায়গায় নিবন্ধকার জানিয়েছেন, 'মার্কস দুঃখের মূল খোঁজেন নি মানবপ্রকৃতি বা বিশ্বপ্রকৃতির কোন বৈশিষ্ট্যে।' মানবপ্রকৃতিতে দুঃখের মূল খোঁজা কী ব্যাপার জানি না; তবে মার্কস তাঁর "অর্থনীতি ও দর্শনবিষয়ক পাণ্ডুলিপি ১৯৪৪" গ্রন্থের এক অংশে মানবপ্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ মানবিক সারসত্তা (হিউম্যান পাওয়ার)-এর স্বরূপ ঠিক কী, এই বিশেষ ক্ষমতা কীভাবে মানুষকে আর-পাঁচটি প্রাণী থেকে আলাদা করে তোলে, বাইরের বস্তুজগতের সঙ্গে মানবিক সারসত্তার বিকাশের সম্পর্ক—এই সবই ছিল মার্কসের সতর্ক অভিনিবেশের অন্তর্গত। এই সতর্কতা থেকেই মার্কস তাঁর "মূলধন" গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেন—মানুষ তথা সমাজের নানা সমস্যা দুঃখকষ্ট লাঘব করার কথা, যেহেতু জরা-মৃত্যুর মতো অনিবার্য সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। কাজেই কিছু-কিছু অনিবার্য প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতা মানুষ কখনোই পুরোপুরি কাটাতে পারবে না বলে তাকে ঈশ্বর তথা ধর্মের মনগড়া আদর্শের ছায়ার আশ্রয় নিতে হবে—এ ধরনের সহজ সমীকরণ গ্রহণ করা যায় না।

তিনি লিখেছেন, 'সোভিয়েত সাম্যবাদী দেশে আজ শিক্ষার বিস্তারের পরও ধর্মের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠেছে।' 'আশা-নৈরাশ্যের উর্ধ্বে মানুষের উচ্চতর আদর্শ ও প্রয়াসের' আশ্রয়ের কথা তিনি বলেছেন। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এই 'উচ্চতর আদর্শ'কে আমরা কীভাবে পাই? ধর্মীয় বিধি-নিষিধের মোড়কে আমাদের খাওয়া-পরা থেকে শুরু করে উৎসব-অনুষ্ঠান প্রায় সবকিছুর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এমন কিছু নিয়ম যা ঐক্যের বদলে মানুষে-মানুষে বিভেদ গড়ে তোলে। উচ্চতর আদর্শের নামে ধর্ম এক সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে অন্য ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে, যা মাঝে-মাঝে বীভৎস দাঙ্গার রূপ নেয়। ধর্ম 'মনুষ্যজাতির সঙ্গে যুক্ত করে ব্যক্তিকে'—অধিকাংশ মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিতরে এ ধরনের কথার কোনো মিল খুঁজে পান না। এমনকী রাসেল কিংবা রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দ্বন্দ্বের স্থানও তাদের জীবনে প্রায় অনুপস্থিত। আসলে 'মানুষের ধর্মই হল এই যে সে নিজেকে বারবার অতিক্রম করে যায়'—এজাতীয় কথা বলে মতান্ধদের মতো অম্লান দত্তও ধর্মের অন্তঃসারহীন, অমানবিক রূপটি আড়াল করতে চেয়েছেন। সেজন্য ধর্ম ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে, তার মূলে

যে এক সর্বশক্তিমান স্রষ্টা বা ঈশ্বরের ধারণা রয়েছে, আগে তার সত্য-মিথ্যার মীমাংসা না করে ধর্মের আলোচনা করাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঘোড়ার আগে গাড়ি লাগানোর মতো। ব্যক্তিমানুষের মনে যে নানা দ্বন্দ্ব-সংশয়ের দোলাচল চোখে পড়ে, তা তো কেবল আর ঈশ্বর বা ধর্মকে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খায় না, ঈশ্বরভাবনার মতোই আরও নানা অলৌকিক ভাবনা, কু-সংস্কার, কু-প্রথাও তাকে জড়িয়ে আছে। কোনো বিশেষ সমাজে বা দেশে যদি অধিকাংশ মানুষের ওপর এসবের অল্প-বিস্তর প্রভাব থাকে, তবে তার অর্থ নিশ্চয়ই ওই কুসংস্কার বা কু-প্রথার কাছে বারবার ফিরে ফিরে যাওয়া নয়।

বিভাস ভট্টাচার্য
কলকাতা-৪৭

২

উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে তিন বিশাল ব্যক্তিত্ব

"চতুরঙ্গ" নভেমবর, ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রখ্যাত প্রাক্তন সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'জওয়াহরলাল নেহরুকে স্মরণ প্রসঙ্গে', বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক খাজিম আহমেদের "জিন্নাহ্ চর্চা : নয়া ভাবনা" ও সুলেখক পুলকনারায়ণ ধরের "আবুল কালাম আজাদ : মনন ও ধর্ম"—গবেষণাধর্মী এই তিনটি প্রবন্ধ পড়ে বিমুগ্ধ হয়েছি। উপমহাদেশের এই তিন বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিন জন আলোচক যে নির্মোহ আলোচনা করেছেন তা যে-কোনো অনুসন্ধিৎসু মনকে নূতন আলোর সন্ধান দেয়।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যেমন উল্লেখ করেছেন 'জওয়াহরলাল ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে' অন্যদিকে তেমনই সাহসভরে বলতে পেরেছেন 'তিনি (জওয়াহরলাল) যতই আদর্শ ও নিষ্ঠাবান থাকুন না কেন তার কলুষ মাঝে-মাঝে স্পর্শ তো তাঁকে করত-ই'। ১৯৫৯-৬১ সালে প্রথম নির্বাচিত (কমিউনিস্ট) কেরালা সরকারকে বরখাস্ত করার অমার্জনীয় দায় থেকেও যে নেহরু নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি, সেকথাও লেখক পরিষ্কার উচ্চারণ করেছেন। দেশভাগ সংক্রান্ত বিষয়ে মুসলিম লীগ ও জিন্না সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ ধারণারও তিনি নিরসন ঘটিয়েছেন ঠিক এইভাবে : "মুসলিম লীগ আর জিন্নার নিন্দা আর ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতিকে শুধু আক্রমণ করে কে তুষ্টি পায় জানি না, কিন্তু আমাদের গোটা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেই ছিল এমন গলদ, যাতে দেশবিভাগের কলঙ্কিত মূল্যের প্রতিদানে 'ক্ষমতার হস্তান্তর' ঘটল ব্রিটেনের কাছ থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই রাষ্ট্রে।'

খাজিম আহমেদের "জিন্নাহ্ চর্চা : নয়া ভাবনা" যথার্থই এ সংখ্যার এক মূল্যবান সংযোজন। ইতিহাসের বহুবিতর্কিত এই রাজনীতিক এবং দেশবিভাগের খল নায়ক হিসেবে বিদিত এই ব্যক্তিত্ব কেন ও কিভাবে জাতীয়তাবাদের মূল স্রোত থেকে ছিটকে গেলেন, সে সম্পর্কে অসংখ্য প্রামাণিক আকরগ্রন্থের তথ্য সহকারে অনুপুঙ্খ আলোচনার জন্য প্রাবন্ধিককে ধন্যবাদ। ইতিহাসে যাঁরা জিন্নাকে কলুষিত করেছেন, তাঁদের সকল দুর্বল যুক্তিকে খণ্ডন করে এক নূতন আলোর সন্ধান দিয়েছেন আলোচক।

ধর্ম ও রাজনীতির বিচ্ছিন্নতায় অবিশ্বাসী মৌলানা আজাদ ছিলেন 'হিন্দু-মুসলিম-মিলন মৈত্রী'তে নিবেদিত-প্রাণ। স্রষ্টার প্রতি অবিচল আস্থাবান ও আরবীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী মানুষ আজাদকে ধর্মীয় গোঁড়ামি স্পর্শ করতে পারে নি। দেশভাগের অসহনীয় জ্বালা নিয়েই তিনি লোকান্তরিত হন।' আজাদ সম্পর্কে এজাতীয় মননশীল ব্যাখ্যায় লেখক পুলকনারায়ণ ধর সফল। তিনিও ধন্যবাদার্হ।

মোঃ সানাউল্লাহ
বর্ধমান

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ত ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তি-নাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্তু মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economical.

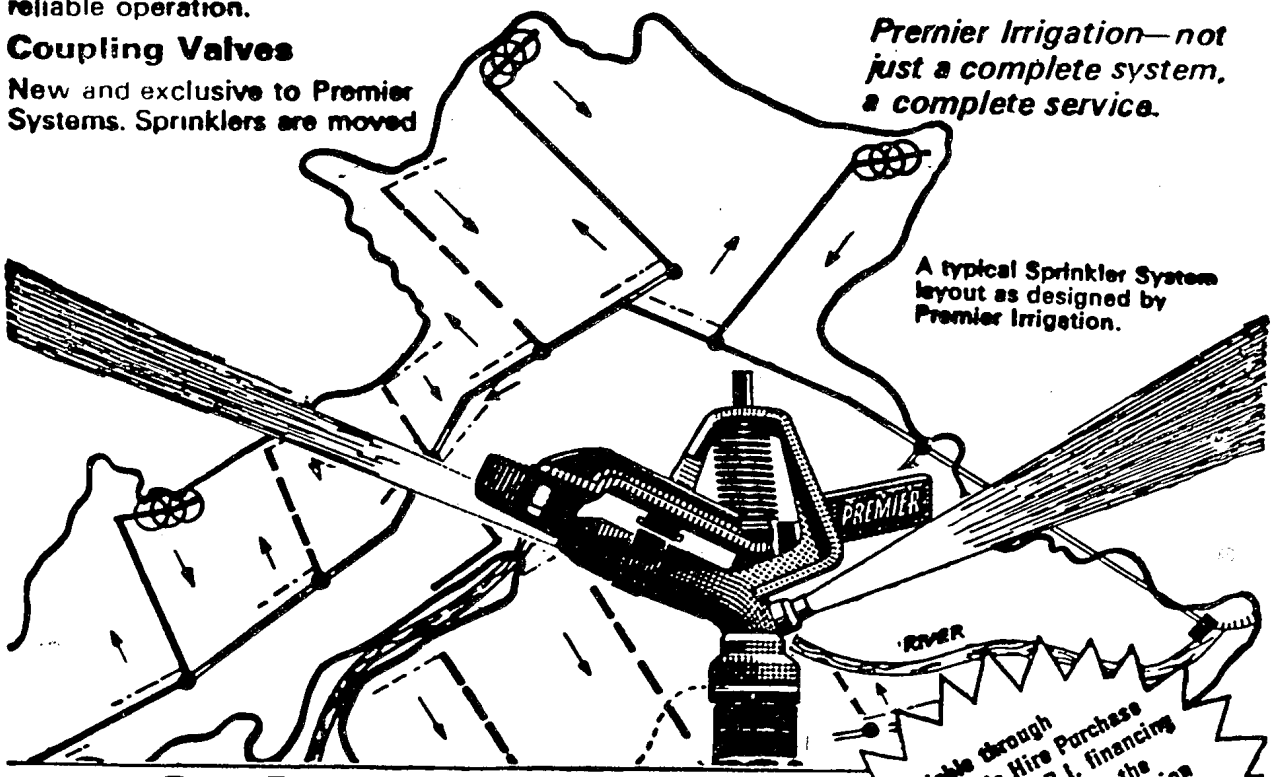
Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Premier Irrigation—not just a complete system, a complete service.



A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities. In addition to the normal annual I.T. depreciation deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

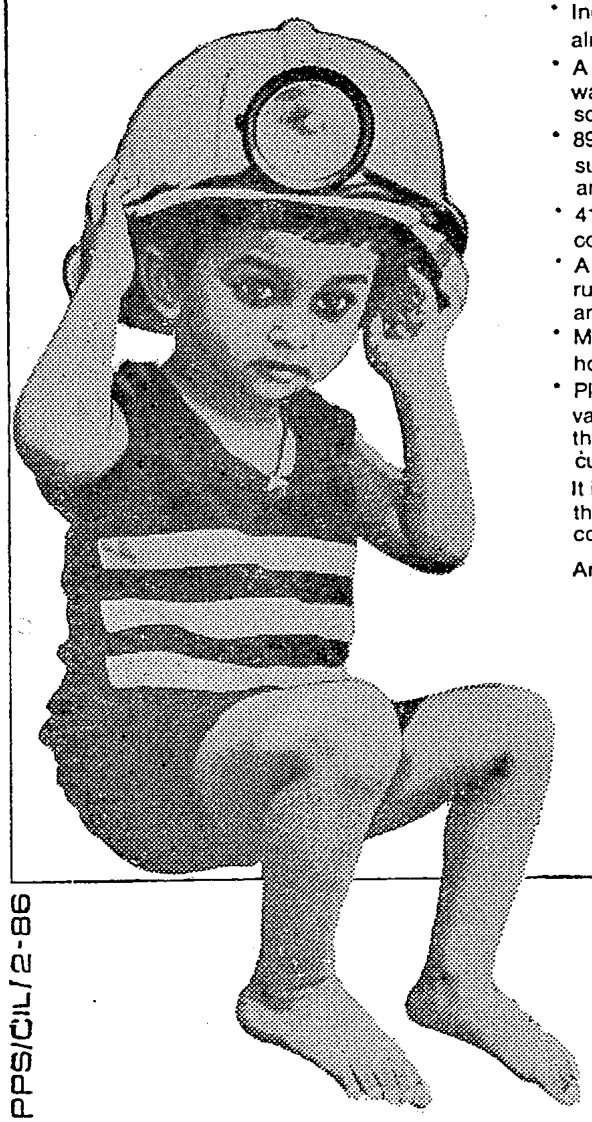
Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302

Postal Regd. No. WB/CC-435 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57 প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা

He can't come to you with facts, but you can reach him.

Today he knows what is more important. He knows where the children's parks are, where quarters, schools, colleges and dispensaries are. And he knows who built these for him and his family.

The welfare of Coal Mine Workers received very low priority before nationalisation. But today the improvement in the living standard of Coal Mine Workers and their families is one of the main corporate objectives of Coal India. In tune with this objective the total outlay on Coal Mine Workers' welfare account since nationalisation is about to exceed Rs. 450 crores. An amount which is almost 10% of the total capital investment. Highlights below will speak for itself.



- An increase of 2.48 lacs of houses from 1.18 lacs. A sure proof of 110% increase in housing since nationalisation.
- Individual water taps and electric fans have been provided in almost all the houses.
- A population of 16.83 lacs have been covered under various water supply schemes in Coalfield areas, which in general have scarcity of potable water.
- 897 schools, colleges and polytechnics are being assisted by the subsidiary companies for providing primary, middle, secondary and technical education for the wards of the colliery employees.
- 417 dispensaries are functioning in different collieries with a contingent of 485 Ambulances.
- A total strength of 1,100 Doctors including specialists are running the expanded medical services in various Coalfield areas.
- More than 4000 hospital beds have been provided in numerous hospitals.
- Playgrounds, stadia and auditoriums have been constructed in various Coalfield areas to encourage colliery workers and their family members to participate in sports, games and cultural activities.

It is Coal India's forethought of their workmen's needs, and meeting them with determination that goes a long way to fulfil the commitment to the Nation.

And Coal India promises to create a better future for them.

কোল ইন্ডিয়া Coal India

Coal India Limited
(A Government of India Enterprise)
COAL BHAWAN, 10 NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-1

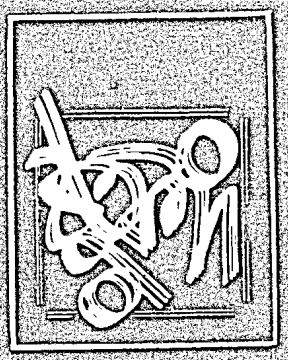
Coal India's concern for the nation

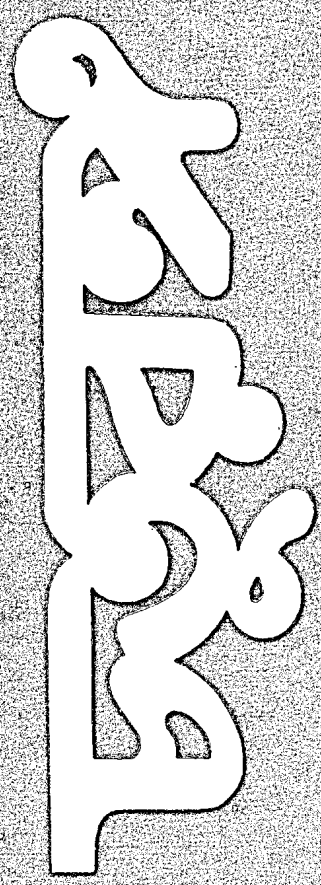
PPS/CIL/2-86

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা এপ্রিল ১৯৮৯





পেরেস্‌ত্রৈকা গ্লাস্‌নস্‌ত নিয়ে তোলপাড় সোভিয়েত দেশে সম্প্রতি সফর শেষ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অধ্যাপক জয়ন্ত রায়ের দীর্ঘ প্রতিবেদন "সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ"।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষদিকে শ্রমজীবী মানুষের উত্তাল সংগ্রামের ফলে জাতীয় স্তরে উন্মোচিত একটি বাম বিকল্পের সম্ভাবনা যেভাবে ১৯৪৫-৪৭ এই কালপর্বের মধ্যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল অধ্যাপক সুনীল সেন এবার বিশ্লেষণ করেছেন সেইসব ঐতিহাসিক তথ্য।

ঝাড়খন্ডী আন্দোলনের অন্যতম প্রবল শরীক মুন্ডা সম্প্রদায় স্বাধীন মুন্ডারাজ্য প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র লড়াই লড়েছিল ৯০ বছর আগে। সেই সংগ্রামের নেতা বীরসা মুন্ডার বিস্ময়কর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির তথ্যসমৃদ্ধ পরিচয় তুলে ধরেছেন অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী।

একটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনার সূত্র ধরে সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে মার্কসীয় উৎপাদন পদ্ধতির প্রত্যয় অপরিহার্য কিনা এই নিয়ে দুই মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র এবং অজিত রায়ের ভিন্নমত।

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বীজবপনের আদৎ জায়গা মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রম এবং অন্ততঃ কুড়িজন পাঠ্যপুস্তক প্রণেতার দৃষ্টিভঙ্গির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করেছেন গবেষণাধর্মী লেখক খাজিম আহমেদ।

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-irrigation-plan' means the best irrigation system with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economical.

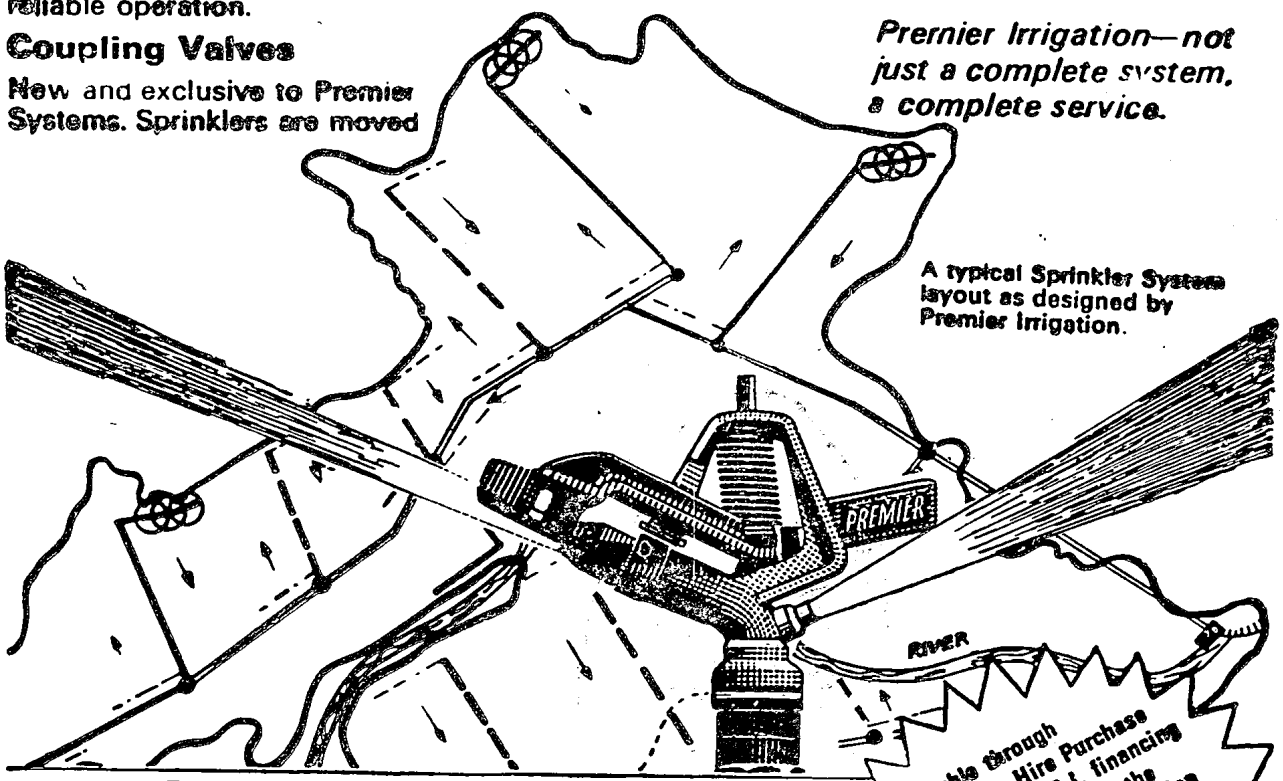
Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprinkler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Premier Irrigation—not just a complete system, a complete service.



A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities. In addition to the normal annual I.T. depreciation deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PI PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302

বাঙলা নতুন বছরের
প্রথম সংখ্যা থেকে
"চতুরঙ্গে"র মূল্যবৃদ্ধি

পাঠকদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়াধিক্য সত্ত্বেও গত দু বছর আমরা "চতুরঙ্গে"র মূল্যবৃদ্ধি করি নি। কিন্তু ইদানীং কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি প্রকাশন সংক্রান্ত সব জিনিসেরই অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির চাপে বাধ্য হয়ে আগামী মে ১৯৮৯ সংখ্যা (বাঙলা নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা) থেকে "চতুরঙ্গে"র মূল্য প্রতি কপি পাঁচ টাকার পরিবর্তে ছয় টাকা না করলে পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ আমাদের নিরুপায় অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন এবং আগের মতোই তাঁদের সহানুভূতি লাভে আমরা বঞ্চিত হব না।

গ্রা হ ক - চাঁ দা

আগামী মে ১৯৮৯ সংখ্যা থেকে গ্রাহক-চাঁদার হার দাঁড়াচ্ছে বার্ষিক সত্তর (৭০) টাকা ষান্মাসিক পঁয়ত্রিশ (৩৫) টাকা। আগের মতোই ডাক-খরচ বহন করার দায়িত্ব থাকছে আমাদের।

মানি-অর্ডার পাঠাতে হবে 'ম্যানেজার, চতুরঙ্গ'—এই নামে। চেক / ব্যাঙ্ক-ড্রাফ্‌ট্ ইত্যাদি পাঠাতে হবে 'ANTARANGA PRAKASHANI PVT. LTD.'—এই নামে।

কলকাতার বাইরের চেক অথবা ড্রাফ্‌ট্ হিসাবমতো আউট-স্টেশন ক্লিয়ারিং চার্জ সহ পাঠাতে হবে।

ম্যানেজার : চতুরঙ্গ

৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ

কলকাতা-৭০০ ০১৩

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশা হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যর্থতা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমা





বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ১২
এপ্রিল ১৯৮৯
চৈত্র ১৩৯৫

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ জয়ন্তকুমার রায় ১০১৭
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ১০৪৬
বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি সুধীর সেন ১০৫৮
বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ১০৬৮
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় সুনীল সেন ১০৭৪

মানবজন্ম রত্নেশ্বর হাজরা ১০৪২
ফল্গু সুকুমার চৌধুরী ১০৪৩
প্রেমে অপ্রেমে সোফিওর রহমান ১০৪৪
পৃথিবী পবিত্র হয়ে উঠছে নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার ১০৪৫

গ্রন্থসমালোচনা ১০৮৫
অজিত রায়, খাজিম আহ্‌মেদ

বিশ্বসাহিত্য ১১০৫
উলকি তানিজাকি জুনিচিরো / সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত

মতামত ১১১১
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, সুশান্ত মজুমদার

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Hindustan Wires Limited

Registered Office :

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 44-6745 (3 lines) Telegram : WIREFIELD

Factory :

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of :

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &

MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED

JAPAN

While purchasing Hessian, Sacking, Yearn and Decorative Furnishing Fabrics & other Jute Products, please insist on quality product.

We are always ready to meet the exact type of your requirement.

AUCKLAND INTERNATIONAL LTD.

(*UNIT :* AUCKLAND JUTE MILLS)

"KANKARIA ESTATE"
6, Little Russell Street
Calcutta-700 071

Telephones : 29-2621
29-2623
29-7199
29-7698
29-7710

Cable : SWANAUCK, CALCUTTA
Telex : 21-2396 AUCK IN
Codes : BENTLEY'S SECOND

REGISTERED OFFICE & JUTE MILL AT **JAGATDAL**
24-PARGANAS, PHONES : BHATPARA 2757, 2758 & 2038

New from Oxford

R. E. B. LUCAS & G. F. PAPANEK, *ed*
The Indian Economy
Recent Development and Future Prospects Rs 110

ANJALI KUMAR
India's Manufactured Exports 1957-1980
Studies in the Export of Non-Traditional Industry Rs 225

NIRMAL K CHANDRA
The Retarded Economies
Foreign Domination and Class Relations in India and Other Emerging Nations Rs 240

SIBNARAYAN RAY
Selected Works of M. N. Roy
Volume II—1923-1927 Rs 300

RABINDRA RAY
The Naxalites and their Ideology Rs 160

STEPHEN FEUCHTWANG, *et al, ed*
Transforming China's Economy in the Eighties
—Volumes I & II set Rs 325

BRIGID KEENAN
Travels in Kashmir
A Popular History of Its People, Places and Crafts Rs 225



OXFORD UNIVERSITY PRESS
Faraday House
P-17 Mission Row Extension
Calcutta 700 013

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা ছয় টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৭০ টাকা
ষান্মাসিক ৩৫ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।
২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির ঊর্ধ্বে শতকরা ৩০।
৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।
৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

KCI

IN THE SERVICE OF INDUSTRY & AGRICULTURE

PRODUCT RANGE INCLUDES—

- CAUSTIC SODA (Lye, Solid & Flakes)
- LIQUID CHLORINE
- HYDROCHLORIC ACID
- BENZENE HEXA CHLORIDE (Technical)
- STABLE BLEACHING POWDER
- PENTAERYTHRITOL (Technical & Nitration Grade)
- ACETALDEHYDE
- FORMALDEHYDE (Under construction)
- COTTON & SYNTHETIC BLENDED CLOTH
- COTTON & SYNTHETIC BLENDED YARN

KANORIA CHEMICAL & INDUSTRIES LIMITED

Corporate Office : "Park Plaza"
71 Park Street, Calcutta 700 016

Phone : 29-9472 (PBX)

Telex : 021-4484

With Best Compliments from :

BENFED THE FARMER's FRIEND

BENFED is a familiar name among the farmers of West Bengal. Through its hundreds of Primary Co-operative Societies and 14 District Offices, BENFED comes closer to the farmers to fulfil their needs.

SOME OF BENFED's BUSINESS ACTIVITIES ARE :

* Distribution of Chemical fertilisers, quality seeds and pesticides.
* Distribution of Pumpsets and Shallow Tubewell Accessories.
* Marketing of Raw Jute & Jute Products.
* Marketing of Vegetables, Pulses, Spices and other Agricultural Products.
* Owner of the only Modern Rice Mill in West Bengal.

The West Bengal State Co-operative Marketing Federation Limited (BENFED)

Regd. Office :
4, GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA-700 013

Business Office :
18, RABINDRA SARANI (PODDAR COURT)
(Gate No. 3 & 4, 7th Floor)
CALCUTTA-700 001

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ

জয়ন্তকুমার রায়

১৯৮৫ সাল থেকে সোভিয়েত দেশে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ বিষয়টি নানা-ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ রুশ থেকে অন্যান্য ভাষাতে গৃহীত হয়েছে। দুটি শব্দ—পেরেসত্রোইকা এবং গ্লাসনসত—বহুলপ্রচলিত। তৃতীয় একটি শব্দ সমান গুরুত্বপূর্ণ হলেও ততটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি—সেটি হল খোজরাশচট। এই প্রবন্ধে আমরা পরে লক্ষ করব যে, খোজরাশচট হল পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনসত-এর মধ্যে সেতুস্বরূপ। এই তিনটি শব্দের কোনোটিরই পুরোপুরি সঠিক বাঙলা করা সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে পেরেসত্রোইকার অর্থ পুনর্গঠন, গ্লাসনসত-এর অর্থ মুক্ত-মতবিনিময় বা গণতন্ত্রীকরণ, এবং খোজরাশচট-এর মানে আর্থিক স্বয়ম্ভরতা বা স্বশাসন—এগুলি ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বর্তমান ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়; এই জটিল এবং সুবিস্তীর্ণ বিষয়ের মাত্র কয়েকটি অংশ নিয়েই আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনায় সুবিধার জন্য পুনর্নবীকরণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক—এই তিনটি দিকের পৃথক বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করা হবে, যদিও এই তিনটি দিক যে পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, সেটাও মনে রাখা দরকার, এবং আলোচনায়ও সেটা হয়ে উঠবে পরিষ্কার।

এক

প্রথমত, অর্থনৈতিক দিক। সমাজবাদের পুনরুজ্জীবনের একটি মৌলিক ধারণা হল, সমাজবাদ জনগণের সেবার জন্য। সাধারণ মানুষকে জড় পদার্থ হিসাবে গণ্য করে তাকে কাল্পনিক সমাজবাদের দাস ভাবা চলবে না। জনগণের প্রত্যেকেই সজীব ব্যক্তি; তাঁদের শুধুমাত্র আদেশ পালনের মূক-যন্ত্র বলে ধরা যাবে না; এমনকী ওই আদেশ যদি কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অজুহাতে দেওয়া হয়, তাহলেও না। একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে তখনই সফল বলা চলে যখন তা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে পারে। যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনগণের অনাকাঙ্ক্ষিত অথবা নিম্নমানের

দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়, অথচ সংখ্যাতত্ত্বের কারচুপি মারফত পরিকল্পনার লক্ষ্য পরিমাণগতভাবে অর্জিত হয়েছে বলে প্রচার করা হয়, সেই পরিকল্পনাকে পেরেসত্রোইকার প্রবক্তারা সফল আখ্যা দিতে নারাজ। এই ধরনের অনেকগুলি পরিকল্পনার ফল কী হয় তা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পূর্ব-ইউরোপের সমাজবাদী দেশগুলির তুলনা করলে সহজেই বোঝা যাবে। রুমানিয়া বা আলবেনিয়ার মতো দেশগুলিকে বাদ দিলে সোভিয়েত দেশে জীবনযাত্রার মান নিম্নতম। আর যদি পশ্চিম জার্মানি, জাপান, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বা কানাডার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে ওই মান যে আরও অনেক নীচু, সেটা স্পষ্ট হবে। এই পার্থক্য কিন্তু পরম আশ্চর্যের ব্যাপার, কারণ সমগ্র পৃথিবীতে মাথাপিছু সম্পদের হার বোধহয় সোভিয়েত ইউনিয়নেই সর্বাধিক। পেরেসত্রোইকার প্রবর্তকেরা তাই অতীব ব্যগ্র যে যথাশীঘ্র সোভিয়েত দেশের সাধারণ মানুষ সেই সু-উচ্চ জীবনযাত্রার মানের অধিকারী হোন, যা সম্পদের সরবরাহ অনুযায়ী তাঁদের সহজেই প্রাপ্য, অথচ প্রাক্-পেরেসত্রোইকা যুগের অবৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাই সেই মান অর্জন থেকে তাঁদের বহুকাল বঞ্চিত রেখেছে।

সেই ১৯২৯-৩০ সাল থেকেই অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন হয়, তার সঙ্গে আসে ব্যক্তিপূজা এবং খামখেয়ালি, অবাস্তব আদেশ নির্দেশ-নির্ভর প্রশাসন। ফলে, উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থের যে সংমিশ্রণ ঘটলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পথ সুগম হয়, তা সোভিয়েত ইউনিয়নে অলভ্য রয়ে যায়। ওই সংমিশ্রণের প্রয়াস পেরেসত্রোইকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

স্তালিন বলেছিলেন, ক্রমবর্ধমান চাহিদার সর্বাধিক তৃপ্তিই সমাজবাদের মূল অর্থনৈতিক সূত্র। কিন্তু, ইনস্টিটিউট অব স্পেস রিসার্চ-এর পরিচালক রোয়াল্ড সাগদেখেভ লিখেছেন, অতীতে, অর্থাৎ সুদীর্ঘ প্রাক্-পুনর্গঠন যুগে, ওই সূত্র ছিল নিতান্তই অভিলাষ-অঙ্কিত চিন্তা; বাস্তবে ওটা ছিল জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাগাড়ম্বর আর ভণ্ডামি। কৃষি এবং শিল্পে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণের ফলে সোভিয়েত জনসাধারণের প্রয়োজন আর সম্পদের তুলনায় তাদের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক নীচে। এটা কেন ঘটেছে তার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ধরা পড়বে যে, যাকে সমাজবাদ বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে সমাজবাদ থেকে বিচ্যুতি। এই অভিমত যাঁরা পোষণ করেন, তাঁদের একজন হলেন ইকনমিকস ইনস্টিটিউট-এর পরিচালক লিওনিদ আবালকিন। তিনি আমাদের স্পষ্টভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সোভিয়েত ইতিহাসে যা ঘটেছে তা হল সামাজিক প্রগতি আনয়নে সক্ষম বিভিন্ন সম্ভাব্য পথের মাত্র একটির বাস্তবায়ন। কিন্তু সোভিয়েত দেশ আর সমগ্র পৃথিবীর বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, আরও বিবিধ সম্ভাবনা উন্মুক্ত ছিল। ওই সম্ভাবনাগুলি অবহেলা না করলে সোভিয়েত দেশে জনগণের জীবনধারণের মান বহু পূর্বে অনেক বেশি উন্নত হতে পারত।

প্রাক্-পেরেসত্রোইকার কাল

চিন্তার দারিদ্র্য এবং বিকৃতির ফলে যেসব অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়েছে; সেগুলির উদাহরণ দিতে গিয়ে পেরেসত্রোইকার অনুগামীরা সহজেই কৃষি এবং শিল্পের নানা ঘটনাপ্রবাহের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা দাবি করেন, ভ্রষ্ট সমাজবাদ বা স্তালিনবাদ থেকে তাঁরা সার্থক সমাজবাদ বা লেনিনবাদে ফিরে যেতে চান। লেনিনের নয়া অর্থনৈতিক নীতি (অর্থাৎ নিউ ইকনমিক পলিসি, সংক্ষেপে NEP বা নেপ) সোভিয়েত সমাজবাদের অর্থনৈতিক ইতিহাসে অবিশ্বাস্য কৃতিত্বের নজির স্থাপন করেছিল। এই নীতি যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ফলে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে শুধু পুনরুজ্জীবিতই করে নি, পাঁচ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে এই নীতির ফলে

সোভিয়েত অর্থনৈতিক প্রগতি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বের প্রগতির মাত্রাকে স্পর্শ করে, এবং লক্ষণীয়ভাবে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান প্রাক্-মহাযুদ্ধ মানকে অতিক্রম করে। এই অগ্রগতি যে কত চমকপ্রদ, তা বরিস মোজায়েভের একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধ পাঠ করলে বোঝা যায়। ওই প্রবন্ধে মোজায়েভ লিখেছেন, প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বছর আগেই রাশিয়ায় কৃষি আর শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেকগুণ বেশি ছিল—আর জার্মানি বা ফ্রান্সের মতো দেশগুলির তুলনায় ছিল আরও বহুগুণ বেশি। লেনিনের 'নেপ' কৃষকদের যে স্বাধীনতা দেয়, তাতে মাত্র এক বৎসরেই অর্থাৎ ১৯২২ সালে, কৃষকেরা অসাধারণ সাফল্য প্রদর্শন করে। পর-পর তিন বৎসর দুর্ভিক্ষের কবলে থাকা সত্ত্বেও ১৯২২ সালে সোভিয়েত দেশ ওই প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হিসাবে রপ্তানি করে, পরের বৎসর ওই রপ্তানির পরিমাণ প্রায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পায়। ওই উদ্বৃত্ত ছিল সত্যিকার উদ্বৃত্ত, যুদ্ধের সময়ে বলপূর্বক কৃষকদের ন্যূনতম প্রয়োজনের পরোয়া না করে যা ছিনিয়ে নেওয়া হত, ওটা সেই ধরনের উদ্বৃত্ত নয়। সার্থক অর্থনৈতিক নীতির ফসল ওই প্রকৃত উদ্বৃত্ত কৃষিদ্রব্য সোভিয়েত কৃষি আর শিল্পে অসামান্য গতির সঞ্চার করে, এবং সোভিয়েত মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দান করে। যুদ্ধপূর্ব কৃষি-উৎপাদনের মাত্রা ১৯২৫ সালে অর্জিত হয়, আর শিল্পের ক্ষেত্রে ওই মাত্রা অর্জিত হয় ১৯২৭ সালে।

লেনিন-প্রবর্তিত "নেপ"-এর এই অবিস্মরণীয় সাফল্য সত্ত্বেও স্তালিন এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ ১৯২৯ সালেই "নেপ" বাতিল করেন। তাঁরা বাধ্যতামূলকভাবে যৌথ চাষ শুরু করেন। এর বিষময় ফল ছিল নানাবিধ। মানবজাতির ইতিহাসে একটি জঘন্যতম গণহত্যা বা কৃষকবধ অনুষ্ঠিত হল। সুদীর্ঘকাল কৃষি-উৎপাদন ব্যাহত হল। যৌথ চাষ আরম্ভের পূর্ববর্তী বৎসরের—অর্থাৎ ১৯২৮ সালের—কৃষি-উৎপাদন পুনরায় লাভ করা গেল স্তালিনের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে। যৌথ খামার ছিল অনেক সময়েই সরকারি খামারের নামান্তর—এগুলির রাশীকৃত অব্যবস্থার কুফল সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৮০-র দশকেও অনুভূত হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে লেনিন-সমর্থিত ব্যক্তিগত ও সমবায় উদ্যোগ স্তালিনের আমলে বাতিল হওয়ায় যেমন সোভিয়েত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রয়াস চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, তেমনি শিল্পক্ষেত্রে "নেপ"-এর সমবায় ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতার নীতি বর্জিত হওয়ার জন্যও ওই ক্ষতি আরও বেড়ে গেল, এবং দীর্ঘস্থায়ী হল। ১৯৮৮ সালের ২৮ জুন থেকে ১ জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশ সম্মেলনে মিখাইল গোরবাচেভ তাই বলেছেন যে বলশেভিক বিপ্লবের ৭০ বৎসর পরেও বহু জেলায় বাসস্থান, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি এবং চিকিৎসাব্যবস্থা নিম্ন মানের। তা ছাড়া, গ্রামের বাড়িগুলিতে আধুনিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার সরবরাহ অসন্তোষজনক; বিদ্যুৎ-সরবরাহ অনিশ্চিত; গার্হস্থ্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার দুষ্কর; আর রাস্তাঘাটের অবস্থাও শোচনীয়।

১৯৮৮ সালের ২৮ জুন ঊনবিংশ পার্টি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে গোরবাচেভ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বাধ্যতামূলক যৌথ চাষ কৃষি উন্নয়নের মূল শর্তটিই লঙ্ঘন করেছিল। ওই শর্তটি হল, যদি ব্যক্তিকে অবহেলা করা হয়, যদি তার কাজ আর জীবনযাত্রার অবস্থার প্রতি ঔদাসীন্য দেখানো হয়, তাহলে কৃষি-খাতে যত সম্পদই বিনিয়োগ করা হোক না কেন, ঈপ্সিত ফল-লাভ অসম্ভব। অতএব, খেতখামারে উৎপাদনসম্পর্কের পরিবর্তনই পেরেসত্রোইকার কৃষি-নীতির সারবস্তু। এর ফলে কৃষকেরা বদখেয়ালি নির্দেশনামা থেকে পরিত্রাণ পাবে, কর্ষিত জমির কর্তা যে সে নিজেই, এই ভাবনা কৃষককে অনুপ্রাণিত করবে; এবং জমি থেকে তার বিচ্ছিন্নতাবোধ বিদূরিত হবে। যেসব জায়গায় এই বিজ্ঞানসম্মত পুনর্গঠন

কার্যে পরিণত করা হয়েছে, সেখানে শীঘ্রই এর সুফল প্রকট। ১৯৮৮ সালের ১৩ মে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভায় স্বয়ং গোরবাচেভ স্বীকার করেছেন যে, যৌথ বা সরকারি খামারে ২০-৩০ জন বিশারদের সহায়তা সত্ত্বেও যে স্থানে দশকের পর দশক কৃষি-উৎপাদন প্রায় একই অবস্থায় থাকে, ওই স্থলে ইজারা-চুক্তি ইত্যাদি বন্দোবস্ত মারফত এক-একটি কৃষক পরিবার দুই-এক বৎসরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদন বাড়ান, আর গাভী-প্রতি দুধের উৎপাদন দ্বিগুণ বা তারও বেশি করে ফেলেন। এমন উদাহরণও আছে, একটি বৃহৎ খামারের একই ভবনের অভ্যন্তরে যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারের চাষিরা যদি একটি গাভী থেকে বৎসরে ২৫০০ কিলোগ্রাম দুধ পান, চুক্তিবদ্ধ কৃষক পরিবার পান ৪১০০ কিলোগ্রাম।

কৃষকেরা যে এই বিপুল সাফল্য অর্জন করেছেন, তার একটি প্রধান উৎস হল অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের দ্বারা সৃষ্ট স্বাধীনতাবোধ। পরিবারভিত্তিক ইজারা-চুক্তি ইত্যাদি নোতুন ব্যবস্থাপনাপদ্ধতি কৃষকের মনে গভীরভাবে শৃঙ্খলমুক্তির ভাবনা সঞ্চারিত করেছে। কৃষকেরা এখন তাঁদের কর্মক্ষমতা ও সৃজনীশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারছেন, কারণ আর তাঁরা পার্টির বা সরকারের কর্মকর্তাদের অবাস্তব আদেশে জর্জরিত নন—তা বীজবপন, কর্ষণ, বা ফসল আহরণেই হোক, বা গবাদি পশুর গৃহনির্মাণেই হোক। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যায়, গবাদি পশুর যে আবাসস্থল নির্মাণে যৌথ খামারের ব্যয় হবে ১,০০০০০ রুবল, ইজারা-চুক্তি পদ্ধতিতে কর্মরত একজন কৃষক ওটি মাত্র ১৪,০০০ রুবল দিয়ে তৈরি করেন। যৌথ খামারের তুলনায় নিজের খামারে একজন কৃষক ঢের বেশি আন্তরিকতা নিয়ে দীর্ঘতর সময় কাজ করেন। কারণ তিনি নিজেকে জমির কর্তা মনে করেন। বিশ্ববিশ্রুত চক্ষুচিকিৎসক সিভ্‌য়াতোশ্লাভ ফিওদোরভ, যিনি মাইক্রোসার্জারির আবিষ্কারক, তিনি এই যুক্তিতে লিখেছেন যে কৃষকদের ১০০ বৎসরের জন্যও জমি ইজারা দেওয়া উচিত। সেক্ষেত্রে কৃষক আর তাঁর পরিবার এমনভাবে জমির ব্যবহারে আগ্রহী হবেন যে, পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের সন্তান-সন্ততিরা উর্বর জমি ভোগ করতে পারবে। পক্ষান্তরে, সরকারি খামারে সাধারণত জমির শোষণ হয় মাত্রাতিরিক্ত। ফলে, জমির উর্বরতা শুধু যে কমে তাই নয়, দূর ভবিষ্যতে ওই জমি মরুভূমিও হয়ে যেতে পারে।

যেমন কৃষিকার্যে, তেমনি শিল্পক্ষেত্রে, নোতুন অর্থনৈতিক সংস্কার তখনই কার্যকর হবে যখন তা প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থকে প্রভাবিত করবে, এবং প্রত্যেক মানুষের কাছে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হবে। একথা গোরবাচেভ পরিষ্কারভাবে ১৯৮৮ সালের ২৮ জুন তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেছেন। আর পেরেসত্রোইকা-গ্লাসনসত প্রবর্তনের পূর্বে অর্থনীতিবিদ ভিকতর নোভোজিলোভ লিখেছিলেন, সোভিয়েত দেশে পরিকল্পিত অর্থনীতির গণতন্ত্রীকরণ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে, এবং গণতন্ত্রীকরণ হয়েছে কিনা তা তখনই বোঝা যাবে, যখন সঠিকভাবে প্রতিপালিত একটি সরকারি নির্দেশ যাঁদের প্রতি উদ্দিষ্ট তাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থ পুষ্ট করে। প্রাক্-পেরেসত্রাইকা যুগে সাধারণ মানুষের ন্যায্য স্বার্থের ব্যাপারটি ছিল প্রায় অবজ্ঞাত। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে (ব্যতিক্রম বাদ দিলে) নানাবিধ ব্যাধি মারাত্মক আকারে দেখা দিয়েছিল—যেমন সম্পদের অপচয়, অকর্মণ্যতা আর ভ্রষ্টাচার। এর ফলে এক দিকে প্রায় সব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহে অবিরাম ঘাটতি, এবং সর্বব্যাপী কালোবাজার জনসাধারণকে সদাই ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। অপর দিকে, খানিকটা অকর্মণ্যতা আর খানিকটা পার্টির আর সরকারের আমলাদের প্রযুক্তি-উন্নয়নের প্রতি মজ্জাগত উদাসীন্যের ফলে (যা এই প্রবন্ধে পরে আরও বিশদ ভাবে বলা হবে), সমগ্র অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। একটি নির্দিষ্ট উদাহরণে

বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। ১৯৭৯-৮০ সালের একটি হিসেব থেকে জানা যায়, যে পরিমাণ জাতীয় উৎপাদনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নকে ১৪৯০ কিলোগ্রাম কয়লা এবং ১৩৫ কিলোগ্রাম ইস্পাত ব্যবহার করতে হয়, তার জন্য পশ্চিম জার্মানিকে প্রয়োগ করতে হয় ৫৬৫ কিলোগ্রাম কয়লা আর ৫২ কিলোগ্রাম ইস্পাত, আর সুইজারল্যানডকে ৩৭১ কিলোগ্রাম কয়লা আর ২৬ কিলোগ্রাম ইস্পাত। এই হিসেব পশ্চিমী সূত্র থেকে গৃহীত, তাই এটি নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু এই হিসেবের মোটামুটি যথার্থতা প্রতীয়মান হয় ১৯৮৭ সালে দেওয়া মিখাইল গোরবাচেভের মুরমানস্ক বক্তৃতা পড়লে। ওতে গোরবাচেভ অকপটে বলেছেন, সম-পরিমাণ জাতীয় আয়ের জন্য অপরাপর উন্নত দেশ-গুলির তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেশি শক্তি এবং অন্যান্য বাস্তব সম্পদ ব্যয় করতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন যে উন্নয়নের জন্য এভাবে অমূল্য সম্পদের নিদারুণ অপব্যবহার করে যেতে পেরেছে, তার কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বাধিক প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী।

রাষ্ট্রাধীন শিল্পের উপরোক্ত ব্যাধিগুলি নিরাময় করতে হলে যা অবশ্যপ্রয়োজনীয় তা হলে প্রতিটি ব্যক্তিকে—সে কর্মীই হোক বা ব্যবস্থাপকই হোক —তার নিজস্ব কাজের জন্য কঠোরভাবে দায়িত্ব মেনে নিতে হবে। এই প্রয়োজনীয়তার প্রকৃত গভীরতা অনুধাবন করতে গেলে তাতিয়ানা জামলাভস্কায়া কর্তৃক পরিচালিত একটি সমীক্ষার ফলাফল জানতে হবে। যেসব শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবী পেরেসত্রোইকার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রণয়ন প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, জামলাভস্কায়া তাঁদের একজন। তাঁর পথনির্দেশক সমীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা ২০ ভাগেরও কম ব্যক্তি তাঁদের পেশায় যা করণীয় ও সাধ্যায়ত্ত তা করতে উৎসাহী। এর ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে গেলে যেগুলি সমাজবাদী ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হিসেবে দীর্ঘকাল পরিগণিত, সেগুলির কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। পর্যালোচনায় প্রতিষ্ঠিত হবে যে ওই নীতিগুলি সুচিন্তিত ছিল না, এবং এগুলি কর্মে অনীহার স্থায়ী কারণ। একটি মুখ্য দৃষ্টান্ত : চিকিৎসা (এমনকী উন্নততম মানের চিকিৎসা), স্বাস্থ্য-নিবাসে স্থানলাভ, বাসভবন, ইত্যাদি মহার্ঘ দ্রব্য নগণ্য বা বিনা মূল্যে বিতরণ সমাজবাদী ব্যবস্থাপনার অন্যতম মূল নীতি। এই নীতি যখন কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত হচ্ছে তখন কিন্তু ওই দুর্লভ দ্রব্যগুলি কী সূত্র অনুযায়ী বিতরণ করা হচ্ছে, তা জানবার বা অনুসন্ধান করার অধিকার সাধারণ মানুষের থাকছে না। অথচ, ওই দ্রব্যগুলি যে প্রয়োজনের তীব্রতা বা কর্মে বিশেষ নৈপুণ্যের ভিত্তিতে বণ্টন করা হচ্ছে না, তা সহজবোধ্য। উপরন্তু, সাধারণ মানুষের সামনে যা অনায়াসদৃশ্য, তা হল ওই দ্রব্যগুলির বিপুল ঘাটতি, যার সুযোগে পার্টি আর সরকারের প্রভাবশালী আমলারা এগুলির বণ্টনে ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পদের অপচয় এবং ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত থাকতে পারেন। এভাবে নানা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের স্বল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে বিতরণের সমাজবাদী নীতি বাস্তবে সাধারণ মানুষের কর্মে প্রবৃত্তির বিনাশের বা দুর্বলতার জন্য দায়ী। এই ধরনের নীতির অপর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হল মজুরির সমতা। ভণ্ডামিমুক্ত পেরেসত্রোইকার প্রবক্তারা নির্দ্বিধায় এসব নীতিকে বিপজ্জনক গোঁড়ামি বা কল্পনাবিলাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সামাজিক পরগাছাবৃত্তি তাঁদের কাছে অসহ্য। একজন অলস, অকর্মণ্য কর্মী (ব্যবস্থাপক) যা রোজগার করবেন, অপর একজন পরিশ্রমী, কর্ম-কুশল ব্যক্তিও তাই রোজগার করবেন—এটা তাঁরা মানতে রাজি নন। অতএব ক্রমে-ক্রমে, সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে ১৯৮৯ সালের মধ্যে খোজরাশচট বা আর্থিক স্বয়ম্ভরতার (দায়িত্বশীলতার) প্রচলন করা হবে।

১৯৮৮ সালের ২৮ জুনে প্রদত্ত ভাষণে গোরবাচেভ বলেছেন, বেতন-সমতা নির্মূল করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে, প্রতিটি যৌথ উদ্যোগের বিভাগ আর উপবিভাগে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোজরাশচট প্রবর্তন করতে হবে।

১৯৮৫ সাল থেকে আজ পর্যন্ত যেখানেই খোজরাশচটের প্রয়োগ হয়েছে, প্রায় সর্বত্রই অভূতপূর্ব সুফল মিলেছে। কর্মীদের কুশলতা আর রোজগার বেড়েছে, সমগ্র অর্থনীতির ভিত্তিও দৃঢ়তর হয়েছে। পেরেসত্রোইকার সাফল্যের জন্য যেমন খোজরাশচট প্রয়োজন, তেমনি খোজরাশচটের কার্যকরতার জন্য দরকার গ্লাসনসত। খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা বা ব্যবস্থাপনার গণতন্ত্রায়ন খোজরাশচটের একটি প্রধান অবলম্বন। বাস্তব উদাহরণ ছাড়া (শুধুমাত্র তাত্ত্বিক বুলি আউড়ে) এই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি বোঝা যাবে না। মস্কোর উপকণ্ঠে অবস্থিত এক গৃহোপকরণ প্রস্তুতের কারখানা নেওয়া যাক। বহু বৎসর যাবৎ এই কারখানা ক্ষতিতে চলছিল; লাভের কোনো আশাও ছিল না। ওই অবস্থায় একটি আকস্মিক বিস্ফোরণ কারখানাটিকে বিপর্যস্ত করল। ইতিমধ্যে দেশে পেরেসত্রোইকার আবাহন ঘটেছে। অতএব, প্রাক্-পেরেসত্রোইকা যুগের মতো নামমাত্র কাজ করে বা না করে রোজগার অব্যাহত রাখার সম্ভাবনা ক্ষীয়মাণ। অন্যত্র নানা কর্মক্ষেত্রে খোজরাশচটের সাফল্যের বার্তাও ওই কারখানার কর্মীদের কাছে পৌঁছেছিল। তাই, গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে, ওই কারখানার ৪০০ শ্রমিক আর পরিচালক নিজেরাই সরকার থেকে কারখানাটি ইজারা নিলেন। তাঁরা খোজরাশচট প্রয়োগ করলেন, এবং আঠারো মাসে তাঁরা যে-পরিমাণ কাজ করলেন, তা ছিল প্রাক্-পুনর্গঠন যুগের পাঁচ বৎসরের কাজের সমান। অথচ, তাঁদের যন্ত্রপাতি ছিল জীর্ণ, নিজেরাই নিষ্ঠাভরে মেরামত-রক্ষণাবেক্ষণ করে পুরাতন যন্ত্রপাতি দিয়েই তাঁরা কাজ চালু রাখলেন। তা ছাড়া, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে, অথবা কাগুজে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী চাহিদাহীন দ্রব্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে, রাষ্ট্রীয় আমলাবর্গের নানা অবাস্তব নির্দেশও তাঁরা মেনে চলতে বাধ্য ছিলেন। এসব দুস্তর বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কর্মীদের উৎপাদন আর মজুরি বিপুল হারে বেড়েছিল, লাভ হয়েছিল শতকরা ১৫০ ভাগ। এই অভাবনীয় সাফল্যের প্রধান কারণ ছিল, কর্মীরা জীবনে প্রথম তাঁদের কারখানার আয়ের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করেছিলেন—সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করে তাঁরা তাঁদের আয়ের একাংশ দিয়ে বাসভবন, ক্রীড়াঙ্গন ইত্যাদিও নির্মাণ করেছিলেন। পেরেসত্রোইকা, খোজরাশচট আর গ্লাসনসত থেকে যে নোতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যুগ শুরু হয়েছে, তাতে পুরনো যুগে যা ছিল অকল্পনীয়, তা-ই এখন হয়ে উঠেছে প্রেরণাদায়ী বাস্তবতা। যেমন, নতুন যুগে কারখানার পরিচালক নির্বাচনের অধিকার শ্রমিকদের অর্পণ করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনার এই গণতন্ত্রায়ন প্রত্যাশিতভাবেই শ্রমিকদের কাজে আগ্রহ আর দক্ষতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে অগণিত যৌথ, সমবায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ বিপুল সাফল্য অর্জন করেছে। যে কয়লাখনিগুলি পেরেসত্রোইকা অনুযায়ী কাজ করছে, সেগুলিতে আর্থিক আত্মনির্ভরতা এসেছে, শ্রমিকদের বেতন বেড়ে জাতীয় আয়ের তিনগুণ হয়েছে, অন্যান্য সুবিধাও তাঁরা ভোগ করছেন। বেলোরাশিয়া রেলপথের যৌথ উদ্যোগে কর্মীরা উৎপাদন আর লাভের ওপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তাঁদের সমস্তরকম কাজের সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে সম্পদের অপচয়, দুর্ঘটনা, কাজের সময়ের অপব্যবহার ইত্যাদি কমিয়েছেন, এবং বেতনও বাড়িয়েছেন। বেলোরাশিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করে মস্কো রেলপথের কর্মী-ব্যবস্থাপকেরা এত বিশাল পরিমাণ সঞ্চয় করেছেন যে তা থেকে শিশুনিকেতন, বাসভবন ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে। আর যদি জন-

সাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় নানাবিধ পরিসেবার কথা ভাবা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে ইজারা-ভাড়া-চুক্তি ইত্যাদি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে ওই পরিসেবার যা উন্নতি ঘটেছে তা এককথায় অপরিমেয়। কেশসজ্জাই হোক বা জুতো মেরামতই হোক, ট্যাকসি-ভাড়া করাই হোক বা মোটরগাড়ি আর দূরদর্শন যন্ত্র মেরামতই হোক, সব ব্যাপারেই নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সুফল প্রকট। অতীতে আদিম কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় একটি গাড়ি বা দূরদর্শন যন্ত্র মেরামতের জন্য সরকারি সংস্থায় দিলে প্রবল প্রতিপত্তিশালী সরকারি আমলারা কবে ওটা মেরামত করার সময় পাবেন, বা কত উৎকোচ দাবি করবেন, তা ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কিন্তু নোতুন ব্যবস্থায় একদিনেই ওগুলি মেরামত হয়ে যাচ্ছে। পেরেসত্রোইকা, খোজরাশচট আর গ্লাসনসতের জন্য ক্রমবর্ধমান রোজগার আর কর্মপ্রেরণা এবং নিত্যনোতুন প্রচেষ্টার যে ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে, তা থেকে ইজারা-ভাড়া-কর ইত্যাদি বাবদ রাষ্ট্রের আয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মস্কোর উপকণ্ঠে কাছাকাছি দুটি সবজির দোকান। একটি পরিচালনা করেন জনৈকা মহিলা আর তাঁর কন্যা। অপরটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা, সেখানে আঠারো জন লোক কর্মরত। দুটি দোকানের আয় প্রায় সমান-সমান। মা-মেয়ে গ্রাহকদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে না-পড়ে ধৈর্য আর দ্রুততার সঙ্গে তাদের চাহিদা মিটিয়ে দেন। কিন্তু অপর দোকানে কর্মচারীরা অলস আর বদমেজাজি। অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ববৃহৎ উষ্ণ খামারে উৎপাদিত শশা অনেক সময়েই দোকানে পচত। এখন আর ওই শশায় পচন ধরে না, কারণ পেরেসত্রোইকার ফলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের নবজন্ম ঘটেছে, এবং শ্রমিক-ব্যবস্থাপকের কর্মে নিষ্ঠা আর তৎপরতা অনেক বেড়েছে। অতীতে নববর্ষের দিনে তরমুজ খাওয়ার জন্য অনেক আমলাতান্ত্রিক দড়িটানাটানি করতে হত। কিন্তু পেরেসত্রোইকার কল্যাণে এখন অনেক পরিবারই পয়লা জানুয়ারি স্বচ্ছন্দে তরমুজ সংগ্রহ করতে পারছেন। এ প্রসঙ্গে লেনিনকে স্মরণ করা যায়। লেনিন লিখেছিলেন, যদি আমরা স্বয়ম্ভরতার ভিত্তিতে ট্রাস্ট ইত্যাদি বহুবিধ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত করি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রক্রিয়া-গুলি অবলম্বন করেও নিজেদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষণে সমর্থ না হই, তাহলে প্রমাণিত হবে যে আমরা পুরোপুরি নির্বোধ। অবশ্য, পেরেসত্রোইকার পথে এখনও বিস্তর বাধা। রাষ্ট্রায়ত্ত, সমবায় ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ পুনর্গঠনের জন্য যেসব আইন প্রণীত হয়েছে, তাতে অনেক ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া, স্থিত স্বার্থের প্রহরীরা পুনর্গঠনের বিরোধিতায় সক্রিয়। কিন্তু পেরেসত্রোইকার সমর্থকরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ —অতীতের যে ব্যবস্থায় শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের রোজগারের জন্যে বাস্তব কাজের ওপর নির্ভর করতে হত না, যে ব্যবস্থায় নিয়মিত কাজের সময়ে যারা যত অলস, অনিয়মিত সময়ে কাজের জন্য অতিরিক্ত (ওভারটাইম) ভাতা পেয়ে তারা তত বেশি আয়ের অধিকারী, সেই উদ্ভট ব্যবস্থার অবসান তাঁরা ঘটাবেনই।

অর্থনৈতিক পুনর্গঠন-প্রসূত জনস্বার্থ-পোষক নানা ব্যাপারের পর্যালোচনা করে "মস্কো নিউজ" পত্রিকায় দুইজন প্রখ্যাত সাংবাদিক লিখেছেন: এটা এমন একটা সময় যখন অর্থনীতিবিদরা সম্মানিত নায়কের মর্যাদায় ভূষিত হচ্ছেন। তাঁরা নিজেদের হাতে হাতুড়ি ধরছেন না বটে, কিন্তু তাঁরা যেসব কাজ করছেন তার ফলে আজ চুক্তিবদ্ধ দোকানে এমনকী জুতোর পেরেকও নিখুঁতভাবে তাড়াতাড়ি লাগানো হচ্ছে। এই মন্তব্য উদ্ধৃত করার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র দেশগুলিতে (যেমন ভারতে আর বাংলাদেশে), যাঁরা সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং নীতি প্রণয়নে প্রভাবশালী অর্থনীতিবিদ, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তাঁরা কেউই উপরোক্ত সোভিয়েত অর্থনীতিবিশারদের মতো নীতি রূপায়নে অতীব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা,

সংগঠন বা প্রশাসন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। তাঁদের সংখ্যাতাত্ত্বিক জুডো-কারাটের আড়ালে হতভাগ্য জনসাধারণের বহুবিধ ন্যায়সঙ্গত দৈনন্দিন চাহিদা হারিয়ে যায়—পরিকল্পনা দলিলেই হোক, বা ধনী পশ্চিমী দেশে প্রশংসিত গবেষণাপত্রেই হোক, খোজরাশচট সম্পর্কে তাঁদের ন্যূনতম চেতনার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সরকারি ক্ষমতার গরিমায় আচ্ছন্ন থেকে, এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন শত-শত অসুবিধা হতে মুক্ত থেকে, তাঁরা মনে করেন যে কাগজে কলমে তাঁরা যদি জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৫ বা ৬ বলে প্রমাণ (অন্তত প্রচার) করতে পারেন, তাহলেই কর্তব্য সুসম্পন্ন হয়েছে।

পেরেসত্রোইকার তাত্ত্বিক ভিত্তি পরিশীলিত এবং চিত্তাকর্ষক ভাবে রচিত হয়েছে। এর জন্য শুধু অর্থ-নীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানীরাই নন, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিজ্ঞানের বিশারদরাও হাত মিলিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞ ফিওদোরভ লিখেছেন, মানবজাতির ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ যেসব আবিষ্কার ঘটেছে তার মধ্যে দুটি হল মুদ্রা এবং বাজার। বাজারের শক্তিগুলিকে (যা বাজারের উৎস বা বাজার থেকে উদ্ভূত) নিষিদ্ধ করার ফল হল ব্যক্তির উদ্যম ও স্বাধীনতাকে খর্ব করা, অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে অতিকেন্দ্রীকরণ ঘটানো, এবং ব্যক্তির বিযুক্তি বা শোষণের জন্ম দেওয়া। প্রাক্-পেরেসত্রোইকা যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি (অর্থাৎ কমিউনিস্ট দল) সমগ্র অর্থনীতির ওপর অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করত, এবং পার্টির আমলাবর্গ বলপূর্বক বাজারের কার্যাবলী আত্মসাৎ করেছিল। ফলে, সামাজিক সম্পত্তি, যা প্রকৃতপক্ষে জনগণেরই সম্পত্তি, তা আমলার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়। এতে সাধারণ মানুষ উৎপাদনের উপায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং অনিবার্যভাবে শোষিত হয়—প্রকাশ্য কিংবা প্রচ্ছন্ন ধরনে। চূড়ান্ত কেন্দ্রী-করণের বলে অমিতশক্তিধর একজন আমলা মনে করেন যে তাঁর যে-কোনো আদর্শই যুক্তিসঙ্গত এবং অপরিবর্তনীয়, কারণ এ আদেশ স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। এরকম দম্ভের বশবর্তী হয়ে তিনি আর সাধারণ মানুষের (শ্রমিকের বা ক্রেতার) ন্যায়সঙ্গত ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা করেন না। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল—সাধারণ মানুষ নানারূপে বিযুক্তি আর শোষণের শিকার হন। সহজতম উদাহরণ: আমলাদের উদ্ভট আদেশে জনতার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিবর্তে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন বাড়তে থাকে। জটিল এবং প্রকৃষ্ট উদাহরণ: ব্যক্তির কাজ আর আয়ের মধ্যে কোনো যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না ; অলস / অসৎ এবং কর্মঠ / সৎ শ্রমিকদের আয় সমপরিমাণ হলে সৎ, কুশলী কর্মীরা বুঝতে পারেন যে, কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় স্তরে তাঁদের যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না ; অতএব তাঁরা নিজেদের শোষিত বোধ করেন। তা ছাড়া, তাঁদের প্রয়োজন বা স্বার্থ, ভাবনা বা ভাবাবেগ তো ক্ষমতাসীন আমলাদের কাছে অবান্তর, এটা জেনে নিষ্ঠাবান ও নিপুণ কর্মীরা বিযুক্তিবোধে আচ্ছন্ন হন।

যখন সামাজিক সম্পত্তি আমলার সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন (ব্যতিক্রম বাদ দিলে) আমলা এবং শ্রমিকদের মধ্যে অলস, দায়িত্বহীন, অসৎ ও অকর্মণ্য হবার প্রবণতা দেখা দেয়। সম্পদ সংরক্ষণে তাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ লক্ষ করা যায় না ; সম্পত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কোনো হাসপাতালে চশমার কাচ বা ইনজেকশনের যন্ত্র নষ্ট হলে, অথবা দরজার হাতল ভেঙে গেলে, কেউই তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হন না। এক-জন শল্যচিকিৎসক রাষ্ট্রীয় কারখানা থেকে কিছু গুরুত্ব-পূর্ণ যন্ত্রপাতি আসার অপেক্ষায় আছেন ; দীর্ঘ এবং ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিদেশ থেকে ওই যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয়। এভাবে রাষ্ট্রাধীন সংস্থাগুলি যথেষ্ট কার্যকারিতা অর্জনে তথা কর্মপ্রেরণা সৃজনে ব্যর্থ হয়, এবং খেতখামারেও অদ্ভুত-অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। গাছের ফল গাছেই রয়ে গেল, সংগ্রহ

করা হল না। আলু-গাজর হয়তো মাঠেই পচে গেল, অথবা গবাদি পশুকে খাওয়ানো হল। পশুখাদ্যের জন্য যে শস্য চাষ করা হয়েছে, তা দিনের বেলাতেও চুরি হয়ে যায়। পার্টির আর সরকারের আমলাদের ব্যক্তিগত গবাদি পশু নিখরচায় যৌথ বা রাষ্ট্রীয় খামারে প্রতিপালিত হয়। উপরন্তু, আমলাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আহার্য থেকে কমপিউটার পর্যন্ত যে-কোনো দ্রব্যই কালোবাজারিদের করায়ত্ত। কালোবাজারের বার্ষিক লেনদেনের আর্থিক পরিমাণ কত শত বিলিয়ন রুবল, কা সঠিকভাবে নির্ণয় করাও সম্ভব নয়।

আমলাতান্ত্রিক কল্পলোকে (ব্যুরোক্রেটিক ইউটোপিয়াতে) ভাবপ্রবণ সমাজবাদ (সেনটিমেনটাল সোশ্যালিজম) গড়ে তুললে রাষ্ট্রীয় সংস্থায় উপরোক্ত গলদগুলি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এই কল্পরাজ্যে একজন ব্যক্তিকে ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ-উচ্চাশা ও অনুভূতি-সম্পন্ন সজীব মানুষ বলে গণ্য করা হয় না, তাঁকে মনে করা হয় একজন বিমূর্ত শ্রমিক, যিনি প্রতিনিয়ত আমলাবর্গের আদেশ আর আদর্শগন্ধী গণবাণী হজম করে বেঁচে থাকবেন। ওই গলদগুলি দূর করার জন্য পুনর্গঠনের প্রতিভূরা লেনিনবাদকে পুনরুজ্জীবিত করছেন, এবং ব্যক্তিগত উদ্যমের জন্য বাস্তব (আর্থিক) উৎসাহের (পুরস্কারের) যথাযথ গুরুত্ব তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন। পেরেসত্রোইকা, খোজরাশ্চট আর গ্লাসনসত অর্থনীতিতে গণতন্ত্রায়ন ঘটাচ্ছে, উৎপাদনসম্পর্কে পরিবর্তন আনছে, এবং সামাজিক সম্পত্তি জনসাধারণকে প্রত্যর্পণ করছে, যাতে সোভিয়েত বিপ্লবের লক্ষ্যগুলি পূর্ণ মাত্রায় অর্জিত হয়। সামাজিক সম্পত্তির নানা রূপ হতে পারে: রাষ্ট্রায়ত্ত, সমবায়িক এবং ব্যক্তিগত। কেবলমাত্র ধনতন্ত্রীদের সম্পত্তি কেড়ে নেওয়াই নয়, ওই সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত লাভের সমবণ্টনও ছিল সোভিয়েতে বিপ্লবের উদ্দেশ্য। নোতুন যেসব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত হচ্ছে—ইজারা, চুক্তি, আর্থিক স্বশাসন—তাতে বিপ্লবের এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে, কারণ ওই ব্যবস্থাগুলি সার্থকভাবে মেহনতি জনতার কাছে উৎপাদনের উপায় হস্তান্তরিত করছে। যখন সাধারণ মানুষ দেখেন যে, সম্পত্তি তাঁদেরই, এবং ব্যক্তির কাজের গুণ-পরিমাণ এবং রোজগারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা তাঁদের নিজেদেরই আছে, তখন কর্মী হিসেবে তাঁদের জীবনধারণে বিশাল পরিবর্তন আসে। তাঁদের চৌর্যপ্রবৃত্তি লোপ পায়। তাঁরা আর সেইসব আমলাকে ভয় পান না, যাঁদের জীবিকা চৌর্যবৃত্তি অব্যাহত থাকার ওপর নির্ভরশীল, এবং মানুষে-মানুষে অবিশ্বাস গড়ে তোলাই যাঁদের কায়েমি স্বার্থ। ওই ভয় থেকে পরিত্রাণ পেলে, এবং পরিশ্রম আর কুশলতার পুরস্কার পরিদৃশ্যমান হলে, সাধারণ মানুষ আর্থিক উন্নতি ছাড়াও এক অসীম আনন্দের নাগাল পান—সে স্বাধীনতাবোধও আত্মার সমৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়। এই পরিস্থিতিতে, কারখানা-পরিচালক-পদের কোনো প্রার্থী প্রাক্-নির্বাচনী সভায় কর্মকুশলতা আর ডিসিপ্লিনের ওপর তাঁর আস্থা ব্যক্ত করলে শ্রমিকেরা তাঁকেই নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে পিছপাও হন না।

আমলাতান্ত্রিক কল্পরাজ্যে সামাজিক সম্পত্তি জনতার অধিকারে না থেকে আমলাবর্গের অধিকারে থাকার একটি বিষম কুফল হল নেতৃত্ব ও উদ্যমকে শৃঙ্খলিত করা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অপচয় ঘটানো এবং বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে আড়ষ্ট করা। আমলাদের অন্ধবিশ্বাস আর স্বেচ্ছাচারিতা অতীতে অনেক বিজ্ঞানের, বিশেষত প্রাণিবিদ্যার, অগ্রগতি রুদ্ধ করেছে, আর অনেক বিজ্ঞানকেই তুমুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পদার্থবিদ্যা বা বলবিদ্যা যে রেহাই পেয়েছে তার প্রধান কারণ—এবং ইনসটিটিউট অব স্পেস রিসার্চ পরিচালক রোয়াল্ড সাগদেয়েভ এটা অকপটে ব্যক্ত করেছেন—আমলারা বোমা আর ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে আগ্রহী ছিলেন। আজ এটা অবিশ্বাস্য—কিন্তু অতীতে ব্যক্তিপূজার যুগের নির্মম সত্য—যে বিনা কারণে ভ্যাদিলভ-এর মতো প্রখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদদের হত্যা করা হয়েছিল। যাদের হত্যা করা

হয় নি, তাদেরও কিন্তু আমলাদের নিষ্পেষণ থেকে রেহাই দেওয়া হয় নি। একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত: মহাকাশ-ভিত্তিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার প্রধান রূপকার সার্জি কোরোলিওভ ছিলেন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন; তাঁকেও ক্ষমতামদমত্ত মতলববাজ আমলাদের হাতে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু কোরোলিওভ শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও ছিলেন অসাধারণ। তিনি নিজেকে মহাকাশগবেষণায় বিলীন করে দিয়ে জাগতিক জ্বালাযন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হতে পারতেন। তিনি আমলাতান্ত্রিক বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর আবিষ্কারশক্তিতে চমকিত করেছিলেন—আর আমলাবর্গের হাতে কোরোলিওভ-এর হয়রানির ব্যাপারে যিনি লিখেছেন, তিনিও একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ভেসভোলোদ ফিওদোসিয়েভ।

আমলাতন্ত্রের চিন্তার অভ্যাসের জড়তা

কিন্তু যাঁরা কোরোলিওভের মতো অতুলনীয় প্রতিভাধর নন, তাঁদের অনেকে আবিষ্কার আমলাদের অবহেলায় দশকের পর দশক অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছে। অগণিত দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি হল: জনৈক আবিষ্কর্তা কারখানার বর্জিত দ্রব্য থেকে একটি জিনিস তৈরি করেন, যা ব্রোনজের বিকল্প হওয়ায় দেশের জন্য অত্যাবশ্যক ডলার-জাতীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে পারে। বিশ বছর এই আবিষ্কার আমলাদের দ্বারা অবজ্ঞাত রইল। তারপর পেরেসত্রোইকার আমলে ওই আবিষ্কার স্বীকৃতি লাভ করল। অপর একজন আবিষ্কর্তা সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরভাগে তুষারাবৃত সুমেরু অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী বাসগৃহের নকশা তৈরি করেন। কানাডায় তাঁর এই নকশা সমাদৃত এবং ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে তা ২৫ বছরেও গৃহীত হয় নি। অথচ এটা কার্যে পরিণত করা হলে উত্তরাঞ্চল থেকে অভিবাসনের জন্য যে বহু কোটি রুবল খরচা হয় সেটা বেঁচে যেত। কেন এমন ঘটে—এই ধাঁধার উত্তর দিতে গিয়ে ভাদিম বুজিচকিন একটি অতি সরল কিন্তু অসাধারণ বাস্তবসম্মত মন্তব্য করেছেন: বেশির ভাগ আমলার কাছে কোনো কাজ করার চাইতে না করাই সহজ।

প্রতি বৎসর সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপুলসংখ্যক আবিষ্কারের পেটেনট নেওয়া হয়। এই সংখ্যা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি, আর জাপানের সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। অন্যান্য দেশের মতো সোভিয়েত ইউনিয়নেও আমলারা সাধারণত ঝুঁকি এড়িয়ে চলেন, এবং তাঁরা অবাস্তব আদিম নিয়মকানুন অন্ধভাবে অনুসরণে আগ্রহী। অতএব, আবিষ্কার প্রয়োগে তাঁদের উৎসাহ প্রায় নেই। পক্ষান্তরে, জাপানে বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (সোভিয়েত ইউনিয়নের ছাঁচে) পার্টির আমলাবর্গ তো প্রায় অনুপস্থিত, আর জনহিতকর আবিষ্কার নষ্ট করার ক্ষমতা সরকারি আমলাদের নেই বললেই চলে। আজ তাই সোভিয়েত জনগণ এই ভাবনায় বিস্মিত-বিহ্বল—পেরেসত্রোইকার আগে এই ভাবনা ব্যক্ত করাও ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ—যে তাঁদের দেশে যদি পার্টির আর সরকারের আমলাদের সব ব্যাপারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা না থাকত, এবং তাঁদের সব আবিষ্কারগুলির যথাযথ প্রয়োগ ঘটত, তাহলে তাঁদের প্রযুক্তি ও অর্থনীতির কী অপরিসীম প্রগতি দেখা যেত। সৌভাগ্যক্রমে, সোভিয়েত আমলারা অগণিত আবিষ্কার ধ্বংস করলেও, সাধারণ মানুষের উদ্ভাবনী-শক্তি বিনষ্ট করতে পারেন নি। কিন্তু কেবলমাত্র আবিষ্কারের সু-উচ্চ স্তরেই নয়, তুলনায় নিম্নস্তরেও, প্রাক্-পুনর্গঠন যুগে অবাস্তব রীতিনীতির প্রতি আমলাদের অনমনীয় আস্থার জন্য অর্থনীতিতে এক ধরনের অকথিত বিপর্যয় দিনে-দিনে প্রকট হচ্ছিল। কর্মনিরপেক্ষ বেতনসমতার প্রতি আমলাদের অবিচল আসক্তির জন্য উদ্যম এবং নেতৃত্ব ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল। উদাহরণস্বরূপ, যাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে বিশারদ, এবং উচ্চতর পদের জন্য যোগ্য, তাঁরা পদোন্নতির আকাঙ্ক্ষা

অনেক সময়েই দেখাতেন না, কারণ মহত্তর কাজ এবং দায়িত্বের সঙ্গে বেতনের কোনো সামঞ্জস্য ছিল না।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে কেউ যেন এরকম কোনো উদ্ভট সিদ্ধান্তে না আসেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতিকে হেয় করার চেষ্টা হয়েছে। ওই বিশ্লেষণে এবং বিভিন্ন সোভিয়েত পত্রপত্রিকায় পুনর্গঠনের উদ্যোক্তারা যা লিখেছেন—তাতে একথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অতুলনীয় সম্পদ অনুযায়ী যে আর্থিক প্রগতি হওয়া উচিত ছিল, এবং বাস্তবে যা ঘটেছে, তার ব্যবধান অপরিমেয়। ওই ব্যবধান ঘোচাবার জন্য, প্রাক্-পুনর্গঠন যুগের যে গলদগুলি আমলাবর্গের অবদান, সেগুলিকে বর্জন করার চেষ্টা চলেছে। প্রসঙ্গত, আলেকজানদার ভাসিনস্কির একটি সরস মন্তব্য মনে আসে : কিছু না কিছু অগ্রগতি প্রায় সব সময়েই হয়—যখন সামগ্রিক-ভাবে দেশে অচলাবস্থা অনুভূত হয়, তখনও কিছু কাজ চলে, যখন সারা দেশ সংকটাবস্থার প্রায় নিকটবর্তী, তখনও কাজ হয়। কিছু যন্ত্রপাতি সচল থাকে ; চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরোয়, জমিতে ফসল আসে ; রকেটও মহাকাশে ভ্রমণ করে—জীবন তো সচলই থাকে।

আমলাবর্গের বহুবিধ মজ্জাগত বদভ্যাসকে একত্রিত করে আমলাতান্ত্রিকতা (ব্যুরোক্রেটিজম) আখ্যা দেওয়া যায়। এই শব্দটি সোভিয়েত ইউনিয়নে যত বহুল-প্রচলিত, ততটা বোধহয় আর কোথাও নয়। মনে রাখতে হবে যে, আমলাতান্ত্রিকতা আবার অতিকেন্দ্রীকরণের শ্রেষ্ঠ সখা। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো অস্বাভাবিক অবস্থায় অতিকেন্দ্রীকরণ সাধারণ মানুষের উপকারে লাগে, কারণ কিছু বিশেষ পদক্ষেপ দ্রুত নেওয়া যায়। কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে অতি-কেন্দ্রীকরণের কুফল বিষম এবং বহুবিধ। এগুলি হল : ক্ষমতাজনিত মনোবিকার, শীর্ষতম নেতাদের স্বৈরাচারী ইচ্ছাপূরণের জন্যে অধস্তনদের লজ্জাকর আত্মসমর্পণ, এবং যথাযথ বিচার-বিবেচনা না করে বিশাল-বিশাল বাঁধের মতো চমকপ্রদ প্রকল্প গ্রহণ, যাতে ক্ষমতা প্রদর্শনের লালসা চরিতার্থ হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকালীন পরিবেশগত ক্ষতি হয় অপূরণীয়।

প্রসঙ্গত বারংবার স্মরণ করা উচিত যে লেনিন এই ধরনের আমলাতান্ত্রিকতা এবং অতিকেন্দ্রীকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে লেনিন বোধহয় সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ তাত্ত্বিক, যিনি তত্ত্বের ভিত্তিতে অভূতপূর্ব সমাজবাদী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন, অতি দ্রুত স্বকীয় অভিজ্ঞতা থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেন, এবং তাঁর অতুলনীয় মননশীলতা দ্বারা তত্ত্ব ও কার্যক্ষেত্রে তত্ত্বের প্রয়োগ—দুয়েরই পুনর্বিন্যাস করেন। সমাজবাদী অর্থনীতির বাস্তব সংগঠনের অদৃশ্য সমস্যাবলী মার্কস-এঙ্গেলস বিশদভাবে আলোচনা করেন নি। লেনিনের একটি প্রধান মানসিক সম্পদ ছিল সত্যনিষ্ঠা। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের অভিজ্ঞতার নিরপেক্ষ মূল্যায়ন তিনি সত্বর করে ফেলতে পেরেছিলেন, যদিও ওই সময়ের ভুলভ্রান্তি চিহ্নিতকরণ শীর্ষতম নেতা হিসেবে তাঁর কাছে মোটেও সুখকর ছিল না। লেনিন নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছিলেন যে যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের সময়ে বলপূর্বক কৃষকদের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য আদায়, এবং ব্যবসাবাণিজ্যকে দেশব্যাপী খাদ্য-রেশন-বণ্টন-ব্যবস্থায় রূপান্তর, এগুলি ছিল ভ্রান্ত পদক্ষেপ। তিনি মেনে নেন যে প্রতিটি মানুষকে বা কারখানাকে যা সরবরাহ করা হবে, সবকিছুই কেন্দ্রীভূত বণ্টন-ব্যবস্থার মারফত করতে হবে, এটা ছিল সমাজবাদ সম্পর্কে প্রমাদপূর্ণ ধারণার পরিচায়ক। লেনিন স্পষ্টই লিখেছেন, এসব ভুল নীতির ফলে সোভিয়েত বিপ্লবীরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের শিকার হন, তা ছিল প্রতিবিপ্লবীদের সফল আক্রমণ-গুলি থেকেও অনেক বেশি বিপজ্জনক।

কেউ-কেউ লেনিনের নোতুন অর্থনৈতিক নীতি বা "নেপ"-এর কদর্থ করে বলেন যে, বেসরকারি উদ্যোগকে স্বল্পকালীন সুযোগসুবিধা দেওয়াই ছিল

"নেপ"-এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। বস্তুত, "নেপ"-এর কেন্দ্রস্থলে ছিল সাধারণ মানুষের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সমাজবাদী অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন। "নেপ" তাই যেমন ব্যক্তিকে আর্থিক উৎসাহদানের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব স্বীকার করেছিল, তেমনি রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগে আর্থিক স্বাবলম্বনের ওপরও জোর দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ যেন সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁরা যেমন কাজের জন্য ন্যায্য মজুরি বা বেতন পাচ্ছেন, তেমনি ক্রেতা হিসেবে তাঁদের উচিত-স্বার্থসাধনেও সরকার সদাই তৎপর। তাই, অতি সংক্ষেপে বলা যায়, "নেপ"-এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল ব্যবসা-বাণিজ্য-কে এবং দ্রব্য-মুদ্রা-সম্পর্ককে অর্থনীতিতে যথার্থ স্থান দেওয়া, এবং অকর্মণ্য সরকারি উদ্যোগগুলির ঋণভার থেকে রাষ্ট্রের কোষাগারকে মুক্ত করা। যে ভাবপ্রবণ সমাজবাদ সমাজের বাস্তব সমস্যাকে অবজ্ঞা ক'রে মনগড়া আদর্শের স্বপ্নলোকে বিচরণ করে, লেনিন ছিলেন তার বিরোধী। ঐ ভাবপ্রবণ সমাজবাদ থেকেই জন্ম নেয় আমলাতান্ত্রিক কল্পরাজ্য, যেখানে ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত স্বার্থের পরোয়া না করে ব্যক্তিকে চিন্তা-শক্তিহীন আমলাদের স্বেচ্ছাচারী হুকুম প্রশ্নাতীতভাবে পালনের যন্ত্রে পর্যবসিত করা হয়।

কিন্তু লেনিন যেমন বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাত্ত্বিক ভাবনা বা আদর্শ-গত রূপকল্প পরিত্যাগ বা পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁর কোনো-কোনো সহকর্মীর এতে সম্মতি ছিল না। এই সহকর্মীরা যুদ্ধকালীন কমিউনিজমের সময়ে অবাধ কর্তৃত্ব ভোগ করে অত্যন্ত ক্ষমতালোভী হয়ে পড়েন, এমনকী নিজেদের অপ্রতিহত আধি-পত্যের জাদুতেও তাঁরা বিকারগ্রস্ত বিশ্বাস স্থাপন করে বসেন। অথচ ওই নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের ব্যবহারে দেশে যে সঙ্কট এসেছিল, সেটাও তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যেমন তাঁরা এটাও দেখেছিলেন যে লেনিনের "নেপ" ওই সঙ্কট দূর করেছিল। কিন্তু ক্ষমতার লালসায় আচ্ছন্ন ওই নেতারা লেনিনের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরই 'নেপ' বাতিল করেন। এই নীতি পরিবর্তনের অবধারিত কুফল ১৯৩০-এর দশকে প্রকট হল। গ্রামাঞ্চলে দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। আর শহরে বিদ্যমান বিশাল ও জটিল পরিসেবাশিল্প হয় ভেঙে পড়ল, নতুবা তাতে অসহ্য ত্রুটিবিচ্যুতির সৃষ্টি হল। কিন্তু এসব কুফল তো কেবল সাধারণ মানুষকেই ব্যতিব্যস্ত করল। যাঁরা পার্টির বা সরকারের পদস্থ আমলা, তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের বিবিধ সমস্যা থেকে মুক্ত ছিলেন; তাঁরা কর্তৃত্বের অপপ্রয়োগ মারফত নিজেদের জন্য বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণে সফল ছিলেন। এই স্পষ্টত অন্যায্য সমাজব্যবস্থার সমর্থনে একটি উদ্ভট তত্ত্বও খাড়া করা হল: বলা হল যে দ্রব্য-মুদ্রা সম্পর্ক একটি ধনতান্ত্রিক আবর্জনা। সুদীর্ঘকাল এই তত্ত্বকে জীবন্ত রাখা হল। ১৯৫০-এর দশকের প্রথমে 'ইকনমিক প্রবলেমস অব সোশ্যালিজম ইন দি ইউ-এস-এস-আর' গ্রন্থেও দ্রব্য-মুদ্রা সম্পর্কের বিরোধিতা করা হয়। এর কারণও সহজবোধ্য: ওই সম্পর্ক স্বীকার করলে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বাধীন পছন্দের অধিকার মেনে নিতে হয়। আর ওই অধিকার বজায় রাখলে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় আমলাবর্গের যে বিশেষ সুবিধাগুলি আয়ত্তে থাকে, সেগুলি হাতছাড়া হয়ে যায়। কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য, এবং যৌথ খামারগুলিকে সরকারি খামারে রূপান্তরিত করার জন্য, স্তালিন বাস্তব অবস্থাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে বলেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ-খামারগুলি পাশ্চাত্ত্য দেশের বাণিজ্যিক সমবায়গুলির সঙ্গে তুলনীয়। যে সময়ে স্তালিন এই কথা বলেছিলেন তখন তাঁর দেশে যৌথ খামারের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব ছিল এতই ব্যাপক যে যৌথ খামারে কী শস্য ফলানো হবে, এবং কী দামে তা সরকারি সংগ্রহ-কেন্দ্রে বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হবে, সবই নির্ভর করত সরকারি আদেশের ওপর। আর ওই আদেশ ছিল এমন স্বেচ্ছাচারী আর অবাস্তব যে শস্যের দাম যা দেওয়া হত তাতে খামার

থেকে সরকারি সংগ্রহকেন্দ্রে শস্যপরিবহণের খরচাও উঠত না।

মহাশক্তিমান সোভিয়েত অর্থনীতি যে তার শক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশ জনতার সেবায় নিয়োগ করতে পেরেছিল এবং সোভিয়েত জনগণ যে সুদীর্ঘকাল তাঁদের সহজপ্রাপ্য জীবনযাত্রার মানের তুলনায় নিতান্ত নিম্ন মানে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল এই অলীক তত্ত্ব এবং অবাস্তব কার্যকলাপ। ভোগ্যবস্তুর বা উৎপাদনের উপায় উৎপাদন, সর্বক্ষেত্রেই, একটি প্রকৃত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের তুলনায় তারই পাশাপাশি একটি গুপ্ত উদ্যোগ অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টান্ত : একটি কারখানায় ১০০ জোড়া জুতো তৈরি করার জন্য স্থিতিস্থাপক চামড়া দেওয়া হল। তা থেকে ২০০ জোড়া প্রস্তুত হল, এবং বাড়তি উৎপাদন ঐ কারখানার কর্মীদের জন্য কালোবাজারে যে বেসরকারি আয় সৃষ্টি করল, তা কর্মীদের নথিবদ্ধ সরকারি রোজগারের তুলনায় অনেক বেশি। সরকারি ভবনের নির্মাণ-কাজ যেখানে চলেছে, সেখান থেকে বিপুলপরিমাণ মালমশলা পাচার হয়ে যায় ব্যক্তিগত বাড়িঘর বা গ্রীষ্মাবাস নির্মাণের জন্য। কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে যেসব বিবেচনাহীন নির্দেশনামা বেরোয়, তার ফলে কৃষকেরা বাধ্য হয় সেই জমিতে গোপালন করতে যা গম চাষের উপযোগী। পক্ষান্তরে, অনেক সময় তারা গম উৎপাদনে বাধ্য হয় সেই জমিতে, যা গোচারণের পক্ষে প্রকৃষ্ট। যেসব এলাকায় ফল আর সবজির বিপুল উদ্‌বৃত্ত আছে, সেখানকার কৃষিজীবীদের বাধ্য করা হয় নিজেদের এলাকায় তাদের বিক্রয় সীমাবদ্ধ রাখতে, যদিও তার জন্য শতকরা ৫০ ভাগ ফল-সবজি পচে যায়, অথবা পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যেসব এলাকায় ফল-সবজির ঘাটতি আছে, সেখানে ওগুলি বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। এভাবেই প্রাক্‌-পেরেসত্রোইকা যুগে বাণিজ্য আর বাজার ব্যবস্থাকে ধনতান্ত্রিক পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে আমলাদের ক্ষমতালিপ্সা আর সর্বজ্ঞতার দম্ভ চরিতার্থ করা হত।

প্রকৃতপক্ষে ঐ ক্ষমতা-বুভুক্ষু সুবিধাসক্ত আমলারা যেটা বিস্মৃত হয়েছিলেন সেটা হল, সমাজবাদী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কার্যকরতা বিশদভাবে পরীক্ষা করার অধিকার সাধারণ মানুষের আছে, এবং বাজার মারফত যে পরীক্ষা চলে সেটি আসলে সাধারণ মানুষের দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা। উপরন্তু, সমাজবাদী দেশে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যোগদানের অধিকার সাধারণ ক্রেতা বা ভোক্তার আছে, এবং বাজারের শক্তিপ্রবাহকে সচল থাকতে দিলে ওই অধিকারই প্রয়োগ করা হয়। বাজারের শক্তিসমূহকে যথাযথ মর্যাদা বা স্বীকৃতি না দিলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনারই অবমূল্যায়ন বা বিকৃতি ঘটে। কারণ, পরিকল্পনার মাপকাঠিগুলি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে, আর সরকারি নির্দেশগুলি হয়ে যায় দায়িত্বজ্ঞানহীন। যখন বাজার মারফত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলাফল যাচাই করার সুযোগ থাকে না, তখন ব্যয়ের পরিমাণ আর ফলাফলের মধ্যে বিভ্রান্তিকর সমার্থতা সৃষ্টি করা হয়। যখন কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনার অধিকর্তারা সমস্ত ক্ষমতা জবরদখল করে বিশদ অপরিবর্তনীয় নির্দেশনামা প্রেরণ করেন, এবং স্থানীয় স্তরে বিকল্প কর্মসূচী বা কার্যপ্রণালী প্রণয়নের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন নোভোজিলোভের ভাষায়, মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় কাল্পনিক ফলাফল ও নিম্নমানের দ্রব্যাদির পশ্চাদ্ধাবন করে। অথবা, গ্লেব করঝিঝানভস্কির কথায় (যিনি ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর উপ-সভাপতি ছিলেন), এমন সব দায়িত্ববিবর্জিত শিল্পপ্রকল্প প্রস্তুত করা হয়, যেগুলির রচয়িতাদের সদিচ্ছা যদি বা থাকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সেগুলি ভিত্তিহীন। এভাবে, সর্বাধিক খরচা থেকে আসে সর্বনিম্ন ফলাফল। কিন্তু যদি (অতীতে প্রাক-পেরেসত্রোইকা সময়ে) নোভোজিলোভের পরামর্শ অনুসারে কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনার কর্তা-

ব্যক্তিরা মৌলিক নীতি-নির্দেশ সাধারণভাবে বা নমনীয়ভাবে প্রণয়ন করে স্থানীয় স্তরে প্রেরণ করতেন, এবং স্থানীয় স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণকারীদের এই স্বাধীনতা দিতেন যে তাঁরা বাজারনির্ভর বিকল্পগুলি রচনা ও পছন্দ করতে পারবেন, তাহলে ন্যূনতম ব্যয়ে মহত্তম ফলাফল লাভ করা যেত।

যদি ভোক্তাকে, বা জনসাধারণকে, বা বাজারকে, অবজ্ঞা করা হয়, তাহলে, নোভোজিলোভের কথায়, একদিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অপরদিকে ব্যয় সম্পর্কে দায়িত্ব (বা আর্থিক আত্মনির্ভরতা)—এই দুইয়ের মধ্যে বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাম-পন্থী কমিউনিজমের পুনরুজ্জীবনের মতো মারাত্মক বিপদ দেখা দেয়। আর আমলাবর্গ তো একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ, মূল্য, ওই উদ্যোগে কোথা থেকে মালপত্র সরবরাহ হবে, কারা ওই উদ্যোগের উৎপাদন কিনবে, ইত্যাদি—সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখবেন, কিন্তু সিদ্ধান্তের শুভাশুভর কোনো দায়িত্ব তাঁরা বহন করবেন না। সাধারণ কৃষক বা শ্রমিকেরও খানিকটা দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়। কিন্তু আমলাবর্গের নিবাস দায়িত্বশূন্য স্বর্গরাজ্যে। নোভোজিলোভের কিন্তু (প্রাক-গ্লাসনসত যুগেও) এতটা সাহস ও সত্যনিষ্ঠা ছিল যে তিনি লিখেছিলেন, কৃষিজীবী আর কারখানার শ্রমিকদের মতো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে টেবিল-বন্দী আমলাদেরও আর্থিক দায়িত্ব-শীলতার প্রমাণ দেওয়া উচিত; তাঁদের আয়কেও হতে হবে উপার্জিত আয়; বিনা দায়িত্বে নির্দিষ্ট বেতন ভোগ তাঁদের আর করা চলবে না। একমাত্র ওই অবস্থাতেই আমলারা প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীলতা প্রদর্শন করে তেমন-তেমন সিদ্ধান্ত নেবেন, যার ফলে তাঁদের নিয়ন্ত্রণভুক্ত উদ্যোগসমূহের কর্মক্ষমতা বাড়বে, তাঁরা আর এমনভাবে কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করবেন না, যার ফলে সেখান মানুষের উদ্যম, উদ্ভাবনীশক্তি আর নেতৃত্বপ্রদানের ক্ষমতা অপচয়িত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে প্রযুক্তির অগ্রাভিযান এত দুর্বার গতিতে চলেছে যে উপরোক্ত মানবিক গুণাবলীর অভাব ঘটলে দেশের মানুষের প্রত্যাশা পূরণ বা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার টিঁকে থাকা দুরূহ হয়ে ওঠে।

যখন একটি সমাজবাদী অর্থনীতি (যেমন চীনে বা সোভিয়েত ইউনিয়নে) পুনর্গঠন বরণ করে নেয়, এবং সেজন্য বাজারের শক্তিসমূহের ওপর প্রয়োজনীয় আস্থা স্থাপন ক'রে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অপচয় হ্রাসের প্রয়াস নেয়, তখন কিন্তু সেখানে এসব করা হয় পরিকল্পিত অর্থনীতি ও উৎপাদনের উপায়ের ওপর সামাজিক মালিকানার সামগ্রিক কাঠামোর অভ্যন্তরে। দ্রব্য-মুদ্রা-সম্পর্কের যে তাৎপর্য আছে সমাজবাদী অর্থনীতিতে, সে তাৎপর্য মূলধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নেই। লাভ, ভাড়া, ইত্যাদির প্রকৃতি সমাজবাদী আর মূলধনশাসিত অর্থনীতিতে এক নয়। অর্থনীতি-বিদ নিকোলাই পেত্রাকভ লিখেছেন: এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে অনুধাবন করতে হবে কারা, এবং কী উদ্দেশ্যে, আর্থিক-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করছেন। একটি মূলধনশাসিত অর্থনীতিতে যেমন সম্পূর্ণ মুক্ত বাজার থাকে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ধনতান্ত্রিক চরিত্র বিনষ্ট হয় না, তেমনি একটি সমাজবাদী অর্থনীতিতে পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু না থাকলেই তার সমাজবাদী চরিত্র অবলুপ্ত হয় না। "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, মূলধন-তন্ত্রের আমলে কিছু-কিছু ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে, এবং সমাজবাদী আমলে ওগুলি মূলধনতন্ত্রের আমলের ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে মুক্ত হয়। পেরেসত্রোই-কার সমর্থকেরা মার্কসের এই বক্তব্য সঙ্গত কারণেই স্মরণ করছেন।

দুই

রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কার

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পুনর্নবীকরণের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিক হল রাজনৈতিক-প্রশাসনিক। এই প্রবন্ধের প্রথমাংশের আলোচনা থেকে এটা মোটামুটি স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কার মারফত পার্টির আর সরকারের আমলাবর্গের ক্ষমতা আর কার্যাবলী ব্যাপকহারে না কমালে, বা সেগুলির পুনর্বিন্যাস না করলে, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সফল হবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন অর্থনীতির গণতন্ত্রীকরণের ওপর নির্ভরশীল, তেমনি অর্থনীতিতে গণতন্ত্র প্রবর্তন রাজনীতি ও প্রশাসনের গণতন্ত্রায়নের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা সহজেই অনুধাবন করা যাবে যদি আমরা বহু উদাহরণের মধ্যে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ করি, যা থেকে বোঝা যাবে যে আমলাবর্গের একাংশ অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বাধা দিচ্ছেন—কখনও সূক্ষ্ম, কখনও স্থূল উপায়ে। এখনও অনেক আমলা আছেন, যাঁরা জনসাধারণের অত্যাবশ্যক চাহিদা মেটানোর পরিবর্তে নিজের দম্ভ আর ভোগলালসা চরিতার্থ করাকেই অগ্রাধিকার দেন, এবং অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, বিলাসবহুল বিশ্রামভবন বা শিকারগৃহ নির্মাণ করেন। সেখানে বিলিয়ার্ড খেলার ঘর, 'সনা'-স্নানাগার, বহুমূল্য ঝাড়লনঠন ইত্যাদি অনেক বন্দোবস্ত থাকে।

আমলাতন্ত্রের পক্ষ থেকে পুনর্গঠনের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে। আপত্তি এই রকমের—পুনর্গঠনের ফলে একটি কৃষিজীবী পরিবার চুক্তিব্যবস্থা অবলম্বন করে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা বার্ষিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ালেন। যে আয় প্রচণ্ড পরিশ্রম মারফত উপার্জিত, সেই আয়ের অধিকারীকে অর্থপিশাচ বলা যায় না। কিন্তু পুনর্গঠন-বিরোধী আমলারা এই পরিশ্রমী ব্যক্তিদের অন্যায়ভাবে অর্থলোভী হিসেবে চিহ্নিত করছেন—অবশ্য এটা তাঁরা করছেন গোপন রটনায়। প্রকাশ্যে এটা না করার চাতুর্য আমলাদের আছে। শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা যখন পেরেস-ত্রোইকার সপক্ষে বক্তৃতা দেন, তখন ওই আমলারাই হর্ষধ্বনি দেন। কার্যক্ষেত্রেও আমলারা এই ধরনের দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করেন। যখন কোনো একটি সমবায় উদ্যোগ অপরাপর কারখানার বর্জিত পদার্থ থেকে এমন একটি দ্রব্য উৎপাদনের প্রকল্প প্রস্তুত করেন যা বৈদেশিকমুদ্রার সাশ্রয় ঘটাবে এবং পরিবেশ রক্ষা করবে, তখন আমলারা ঐ সমবায়কে পুনর্গঠনের পথিকৃৎ বলে প্রশংসা করবে না। কিন্তু, বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও, এবং জমির কোনো অভাব না থাকলেও, আমলারা ঐ সমবায়কে জমিবণ্টনে অযথা বাধা-বিলম্বের সৃষ্টি করেন। অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখার কাজ—যার গুরুভার কেবল বহুসংখ্যক ব্যবস্থাপনার কর্মী নিয়োগকারী উদ্যোগই বহন করতে পাবে—সেই কাজ ছোটোখাটো সমবায়ের ওপরও আমলারা চাপিয়ে দেন। ওই সমবায় যদি ব্যবহৃত পদার্থের পুনর্ব্যবহার করে টিনের মতো দুষ্প্রাপ্য ধাতু তৈরির প্রকল্পও গ্রহণ করে থাকে, তাহলেও সব আমলাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায় না। কোনো কোনো আমলা ব্যক্তিগত উদ্যোগ সংক্রান্ত আইনেরও এমন অপব্যাখ্যা দেন যে একজন উদ্যমী ব্যক্তি কাগজপত্র তৈরির কাজেই প্রায় ডুবে যান, অথচ ওই কাগজপত্র প্রস্তুতের কাজ প্রায় পুরোটাই পরিহার্য। এভাবে এখনও পর্যন্ত কিছু-কিছু আমলা পেরেসত্রোইকাকে মৌখিক সমর্থন জানিয়ে কার্যক্ষেত্রে তাতে বাধা দিচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে আমলাবর্গ সম্পর্কে মার্কসের একটি বক্রোক্তি প্রণিধানযোগ্য : আমলাবর্গের উচ্চ ও নিম্ন স্তরের ভেদাভেদের ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় তাঁদের বিদ্যাবত্তা; কোনো বিষয়ের বিশদ ব্যাপারগুলি অনুধাবনের দায়িত্ব উচ্চপদস্থ আমলারা নিম্নপদস্থদের ওপর দেন, আর সমগ্র বিষয়টি বোঝার দায়িত্ব যে উচ্চপদস্থ আমলাদের, সেটা নিম্নপদস্থরা মেনে নেন,

এবং এভাবে সব আমলারাই প্রতারিত হন। এ যুগের রাজনৈতিক-ভাষ্যকার লিওনিদ লিখোদেয়েভ লিখেছেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে সব আমলারা মনে করেন তাঁরা সবজানতা, এবং সব সময়েই তাঁরা ঠিক করেন। অ্যাকাডেমিসিয়ান ভ্লাদিমির সোকোলোভের লেখা থেকে জানা যায়, কয়েকজন সোভিয়েত আমলা একবার দাবি করলেন যে জাতীয় উদ্যানগুলি থেকে লাভ আসা উচিত। পরিবেশ সংরক্ষণে কী গভীর অনাসক্তি থাকলে আমলারা এই ধরনের উদ্ভট দাবি তুলতে পারেন, তা সহজ-বোধ্য। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নে শতকরা মাত্র এক ভাগ জমি সরকার সংরক্ষণের আওতায় এনেছেন, আর জাপানে এর পরিমাণ শতকরা আঠারো ভাগ, যদিও জাপানে জনবসতির ঘনত্ব অনেক বেশি—অতএব জাপানে জাতীয় উদ্যান ইত্যাদি স্থাপন করা সোভিয়েত দেশের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন। উপরন্তু, মূলধনশাসিত দেশগুলিতেও জাতীয় উদ্যান বিপুল-পরিমাণ ভরতুকির ওপর নির্ভরশীল। তাই উপরোক্ত সোভিয়েত আমলারা যখন জাতীয় উদ্যানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠান করতে চাইলেন, তখন তাঁদের বক্তব্য শুধু সমাজবাদ-বিরোধী নয়, প্রায় অসামাজিক পর্যায়ে চলে গেল। বিশেষত, ওই আমলাদের সহ-কর্মীকে যেখানে যুগের পর যুগ অগণিত শিল্পোদ্যোগ ক্ষতিতে চালাচ্ছেন, সেখানে জাতীয় উদ্যানের ওপর এই বিধিনিষেধ আরোপের চেষ্টা আমলাদের অজ্ঞতা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া, ছোটোখাটো কর্মসূচীও—যেমন একটি প্রকৌশল কারখানার স্বাস্থ্য কর্মসূচী—আমলাবর্গের আবিষ্কৃত নানা নির্দেশ (ও বিধিনিষেধ) লঙ্ঘন না করে চালানো যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নে তৈলশোধন ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের মন্ত্রী নিকোলাই লেমায়েভ অতীতে দুই দশকেরও বেশি সময় একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার পরিচালক ছিলেন। ওই কারখানার কাজ তিনিই শুরু করেন, এবং তাঁর পরিচালনায় কালক্রমে ওই কারখানা পেট্রোক্যামিক্যাল শিল্পের ২০০ উদ্যোগের মধ্যে বৃহত্তম স্থান অধিকার করে। স্বয়ং লেমায়েভ অকপটে ব্যক্ত করেছেন যে সোভিয়েত অর্থনীতি প্রায় ২ লক্ষ আমলাতান্ত্রিক নির্দেশের ভারে ন্যুব্জ, এবং বেশির-ভাগ নির্দেশই বহুকাল পূর্বে বাতিল করা উচিত ছিল; তা ছাড়া, তিনি যে কারখানা-পরিচালক হিসেবে তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন, তার একটি প্রধান কারণ তিনি অগণিত নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন।

লিখোদেয়েভ একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, আমলাদের এক অসাধারণ ক্ষমতা হল যে তাঁরা তাঁদের ঔদ্ধত্য আর প্রকৃত জ্ঞানকে সমতুল্য মনে করতে পারেন। উৎপাদন-ও বণ্টন-ব্যবস্থায় অতিকেন্দ্রীকরণের ক্ষমতার নেশায় মত্ত আমলাদের স্বৈরাচারী নির্দেশগুলিকে জোরদার করে—আবার, এসব নির্দেশও অতিকেন্দ্রী-করণকে অধিকতর দৃঢ়মূল করে। ফলে, কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিই হোক বা ভোগ্যপণ্যই হোক, প্রায় সব দ্রব্যেরই একটানা ঘাটতি লেগেই থাকে। ভাগ্যহীন ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়, বহু উদ্যোগে বিবেকবান কর্মী আর ব্যবস্থাপকেরা এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হন। আইন ও সুনীতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, সৃষ্টি হয় নতুন ধরনের ব্যক্তির, যাঁদের (আলেক-জানদার বোরিন-এর ভাষায়) 'নিঃস্বার্থ অপরাধী' আখ্যা দেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মস্কোর এক কার-খানার প্রধান প্রকৌশলী দেখলেন যে, তাঁর একটি সিমেন্ট পাম্প শীঘ্র প্রয়োজন। স্বাভাবিক উৎস থেকে ওই পাম্প পাওয়া অসম্ভব, অতএব সমগ্র কারখানার উৎপাদনই স্তব্ধ হয়ে যাবে। কারখানা চালু রাখার জন্য একটি পথই খোলা ছিল: পার্শ্ববর্তী এক কার-খানায় একটি অপ্রয়োজনীয় সিমেনট পাম্প অলস অবস্থায় ছিল, এবং ওই কারখানার এক কর্মীকে উৎকোচ দিয়ে পাম্পটি জোগাড় করা যায়। এই পথ

অবলম্বন করে উপরোক্ত প্রধান প্রকৌশলী তাঁর উদ্যোগ চালু রাখলেন, যদিও এতে তাঁর কোনো ক্ষুদ্র বা গোপন ব্যক্তিগত সুবিধা জড়িত ছিল না। দুর্ভাগ্য-ক্রমে, ভবিষ্যতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, আর বিচারে তাঁর কারাবাস হয়। কিন্তু যেটা মনে রাখা উচিত সেটা হল যে উক্ত প্রকৌশলীর মতো অনেক নিঃস্বার্থ আইনভঙ্গকারীই ধরা পড়েন না, এবং সেজন্যই অসঙ্গত আমলাতান্ত্রিক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও অনেক উদ্যোগ চালু থাকে। আরও যেটা মনে রাখা অবশ্য-কর্তব্য, সেটা হল, যন্ত্রপাতি বা ভোগ্যপণ্যের নিরন্তর ঘাটতির জন্য দায়ী যেসব ক্ষমতাশালী আমলারা (এবং তাঁদের অযৌক্তিক নির্দেশাবলী), সেই আমলাদের কিন্তু ঘাটতির জন্য কোনো অসুবিধা সহ্য করতে হয় না। কারণ, তাঁরা সব ব্যাপারেই বিশেষ সুবিধার অধিকারী: তাঁদের জন্য সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের দোকানে কোনো কিছুর অভাব নেই; তাঁদের জন্য স্বল্প অথবা বিনা মূল্যে পাওয়া যায় বিলাসবহুল আবাসগৃহ, উচ্চমানের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এবং চালকসমেত মোটরগাড়ি এখনকী বিমান, রেল, থিয়েটার, সিনেমার টিকিটের জন্যও আছে পৃথক নির্ঝঞ্ঝাট বন্দোবস্ত। উপরন্তু, আমলা-সৃষ্ট ঘাটতির ওপর নির্ভরশীল যে কালোবাজার, তা থেকেও অনেক আমলা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। প্রাক্-পেরেস-ত্রোইকা যুগে এসব উচ্চপদস্থ লুটেরাদের শাস্তি হওয়া ছিল প্রায় অভাবনীয়। পেরেসত্রোইকার আমলে এঁদের অনেকেই শাস্তি পাচ্ছেন।

যে বহুস্তরবিশিষ্ট আমলাবর্গ সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর, যাঁরা কাল্পনিক কাজ-কর্মেই পারদর্শী, তাঁদের সংখ্যা আর ক্ষমতা হ্রাস করা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র পুনর্নবীকরণের একটি প্রধান পূর্বশর্ত, একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ঊনবিংশ পার্টি কনফারেন্সে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর মুরমানস্ক বক্তৃতায় গোরবাচেভ খেদোক্তি করেছিলেন যে সারা দেশে আমলার সংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। (দেশের জনসংখ্যা প্রায় ২৮ কোটি ১০ লক্ষ।) ইউনিয়ন (বা কেন্দ্রীয়) স্তরে মন্ত্রণালয় ইত্যাদির সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে হয়েছিল ১০০, আর পরবর্তী বা রিপাবলিক স্তরে ৮০০। পেরেসত্রোইকার ফলে ইতিমধ্যে কতকগুলি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। আর ১৯৮৮ সালের ২৮ জুন গোরবাচেভ তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, ক্রমে-ক্রমে ইউনিয়ন স্তরে শতকরা ৪০ ভাগ সরকারি দফতর লুপ্ত হয়ে যাবে; অনুরূপভাবে নিম্নবর্তী বিভিন্ন স্তরে শতকরা ৩৩ থেকে ৫০ ভাগ সরকারি দফতর তুলে দেওয়া হবে।

পুনর্গঠনের যুগে কোথাও-কোথাও আমলাদের কাজে গাফিলতির জন্য বা অনাচারের জন্য শাস্তি পেতে হচ্ছে—যেমন, সিদ্ধান্ত রূপায়নে বিলম্বের জন্য, অথবা সাংবাদিকদের হয়রানি করার জন্য। কয়েক বৎসর আগে আমলাদের এসব ব্যাপারে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল অচিন্তনীয়। আমলাদের আচরণেও নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। গ্লাসনসতের যুগে দূরদর্শনের কর্মকর্তারা কোনো ব্যক্তি বা গল্প-আলোচনাকে স্বেচ্ছাচারী ভাবে অবাঞ্ছিত আখ্যা দিতে পারেন না, কোনো বিষয়কে নিষিদ্ধ তালিকায় পাঠাতে পারেন না। একটি শহরে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের এক গোষ্ঠী নিজেদের সরকারি পঞ্জীভুক্ত করতে চান: তাঁদের ইচ্ছা, শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি পুরনো বাড়ি কিনে সেটিকে তাঁরা উপাসনাস্থল হিসেবে ব্যবহার করবেন। আমলাদের কাছে তাঁরা দরখাস্ত পাঠান। কিন্তু গ্লাসনসতের যুগেও কিছু আমলা প্রাক্-গ্লাসনসত ভাবধারায় আচ্ছন্ন। অতএব ওই দরখাস্ত প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং দরখাস্ত-কারীদের উৎপীড়নও করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্লাসনসতের নাগরিকদের জয় হয়। ঈশ্বরবিশ্বাসীরা নিজেদের পঞ্জীভুক্ত করাতে সফল হন। এটাও লক্ষণীয় যে গণতন্ত্রীকরণের যুগে কেবলমাত্র কারখানার পরি-চালকদের জন্যই নয়, পুলিসবাহিনীর মতো সরকারি

ক্ষেত্রেও নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে—যেমন, শহরের কোনো এলাকার পুলিশ-প্রধানের পদের জন্য, অথবা একটি জেলার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বিভাগের যে প্রধান, তার পদের জন্য। এভাবে আমলাবর্গের সংস্কারের জন্য ব্যাপক প্রয়াস চলেছে। কিন্তু এই সংগ্রামের অনেকটাই এখনও অসম্পূর্ণ, এবং তাই আগামী দিনেও ওই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে—এটা উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সের অন্যতম সিদ্ধান্তেও জোর দিয়ে বলা হয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্রের সুপ্ত গণতান্ত্রিক ক্ষমতাকে জাগ্রত, প্রতিষ্ঠিত, উন্নত করার জন্য লেনিনের প্রয়াস ছিল ঐকান্তিক। কিন্তু ব্যক্তিপূজার যুগে, যা পেরেসত্রোইকার আবাহনের আগে অবধি অনেক দশক স্থায়ী ছিল—আমলাতান্ত্রিক বাস্তবতা সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শকে পরাস্ত করে। সোভিয়েতগুলির, অর্থাৎ আইনসভাগুলি ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয় কার্যনির্বাহী সংস্থাগুলি। জনপ্রতিনিধিরা আমলাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সে তাই সোভিয়েত সমাজের গণতন্ত্রীকরণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে কার্যনির্বাহী সংস্থার ওপর সোভিয়েতের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে, এবং সরকার, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সোভিয়েতের কার্যাবলী বাড়ানো হবে।

এই পদক্ষেপের মতো আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে জনসাধারণের কাছে সরকারকে নামমাত্র-ভাবে নয়, প্রকৃতপক্ষেই, দায়বদ্ধ করা যায়। যে পদক্ষেপগুলি উপরোক্তটির চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল : পার্টি-সরকার সম্পর্ক এবং পার্টির সংগঠন ও কার্যাবলী পুনর্বিন্যস্ত করা। পার্টি নিজেকে আদর্শগত, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজে আবদ্ধ রাখবে, আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু অতীতে পার্টি সরকারের নানা কাজ আত্মসাৎ করে, যদিও তার পেছনে কোনো আইনের সমর্থন ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, পার্টি সরকারের বিভিন্ন পদে নিয়োগের ব্যাপার স্থির করত, এবং সরকারি আমলাদের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ অনবরত (টেলিফোনে বা অন্যভাবে) পাঠাত। উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে পার্টির হাত থেকে এসব সরকারি কাজ করার ক্ষমতা তুলে নেওয়া হবে।

পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্র গড়ার ব্যাপারে লেনিন ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর ঘোষণায় আচরণে এটা ছিল প্রকট। শুধুমাত্র লেনিনের রচনাবলীই নয়, তাঁর আমলে পার্টির রীতিপদ্ধতিসম্বলিত পুস্তক (ম্যানুয়াল), অগণিত সিদ্ধান্ত, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদিতে পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের নীতিমালা, কর্মপদ্ধতি আর আচরণের ব্যাপারগুলি ক্রমাগত ব্যাখ্যা আর পরিশীলিত করা হয়েছিল। এসব অমূল্য নথিপত্র লেনিনের আমলে সর্বদা খোলাখুলি ব্যবহৃত হত। কিন্তু, লিওন ওনিকোভ লিখেছেন, পরবর্তী কালে স্তালিন ওগুলিকে গোপন দলিলে পরিণত করেন, এবং পার্টির লেখ্যাগারে লুকিয়ে রাখেন। এরপর স্তালিন যা করলেন তা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। তিনি মুখে বললেন যে তিনি লেনিনের অনুসারী। কিন্তু বাস্তবে তিনি গোপন নিয়মকানুন দ্বারা যে-পার্টিতে লেনিন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেখানে আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ স্থাপন করলেন। খোলাখুলি আলোচনা, যৌথ নেতৃত্ব, পার্টির নির্বাচিত আমলা এবং পার্টির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ—লেনিন ছিলেন এসবের ওপর আস্থাশীল। এর বিপরীতে, স্তালিন পছন্দ করতেন গোপন শলাপরামর্শ। এক ব্যক্তির (অর্থাৎ তাঁর নিজের) শাসন, এবং নিয়োগপ্রাপ্ত, সার্বক্ষণিক, বেতনভোগী পার্টির আমলা এবং কর্মী। লেনিনের সময়ে পার্টির আমলাদের সংখ্যা ছিল স্বল্প, এবং সাধারণ পার্টির সদস্যদের পার্টির কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল প্রচুর। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মস্কোতেই কয়েকটি জেলা পার্টি কমিটিতে একজন আমলা-পিছু ত্রিশজন সাধারণ সদস্য ছিল, যাঁদের ছিল প্রশিক্ষণ।

স্তালিনের সময়ে, পার্টির সাধারণ সদস্যরা পার্টির কাজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন, এবং পার্টির আমলারা পার্টির নির্বাচিত সংস্থাগুলির ক্ষমতা অপহরণ করলেন। পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনসতের একটি প্রধান লক্ষ্য হল পার্টির ব্যাপারে লেনিনবাদকে ফিরিয়ে আনা। এজন্য উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সের একটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে, পার্টির প্রশাসনযন্ত্র নির্বাচিত সংস্থাগুলির কাজকর্ম জবরদখল করে নেবে, এবং একজন কমিউনিস্টের ভূমিকা পর্যবসিত হবে পার্টির সভায় উপস্থিত হওয়ায় এবং প্রার্থী-তালিকায় আর খসড়া প্রস্তাবে বিনা বিতর্কে সম্মতি দেওয়ায়—এই অবস্থা আর অনুমোদনযোগ্য নয়।

সোভিয়েত সমাজের গণতন্ত্রীকরণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত উনবিংশ পার্টি কনফারেন্সে গৃহীত হয়েছে, তাতে লেনিনপ্রদর্শিত পথে পার্টিকে পুনর্গঠিত করার জন্য নানা পদক্ষেপের কথা বিশদভাবে বিবৃত আছে। যেমন, ওই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে নতুন সদস্যদের পার্টিতে প্রবেশের ব্যাপারটি খোলাখুলি পার্টির সভায় আলোচনা হওয়া উচিত। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রবেশ-প্রার্থীদের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা (কোটা) স্বৈরাচারী ভাবে বেঁধে দেওয়া চলবে না। পার্টিতে প্রবেশের যোগ্যতা হিসেবে ব্যক্তিগত গুণাবলী যাচাই করতে হবে—প্রার্থীদের নৈতিক চরিত্র, কাজের প্রতি মনোভাব, এবং পেরেসত্রোইকা প্রচলনে তাঁদের ভূমিকা ইত্যাদির ওপর জোর দিতে হবে। সর্বস্তরে পার্টি কমিটির সদস্য এবং সেক্রেটারিদের একাধিক প্রার্থীর মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং গোপন ব্যালট মারফত নির্বাচিত হতে হবে। পার্টির আমলাবর্গের সংখ্যা কমাতে হবে, পার্টির নির্বাচিত সংস্থাগুলির কাছে তাঁরা থাকবেন দায়বদ্ধ, এবং অধস্তন পার্টির সংস্থায় নির্বাচিত ব্যক্তিদের কার্যকাল সীমাবদ্ধ থাকবে পাঁচ বৎসরে, যদিও দু-তিন বৎসর অন্তর নির্বাচিতদের এক-পঞ্চমাংশকে পুনর্নির্বাচিত হতে হবে, এবং অযোগ্য সভ্যদের কার্যকাল মেয়াদ ফুরোবার আগেই শেষ করে দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকবে। উপরন্তু, পার্টির কোনো একটি পদে একজন ব্যক্তিকে পর পর দুইবারের বেশি নির্বাচিত করা উচিত নয়। অতীতে যাঁরা দীর্ঘদিন পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদে সমাসীন থাকতেন, তাঁদের অনেকেই মনে করতেন যে তাঁরা কোনো ভুলত্রুটি করতে পারেন না, এবং তাঁদের কোনো বিকল্প ছিল না। এভাবে তাঁদের নৈতিক অবনতি ঘটে, এবং তাঁরা ক্ষমতার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। এ ছাড়া, অতীতে পার্টির উচ্চতর সংস্থাগুলি নিম্নতর সংস্থাগুলির ওপর অন্যায়ভাবে তাদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিত। উনবিংশ পার্টি কনফারেন্স পার্টির নিম্নতর সংস্থাগুলিকে যথাযথ স্বাধীনতা দানের পক্ষে মত দিয়েছে। তা ছাড়া, এই কনফারেন্স সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সমস্ত পার্টি সংগঠন খোলাখুলিভাবে কার্য নির্বাহ করবে, এবং সভার কার্যবিবরণী এবং সিদ্ধান্ত পুরোপুরি প্রকাশ করবে। ব্যক্তিপূজার যুগে পার্টিতে সুযোগসন্ধানী আর সময়সেবীদের ভিড় জমেছিল। এই সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত হলে এদের সরে যেতে হবে।

যেমন পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে, তেমনি সরকারি সংস্থাগুলিতে, অর্থাৎ সর্বস্তরের সোভিয়েতগুলিতে এবং সোভিয়েত-সৃষ্ট সংগঠনগুলিতে গণতন্ত্র প্রচলনের জন্য উনবিংশ পার্টি কনফারেন্স একই রকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে: এগুলি হল, সংক্ষেপে, একাধিক প্রার্থীর নির্বাচনে প্রতিযোগিতা, গোপন ব্যালটে ভোট, কার্যকালের সীমিত মেয়াদ ইত্যাদি। উপরন্তু, এই কনফারেন্স শীর্ষস্থানীয় সরকারি সংস্থাগুলির ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে বার্ষিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেবে কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ। প্রশাসন, আইন-প্রণয়ন এবং ব্যাপক পর্যবেক্ষণের জন্য এই কংগ্রেস যে স্থায়ী সংস্থা গঠন করবে, সেটি হল ক্ষুদ্রাকার দুই-সংসদ-বিশিষ্ট সুপ্রীম সোভিয়েত তা ছাড়া, সোভিয়েত

ইউনিয়নের মতো বিশাল, বহুজাতিক দেশের চাহিদা সঙ্গতভাবে পূরণের জন্য স্থানীয় স্তরে উদ্যোগ এবং স্বাধীনতা যথাসম্ভব বাড়ানো দরকার। অতএব, ঊনবিংশ পার্টি কনফারেন্স সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সরকারি কাজ ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস এবং বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে।

এই নতুন সংস্থা কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ-এর গঠনপ্রণালী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এতে কেবলমাত্র চিরাচরিত এলাকাভিত্তিক কেন্দ্র থেকেই প্রতিনিধিরা আসবেন না, তাঁরা আসবেন আরও বহুবিধ নাগরিক সংস্থা থেকে—যেমন, ট্রেড ইউনিয়ন, বিজ্ঞানীদের সমিতি, যুব কমিউনিস্ট লীগ, সমবায় সমিতি, মহিলা বা বয়স্কদের সংস্থা ইত্যাদি থেকে। এই অভিনব পদক্ষেপ সোভিয়েতসমাজের যে বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে সেটি হল: সোভিয়েত জনসাধারণের মধ্যে নানা গোষ্ঠী আছে, এবং তাদের স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য কোনো শ্রেণীদ্বন্দ্ব সূচিত করে না। কিন্তু এই বৈচিত্র্য থেকে উদ্ভূত বিভেদ-সংঘাতের সামঞ্জস্যবিধান একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। অনেক সোভিয়েত তাত্ত্বিক এদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: এঁদের মধ্যে আছেন জর্জি শাখনাজারভ, যিনি "সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রেসি: সাম কোয়েশ্চেনস অব থিওরি" গ্রন্থের লেখক। আর তাতিয়ানা জাসলাভাস্কায়াও এ বিষয়ে অনেক স্পষ্টোক্তি করেছেন। তিনি লিখেছেন, মানুষের আচরণের মূল শক্তি বা প্রেরণা আসে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ থেকে, যার ভিত্তিতে একজন মানুষ তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য রচনা করে। কিন্তু প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীর কিছু নির্দিষ্ট স্বার্থ আছে, সেগুলির সাথে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর স্বার্থের মিল বা সঙ্গতি নাও থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে জাসলাভস্কায়া লিখেছেন, যাঁরা একটি বাড়িতে বসবাস করতে চলেছেন, তাঁদের স্বার্থ হল যে বাড়িটির নকশা আর নির্মাণ সুষ্ঠু ও সুন্দর হবে। অন্য দিকে, বাড়ি তৈরির কাজে যাঁরা নিয়োজিত, তাঁরা কিন্তু প্রায়ই অনেক কাজ বাকি থাকা সত্ত্বেও বাড়ি-তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে, এটা প্রমাণের চেষ্টা করেন। অতএব, আমরা বলতে পারি যে ভবিষ্যতে কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ গঠিত হয়ে জনস্বার্থের উপরোক্ত বৈচিত্র্য ও সংঘাতকে স্বীকৃতি দিলে তা সোভিয়েত সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনকই হবে। তা ছাড়া, এ ব্যাপারে আরও একটি যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। ঊনবিংশ পার্টি কনফারেন্স যে বিভিন্ন নাগরিক সংস্থা থেকে প্রতিনিধিদের কংগ্রেস অব পিপলস ডেপুটিজ-এ আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার একটা কারণ বোধহয় এই যে, এঁদের দ্বারা স্থিত স্বার্থের (অর্থাৎ প্রাক্-পেরেসত্রোইকা আমলের) প্রহরী আমলাদের শক্তি হ্রাস করা যাবে।

এই রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত হতে নিঃসন্দেহে দীর্ঘ সময় নেবে। সোভিয়েত সংবিধানে এবং পার্টির নিয়মাবলীতে অনেক সংশোধন আনতে হবে। লক্ষণীয় যে, ঊনবিংশ পার্টি কনফারেন্সের পর প্রশংসনীয় দ্রুততার সঙ্গে সুপ্রীম সোভিয়েত সংবিধানে ও নির্বাচনী আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ফেলেছে: এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ১৯৮৮ সালের ১ ডিসেমবর, এবং ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে নতুন পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপরন্তু, এটাও উৎসাহজনক যে ইতিপূর্বে অন্তত কয়েকটি শহর আর জেলার পার্টি কমিটি কায়েমি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে তাদের অনেকগুলি বিভাগ (যেগুলি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমান্তরাল হয়ে বহু যুগ ধরে গড়ে উঠেছিল) বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে, সরকার আর পার্টির প্রশাসনযন্ত্রে অযথা যে দ্বিত্বকরণ ঘটেছিল, তার অবলুপ্তি ত্বরান্বিত হবে। পার্টি আর সরকারের কাজ পৃথক রাখার ব্যাপারে লেনিনের যে সিদ্ধান্ত ছিল, তার রূপায়ন সহজতর হবে। পার্টি পুনর্গঠনের ব্যাপারে পুরাতন (প্রাক্-গ্লাসনসত) আর নতুন ভাবধারার যে দ্বন্দ্ব, তা ঊনবিংশ পার্টি কনফারেন্সের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের সময়ে লক্ষ করা গিয়েছে: কখনও পুরাতনের কখনও নতুনের

জয় হয়েছে। কোনো-কোনো এলাকায় প্রার্থীদের মধ্যে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, এবং যে প্রার্থী অধিকতর ভোট পেয়েছেন, তিনিই প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। আবার এমন এলাকাও ছিল যেখানে পার্টির প্রাচীনপন্থী নেতারা কোনো প্রতিযোগিতাই হতে দেন নি, অথবা, প্রতিযোগিতার অনুমতি দিলেও, তাঁদের পছন্দমতো প্রার্থী যদি প্রতিযোগীর চাইতে কম ভোটও পান, তাঁকেই প্রতিনিধি হিসেবে কনফারেন্সে পাঠানো হয়েছে। যদি এই ধরনের ঘটনায় পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনসতের প্রবক্তারা বিচলিত বোধ করেন, তাহলে তাঁরা যেন শাখনাজারভের উক্তি স্মরণ করেন। শাখনাজারভ বলেছেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্র নিজেকে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করতে সুদীর্ঘ সময় নিয়েছে; অতএব, আমরা আশা করতে পারি না যে জন্মের অব্যবহিত পরেই সমাজবাদী গণতন্ত্র নিখুঁত অবস্থায় উপনীত হবে।

পেরেসত্রোইকা নতুন কাজের-ধারা প্রবর্তন করেছে। যে-কোনো নতুন পদক্ষেপের মতো এটিও স্বল্পকালের জন্য কিছু-কিছু পরোক্ষ অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তা ছাড়া, ব্যক্তিগত উদ্যম এবং যৌথ প্রচেষ্টায় অনিবার্য পার্থক্যের ফলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো বৈচিত্র্য-ময় দেশের নানা অংশে বিভিন্ন সময়ে পেরেসত্রোইকার প্রগতি অসম হতে বাধ্য। মাঝে-মাঝে জনগণ পেরেসত্রোইকার অগ্রগতি আশানুরূপ হচ্ছে না, এই অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন। এটা কিন্তু প্রত্যাশিত, এবং এটা গ্লাসনসতের জয়ই সূচিত করে। ব্যক্তিপূজার যুগসমূহে যে নৈতিক অসাড়তা সমগ্র দেশকে প্রায় গ্রাস করেছিল, গ্লাসনসত যে তাকে বিদূরিত করছে, এই অসন্তোষ তারই একটি অভিব্যক্তি।

তিন

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পুনর্নবীকরণের তৃতীয় অর্থাৎ সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকটি বুঝতে গেলে প্রাক-পুনর্নবীকরণ যুগসমূহের নৈতিক দেউলে-পনার ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এই ব্যাপারটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে যেসব চলচ্চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তার একটির নাম "দ্য কোল্ড সামার অব নাইনটিন ফিফটিথ্রী"। ১৯৫৩ সালে, স্তালিনের মৃত্যুর পরেই, অপরাধীদের গণমুক্তি ঘোষণা করা হয়। কেন এই ঘোষণা করা হয়েছিল, তার কারণ কোথাও প্রকাশ করা হয় নি, কিন্তু এর উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল না, সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়া উচিত নয়। বহু বিপজ্জনক অপরাধীকে ওই সময়ে কারামুক্ত করা হয়; তাদের মধ্যে ছয় বন্ধুর একটি দল (ওই চলচ্চিত্র অনুযায়ী) সোভিয়েত দেশের উত্তরাঞ্চলে একটি দূরবর্তী গ্রামে হানা দেয়। মাত্র ছয় জন লোক পুরো একটি গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকে পর্যুদস্ত করে। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব হল? চলচ্চিত্রে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, ব্যক্তির স্বাধীনতা আর সম্মান যে সমাজে নিশ্চিহ্ন, ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে পারস্পরিক অবিশ্বাস, ভয় আর সন্দেহে যে সমাজ বিদীর্ণ, একটি মানুষকে যেখানে অপর একজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করে সরকারি চর হিসেবে বেঁচে থাকতে হয়, সরকারের আতঙ্কে যেখানে সমগ্র সমাজ রক্তশূন্য, সেখানে কয়েকজন বদমায়েশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোও সম্ভব নয়। ফলে, ওই গ্রামে ছয় জন গুণ্ডা শাসনকর্তা হিসেবে বাস করতে থাকল। কিছুদিন পর ওই গ্রামে দুই রাজনৈতিক বন্দী বসবাস করতে আসেন। অতীতে ওঁরা বন্দীশিবিরে অনেক অত্যাচার সহ্য করেছিলেন; এখন ওঁরা ওই গ্রামে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে এলেন। সরকারের চোখে এই দুই জন গণশত্রু। কিন্তু ওই দুই জনই তাঁদের চরিত্রমাহাত্ম্য, বিবেকবল, ও শক্তিমত্তায় গোটা গ্রামটিকে পরিত্রাণ করে, এবং ছয়টি শয়তানকে পরাভূত করে।

এই ধরনের চলচিত্র নির্মাণ এবং প্রদর্শন থেকে প্রমাণ হয় যে পেরেসত্রোইকা ও গ্লাসনসতের একটি

মৌলিক উদ্দেশ্য হল মানুষের আত্মসম্মানের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। ওই চলচ্চিত্রেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের চরিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, পেরেসত্রোইকা আর গ্লাসনসতের আবির্ভাবের পূর্বে প্রধানত কবি, উপন্যাসিক, চলচ্চিত্রনির্মাতা আর থিয়েটারশিল্পীরাই সমাজের নৈতিক পক্ষাঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিলেন, এবং মানুষের মনে সত্য এবং আত্মসম্মানের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা অনেক সময়েই ব্যর্থ হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রাক্-গ্লাসনসত যুগে "দি অ্যাপয়েনমেনট" নামের একটি চলচ্চিত্র নিষিদ্ধ ছিল। এর প্রধান চরিত্র একজন মেধাবী ব্যবস্থাপক, যিনি তাঁর উপরওয়ালা অকর্মণ্য হওয়া সত্ত্বেও একটি উদ্যোগ পরিচালনায় সফল হয়েছিলেন। তাঁর সাফল্যে মূল কারণ ছিল, তিনি উদ্যোগ পরিচালনায় মানবিক দিকের বা ব্যক্তিমর্যাদার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। অতএব, চলচ্চিত্রটি নিষিদ্ধ হওয়াই ছিল প্রত্যাশিত। কারণ এটি যে যুগে—অর্থাৎ ব্যক্তি-পূজার যুগে—নির্মিত হয়েছিল, তখন উচ্চপদস্থ আমলারা মানুষের মর্যাদারক্ষার ব্যাপারে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করতেন না। এই নিষিদ্ধ-করণ নিয়ে আলেকজানদার ভোলোভিন মন্তব্য করেছেন যে এ ছিল এমন এক সময় যা সমগ্র মানবজাতির নৈতিক-আত্মিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংস্পর্শহীন—যে আদিম যুগে মানুষ ছিল গুহানিবাসী তখনও বোধহয় এর চাইতে খারাপ অবস্থা ছিল না।

১৯২২ সালে লেনিন লিখেছিলেন, রাজনীতিতে বিবিধ কাজকর্মের মধ্যে অসূয়াজনিত ক্রিয়াকলাপই নিকৃষ্ট। স্তালিন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে লেনিন মন্তব্য করেছিলেন, অসূয়া স্তালিনের চরিত্রের একটি খারাপ দিক। যদি অসূয়ার সঙ্গে অবাধ ক্ষমতার অন্বেষণ জুড়ে দেওয়া যায়, তাহলে স্তালিন আর তাঁর অনুচর-দের অন্যায়, অমানবিক ব্যবহারের অন্তত একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। এই ব্যবহার সমস্ত সাংস্কৃতিক জগৎকে কলুষিত করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যাঁরা ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান করতেন, তাঁদেরও চরম উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। অধ্যাপক আগদাস বুরগানভ লিখেছেন, লেনিনের রচনাবলী বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে জনৈক ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অকটোবরের পর নানা গোষ্ঠী বহুস্তরবিশিষ্ট সোভিয়েত অর্থনীতি গড়ে তোলায় নিয়োজিত ছিল, এবং সরকারি নীতিকে এই গোষ্ঠীসমূহের প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য আর ভারসাম্য বজায় রাখতে হত। স্তালিনের মতে, একমাত্র দরিদ্রতম কৃষকই ছিল শ্রমিকের মিত্র—এই মতের দ্বারাই ১৯৩০-এর দশকে মধ্যম স্তরের কৃষকদের ওপর দমনলীলা সমর্থন করা হয়েছিল। এই ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত ছিল স্তালিনের মতের বিরোধী। অতএব, যে নিবন্ধে ওই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ ছিল, সেই নিবন্ধ প্রত্যাহার করতে হল, নতুবা ওই ঐতিহাসিক চাকরিচ্যুত হতেন। অপর একজন ঐতিহাসিককে শাস্তি পেতে হয়েছিল, কারণ তিনি প্রমাণ করেছিলেন, লেনিন-লিখিত "দ্য প্রোলেটারিয়ান রেভোলিউশন অ্যানড দ্য রেনিগেড কাউটস্কি" থেকে স্তালিন এমনভাবে ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, যাতে স্তালিনের যে অভিমত—অর্থাৎ অকটোবর বিপ্লবের পেছনে শ্রমিকরাই ছিল একমাত্র শক্তি—সেটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভবিষ্যতে অগণিত নিরীহ কৃষককে নির্বিচারে হত্যার জন্য এই অভিমত প্রতিষ্ঠা করা জরুরি ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক বুরগানভ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, লেনিনের মতে (সব না হলেও) প্রায় সব স্তরের কৃষকরাই অকটোবর সমাজবাদী বিপ্লবে যোগদান করেছিল। উপরন্তু, ১৯২৯ সালে যখন বলপূর্বক যৌথ কৃষি প্রচলনের নৃশংসনীতি গৃহীত হয়, তখন মধ্যম স্তরের কৃষকই ছিল দেশের কৃষিতে মুখ্য চরিত্র, এবং ওই কৃষক ছিল যুগপৎ মালিক আর কর্মী। অকটোবর বিপ্লবের পর থেকে কৃষককুলের শ্রেণীচরিত্রে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছিল, স্তালিন সেটিকে গুরুত্ব দেন নি। এ ছাড়া,

যেটা আনাতোলি বুটেঙ্কোর মতো লেখক জোর দিয়ে বলেছেন, বলপূর্বক যৌথ কৃষি প্রবর্তনের আর-একটি যে অজুহাত দেখানো হয়, অর্থাৎ যুদ্ধের ভয়, ১৯২০-র দশকের শেষে তার অস্তিত্বই ছিল না।

কিন্তু যুক্তি-তথ্য দিয়ে স্তালিনের মতসংশোধন করা বা তাঁর সমালোচনা করা ছিল অভাবনীয়। সমস্যাটা এই রকম ছিল, লিখেছেন বোরিস বোলোতিন, যে স্তালিনের কাছে এটাই ছিল অবাস্তব যে তাঁর অভিমতের কোনো সমালোচনা হতে পারে। এসব ব্যাপারে তাত্ত্বিক গবেষণা করার একচ্ছত্র অধিকারও একমাত্র তাঁরই, এটাই ছিল স্তালিনের দাবি এবং বিশ্বাস। দেশে এমন এক মতিচ্ছন্নতার পরিমণ্ডল সৃষ্ট হল, যেখানে সব সিদ্ধান্তই সর্বসম্মত, কারণ এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত না, যাতে স্তালিনের সম্মতি নেই। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিওনিদ আইওনিন বলেছেন, মানুষ বিরুদ্ধ মত বা ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ তো বন্ধ করলই, এমনকী কোনো প্রতিবাদী মতামত যে মনে-মনে পোষণ করা অনুচিত বা বিপজ্জনক, এই অবস্থাও অনেকে মেনে নিল। সমাজবাদের এই আমলাতান্ত্রিক বিকৃতিকে পুনর্নবীকরণের সমর্থকেরা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। যে মতৈক্যের ভিত্তি চিন্তার দৈন্য আর কর্তাভজা রীতি, তাকেও এঁরা বাতিল করেছেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বা অন্যত্র যাঁরা এখনও ব্যক্তিপূজার যুগের মায়া থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন নি, তাঁরা সমাজের পুনর্নবীকরণের প্রবক্তাদের কাজ বা ভাবনার কিছু-কিছু অপব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। এই অপব্যাখ্যাগুলি অপসারণ করার জন্য দুটি ব্যাপার স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমত, যদিও স্তালিন আমলে লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তির ওপর নৃশংস পীড়ন ও হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এবং ওই ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে দক্ষতম দলীয় ও সরকারি কর্মী (এমনকী সৈন্য-বাহিনীর নেতারাও) ছিলেন, তথাপি সাধারণ মানুষ স্তালিনবাদ এবং সমাজবাদের অভিন্নতা মেনে নেন নি। যেসব প্রাজ্ঞ-প্রবীণ বলশেভিকদের অন্যায়ভাবে কয়েদি শিবিরে পাঠানো হয়েছিল এবং অপমান করা হয়েছিল, তাঁরাও সমাজবাদের আদর্শ এবং বিচ্যুতিকে এক করে দেখেন নি। এঁদেরই একজন, নাম কুপ্টসভ, লিখেছেন যে ওইসব অমানবোচিত অনাচারের মূলে ছিল কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তির মারাত্মক ভুল। অতএব, বর্তমান সময়ে স্তালিনবাদের ভক্তরা যদি মনে করেন যে সমাজবাদের পুনর্নবীকরণের সমর্থকেরা স্তালিন-বাদের নিন্দা করতে গিয়ে সমাজবাদকেই হেয় করছেন, তাহলে সেটা হবে অন্যায় বিচার।

দ্বিতীয়ত, স্তালিনের অন্ধ পূজারীরা একটি প্রশ্ন তুলে থাকেন: সেটি হল, স্তালিনের আমলের রাজ-নৈতিক উৎপীড়নের চাইতে ওই আমলের অর্থনৈতিক অগ্রগতির মূল্য বেশি কি-না। এই প্রশ্নটি কিন্তু অবান্তর। দিমিত্রি ভোলকোগোনভ লিখেছেন, এই প্রশ্নটি নীতিবিরুদ্ধ, কারণ এমন কোনো ভালো কাজ নেই, যা দিয়ে বর্বরতাকে সমর্থন করা যায়। প্রসঙ্গত, হিটলারের শাসনকালে জার্মানিতে যে অভাবনীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছিল, তার জন্য ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিটলারের জঘন্য অপরাধ মার্জনা করা যায় না। উপরন্তু, এই প্রবন্ধের প্রথম অংশের আলোচনা অনুসারে পুনর্বার বলা উচিত যে, স্তালিনের আমলে রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং তাত্ত্বিক ভ্রান্তি / গোঁড়ামি না থাকলে, যে অর্থনৈতিক প্রগতি বাস্তবে অর্জিত হয়েছিল, তার চাইতে অতুলনীয় রকম বেশি অগ্রগতি সাধ্যায়ত্ত ছিল।

"অকটোবর অ্যানড পেরেসত্রোইকা: দি রেভো-লিউশন কনটিনিউজ"—এই পুস্তিকায় গোরবাচেভ লিখেছেন, কখনও-কখনও বলা হয় যে স্তালিন তাঁর আমলের অনাচার-অবিচারের খবর রাখতেন না, কিন্তু যেসব দলিলপত্র প্রাপ্তিসাধ্য, তা থেকে বোঝা যায় যে স্তালিন সম্পর্কে ওই বক্তব্য সত্য নয়। গোরবাচেভ আরও লিখেছেন, ব্যাপক দমন, পীড়ন এবং অনাচারের জন্য দল ও জনগণের কাছে স্তালিন আর তাঁর ঘনিষ্ঠ

সহকর্মীরা যে দোষে অভিযুক্ত সেই দোষ বিকট ও অমার্জনীয়, এবং সেটি সব প্রজন্মের নিকট শিক্ষাপ্রদ।

চার

এই প্রবন্ধের শেষাংশে, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবর্তিত পেরেসত্রোইকা থেকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলি (যেমন, ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যানড) কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে সম্পর্কে দুই-একটি কথা বলা যেতে পারে। বর্তমান লেখকের ও অন্যান্য অনেকের গবেষণা এবং জনসাধারণের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে যে, এই দেশগুলিতে, কৃষি বা শিল্পের ক্ষেত্রে, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ কতিপয় সুপরিচিত ব্যাধিতে আক্রান্ত : সেগুলি হল সম্পদের অপচয়, অকর্মণ্যতা, আর ভ্রষ্টাচার। শুধু প্রাত্যহিক কাজের ব্যাপারেই নয়, মূল পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও এই ব্যাধিগুলি প্রকট। এই গলদগুলি যে দূর করা যাচ্ছে না, তার প্রধান কারণ হল, ভালো কাজের জন্য উৎসাহ বা পুরস্কার প্রদান, আর মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার বা শাস্তির বিধান—এসবের প্রায় কোনো ব্যবস্থাই রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলিতে নেই। কাজ এবং বেতন, কর্মদক্ষতা এবং পদোন্নতি—এদের মধ্যে কোনো ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক হয় অনুপস্থিত, নতুবা নগণ্য। অবশ্য, কিছু ব্যতিক্রমী সরকারি সংস্থা আছে, এবং প্রতিটি সংস্থায় আছেন কিছু অসাধারণ ব্যক্তি, যাঁরা শুধুমাত্র বিবেকের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করেন, যাঁদের জন্যই দেশে অর্থনৈতিক প্রগতি মন্থর হলেও স্তব্ধ হয়ে যায় নি, এবং যাঁরা অগ্রগতির আশাকে সদাজাগ্রত রেখেছেন। এঁদের ছেড়ে অন্যত্র দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, বহু সরকারি সংস্থায় একটি অভিনব নীতি আত্মপ্রকাশ করেছে : যে কত কম কাজ করে, তার রোজগার তত বেড়ে যায়। অর্থাৎ, প্রশাসনে স্বাভাবিকতার বিভ্রম জনমানসে জীইয়ে রাখার জন্য সাধারণ সময়সীমায় (ধরা যাক সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে) যে কাজ হওয়া উচিত কিন্তু হচ্ছে না, তার অন্তত অল্প একটি অংশ অতিরিক্ত সময়ে অনেক বাড়তি হারে মজুরি দিয়ে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অতএব, দেখা যায়, অনেক সরকারি সংস্থাতেই বিরাট সংখ্যায় উদ্‌বৃত্ত কর্মী থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত সময়ে কাজের জন্য মজুরি বা বেতনের খরচা (ওভারটাইম বিল) ক্রমবর্ধমান।

একটি অনুন্নত দেশে বিপুলপরিমাণ ব্যয়ে নির্মিত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যথাযথ পরিচালনব্যবস্থা না থাকলে সাধারণ লোকের চরম ক্ষতি। দেশের অগ্রগতি এসব প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু যেসব উচ্চপদস্থ আমলাদের ওপর এই প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনভার ন্যস্ত, তাঁরা কিন্তু নিজেদের এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে করেন না। একটি সরকারি শিল্পে যদি তিন বৎসরের মধ্যেই (এরকম উদাহরণ ভারতে আছে) এত ক্ষতি হয়, যার পরিমাণ ওই শিল্পের মূলধনী ব্যয়ের চাইতেও বেশি, তাতে শীর্ষস্থানীয় আমলারা একেবারেই বিচলিত হন না। কারণ, ওই ক্ষতি সত্ত্বেও তাঁরা যে অন্যায় সুবিধাগুলি ভোগ করছেন (যেমন নিখরচায় বা নামমাত্র খরচায় বাড়ি আর চালকসমেত গাড়ির ব্যবহার), সেগুলি প্রত্যাহৃত হয় না।

যদি দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির শাসকগোষ্ঠী জীবনধারণের মানের দ্রুত উন্নয়নে আগ্রহী হন, তাহলে তাঁদের উচিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের সরকারি সংস্থায় পেরেসত্রোইকা আর খোজরাশ্চট প্রবর্তন করা। আর্থিক স্বয়ম্ভরতার নীতি গৃহীত হলে একটি সরকারি সংস্থার প্রতিটি কর্মীকে তাঁর নিজের কাজের জন্য নির্দিষ্টভাবে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। পরগাছাবৃত্তি লোপ পাবে। বর্তমানে এই অনুন্নত দেশগুলির সরকারি সংস্থাসমূহে একজন কর্মকর্তা বা কর্মীর সামনে দুটি বিকল্প আছে ; দক্ষতা,

নিষ্ঠা আর পরিশ্রম-সহকারে কাজ করা, অথবা আলসেমিতে ডুবে থাকা। দ্বিতীয় বিকল্পটিই সাধারণত পছন্দ করা হয়। খোজরাশ্চট প্রবর্তিত হলে দ্বিতীয় বিকল্পটি লুপ্ত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি আর সরকারি আমলাবর্গের কোনো-কোনো অংশ পুনর্গঠনের বিরোধিতা করেছে। ভারত, বাংলাদেশ বা থাইল্যান্ডের মতো দেশে অবশ্য তুলনামূলকভাবে পার্টির (অর্থাৎ শাসক দলের) আমলাবর্গের প্রভাব প্রায় গুরুত্বহীন, যদিও সরকারি আমলাবর্গের কিছু অংশ যে খোজরাশ্চটের প্রবর্তনে বাধা দেবে, এটা ধরে নেওয়া যায়। অনতিদূর ভবিষ্যতে রাজনৈতিক নেতারা আমলাদের সৃষ্ট এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারবেন—এটাই সাধারণ লোকের প্রত্যাশা। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই মুহূর্তে, এই দেশগুলিতে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে পেরেসত্রোইকা আর খোজরাশ্চট প্রবর্তনের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা যাচ্ছে না।

মানবজন্ম

রত্নেশ্বর হাজরা

মানুষ জন্মায়—মানুষের
জন্ম হয় রোজ
মানুষের এই যে জন্মানো—এটা
একটা ঘটনা।
এই ঘটনার চিহ্ন সর্বাঙ্গে অমর হয়ে থাকে
মানুষেরা মানুষের পদবাচ্য হয়।
ফলত দুঃখকে দুঃখ বলে মানুষেরা
বস্তুকে বস্তুর নাম দেয়—।
এই ঘটনার জন্য মরুভূমিগুলো মরুভূমি
সবুজেরা সবুজের নামে অভিহিত
হয়ে উঠতে থাকে—
বেত্রবতী নদী আর অশ্বত্থের ডালপালা প্রকৃতির বিবর্তনগুলো
সম্মানিত হয়—।
মানুষ জন্মায়—মানুষের
এই যে জন্মানো—এটা একটা ঘটনা।
এই ঘটনার
বিচিত্র অসংখ্য দাগ রঙিন জড়ুল হয়ে প্রত্যেকের গায়ে
লেগে থাকে
সৌভাগ্যরেখার মতো কখনো বা
কলঙ্করেখার মতো করতল জুড়ে
আজীবন বেঁচেবর্তে থাকে.....
মানুষের
জন্মানোই তার কাছে সবচেয়ে বিশিষ্ট ঘটনা—

ঘরছাড়া

সুকুমার চৌধুরী

ঝরে যাবো, যেন নির্ভার শিশির।
এরকম সাবলীল, বীতশব্দ, বিভা।
গন্ধহীন, বর্ণহীন খুলে যাবো
নিবিড় ঘাসের বুকে স্বতোৎসার

যদি ধুয়ে যায় বোধি
যদি অনুভবে বেজে ওঠে এইসব
ঝরে-যাওয়া হিম
ভোররাতে কোজাগর চাঁদের কিরণ
যদি ভালোবাসে দ্যুতি,

শান্ত আমি প্লুত
নির্বাণের দিকে হেঁটে যাবো, আর
হাঁটাপথে বেজে উঠবে অজস্র নির্মাণ

প্রেমে অপ্রেমে

সোফিওর রহমান

আমার বরাত ভালো কবিতা এই শরীর ছুঁয়েছে
শরীর সময়ের চোখে কচিপাতা, নতুন শহর
হাড় ও মাংসে নববন্দর
যেমন শব্দে-শব্দে কবিতার ঘর—
ওই ঘরে বাস করে এ শরীর সংগীত শিখেছে, হৃদয়ে মন্দাকিনী ;
সে এখন শিহরনে বহুধা, মোহরপ্রাসাদ ;
এ প্রাসাদে গন্ধের ফুল ধরে ঘামে ও ঘুমে
ফুলের সে মধু সঞ্চিত রাখে বুকের ওম—
আমার বরাত ভালো কবিতা এই শরীর ছুঁয়েছে।
এ জীবন তাই কবিতার অতীন্দ্রিয় ঠিকানায় কেঁদে ওঠে, এবং
জাগতিক ঘেরাটোপে দায়বদ্ধ
কখনওবা সংগ্রামপাথরে রক্তাক্ত নিমগন্ধের মুখোমুখি
তবু কপালে কবিতার টিপ, আমি কি মাতাল হই ?
পতনকে নদীর বাঁক ভাবি, দুঃখকে প্রেম
আর যন্ত্রণাকে বিজ্ঞান-জ্ঞানে চলে যাই নবতমবন্দরে
তখনি এ-দেহে নোঙর করে কবিতা
আমার বরাত ভালো কবিতা এই শরীর ছুঁয়েছে।

পৃথিবী পবিত্র হয়ে উঠছে

নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার

প্রাগৈতিহাসিক কোনো গহ্বর থেকে যেন
জ্যোৎস্নার স্রোত গড়িয়ে পড়ছে
ইরানী রানীর হাতে মুদ্রায় ধরে রাখা
মদের অজস্র পাত্র থেকে উপছে পড়া
অফুরন্ত ঢলের মতো।
আরণ্যক কোনো অনাবৃতা রমণীর
পাতলা চামড়ার মতো লোভনীয় জ্যোৎস্না।
সমুদ্রের মতো ভাসমান হাওয়ায়-হাওয়ায়
জ্যোৎস্নার তরল স্রোত ছড়িয়ে পড়ছে
মধ্যরাত্রির দিক থেকে দিগন্তের
বিশালতায়।
ধ্যানস্থ বুদ্ধের মতো প্রকৃতি
সেই বিশালতার মধ্যে
স্থির নির্বাক।
আধিদৈবিক কোনো অন্তশ্চেতনায়
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে
শাখা-প্রশাখায় অভিব্যক্তির
আন্দোলিত হিল্লোল।
হিল্লোলিত হয়ে উঠছে বাতাস
পরিশুদ্ধ নৈঃশব্দ্যের আনন্দে।
বহুদূর শতাব্দীর নক্ষত্রের রহস্যের মতো
হয়ে উঠছে রাত্রি
সেই আনন্দে।
আনন্দের সঙ্গমে রাত্রির ধরিত্রী
জ্যোৎস্নাকে কোমল শিশুর মতো
ভালোবাসছে
পরিপূর্ণ নারীর যৌবনের
ঘনিষ্ঠ তীব্রতায়।
রাত্রিটা যৌবন হয়ে যাচ্ছে নিবিড়তায়।
প্রাগৈহিতাসিক এক আশ্চর্য নিবিড়তায়।
পৃথিবী সেই রহস্যমগ্ন নিবিড়তার
অবিনশ্বর অংশীদার হয়ে উঠছে জ্যোৎস্নার মধ্যে।
পৃথিবী পবিত্র হয়ে উঠছে।

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

১০.১

বীরসা আন্দোলনের পটভূমিকা হিসেবে মুণ্ডা আন্দোলনের (১৮৫৭-১৮৯৫) উপর চারটি বিশিষ্ট প্রভাবের রূপ আমরা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি: স্বাধীন মুণ্ডারাজের ধারণার উন্মেষ এবং বিকাশ; ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অপস্রিয়মাণ বিশ্বাস; খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের মধ্য থেকে এক নূতন নেতৃত্বের আবির্ভাব, এবং সমসাময়িক সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব।

আগেই উল্লেখ করেছি, বীরসার ব্যক্তিগত সম্মোহনী প্রতিভা ছাড়া এসব উপকরণ থেকে সুসংহত এক বিশাল আন্দোলন গড়ে উঠতে পারত না। তার ধ্যানধারণায় এসব বিভিন্ন প্রভাবের আদিরূপও অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়েছে। মুণ্ডারাজের স্বপ্ন বীরসারও সব উদ্যোগের মর্মমূলে। কিন্তু আগের মুণ্ডা নেতারা ব্রিটিশ রাজের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নি; তারা বলত, জমি বাবদ রাজস্ব তারা ব্রিটিশ-রাজকেই দেবে। বীরসার কাছে ব্রিটিশরাজ 'কলুষময়' পৃথিবীর অংশবিশেষ; তার সম্পূর্ণ বিলোপ না ঘটলে মুণ্ডারাজের স্বপ্ন অলীক ভ্রান্তি মাত্র। চাইবাসার জার্মান মিশন স্কুলে[২৫৩] বীরসার ছাত্রজীবন কেটেছে; কিন্তু আস্তে-আস্তে এ মিশনের সঙ্গে সব সংস্রব ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যান্য অনেক মুণ্ডার মতো বীরসাও তিক্ত-বিরক্ত হয়ে এ মিশন ছেড়ে রোমান-ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে যোগও ক্ষণস্থায়ী। খ্রীষ্টান-বিশ্বাস ছেড়ে সে ফিরে যায় তার আদি ধর্মবিশ্বাসে। নিজের পরিচয় দিত "মুণ্ডারী কোল" বলে।[২৫৪] বীরসার চিন্তায় খেরওয়ার 'ধর্ম-সংস্কার' আন্দোলনের প্রভাব অনস্বীকার্য, কিন্তু তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের বনিয়াদ ব্যাপকতর। এ আলোচনা আমরা পরে করছি।

বীরসা আন্দোলনের দুটি পর্যায়: জুলাই-অগস্ট ১৮৯৫ এবং ডিসেমবর ১৮৯৯-জানুয়ারি ১৯০০। এ দুই পর্যায়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। তাই

আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাদের আলোচনা করব।

তবে পূর্ববর্তী আন্দোলন থেকে এ দুই পর্যায়ের আন্দোলনই বিশিষ্ট। বিদ্রোহী মুণ্ডাদের ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে যে নিগূঢ় যোগ বীরসা আন্দোলনে দেখি, তা আগে প্রায় ছিল না বললেই চলে।

১০.২

বীরসা আন্দোলনের শুরু এক ধর্মীয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে।[২৫৫] মুণ্ডাদের সে বলে, সে ভগবানের প্রেরিত দূত; বিপুল এক প্রলয়ের পর এ কলুষময় পৃথিবীর আসন্ন বিনাশ ঘোষণার জন্যই তার আবির্ভাব; এ প্রলয়ে সরকারও নিশ্চিহ্ন হবে ('ভেসে যাবে'); নিষ্ফল হয়ে যাবে বর্তমানের সব জীবিকা, এমনকী কৃষিকাজও। তার এক ঘোষণা থেকে মনে হয়—তার ধারণা ছিল, মুদ্রাসর্বস্ব অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে: 'এ দুনিয়ার সব টাকাপয়সা জল হয়ে যাবে; তাদের হাতে যা কিছু অর্থ আছে, তা যেন অতি শীঘ্র তারা খরচ করে ফেলে, এবং তা দিয়ে বস্ত্রাদি কেনে।' একমাত্র তার অনুগামীদের জন্যই ছিল তার অভয়বাণী। সামগ্রিক এ বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে না; তারা সবাই জড়ো হবে বর্তমান জনপদ থেকে দূরে এক 'উঁচু ডাঙ্গায়'; একটিমাত্র নিরাপদ জায়গা হবে সেটি; অনুগামীদের নিয়ে বীরসা সেখানে নিষ্কলুষ এক পৃথিবী গড়ে তুলবে।

লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষ জানতে পারে[২৫৬] গ্রাম থেকে প্রায় ষাট গজ দূরে এ নূতন জায়গা; শ দেড়েক বা দু শ অনুগামী সেখানে জড়ো হয়েছে; 'বহুসংখ্যক' চালাঘর তাদের জন্য সেখানে বানানো হয়েছে। 'দেওয়ান' হিসেবে নিযুক্ত এক তাঁতি অন্য তিন-চারজন 'পদাধিকারী'র সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে এ জায়গায় আসার জন্য সবাইকে বলছে।

জনপদ থেকে দূরে অনুগামীদের এ নূতন উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে বীরসার সম্ভবত এ ধারণা ছিল যে বর্তমানের পঙ্কিল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার সম্ভব নয়; নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব হবে বর্তমান ব্যবস্থার বিনাশের পর। কিন্তু বীরসার পরিষ্কার ধারণা ছিল, ব্রিটিশরাজ থেকে এভাবে দূরে সরে যাওয়া সম্ভব নয়; নূতন পৃথিবীতে উত্তরণের পথে তার সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য, এবং তাতে সফল হলেই নূতন আদর্শ মুণ্ডা-রাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সে সংঘর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে কোনো সংহত পরিকল্পনা তখন বীরসার ছিল বলে মনে হয় না। তবে এটা বোঝা যায়, সহিংস পন্থার অপরিহার্যতা সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

আসলে মুণ্ডা-আন্দোলনে বীরসা আগে থেকেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল। অরণ্যসম্পদের উপর মুণ্ডা-দের দীর্ঘদিনের অধিকার সংকোচনের জন্য নূতন সরকারি বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে ১৮৯৪ সালে এক বড়ো আন্দোলন সে গড়ে তোলে।[২৫৭] ১৮৯৫ সালের আন্দোলনের শুরু থেকেই তার নানা ঘোষণা এবং কাজে ব্রিটিশরাজবিরোধিতা সুস্পষ্ট। প্রলয়ের কালে 'সরকার ভেসে যাবে'—এ ঘোষণার সময় ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের কথাই সম্ভবত তার মাথায় ছিল। তার নূতন 'দেওয়ান' এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের গ্রামে-গ্রামে এ ঘোষণা করার ভার দেওয়া হয়েছিল যে মুণ্ডারা যেন তাদের কুড়ুল আর ফরসা নিয়ে ২৭শে অগস্ট ওই নূতন জায়গায় আসে। সম্ভবত ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের সশস্ত্র প্রতিরোধের ধারণার সঙ্গে এ নির্দেশ যুক্ত। মুণ্ডাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল—তার অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে ব্রিটিশবাহিনীর বুলেট নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, জলে পরিণত হবে।[২৫৮] এ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা লোকের মুখে-মুখে এত ছড়িয়ে পড়ে যে, লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষ ঠিক করে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি দমানোর জন্য সরকারি নির্দেশ-মতো খালি কার্তুজ ব্যবহার করা নির্বুদ্ধিতা হবে; কারণ বিদ্রোহীরা একে বীরসার কথার যথার্থতার প্রমাণ ধরে নিয়ে আরো 'দুঃসাহসী' হবে।[২৫৯] বীরসা ধরেই নিয়েছিল, সরকার তাকে রেহাই দেবে না। শিষ্যদের

তাই সে বলত, সরকার তিনদিনের বেশি তাকে হাজতে পুরে রাখতে পারবে না ; কয়েদখানায় তার স্থূল দেহ এক কাষ্ঠখণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে সেখানে পড়ে থাকবে; তার বিদেহী আত্মা অন্যত্র চলে যাবে। থানার হেড-কনস্টেবল তার দলের কার্যকলাপ দেখার জন্য গেলে 'তার অনুগামীরা তাকে গ্রাম থেকে বার করে দেয়, তার বিছানাপত্র, বাসনাদি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ; বীরসা বলে, 'সাহেব লোকদের' রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে ; আর তারা সরকার বা পুলিশকে মানবে না ; সেই রাজা হবে। 'হেড-কনস্টেবল ··বেশ কিছু লোকজন সঙ্গে করে এনেছিল ; কিন্তু বীরসার এ ঘোষণার পর তারা তার দলে-চলে গেল···'।[২৬০]

বীরসার এ প্রকাশ্য রাজবিরোধিতার একটা কারণ, 'সর্দারি লড়াই' (১৮৬৯-১৮৮০)-এর সঙ্গে যুক্ত অনেকেই বীরসার দলে যোগ দেয়।[২৬১] বীরসা তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আন্দোলন শুরু করে, না কি, আন্দোলন শুরু হবার পর তারা এতে যোগ দেয়—তা ঠিক জানা যায় না। তবে আন্দোলনে সর্দারদের ভূমিকা সন্দেহাতীত। 'সাও মুণ্ডারী' বলে বীরসার এক 'দেওয়ান' সর্দারি লড়াইয়ে যোগ দেবার জন্য বেশ কিছুদিন হাজতে বাস করে।[২৬২] বীরসার কোনো-কোনো ঘোষণায় এ লড়াইয়ের কর্মসূচীর প্রভাব সুস্পষ্ট। একটা ঘোষণায় বলা হয়েছিল—কত খরচ করে তারা সরকারের কাছে আর্জি পাঠিয়েছে। কোনো ফল হয় নি ; কেবলমাত্র বিদ্রোহ করলেই তারা সরকারের 'ন্যায়-বিচার' আর তাদের হারানো জমি (ভুঁইহারি) ফিরে পাবে।[২৬৩]

বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনে ধর্ম- ও সমাজ-সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম আন্দোলনের সময় বীরসার এ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার বিশদ বিবরণ মেলে না। পুলিশের কাছে তার এক 'দেওয়ান' দেওকী পাত্তরের সাক্ষ্য থেকে আমরা সামান্য কিছু জানতে পারি।[২৬৪] তার প্রধান কর্তব্য ছিল বীরসার বাণী প্রচার—তার মধ্যে একটা ছিল, মুণ্ডারা 'সৎ জীবন যাপন' করবে ; ভূতপূজা করবে না। বোংগাপূজার উপর বীরসার তীব্র আক্রমণের উল্লেখ করেছেন কুমার সুরেশ সিং।[২৬৫] সাদা শুয়োর এবং সাদা মুরগি মেরে ফেলার নির্দেশও নাকি বীরসা দিয়েছিল।[২৬৬] সমসাময়িক সরকারি দলিলে এর কোনো উল্লেখ নেই।

স্বল্প সময়ের মধ্যে বীরসার 'ধর্মীয়' আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে গেল, তার প্রধান কারণ—বীরসার ঘোষিত "ধর্ম" প্রচলিত অর্থে ধর্ম নয়। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিক বিধান—শুধু এসব বীরসার প্রচারের বিষয়বস্তু ছিল না। সিধু-কানুর নূতন ধর্মের মতো এও মুণ্ডাদের ধর্ম থেকে ভিন্ন। বীরসার ধর্মীয় ঘোষণার মূল কথা—এক মহাপ্রলয়ের পর কলুষময় পৃথিবীর আসন্ন বিলুপ্তি ঘোষণার জন্য ভগবানের দূত হিসেবে তার আবির্ভাব। মুণ্ডা ও সাঁওতাল সৃষ্টিতত্ত্বের একটা মূল ধারণা 'মহাপ্লাবন' নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বীরসার চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। খ্রীষ্টান বীরসা বাইবেলে বর্ণিত প্লাবনের উপাখ্যানের কথাও জানত। বীরসা প্রলয়, মহাপ্লাবন ইত্যাদির কথা বলেছে। তার ধারণায়, এ বিপর্যয় আমূল রূপান্তরের ইঙ্গিতমাত্র। বীরসা তাই সঙ্গে-সঙ্গে বলেছে, এ প্রলয়ে 'সরকারও ভেসে যাবে'। বীরসার স্বপ্নলব্ধ নানা 'সত্য' সম্পর্কে মুণ্ডাদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে একটার তাৎপর্য বীরসা নাকি ব্যাখ্যা করে বলেছিল। তা হল : হারানো মুণ্ডারাজ সে আবার তাদের ফিরিয়ে দেবে।[২৬৭]

বিদ্রোহী মুণ্ডাদের ধর্ম এবং রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য যোগের আর-একটা রূপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্দোলনে রাজনৈতিক মেজাজ ক্রমে প্রকট হয়ে উঠলেও মুণ্ডাদের কাছে বীরসা পূর্ববর্তী মুণ্ডা নেতাদের মতো শুধুমাত্র রাজনৈতিক নেতা ছিল না, যার প্রচার এবং ক্ষমতা রাজনৈতিক লক্ষ্যসিদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ। বছর খানেক আগেও মুণ্ডাদের কাছে বীরসার

পরিচয় মূলত তাই ছিল—তাদের অরণ্যের অধিকারের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ আর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নেতারূপে। কিন্তু এখন মুণ্ডাদের চেতনায় তার ভাবমূর্তির আমূল রূপান্তর ঘটে। বীরসা এখন অলৌকিকতার স্তরে উন্নীত; 'ধরতি আবা' (পৃথিবীর পিতা), ভগবান বলেই এখন তার পরিচয়; অনেকেই তাকে মুণ্ডাদের পরম উপাস্য দেবতা সিং বোংগা (সূর্য-দেবতা) বলে মনে করে, যে দেবতা কোনো অমঙ্গল করেন না, অথচ দূর থেকে তাদের সব কাজ লক্ষ করেন।

বীরসার অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথা, মুণ্ডারা তাদের নির্দ্বিধায় সত্য বলে মেনে নিয়েছে, এবং ফলে বীরসার মানবিক অস্তিত্ব দেবত্বে রূপান্তরিত হয়েছে। এরকম এক কাহিনী তখন প্রায় জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছিল। তা লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষের কানেও আসে।[২৬৮] তা হল: প্রচণ্ড এক ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে অন্য এক মুণ্ডার সঙ্গে বীরসা কোথায় যেন যাচ্ছিল। এক তীব্র বিদ্যুতের ঝলকে সহগামী দেখতে পায়, বীরসার মুখের আদলই পালটে গেছে; যা ছিল ঘনকালো, তা হয়ে গেল লাল এবং সাদা। বীরসাকে সে তা বলে। বীরসা বলে, ভগবান তার কাছে দেখা দিয়েছেন। গ্রামে ফিরে বিস্মিত সহগামী সবাইকে এ কথা জানায়। চতুর্দিকে তা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এর মধ্যে এ কথাও জানাজানি হয়ে যায় যে দুরারোগ্য রোগ সারানোর ক্ষমতা বীরসার আছে; তার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রমাণও নাকি অনেকে পেয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ধরে নিয়েছিল—এসব এক বিকৃতমস্তিষ্ক বা ফন্দিবাজ লোকের কাণ্ড। বীরসা উন্মাদ কিনা, তা জানার জন্য ডাক্তারি পরীক্ষারও ব্যবস্থা হয়। ডাক্তার বলে, তার মাথায় কোনো গণ্ডগোল নেই। 'রাজপুরুষদে'র কেউ-কেউ তখন ভাবল, লোকটা পাকা ফন্দিবাজ। ছোটনাগপুরের কমিশনার ব্যঙ্গ করে বলে, বীরসার রোগ সারানোর ক্ষমতার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত তার জানা আছে—এক অর্ধোন্মাদ প্রলাপভাষিণী মুণ্ডারমণীকে কী সব তুকতাক করে সে সারিয়েছিল।[২৬৯] গ্রামের লোক কিন্তু বীরসার ক্ষমতার কথা সহজ বিশ্বাসে মেনে নিয়েছে। বস্তুত, তাদের অনেকেই এ ক্ষমতার প্রমাণ পেয়েছে। যারা নিরাশ হয়েছে, তারা বীরসায় ক্ষমতায় অবিশ্বাস করে নি। তারা বলত—দোষ তাদেরই; তারা হয়তো যথেষ্ট শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের মনোভাব নিয়ে তার কাছে যায়নি; না হলে অন্যরা সুফল পেয়েছে, তারা পেল না কেন? বীরসার দেবত্ব বা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এভাবে সুদৃঢ় হয়।

তাই চালকাদে (Chalkad) তার নূতন আবাসে তার "দর্শন" লাভের জন্য কাতারে-কাতারে লোক সেখানে যেতে থাকে। কমিশনারের ভাষায়, 'গ্রামের সব লোক সেখানে জড়ো হয়েছে···তখন দুজন লোকের দেখা হলে তাদের কুশলবিনিময়ের কথা ছিল—চালকাদ গেছ কি?'[২৭০]

শুধু তাই নয়। মুণ্ডা চেতনায় বীরসার অনন্য-সাধারণ প্রভাবের অন্যান্য দৃষ্টান্ত প্রশাসনকে বিস্মিত করেছিল। ছোটোনাগপুরের কমিশনার জানতে পারে: 'বহু যোজন দূর থেকে অগণিত লোক তার প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে যায়; চাষবাস ছেড়ে, বাড়িঘর, গবাদি পশু বিক্রি করে তারা চলে আসছে।'[২৭১] সব টাকাপয়সা জল হয়ে যাবে, তাই কাপড়চোপড় কিনে তারা সব সঞ্চয় শেষ করে ফেলুক—বীরসার এ ঘোষণার ফল সম্পর্কে লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষের প্রতিবেদন: 'বস্ত্রব্যবসায়ীদের কারবার ফেঁপে-ফুলে উঠেছে; আসল দামের দ্বিগুণ দিয়ে লোকেরা তাদের পণ্য আকুল আগ্রহে কিনে নিচ্ছে।'[২৭২]

মুণ্ডারা বীরসাকে কী দৃষ্টিতে দেখত, বা আবার বোঝা গেল তার গ্রেপ্তারের পর (২৩-২৪ অগস্ট, ১৮৯৫)। সন্ধ্যায় যখন বীরসা এবং অন্য কয়েকজন মুণ্ডাকে লোহারডাগার উপ-কমিশনারের কাছে আনা

হল, 'এক বিশাল জনতা সঙ্গে আসে, কাছারিঘর থেকে তাদের জোর করে বার করে দিতে হয়। সব দরজা বন্ধ করা হয়; বোঝা গেল, এ লোকটার খাম-খেয়ালিপনা কী নিদারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।'[২৭৩] খুন্টি থানার সাব-ইন্সপেক্টর লিখছে: 'ভগবান বীরসার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা তারা কেউ বিশ্বাসই করে না··· আরো জানতে পেরেছি, ধাঙ্গর হিসেবে অ্যাদ্দিন কাজ করছিল প্রতি গ্রামের এমন সব কোলরা তাদের কাজ ছেড়ে চলে গেছে, তারা বলছে, দু-চারদিনের মতো এত অল্প সময়ের জন্য তারা কাজ করবে না।'[২৭৪] তিনদিন পরেও যখন বীরসা ফিরে এল না, সবাই হতাশ, বিমর্ষ হয়ে ফিরে গেল। এক মিশনারির ভাষায়, '···এতে তারা এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাদের মুখ দিয়ে কোনো কথা সরেনি।' বিভ্রান্ত তারা হয়েছিল, কিন্তু বীরসার উপর আস্থা হারায় নি। লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষ খবর পায়; 'তবুও শত-শত লোক রোজ সেখানে [চালকাদে] আসত; আসলে কী ঘটেছে, তা তারা জানতে চায়; 'ভগবান' ফিরে এসেছেন কিনা, তার খোঁজ নেয়। এরা বীরসার শূন্য ঘরেই তার পুজো সেরে আবার বাড়ি ফিরে যায়।'[২৭৫]

অকটোবরে বিচার শুরু হলে 'ভগবানের' দর্শনের জন্য তারা যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। লোহার-ডাগার উপ-কমিশনার প্রথমে ভেবেছিল, খুন্টির কোনো জায়গায় বিচার হবে। তার ধারণা ছিল, বীরসার গোটা ব্যাপারটাই বুজরুগি; যে অলৌকিক ক্ষমতা আছে বলে সে বরাবর মুণ্ডাদের বলে আসছে, আসলে তার তা নেই; মিথ্যা ছলনায় সে মুণ্ডাদের প্রতারিত করেছে; উপ-কমিশনারের উদ্দেশ্য ছিল, খুন্টির মুণ্ডারা নিজের চোখে দেখুক, বীরসার সব কথা কত ভিত্তিহীন। ফল হল ঠিক উলটো। বীরসাকে দেখার জন্য সমবেত বিশাল জনতার হাবভাব দেখে উপ-কমিশনার ভয় পেয়ে যায়। ২৪শে অকটোবর মাঝরাতে কমিশনারকে জরুরি বার্তা পাঠিয়ে বলে, 'জনতা মারমুখী; বহুজনকে তাকে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে; খুন্টিতে বিচারের ব্যবস্থা বাতিল; রাঁচীতেই তা করতে হবে; আর অতি সত্বর যেন এক পুলিশ-বাহিনী পাঠানো হয়।' উপ-কমিশনার পরে জানতে পারে, খুন্টিতে বিচার হবে বলে গ্রামে-গ্রামে রটিয়ে দেওয়া হয়; তাতেই এত লোক জড়ো হয়; 'কিন্তু যখন তারা দেখল, ধরতি আবা বীরসাকে তাদের দেখতে দেওয়া হচ্ছে না, তারা চেঁচামেচি শুরু করে দেয়, অশান্তভাবে লাফালাফি আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে।'[২৭৬]

বীরসা ভগবান, তাই ব্রিটিশরাজের থানা, পুলিশ, আদালতের কোনো এক্তিয়ার তার ওপরে নেই—মুণ্ডাদের এ বিশ্বাস পরেও ভাঙে নি। একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। ১৮৯৭ সালের ডিসেমবরে বীরসাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছটিয়ার হিন্দু মন্দিরে পুজো ইত্যাদি ব্যাপারে হিন্দুদের সঙ্গে মুণ্ডাদের এক বিবাদ উপলক্ষে পুলিশ আবার তাকে ধরতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে নি। এ বিষয়ে মুণ্ডাদের বিশ্বাস সম্পর্কে কমিশনার লিখছে: 'এ অর্ধোন্মাদ লোকটার [বীরসার] নানা উচ্চাভিলাসের মধ্যে একটি হল, সে দাবি করে, সে 'দেওতা'; তার অনুগামীদের মধ্যে একটা প্রচলিত ধারণা ছিল, দিব্যশক্তির ইচ্ছায় কিছু-দিনের জন্য সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।'[২৭৭]

১০.৩

এ আন্দোলনের সঙ্গে বীরসার দ্বিতীয় আন্দোলনের গুণগত পার্থক্যের কথা আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এ বিশিষ্ট পার্থক্যগুলির বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ। দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে মুণ্ডাচেতনায় নূতন লক্ষণের রূপ বোঝা তাতে সহজ হবে। মুণ্ডা-আন্দোলনে ধর্মের ভূমিকাও তখন অংশত পরিবর্তিত হয়েছে।

সামগ্রিকভাবের দেখতে গেলে, গোড়ায় বীরসার রাজনৈতিক দর্শনে যে অনির্দিষ্টতা, অস্পষ্টতা ছিল,

পরবর্তী আন্দোলনে তা প্রায় সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। বিধ্বংসী এক মহাপ্লাবনে কলুষিত পৃথিবী বিলুপ্ত হবে, এবং এর একমাত্র ব্যতিক্রম—এক নির্দিষ্ট স্থানে সমবেত বীরসার অনুগামীরা—এ ভবিষ্যদ্বাণী গোটা মুণ্ডামুলুকে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। গুজব রটেছিল—এক নির্দিষ্ট দিনে (২৭ অগস্ট) তুমুল অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে এ প্রলয় ঘটবে। কিন্তু তা ঘটেনি। অধীর প্রত্যাশায় উন্মুখ মুণ্ডারা সাময়িক-ভাবে বিভ্রান্ত বোধ করেছিল। কিন্তু "ধরতি আবা" বীরসার উপর বিশ্বাস কিন্তু অটল থাকল।

মুণ্ডারা সম্ভবত আশা করেছিল, বীরসা তাদের বহু-আকাঙ্ক্ষিত মুণ্ডারাজ ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু বীরসার ঘোষণায় এর কোনো সঠিক নির্দেশ ছিল না। এক পৃথিবীর বিনাশ হবে; কিন্তু বিকল্পের রূপ কী, মুণ্ডারা তা জানত না। তাদের শত্রু কারা, তা নূতন করে বলার দরকার ছিল না। কিন্তু কীভাবে তাদের প্রভুত্বের অবসান ঘটানো যাবে, সে বিষয়ে কোনো কিছু বলা হয় নি। শত্রুবিরোধী 'রাজনৈতিক কার্যকলাপ' যা কিছু ঘটেছিল, তা পূর্ব-পরিকল্পিত রাজনৈতিক কর্মসূচীর অংশ নয়। তাদের উপলক্ষ ভিন্ন। বীরসার প্রচারে বাধাসৃষ্টিকারীদের কাকে-কাকেও শাসানি দেওয়া হয়েছিল, (যেমন বন্দগাঁওয়ের খুদে জমিদার জগমোহন সিং),[২৭৮] এমনকী প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছিল, (যেমন কোচাং অঞ্চলের এক সর্দার)।[২৭৯] 'ভগবানে'র গ্রেপ্তারে প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ মুণ্ডারা বিপুল সংখ্যায় কাছারি আদালতে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে; কিন্তু থানা বা আদালতের লোকজনের বিরুদ্ধে হিংসার কোনো ঘটনা ঘটে নি।

পরবর্তী আন্দোলনে বীরসার রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় সব অস্পষ্টতা কেটে গেছে। নূতন সমাজ গড়ে উঠবে বর্তমান 'কলুষময়' পৃথিবী থেকে দূরে কোথাও নয়; তা গড়ে উঠবে একান্ত প্রত্যক্ষ, সন্নিকট, জীবনের সহস্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে; কোনো 'মহাপ্লাবনে'র ফলে এ রূপান্তর ঘটবে না; সহিংস প্রতিরোধেই পরাক্রান্ত শত্রুকুল পর্যুদস্ত, নিশ্চিহ্ন হবে। সহিংস সংঘর্ষের অনিবার্যতা সম্পর্কে বীরসার ধারণা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরে আমরা দেখব, প্রায় দু বছর ধরে[২৮০] যে মুণ্ডা-সংগঠন বীরসার নির্দেশে গড়ে উঠেছে, তা এ ধারণায় অণুপ্রাণিত।

সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মূল লক্ষ্য যে মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা, এ বোধ প্রথম থেকেই স্পষ্ট ছিল। কিন্তু কোন্ কোন্ শত্রুগোষ্ঠীর উপর কঠিনতম আঘাত হানতে হবে? বীরসা মুণ্ডাদের চিরাচরিত শত্রুদের কথা অনবরত বলেছে। কিন্তু মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠার পথে ব্রিটিশরাজই প্রধান প্রতিবন্ধক, তার এ ধারণা সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

মুণ্ডা চেতনায় ব্রিটিশরাজ শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসন নয়—গোটা য়ুরোপীয় গোষ্ঠী ('সাহেব লোক'), এমনকী মিশনারিরাও। মিশনারিদের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় এক দশক ধরে ক্রমেই তিক্ত হচ্ছিল। 'সর্দারেরা সব প্রতারক'—এক জার্মান মিশনারির এ মন্তব্যে মুণ্ডারা তীব্র বিক্ষুব্ধ হয়। বীরসা নাকি এ মন্তব্যের উত্তরে বলেছিল—মিশনারির এ আচরণ অস্বাভাবিক নয়; কারণ, 'সাহেব সাহেব এক টোপী হ্যায়'। মিশনারি হফমানও বলেছেন, মুণ্ডাদের জন্য মিশনের এত আন্তরিকতা, সহানুভূতি তারা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে; এমনকী তাঁকে এবং তার এক সহকর্মীকে মুণ্ডারা খুন করতেও চেয়েছে। এর কারণ হিসেবে হফমান বলেছেন: 'শুধুমাত্র আমরা সাদা চামড়ার লোক; তাদের বিশ্বাস, তাদের সব পরিকল্পনায় আমরা বাদ সাধছি।'[২৮১] স্বভাবতই, যেসব খ্রীষ্টান মুণ্ডা তখনও য়ুরোপীয় মিশনের প্রতি অনুগত ছিল বীরসার অনুগামীরা তাদেরও শত্রুদল-ভুক্ত বলে মনে করেছে। বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় (২৪ ডিসেমবর) সমবেত খ্রীষ্টানদের উপর আক্রমণ দিয়েই বিদ্রোহ শুরু হয়।

এর তিনদিন পরে এক নূতন ঘোষণায়[২৮২] বিদ্রোহীরা অন্য শত্রুদের চিহ্নিত করে। তারা বলে—মুণ্ডাদের কোনো ক্ষতি তারা করবে না; তাদের লড়াই 'হিন্দু এবং সরকারে'র বিরুদ্ধে; গ্রামের সবাইকে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলেছে। 'সরকারের প্রতি অনুগত মুণ্ডাদের বলেছে, এ মুলুক ছেড়ে সাহেবদের সঙ্গে তারা বিলেত চলে যাক।'

কিন্তু "হিন্দু" শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হিংসা প্রয়োগের ঘটনা বিরল। এর প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, বিদ্রোহ শুরু হবার পর বিদ্রোহীদের আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় পুলিশ আর সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা। থানা আক্রমণের বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব ছিল না। তবুও যেভাবে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাতে ব্রিটিশ বাহিনীর লোকেরা বিস্মিত হয়েছিল। অদম্য তাদের সংকল্প, দুর্জয় তাদের সাহস। গয়া মুণ্ডা-পরিচালিত মুণ্ডা প্রতিরোধ (৭ জানুয়ারি, ১৯০০) সম্পর্কে রাঁচীর উপকমিশনারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: 'যে সাহস এবং মরীয়াভাব নিয়ে গয়া লড়াই করেছে, তা আমার কাছে এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা।'[২৮৩]

এ দুর্দমনীয় নির্ভীকতার উৎস ছিল তাদের নৈতিক এবং আত্মিক বল, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ এলাকার কর্তৃত্ব ন্যায্যত তাদের; ব্রিটিশরাজের কোনো এক্তিয়ার এখানে নেই। ছোটোনাগপুরের কমিশনার একটা ঘটনার উল্লেখ করে।[২৮৪] ব্রিটিশ-বাহিনী বুঝতে পারে, লড়াই চালিয়ে যাওয়া বিদ্রোহীদের পক্ষে আত্মঘাতী মূঢ়তা মাত্র; তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে, তারা লড়াই বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করুক। 'প্রতিনিধি হিসেবে তাদের একজন এগিয়ে এল; বেশ খানিকটা দূর থেকে চেঁচিয়ে বলল, রাজ তাদের, আমাদের নয়; যুদ্ধ যদি থামাতে হয়, আমরাই তা করব, তারা নয়; শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে তারা প্রস্তুত।' এ প্রতিরোধ বর্ণনা বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। এখানে এটা বলাই যথেষ্ট হবে, এ প্রতিরোধ সুপরিকল্পিত, কারণ রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে বীরসার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল, এবং এ লক্ষ্যসিদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়গুলি সম্পর্কে তার কোনো সংশয় ছিল না।

বিদ্রোহীদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট, অমিত তাদের সাহস প্রতিরোধের প্রস্তুতিও যথাসম্ভব নিপুণ। কিন্তু সমগ্র বিদ্রোহটা যেন ক্ষণস্থায়ী তীব্র এক স্ফুলিঙ্গের মতো হঠাৎ জ্বলে ওঠা, আবার সঙ্গে-সঙ্গে নিভে যাওয়া। কারণ ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠা অসম্ভব ছিল।

কীভাবে মাত্র দু বছরের মধ্যে এ প্রতিরোধের মানসিকতা গড়ে উঠল, তা বিশ্লেষণ বর্তমান আলোচনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এখানে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যদিও আগের তুলনায় এ ভূমিকার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।

১০.৪

বীরসা-মন্ত্রে দীক্ষিত দৃঢ়সংকল্প এক ক্ষুদ্র মুণ্ডা-সম্প্রদায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ফলেই এ মানসিকতার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। এ প্রচেষ্টার প্রধানতম দিক সংঘবদ্ধভাবে বীরসার আদর্শ প্রচার।

প্রচারের রীতি ১৮৯৫ সালের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে সময় মুণ্ডারা যেত চালকাদে বীরসার নূতন "আশ্রমে"। এখন বীরসার আস্থাভাজন শিষ্যরাই যাবে মুণ্ডাদের কাছে, এমনকী দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও; বহুসংখ্যক মুণ্ডার সঙ্গে যোগস্থাপন করে বার-বার বীরসার আদর্শের কথা তাদের বলবে; এভাবেই তার চিন্তার "বীজ"[২৮৫] বহুদূর ছড়িয়ে যাবে।

প্রধানত মিশনারি হফমানের প্রতিবেদন[২৮৬] থেকেই বীরসার এ মন্ত্রশিষ্যগোষ্ঠীর সংগঠন সম্পর্কে আমরা জানতে পেরেছি। এ গোষ্ঠীর তিন ভাগ—প্রচারক, পুরানক এবং নানক। প্রচারকরা বীরসার সবচাইতে কাছের লোক; সপ্তাহে দুদিন তারা বীরসার

সঙ্গে দেখা করত; রাতে মাঝে-মাঝে মুণ্ডাদের যে গোপন সমাবেশ হত, সেগুলি সম্পর্কে প্রধান দায়িত্ব ছিল তাদের। পুরানকরা সংখ্যায় বেশি; গোটা মুণ্ডা মুলুক থেকে নানা দিক বিচার করে বীরসা তাদের বাছাই করত; তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হফমান লিখছেন, 'প্রকাশ্য সংঘর্ষের সংকল্প থেকে তারা কখনও বিচ্যুত হয় নি।' নানকরা নূতন শিষ্য; হফমানের মতে বিদ্রোহের 'মাস পাঁচেক আগে' তারা বীরসার দলে যোগ দেয়। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল; কিন্তু 'গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েতে' তারা যোগ দিতে পারত না।

বীরসার নানা নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনার জন্য গ্রামে-গ্রামে মুণ্ডারা জমায়েত হত; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাত্রে। সম্ভবত গোপনীয়তা রক্ষার জন্য।

এভাবে গড়ে উঠল বৃহত্তর "বীরসা সম্প্রদায়"।[২৮৭] এর সংহতির ভিত্তি বীরসার আদর্শ এবং নেতৃত্বের প্রতি অবিচল আনুগত্য। স্বভাবতই, যারা বীরসার আদর্শ গ্রহণ করে নি, তাদের সঙ্গে এ সম্প্রদায় ব্যবধান রক্ষা করে চলত। সম্ভবত বীরসা-অনুগামীদের দৃঢ় ধারণা ছিল—শুধুমাত্র নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত মুণ্ডারাই তাদের মুক্তিসংগ্রামের জন্য সবরকম ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে। এ অনমনীয় মনোভাবের জন্য এ নূতন সম্প্রদায়কে হফমান 'হিন্দুজাতিপ্রথা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন; বস্তুত, তাঁর মতে, এ সম্প্রদায়ের অনুশাসন 'কঠোরতর'। অন্য মুণ্ডাদের সঙ্গে তারা একসঙ্গে বসে খেত না; তাদের, এমনকী, তাদের ছেলেপিলেদেরও তারা ঘরের 'চৌকাঠা মাড়াতে দিত না'। ছোটোনাগপুর কমিশনারের মতে, তারা এক নূতন ধরনের পইতে পরত, যার নাম 'বীরসা পইতে'।[২৮৮]

কোন্ আদর্শ বীরসার ক্ষুদ্র মন্ত্রশিষ্যগোষ্ঠী গ্রামে-গ্রামে প্রচার করত? মুক্তির ব্রতে কীভাবে তারা মুণ্ডাদের উদ্‌বুদ্ধ করত? হফমান বা প্রশাসনকর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কিছু লেখেন নি। এক অনন্যসাধারণ গবেষণা-গ্রন্থের উপর আমরা এর জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।[২৮৯]

বীরসার নূতন বাণীর মূল কথা—মুণ্ডাদের জানতে হবে এককালে তারা কত মহান জাতি ছিল; 'সত্য-যুগের' অবসান ঘটেছে নানা বহিরাগত গোষ্ঠীর চক্রান্তে এবং শোষণে, যার ফলে বর্তমানের দুঃসহ গ্লানি; সে স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার জন্য শত্রুকুলের উৎসাদন অপরিহার্য, এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

শুধু সামরিক প্রস্তুতি এর জন্য যথেষ্ট নয়; দরকার মুণ্ডাদের আমূল আত্মিক এবং নৈতিক রূপান্তর। এর প্রধান উপায় দুটি: (১) বহু পুরনো ধর্মবিশ্বাস, আচার, সামাজিক বিধিবিধান বর্জন করে মুণ্ডাদের নূতন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে; (২) সমৃদ্ধতর হতে হবে তাদের ইতিহাস-চেতনা।

ভূত-প্রেত-বোংগায় বিশ্বাস, ডাইনিপ্রথা ইত্যাদি বর্জনের কথা বীরসা ১৮৯৫ সালেও বলেছে। কিন্তু সে আন্দোলন মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য টিকে ছিল; তারপর বছর দেড়েক বীরসাকে হাজতে কাটাতে হয়েছে। তাই সংগঠিত কোনো 'ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন' তখন হতে পারে নি। এবারকার চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতির একটা প্রধান অঙ্গ ছিল এ নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান।[২৮৯ক]

ইতিহাসচেতনা সৃষ্টির জন্য শুধুমাত্র প্রচার যথেষ্ট ছিল না। বীরসার পরিকল্পনা ছিল—প্রাচীন মুণ্ডা-কীর্তির সঙ্গে মুণ্ডারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হোক। এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল তিনটি জায়গা—দুটি মন্দির এবং একটা দুর্গ। মুণ্ডা লোকগাথামতে, সবগুলি মুণ্ডাদের তৈরি। ছুটিয়া মন্দির থেকে আনা হল পবিত্র তুলসীপাতা, জগন্নাথপুর মন্দির থেকে চন্দনবাটা; আর নও রত্তন (Naw Rattan) দুর্গের সন্নিকটস্থ অঞ্চল থেকে 'পবিত্র মাটি ও জল'। বিদ্রোহী কোলদের শৌর্যময় প্রতিরোধ (১৮৩১-৩২) নিয়ে রচিত হল গান; গ্রামে-গ্রামে মুণ্ডাদের রাত্রির জমায়েতে সমবেতভাবে তা গাওয়া হল; গৌরবময় মুণ্ডা-

ইতিহাসের এক পর্বের সঙ্গে তারা নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করতে পারল।

বিদ্রোহের মানসিকতা সৃষ্টিতে রাত্রির জমায়েত-গুলির বিশেষ এক ভূমিকা ছিল। শুধু 'প্রচারক' বা 'পুরানক' নয়, 'ভগবান' বীরসার উপস্থিতি, তার ভাষণ, তার রচিত গান মুণ্ডাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। তার ভাষণ এবং গানের[২৯০] প্রতীকধর্মী শব্দ-চয়ন শ্রোতাদের মনে আসন্ন ব্রিটিশরাজবিরোধী সংঘর্ষের আবহ সৃষ্টি করে। সেখানকার অন্যান্য কোনো-কোনো অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল—রাজ এবং অন্যান্য শত্রুবিরোধী আক্রোশ যেন উদ্দীপিত হয়। যেমন কলাগাছে ব্রিটিশরাজ (রাবণ) এবং মহারানীর (মন্দোদরীর) কুশপুত্তলিকা বানিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। মাঝরাত পর্যন্ত এ অনুষ্ঠান চলত মাদল-বাজনা আর নাচের সঙ্গে।[২৯১]

শ্রোতাদের মধ্যে কেউ পরাক্রান্ত ব্রিটিশবাহিনীর বিরুদ্ধে মুণ্ডাদের জয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করলে বীরসা অভয় দিয়ে বলত, ব্রিটিশ বুলেট তাদের শরীর ভেদ করতে পারবে না; শরীর স্পর্শ করার আগেই তা জল হয়ে যাবে। তাদের আরো বলা হত, নও রত্তন থেকে আনা 'পূত জল' তাদের গায়ে ছিটিয়ে দিলে তারা অজেয় থাকবে।

মনে হয়, কোনো এক সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ সম্পর্কে বীরসার খানিকটা দ্বিধা ছিল। তার ধারণা ছিল—সংঘর্ষের অনিবার্য ফল হবে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে হিংসার তাণ্ডব। তাতে অপরিমেয় ক্ষতি হবে কৃষিকাজের; অনিশ্চিত হবে মুণ্ডাদের জীবিকা; বিধ্বস্ত হবে তাদের বাড়িঘর। তার বিশ্বাস ছিল, নিষ্ঠার সঙ্গে তার প্রচারিত নূতন অনুশাসন পালন করলে মুণ্ডাসমাজে নূতন প্রাণশক্তির সৃষ্টি হবে। কিন্তু অনেকেই রাজ-বিরোধী সংঘর্ষের সিদ্ধান্তে অটল থাকল—প্রধানত সর্দারি লড়াইয়ের নেতারা। তা ছাড়া, বিগত চার বছরের নানা বিপর্যয়—১৮৯৬-৯৭ এবং ১৮৯৯ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ১৮৯৮ সালে কলেরা মহামারীর ব্যাপক ধ্বংসলীলা, পরের বছর খরায় আমন শস্যের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি—মুণ্ডাদের অসহিষ্ণু করে তোলে। ২২ ডিসেমবর, ১৮৯৯ বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গোটা আন্দোলনের মূল প্রেরণা নিঃসন্দেহে বীরসার সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব। তবে ধর্মের ভূমিকা এবার খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। বীরসার বিশেষ-বিশেষ আলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে যে ব্যাপক জনশ্রুতি ১৮৯৫-এর আন্দোলনের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, এবার তার কিছুই ছিল না। অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী বীরসা করেনি। দুরারোগ্য রোগ বীরসা সারাতে পারে—এরকম কোনো প্রচার এবার ছিল না। মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের ঘটনাকে বীরসা প্রকাশ্যেই বুজরুকি, লোক ঠকানোর ফন্দি বলে বলেছে।

কিন্তু বীরসার সম্মোহনী ক্ষমতার প্রধান উৎস তার ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এ আন্দোলনকে 'ভগবান আন্দোলন' বলেই অভিহিত করেছে। 'মহা-প্রলয়' সম্পর্কে বীরসার কথা না ফললেও মুণ্ডা চেতনায় বীরসা তখনও ভগবান। 'ভগবানের দূত' বলেই সে নিজের পরিচয় দেয়। রাত্রে মুণ্ডাদের গোপন জমায়েতে একটা প্রধান অনুষ্ঠান ছিল ভগবান হিসেবে বীরসার স্তবগান। যে বিভিন্ন উপায়ে মুণ্ডা-দের মধ্যে বিদ্রোহের মানসিকতা গড়ে তোলা হয়েছিল, তাদের ধর্মীয় অনুষঙ্গ আর আবহ সুস্পষ্ট। মুণ্ডারাজ মুণ্ডা লোকগাথার 'সত্যযুগ'। এক ব্যাপক ধর্মসংস্কারের ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে মুণ্ডাদের নূতন সমাজ ও সংস্কৃতি। বীরসার এমনও ধারণা ছিল, তার নূতন ধর্মীয় অনুশাসন নিষ্ঠার সঙ্গে মানলে সহিংস-সংঘর্ষ ছাড়াই মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ইতিহাস-চেতনা সৃষ্টির উপায়গুলি মূলত ধর্মীয়। সমবেত দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর দুটো মন্দির থেকে যা আনা হল, তা প্রধানত পূজার উপচার—তুলসী-পাতা ও চন্দন। নও রত্তন থেকে আনা পবিত্র জলের (নীরদ) স্পর্শ মুক্তিসংগ্রামের যোদ্ধাদের ব্রিটিশ বুলেটের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য করবে। [ক্রমশ

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

২৫৩. *Papers Relating to Agrarian Disputes* etc. ; Vol. I ; পৃ ১৪৬ ; Chotonagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 16 January, 1890. Para 5.

২৫৪. Bengal Judicial (Police) Progs. ; Nov. 1895 ; Nos. 38-39 ; Chotonagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 28 Aug., 1895 ; Para 4. কুমার সুরেশ সিং-এর মতে, চাইবাসায় বীরসা চার বছর থাকে (১৮৮৬-১৮৯০)। *Birsa Munda and His Movement, 1874-1901* (O. U. P., 1983), P. 40.

২৫৫. একই ; Chotonagpur Commissioner-এর চিঠি ; Para 4.

২৫৫. একই ; Para 2.

২৫৬. মূলসূত্র একই ; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 26 Aug., 1895.

২৫৭. Bengal Judicial (Police) Progs. ; Nov. 1895 ; Nos. 44-45 ; Chotanagpur Commissioners to Govt. of Bengal, 6 Sept., 1895, Para 2.

২৫৮. Bengal General Misc. Progs. ; Nov. 1896, Nos. 20-21 ; Chotanagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1895-96 , 29 June, 1896 ; Para 4.

২৫৯. পাদটীকা নং ২৫৬ দ্রষ্টব্য ; District Superintendent of Police, Lohardaga-র চিঠি।

২৬০. মূলসূত্রের জন্য পাদটীকা নং ২৫৭ দ্রষ্টব্য ; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 4 Sept., 1895.

২৬১. হারানো জমি ফিরে পাবার জন্য ভুঁইহারদের দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন 'সর্দারি লড়াই' নামে পরিচিত।

২৬২. ২৬০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৬৩. বীরসার বিরুদ্ধে মামলায় সরকার পক্ষের একটা প্রধান অভিযোগ ছিল, তার সঙ্গে সর্দারদের ঘনিষ্ঠ যোগ। এ সম্পর্কে মিশনারি হফমান তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। তিনি নিজে দেখেছেন, 'বীরসা ভগবান'কে দর্শন করতে যাবার জন্য ওই অঞ্চলের সর্দাররাই জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছিল ; প্রধানত সর্দার-প্রভাবিত গ্রামগুলি থেকে মুণ্ডারা অস্ত্রশস্ত্রসজ্জিত হয়ে বীরসার দর্শনে যায়। কুমার সুরেশ সিং মনে করেন, বীরসার 'ধর্মীয়' আন্দোলন যে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হল, তার একটা কারণ সর্দারদের "ক্রমবর্ধমান প্রভাব"। (*Birsa Munda and His Movement etc.* পৃ ৫৭)। তবে তিনি বলেন, সর্দারদের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করা হয়েছে ; বীরসা ও সর্দারদের দৃষ্টিভঙ্গি মোটেই অভিন্ন নয় : 'Birsa, though influenced by the Sardars, was certainly not their mouthpiece' (পৃ ৫৮)।

২৬৪. পাদটীকা নং ২৬০ দ্রষ্টব্য। 'to live good lives and not to do Puja to Bhuts.'

২৬৫. Kumar Suresh Singh, পূর্বোল্লেখিত, পৃ ৫০। এ বই থেকে জানতে পারি, বীরসা সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ যখন বিশেষ কিছু জানত না, সে সময়কার এক জনশ্রুতি পুলিশ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় : 'a sanyasi of the Mundari caste of Chalkad had been exhorting the neighbouring Kols to become strict Hindus and abstain from forbidden articles of food.' (পৃ ৫৯)। সম্ভবত "নিষিদ্ধ আহার্যে"র মধ্যে শুয়োর, মুরগি এবং গোরুর মাংস ছিল।

২৬৬. একই ; পৃ ৫৪। এখানে O' Malley'র একটা বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

২৬৭. K. S. Singh, পূর্বোল্লেখিত ; পৃ ৪৬।

২৬৮. Bengal Judicial (Police) Progs. ; Nov. 1895 ; Nos. 38-39 ; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 26 Aug., 1895. পুলিশাধ্যক্ষ আরো একটা জনশ্রুতির উল্লেখ করেছে : Another rumour was that he had left his house suddenly at night, and

having gone out into the jungle, returned shortly after, giving out that God had appeared to him.'

২৬৯. Bengal General Misc. Progs.; Nov. 1896, Nos. 20-21; Chotanagpur Divisional Commissioner's Annual Report, 1895-96; 29 June, 1896; Para 4.

২৭০. একই; এ বিষয়ে মুণ্ডাদের একটা গান কুমার সুরেশ সিং উদধৃত করেছেন; পূর্বোল্লেখিত, পৃ ৫৩। গানের কিছু-কিছু কলি থেকে মনে হয়, তা বীরসা বিদ্রোহের পরে রচিত। যেমন, He has risen like the Sun, he has come up like the full moon, / he does not rise every day, he will suddenly disappear one day.' 'He will suddenly disappear one day', এর মধ্যে যে শঙ্কার ভাব ফুটেছে, তা প্রথম বিদ্রোহের সময় মুণ্ডাদের মনোভাবের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়।

২৭১. পাদটীকা নং ২৬৮; Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 28 Aug., 1896; Para 2.

২৭২. একই; District Superintendent of Police, Lohardaga, to Deptuy Commissioner of Lohardaga, 26 Aug., 1895.

২৭৩. একই; Deputy Commissioner of Lohardaga to Chotanagpur Commissioner, 27 Aug., 1895, Para 4.

২৭৪. একই; Sub-Inspector of Khunti to Deputy Commissioner of Lohardaga, 29 Aug., 1895.

২৭৫. Bengal Judicial (Police) Progs.; Nov. 1895; Nos. 44-45; District Superintendent of Police, Lohardaga to Deputy Commissioner of Lohardaga, 4 Sept., 1895.

২৭৬. পাদটীকা নং ২৬৯ দ্রষ্টব্য; Para 4.

২৭৭. Bengal General Misc. Progs.; Dec, 1898; Nos. 16-17; Chotanagpur Divisional Commissioner's Report, 1897-98; 18 July, 1898; Para 269.

২৭৮. সরকারি দলিলে জগমোহনকে 'Tenure-holder' বলা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বীরসা-দলের আক্রোশের প্রধান কারণ, সে গোপনে তাদের নানা খবর পুলিশকে যোগাত; অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত খবর।

২৭৯. পাদটীকা নং ২৭৫ দ্রষ্টব্য; Progs. Nos. 38-39; District Superintendent of Police, Lohardaga to the Deputy Commissioner of Lohardaga; 26 Aug., 1895. সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, বীরসা সর্দারকে আসার জন্য খবর পাঠিয়েছিল; সর্দার এ নির্দেশ মানে নি; তাতেই নাকি বীরসা বলে: "he would have him killed".

২৮০. বীরসা জেল থেকে ছাড়া পায় ডিসেম্বর ১৮৯৭; বিদ্রোহ শুরু হয় ১৮৯৯ সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। জেল থেকে বেরিয়ে আসার ঠিক পরেই বীরসা নতুন উদ্যমে সংগঠনের কাজ শুরু করে দেয়। মিশনারি Hoffman-এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা: No sooner was he back than his name flew from village to village. India Home Dept. Progs.; Aug., 1900; No. 335; Rev. J. Hoffman, Catholic Missionary of Sarwada, Thana Kunti, to Chotanagpur Commissioner, 14 Jan., 1900; Para V; [Hoffman-এর চিঠিটা বাঙলা সরকারের কাছে ছোটো-নাগপুরের কমিশনারের চিঠির (17 Jan., 1900) Enclosure No. 4]

২৮১. একই; Hoffman-এর চিঠি।

২৮২. একই; " " ।

২৮৩. একই; Deputy Commissioner of Ranchi to Chotanagpur Commissioner; 7 Jan., 1900. এ চিঠিতে গয়া মুণ্ডার দুঃসাহসী প্রতিরোধের বর্ণনা আছে।

২৮৪. একই; Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal; 10 Jan., 1900; Para 5. ব্রিটিশ-বাহিনী যখন অনন্যোপায় হয়ে গোলা ছোঁড়ে, তখন: 'the insurgents replied with renewed cries of derision, continuing to brandish their weapons and to dare us to do our worst'.

২৮৫. 'Scatterings the seeds'-কথাটি যীশু নানা

'প্যারাবল' (Parable)-এ ব্যবহার করেছেন। খ্রীষ্টান মুণ্ডার উপর বাইবেলের প্রভাব অনস্বীকার্য।

২৮৬. ২৮০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৮৭. সরকারি দলিলে 'Birsaites' বলা হয়েছে।

২৮৮. সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে : '...the followers have lately taken to wearing the Birsaite janew (sacred thread)' India Home Dept. Progs.; Aug, 1900; No. 335; Chotanagpur Commissioner to Govt. of Bengal, 12 Jan., 1900; Para 3.

২৮৯. K. S. Singh; পূর্বোল্লেখিত; সবচাইতে মৌলিক অংশ : পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

২৮৯ক. খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে প্রভাবিত বীরসার কাছে ভগবান একান্তভাবেই "personal God"।

২৯০. K. S Singh-সংকলিত একটা গানের অনুবাদ :

বড়ো নদীতে বান ডেকেছে; ধুলোর ঝড় উঠছে,
ময়না, পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও।
অরণ্য জুড়ে আগুন আর ধোঁয়া,
ময়না, পুড়ছে তোমার মা;
ভেসে যায় তোমার বাবা,
ময়না···

পূর্বোল্লেখিত; পৃ ৮৮-৮৭।

২৯১. একই; পৃ ৯০।

পাঠকদের প্রতি আবেদন

কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি প্রকাশন সংক্রান্ত সব জিনিসেরই অতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির চাপে বাধ্য হয়ে আগামী মে ১৯৮৯ সংখ্যা (বাঙলা নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা) থেকে "চতুরঙ্গে"র মূল্য প্রতি কপি পাঁচ টাকার পরিবর্তে ছয় টাকা না করলে পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আশা করি, পাঠকবৃন্দ আমাদের নিরুপায় অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন এবং আগের মতোই তাঁদের সহানুভূতি-লাভে আমরা বঞ্চিত হব না।

বড়দা ও আমার তরুণকালের স্মৃতি

সুধীর সেন

৯ঃ দিদির দান

পি সি র বা ড়ি তে

কুমিল্লায় একটানা থেকে আমি অনেকটা হাঁফিয়ে উঠছিলাম। ক্রমাগত আত্মীয়স্বজনের আসাযাওয়া হত। তাঁদের কাছে তখন আমি ছিলাম এক বিশেষ কৌতূহলের বস্তু। তাঁরা আমার কুশলবার্তা জিগ্যেস করতেন। উপদেশ দিতেও কার্পণ্য করতেন না। সংসারই যে আমাদের স্থান, আর সেখানে থেকেই যে মানুষ অনেক ধর্মকর্ম আর পুণ্যসঞ্চয় করতে পারে, অনেকেই তা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। আমি তাঁদের সদুপদেশ বিনা প্রতিবাদে শুনে যেতাম। গৃহত্যাগের কারণ বা আশ্রমজীবনের কাহিনী সম্বন্ধে কাউকেই কোনো কথা বলি নি। তাঁদের অনেকেই ভাবতেন: আমাকে হঠাৎ "সন্ন্যাসরোগে" আক্রমণ করেছিল, তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। বহু চেষ্টা করে বড়দা আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন। এখন সবার নজরে থেকে রোগমুক্ত আর প্রকৃতিস্থ হচ্ছি।

এ ধারণার প্রতিবাদ করার কোনো প্রয়োজন বোধ করি নি। তবে কিছুদিন থেকেই অল্প সময়ের জন্য হলেও পরিবেষ্টন বদল করার একটা তাড়না অনুভব করছিলাম। পুজোর ছুটি ঘনিয়ে আসায় সে-তাড়না আরো বেড়ে গেল। ঠিক সে সময় আমন্ত্রণ এল পিসির বাড়িতে যাবার। তক্ষুনি রাজি হলাম। হঠাৎ কেন পিসির বাড়ি যাবার ডাক এল বুঝতে পারি নি। বুঝবার চেষ্টাও করি নি। পরে আঁচ করে-ছিলাম তার পেছনে ছিলেন খুব সম্ভবত সেই কলকাতার বউদি, আমাদের পিসতুতো ভাই ধীরেনদার স্ত্রী।

বউদি আমার আসায় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করলেন। এবার আমি নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে তাঁর কাছে বসলাম। তিনি নিজহাতে বিধবা শাশুড়ির জন্য কিছু রান্না করছিলেন। কাজ করতে-করতেই আমাকে বললেন, 'সেবার তুমি কলকাতায়

আমাদের কাছে এলে, তারপর হঠাৎ চলে গেলে কাউকে কিছু না বলে। তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারলাম না ভেবে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল।'

আমি একটু চমকে উঠলাম। আমার জন্য কিছু করতে পারেন নি বলে তাঁর ভীষণ খারাপ লেগেছিল, এজাতীয় কথা তো আগে আর কোথাও শুনি নি। হেসে বললাম, 'ভেবো না, বউদি, এবার আর পালাব না। আমি তো এখানে এসেছি নিজের ইচ্ছায়, তোমাদের কাছে ছুটি কাটাব বলে। আমার জন্য অনেক কিছু করার সুযোগ পাবে, করতে হবেও।'

কলকাতায় চোখের দেখার পর বউদির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। অথচ সেই মুহূর্ত থেকেই যেন তাঁর সঙ্গে আমার একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। তার কারণও খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। বউদি আমার অচেনা হলেও তিনি আমার কথা বেশ ভালো করেই জানতেন। দাদারা কলকাতা গেলে তাঁদের কাছেই উঠতেন, তখন আমার কথাও নিশ্চয়ই হত। তা ছাড়া, পিসি ছিলেন বাবার একমাত্র বোন। সেজন্য যোগাযোগটাও বেশি ছিল।

তাঁর সঙ্গে আমাদের আরো একটি সম্বন্ধ ছিল, সেটি আত্মীয়তার দিক থেকে দূরের হলেও আন্তরিকতার দিক দিয়ে ছিল খুবই কাছের। এই বউদি ছিলেন আমাদের বালবিধবা কাকিমার বোনঝি। সেই কাকিমা থাকতেন অধিকাংশ সময়ই নিজের বাপের বাড়িতে, ভাইয়ের কাছে সিলেটে নিজেদের আদিম বাসস্থান সাতকাপন গ্রামে, কিংবা করিমগঞ্জ শহরে তাঁদের বাসা-বাড়িতে। তা সত্ত্বেও তাঁকে আমরা ছোটোবেলা থেকেই মনে করতাম আমাদের পরম আত্মীয়। বড়দা আর আমি অনেক সময় সাতকাপন-করিমগঞ্জ গিয়ে ছুটি কাটিয়ে এসেছি।

"আমার ছেলেবেলা" প্রবন্ধে বড়দা লিখেছেন, 'কাকিমার বিয়ের আট মাস পরেই আমাদের কাকার মৃত্যু হয় (১৮৯৬ নভেমবর)। বিয়ের সময় ছাড়া আর কখনো কাকিমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। আমার জীবনে এই বালবিধবা কাকিমার প্রভাব অপরিমেয়।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১৭ নভেমবর, ১৯৮৫)।

আমিও কাকিমার স্নেহ প্রভূত পরিমাণে ভোগ করেছি, বিশেষ করে আশ্রম থেকে ফিরে আসার পরে। তা ছাড়া, কাকিমার এই বোনকেও আমি আমার আপন মাসি বলেই মনে করতাম। দ্বিতীয় বোনের বিয়ে হয়েছিল বিরামপুর গ্রামে, আখাউড়া রেলস্টেশন থেকে আট-দশ মাইল দূরে, বেশ অবস্থাপন্ন বাড়িতে। কাকিমার নাম ছিল অমলা; দ্বিতীয় বোনের নাম খুব সম্ভবত ছিল বিমলা। তাঁরই বড়ো-মেয়ের বিয়ে হয় আমাদের পিসতুতো ভাই ধীরেনদার সঙ্গে। বউদির ডাক-নাম ছিল ময়না।

কাকিমার ছোটোবোনের বিয়ে হয় কুমিল্লানিবাসী নামকরা এক দত্ত পরিবারে। মেসোমশাই কাজ করতেন পাটনায় অ্যাকাউনটস আপিসে। তাঁর নাম ছিল তৃষিতচন্দ্র দত্ত। তিনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, পাটনাতে ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসাবে অনেক বছর কাজ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের বহু গান শুনেছি। ১৯২৬ সনে আই. এ. পরীক্ষা দেবার পর ছুটিতে এক-মাস পাটনায় মাসিমার কাছে কাটিয়ে এসেছিলাম। তার এক বছরের মধ্যেই মেসোমশাই ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। বিধবা মাসিমা তখন শান্তিনিকেতনে চলে আসেন ও সেখানে শিশু-বিভাগ পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

তখন থেকে এই সর্বজনপ্রিয় সুশীলাবালা দত্ত সবারই মাসি হয়ে দাঁড়ান। আর নিঃসন্তান মাসিমাও শিশুবিভাগের নানাপ্রদেশের শিশুদের আপন সন্তানের মতোই দেখাশুনা করতেন। আমি ছিলাম ছোটো-মাসিমার বিশেষ স্নেহের পাত্র, একরকম পুত্রতুল্য। বিশ্বভারতীতে কাজ করার সময় আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যেতাম। একপাল শিশু তখন ছুটে এসে হইচই

করে আমাকে ঘেরাও করে তাদের আনন্দ জানাত। আমিও তাদের সঙ্গে নানারকম খেলায় যোগ দিতাম।

দুইদিকের পরিবারে অত জানাশোনা ছিল বলে অচেনা বউদি যেন এক নিমেষে আমার চেনা হয়ে গেলেন, আর তাঁর সঙ্গে গড়ে উঠল একটা অন্তরের সম্বন্ধ। কয়েকদিনের মধ্যেই সে সম্বন্ধ গভীরতর হল আরো একটি বিশেষ কারণে। আমাদের পাঁচ ভাইয়ের বোন ছিল একটিমাত্র। আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়ো। দিদির প্রতি আমার ছিল অগাধ ভালোবাসা। তাঁর বয়স ছিল চোদ্দ কি তার কাছাকাছি, যখন তাঁর বিয়ে হয়। তখন ভগ্নীপতি বিশ্বেশ্বর দত্ত ছিলেন সিলেট জেলায় চাবাগানের ডাক্তার। আমি কয়েক-বারই দিদির কাছে গিয়ে ছুটি কাটিয়েছিলাম। বিয়ের কয়েক বছর পরই দিদির মৃত্যু হয়। ফলে আমাদের পরিবারে নানা দিক দিয়ে ভাঙন ধরে। সে আঘাত আমি সহজে সামলাতে পারি নি। বউদিকে দেখে মনে হল, তিনি যেন সেই হারানো দিদিরই প্রতিচ্ছবি। তাই অনায়াসেই তিনি দিদির স্থান দখল করে নিলেন।

প্রথম দেখাতেই বউদি জানতে চাইলেন—সেবার তাঁদের কলকাতার বাড়ি থেকে আমি কী করে বেরিয়ে গেলাম, কোথায় গেলাম, কী করলাম ইত্যাদি। রান্নার কাজ করার সঙ্গেই সব শুনলেন। কাহিনী শুনে অবাক হয়ে গেলেন। এই হল সূচনা। তারপর থেকে সব ঘটনা তাঁকে বিশদভাবে বলতে হয়েছে, তবে একটানা নয়, কিস্তিতে-কিস্তিতে, তাঁর নানা কাজের মাঝখানে ফুরসতমতো—কখনো বসার ঘরে, অনেক সময় রান্নাঘরে, কখনো বা ছাদের উপরে আর মাঝে-মাঝে নূতন করে শপথ করিয়ে নিতেন যে আর কখনো এভাবে উধাও হয়ে যাব না। এ-জাতীয় কড়ারের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবু তাঁর সস্নেহ ভৎর্সনা সানন্দে মেনে নিয়ে যখনি বলেছেন তখনি তাঁকে সহাস্যে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।

ইতিমধ্যে বউদি আমার নূতন নামকরণ করলেন। তিনি ডাকতেন আমাকে "সাধু" বলে। তাঁর এবং কাকিমার দিকের আত্মীয়-স্বজন মহলে সে নাম বেশ কিছুকাল চালু ছিল। প্রতিদানে আমিও বউদিকে করে দিলাম কেবল "দিদি"।

পুজোর দিনে

পিসির বাড়ি ছিল মস্ত বড়ো, দোতলা দালান, সামনে অনেকটা খোলা জায়গা পুজোর মণ্ডপসহ, তার খানিক দূরেই ছিল বড়ো দীঘি, বাঁধানো ঘাটলা তার চারি-দিকে সুন্দর, উঁচু পাড়সহ। সাঁতার কাটার পক্ষে যেমন অপূর্ব তেমনি মাছচাষের পক্ষেও। সেই দীঘির পরই শুরু হল প্রকাণ্ড বিল দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত, যেন একটা ঘোলাজলের সাগর। আর বহু দূরে দেখা যেত সবুজ-গাছে-ঢাকা কয়েকটি গ্রাম দ্বীপের মতো তার বুকে ভাসছে।

বর্ষার জল তখনো সরা শুরু হয় নি। তাই ট্রেনে আখাউড়ার আগের স্টেশনে নেবে নৌকা করে পিসির বাড়ি বিনাউটি গ্রামে এসেছিলাম—স্টেশন থেকে ছ মাইল হবে। শীতের দিনে বিলের জল সরে গেলে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে আসা যেত। তবে রাস্তা বলে কিছু ছিল না। আমাদের মামার বাড়িও ছিল খুব কাছেই; মুনিয়ন্ধ গ্রামে। একই স্টেশন থেকে যেতে হত, তবে রেল লাইনের উলটো দিকে অনেকটা উঁচু জায়গায়। তাই ওখানে বিলের বালাই ছিল না। কাঁচা সড়ক ধরে দু মাইল হেঁটে গেলেই মামার বাড়ি পৌঁছনো যেত।

সে অঞ্চলের সঙ্গে ছোটোবেলা থেকেই আমার খুব ভালো পরিচয় ছিল। মামা-বাড়ি যাবার সড়ক ধরে দু মাইল সোজা উত্তর দিকে গেলেই ছিল গুরুহিত গ্রাম, আমার মাসির বাড়ি, যেখানে থেকে আমি তিন বছর কসবা স্কুলে পড়েছিলাম। সে সময় আমি বেশ ঘন-ঘন হেঁটে মামা-বাড়ি চলে যেতাম, অনেক সময়

স্কুলের এক সহপাঠী আত্মীয় বন্ধু পবিত্র সেনের* সঙ্গে। সুবিধা পেলে পিসির বাড়িও যেতাম।

পিসির বাড়ির ভিতরটাও ছিল খুব সুন্দর। দালানের পরেই মস্ত বড়ো উঠোন, তার তিন দিকে কয়েকখানি সুন্দর ঘর, তার পরেই নানারকম ফুল আর ফুলের গাছ। দালানের গায়েও ছিল কিছু ফুলের গাছ, বিশেষ করে জুঁই ও হাসনুহানা। আশেপাশে ছিল কয়েকটা সুন্দর শেফালি গাছ, সকালবেলা মনে হত যেন সে গাছগুলোর নীচে কে গোল করে শেফালি-ফুলের কার্পেট বিছিয়ে রেখে গেছে।

পিসির বাড়ির পাশেই ছিল তাঁর ভাসুরের বাড়ি, ঠিক একই ধরনের দোতলা দালানসহ। দুই সংসার আলাদা হলেও কোথাও কোনো দেয়াল বা বেড়া ছিল না। তাই দুবাড়ির মধ্যে অবাধ যাতায়াত চলত। পুজোর সময় তো কথাই নেই। মণ্ডপে বড়ো দুর্গা-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে দুই বাড়ির সবাই মিলে বিশেষ ঘটা করে পুজো করত। তখন কিছুদিনের জন্য দুই সংসার এক হয়ে যেত। বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্যবর্গ নিয়ে বাড়ি গমগম করত। তার সঙ্গে ছিল জনস্রোত, বাইরে থেকে প্রতিমাদর্শনের জন্য ক্রমাগত লোক আসাযাওয়া করত!

দিদি ছিলেন বাড়ির বড়ো ছেলের বউ। তাই সংসার পরিচালনার ভারও ছিল তাঁরই উপর। আমি দিনের পর দিন মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছি তিনি সে দায়িত্ব কত সহজে—নিখুঁতভাবে বহন করে গেছেন, সবাইকে অল্প কথায় কাজে লাগিয়ে আর নিজে একগাদা কাজের ভার নিয়ে। তাঁর কাজের গতি ছিল দ্রুত, অথচ অচঞ্চল।

দিদির সেই ছবি আজও আমার চোখের সামনে ভাসে—দায়িত্বশীল, করিৎকর্মা, বুদ্ধিমতী, রূপসী, মিষ্টভাষী, স্নেহপরায়ণ, উদার, সংস্কারমুক্ত, আধুনিক, বিশেষ করে তখনকার চিন্তাধারার তুলনায়। আমার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অনায়াসে আদর্শরমণীদের পর্যায়-ভুক্ত। সব কাজের মধ্যেও আমাকে যথাসাধ্য কাছে রাখতেন আর সব কথা তন্নতন্ন করে জানতে চাইতেন। সেবার পুজোর দিনে তাঁর কাছে আমিই যেন ছিলাম প্রধান অতিথি! আমিও তাঁর সঙ্গলাভের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম, এমন দরদি শ্রোতা পেয়ে নিঃসংকোচে মন খুলে সব কথা তাঁকে বলতাম। তাঁর বেদনাক্লিষ্ট ছলছল দৃষ্টি বহুবার দেখেছি। অস্বীকার করতে পারিনে যে তখন আমারও সন্ন্যাসধর্মের বর্ণ ভেদ করে অশ্রু উদ্বেলিত হয়ে উঠত।

বাইরে ছিল পুজোর হট্টগোল, গল্পগুজব, হাসি-তামাসা, যথাসময়ে খোলকরতাল নিয়ে ভজন-কীর্তন, আরতি, পুষ্পাঞ্জলি। আর তার সঙ্গে ছিল সেই মর্মঘাতী, অমানুষিক দৃশ্য—পাঁঠাবলি! যখনি সে দৃশ্য দেখেছি তখনি আমার "বিসর্জনে"র কথা মনে হয়েছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভেবেছি মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে কিভাবে অভ্যাসের দাস হয়ে অমানুষিক কাজ করতে পারে।

আশ্রম পরিত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গেই আমি মনে-মনে দেবদেবীবহুল পূজা-অর্চনায় ভারাক্রান্ত হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করেছিলাম। তবে পুজোর দিনে মণ্ডপের দিকে একেবারেই না গেলে বিসদৃশ দেখাবে, তাই দিনে কয়েকবার সেখানে গিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতাম। উদ্দেশ্য ছিল শুধু বাহ্যিক শোভনীয়তা। মণ্ডপে বসলেও সেদিন আমার সমগ্র অন্তর দখল করে ছিল দেবতা নয়, মানুষ; দুর্গা নয়, দিদি। যখনি সময় পেয়েছি, চুপে চুপে বসে কবিতা লিখেছি দিদির জন্য। প্রথম কবিতার নাম ছিল "মায়ের জাতি"। নীচের কয়েকটি লাইনে তখনকার মনোভাবের ছাপ রয়েছে :

* * * *

স্বার্থবিহীন যত্নে যাঁদের মানুষ শুধু "মানুষ" হতে পারে

---

* তিনি বহু বৎসর বিহারে হর্টিকালচার নিয়ে অনেক মূল্যবান রিসার্চ করেন, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বটানির প্রফেসার নিযুক্ত হন ও সে সময় "সেবাভারতী"র প্রতিষ্ঠা করেন।

নিষ্ঠুরেরা অত্যাচারে জর্জরিত করছে আজি তাঁরে।

*　　*　　*　　*

মুক্ত আলো মুক্ত বায়ুর সঙ্গে তাঁদের নাই যে পরিচয়,
তাই তো আজি অশান্তি ঘোর,
তাই তো তাঁদের জীবন দুঃখময়।
নিজের রোগে অসুবিধায় নাই তোমাদের দৃষ্টি ক্ষণেক তরে,
পরের দুখে গভীর শোকে জীবন-ভরা নয়নবারি ঝরে।
পরের সেবা লক্ষ্য শুধু, পরের দুখে পাও মা ব্যথা প্রাণে,
প্রাণ আছে যার প্রাণ তোমাদের সেই জানে মা,
আর কে বলো জানে।
পরের তরে প্রাণ দিতেছ, দিচ্ছ নিতি সাধের জীবনখানি,
তার ফলে আজ তোমাদেরে রাখছে করে কেবলি চাকরানী!

*　　*　　*　　*

এর প্রতিকার আর কিছু নাই দেখেছি মা
অনেক ভাবি ভাবি—
তোমাদেরই চাইতে হবে, করতে হবে নিজের সুখের দাবী।
স্বার্থপরে ক্ষণেক তরে নেয় না কভু খোঁজ তোমাদের যেথা
সেথায় আজি মুখটি ফুটে তোমাদেরই বলতে হবে কথা।
তাই বলি আজ লজ্জা রাখো, তাই তো বলি চাইতে শেখো,
মাগো।
বহুদিনের নিদ্রা ছেড়ে তাই তো বলি তোমরা আজি জাগো।

১২ই আশ্বিন, ১৩২৯ বাং
নবমী পূজা, বিনাউটি

দিন দুই ধরে এই কবিতা লিখে নবমীপুজোর দিন দিদির হাতে তুলে দিয়েছিলাম মনে-মনে আমার প্রীতির অঞ্জলিরূপে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে মনে হত, আমি যেন সেই মরুতুল্য আশ্রম ছেড়ে এক স্বর্গে চলে এসেছি। আর সেখানে যেন এক দেবী দিদিরূপে এসে দিনের পর দিন অপরিমেয় স্নেহসুধা ঢেলে আমার অন্তরের পুঞ্জীভূত জ্বালাযন্ত্রণা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন।

পরের দিন বিজয়াদশমী। মণ্ডপের সমারোহে একটু মন্দা দেখা দিল। সবারই মনে যেন আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে বিসর্জনের বেদনাবোধ জেগে উঠল। বিকেল থেকে শুরু হল বিদায়পর্ব। সন্ধে হবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রতিমাকে তোলা হল একটি বড়ো নৌকোতে, তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে ও গ্যাসের আলোতে যথা-সম্ভব উদ্ভাসিত করে। পাঁচ-ছটি নৌকোতে দুবাড়ির প্রায় সব্বাই উঠে বসলেন। তখন অবশ্য ছোটোদেরই জয়জয়কার, সবে মিলে আনন্দধ্বনিতে যাত্রা মুখর করে তুলল। আমিও মিছিলে যোগ দিলাম, তবে ধর্মপ্রণোদিত হয়ে নয়, একান্তই ঔৎসুক্যের বশে সবটা ঘটনা আদ্যোপান্ত স্বচক্ষে দেখার জন্য। দিদি যোগ দিলেন না সংসারের কাজ সামলাতে হবে বলে, বিশেষত বিসর্জনের পরে সদ্যঃপ্রত্যাবৃত্ত ভক্তবৃন্দের যথারীতি সংবর্ধনা করা, প্রসাদ বিতরণ করা আর তাদের নৈশভোজনের আয়োজন করা—সব-কিছুরই ভার ছিল তাঁর উপর।

বিলের উপর দিয়ে অভিজ্ঞ মাঝিরা লগির সাহায্যে সহজেই নৌকো চালিয়ে চলল। কলধ্বনিতে তখন চারিদিক মুখরিত। আকাশ পরিষ্কার, তারাগুলো সবেমাত্র ফুটে উঠছে। চারদিকে জল, শুধু জল। খানিক পরেই বিলের উপর দেখা গেল আরো কয়েকটি বিসর্জনের মিছিল, আলো জ্বালিয়ে প্রতিমা নিয়ে তারাও চলেছে একই দিকে। ধীরে ধীরে মিছিলের সংখ্যা বাড়তে লাগল। আলোর ঘটা দেখে মনে হল হঠাৎ যেন এই বিশাল বিলের উপর দেওয়ালির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিসর্জনের নির্দিষ্ট স্থান ছিল তিস্তা নদী। আমাদের সবশুদ্ধ লেগেছিল দেড় ঘণ্টার মতো বাড়ি থেকে তিস্তায় পৌঁছতে। সেখানকার দৃশ্য ছিল অপূর্ব। অত দুর্গাপ্রতিমা আগে কখনো দেখি নি। হয়তো দেড়শ থেকে দুশ প্রতিমা সেদিন সেখানে জড়ো হয়েছিল। অত আলোতে মনে হল যেন নদীর জলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। হুলুস্থুলের অন্ত নেই—কোথাও উলুধ্বনি, তাকে ছাপিয়ে শঙ্খধ্বনি আর কাঁসর-ঘণ্টার বিকট শব্দ; কোথাও খোলকরতাল-সহ প্রাণ ঢেলে গলা ছেড়ে ভজনকীর্তন; দু-একটি নৌকায় ভাবের আতিশয্যে করতাল হাতে বেতাল নৃত্য ও সঙ্গে-সঙ্গে নৌকো টলমল; অনেক প্রতিমার

সামনেই থেকে-থেকে আরতির ঘণ্টা; কিছু-কিছু বয়োবৃদ্ধ ভক্ত নৌকোতে সমাসীন হয়ে নিবিষ্ট মনে মন্ত্রজপ বা স্তোত্রপাঠে মগ্ন।

ঘণ্টা দুই কেটে গেল। এবার বিসর্জনের সময় ঘনিয়ে এল। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি আর কাঁসরঘণ্টার সমন্বয়ে নৈশ আকাশ বিদীর্ণ হয়ে গেল। তখন প্রায় একই সঙ্গে সব নৌকো থেকে প্রতিমাকে ধরে-ধরে ঠেলে জলে বিসর্জন দিল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ যেন সেখানে অমাবস্যা নেবে এল। মাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে ছোটোবড়ো সবাই মাতৃহারা সন্তানের মতো বিষণ্ণ ও অবসন্ন মনে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

আমার চোখ ছিল এই বিসর্জনলীলার উপর, কিন্তু আমার মন ছিল অন্য লোকে। তার ফলে হল "সংসার" কবিতা :

সংসার, তুমি আমার হৃদয়প্রিয়!
চিরদিন তব মধুর মূর্তি চক্ষে ধরিয়া দিয়ো।
হাজার ঘুরবিপাকে……
রাখিয়ো ঘিরিয়া আমার জীবনটাকে।
তোমার স্নেহের শক্ত বাঁধন চাহি না ছিঁড়িতে আর,
শান্তির লাগি চাহি নাক যেতে বিশ্বের পরপার।
ছাড়িয়া তোমার স্নেহ-উপহার
ভিখারি সাজিতে চাহি না মা আর
সম্বল করি তুচ্ছ উত্তরীয়।
সংসার, তুমি আমার হৃদয়প্রিয়!

* * * *

সংসার, তোমা প্রাণ হতে ভালোবাসি,
তাই ঘুরে-ফিরে তোমারি বক্ষে আসি।

* * * *

এবার তোমার বুকের ওপর আমার স্বর্গবাস,
তোমারে ঘিরিয়া থাকিব, এবার এই আজি মোর আশ।
চাহি না স্বর্গ, নহি মা মোক্ষ-আশী।
সংসার, তোমা প্রাণ হতে ভালোবাসি।

১৩ই আশ্বিন, ১৩২৯ বাং
বিজয়াদশমী, বিনাউটি

এই কবিতা হল পুরনো প্রতিশ্রুতিরই পুনরুক্তি—দিদির কাছে আর নিজের কাছে। সেদিন রাত্তিরে তা শেষ করে দিদির হাতে তুলে দিয়েছিলাম আমার বিজয়াদশমীর অর্ঘ্যরূপে।

নৌকো ডুবি

পুজোর ধূম কেটে গেল, বাড়িতে জীবনযাত্রাও প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এল। চার-পাঁচ দিনের উৎসব যেন একটা ঝড়ের মতো বয়ে গেল, অথচ তা আমাকে বিশেষ স্পর্শ করে নি। 'সকলের মাঝে থেকে আছ তুমি স্থিরতার চির অন্তঃপুরে'—আমার অবস্থা ছিল অনেকটা সে-জাতীয়। আমি ছিলাম সেই মহোৎসবের অনাসক্ত দর্শক, অংশীদার নয়। দিদি তা বুঝতে পেরেছিলেন, তবে কিছু বলেন নি বা মনেও করেন নি। আমার নিজের খেয়ালমতো চলি, যা ভালো লাগে তাই যেন করি, তিনি নিজেও তা-ই চেয়েছিলেন।

বিজয়ার দু দিন পরে দ্বাদশীর দিন বাড়ির বাইরে একটু একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দীঘির পাশে নৌকোঘাটে এসে হাজির হলাম। তখনো বেশ কিছু বেলা ছিল। দেখলাম, ঘাটে কয়েকটি নৌকো লাগানো রয়েছে, লগিসহ। হঠাৎ খেয়াল চাপল, একটা নৌকো নিয়ে বিলে গিয়ে ঘুরে আসি। মাঝিরা কিভাবে লগি ফেলে কত সহজে জলের উপর দিয়ে যায়, তা তো বহুবার দেখেছি; মাত্র দুদিন আগে প্রতিমা নিয়ে যাবার সময় আবার নূতন করে তা দেখেছি। আমিই কেন সেভাবে নৌকো চালাতে পারব না? এতে ভাববার আছে বলে মনে করি নি।

একটা মাঝারি সাইজের নৌকো বাছাই করে নিলাম। ঘাটের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। তার গেরো খুলে নৌকো এবার জলে ভাসিয়ে দিলাম। তারপর লগি হাতে নিয়ে মাঝি সাজলাম। মাঝিরই অনুকরণে জলে লগি ফেলে মাটিতে জোরে গুঁতো মেরে চলা শুরু করলাম। নৌকো বেশ ভালোভাবেই এগোচ্ছিল, তবে খুব বাধ্যভাবে নয়, সোজা না গিয়ে

খানিকটা বেশি ডানে কি বাঁয়ে হয়ে যাচ্ছিল। যা হোক, এভাবে ঘাট থেকে বেশ অনেকটা দূরে চলে গেলাম।

মস্ত বড়ো বিল। চারদিক ফাঁকা, জল ছাড়া আর কিছু নেই। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া বইতে শুরু করল, নৌকোটাকেও অনেকটা ঘুরিয়ে দিল। লগি দিয়ে তাকে সামলাতে চেষ্টা করলাম। বিশেষ ফল হল না। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি নৌকো ঘুরিয়ে ঘাটে ফিরে যাব ভাবলাম। সে সময় শুরু হল প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি। উলটোদিকের হাওয়া এসে নৌকোকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল আরো দূরে। এবার বেগতিক হয়ে লগি মারলাম গায়ের জোরে, তাই দিয়ে নৌকোকে সামলাব বলে। কিন্তু ফল হল উলটো। লগি গেল মাটিতে গেঁথে আর ঝোড়ো হাওয়ায় নৌকো দিল ঘুরিয়ে, আমার হাত থেকে ফসকে লগি থেকে গেল কয়েক হাত দূরে। সঙ্গে-সঙ্গে নৌকো কাত হয়ে গেল জলে ভরে।

এবার বিপদের মাত্রা ভালো করেই বুঝলাম। নৌকো-লগি ফেলে সেই অন্ধকারে যাত্রা করলাম ঘাটের দিকে সাঁতার কেটে। জলের ঠিক নীচেই এত ঘাস যে সাঁতার কাটাও ছিল কঠিন। বোধ হয় সেই ঘাসের অধিকাংশই ছিল বর্ষাকালের জন্য বিলের নীচু জমিতে বোনা ধানগাছে। সেই জলমগ্ন জঙ্গল বেয়ে আসতে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠছিলাম। বাধ্য হয়ে মাঝে-মাঝে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছি। সেখানে তখন ছিল বুকজল কি গলাজল। তাই মাটির উপর, আসলে কাদার উপর দাঁড়াতে পেরেছি। কিন্তু সেই জলজ উদ্ভিদের আবেষ্টন ভেদ করে দু-চার পার বেশি এগোতে পারি নি। তাই সাঁতারের উপরই নির্ভর করতে হল।

সেই ঝড়বাদলের রাতে অনেক লড়াই করে এসে পৌঁছলাম নৌকোঘাটে, তবে নৌকোছাড়া। বুঝলাম মস্ত বড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। এবার মনে এল অন্য ভয়—কী করে বাড়ির ভিতরে যাব। আমার আপাদমস্তক সপসপে ভিজে, বিলের ঘোলা জলে জামাকাপড় অনেকটা গেরুয়া রঙ ধারণ করেছিল, আর তার উপর ছিল ঘাস, লতাপাতা, শ্যাওলা। ঝেড়ে-মেড়ে কিছুটা পরিষ্কার করলাম। তারপর চুপি-চুপি সোজা গিয়ে হাজির হলাম দিদির কাছে। ভাগ্যিস তখন ওখানে আর কেউ ছিল না।

আমাকে দেখে দিদি মাথায় হাত দিলেন, 'এ কী কাণ্ড! কী হল তোমার? কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' আমার পাগলামির কথা তাঁকে বললাম, মস্ত বড়ো অন্যায় করেছি, তাও বললাম। দিদির তখন আর সেদিকে মন নেই। তাড়াতাড়ি গরম জল করলেন, তারপর আমাকে স্নানের ঘরে নিয়ে সাবান-জল দিয়ে ঘসে-ঘসে সারা গা, মাথা পরিষ্কার করে দিলেন। আমার গঙ্গাস্নান শেষ হল। এবার পরিষ্কার জামা-কাপড় পরিয়ে আমাকে সোজা বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন, পরিপাটি করে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। বললেন, 'এবার তুমি এখানেই শুয়ে থাকো, আর উঠবে না।'

আমি ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নৌকোটার কী হবে, দিদি? আমি যে সেটা বিলে ফেলে এসেছি। শুনলে আমাকে যে সবাই বকবে।'

দিদি বললেন, "তুমি নৌকার জন্য কিছু ভেবো না। তোমাকে কেউ-কিছু বলবে না। এখন তুমি ভালো করে বিশ্রাম করো, কিছুক্ষণ ঘুমোও।' সেই-আসুরিক পরিশ্রমের পরে এ আদেশ পালন করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় নি। সহজেই ঘুম এসে গেল। সময় সম্বন্ধে তখন আমার কোনো ধারণা ছিল না, তবে মনে হল যেন অনেকক্ষণ ঘুমুলুম।

যখন জাগলাম, তখন দিদির হাত আমার কপালে। তিনি বসেছিলেন আমার পাশে পথ্য নিয়ে। বললেন, 'তোমার বেশ জ্বর এসেছে। সে আশঙ্কাই আমি করেছিলাম।' বিছানায় শুয়েই পথ্য গ্রহণ করলাম। দিদি বললেন, ডাক্তারকে খবর

দেওয়া হয়েছে। শীগগিরই আসবেন, পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে যাবেন। আবার ভালো করে আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে ঘুমুতে বলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার এলেন, নাড়ীনক্ষত্র দেখলেন। বললেন, জ্বর খুব বেশি, তবে সঙ্গে আর কোনো উপসর্গ নেই, তাই তিনি আশা করেন যে জ্বর দিন দুয়েকের মধ্যে সেরে যাবে। তবে জ্বর একেবারে সেরে না যাওয়া পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে, তরল পথ্য খেতে হবে। একটা মিক্‌স্‌চারেরও ব্যবস্থাপত্র দিয়ে গেলেন।

ওষুধ এল। দিদিই নিজ হাতে ঢেলে আমাকে দিলেন। ওষুধ খাওয়ার পর আবার তাঁর সেই সাদর হুকুম, 'এবার তুমি ঘুমোও, বেশ ভালো করে। হয়তো কাল সকালেই জ্বর অনেক কমে যাবে।'

আমার মন ছিল সেই বিলে। বললাম,'নৌকোটার কী হবে, দিদি? সকালে যখন সব্বাই এ ঘটনার কথা শুনবে, তখন তারা আমাকে কী বলবে?'

দিদি আবার জোর করে বললেন, 'তোমাকে কেউ কিছু বলবে না, বলতে দেব না, যা ব্যবস্থা করার সব আমি নিজে করব। তুমি সেজন্য বিন্দুমাত্র ভেবো না। এখন তুমি ভালো করে ঘুমোও, লক্ষ্মীটি, যেন তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পার।' বলে ধীরে-ধীরে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

সে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবছিলাম নিজের ভাগ্যের কথা। সেই ঝড়ের দুর্যোগে বিলের উপর দিয়ে অতটা পথ কী করে পার হয়ে এলাম ভেবে আশ্চর্য হলাম। সাপের কামড়, অন্য জীব-জন্তুর আক্রমণ, লতাপাতার আবেষ্টন, ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করার নিছক ক্লান্তি—সেদিন একটা অঘটন ঘটবার সুযোগ যথেষ্টই ছিল। আমার ভাগ্যবিধাতার কাছে মনে-মনে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

তারপরে মনে হল আশ্রমের কথা। একদিন কয়েকটা বাটি-গেলাস ভেঙেছিলাম বলে গুরু আমাকে নিষ্ঠুরভাবে গাল দিয়েছিলেন, আমাকে নগণ্য, অকর্মণ্য বলে তাড়াতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে বাটি-গেলাসই ছিল মূল্যবান, আমি ছিলাম তুচ্ছ। আর আজকে? আমি বিলে নৌকো ডুবিয়ে এসেছি, সেজন্য দিদির বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, তাঁর কাছে নৌকোর চেয়ে আমিই হলাম ঢের বড়ো, আমার জন্যেই তিনি ব্যাকুল। অন্ধকার ঘরে শুয়ে-শুয়ে বার-বার চোখ মুছলাম।

এক বছর আশ্রমে ছিলাম, কলকাতার নঠে আর মাধাইপুরের সত্যপ্রতিষ্ঠিত "তীর্থস্থানে"। আশ্চর্য এই যে একদিনের জন্যও অসুস্থ হই নি, একদিনও কাজে কামাই করি নি। অথচ তার আগে আমি কত ভুগেছি। গ্রামে মাসির বাড়িতে যাবার কয়েক মাস পরই আমাকে ম্যালেরিয়ায় ধরে। গা কেঁপে জ্বর আসত, ধাঁধাঁ করে ১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত উঠে যেত, তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে হত। কোনো-কোনো সময় তিন-চার দিন একটানা জ্বর থাকত। মাঝে-মাঝে দেখা দিত পালা-জ্বর, একদিন থেকেই চলে যেত; আবার চব্বিশ ঘণ্টা বাদেই ফিরে আসত। মাসি নিজে কিছু চিকিৎসা করতেন। আম গাছের গা থেকে হলদে লতা এনে তা দিয়ে হার বানিয়ে গলায় পরিয়ে দিতেন। তা ছাড়া অন্য একটা গাছের পাতা এনে তা দিয়ে বালা বানিয়ে হাতে পরিয়ে দিতেন। মাসির এ চিকিৎসা অগ্রাহ্য করার সাহস ছিল না। তাই কিছুকাল তা মেনে নিতে হয়েছিল।

ডাক্তার এসে অবশ্য অন্য ওষুধের বাবস্থা করে-ছিলেন। মনে আছে তখন এডুয়ার্ডস্ টনিক আমাকে দিনে তিন-চার বার করে গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। এ টনিক যে কত বোতল খেয়েছি তার অন্ত নেই। এটা তখন আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম থেকে কুমিল্লা যাবার সময়ও এ বোতল যত্ন করে সঙ্গে নিয়ে যেতাম।

গ্রাম ছাড়ার পরও ম্যালেরিয়া আমাকে ছাড়ে নি। কয়েকবার দিদির কাছে ছুটিতে চা-বাগানে

গিয়েছিলাম। সেখানে প্রত্যেক বারই ম্যালেরিয়া এসে আমাকে চেপে ধরেছিল। ডাক্তার জামাইবাবু নিজের ডিসপেনসারিতে তেতো ওষুধ বানিয়ে দিতেন। তাতেই জ্বরের উপশম হত; ছুটির আনন্দ অন্তত আট-আনা উপভোগ করতে পারতাম।

গুরুর আশ্রমে যদি আমাকে এ-জাতীয় রোগে ধরত তা হলে কী উপায় হত? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। গুরু হয়তো তখন আমাকে ঠেলে দিতেন চিরমুক্তির পথে, সংসারের পরপারে। তবে পাছে আশ্রমের দুর্নাম হয় সে ভয়ে হয়তো বাড়িতে খবর পাঠাতেন আমাকে রুগ্ন অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার জন্য। কে জানে!

মনে হল আমার পরম ভাগ্য যে আমাকে এ-জাতীয় সংকটের সম্মুখীন হতে হয় নি। দিদির কাছে জ্বরে পড়ে মনে হল যেন বিলাসিতায় ডুবে আছি। আদরযত্নের অন্ত নেই। তাঁর দৃষ্টি সব সময় আমার উপর। তাঁর কাছে থেকে অসুখে পড়াও যেন পরম সুখ।

ভাগ্যক্রমে বিশেষ কোনো উপসর্গ দেখা দেয় নি। জ্বর সহজেই ছেড়ে গেল। দুদিনেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলাম।

বিরামপুরের পথে

পুজোর দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর দিদির কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই ঠিক হল তিনি বিরামপুর যাবেন তাঁর মায়ের কাছে। আমিও ঠিক করলাম একই সময় পিসির বাড়ি ছেড়ে কুমিল্লা ফিরে যাব।

হঠাৎ দিদি এসে আমাকে বললেন, 'সাধু, তোমার তো এখনো স্কুল খোলার বেশ কয়েকদিন বাকি আছে। চলো না আমার সঙ্গে বিরামপুরে, ওখানে আমাদের কাছে কয়েকদিন থেকে কুমিল্লায় ফিরে যাবে তোমার ছুটি ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গেই। যাবে?' দিদির সঙ্গে আরো কয়েকদিন কাটাবার প্রলোভন সামলানো কঠিন ছিল। সানন্দে রাজি হলাম।

পরের দিন বাড়ির ছোটবড় সববার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, যথারীতি প্রণাম করে, প্রণাম নিয়ে। আমি এসেছিলাম বলে সবাই আনন্দ প্রকাশ করলেন। পিসির তো কথাই নেই—বুঝলেন এখন আমার সুমতি হয়েছে, আর পালিয়ে আশ্রমে যাব না; তা ছাড়া বউমার সঙ্গে আমার অতখানি ভাব যে তাঁর সঙ্গে আমি সারাদিন নৌকা করে তাঁর বাপের বাড়ি যেতে রাজি।

তখন হয়তো বেলা দশটা হবে। ঘাটে গিয়ে সুন্দর করে সাজানো একটি নৌকোতে উঠলাম। বাড়ির পুরনো মাঝি, পুরনো ঝি, দিদি আর আমি—এই হল সওয়ারি।

নৌকো ছেড়ে দিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে সবাই হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দিল। বেশ কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এবার নৌকো একটা মোড় ফিরল, পাড়ের দৃশ্য আড়ালে চলে গেল। বিনাউটি গ্রামে আমারও ছুটি শেষ হল।

বিশেষ মন দিয়ে দেখছিলাম মাঝি কী করে লগি ফেলে, কত জোর দেয়, আর কিভাবে তা জল থেকে তোলে। বুঝলাম তার মধ্যে বেশ একটু কায়দা আছে; যেমন, সোজা যাবার জন্যে লগি একেবারে নৌকার গা ঘেঁষে ফেলতে হয়। এ কাজ করে-করে অবশ্য মাঝির হাত পেকে গেছে, তাই দেখে অত সোজা মনে হয়।

এবার এসে পৌঁছলাম সেই স্মরণীয় জায়গায়। নৌকোটা তখনো প্রায় জলে ডুবে রয়েছে। দিদিকেও দেখালাম, বললেন 'সেদিন কী কাণ্ডই না তুমি করেছিলে! কী যে হতে পারত!' দিদি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন। আমি একটু হেসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নৌকোটা এখনো কেন ওখানে পড়ে রয়েছে। তিনি নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন, 'উঃ, তারা এটা তুলে নেবেখন, সুবিধেমত। ওদের বলে দিয়েছি।'

দিদি বিনাউটিতে প্রথম আসেন বছর সাতেক আগে, বিয়ের পরে। তারপর থেকে বহুবার এ পথে আনাগোনা করেছেন। পুজোর সময় শ্বশুরবাড়িতে থাকা আর লক্ষ্মীপূর্ণিমার আগে নৌকো করে বাপের বাড়ি যাওয়া একটা বাৎসরিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একাই যেতেন, এবার দৈবাৎ সঙ্গী জুটে গেল।

দিদি সুখে ছিলেন, কিন্তু সুখী ছিলেন না বোধহয়। কয়েক বছর আগে তাঁর একটি ছেলে হয়েছিল, জন্মাবার অল্প পরেই মারা যায়। তখন থেকে তিনি নিঃসন্তান। তা ছাড়া মানুষের সত্যিকার সুখের জন্য শুধু বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যই যথেষ্ট নয়, মনের খোরাকেরও প্রয়োজন। এ দুয়ের সমন্বয় চিরদিনই কঠিন ছিল, তখনকার আমলে মেয়েদের বেলা তা ছিল একান্ত দুর্লভ, প্রায় স্বপ্নের মতো। তবু তাঁর মা-মাসিদের মতো তাঁরও জ্ঞানার্জনের আর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। তখনকার দিনে তাঁদের পক্ষে স্কুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না, তা ছাড়া তিন বোনেরই বিয়ে হল অল্প বয়সে। তা সত্ত্বেও নিছক নিজের চেষ্টায় বাড়িতে লেখাপড়া করে তাঁরা মানসিক উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের জীবনে স্কুল-কলেজের ডিগ্রির ছাপ ছিল না, কিন্তু আসল শিক্ষার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। আর তার সঙ্গে ছিল বহুল পরিমাণে কালিদাস যাকে বলে গেছেন 'নারীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্বম্'। সেই সহজাত শিক্ষাহীন শিক্ষা তাঁদের ছিল বিশেষ সম্পদ।

দিদির বাল্যজীবনের ইতিহাসও ছিল একই ধরনের। তফাতের মধ্যে এই যে তিনি স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন আর মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল, কিন্তু ভাগ্য ছিল প্রতিকূল। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তাঁর বিয়ে হয় যখন তিনি স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে, বয়স তখন বোধ হয় চোদ্দ পেরোয় নি। তবু প্রগতিশীল পরিবারের আবহাওয়া, স্কুলে কয়েক বছরের শিক্ষা, বিবাহিত জীবনেও জ্ঞানার্জনের সাধ্যমতো চেষ্টা—সবকিছুর ফলে ডিগ্রিহীন হলেও তিনি ছিলেন মার্জিত, সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে স্বপ্নপ্রবণ।

[ক্রমশ

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) ব্রহ্মরাজ্যের বিচারপ্রথা ও বিচারকক্ষ

কঠিন-কঠিন মোকদ্দমার কথা বলা এই ক্ষুদ্রায়তন রচনায় সম্ভবপর নহে। পূর্বতন মোকদ্দমার বিচারফল-গুলি যে গৃহে রক্ষিত ছিল, সে মহাফেজখানা নথিসহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গ্রামের ছোটো-ছোটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা গ্রামের তুজির গৃহেই বিচারিত হইত। পঞ্চায়েত-প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ-গণ সম্মিলিত হইয়া মোকদ্দমা আপোসে নিষ্পত্তি করিতে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত প্রায়ই ন্যায়সঙ্গত হইত।

তুজির বিচারালয়ে বাদী ও বিবাদী উভয়কেই দুই টাকা করিয়া বিচার-কর জমা দিতে হইত। তুজির কেরানি দু পক্ষ ও তাহাদিগের সাক্ষীদিগের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেন। বাদী মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলে শতকরা দশ টাকা হিসাবে রাজকর দাখিল করিয়া, বিচারের আদেশলিপি গ্রহণ করিত। উত্তর গান মুল্লুকে এখনো এইরূপ দশ টাকা কোর্ট ফী দেওয়ার নিয়ম আছে।

তুজি বা মিও-তুজির বিচারে অসন্তুষ্ট হইলে উন্-ডাউক বা মিও-উনের (গভর্নরের) নিকট আপীল করা যাইত। তুজির কেরানিকে রোজ আট আনা হিসাবে বারবরদারি দিলে, সে ঊর্ধ্ব-আদালতে যাইয়া আপীল দাখিল করিয়া দিত।

হ্লুড' ছিল ব্রহ্মরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আদালত। দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্বসংক্রান্ত সকল মোকদ্দমারই সেখানে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইত।

ফৌজদারি মোকদ্দমাতেও কার্যবিধি প্রায় এইরূপ ছিল। জরিমানাই ছিল সাধারণ দণ্ড। রাজদ্রোহিতা প্রভৃতি অসাধারণ অপরাধে কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড হইত ; কিন্তু মান্দালয়ের হ্লুড'র সম্মতি ভিন্ন কাহারও প্রাণদণ্ড করা যাইত না।

মান্দালয় শহরের বিচারকার্য অন্যান্য প্রদেশ হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ছিল।

স্বর্ণ বিচারালয় (shwe yon daw) নামে এখানে এক বড়ো আদালত ছিল। ইহাতে তুজি, মিও-তুজি, নে-ওক, দ্বীলা-বো, মিও-উক ও উন্ পিনের বিচারের আপীল গ্রহণ করা হইত। বিচার করিতেন মান্দালয়-মিও-উন্ (town governor)। কখনো-কখনো তিনি জুরি ডাকিয়া তাঁহাদের মত লইতেন। তাঁহাদের আদেশের আপীল হইত হ্লু-ড' কোর্টে।

দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রেভেনিউ—তিন রকমের আদালত ছিল। কিন্তু পূর্বোক্ত স্বর্ণবিচারালয়ে সর্ব-প্রকারের মোকদ্দমাই গ্রহণ করা হইত।

রাজা তিব' কখনো-কখনো স্বীয় ইচ্ছা অনুসারে কোনো-কোনো মোকদ্দমা স্বয়ং বিচার করিতে পারিতেন। কিন্তু হ্লু-ড'র মন্ত্রিগণের স্বাক্ষর না পাইলে তাঁহার আদেশ কার্যে পরিণত করা যাইত না।

মহারানী থুপিয়ালার নিজের একটি কোর্ট ছিল—পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে। তিনি সেখানে স্বর্ণ-পদ্ম আসনে বসিয়া স্ত্রীলোকদিগের ফরিয়াদ ও বিচার করিতেন।

আমাদের দেশের কাজির বিচারের ন্যায় প্রাদেশিক গভর্নরদের বিচারকার্যের আশ্চর্যজনক গল্প এখনো শোনা যায়। কোনো-কোনো বিচারক এরূপ কুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে হ্লু ড' সভা হইতে কঠিন-কঠিন মোকদ্দমার বিচারভার তাঁহাদিগের উপর অর্পিত হইত। কিন্তু সাধারণত গভর্নরগণই তাঁহাদিগের শাসনাধীন প্রদেশের শাসনকর্তা, বিচারকর্তা, রাজস্ব-সংগ্রহীতা, শান্তি-রক্ষক ও পূর্ত-স্থপতি-জলনালী-বিভাগের একমাত্র কর্তা ছিলেন। নানাপ্রকার কার্যে ব্যাপৃত থাকাতে বিচারকার্য কখনো-কখনো বিলম্বিত হইত।

বিচারকার্যের জন্য লিখিত কোনো আইন ছিল না। প্রাদেশিক রীতিনীতি, পুরাতন ধর্মতত্ত্ব ও মনুলিখিত সংহিতা তাহাদিগের পরিচালক (guide) ছিল। ইহাতে অবিচার হইত বলিয়া ব্রহ্মদেশীয়দিগের মুখে শোনা যায় না। ইংরেজি পুস্তকে লিখিত আছে—'উৎকোচগ্রহণে ব্রহ্মদেশের বিচারকার্য পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল।'

হ্লু ড'র বিচারপদ্ধতির কোনো লিখিত বিবরণ আমরা দিতে পারিলাম না। নানাপ্রকার গল্প হইতে একটি গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

অমরাপুরায় এক দোকানদার ছিল—নাম মংটিন্। তাহার স্ত্রী ছিল খুব সুন্দরী, নাম মা-ইউ।

অমরাপুরায় ভালো রেশমি কাপড় বয়ন করা হয়*। মংটিন দুই-তিন গাঁটরি রেশমি থান লইয়া মান্দালয়ে যাইত। দেখানে পাঁচ-সাত দিন থাকিত। থানগুলি বিক্রয় হইলে, মান্দালয় হইতে অন্য কোনো বাণিজ্য-দ্রব্য ক্রয় করিয়া অমরাপুরায় ফিরিয়া আসিত। মংটিনের অনুপস্থিতিতে মা-ইউ অমরাপুরার দোকানে বসিত, বিক্রয় করিত, হিসাব লিখিত ও ক্রেতাদিগকে মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করিত। অবস্থা ভালোই ছিল।

অমরাপুরার মিও-উনের পুত্র মংহ্লাজ্য একদিন মা-ইউর দোকানে আসিলেন। এটা ওটা দেখিয়া দরদস্তুর করিয়া একখানি রেশমি গাউণ্ড-বাউণ্ড কিনিলেন, বলিয়া গেলেন—আমি তোমার দোকান হইতে আমার প্রয়োজনীয় জিনিস সব কিনিব।

মা-ইউ কৃতার্থ হইল। মিও-উনের পুত্র তাহার দোকানের ক্রেতা। ভবিষ্যতে খুব লাভের আশা করিয়া সে মংটিনকে এই সৌভাগ্যের সংবাদ জানাইল। মংহ্লাজ্য মাসে ২০০।২৫০ টাকার জিনিস নগদমূল্যে ক্রয় করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মা-ইউ ও মংহ্লাজ্যর ক্রেতা-বিক্রেতা সম্বন্ধ অন্যরকম হইয়া গেল। মংটিনের

* অমরাপুর রেশমের বয়নের বিশেষত্ব : বস্ত্র খুব খাপি হইবে, অথচ তাহার মধ্যে শিষের দিকে করিয়া পেন্সিল ঢুকাইয়া দিলে তাহা অপর দিকে বাহির হইবে। পরে আঙুল দিয়া বস্ত্র মসৃণ করিয়া দিলে পেন্সিলের ফুটো বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অ.মি.।

অনুপস্থিতিতে মংহ্লাজ্য মা-ইউর গৃহে রাত্রিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। চুনীর ইয়ারিং, হীরার অঙ্গুরীয়, সোনার হার প্রভৃতি বহুবিধ অলঙ্কারে মা-ইউর লাক্ষাপুটিকা পূর্ণ হইয়া গেল। মা-ইউ তখন খুব তানাখা মাখিত, সুন্দর প্রসাধন করিত, ভালো এঞ্জি ও কাপড় পরিত এবং দেড় ঘণ্টা ধরিয়া গা পরিষ্কার করিয়া স্নান করিত।

এদিকে মংটিনের মান্দালয়ের কারবারও ক্রমে বৃদ্ধিলাভ করিতেছিল। মাসের মধ্যে পনেরো দিনই তাহাকে কার্যানুরোধে মান্দালয়ে থাকিতে হইত। ঘরে যুবতী ভার্যা মা-ইউ, যুবক মংহ্লজ্যর সহিত যে অন্যায় সম্পর্ক পাতিয়াছিল তাহা মংটিন্ জানিত না, কোনো সন্দেহও করে নাই।

কয়েক মাস পর মান্দালয়ে যাতায়াতে কষ্ট ও অসুবিধা হওয়ায় মংটিন্ মান্দালয়ে তাহার এক এজেনট নিযুক্ত করিল। মা-ইউ এই প্রতিনিধি নিয়োগে সন্তুষ্ট হইল না। ব্যাবসার ক্ষতি নির্দেশ করিয়া মংটিনকে স্বয়ং মান্দালয়ে যাইয়া ব্যাবসা রক্ষা করিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু মংটিন মা-ইউর কথা রাখিল না।

এইরূপ ব্যবস্থার পর মংটিন্ অমরাপুরাতেই থাকিতে লাগিল, মংহ্লজ্যর সহিত মা-ইউর নৈশমিলন বন্ধ হইয়া গেল। মা-ইউ প্রণয়ীর অদর্শনে ক্রমে অস্থির হইয়া উঠিল। মংহ্লাজ্যও ততোধিক অধীর হইয়া মা-ইউর নিকট দূতী পাঠাইয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। মাঝে-মাঝে তখন তাহাদের চোখের দেখা হইত, কিন্তু মিলন হইত না।

একদিন মা-ইউ স্বামী মংটিনকে বলিল—মাউঙ্, আমি এক বিলূর দয়ালাভ করিয়াছি; বিলূ রাত্রি দুপ্রহরের সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে, এবং আমি যাহা চাই, তাহাই আমাকে দান করে। এতদিনে আমার দেবপূজা সার্থক হইয়াছে।

মা-ইউ মংটিন্‌কে এক বহুমূল্য সোনার হার ও হীরার কুণ্ডল দেখাইল।

মংটিন্ সংবাদটি শুনিয়া খুশি হইল না। প্রেয়সী-ভার্যার উপর বিলূর দয়া তাহার মোটেই পছন্দ হইল না। সে বলিল, আমাকে দেখাও সে কীরকম বিলূ।

মা ইউ বলিল, 'বেশ, আজই তোমাকে দেখাইব; তুমি দোকানঘরে থাকিও। সাবধান, আমার শোবার ঘরে তুমি আসিও না।'

রাত্রিতে মংটিন্ দেখিল, এক ভীষণাকৃতি পুরুষ, পরনে কালো কোট ও কালো পাজামা, মাথায় উজ্জ্বল রত্নমুকুট, পায়ে বৃহৎ, সুদীর্ঘ জুতা, আর হাতে খোলা তরোয়াল—রাত্রি বারোটার সময়ে সিড়ি দিয়া মা-ইউর শোবার ঘরে উঠিতেছে। মা ইউ দরজা খুলিয়া হাতজোড় করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। বিলূ ঘরে প্রবেশ করিলে আবার দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

রাত্রি চারটা পর্যন্ত মংটিন্ বিমর্ষচিত্তে দোকান-ঘরে বসিয়া রহিল। তার পর বিলূ ধীরে-ধীরে মা-ইউর শয়নঘর হইতে বাহির হইয়া মিও-উনের বাড়ির উদ্যানে অন্তর্ধান করিল।

এইরূপে প্রতি তিনদিন পরেই মংটিনের গৃহে বিলূর আবির্ভাব হইতে লাগিল। কোনো দিন বিলূ আসিত সুন্দর সুবেশ ভদ্র মূর্তিতে, কোনো দিন ভয়ঙ্কর দৈত্যমূর্তিতে, আবার কোনো দিন আসিত মনোহারিণী "উর্বশী-মূর্তিতে"। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মা-ইউ বিলূকে আরাধনা করিত। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভোজ্য রন্ধন করিয়া তাহাকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইত, এবং ভোর চারটার সময়ে চা পান করাইয়া বিদায় দিত।

কিন্তু এই ভূতের অত্যাচার এক মাসের মধ্যেই মংটিনের অসহ্য হইয়া উঠিল। সে মা-ইউকে বলিল, সে ওঝা ডাকিবে।

মা-ইউ বলিল—অনর্থক একটা গোলমাল করিও না। বিলূর দয়ায় আমাদের ক্রমশই ধনবৃদ্ধি হইতেছে। এ সৌভাগ্য যার তার হয় না। তুমি অত্যন্ত পুণ্যবান বলিয়াই, এই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন বিলূর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছ। নতুবা এতদিনে মংকোজির ব্যাবসার উন্নতিতে আমাদের দোকান উঠিয়া যাইত।

মংটিন্ আরও কিছুদিন বিলূর অত্যাচার নীরবে সহ্য করিল। তাহার পর একদিন রাত্রিতে গোপনে এক ওঝা আনিয়া দোকানঘরে বসাইয়া রাখিল। ওঝা দেখিয়া শুনিয়া বলিল : 'এ বিলূ সাতলোকের রাজা; আমার সাধ্য নাই যে আমি কিছু সাহায্য করিতে পারি। তুমি অন্য ওঝা ডাকো।'

মংটিন আরও অধীর হইল; ব্যাবসায় তাহার মন রহিল না। মা-ইউ সোনা, চুনী, নীলা পাইয়া শতমুখে বিলূর প্রশংসা করিত, কিন্তু মংটিন সে চুনী-নীলায় সন্তুষ্ট হইল না। সে গোপনে এক জেরবাদী শিকারি সংগ্রহ করিল এবং একদিন রাত্রিতে এই জেরবাদীকে লইয়া বিলূকে হত্যা করিল।

মৃত্যুর পর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল, ওই নিশাচর বিলূ অমরাপুরের মিও-উনের পুত্র হ্লাজ্য। জেরবাদী তখনই পলায়ন করিল। মংটিন পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতায় আরও ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মা-ইউর প্রাণসংহার করিল এবং তাহার পর মিও-উনের কেরানির নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিল।

মংহ্লাজ্য ছিল মিও-উনের একমাত্র পুত্র। তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মংটিনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন, এবং তাহাকে কারাগারে বন্ধ রাখিয়া হ্লু-ড'র সম্মতি প্রার্থনা করিলেন।

মংটিনের অপরাধসংক্রান্ত মোকদ্দমার কাগজ পৌঁছিলে, মহারাজ তিব এই মোকদ্দমার কথা মহারানী থুপিয়ালাকে বলিলেন। মহারানী বলিলেন, বিচারের দিন আমিও উপস্থিত থাকিব।

বিচারের দিন মংটিনের পক্ষ হইতে উছান নামক এক উকিল হ্লু-ড' সভায় হাজির হইলেন। তখনকার উকিলরাও সরকারি 'আদেশ' (আমেইন-ড') লইয়া আদালতে ওকালতি করিতেন। হ্লু-ড' কোর্টের উকিলরা ফৌজদারি মোকদ্দমায় লাল চোগা পরিয়া কোর্টে হাজির হইতেন। বিচারক রাজমন্ত্রিগণ তাহাদিগের বাদামি-চোগা ও চকোলেট টুপি পরিয়া পূর্ণ পদবীসঙ্গত পরিচ্ছদে বিচার করিতে বসিতেন। রাজা তিব' ছিলেন হ্লু-ড' সভার সভাপতি। এ মহাসভায় মহারানীর কোনো বিচারাধিকার ছিল না। কিন্তু তথাপি তিনি প্রায়ই মহারাজ তিব'র পশ্চাতে বসিয়া তাহাকে বিচারকার্যে সাহায্য করিতেন।

মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইলে উকিল উছান মংটিনকৃত অপরাধের সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তৎপর অমরাপুরা-মিও-উনের আদেশপত্র পাঠ করা হইল। উছান বলিলেন :

—হ্লাজ্য যেরূপ চতুরতাপূর্বক আসামি ঙ্গা টিনকে প্রবঞ্চিত করিতেছিলেন, তাহাতে সরলস্বভাব ঙ্গা-টিন বুঝিতে পারে নাই যে মিওউনের পুত্র হ্লাজ্য বিলূর বেশ ধারণ করিয়া এইরূপ অপকার্য করিতে-ছিলেন। ঙ্গা টিন্ বিলূকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। হ্লাজ্যকে হত্যা করিবার বাসনা তাহার ছিল না; হ্লাজ্য যে বিলূরূপ ধারণ করিয়াছে তাহাও সে জানিত না। সুতরাং ঙ্গা টিন্ ছদ্মবেশী মংহ্লাজ্যর মৃত্যুর জন্য দণ্ডিত হইতে পারে না। তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আদেশ হউক।

হ্লু-ড' কোর্টের বড়ো কেরানি মিও-উন মহাশয়ের আদেশপত্র সমর্থন করিয়া বলিলেন :

—বিলূগণ পরলোক হইতে ইহলোকে আসিয়া স্ত্রীলোকসহিত রাত্রিযাপন করিতে পারে, এরূপ কথা বিকৃতমস্তিষ্ক পাগল ভিন্ন অন্য লোকের বিশ্বাস হইবে না। ঙ্গা টিন্ পাগল নহে, সে সু-চতুর ব্যবসায়ী লোক; সে নিশ্চয়ই জানিত যে বিলূবেশী পুরুষ প্রকৃতপক্ষে বিলূ নহে, রক্তমাংস-সম্পন্ন মানুষ। মংহ্লাজ্য এই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল, ঙ্গা টিনের এরূপ জ্ঞান বা বিশ্বাস না থাকিলেও সে যে মানুষ হত্যা করিবার জন্য দা লইয়া বিলূবেশীকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয় না। সুতরাং ঙ্গা টিন্ নরহত্যা অপরাধে অপরাধী; প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত

শাস্তি।

মহামন্ত্রী কিন্ উন্‌মিন্‌জী মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

—মংহ্লাজ্য পরস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া মা-ইউর স্বামীর সম্মুখে যেরূপ পাপকার্য সম্পাদন করিতেছিল তাহাতে মা ইউর স্বামী পরদারাসক্ত পাপীকে হত্যা করিলেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে না; কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে এরূপ চরিত্রহীন ব্যক্তির প্রাণনাশ করিলে, মৃতব্যক্তির দেহের মূল্যস্বরূপ ৩২ টিকল রৌপ্য দিলেই হত্যাকারীকে মুক্তিদান করা যাইতে পারে।

মহামন্ত্রী খমপাট মিন্‌জী বলিলেন :

—মহারাজ, আপনার প্রজাগণ যদি দুষ্কৃতকারীদিগকে আদালতে অভিযুক্ত না করিয়া স্বহস্তেই তাহাদের প্রাণদণ্ড করিতে আরম্ভ করে, তবে রাজ্যে আইন বা আদালতের প্রয়োজন থাকিবে না। মংহ্লাজ্য পাপকার্য করিয়া থাকিলেও দণ্ডদানের কর্তা ব্রহ্মরাজ। তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। ঙ্গা টিন্ তাহাকে হত্যা করিয়া নরহত্যার অপরাধে দোষী হইয়াছে।

মহামন্ত্রী হ্লে তুইন্ উন্‌জী বলিলেন :

—স্বামীর সমক্ষে তাহার পত্নীতে উপগত হইলে স্বামীর স্বভাবতই ক্রোধ হইতে পারে। এবং এরূপ ক্রুদ্ধ অবস্থায় উপপতিকে হত্যা করিলে, হত্যাকারীকে দণ্ডদান করা সুবিচার নহে।

—পুরাকালে চিত্রকলির নরপতি এইরূপ এক অপরাধীকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

উকিল উহান কহিলেন :

—আমি নিবেদন করিতেছি যে, ব্রিটিশ আইনমতেও এইরূপ অপরাধে শাস্তি হয় না। উপযুক্ত কারণে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় নরহত্যা করিলে হত্যাকারী ব্রিটিশ আইন অনুসারে অপরাধী নহে।

মহারাজ তিব' উকিলের কথা শুনিয়া বলিলেন :

—আমরা ব্রিটিশ আইন মতে ঙ্গা টিনের বিচার করিতে বসি নাই। আমাদের দেশের কানুন কী উকিল মহাশয় তাহা এই মহাসভাকে জানাইলে আমাদের বিচারকার্যে সহায়তা হইত।

উকিল উহান তখন পুনরায় নিবেদন করিলেন :

—মহারাজ, ব্রহ্মের কানুন আপনার অবিদিত নাই। তথাপি স্মরণার্থে আমি নিবেদন করিতেছি। মনুজ্যে ধর্মতত্ত্বের পঞ্চম অধ্যায়ে ভগবান মনু বলিয়াছেন :

হে মহারাজ, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বর্শা, তরবারি, তীর, বা অন্য কোনো অস্ত্র দ্বারা নিহত করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড করা উচিত নহে। কারণ কোনো কুকুর যদি কোনো লোকের পায়ে দন্তাঘাত করে, মানুষের সেই কুকুরকে দন্তাঘাত করা উচিত নহে। রাজা হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড না করিলে, তিনি সকল দেবতা ও মানবের পূজ্য হন।

মহারাজ তিব' বলিলেন :

—প্রাণদণ্ড না হইলেও হত্যাকারীকে অন্য দণ্ডপ্রদানের ব্যবস্থা আছে। হ্লাজ্য অমরা মিও-উনের একমাত্র পুত্র। তাহাকে হত্যা করিয়া মংটিন্ তাহাকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে।

উহান—মহারাজ, ঙ্গা টিন্ জ্ঞাতসারে হ্লাজ্যকে হত্যা করে নাই। সে জানিত সে বিলূকেই আক্রমণ করিয়াছে।

হ্লড'র কেরানি—মহারাজ, ঙ্গা টিন্‌কে স্ত্রীহত্যার জন্যও দণ্ডিত করা উচিত।

মহামন্ত্রী খামলট মিন্‌জী—স্ত্রীহত্যা মহাপাপ। এজন্য ঙ্গা টিনের প্রাণদণ্ড না হইলেও গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত।

মহারানী থুপিয়ালা—স্ত্রীহত্যার অপরাধে ঙ্গা টিন্‌কে কারাগারের বাহিরে সাধারণের সমক্ষে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা উচিত।

মহামন্ত্রী কিন উন মিন্‌জী বলিলেন :

—মহারাজ, ভগবান মনু সাত প্রকার স্ত্রী নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা এই—১। জপনীর ন্যায় স্ত্রী, ২। ভগিনীর ন্যায় স্ত্রী, ৩। প্রভুর ন্যায় স্ত্রী, ৪। বন্ধুর ন্যায় স্ত্রী, ৫। শত্রুর ন্যায় স্ত্রী, ৬। দাসীর ন্যায় স্ত্রী, ৭। চোরের ন্যায় স্ত্রী। মা-ইউ যেপ্রকার ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতে তাহাকে শত্রু স্ত্রীর মধ্যে পরিগণনা করা যাইতে পারে। তাহাকে বধ করিয়া ঙ্গা টিন্ দণ্ডভাক্ হইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রের বচন।

অন্যান্য মন্ত্রিগণ সকলেই মহামন্ত্রী কিন্‌উন্ মিন্‌জীর মত সমর্থন করিলেন। মহারানী থুপিয়ালা ঙ্গা টিনের প্রাণদণ্ডের আদেশের জন্য মহারাজ তিব'কে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মহারাজ তি'ব মন্ত্রিগণের মতেই স্বীয় মত প্রদান করিয়া আদেশ দিলেন :

—ঙ্গা টিন্ বিলুবোধে হ্লাজ্যকে হত্যা করিয়াছে। মনুষ্যবোধে করে নাই। মা-ইউকেও সে গুরুতর অপরাধে নিহত করিয়াছে। স্বীয় পতির সম্মুখে দুশ্চরিত্রা পত্নী উপপতিকে ভজনা করিলে, পতি যদি ক্রোধান্ধ হইয়া উপপতিকে বা পত্নীকে বা উভয়কে হত্যা করে, তবে তাহাকে দণ্ডপ্রদান করা আমি ন্যায়সঙ্গত মনে করি না। ঙ্গা টিনের প্রাণদণ্ডাদেশ আমি কর্তন করিলাম। কিন্তু ঙ্গা টিনের বত্রিশ টিকল রৌপ্যমুদ্রা জরিমানা দিতে হইবে। সে টাকা অমরাপুরা মিও-উন পাইবেন।

বিচার সাঙ্গ করিয়া মহারাজ ও মহারানী হ্লু ড' মহাসভা হইতে বহির্গত হইলেন।

উকিল উছানের সুনাম বাড়িয়া গেল।

[ক্রমশ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, ১৯৪৫-৪৭

সুনীল সেন

চার

সেই বিষণ্ণ যুগে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতীক, ভবিষ্যতের আশা দক্ষিণ ভারত। এপ্রিলে পানজাব এবং উত্তর ভারতে দাঙ্গা অব্যাহত; বাঙলার তেভাগা-আন্দোলন মুমূর্ষু। শ্রমিক আন্দোলনের লাল দুর্গ বোম্বাই মার্চের শেষে দাঙ্গায় বিধ্বস্ত। শুধু বিহারে বকস্ত আন্দোলন দুর্বার—তবে সীমিত অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতে কিন্তু দাঙ্গার কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। শ্রমিক আন্দোলন নিস্তেজ হয় নি। তেলেঙ্গানায় চলছিল সশস্ত্র কৃষকবিদ্রোহ আর সেই সঙ্গে তেলুগুভাষীদের আত্মনিয়ন্ত্রণপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ত্রিবাঙ্কুরে ভায়ালারে কারিগর এবং শ্রমিকদের এক অভ্যুত্থান। মালাবারে ভূস্বামী-প্রথার বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত আন্দোলন। এ যেন আর-এক ভারতবর্ষ! বাম-বিকল্পের সম্ভাবনা শুধু এই অঞ্চলে তখনো অবাস্তব বা অবান্তর হয় নি।

১৯৪৭ সালের শুরু মাদুরার কাপড়ের কলে ধর্মঘট দিয়ে। মিলের দরজা বন্ধ করে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ হল; চারজন শ্রমিক মারা গেল।[১] ফেবরুয়ারি মাসে কোয়েমবাটোরে আবার ধর্মঘট। ১১ মার্চ বাকিংহাম কর্ণাটক মিলে চোদ্দ হাজার মজুরের সর্বাত্মক ধর্মঘট।[২] ১৮ মার্চ 'মৌলিক দাবি দিবসে' আংশিক ধর্মঘট হল শিল্পাঞ্চলে[৩]। ৩১ মার্চ অসংখ্য কমিউনিস্টদের গ্রেফতার করে কংগ্রেস সরকার কমিউনিসট-বিরোধিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। এমনকী মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন নিষিদ্ধ হল। আন্দোলন দুর্বল হল বটে, তবু শ্রমিক ইউনিয়নে কমিউনিসটদের প্রাধান্য ছিল অটুট। জুনের প্রথম সপ্তাহে বাকিংহাম-কর্ণাটক মিলের ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন সাধারণভাবে অব্যাহত ছিল।

ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানায় শুরু হয়ে গিয়েছিল কৃষক-বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের পটভূমিকা জানা দরকার। প্রথম আন্দোলন শুরু করে অন্ধ্র মহাসভা (১৯৩০);

এই প্রতিষ্ঠানের মৌল দাবি হায়দরাবাদে নিজামের শাসনের অবসান এবং অন্ধ্রজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি। ১৯৪০-৪২ থেকে রবিনারায়ণ রেড্ডি এবং বাদাম ইয়ালা রেড্ডির নেতৃত্বে অন্ধ্র মহাসভার আংশিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়। ১৯৪৬-এর শেষে শুরু হয় কৃষকসংগ্রাম। অবস্থার মৌল পরিবর্তন ঘটে স্বাধীনতার ঠিক পরে। নিজাম হায়দরাবাদের স্বাধীনতা ("আজাদ হায়দরাবাদ") ঘোষণা করেন। ইত্তেহাদ-উন-মুসলিমিন এবং কাসিম রাজভীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাজাকার-বাহিনী দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শাসন অক্ষুণ্ণ রাখবার প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করে। কংগ্রেস এবং কমিউনিসটদের মোর্চা গঠিত হয়; তেরঙ্গা এবং লাল ঝাণ্ডার সমারোহ দেখা গেল গ্রাম-গ্রামান্তরে। সাহসের সঙ্গে কমিউনিসট পার্টি কৃষি-বিপ্লবের ডাক দিল। নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে অন্ধ্র-জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন এবং কৃষকবিদ্রোহের ধারা একস্রোতে মিলিত হল। সুন্দরাইয়া লিখেছেন: 'জাতীয় ভাবধারা ছিল আন্দোলনের পক্ষে,··· সমগ্র হিন্দু জনতা চাইছিল নিজামের সামন্ততন্ত্রী শাসনের অবসান···।[৪] কংগ্রেস নেতা রামানন্দ তীর্থ বন্দী হলেন, আর কমিউনিসট দল নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯৪৩-এ।

তেলেঙ্গানা আন্দোলনের দুটো স্তর চিহ্নিত করা যায়। প্রথম স্তর সেপটেমবর, ১৯৪৮ পর্যন্ত; দ্বিতীয় স্তর জেনারেল চৌধুরীর হায়দরাবাদে অভিযান থেকে তেলেঙ্গানা সংগ্রামের সমাপ্তি পর্যন্ত। প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য ব্যাপক কৃষক-জনতার যোগদান। এঁদের মধ্যে বিস্তর ধনী-কৃষক ছিলেন; নেতৃত্বের একটি অংশ ধনী-কৃষক। গ্রামীণ ঐক্য আন্দোলনের শক্তির উৎস। বড়ো-বড়ো ভূস্বামীদের জমি অধিকার এবং গ্রামের গরিবদের মধ্যে জমি-বণ্টন একমাত্র এখানেই হয়েছিল। জমির সর্বোচ্চ সীমা ছিল প্রথমে ৫০০ একর, পরে ১০০ একর। স্পষ্ট বোঝা যায়—ধনী-কৃষকদের সন্তুষ্ট রাখা ছিল নেতৃত্বের বাসনা। দ্বিতীয় স্তর সম্বন্ধে নেতৃত্বের মধ্যে তীব্র বিতর্ক রয়েছে। আন্দোলনের কিংবদন্তী নেতা রবিনারায়ণ রেড্ডির মতে, দ্বিতীয় স্তরে পার্টি হারায় হাজার-হাজার কর্মী; আন্দোলন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পঙ্কে নিমগ্ন হয়; কর্মীরা পুরানো এলাকা ছেড়ে আশ্রয় নেন সুদূর অরণ্যে।[৫] সুন্দরাইয়ার মতে, কোনো বিকল্প তখন ছিল না; প্রতিরোধ বিনা জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর সশস্ত্র বাহিনী "লাল অঞ্চল" ধ্বংস করে দিত। প্রায় চার হাজার কর্মী নিহত হন; ষাট হাজার বন্দী হন। কে. এম. মুনসির হিসাব অনুসারে, দু-হাজার ভূস্বামী কমিউনিসটদের হাতে নিহত হয়েছিল। ১৯৫১-র শরৎকালে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল। সুন্দরাইয়া লিখেছেন: এলাকার প্রধান কেন্দ্র লালগোণ্ডা, ওয়ারাঙ্গাল এবং খাম্মাম জেলাতেও কোনো গণ-আন্দোলন ছিল না। আক্রমণের লক্ষ্য ক্রমে-ক্রমে হয়েছিল ব্যক্তিবিশেষ। গণসংগ্রামের স্থান গ্রহণ করল ব্যক্তিহত্যা।[৬]

অবশ্য তেলেঙ্গানা আন্দোলনের বিজয় স্বীকার্য। নিজামের শাসনের অবসান হল। হায়দরাবাদ ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিল। হায়দরাবাদকে কেন্দ্র করে কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ঘটে নি। শেষ পর্যন্ত অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হল হায়দরাবাদ। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তও ১৯৫২ সালে নতুন অন্ধ্ররাজ্যের সৃষ্টি। অন্ধ্রজাতির সংহতি সুপরিচিত। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কমিউনিসটদের বিপুল প্রভাব অনেক বৎসর অক্ষুণ্ণ ছিল।

হায়দরাবাদের নিজামের পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান স্যর রামস্বামী আয়ার। জনসাধারণের শিক্ষার মান উন্নত হলেও এই রাজ্যে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজা এবং দেওয়ানের হাতে কেন্দ্রীভূত রাখার এক পরিকল্পনা রামস্বামী পেশ করেন। কমিউনিস্ট পার্টি এই স্বৈরতন্ত্রী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করে। পার্টির প্রধান ঘাঁটি ছিল পুন্নাপ্রা আর ভায়ালারে; পার্টির সমর্থক কারিগর, জেলে এবং কৃষিশ্রমিক। ১৯৪৬-এর অকটোবরে এক

অভ্যুত্থান দেখা গেল পুন্নাপ্রা-ভায়ালার অঞ্চলে। কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকদের কেন্দ্র ভায়ালার—তাদের হাতে লাঠি, বল্লম, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র। সেনাবাহিনীর আক্রমণে প্রায় আট-শ কমিউনিস্ট বিদ্রোহী নিহত হন।[৭] নিঃসন্দেহে এক রক্তস্নান।

নামবুদিরিপাদ লিখেছেন, এই সংগ্রাম মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পরাজিত হয়, কেননা এর পিছনে কৃষক ছিল না। কৃষক আন্দোলনের কেন্দ্র মালাবার—ত্রিবাঙ্কুর নয়।[৮] এই যুক্তি আংশিক সত্য। মনে রাখা দরকার, সেদিন মালাবারে তেভাগা কিংবা বকস্ত আন্দোলনের মতো কোনো জঙ্গি কৃষক আন্দোলন বিকশিত হয় নি; জেনমি-বিরোধী কয়েকটা বড়ো মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ত্রিবাঙ্কুরের আন্দোলন সাময়িকভাবে ধ্বংস হলেও, দেওয়ান-রাজের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত দিল। এক বছরের মধ্যে রামস্বামী আয়ারের পরাজয় হল যখন ত্রিবাঙ্কুর ভারতে যোগ দিল। পরবর্তী কালে ত্রিবাঙ্কুর আর মালাবার সংযুক্ত হয়ে কেরল রাজ্য গঠিত হয়েছিল রাজাগোপালাচারীর সাবধানবাণী উপেক্ষা করেই।[৯] ভারতে বাম বিকল্প প্রথম রূপায়িত হয়েছিল কেরলে কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়ে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের সংগ্রামের গুরুত্ব অস্বীকার করলে ভুল হবে। হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, পাতিয়ালা, কাশ্মীর, ঢেনকানল ইত্যাদি দেশীয় রাজ্যে ত্রিশের দশকে যে আন্দোলন ছিল মন্থর, তা এক দুরন্ত বন্যায় পরিণত হয় ১৯৪৬-৪৭ সালে। দুঃখের বিষয়, এইসব আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণা এখনো আদৌ অগ্রসর হয় নি। তবু আমরা সংক্ষেপে এর প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করব। ভারত বিভক্ত হলেও বেশির ভাগ দেশীয় রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এর পরিণতি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন এবং স্বৈরতন্ত্রের অবসান।

পাঁচ

বর্তমান লেখকের প্রধান প্রতিপাদ্য এই যে, ১৯৪৫-৪৭ পর্বে বাম বিকল্প ঠিক দিবাস্বপ্ন ছিল না। অন্তত কয়েকটি অঞ্চলে এর রূপায়নের বাস্তব ভিত্তি ছিল। দক্ষিণ ভারতের কথা বলা হয়েছে। এই পর্বে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের কৃষকসংগ্রামের বিষয় জানা দরকার। বিগত দুই দশকে বিষয়টি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। বোধহয় বলা যায়—শ্রমিকদের তুলনায় কৃষক আধুনিক ঐতিহাসিকদের বেশি আকর্ষণ করেছে। এরিক স্টোকসের বিখ্যাত প্রবন্ধ **The Return of the Peasant** ("ইতিহাসের প্রাঙ্গণে কৃষকের প্রত্যাবর্তন") হয়তো অনেকের মনে পড়বে।[১০] ত্রিশের দশকে এক সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। নিঃসন্দেহে এর প্রাথমিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল গান্ধীপর্বে—যার সূচনা চম্পারনে এবং খেদায়, এবং তার নেতা গান্ধী স্বয়ং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কৃষক আন্দোলন শান্ত নিস্তরঙ্গ ছিল। হঠাৎ আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মতো কৃষকসংগ্রাম শুরু হল ১৯৪৬-এর ধানকাটার মরসুমে। প্রায় সারা ভারত জুড়ে কৃষক আন্দোলনের বিকাশ এই প্রথম দেখা গেল। নিখিল ভারত কৃষকসভার প্রতিবেদনে এই পর্বের কৃষকসংগ্রাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে: 'unprecedented in sweep and intensity'।[১১] এই বক্তব্য আক্ষরিক অর্থে সঠিক।

আমরা শুধু কয়েকটি বড়ো সংগ্রামের কথা বলব। তেলেঙ্গানার কাহিনী ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এবারে বাঙলার তেভাগা আর টঙ্ক সংগ্রাম এবং বিহারের বকস্ত আন্দোলনের উপর দৃষ্টিপাত করা যাক। গোদাবরী পারুলেকর মহারাষ্ট্রের ওয়ার্লি কৃষকদের বিদ্রোহের বিবরণ দিয়েছেন। বর্তমান লেখকের মতে, ওয়ার্লিদের আন্দোলন মূলত ধর্মঘট সংগ্রাম; সীমাবদ্ধ অঞ্চলে ধর্মঘট কেন্দ্রীভূত ছিল।

ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হল ওয়ার্লি উপজাতির চেতনা এবং সংগঠন।[১২]

নোয়াখালি দাঙ্গার এক মাস পরে দিনাজপুর জেলায় ঠাকুরগাঁও মহকুমায় তেভাগা সংগ্রামের শুরু; ডিসেমবরের শেষে অবিভক্ত বাঙলার উনিশটা জেলায় সংগ্রাম প্রসারিত হয়েছিল। দাঙ্গার আগুন যেন দপ করে নিভে গেল। সংগ্রামের প্রধান কেন্দ্র মুসলমান-প্রধান কয়েকটি জেলা—দিনাজপুর, রংপুর, বোদা, পচাগড়, দেবীগঞ্জ (জলপাইগুড়ি জেলা, অধুনা বাংলাদেশে), মৈমনসিংহ, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম। ইতিপূর্বে কোনো আন্দোলনে হাজার-হাজার মুসলমান কৃষক যোগদান করে নি। ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ দাবি মূল রণধ্বনি ("তেভাগা চাই") হলেও, কোনো-কোনো অঞ্চলে সংগ্রাম অর্থনীতিবাদের সীমানা ছাড়িয়ে বিপ্লবী রূপ নিয়েছিল। আইনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতায় সুরাবর্দি আন্দোলনের গতি বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলেছেন: '…আইনসঙ্গতভাবে আদালতের জারি করা পরোয়ানা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার প্রতিরোধ করার এবং গ্রেপ্তার-হওয়া ব্যক্তিদের মুক্ত করার, দরকার হলে পুলিশকে আক্রমণ করার, মাঠ থেকে এবং কখনো-বা জোতদারদের বাড়ি থেকে জোর করে ধান নেবার নির্দেশ লোককে দেওয়া হয়েছে।…জমি চাষ করা হচ্ছে জোর করে…সংগঠিত করা হয়েছে সংগ্রাম কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, প্রচার ইস্তাহার, গোপন আশ্রয়স্থল। ব্যাজ আর লাঠি দেওয়া হয়েছে, স্বেচ্ছা-সেবকদের ড্রিল আর প্যারেড শেখানো হচ্ছে…।' খাঁপুর সংগ্রাম সম্বন্ধে তাঁর বিবৃতি এইরকম: 'ঢোল বাজিয়ে সংকেতধ্বনি করা হয়। আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রচুর লোক এসে জড়ো হয় তীর-ধনুক, বর্শা ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র হাতে। তারা পুলিশের দলটিকে ঘিরে ফেলে। রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল, ট্রাকটি পড়ে তার মধ্যে…।' ১২১ রাউনড গুলি ছোঁড়া হয়েছিল, ২০ জন নিহত হয়। তাদের মধ্যে দুজন কৃষক মহিলা আর দুজন স্থানীয় নেতা—চিয়ার কাই শেখ এবং হোগন মার্ডি। ডুয়ার্সে মাল ও মেটেলি অঞ্চলে দেখা গেল অভিনব দৃশ্য—চাবাগানের ওরাওঁ মজুর এবং গ্রামের ওরাওঁ কৃষকদের মিলিত অভিযান। রণজিৎ গুহ একে বলেছেন: 'ethnic solidarity'। সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং বীরসা মুণ্ডার আন্দোলনে এই ধরনের উপজাতীয় সংহতি দেখা গিয়েছিল। মৈমনসিংহের হাজং কৃষকদের টঙ্ক আন্দোলন সম্বন্ধে সুরাবর্দি বলেন: '…দুজন সশস্ত্র পুলিশকে বর্শাবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়…সুদূরতম গ্রামেও কমিউনিস্ট প্রচারপত্র পাওয়া গেছে। অনেক গ্রামে টঙ্ক ধানের বিরাট মজুত এবং বেশ কিছু বর্শা, লাঠি ও ধনুক পাওয়া গেছে।' হাজং উপজাতির ঐক্য টঙ্ক আন্দোলনে প্রতিভাত।[১৩]

মে মাস নাগাদ ঝড় থেমে গেল বটে, প্রধানত দাঙ্গার ধাক্কায়, কিন্তু গ্রামদেশ আর আগের মতো রইল না। যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মধ্যশ্রেণীর নেতা ধরা পড়েন। স্বাধীনতার পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মধ্যশ্রেণীর প্রায় সকল নেতা এবং কৃষক ক্যাডার নিজ-নিজ অঞ্চলে বীরের অভ্যর্থনা পেলেন। সরকার পাস করলেন পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন, ১৯৫০। আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তৈরি হল নতুন ক্যাডার, যাদের মধ্যে ছিলেন অসংখ্য মহিলা। তেভাগা আন্দোলনের এই ইতিবাচক ভূমিকা অবিস্মরণীয়। কৃষক আন্দোলনে এল দিক-পরিবর্তনের পর্ব; গ্রামের গরিবরা পুরোভাগে আসতে থাকেন।

বিহারে বকস্ত আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গের কালপর্ব ১৯৩৬-৩৮; দ্বিতীয় তরঙ্গের শুরু ১৯৪৭-এর জানুয়ারিতে, যেটা চলেছিল স্বাধীনতার পরেও কয়েক মাস। প্রথম তরঙ্গের সময় কৃষকসভা ছিল সর্বদলীয় গণসংগঠন—তার পুরোভাগে স্বামী সহজানন্দ, এবং সচ্ছল কৃষকদের গোষ্ঠী। দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় কৃষকসভা দ্বিধাবিভক্ত, কিন্তু সকল বামপন্থী দল আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। দ্বিতীয় তরঙ্গের কয়েক মাস আগে

পাটনা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত; আন্দোলনের স্রোতে দাঙ্গা বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে গেল। আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র গয়া, মুঙ্গের, সাহাবাদ জেলা। বকস্ত জমি থেকে উচ্ছেদ-প্রতিরোধ, এবং নিজেদের ফসল রক্ষাই ছিল কৃষকদের উদ্দেশ্য। বকস্ত জমিতে প্রজাদের কোনো স্বত্ব ছিল না। জমিদারি উচ্ছেদ আইন কংগ্রেস সরকার শেষ পর্যন্ত পাস করবে—এই আশঙ্কায় জমিদারদের চেষ্টা ছিল বকস্ত জমি থেকে প্রজা-উচ্ছেদ, নতুন প্রজা নিয়োগ, এবং জমিতে প্রজা যাতে স্বত্ব না পায়, তার ব্যবস্থা করা। কয়েকটি অঞ্চলে গরিব কৃষকরা বকস্ত জমি দখল করে; ভূমিহার পরিবারের মেয়েরা পরদাপ্রথা ভেঙে গঠন করেন "লাল ফৌজ"। পুলিসি বিবরণে আছে: মিছিলে যেসব মহিলা যোগ দেন, তাঁরা পুরোভাগে থাকেন বলে দমননীতির আশ্রয় নিলেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় মহিলাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী। অতি পশ্চাৎপদ ভূস্বামীদের দুর্গ বিহারকে বকস্ত সংগ্রাম ১৯৩৬-৩৮ আর ১৯৪৬-৪৮ সালে একটা বড়ো ধাক্কা দিয়েছিল।[১৪]

কয়লাখনি অঞ্চলে ধর্মঘটের কথা আগে বলা হয়েছে। মার্চে পুলিস ধর্মঘটে সৈন্যদের গুলিবর্ষণে দুজন পুলিস নিহত হন। দুটি আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল। ফেবরুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সম্মেলনে কৃষক, শ্রমিক এবং যুবসমাজের কাছে আপসের পথ পরিত্যাগ করে স্বাধীনতার জন্য "শেষ সংগ্রাম" সংগঠিত করার আবেদন করা হয়।[১৫] তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ জয়প্রকাশ নারায়ণ। কিন্তু বামপন্থী ঐক্যের প্রশ্নে কোনো পরিষ্কার নির্দেশ ছিল না। এই পর্বে বামপন্থী ঐক্য সম্বন্ধে যিনি সোচ্চার ছিলেন তিনি মানবেন্দ্রনাথ। প্রথম যৌবনে কোমিনটার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যিনি লেনিনের সঙ্গে বিতর্কে যোগ দিয়ে গান্ধীবাদ এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের প্রবক্তা, তিনিই আবার ত্রিশের দশকে কংগ্রেসে যোগদান করে তাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মঞ্চে পরিণত করার ভূমিকায় অবতীর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিস্টবিরোধী রূপ এই মহান বুদ্ধিজীবীর চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবসানে মানবেন্দ্রনাথ যেন ক্লান্ত, হতাশায় আচ্ছন্ন। তাঁর শেষ চেষ্টা বামপন্থী ঐক্য গঠন এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রগতিশীল ভাবধারার অবিরাম প্রচার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান আসন্ন; সুতরাং সংগ্রামের লক্ষ্য হবে কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় সরকার—যার সামাজিক ভিত্তি উচ্চবিত্ত শ্রেণী। মনে হয়, তখনো তাঁর মডেল ফরাসি বিপ্লব; গণবিপ্লবের ধাক্কায় সংবিধান পরিষদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু কোনো বামপন্থী দল তাঁকে সমর্থন করল না। নিঃসঙ্গ, মোহমুক্ত মানবেন্দ্রনাথ আশ্রয় খুঁজলেন নতুন সমাজদর্শনে, যা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম নামে অভিহিত।[১৬] বস্তুত, ১৯৪৬-৪৭ কালপর্বে বামপন্থী দলগুলি বিভ্রান্ত, আত্মকলহে নিমগ্ন, কোনো দীর্ঘমেয়াদি রণকৌশল উদ্ভাবনে অপারগ এবং ব্যর্থ। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, এবং পরে ভেঙে যায়। জয়প্রকাশ নতুন আলোর সন্ধান পান বিনোবা ভাবের দর্শনে।

একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি "শেষ আঘাত হানো" প্রস্তাবে অবিচল আস্থা রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জঙ্গি কৃষকসংগ্রাম সংগঠিত করতে সচেষ্ট। সংগ্রামের প্রধান রূপ ছিল—উচ্ছেদ-প্রতিরোধ, ফসলে দেয় খাজনা (rent in kind)-এর পরিমাণ হ্রাস, এবং জমিতে স্বত্ব লাভ। সমাজতাত্ত্বিকরা বলতে পারবেন, সেদিন ঠিক কী কারণে ভারতে প্রায় সর্বত্র একই ধাঁচে কৃষকসংগ্রাম বিকশিত হয়েছিল। বর্তমান লেখকের ধারণা, মার্কস যাকে "প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা" বলেছেন, তার বিরুদ্ধে গরিব কৃষকদের সহজাত, স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন আন্দোলনের পুরোভাগে তাই দেখা গেল আদিবাসী এবং তপশিলি সম্প্রদায়ের কৃষকদের। উচ্চবর্ণের ধনী কৃষকদের ভূমিকা তেমন জঙ্গি ছিল না। অবশ্য তখনো

তারা বিরোধী শিবিরে চলে যায় নি। মনে হয়, পুরনো গ্রামীণ ঐক্য তখন ভঙ্গুর।

আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে, পূর্ব উত্তর-প্রদেশের কয়েকটি জেলায় "সির" (Sir) জমি থেকে উচ্ছেদ প্রতিরোধ করে জমির উপর দখল রাখছে প্রজাদের বাহিনী। ওড়িষায় কটক, পুরী এবং গঞ্জাম জেলায় বাঙলার তেভাগা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত কৃষক "চুক্তিভাগ"প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে; পানজাবের ফিরোজপুর জেলায় বাতাইদার "তেভাগা"র দাবি উত্থাপন করেছে, আর পাতিয়ালায় গরিব কৃষক জমি দখল করছে। সর্বত্র আংশিক আন্দোলন ঠিকই, কিন্তু সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলনের বিকাশ এই প্রথম দেখা গেল।[১৭] ১৯৪৭-এর মে-জুন মাস থেকে দক্ষিণ ভারত ছাড়া অন্যত্র কৃষক আন্দোলনে ভাটার টান শুরু হল। তেলেঙ্গানা তখনো অপরাজিত।

কৃষক আন্দোলন সর্বভারতীয় রূপ নিয়েছিল, আর দেশীয় রাজ্যের আন্দোলন কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও বিপুল শক্তিশালী হয়েছিল—যার মধ্যে নিহিত ছিল বাম বিকল্পের সম্ভাবনা। হায়দরাবাদ এবং ত্রিবাঙ্কুরে আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল কমিউনিস্ট-দের হাতে। কিন্তু কাশ্মীরে গণ-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন একজন জাতীয়তাবাদী যাঁর চিন্তায় ধর্ম-নিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ মিশে গিয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্বের প্রধান নায়কদের একজন শেখ আবদুল্লা, যাঁর জনপ্রিয়তা এবং ব্যক্তিত্ব অসাধারণ। কাশ্মীরে কয়েক জন বামপন্থী থাকলেও, তাঁদের ভূমিকা ছিল গৌণ।

জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ত্রিশের দশকে প্রজা-আন্দোলনের বিকাশ হলেও, ১৯৩৯ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে একদল নতুন নেতা পুরোভাগে এসে-ছিলেন। এঁরা ছিলেন প্রধানত জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক, কিন্তু যুবকদের মধ্যে প্রগতিশীল ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। তেলেঙ্গানার রবিনারায়ণ রেড্ডি, ইয়ালা মখদুম মহীউদ্দিনের নাম এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লাকে পেশাদার কংগ্রেসি বলে চিহ্নিত করা যায় না—তাঁকে মনে হয় এক ব্যতিক্রম, গণ-আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষে যাঁর উত্থান। ১৯৩৮-এ কাশ্মীরের "মুসলিম জাতীয় সম্মেলন"-এর তিনি নতুন নাম দিলেন—"জম্মু ও কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলন"। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শে জাতীয় সম্মেলন অনুপ্রাণিত হল। সাম্প্রদায়িকতাবাদ এই অঞ্চলে প্রবল হতে পারে নি। ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্ম-কালে "কাশ্মীরকো ছোড় দো" [কাশ্মীর ছাড়ো] সংগ্রামের শুরু। কৃষক থেকে মধ্যশ্রেণীর মানুষ সংগ্রামে শামিল হয়েছিল; বিভিন্ন মিছিলে সভায় পাঁচ থেকে পঁচিশ হাজার মানুষের যোগদান ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। বেশির ভাগই মুসলমান। তাদের চোখে শের-ই-কাশ্মীর প্রধান নেতা।

কাশ্মীরের প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু রাজা নিজামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কাশ্মীরের সার্বভৌমত্বের পতাকা উড্ডীন রাখেন, তার সঙ্গে চলে হিংস্র দমননীতি। শ্রীনগরের পথে-প্রান্তরে সৈন্য আর জনতার অসংখ্য সংঘর্ষ ঘটে; ২০শে মে শেখ আবদুল্লা বন্দী হন—তাঁর তিন বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হল। নেহরু স্বয়ং কাশ্মীরে ছুটে যান—২০ জুন তাঁকেও বন্দী করা হয়।[১৮] সর্দার প্যাটের অবশ্য ওয়েভেলকে জানান—নেহরুর নীতি ঠিক কংগ্রেসের নীতি নয়। ইতি-মধ্যে শুরু হয়েছিল মহারাজার প্রধানমন্ত্রী কাকের সঙ্গে নিভৃত আলোচনা। কিন্তু বীর মহারাজা স্যর হরি সিং তখনো অটল, অবিচল। কিন্তু হায়, হঠাৎ পাকিস্তান থেকে দুরন্ত হানাদারদের অভিযান হল, আর এই লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে সোনারুপোমণিমাণিক্য সহ দিল্লীতে আশ্রয় নিলেন এবং ভারতে কাশ্মীরের যোগদানের দলিলে স্বাক্ষর দিলেন (অকটোবর, ১৯৪৭)। ২ নভেমবর নেহরু কাশ্মীরে গণমত গ্রহণের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার,

"হানাদার"দের আক্রমণ প্রতিরোধ করার এবং ভারতের সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিলেন শেখ আদদুল্লা। তখন থেকে কাশ্মীর সমস্যার শুরু। কিন্তু প্রশ্ন হল : "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনকে সেদিন সমর্থন করলে পরবর্তী ইতিহাস কি অন্যরূপ নিত না? ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্টি এক পরগাছা হিন্দু মহারাজার জন্য এত দরদ না দেখিয়ে "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সহানুভূতি দেখালেও উত্তর ভারতে মুসলমান জনমানসে তার ইতিবাচক ছায়া পড়ত।

কাশ্মীর পরিক্রমা করে ব্রিটিশ কমিউনিসট নেতা রজনী পাম দত্ত প্রকাশ্য বিবৃতিতে কংগ্রেস নেতৃত্বকে অনুরোধ জানালেন কাশ্মীর সংগ্রামকে সমর্থন করার জন্য। তিনি লিখলেন :

The Princes are the lynchpin of the British Constitutional Plan. The entire structure is devised to play off the Congress and the League against each other in perpetual friction. ···Behind the scenes military and strategic plans are being hurried forward to build up the power of the States as the final basis of British Power.[১৯] অবশ্য ব্রিটিশ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল। তাকে ব্যর্থ করার কৃতিত্ব প্রাপ্য গণ-আন্দোলনের। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তাল গণ-আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে। এবার আমরা দৃষ্টি ফেরাব পাতিয়ালার দিকে। দেশীয় রাজ্য-গুলিকে ভারতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে "লৌহমানব" প্যাটেল এবং ভি. পি. মেননের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা ঐতিহাসিকদের লেখায় প্রকাশিত। অশান্ত জনগণের অবিরাম আন্দোলনের উল্লেখ প্রায় অনুপস্থিত অনেকের লেখায়।

পাতিয়ালা রাজ্যে একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকসংগ্রাম চলছিল। ১৯২৮ সালে গঠিত "পানজাব রিয়াস্তি প্রজামণ্ডল" প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি তুলেছিল। ১৯৩০-এ প্রজামণ্ডল আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিল। নিষ্ঠুর দমননীতি পাতিয়ালার স্বৈরতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে ঘৃণা জাগাল। কৃষক আন্দোলন সৃষ্টির ওই ছিল পটভূমি।

কৃষকদের একটি বড়ো অংশ ছিল "মুজারা" (প্রজা)—এরা ফসলে খাজনা দিত (বাঙলার বর্গাদার-দের মতো)। কৃষকদের অধিকাংশই শিখ। "বিশ্বেদার" (জমিদার) বিপুল জমির মালিক এবং মহারাজার অবিচল সমর্থক। খাজনা বা "বাতাই"-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৩০ থেকে। প্রাথমিক পর্বে প্রজামণ্ডল একে সমর্থন করত। ১৯৪৬ সালে বাতাই-বন্ধের আন্দোলন এক অভ্যুত্থানের রূপ নিল। হাজার-হাজার মুজারার সভা অনুষ্ঠিত হল। অসংখ্য সংঘর্ষ চলেছিল বিশ্বেদার আর কৃষকদের মধ্যে। সংগ্রামের পুরোভাগে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি; পার্টির নেতা তেজা সিং স্বতন্ত্র—পুরনো "গদর" বিপ্লবী। কমিউনিস্টরা প্রজামণ্ডলের সঙ্গে সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে আগ্রহী ছিল। ১৯৪৭ সালের শুরুতে বাতাই-বন্ধ আন্দোলন জমি-দখল আন্দোলনে পরিণত হচ্ছিল—আন্দোলন প্রসারিত হয়েছিল ২২৮টি গ্রামে। মুজারারা দখল করেছিল এক লক্ষ বত্রিশ হাজার (১৩২০০০) বিঘা জমি। মুজারাদের প্রধান দাবি ছিল : বিশ্বেদারি-প্রথার অবসান; পুরনো ঋণ মকুব; পাতিয়ালা রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং সার্বজনীন ভোট অধিকারের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচন।

স্বাধীনতার পরে প্রজামণ্ডল ক্রমশ জঙ্গি মনোভাব দেখাল—মহারাজার আংশিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য হল। মহারাজার শাসনযন্ত্র ব্যবহৃত হল মুজারাদের আন্দোলন ধ্বংসের কাজে। এই অবস্থায় ভি. পি. মেনন এবং সর্দার প্যাটেলের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ এবং পেপসু রাজ্য (পূর্ব পানজাব রাষ্ট্রের সংঘ) গঠন (জুলাই, ১৯৪৮); রাজ্যের প্রধান রাজপ্রমুখ

পাতিয়ালার মহারাজা —তাঁর ভাতার পরিমাণ সতেরো লক্ষ টাকা। স্বৈরতন্ত্র এবং সামন্তদের সঙ্গে প্যাটেলের আপসমুখী মনোভাবের আর-একটা দৃষ্টান্ত।[২০]

ওড়িষার ঢেনকানল আর নীলগিরি রাজ্য ১৯৩৮ থেকে প্রজামণ্ডলের শক্তিশালী কেন্দ্র। ১৯৪০-এ প্রজামণ্ডল কৃষকদের আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৪৭-এ আন্দোলন বৈপ্লবিক রূপ নিল। মনে হয়, এর একটি কারণ ছিল তীরধনুকে সজ্জিত আদিবাসী কৃষকদের ব্যাপক যোগদান। স্বৈরতন্ত্রের অবসান দাবি করে প্রজামণ্ডল ঢেনকানলের রাজপ্রাসাদ অবরোধ করে; নীলগিরিতে আদিবাসী কৃষকরা জমি দখল করতে থাকে। সরকারের ধারণা হয়: এদের পরিচালনা করছে কমিউনিস্টরা। শেষ পর্যন্ত ঢেনকানল, নীলগিরি এবং অন্যান্য রাজ্য ওড়িষার অন্তর্গত হয়।[২১]

ছয়

ইতিপূর্বে বলেছি, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চল বাদে এই দেশে ১৯৪৭ সালের মে-জুন থেকে বাম বিকল্প মরীচিকা হয়ে গিয়েছিল। অসাধারণ ক্ষিপ্রতা এবং দক্ষতার সঙ্গে মাউনটব্যাটেন কংগ্রেস, লীগ আর শিখ নেতাদের তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সম্মত করালেন। বিষয়টি ইতিমধ্যে বহু-আলোচিত; বিশেষ করে মসলে, গোপাল এবং মৌলানা আজাদের লেখা উল্লেখ্য। ১৪ জুন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি (এ. আই. সি. সি.)-র অধিবেশনে গোবিন্দবল্লভ পন্থ দেশ-বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আজাদ এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধী পন্থ-প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তাঁর দুঃখ-বেদনা সম্পর্কে সন্দেহ করবার কারণ নেই। খান আবদুল গফফর খানের মনে হল—তাঁদের নেকড়ের মুখে ছুড়ে দেওয়া হল। পন্থ-প্রস্তাবের পক্ষে ১৫৭ আর বিপক্ষে মাত্র ২৯ ভোট পড়ে। কিছু পেশাদার রাজনীতিবিদ নিরপেক্ষ রইলেন। যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হল এই যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অঙ্কে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটি বড়ো অংশ ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শে আস্থা হারান নি। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-জীবীদের অনেকেই আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে গেলেন। উত্তরপ্রদেশ এবং পানজাবের রাজনৈতিক অবস্থার পার্থক্য চোখে পড়ে।

অধ্যাপক গোপাল ক্ষমতা-হস্তান্তরের দিনটিকে 'এক বিষণ্ণ প্রভাত' বলেছেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠী সমাজের পুরোভাগে এল। ভি. পি. মেনন হলেন ওড়িষার অস্থায়ী গভর্নর। ইতিমধ্যে পানজাবের দাঙ্গার আগুন দিল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলমান তখনো ভারতে ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নে নেহরু-প্যাটেলের ভিন্নমত অজানা রইল না (আজাদ তাঁর বইয়ের সদ্যঃ-প্রকাশিত পরিমার্জিত সংস্করণে প্যাটেলের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করেছেন)। এত কালের নীরব গান্ধীবাদী রাজেন্দ্র প্রসাদ প্যাটেলের সমর্থক। ৩০ জানুয়ারি (১৯৪৮) দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জঙ্গি কর্মী নাথুরাম গড়সের গুলিতে নিহত হলেন গান্ধীজী। নেহরুর আবেগময় বক্তৃতা কানে বাজে:

Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere.[২২]

পানজাব আর দিল্লী তখনো জ্বলছে। অশান্ত ভারত। লক্ষ-লক্ষ মানুষ দেশ থেকে দেশান্তের চলমান। নতুন প্রজন্ম হতাশায় আচ্ছন্ন। পেশাদার রাজনীতিবিদ রঙিন কল্পনায় বিভোর। শুধু কিছু ব্রিটিশ আমলা আর দেশীয় রাজাদের প্যারাডাইস লস্ট।

বামপন্থীদের কেন্দ্র বাঙলার কথা একটু জানা দরকার। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভ করে কংগ্রেস নেতারা সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। গান্ধীবাদী খাদিগোষ্ঠীর নেতা ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ হন মুখ্যমন্ত্রী। "যুগান্তর" দল এঁদের পক্ষে। কংগ্রেস

সংগঠনের নেতৃত্ব ছিল সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের হাতে। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখ্য "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের প্রথম সারির নেতারা—অজয় মুখোপাধ্যায়, ডা. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন। দিগন্তে আর-এক নেতার নক্ষত্র তখন উদীয়মান। তিনি ডা. বিধানচন্দ্র রায়। ১৯৪৪ থেকে তিনি এবং কিরণশঙ্কর রায় গভর্নর কেসির কাছে "যুক্ত মন্ত্রিসভা" গঠনের সুপারিশ করেছিলেন। চল্লিশের দশকে মাড়োয়ারিদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।[২৩] তিনি হলেন নতুন মুখ্যমন্ত্রী। গোপাল যথার্থই বলেছেন, ডা. রায় একজন 'প্রতিক্রিয়াশীল' রাজনীতিবিদ, অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তুলনায় সর্বাপেক্ষা 'রক্ষণশীল'। নেহরুর আপত্তি সত্ত্বেও তিনি পশ্চিম বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টিকে হঠাৎ নিষিদ্ধ করলেন।[২৪]

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি "শেষ আঘাত হানো" প্রস্তাব থেকে সরে আসে। দেশে দাঙ্গার প্রসার এবং কংগ্রেস সংগঠনে দক্ষিণপন্থীদের প্রাধান্যের পটভূমিকায় নেহরু সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানায়। শ্রমিক এবং কৃষকদের আংশিক সংগ্রাম সংগঠিত করার বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল না। দাঙ্গা-প্রতিরোধ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসে (মার্চ, ১৯৪৮) কমিউনিস্ট পার্টি নতুন রণনীতি (স্ট্র্যাটেজি) গ্রহণ করে। রাজনৈতিক প্রস্তাবে বলা হয়: ভারতের 'আজাদি ঝুটা'; নেহরু সরকার ইঙ্গ মারকিন সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল এক 'তাঁবেদার রাষ্ট্র'। পার্টির রণধ্বনি: 'তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ'। পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন বি. টি. রণদিভে; প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশী কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নির্বাচিত হতে পারলেন না। ১৯৫১ সালের অকটোবরে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রণনীতি পরিত্যক্ত হল; পার্টি সংসদীয় পথ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিল[২৫] কিন্তু ইতিমধ্যে (১৯৪৮-৫১) পার্টি হারাল শ্রেষ্ঠ কর্মীদের —শুধু তেলেঙ্গানায় নিহত হয়েছিলেন চার হাজার কর্মী। পশ্চিমবঙ্গে কাকদ্বীপ, হাওড়া, হুগলী আর মেদিনীপুরে, পূর্ব-পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) দিনাজপুর আর ময়মনসিংহে পার্টি হারাল কয়েক জন শ্রেষ্ঠ ক্যাডার। ক্যাডার একদিনে তৈরি হয় না—বুদ্ধিজীবীদের অনেক অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে ক্যাডার তৈরি হয়। ভারতে বাম বিকল্প (শুধু কেরল ব্যতিক্রম) যে সুদূরপরাহত হল, তা আদৌ দৈবাৎ ঘটনা নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা পূরণ করল হিন্দিভাষী অঞ্চলে জনসঙ্ঘ এবং তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে। বামপন্থী বিকল্পের সত্যিকার বিকল্প দেশে প্রতিষ্ঠিত হল।

বর্তমান লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝতে হলে গ্রামসির চিন্তা একটু জানা দরকার। অনেকের ধারণা, মার্কসবাদ সম্বন্ধে শেষ কথা বলেছেন লেনিন। আধুনিক গবেষণার আলোকে বলা চলে, মার্কসবাদী চিন্তাকে আরো উন্নত করার সম্ভাবনা শেষ হয় নি। লেনিনোত্তর যুগের সৃজনশীল মার্কসবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা গ্রামসি—মুসোলিনির কারাগারে যাঁর কেটেছিল এগারো বৎসর, এবং জেলেই যাঁর মৃত্যু। ইউরোপে ফাসিস্টতন্ত্র প্রথম বিজয়ী হয় ইতালিতে। জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের পরাজয়ের উপর মুসোলিনির বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। গ্রামসি তাই নতুন বৈপ্লবিক রণনীতির কথা বলেছেন যা নিষ্ক্রিয় বিপ্লব (প্যাসিভ রেভলিউশন বা ওয়র অব পজিশন) নামে অভিহিত।

বাস্তবকে অতিরঞ্জিত করে লাভ হয় না। বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় সশস্ত্র ক্ষমতা-দখলের রণনীতি ভ্রান্ত; তখন অনুসরণ করতে হয় নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের পথ—অসংখ্য মানুষের সমর্থন সংগ্রহের উপর যে পথের সাফল্য নির্ভর করে। নিম্নবর্গ (সাবঅলটার্ন ক্লাসেস)-এর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উন্নত চিন্তা বিকশিত হয় না; উন্নত চিন্তার বাহন বুদ্ধিজীবী। দীর্ঘ দিনের সচেতন প্রয়াস বিনা সমাজে আদর্শগত নেতৃত্বের (হেগিমনি) প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য। সমাজবিপ্লবের পূর্ব-

শর্ত আদর্শগত নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা।[২৬]

মনে হয়, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত গ্রামসির চিন্তা অনুসরণ করলে নেহরু পর্বে বাম বিকল্প এত ম্লান বিবর্ণ হত না, বিশেষত হিন্দিভাষী অঞ্চলে এবং মহারাষ্ট্রে।

তথ্যনির্দেশ

১. Madras Legistative Assembly Debates, ৫ম খণ্ড, এপ্রিল ১৯৪৭

২. ওই ; হোম/পল, মাদ্রাজ, ন. ১৮.৩.৪৭

৩. হোম/পল, মাদ্রাজ, ন. ১৮.৩.৪৭ এবং ১৮.৬.৪৭ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এই দিবসে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া সত্ত্বেও ভারতের আর কোনো শিল্পাঞ্চলে আংশিক ধর্মঘট হয় নি। মাদ্রাজে বিশাখাপত্তনম অঞ্চলেও ধর্মঘট প্রসারিত হয়েছিল।

৪. পি. সুন্দরাইয়া, Telangana People's Struggle, ১৯৭২, পৃ ৫৮।

৫. রবিনারায়ণ রেড্ডি, Heroic Telangana, ১৯৭৩

৬. পি. সুন্দরাইয়া, ওই, পৃ ৪২৩। আন্দোলনের নেতৃত্ব (সি রাজেশ্বর রাও, এম বাসবপুন্নাইয়া, এম. চন্দ্রশেখর রাও, পি. সুন্দরাইয়া, ভি. ভি রাও, রবিনারায়ণ রেড্ডি) আন্দোলন প্রত্যাহারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৭. কে. সি. জর্জ, Immortal Punnapra-Vayalar, ১৯৭৫

৮. ই. এম. এস. নামবুদিরিপাদ, A History of Indian Freedom Struggle, ১৯৮৬, পৃ ৮৮৩। মালাবার নিঃসন্দেহে কৃষক আন্দোলনের পুরনো কেন্দ্র, কিন্তু সেই সময় কোনো কৃষক অভ্যুত্থান মালাবারে ঘটে নি।

৯. এস. গোপাল, Jawaharlal Nehru, ২য় খণ্ড, ১৯৭৯, পৃ ২৫৮। রাজাগোপালাচারীর চিঠি—৩০ মে, ১৯৫২। তিনি লিখেছিলেন, কেরল রাজ্য গঠিত হলে সুবিধা হবে কমিউনিস্টদের। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদের সতর্কবাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল। প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল কেরলে।

১০. এই প্রবন্ধের জন্য দ্রষ্টব্য Eric Stokes, The Peasant and the Raj, ১৯৭৮।

১১. AIKS Papers, ১৯৩৬-৪৭, অজয় ভবন, নতুন দিল্লী।

১২. গোদাবরী পারুলেকর, Adivasis Revolt, ১৯৭৫। দুটি তালুকে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল।

১৩. তেভাগা আন্দোলনে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। তাঁর বই Agrarian Struggle in Bengal, 1946-47 প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। ভারতের বৃহত্তম কৃষক আন্দোলন তেভাগা অনেক গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কয়েকটি বই উল্লেখ্য : সুগত বসু, Agrarian Bengal, ১৯৮৮ ; ডি. এন. ধানাগার Peasant Movements in India, ১৯৮২; আদ্রিয়েন কুপার (লনডন), অশোক মজুমদার (দিল্লী), দীপঙ্কর ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রভারতী), রবীন মণ্ডল (রবীন্দ্রভারতী)-এর অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস। যুদ্ধোত্তর যুগের কৃষক আন্দোলনের বিশ্লেষণ করেছেন বিপানচন্দ্র এবং অন্যান্য, India's Struggle for Freedom, 1988, পৃ ৩৫২-৫৫

১৪. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, Peasant Movements in Bengal & Bihar, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি. থিসিস। এবং হোম/পল, বিহার, ১৮.৬.১৯৪৭

১৬. "সার্চলাইট", ১০.২.১৯৪৭। লাহোরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বিপ্লবের আহ্বান জানান, হোম/পল, পানজাব, ১৮.৭.১৯৩৬

১৬. সৌরেন গাঙ্গুলী, M. N. Roy and Indian Politics, 1920-48, ১৯৮৪, পৃ ২৭৫-৮০

১৭. Report of AIKS, 1947, AIKS Papers, অজয় ভবন, নতুন দিল্লী। পানজাবের আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য মাস্টার হরি সিং, Punjab Peasant in Freedom Struggle, ২য় খণ্ড, ১৯৮৪, পৃ ২৪৮-৪৯

১৮. Peoples Age, 26 May, 1946 এবং 2 June, 1946

১৯. ওই, 30 June, 1946

২০. মৃদুলা মুখার্জির চমৎকার প্রবন্ধ Peasant Movement in Patiala State, 1937-48, ১৯৭৯ দ্রষ্টব্য। আকালি নেতা মাস্টার তারা সিং সাধারণভাবে পাতিয়ালার মহারাজাকে সমর্থন করতেন। কমিউনিস্টরা নমনীয় কৌশল অনুসরণ করে প্রজামণ্ডলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ওড়িষার প্রজা আন্দোলনের বিবরণ (১৯৩৮-৪৬) দিয়েছেন সুরেন্দ্র দ্বিবেদী, Quest for Socialism, ১৯৮৪, পৃ ৭৮-৮০। কৃষকদের সংগঠিত

করতে গ্রামে-গ্রামে পরিক্রমা করেছিলেন মালতী চৌধুরী, নবকৃষ্ণ চৌধুরী প্রভৃতি। পাতিয়ালার জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের জন্য দ্রষ্টব্য People's Age, 16 February, 1947। রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য অবশ্যপাঠ্য V.P. Menon, The Story of the Integration of Indian States.

২১. ভি. পি. মেনন, ওই, পৃ ১৪৬-৪৮। দ্বিবেদী, ওই, পৃ ৭৯।

২২. গোপাল, ওই, পৃ ২৪, ২৫, ৩৬।

২৩. Personal Diary of R. G. Casey, ইনডিয়া অফিস লাইব্রেরি, ৭ নভেম্বর, ১৯৪৪ এবং ৭ জুন, ১৯৪৫। বিবদমান রাজনৈতিক দল উপদল সম্পর্কে কেসি লিখেছেন, 'গোঁড়া কংগ্রেস বনাম বোস দল ; হিন্দু মহাসভা বনাম কংগ্রেস ; ফজলুল হকের মুসলমান বনাম মুসলিম লীগ। মাড়োয়ারিদের সঙ্গে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের যোগাযোগ সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য B. R. Tomlinoon, The Indian National Congress and the Raj, ১৯৭৬, পৃ ৪২।

২৪. গোপাল, ওই ৭২। রায়কে নেহরুর চিঠি, ১৩ মে, ১৯৪৯। নেহরু লিখেছিলেন : It is a slippery slope...pure repression will fail।

২৫ M. B. Rao, ed., Documents of the History of the Communist Party of India, 1948-50, ৭ম খণ্ড, ১৯৭৬। ২য় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে বর্তমান লেখকের ধারণা—'সংস্কারবাদের নায়ক' হিসাবে শুধু পি. সি. যোশীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য নেতাদের এবং প্রাদেশিক নেতাদের ভূমিকার আলোচনা হয় নি।

২৬. Q. Hoare and G. N. Smith, ed. A Gramsci, Selections from Prison Notebooks, 1971। বর্তমান লেখকের প্রবন্ধ Thought of Gramsci, Agrarian Question, Revolutionary Strategy and Contemporary India, Socialist Perspective দ্রষ্টব্য।

সমাপ্ত

ইতিহাসের বিকাশ প্রসঙ্গে মার্কসীয় প্রত্যয়ের বিচার

অজিত রায়

বিগত তিন দশকে, অর্থাৎ স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে, সারা দুনিয়ায়, বিশেষ করে পশ্চিমী দেশগুলির মার্কসবাদী মহলে নতুন করে তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার ঢেউ দেখা যায়। আগে যা সবটাই আপ্তবাক্য হিসেবে ধরা হত, তার পরিবর্তে মার্কসের নিজের কোনো-কোনো তত্ত্ব বা ব্যাখ্যাকেও মার্কসবাদী মহলে প্রশ্ন করা শুরু হয়। বাঙলা ভাষায় এইসব বিতর্কের পূর্ণ বিবরণ তো দূরের কথা, এর উল্লেখও বেশি দেখা যায় না। মার্কসপন্থী চিন্তাবিদ অশোক রুদ্র তাঁর এই সাম্প্রতিক পুস্তকে বাঙালি পাঠককে এইসব বিতর্কের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের সুযোগ করে দিয়েছেন।

প্রয়াত সমর সেনের স্মৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত এই পুস্তকের দুই ভাগে লেখকের বিভিন্ন সময়ে ও উপলক্ষে রচিত মোট নয়টি নিবন্ধ একত্র করা হয়েছে। বিষয়-গুলি হচ্ছে, প্রথম ভাগে অর্থাৎ সামগ্রিক ক্ষেত্রে: (১) সমাজবিজ্ঞানে বিষয়গততা, (২) ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের মতামতের কয়েকটি দফা, এবং (৩) ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সমস্যা; দ্বিতীয় ভাগে, তথা, ভারতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে: (৪) সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, (৫) উনবিংশ শতাব্দীর পুনর্মূল্যায়ন, (৬) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ ও স্থানীয় ক্ষমতা, (৭) ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে শ্রেণী-কাঠামো, (৮) ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে ভাগ-বিভাগ, এবং (৯) ভারতে (অর্থনৈতিক) পরিকল্পনা-মূল্যায়ন। কখন এবং কোন্ উপলক্ষে নিবন্ধগুলি রচিত, তার কোনো উল্লেখ নেই।

প্রথম সমস্যা নামকরণ নিয়ে। লেখকের নামকরণ থেকে মনে হয়—যেন দ্বিবিধ চরিত্রের মার্কসবাদ প্রাপ্তব্য—ইউরোপ-কেন্দ্রিক ও অন্যবিধ। তাঁর প্রকৃত মনোভাব কিন্তু তা নয়। ভূমিকায় তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে, পশ্চিম ইউরোপে ধনতন্ত্রের উদ্ভবের যে ঐতিহাসিক রূপরেখা মার্কস এঁকেছেন, তাকে বিশ্ব-জগতের অনন্য বিকাশপন্থা বলে চালাবার চেষ্টা তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলেই মার্কস মনে করতেন; তা ছাড়া, ইউরোপের বাইরে, বিশেষ করে ভারত আর চীনের ক্ষেত্রে, তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নির্ণয়-প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মার্কস তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকট করে গিয়েছেন। সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের নিজস্ব গতিধারা সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা, এবং তার সাফল্যের পূর্বশর্ত হিসেবে ইউরোকেন্দ্রিক বিশ্বজনীন বিকাশ-পথের 'ডাণ্ডাবেড়ি' পরিহার অবশ্যকর্তব্য। অশোক রুদ্রের এই মত নিয়ে মার্কসবাদী মহলে বিতর্ক থাকা উচিত নয়।

এরই সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পুস্তকের ভূমিকায় লেখকের দ্বিতীয় মন্তব্য যে, ইতিহাসের অমোঘ বিধান বলে কিছু নেই। মার্কসবাদকে যাঁরা কঠোর নিয়তিবাদের পর্যায়ভুক্ত করেন, তাঁরা মার্কসীয় চিন্তা তথা কর্মধারার পরিপন্থী। রুদ্রের এই বক্তব্যও বহুজনগ্রাহ্য মার্কসীয় সিদ্ধান্ত। কিন্তু একদিকে এই অভিমত প্রকাশ করলেও লেখক এর তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন বলে মনে হয় না। তাঁর দ্বিতীয় নিবন্ধে, অর্থাৎ, ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের মতামত আলোচনা করতে গিয়ে, পাদটীকায় কিছুটা সংশয় ব্যক্ত করা সত্ত্বেও তিনি নানাবিধ গাণিতিক সমীকরণ মারফত ভবিষ্যৎ নির্ধারণের যে সীমিত সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, তা

Non-Eurocentric Marxism and Indian Society. Ashok Rudra. People's Book Society. Cal. 73, 1988. Rs. 75

কিন্তু মার্কসের মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ কথার অর্থ এই নয় যে, মার্কস কখনও ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। তিনি বহুক্ষেত্রেই অদূর এবং সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নানাবিধ উক্তি করেছেন। কিন্তু সেসব উক্তিকে ভবিষ্যদ্বাণী বলা যায় না, কেননা কোনো ক্ষেত্রেই তা মানুষের সামাজিক-কর্মকাণ্ড-নিরপেক্ষ নিয়তি বলে উপস্থাপিত হয় নি। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যের অনুক্ত ভিত্তি হচ্ছে মানুষের সম্ভাব্য সক্রিয় ভূমিকা। কিন্তু মানুষের সেই সক্রিয় ভূমিকা এত বেশি ধরনের ছোটো-বড়ো কারণ-কারকের উপরে নির্ভরশীল যে, সে সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়; এবং গাণিতিক সমীকরণের মারফত তার পূর্বাভাস দেওয়া যায় না।

অশোক রুদ্র সামন্ততন্ত্রের প্রত্যয় এবং ভারতে সামন্ততন্ত্রের আবির্ভাব আর উপস্থিতি সম্পর্কে মার্কসবাদী মহলে যেসব প্রশ্ন এবং বিতর্ক আছে, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রুদ্রের মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, ভারতে সঠিকভাবে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব হয় নি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, জাতিভেদ এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট কর্মফলবাদ ইত্যাদি ভাবাদর্শগত প্রভাব খাটিয়ে এদেশের উচ্চবিত্ত সমাজ শ্রমজীবী জন-সাধারণকে বশে রেখেছে; এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে তাদের সঠিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মতো বলপ্রয়োগ করতে হয় নি। এই বিতর্কের মূল্যায়ন করার, এমনকী বিস্তৃত আলোচনার সুযোগও এখানে অনুপস্থিত। তা ছাড়া, রুদ্রের বক্তব্যপ্রসঙ্গে তা অপরিহার্যও নয়। কেননা, তাঁর মূল বক্তব্য হচ্ছে—সামাজিক বিবর্তনের আলোচনায় মার্কসীয় উৎপাদনপদ্ধতি (মোড অব প্রোডাকশন)—এই প্রত্যয়েরই কোনো অপরিহার্যতা নেই। তাঁর এই মত অনুসারে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত সমাজবিন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে—অশোক রুদ্র যে দুটি অভিনব প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছেন, তা হল: (১) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজ এবং (২) সামাজিক শক্তি (সোশ্যাল পাওয়ার)।

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজের তিনি সংজ্ঞা দিয়েছেন: অধিকাংশ গ্রামবাসী, যাঁরা প্রধানত শ্রমশক্তি-বিক্রেতা অথবা স্বয়ং-নিযুক্ত উৎপাদক, অবস্থার চাপে পড়ে তাঁদের আর্থনীতিক লেনদেন সীমিত রাখতে বাধ্য হন নিজ-নিজ গ্রামের অধিবাসী, স্বল্পসংখ্যক বিত্তশালী লোকের সঙ্গে।

এই বিত্তশালী অংশ যে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে নানা ধরনের আর্থনীতিক গাঁটছড়ায় বাঁধা, তা কিন্তু রুদ্র অস্বীকার করেন নি। সুতরাং অন্য সবদিক উপেক্ষা করলেও রুদ্রর নিজের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ীও গ্রামীণ সমাজ মোটেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

সম্পদ ও আয়ের [বৈষম্যমূলক ভাগবাঁটোয়ারা, বর্ণভিত্তিক কাঠামো, পেশাগত নকশা, এবং প্রথা ও প্রচলিত নিষেধ (ট্যাবু)] ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক উপাদান থেকে উদ্ভূত শক্তিকেই রুদ্র গ্রামীণ স্তরের সামাজিক শক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, এই ধরনের বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ সমাজ অনেক ক্ষেত্রেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং এক ধরনের জাতীয় অর্থ-নীতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

রুদ্রর মনে রাখা উচিত যে, এই আর্থনীতিক সমাকলনের চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজনৈতিক সমাকলন, যা প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং উত্তরোত্তর গভীরতর হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার বাহন হচ্ছে থানা-পুলিশ, আইন-আদালত, পঞ্চায়েত, বিধানসভা, সংসদীয় নির্বাচন, শিক্ষা, বেতার ও দূরদর্শন ইত্যাদি। এই রাজনৈতিক শক্তি শুধু জাতীয় ক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত নয়—অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সূত্রে তা দেশের সীমানার বাইরে বহুবিধ আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত। এইসব থেকে এই সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ভ্রান্ত হবে না যে, ভারতের গ্রামীণ অর্থ-নীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং গ্রামভিত্তিকশক্তিশাসিত বলে বিবেচনা করলে এই সমাজের বর্তমান চলমানতাকে

অস্বীকার, এবং এই চলমানতার চরিত্র এবং গতিমুখ নির্ধারণের কর্তব্য উপেক্ষা করা হয়। এই প্রসঙ্গেই মার্কসের নির্ণীত উৎপাদনপদ্ধতির চরিত্র নির্ধারণের তাৎপর্য বোধগম্য হওয়া উচিত।

মার্কস তাঁর সামগ্রিক চিন্তার কেন্দ্রস্থলে যে প্রশ্নটি উপস্থাপিত করেছেন, তা হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন সামাজিক গঠনের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে মানুষের অভিযান। এই যাত্রাপথে উত্তরণের সোপান হিসেবে এসেছে উৎপাদনপদ্ধতির প্রত্যয়। মার্কসের ভাষায়:

'[যে যুগে শ্রমজীবী নিজেই বাস্তব উৎপাদনের কারণাংশ (conditions of production), সেই ক্রীতদাসত্বের যুগ বাদ দিলে] শ্রমজীবী ও উৎপাদন-কারণাংশের আদিম ঐক্য দুটি প্রধান রূপ নিয়েছে: এশীয় সামুদায়িক (communal) ব্যবস্থা (আদিম সাম্যবাদ) এবং পরিবারভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তন (এবং গার্হস্থ্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত) শিল্প। এ দুটিই ভ্রূণস্বরূপ আকার এবং এই উভয় আকারই শ্রমকে সামাজিক শ্রমরূপে বিকাশের এবং সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত। এইজন্য প্রয়োজন হয় শ্রম এবং সম্পত্তির (অর্থাৎ উৎপাদনের কারণাংশের উপর অধিকার) মধ্যে বিচ্ছেদ, বৈষম্য। এই বিচ্ছেদের সর্বাপেক্ষা চরম রূপ—যার মধ্য দিয়ে সামাজিক শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি সর্বাপেক্ষা প্রবল-ভাবে বিকশিত হয়, তা হচ্ছে মূলধন। মূলধন যে বাস্তব ভিত্তি রচনা করে, একমাত্র তার উপরেই এবং সেই রচনাপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণী এবং সমগ্র সমাজ বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া অতিক্রম করে; এর মাধ্যমেই (উৎপাদনের কারণাংশ ও শ্রমের) আদিম ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে।' (কার্ল মার্কস, থিয়োরিজ অব সারপ্লাস ভ্যালু, ৩য় খণ্ড, মস্কো, পৃ ৪২২-২৩, গুরুত্ব আরোপ মার্কসের)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আদিম সমাজ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এই ঐতিহাসিক উত্তরণের বিভিন্ন পর্যায়ের নিজস্ব গতিধারা উপলব্ধির জন্য উৎপাদনপদ্ধতির চরিত্র-নির্ণয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। রুদ্রের প্রস্তাবিত বিকল্প এই দায়িত্ব পালনে অক্ষম।

বিষয়টা আরেকটু বিস্তারিত করে আলোচনা করা যায়। মার্কসীয় উৎপাদনপদ্ধতির ক্রমবিবর্তনের মূল সূত্র হচ্ছে শ্রমজীবীর স্বাধীন সত্তার ক্রমবিকাশ। দাসপ্রথায় যে পুরোপুরি মালিকের সম্পত্তি, সামন্ত-তন্ত্রে যে অর্ধস্বাধীন, ধনতন্ত্রে তার পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু তা নিছকই আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যিক; আসলে সে মজুরির দাস। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই তার আনুষ্ঠানিক এবং বাস্তব স্বাধীনতার একীকরণ সম্ভব হয়। এই পর্যায়ক্রমের ধারণাই শ্রমিকশ্রেণীকে তার শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষ্য স্থির করতে সাহায্য করে। তাই উৎপাদনপদ্ধতির প্রত্যয় ছাড়া এই ঐতিহাসিক অভিযানের দিগ্‌দর্শন সম্ভবপর নয়।

পরিশেষে লেখকের অন্তত দুটি গুরুতর ত্রুটির উল্লেখ প্রয়োজন। ৪৪ পৃষ্ঠায় রুদ্র বলেছেন—ইউরোপে ধনতন্ত্র প্রসারের স্বার্থে আদিম সঞ্চয়ের জন্যে সাম্রাজ্য-বাদী বিস্তারের প্রয়োজন হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি সমান্তরাল দুটি পৃথক ধারাকে একাকার করে ফেলেছেন। মার্কস আদিম সঞ্চয় বলতে শুধু "উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদকের" মধ্যে বিচ্ছেদকেই বুঝিয়েছেন। সাম্রাজ্য-বিস্তার, লুঠপাট ও বলপূর্বক ধনসম্পদ আহরণকে তিনি আদিম সঞ্চয়ের প্রেরণা বলে উল্লেখ করেছেন। (ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, ২৬ ও ৩৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

আরেক জায়গায় (পৃ ১১২) রুদ্র শ্রমশক্তির পরিবর্তে শ্রমিক ও শ্রমকে পণ্য বলে গণ্য করেছেন। শেষ কথা, অশোক রুদ্রের আর-সব রচনার মতো আলোচ্য রচনাসংগ্রহও চিন্তার উদ্রেক করে বলে মূল্যবান।

মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রম—পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি

খাজিম আহ্‌মেদ

ভূমিকা

জনৈক ইতিহাসবেত্তা সতর্কতার সঙ্গে নিটোল আর গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন: একজন ইতিহাস-শিক্ষক একটি জাতিকে গড়তে পারেন, আবার ধ্বংস করে দিতেও পারেন। মোদ্দা কথা, সঠিক ইতিহাস-শিক্ষণ ও পাঠনপদ্ধতি জাতির মঙ্গল করতে পারে; বিকৃত ইতিহাসচর্চা কোনো জাতির সামনে নিষ্কৃতি-হীন সমস্যার সৃষ্টি করে। বিকৃত ইতিহাসচর্চা যে এদেশে সাম্প্রদায়িকতারূপ বিষবৃক্ষকে মহীরূহে পরিণত করেছে—সেটি বিপানচন্দ্র ফালাফালা করে চিরে দেখিয়েছেন বহুবার, বহুভাবে। মুক্তমতি ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব, "সেক্যুলার অ্যানড সায়েনটিফিক হিস্ট্রি"-গবেষণার ওপর অশেষ গুরুত্ব আরোপের প্রশ্নটি পুনঃপুন তুলেছেন। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের আলোচনাসভায় "সেক্যুলার অ্যানড সায়েনটিফিক টেকসট বুক"-রচনার দাবি বারবার উঠেছে সঙ্গত কারণেই। আদতে, তাত্ত্বিক ক্ষেত্র থেকে সাম্প্রদায়িকতা আর ভেদবুদ্ধির উচ্ছেদ অপরিহার্য বিষয়। তা না হলে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে উঠবে। এর ফলে সামাজিক জীবনে ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাপক অবকাশ থেকে যাবে।

একদা ব্রিটিশ দার্শনিক কার্লাইল মন্তব্য করে-ছিলেন, ইতিহাস খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনগাথা। এই ধারণার দ্বারা চালিত হয়েই বহুকাল যাবৎ এই উপমহাদেশের ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলো রচিত হয়ে এসেছে। ফলত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অর্থাৎ রাজা-সুলতান-বাদশাহ এবং গভর্নর-জেনারেলদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণ এইরকম: ভারতবর্ষ সম্পর্কে রচিত ইতিহাসগ্রন্থের অধিকাংশই নাম, বংশ, রাজা, জীবনী প্রভৃতির লম্বা ফিরিস্তি। কে. এম. পানিক্করও চীনে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সেখানে ভারত-ইতিহাসকে কতকটা বিদ্রূপ করেই টেলিফোন ডাইরেক্টরির সঙ্গে তুলনা করা হত। কিন্তু এখন ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের ভূমিকা একমাত্র বিচার্য বিষয় বলে গণ্য করা হয় না। মানবসমাজের অগ্রগতির ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের আলোচনা আর বিশ্লেষণ-ই হল ইতিহাসের মূল আলোচ্য বিষয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের গতিরেখা বিশ্লেষণ করা জরুরি।

সিলেবাস পর্যালোচনা

সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নবম (১৯৮৮) এবং দশম (১৯৮৯) শ্রেণীর জন্য বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসের এমন একটি সিলেবাস তৈরি করেছেন, যাতে ভারত-ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়-সমূহের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পাঠ্যসূচীটি খতিয়ে দেখা যাক: মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-প্রবর্তিত নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে প্রাচীন কাল থেকে ১৮৫৭ সালের 'মহা-বিদ্রোহ'—নবম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকক্ষেত্র, ভারতসংস্কৃতির বৈচিত্র্য, ধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শ ও ঐতিহ্য, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাসের মূলধারা ও বৈশিষ্ট্যগুলোর সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত, সচেতন ও আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। অপ্রসাসঙ্গিক খুঁটিনাটি আর অনুপুঙ্খ বর্ণনা ব্যতিরেকে স্মর্তব্য তথ্য এবং নির্দিষ্ট ও

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-অনুমোদিত কুড়িখানি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে এই আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত এই বই-গুলিই বেশিরভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবিন্যাসের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতার দিকচিহ্নের রূপরেখা হাজির করার উদ্দেশ্য প্রতিভাত হয়েছে। বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে আধুনিক গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ রয়েছে। গতানুগতিক রক্ষণশীল মতামতের ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে শিক্ষার্থীরা যাতে প্রথম থেকেই নিজেদের যুক্তি, তর্ক, বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করতে সাহসী হয়, অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে—সেটিও খুব সম্ভব পর্ষদের উদ্দিষ্ট।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ-কর্তৃক প্রবর্তিত দশম শ্রেণীর নতুন পাঠ্যসূচীতেও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলাফল থেকে ১৯৫০ সালের সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ, গণ-প্রজাতন্ত্রী ভারতের অভ্যুদয় দশম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ধারিত হয়েছে। পর্ষৎ এই পর্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সমাজের বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত শ্রেণীর আন্দোলন এবং শোষিত শ্রেণীর উত্থান ও আন্দোলনের মিলিত প্রয়াসের মারফত ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়েছিল—সেটি স্বীকৃত হয়েছে। সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির ভেদনীতি, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ভ্রান্তি আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এবং আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি আলোচনার নির্দেশ পাঠ্য-সূচীতে রয়েছে। আদিবাসী-উপজাতি, শ্রমিক-কিষাণ আন্দোলন উপেক্ষিত নয়, গুরুত্ব পেয়েছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ইংরেজদের রাজ্য-গ্রাসনীতির অবসান হয়েছিল এবং ইউরোপীয় উদ্যোগে রেলপথ স্থাপন, শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। শ্রম-জীবী সম্প্রদায় তাদের সুযোগসুবিধার জন্য আন্দোলন করেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র ও অহিংস আন্দোলনের একটি যুক্তিগ্রাহ্য পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। জাতীয় সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে নেতা, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গণ-সমাবেশের চিত্রটি পরিস্ফুটনের সুযোগ পর্ষৎ রেখেছেন। এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর একটি অধ্যায় রচনার নির্দেশ আছে, সেটি হচ্ছে—এ দেশে মুসলিম রাজনীতির গতিধারা। ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং সার্বভৌম ভারতের স্বপ্ন আমরা প্রতিনিয়ত দেখে থাকি—তাকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য নিজের দেশ, দেশবাসী আর বিভিন্ন জাতিসত্তা সম্পর্কে এক সুস্পষ্ট ধারণা থাকা একান্তভাবে অপরিহার্য। স্বীকার্য, পর্ষৎপ্রবর্তিত বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাসটি প্রশংসার যোগ্য।

পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি

গত চার দশক ধরে আধুনিক গবেষণার ফলে ভারত-ইতিহাসের বহু বিতর্কিত বিষয়ের ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। ফলত রক্ষণশীল এবং প্রচলিত ধারণা বহু ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কারণে, পরিবর্তিত হয়েছে। স্বভাবতই সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস-গবেষণা-জনিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে আন্তরিক পরিচিতি এবং বিশ্বাস না থাকলে পর্ষৎ-নির্দেশিত পাঠ্যপুস্তক রচনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত প্রচলিত ধ্যানধারণা মোতাবেক বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হলে পর্ষদের উদ্দেশ্যও অকার্যকর হয়ে উঠবে। এই প্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের অভিপ্রায়েই বর্তমান আলোচনাটির অবতারণা। শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা ব্যতিরেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকও মাধ্যমিক-সিলেবাস-নির্ভর পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ণ করেছেন। এবারে মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক।

মিশ্র সংস্কৃতি

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে ভারতবর্ষ 'পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র সংস্করণ'—(epitome of the world)। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ভারতবর্ষকে প্রধানত দু ভাগে বিভক্ত করা

হয়েছে। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত অঞ্চল "আর্যাবর্ত" বা "উত্তরাপথ" এবং বিন্ধ্য থেকে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত অঞ্চল "দাক্ষিণাত্য" বা "দক্ষিণাপথ" নামে পরিচিত। উত্তরভারতের সভ্যতা "আর্যসভ্যতা", দক্ষিণভারতীয় সভ্যতা মূলত "দ্রাবিড় সভ্যতা"। প্রাচীন ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছিল "দ্রাবিড়-জাতি"। বিদেশাগত আর্যজাতি "উত্তরাপথে" প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। দ্রাবিড়জাতির পর আর্যজাতি সুসভ্য হিসেবে উত্থিত হয়। অনেকেই "আর্যাবর্ত"কে "আর্যদের পবিত্র বাসভূমি", "ভারতের হৃৎপিণ্ড" এবং প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে চিত্রিত করে শ্লাঘা বোধ করে থাকেন। এটি সমর্থন-যোগ্য নয়, কেননা যাঁরা উত্তর ভারতের আর্যসভ্যতাকে "ভারতীয় সভ্যতা"র সমার্থক হিসেবে জ্ঞান করেন, তাঁরাই এই মতের প্রবক্তা। মনে রাখা দরকার যে দীর্ঘকাল উত্তরের কোনো শক্তিশালী রাজা দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন নি। ফলে আর্যাবর্ত থেকে বহুকাল বিচ্ছিন্ন থেকে দাক্ষিণাত্য প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ধারক হিসেবে এক সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র ইতিহাস গড়ে তুলেছিল। আর্য প্রভুত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বটি প্রাধান্য পেলেও লক্ষ করার বিষয় এই যে, আর্য সংস্কৃতি কিন্তু সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। মধ্য দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে অনার্য সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। এতৎসত্ত্বেও কোনো-কোনো পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি হচ্ছে "আর্য সংস্কৃতি"। ভারতবর্ষ "কমপোজিট কালচারের দেশ"—এই বিষয়-টির ওপর মর্যাদা আরোপ করলে সিদ্ধান্তে স্ববিরোধিতা আর তালগোলপাকিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'মহামানবের সাগরতীর'-রূপে বর্ণনা করেছেন। ভিনসেনট স্মিথ এদেশকে চিন্তা করেন, 'নৃতত্ত্বের জাদুঘর' বা 'জাতিতত্ত্বের সংগ্রহশালা' (an ethnological museum) হিসেবে। বিভিন্ন সময়ে বিদেশ থেকে এদেশে এসেছিল গ্রীক, পারসিক, শক, কুষাণ, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতি। মধ্যযুগে ইসলামধর্মী যেসব জাতি রাজ্যস্থাপন করে বসবাস করে তাদের মধ্যে বিশিষ্ট হল, তুর্কী, আফগান (পাঠান), মোঙ্গল এবং আবিসিনীয় জাতি। পরবর্তী কালে সমুদ্রপথে পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এসেছে পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসি এবং ইংরেজ। প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভাষা, ধর্ম, জাতি, সামাজিক রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির দিক দিয়ে বৈচিত্র্য সত্ত্বেও একটি "মূলগত ঐক্য" (Funda-mental unity of India) অর্থাৎ "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" (unity in diversity) ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের মূলতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যে, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা ভারতবর্ষের চির-দিনের একমাত্র প্রচেষ্টা। স্বীকার্য, দু হাজার বছরের হিন্দু ও বৌদ্ধ আধিপত্যের সময়ে রাজনৈতিক বিভেদ, ভাষা, ধর্ম ও রীতিনীতির পার্থক্য ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর একটি নতুন সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রবর্তন হয়। ইসলাম এদেশেরই একটি ধর্মে পরিণত হয়। বহু কাল একসাথে বসবাস করার ফলে হিন্দু ও ইসলামি সংস্কৃতির মিলনে এক মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পৃথক ও স্বতন্ত্র হলেও একে অপরকে জীবনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কিন্তু রক্ষণশীলরা এই সত্যটি মানতে রাজি নন। রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিকবর্গ বিশ্বাস করে থাকেন যে ভারতবর্ষের ঐক্যবোধ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এর প্রভাব পাঠ্যগ্রন্থপ্রণেতাদের একটি বিরাট অংশকে প্রভাবিত করেছে। জনৈক বিশিষ্ট গ্রন্থপ্রণেতা লিখেছেন, 'দেবভূমি ভারতবর্ষের সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে এক ধর্মীয় ঐক্য।.....

বৈদিক সাহিত্য, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারতের মতো কাব্যগ্রন্থ ও মহাকাব্য ভারতের জাতীয় ঐক্য-বোধকে সুদৃঢ় করেছে।' এটি কি অখণ্ড ভারতীয় মানসিকতার পরিচয় বহন করে? সুপ্ত সনাতনবোধে আচ্ছন্ন একজন প্রবীণ পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা লিখেছেন যে, হিমালয় ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক। ভারতীয় সাধনার পীঠস্থান 'দেবতাত্মা হিমালয়।' আন্তর্জাতিকখ্যাতিসম্পন্ন এক ঐতিহাসিক তাঁর রচিত গ্রন্থে লিখেছেন যে, পুণ্যসলিলা নদীগুলো হিন্দুধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার জন্য নাকি এদেশে ধর্মীয় ঐক্য সম্ভব হয়েছে। বহুজাতিক ও বহুধর্মাবলম্বী দেশে এই তত্ত্ব কিভাবে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে? এটি ভেবে দেখা দরকার।

রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ : প্রাচীন নয়

প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকেই এই মত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ সুপ্রাচীন। প্রাচীন কালে ভারতীয় সভ্যতার প্রবর্তকরা এই দেশের ভৌগোলিক ঐক্য সম্পর্কে একটি ধারণা পোষণ করলেও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা সেই সময়ে ক্রিয়াশীল ছিল না, যা ছিল তা তত্ত্বে, সাহিত্যে, স্নানমন্ত্রে এবং ধর্মবিশ্বাসে। মাত্র ১৫০ বছর আগেও "ভারতবর্ষ"-নামক আইডিয়াটির অস্তিত্ব ছিল না। "ভারতবর্ষ" নাম উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনে তখনও আসমুদ্রহিমাচল এক বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা জাগে নি। পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাবর্গ এই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকৃত তথ্যটি পেশ করতে পারতেন।

বৈদিক সভ্যতা ও প্রতিবাদ-আন্দোলন

তৃতীয় অধ্যায়টি বৈদিক সভ্যতা তথা আর্যদের ভারতে আগমন ও বিকাশ সংক্রান্ত। আর্য কথাটির অর্থ হল 'শ্রেষ্ঠ', সৎকুলজাত বা সুসভ্য। আর্য সভ্যতাকে "আদিবৈদিক" ও "উত্তরবৈদিক"—এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। ঋগ্বেদে বর্ণিত আর্যসভ্যতাকে আদি বৈদিকসভ্যতা বলা হয়। আর্যসমাজব্যবস্থার দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল "বর্ণভেদ" ও "চতুরাশ্রম"। বর্তমানে হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ- ও জাতিভেদ-প্রথা বৈদিক যুগের বর্ণভেদপ্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ডি. ডি. কোশাম্বী মনে করেন, বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে বর্ণভেদের কঠোরতা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে বর্ণভেদ-প্রথা ভয়ানকভাবে কঠোর ও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। ভারতের আদি অধিবাসীদের আর্যরা "অনার্য", "দাস" হিসেবে বিবেচনা করত। আর্যরা এদের নির্মমভাবে ধ্বংস করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শূদ্রদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে—শূদ্র অপরের দাস, যখন ইচ্ছে তাকে বহিষ্কার ও হত্যা করা যায়। অস্পৃশ্য মনে করে মানুষকে ঘৃণা করার সংস্কার জাঁকিয়ে বসে। নারীস্বাধীনতা, সামাজিক মর্যাদা, নারীদের সম্পত্তিভোগ বা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস মনুসংহিতায় স্পষ্ট হয়ে আছে। ব্যয়বহুল আচার-অনুষ্ঠান, দুর্বোধ্য যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড ক্রমশ জটিল হওয়ার ফলে পুরোহিতশ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপিত হয়। অন্তহীন সমস্যায় সাধারণ মানুষের জীবন জর্জরিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেন। প্রাচীন বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে "প্রতিবাদ-আন্দোলনের" সূত্রপাত হয়। বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় আরণ্যক ও উপনিষদে। সামরিক, রাজ-নৈতিক, এমনকী প্রজ্ঞার ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়রা তাঁদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সচেতন হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'ষোড়শ জনপদে' ক্ষত্রিয়রাই ছিলেন শাসকশ্রেণী। বিশেষ আপত্তির সঙ্গে তাঁরা সমাজবিন্যাসে ব্রাহ্মণদের প্রথম স্থান মেনে নেন। বৈশ্যশ্রেণীও সমৃদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, তাঁদের ধনসম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র ব্রাহ্মণরা ধর্মের নাম করে তাঁদের

ওপর আধিপত্য করেছেন। ফলত, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে মনোভাব জেগে ওঠে। নিরীশ্বরবাদী আজীবক সম্প্রদায় "নিমিত্তবাদ" প্রচার করেন এবং নিরীশ্বরবাদী চার্বাক ও তাঁর অনুগামীরা "জড়বাদ" প্রচার করেন। আজীবক ও চার্বাকপন্থীরা পুরোহিতদের অর্থহীন কঠোর অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সংস্কৃতের কোনো প্রভাব ছিল না। তাঁরা "প্রাকৃত" ভাষা ও "মাগধী" ভাষা ব্যবহার করতেন। গৌতম বুদ্ধ "মাগধী"তে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর শিক্ষা প্রচার করেন। তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের 'প্রথম বিদ্রোহী সন্তান'। ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা। বেদের অভ্রান্ততা, অপৌরুষেয়তা, আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং জাতিভেদের প্রতি বিতৃষ্ণা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল। বুদ্ধ ছিলেন বাস্তবচেতনাসম্পন্ন ধর্ম-সংস্কারক। হিন্দু দেবদেবীও উভয় ধর্মে অস্বীকৃত। যদিও জৈনরা পরবর্তী কালে পুজোপার্বণে কিঞ্চিৎ আসক্ত হয়ে পড়ে। বর্ণভেদহীন এই ধর্মীয় আন্দোলন অহিংসা, উদারতা, যুগোপযোগী নমনীয়তা, সকল মানুষের সমান অধিকার ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। স্বভাবতই ব্যবসায়ী, কারিগর, কৃষিজীবী আর নিম্ন-বর্ণের দরিদ্র মানুষ বৌদ্ধধর্মগ্রহণে আগ্রহী হয়। যুদ্ধই একমাত্র পেশা ছিল না—এমন ক্ষত্রিয়রাও দলে-দলে বৌদ্ধমত গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—এই দুই শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার দীর্ঘস্থায়ী বিরোধ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। স্পষ্ট উচ্চারণ করা যেতে পারে—এই আলোচনায় পাঠ্য-পুস্তকপ্রণেতারা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। ছাত্রছাত্রীদের মনে বহু সঙ্গত প্রশ্নের উদ্রেকে তাঁরা সহায়তা করেছেন। বিশিষ্ট একজন ঐতিহাসিকের লিখিত একটি পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করেছে। এটি সঠিক নয়। খুব সম্ভব এটি মুদ্রণপ্রমাদ।

ধর্মাশোক

'চণ্ডাশোক' থেকে 'ধর্মাশোক'-এ রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যেই অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে। 'ধর্মাশোক' ছিলেন বৌদ্ধ। রোমিলা থাপার মন্তব্য করেছেন, 'ধম্মনীতি' গ্রহণ করেও অশোক 'এক নীতিনির্ভর কার্যকর ও উপযোগী জীবনপদ্ধতি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।' আধুনিক কালে হিন্দু অভ্যুত্থানবাদীরা অশোকের ওপর 'হিন্দুত্ব' আরোপ করে তাঁকে 'হিন্দু ভারতের' শ্রেষ্ঠ সন্তান আর শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিকতা-বাদী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হন। সর্বাত্মক সেবাধর্মের আদর্শ তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের মধ্যে একজন করে তুলেছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তাঁর কোনো উল্লেখ নেই। পুরাণে তাঁকে শুধু একজন মৌর্য রাজা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর কারণটি পরিষ্কার : অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর সমর্থনের কথা কখনই গোপন করেন নি। পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়টির উত্থাপন বাঞ্ছনীয় ছিল।

সুবর্ণযুগ : প্রকৃত চিত্র

পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাবর্গ গুপ্তযুগকে ইতিহাসে "সুবর্ণ যুগ" এবং ভারতে "হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির" প্রতিষ্ঠার যুগ হিসেবে বর্ণনা করতে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়েছেন। স্মর্তব্য যে, গুপ্তশাসন উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তর ভারতের ইতিহাস কি পুরো ভারতবর্ষের ইতিহাস? উপরন্তু, একালের শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল বৌদ্ধ মঠগুলোর অনুপ্রেরণায়। বৌদ্ধদের তৎপরতায় চিকিৎসাবিদ্যা, কারুশিল্প প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য যুগে অবহেলিত বিদ্যার নতুন করে চর্চা শুরু হয়। অহিংসা নীতি গুপ্তযুগে চর্চিত হয় নি। বৌদ্ধধর্মের বিনাশের মধ্যে দিয়েই ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, পরধর্মসহিষ্ণুতা উপেক্ষিত হয়েছিল—এসব কথা

অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকেই অনুল্লেখিত থেকেছে। "ভারতীয় সভ্যতার রূপরেখা"-নামক গ্রন্থটিতে অবশ্য ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে, 'গুপ্ত-যুগের সভ্যতা ভারত ইতিহাসে সুবর্ণযুগ এনেছিল কিনা' সে বিষয়ে অবশ্য কেউ-কেউ আজকাল ভিন্ন মত পোষণ করেন। রোমিলা থাপারের মতে, এই সভ্যতা ছিল সমাজের ওপরতলার লোকের জন্য সৃষ্ট। নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল না।..... সেই আমলে সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌গতি লক্ষ করা যায়। অস্পৃশ্যতা নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছিল।...নারীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করছিল বাল্য-বিবাহ ও সতীদাহের প্রচলন। উত্তর ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে ভূমিদাসপ্রথার বিকাশ ঘটেছিল। ...জমি হস্তান্তরিত হলে চাষীরাও হস্তান্তরিত হত। ...ভারতবর্ষের সঙ্গে রোমের বাণিজ্য-সম্পর্কেও অবনতি দেখা দিয়েছিল; এতে ভারতীয় অর্থনীতি আহত হয়, পতন ঘটে গাঙ্গেয় সমভূমিতে অবস্থিত কয়েকটি নগরের।'

প্রাচীন যুগের অবসান

শশাঙ্ক এবং হর্ষবর্ধনের আলোচনায় সকলেই পরিমিতি-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের ইতিহাস দীর্ঘকালের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বাঙলার এই দুর্দিন ইতিহাসে "মাৎস্যন্যায়" বলে বর্ণিত হয়েছে। পালরাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গোপাল এই অবস্থাটির পরিবর্তন ঘটান। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাদেশে সেনবংশের অভ্যুত্থানের ফলে পালশাসনের অবসান ঘটে। খুব সম্ভব ১২০১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান বিজেতা মুহম্মদ ঘোরির অনুচর এবং কুতুবউদ্দিন আইবকের অন্যতম বিশিষ্ট সেনাপতি ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে নদীয়া দখল করেন। ফলত, বাঙলায় ইসলামধর্মীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক আধিপত্যস্থাপনের দ্বন্দ্বে দাক্ষিণাত্যের চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, পল্লব, এবং চোলরাজ্যের শাসকগোষ্ঠীর কৃতিত্বের বিষয়টি চমৎকার আলোচিত হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

প্রাচীন ভারতবর্ষের আলোচনায় সপ্তম অধ্যায়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে স্থল ও জলপথের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগের বিষয়টি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলবে। ভারতীয় সামন্ত-তন্ত্রের উদ্ভবের এবং বিকাশের প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে যুক্তিসহকারে। ভূমি- ও কৃষিনির্ভর সমাজে সামন্ততন্ত্র স্বাভাবিকভাবেই সমাজ-ব্যবস্থাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। ফলে সচ্ছলতা থাকলেও সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ছিল না। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সমাজ, সমাজে নারীর স্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, আমোদ-প্রমোদ, যানবাহন, কৃষি ও রাজস্ব, শিল্প, ব্যাবসা-বাণিজ্য, মুদ্রাব্যবস্থা, ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, ধর্ম, শিল্পকলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কতিপয় পাঠ্যপুস্তকরচয়িতা আলোচনার সুবিধের জন্য উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত—এই দুই শিরোনামে আলোচনা করেছেন। ফলত উভয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্ণভেদের কঠোরতা, উপবর্ণের উদ্ভব ও তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি, ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য, হিন্দুসমাজের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের উত্থান, অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত শংকরাচার্য এবং বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজের আবির্ভাব,

ভক্তি-আন্দোলনের ফলে সমাজজীবনে আলোড়ন, মনুস্মৃতিতে নারীদের চিরস্থায়ী বশবর্তিতার মৌলিক তত্ত্বানুসারে তাঁদের অবস্থার অধোগতি, বাল্যবিবাহের প্রচলন এবং বিধবাবিবাহের ওপর নিষেধাজ্ঞার কঠোরতা, স্বেচ্ছায় বা বলপ্রয়োগের মারফত সতীদাহ, ক্রীতদাসপ্রথার প্রচলন, মন্দিরের দেবদাসীদের বারবণিতায় রূপান্তর—সব মিলিয়ে এই কালপর্বে নৈতিকতার মান নীচে নেমে যায়। উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের বরাত দিয়ে একটি পাঠ্যগ্রন্থে বলা হয়েছে যে, গুজরাতের চার হাজার মন্দিরে কুড়ি হাজারেরও বেশি নর্তকী ছিল। অদৃষ্টবাদের প্রভাবে নৃপতি থেকে সাধারণ মানুষ উদ্যোগহীন হয়ে পড়েছিল। এদেশের পণ্ডিতবর্গ বহিরাগত কোনো জ্ঞান সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। একাদশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজের সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন, আলবেরুনি তাঁর "কিতাব-উল-হিন্দ" গ্রন্থে। আরব ভ্রমণকারী আবু জাইদ্ আল হাসান বহু তথ্য রেখে গেছেন। এই যুগে ভারতীয় সমাজ ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচিত হয়। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট ও পাণ্ড্য রাজারা ইসলামধর্মাবলম্বীদের প্রতি বদান্যতা দেখিয়েছিলেন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতিও অনুরূপ আচরণ করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য শ্রেণীর মধ্যে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেন। কৌলীন্যপ্রথা হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বংশগৌরব অনুসারে সামাজিক স্তর। এই সময় থেকেই সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া বৈদ্য ও কায়স্থ শ্রেণীর প্রভাব ও প্রাধান্য সূচিত হয়। বস্তুত আধুনিক বাঙালি হিন্দু সমাজের গড়ন এই যুগেই সূচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে তুর্ক-আফগান শাসন প্রতিষ্ঠাকালে হিন্দুসমাজ গতিহীন ও স্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। এই অধ্যায়টি আলোচনায় অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ দুটি পাঠ্যপুস্তকে গভীর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অবশ্য ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছে এমন একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, আলোচ্য সময়ে ভারতীয় হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ধর্মোন্মত্ত ব্যবহারের ফলেই হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল হয়ে পড়ে এবং হিন্দু ও মুসলিম সমাজের সমন্বয়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। খোলাখুলি বলা দরকার যে, আধুনিক গবেষণার ফলে এসব অভিযোগের শিকড় বেশ কিছুকাল আগে থেকেই সমূলে উৎপাটিত হয়ে গেছে।

আরব বণিক : প্রাচীন ভারতে

এদেশে রাজনৈতিক ইসলামের প্রবেশের বহু পূর্ব থেকেই আরব বণিকদের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের উপকূলের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। দ্বিতীয় খলিফা ওমরের আমলে আরব বণিকরা এদেশে বসতি স্থাপন করে। তারা দক্ষিণ ভারতের নৃপতিদের ঘোড়া এবং দক্ষ জাহাজচালকের জোগান দিত। এইভাবেই আরব মুসলমান বণিকদের সঙ্গে হিন্দুরাজাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আরবদের মাধ্যমেই ভারতীয় বণিকদের পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।

ভারতে ইসলামের আগমন

আরবের একজন তরুণ দক্ষ সেনাপতি মহম্মদ বিন কাশিমের উদ্যোগে ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধুবিজয়ের মারফত ভারতে ইসলামের আগমন ঘটে। সিন্ধুরাজ গোঁড়া-ব্রাহ্মণ দাহির বৌদ্ধপ্রজা ও সামন্তদের প্রতি ব্যাপক দুর্ব্যবহার করেছিলেন। ফলত, এই বিক্ষুব্ধ প্রজাদের সাহায্য পেয়েছিলেন আরবরা। প্রায় তিনশ বছর ধরে সিন্ধুদেশে আরব-দখল বহাল ছিল। সিন্ধুদেশ জয়ের পর আরব শাসকরা বিজিতদের প্রতি উদারতা দেখায়। ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রচলিত ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থা ও স্থানীয় কর্মচারীদের চাকরির সুযোগও কেড়ে নেওয়া হয় নি। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

গজনীর মামুদ সিন্ধু দেশের আরব রাজ্য অধিকার করেন। আরবরা হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিবেশিসুলভ মনোভাব নিয়ে শান্তি ও মৈত্রীর সঙ্গে বসবাস করেন। আরবরা ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান স্বীকরণ করেন। এই বিদ্যা ও জ্ঞান তারা ইউরোপীয় দেশেও প্রচার করেছিল। আমির খসরুর রচনা থেকে জানা যায় যে, আরব জ্যোতির্বিদ আবু মাশার বারাণসীতে এসে দশ বছর জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ভারতে রাজনৈতিক ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট ও তৎকালীন উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজপুতবংশীয় নৃপতিদের ঈর্ষা-পরায়ণতা ও পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলেই যে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনো সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন নি—সেটি যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে।

মুসলিম যুগ নয়—মধ্যযুগের ভারত

শাসক বংশের ধর্মীয় পরিচয়ের প্রেক্ষাপট থেকেই প্রাচীন যুগ আর মধ্যযুগের ইতিহাসকে "হিন্দুযুগ" ও "মুসলিম যুগ" বা "মুসলিম ভারত" বলে অভিহিত করা হয়েছে এযাবৎকাল। শাসক শক্তির উত্থান ও পতনের সঙ্গে ধর্মকে যোগ করে ভারতীয় ইতিহাসের যুগবিভাগ অর্থাৎ ভারতের ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা আজ আর স্বীকৃত নয়। স্বভাবতই ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসকে "মুসলিম যুগ" বলার পরিবর্তে কেন আমরা "মধ্যযুগের ভারত" বলব তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন পাঠ্য-পুস্তকপ্রণেতারা। এটি বিশেষভাবে আশার কথা। পর্ষদের নির্দেশেই এই ব্যাখ্যাটি তাঁরা করেছেন। কিন্তু লক্ষ করার বিষয় এই যে, প্রাচীন যুগ সম্পর্কে এমন কোনো নির্দেশ সিলেবাসে নেই। ফলত পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাবর্গ প্রাচীন যুগকে বহুক্ষেত্রে "হিন্দু যুগ" বলেই বর্ণনা করেছেন। এটি সঠিক নয়; কারণ মৌর্য, ইন্দো-গ্রীসীয়, শক, কুষাণ প্রভৃতি বহু প্রধান রাজবংশই অহিন্দু ছিল। অনেক রাজাই ছিলেন বৌদ্ধ। তাহলে কি আমরা মনে করব যে প্রাচীন যুগে ভারতে একটি বৌদ্ধযুগও ছিল? বহুলপঠিত একটি পাঠ্যপুস্তকের জনৈক প্রণেতা তো পরিষ্কার লিখেছেন, 'প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দু যুগেই…' ইত্যাদি ইত্যাদি। আশা করা যায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ বিষয়টি ভেবে দেখবেন। প্রাচীন ভারতের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বহু বিপত্তির কারণ হয়েছে—এটি তো সর্বজনবিদিত। পাঠ্যপুস্তকে অবশ্য শিরোনাম হিসেবে "প্রাচীন যুগ" বা "প্রাচীন ভারত" ব্যবহৃত হয়েছে।

তুর্কি শাসনের সূচনা

একাদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর বছর থেকেই আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনীর সুলতান মামুদ পুনঃপুন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ভারতে তুর্ক-আফগান রাজনৈতিক শক্তির আগমনের পথকে পরিষ্কার করে দেন। মামুদ ছিলেন ভারতে তুর্কি শাসনের অপ্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠাতা। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ পানজাব দখল করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিখ-শক্তির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত পানজাবে ইসলামধর্মীদের শাসন কায়েম ছিল। মামুদের ভারত অভিযানের কালেই আবু রিহান মোহাম্মদ আলবিরুনি তাঁর সহচর হিসেবে 'হিন্দুস্তানে' এসেছিলেন এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সুন্দর একটি বিবরণ রেখে গেছেন। স্মর্তব্য যে আলবিরুনি ভগবদ্গীতার দার্শনিক প্রভাবে গভীর-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আলবিরুনির মতে, এদেশের লোকের প্রধান দোষ ছিল যে, 'তারা বিদেশীর কাছ থেকে কিছু শিখতে বা তাদের সঙ্গে মিশতে চায় না; হিন্দুরা মনে করে তাদের দেশ ছাড়া আর দেশ নেই, এমনকি তারা ছাড়া আর কোনো জীবও নেই।' সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের জের হিসেবে এদেশে সুফী ধর্মপ্রচারকরা প্রবেশ করেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও ধর্মের সঙ্গে পারস্পরিক

আদানপ্রদানের সুযোগ ঘটে। লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সুলতান মামুদকে শুধুমাত্র নিষ্ঠুর হত্যাকারী আর মন্দিরলুণ্ঠনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি, মামুদের চরিত্র ও কৃতিত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষ একটি মূল্যবান পাঠ্যপুস্তকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক হাবিবের সুলতান মামুদ সম্পর্কিত একটি সিদ্ধান্ত সংযোজিত হয়েছে।

অভিযান থেকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

সুলতান মামুদের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে ১১৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘোরী অধিপতি গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ঘোরী গজনি অধিকার করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাবউদ্দিন মহম্মদকে গজনি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর শিহাবউদ্দিন, সুইজউদ্দিন মহম্মদ ঘোরি নামে ঘোরী রাজ্যের (গজনি ও হিরাটের মধ্যবর্তী অঞ্চল) সিংহাসনে বসলেন। ভারতের ইতিহাসে তিনিই মহম্মদ ঘোরী নামে পরিচিত। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও যুদ্ধাভিলাষী মহম্মদ ঘোরীর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতবিজয়। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দের তরাইনের যুদ্ধে ভারতীয়দের চিরাচরিত যুদ্ধপদ্ধতির নিকৃষ্টতা আর রাজনৈতিক অনৈক্যর সুযোগ নিয়ে তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তুললেন। এর অল্পকালের মধ্যেই তাঁর দক্ষ সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবক আর্যাবর্তের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে ফেলেন। অন্যদিকে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণসেনের কাছ থেকে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ কেড়ে নেন। একান্ত বিশ্বস্ত ও প্রিয় অনুচর কুতুবুদ্দিন আইবকের ওপর বিজিত ভারতীয় রাজগুলির পরিচালনার ভার অর্পণ করে মহম্মদ ঘোরী গজনি ফিরে যান। এই নতুন রাজ্য "দিল্লীর সুলতানি রাজ্য" নামে পরিচিত। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবউদ্দিন আইবকের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদীর রাজত্বকাল সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়সীমাকে "সুলতানি আমল" বলা হয়। কুতুবউদ্দিন স্বাধীন সুলতান হিসাবে শাসন শুরু করেছিলেন। এই কারণে কুতুবউদ্দিন আইবককে দিল্লীর স্বাধীন সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা-রূপে অনেকেই গণ্য করেন। কুতুবউদ্দিন-প্রতিষ্ঠিত "তুর্কি সুলতানি বংশ"কে এযাবৎকাল পাঠ্যপুস্তকগুলোতে 'দাসবংশ' (Slave Dynasty) হিসেবে বর্ণনা করা হত। বর্তমান পাঠ্যপুস্তকগুলো যুক্তি-সহকারে তা খণ্ডন করেছে। শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি আকর্ষক হয়ে উঠবে।

সাম্রাজ্যের সংহতি

ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬) এবং গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)-এর স্থান ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছে সুলতানি সাম্রাজ্যের সংহতিবিধানকারী হিসেবে। কবি আমির খসরুর প্রথম পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও বলবন মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। খলজি সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন খলজির ভূমিকার নির্মোহ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের চিন্তনে ও মননে গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন রাষ্ট্রনীতি থেকে ধর্মকে বর্জন করে এক নতুন রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন করেছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতাস্থাপন, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণে তাঁর অভিনব বিধিব্যবস্থা পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে। 'পদ্মিনী কিসসা' সম্পূর্ণ সঙ্গত কারণেই উপেক্ষিত হয়েছে। মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রতিও পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাবর্গ সুবিচার করেছেন। চরিত্রের স্ববিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে মহম্মদ বিন তুঘলকের উলেমাপ্রভাবমুক্ত ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা, বিরাট হিন্দু সমাজের প্রতি বদান্যতা, সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদের চেষ্টা এবং বিভিন্ন সংস্কার-প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয়

পেয়েছেন। 'পাগলারাজা' হিসেবে তাঁর পরিচয় ক্রমে-ক্রমে লোপ পাবে বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

ফিরোজশাহ কি ধর্মান্ধ?

নতুন পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বের পাঠ্য বই-গুলোতে ফিরোজ শাহ তুঘলককে ভয়ানক ধর্ম্মান্ধ হিসেবে চিত্রিত করা হত—যেন সেটিই তাঁর একমাত্র পরিচয়। কিন্তু বর্তমানে তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজ, শাসনসংস্কার, নতুন নগর নির্মাণ, কৃষির উন্নয়ন, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকেই দ্রব্যমূল্য হ্রাস, শিক্ষার উন্নতিসাধন, বহু সংস্কৃত পুঁথি ফারসি ভাষায় অনুবাদ এবং তাঁর শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা (উলেমাদের প্রভাব, জায়গির পুনঃপ্রবর্তন, ক্রীতদাসের সংখ্যাবৃদ্ধি) ইত্যাকার বিষয় আলোচিত হয়েছে। ব্রাহ্মণদের প্রতি জিজিয়া প্রবর্তনের জন্য ফিরোজকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কয়েকটি আলোচনায়, কিন্তু একথাও উল্লেখিত হয়েছে যে, সমস্ত অবৈধ কর তিনি বাতিল করেন এবং অন্যায়ভাবে অতিরিক্ত কোন কর যাতে আদায় করা না হয় সেদিকে তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন। ফলত, কৃষক-সমাজের তাঁর প্রতি কোনো অভিযোগ বা ক্ষোভ ছিল না।

সিকান্দার লোদী

সিকান্দার লোদীর অসাধারণ শাসনদক্ষতার কথা স্বীকৃত হয়েছে। গরিব-দুঃখী প্রজাদের কাছে তিনি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তবে তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দুবিদ্বেষ তথা মথুরার মন্দির ধ্বংসের অভিযোগ আছে। রাজনৈতিক কারণে সিকান্দার লোদী জৌনপুরের মসজিদ পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিলেন। এই তথ্যটি পাঠ্যবইরচয়িতারা উল্লেখ করতে পারতেন। মন্দির-মসজিদ ধ্বংসের বিষয়টি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা দরকার।

আঞ্চলিক শক্তি

তুঘলক বংশের পতনের পর কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির আবির্ভাব ঘটে। এর মধ্যে বাঙলাদেশে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) এবং নুসরৎ শাহের শাসনকাল (১৫১৯-১৫৩২) হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের জন্য খ্যাত। পাঠ্যগ্রন্থ-গুলোতে এই সময়ের বর্ণনায় বেশ উচ্ছ্বাস লক্ষ করা গেছে। দাক্ষিণাত্যের বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের উত্থান এ-সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের নিরন্তর দ্বন্দ্বকে ধর্মীয় সংঘাত হিসেবে বর্ণনা করা হয় নি। এই সংঘর্ষের পশ্চাতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্রিয়াশীল ছিল—এই ব্যাখ্যাটি প্রাধান্য পেয়েছে। এইসব সিদ্ধান্তই হচ্ছে 'সেক্যুলার অ্যানড সায়েনটিফিক হিস্ট্রি' চর্চার ফসল। পাঠ্যগ্রন্থ-প্রণেতাবর্গ এ বাবদে আধুনিক ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র, অধ্যাপক হাবিব ও নিজামির গবেষণাকর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের প্রভাব

সুলতানি আমলে ভারতীয় জীবনে, বিশেষভাবে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনে ইসলামের প্রভাব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। এই যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সনাতন সংস্কৃতির একটি সংঘাত লক্ষ করা গেছে। মুসলমানরা নিজেদের একটি সুনির্দিষ্ট ধর্ম, সমাজব্যবস্থা, জীবনবোধ, বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলে বিশ্বাস করত। প্রচণ্ড একেশ্বরবাদী ইসলামধর্মাবলম্বী মুসলমান এবং প্রতীক- ও প্রতিমা-পূজায় বিশ্বাসী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ উভয়ের মিলনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে হিন্দু-ধর্মের বর্ণাশ্রমের আদর্শের বিরাট পার্থক্য ছিল।

সামাজিক বৈষম্য ও অত্যাচারে জর্জরিত নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্মের সাম্যনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে ইসলামের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য হিন্দু শাস্ত্রকারগণ অধিকতর কঠোর বিধিনিষেধ ও সামাজিক রীতিনীতির প্রবর্তন করতে শুরু করেন। ফলে সনাতনধর্মী হিন্দুসমাজে রক্ষণশীলতা আরও বৃদ্ধি পায়। সুখের কথা, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম-বিরোধী এই প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই সমন্বয়ের মাধ্যমে উভয় ধর্ম ও সংস্কৃতি পরস্পরের প্রতি ক্রমশ শ্রদ্ধাবান ও সহনশীল হয়ে উঠেছিল। অবশেষে সাধিত হয় উভয় সংস্কৃতির মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়। এই ধারাতেই অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা এই পর্বটি আলোচনা করেছেন। হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্পর্কে বিশেষ একটি পাঠ্যপুস্তকের সিদ্ধান্ত আমাদের চমকিত করে। সিদ্ধান্তটি এই: 'কিছুকাল আগেও ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ও তাঁদের অনুসারী হিন্দু জাতীয়তা-বাদী ঐতিহাসিকেরা (যেমন, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার) মেনে নিয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাস শুধুমাত্র পারস্পরিক বিরোধেরই ইতিহাস। সংঘাত অবশ্যই ছিল, এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনায় সেই সংঘাত বিপুল আকার ধারণ করে শেষ পর্যন্ত ভারত-ব্যবচ্ছেদে পর্যবসিত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেই সংঘাত ধর্মগত কারণে যতটা তার চাইতে ঢের বেশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে। ঐতিহাসিকেরা মধ্যযুগে মুসলমানশাসকদের নিষ্ঠুরতার উদাহরণ দেন, কিন্তু মনে রাখেন না যে, বিজয়নগরের মতো সভ্য হিন্দুরাষ্ট্রেও নিষ্ঠুরতার ঘাটতি ছিল না; বস্তুত বিশ্বজোড়া মধ্যযুগীয় শাসকশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যই ছিল নিষ্ঠুরতা। কি হিন্দু, কি মুসলমান তখন শাসক-মাত্রেই কমবেশি আধুনিক দৃষ্টিতে নিষ্ঠুর ছিলেন। তেমনি বলপূর্বক ধর্মান্তরের ঘটনা পাওয়া গেলেও ধর্মান্তর ব্যাপক ছিল না। সুলতান মামুদের বারংবার ভারত আক্রমণের পিছনে যে ধর্মান্ধতার বদলে হিন্দু-মন্দিরে লুকোনো ধনরত্নলাভের আকাঙ্ক্ষা কাজ করে-ছিল, সেটাও আমরা দেখেছি। এ ছাড়া স্মরণীয় যে, প্রয়োজনের খাতিরে মুসলমান শাসকেরা হিন্দু স্থপতিকে কাজে লাগিয়েছেন; রাজস্ববিভাগের কর্মচারিগণ ও বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে শাসন বিভাগ ও সামরিক বিভাগেও হিন্দুরা উচ্চপদ লাভ করতেন। .....এর ফলেই সাংস্কৃতিক সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল।' "কমিউনালিজম অ্যানড দ্য রাইটিং অব ইনডিয়ান হিস্ট্রি" (রোমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপানচন্দ্র) নামক গ্রন্থটির প্রভাবেই গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। আশা করা যেতে পারে, শিক্ষার্থীদের জন্য এটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

আকবর, রানাপ্রতাপ, শেরশাহ

আওরঙ্গজেব ব্যতিরেকে অন্যান্য মোগল সম্রাটদের শাসনকাল ও শাসনপদ্ধতি বর্ণনায় পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা-বর্গ কিঞ্চিৎ বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করছেন। বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের জন্য আকবরকে "জাতীয় সম্রাট" হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং রানা প্রতাপের "স্বদেশপ্রেম তথা জাতিপ্রেম" সম্মানিত হয়েছে। এই সময়কালীন শাসক হিসেবে শেরশাহ প্রসঙ্গটিও এখানে এসে যাচ্ছে। তাঁকে বলা হয়েছে, প্রতিভাধর, ন্যায়পরায়ণ, সামরিক সংগঠক ও অসাধারণ উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন শাসক। রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম মিলনের বিশিষ্ট রূপকার। ধর্মনিরপেক্ষ ও জনকল্যাণকর শাসনপদ্ধতির জন্য পাঠ্য বইয়ের লেখকরা তাঁকে মধ্যযুগের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আকবর ছিলেন শেরশাহের উত্তরসূরী।

আওরঙ্গজেব আর শিবাজী

বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকেই

আওরঙ্গজেবকে ভয়ঙ্কর 'হিন্দু নির্যাতনকারী' হিসেবে ঘোরতর সমালোচনা করা হয়েছে। আওরঙ্গজেব 'অতিরিক্ত বিশুদ্ধতাবাদী' ছিলেন—এটি অস্বীকার করা হচ্ছে না। কিন্তু তাঁকে ঘৃণিত ব্যক্তি হিসেবে প্রমাণ করার দায়িত্বটি সম্পাদন করেছিলেন জাতীয়তাবাদী তথা সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকরা। মান্ধাতা আমলের সমস্ত অভিযোগগুলোই পাঠ্যপুস্তকে অতি উৎসাহের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এমনকী মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আওরঙ্গজেবকেই দায়ী করা হয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই আওরঙ্গজেবের নীতিকে সমসাময়িক রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায় আলোচনা করে তাঁর বিধিব্যবস্থার মধ্যে যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছেন। আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানাধরনের বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়েছিল—এটি সত্য। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব মনে করেন যে, ওইসব বিদ্রোহ মূলত সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাপ্রসূত, ধর্মীয় প্রশ্ন ছিল গৌণ। পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতারা রক্ষণশীল ঐতিহাসিকদের দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত হয়েছেন। ফলত, তাঁদের সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন হয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। পরিষ্কার বলা যেতে পারে—আওরঙ্গজেব সম্পর্কে সতীশচন্দ্র, আতাহার আলি, গৌতম ভদ্র আর ইরফান হাবিবের বিজ্ঞানভিত্তিক নিরপেক্ষ গবেষণাকর্মকে পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাবর্গ মূল্য দেন নি। [দেখুন, ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা, চতুরঙ্গ, মার্চ, ১৯৮৮]। অবশ্য "ভারত ইতিহাসের ধারা" নামক একটি পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে, 'এ কথা ঠিক যে তিনি ইসলামের নীতি দ্বারা বহুলাংশে পরিচালিত হতেন। তবে তিনি প্রজাদের স্বার্থ উপেক্ষা করতেন না। তিনি···প্রজাদের উপর থেকে বহু রকমের কর তুলে দেন। আওরঙ্গজেব তাঁর রাজত্বকালের প্রথম দিকে জিজিয়া কর প্রবর্তন করেন নি। এই জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করতে কুড়ি বছর সময় লাগে। এই কর প্রবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ যোগ দেখা যায়।···ফারুকির মতে, মন্দির ধ্বংসের পিছনে সাধারণভাবে কোন আদেশ জারি করা হয় নি।' "ভারতীয় সভ্যতার রূপরেখা" নামক একটি গ্রন্থে আধুনিক গবেষণার ওপর কিছু মূল্য আরোপ করা হয়েছে। শিবাজীর মহত্ত্বকে বিরাট করে দেখাতে গিয়ে আওরঙ্গজেবকে প্রায় "নরাধমে" পরিণত করেছেন অধিকাংশ পাঠ্যগ্রন্থপ্রণেতা। আধুনিক গবেষণায় শিবাজী বহু সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। সতীশচন্দ্র শিবাজীর শাসনব্যবস্থায় কোনো মৌলিকত্ব খুঁজে পান নি। হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা গোব্রাহ্মণ-প্রতিপালক হিসেবে শিবাজীর যে পরিচয় রক্ষণশীল ঐতিহাসিকরা দিয়ে থাকেন সেটি সঠিক নয়, কেননা তাঁর প্রতিবেশী হিন্দু প্রজাবর্গ মারাঠা লুঠতরাজ থেকে রেহাই পায় নি। ফলত, শিবাজীর কল্পিত হিন্দু-রাজ্যের ধারণায় সাধারণ হিন্দু সম্প্রদায় পুলকিত হয় নি। একথা ভাবা ঠিক হবে না যে, শিবাজী একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ; কেননা তাঁর আমলে ভারতে জাতীয়তাবোধের জাগরণ দেখা দেয় নি। উপরন্তু তিনি একজন স্বদেশী সম্রাটের বিরুদ্ধে আপন স্বার্থ রক্ষায় লড়াই করেছিলেন। বিশেষ একটি পাঠ্যপুস্তকে অবশ্য উপরের ব্যাখ্যাটি প্রাধান্য পেয়েছে। আশার কথা, কিছু-কিছু শিক্ষার্থী এইসব সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ পাবে। অনেকেই বলে থাকেন যে, মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজীর সংগ্রাম পরবর্তী কালে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা ছিলেন 'নব্যহিন্দু জাতীয়তাবাদী'। এই জাতীয়তাবাদ ভারতে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের অভ্যুদয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখা দরকার।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ব্রিটিশ রাজত্বের শুরু থেকেই এদেশের মানুষ তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে। হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে কৃষক সমাজ থেকে শুরু করে আদি-বাসী-উপজাতি সম্প্রদায়ের নিষ্পেষিত মানুষ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ প্রকাশ করে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-তক সুদীর্ঘ একশো বছর নানা শ্রেণীর মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করে চলেছিল। নতুন পাঠ্যক্রমে এই অধ্যায়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "সিপাহী বিদ্রোহ" নামে পরিচিত আন্দোলনটি হিন্দু মুসলমানের যৌথ আন্দোলন, তা সাম্প্রতিককালের শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করতে পারবে। বহুস্থানে হিন্দু-মুসলমান কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ স্বেচ্ছায় এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই ছিল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের মূল চালিকা শক্তি। লক্ষ-লক্ষ হিন্দু-মুসলমান এই বিদ্রোহে প্রাণ হারিয়েছিলেন। নবাব ওয়াজেদ আলির শহর অযোধ্যাতে দেড় লক্ষ বিদ্রোহী নিহত হয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তকে ফরাজি আর ওয়াহাবি আন্দোলন সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে। আন্দোলনের চরিত্রবিচারে পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাবর্গ রক্ষণশীল এবং আধুনিক উভয়বিধ মতামত এবং বিশ্লেষণ পেশ করার চেষ্টা করেছেন। ফরাজি এবং ওয়াহাবি আন্দোলনে শুধুমাত্র মুসলমানরাই নয়, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও বিশাল সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকর সাহেবের বিরুদ্ধে বাঙলার কৃষককুল ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গেই ব্রিটিশবিরোধী চরিত্র অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশুদ্ধ ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ঝোঁক থাকলেও ডব্লিউ. সি. স্মিথের মতে, বাঙলার ওয়াহাবি আন্দোলন ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে কৃষকসম্প্রদায়ের এক নিজস্ব আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল ধাক্কাটা ছিল, গ্রামীণ জনসাধারণকে সম্বল করে; ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যাকে সুশোভন সরকার (অমিত সেন) চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছিলেন, 'রেড রিপাবলিকান ইন ক্যারাকটার' ("নোটস অন বেঙ্গল রেনেসাঁ")। দু-একজন পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা এই প্রসঙ্গে রক্ষণশীল মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি উদ্‌ধৃতি দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে-ছেন, '...a movement of the Muslims by the Muslims and for the Muslims'। বিচারবিমুখতা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত এসেছে। স্মর্তব্য যে, ফরাজি আর ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতে সমস্ত কৃষক অভ্যুত্থানের পথপ্রদর্শক। "ভারত ইতিহাসের ধারা" এবং "ভারত পরিচয়" নামক দুটি পাঠ্যপুস্তকে "ফরাজি আন্দোলন"-কে "ফেরাজি আন্দোলন"-রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি সঠিক নয়।

উনিশ-শতকী সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র

উনিশ শতকে বাঙলার সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রটি আলোচিত হয়েছে বটে, কিন্তু প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ প্রকাশ লক্ষ করা যায় নি। উনিশ-শতকী হিন্দুসমাজের সংস্কার আন্দোলন কিভাবে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনে পরিণত হল, 'হিন্দুপ্রীতি' ক্রমে 'হিন্দুত্বপ্রীতি'র ভিতর দিয়ে সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হল, রামমোহন, ইয়ং-বেঙ্গল, বিদ্যাসাগরের উদারতা ও যুক্তিবাদের মানসিক ধারাটি ক্রমে-ক্রমে অস্ত গেল, যুক্তির বদলে এল সনাতন ভক্তি, সংস্কারের বদলে এল কুসংস্কার, উদারতার বদলে এল সংকীর্ণতা, মানবতার বদলে সাম্প্রদায়িকতা, মুসলমানবর্জিত তথাকথিত নবজাগরণ আন্দোলনের প্রায়শ্চিত্ত করা হল চরম প্রতিক্রিয়া-শীল রিভাইভ্যাল আন্দোলনের সূত্রপাত করে; এমন-

কী বিদ্যাবুদ্ধিযুক্তি সব বিসর্জন ও বন্ধক দিয়ে যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদের উত্তরাধিকারীরা গুরু আর অবতারবাদের পাঁকের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লেন (সমাজতাত্ত্বিক বিনয় ঘোষ এইভাবেই বিশ্লেষণটি করেছেন) এমন মূল্যায়নের উল্লেখ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে করা হয় নি।

তথাকথিত "দেশাত্মবোধক" সাহিত্য

ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে "দেশাত্মবোধক" সাহিত্যের সার্বিক অবদানের কথা প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে আবেগসহকারে বর্ণিত হয়েছে। একটি দৃষ্টিনন্দন পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'শ্রীকৃষ্ণের ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "কৃষ্ণচরিত্রে" প্রকাশ করেন। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বভারতীয় রাষ্ট্র গঠনের কথা পরোক্ষভাবে প্রচার করেন। স্বাদেশিকতা ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "আনন্দমঠ"-এ পূর্ণভাবে বিকশিত। "আনন্দমঠে"র 'বন্দেমারতম্'-মন্ত্র ভারতে রাষ্ট্রীভাব প্রবুদ্ধ করে এবং এক অভূতপূর্ব দেশপ্রীতির সঞ্চার ঘটায়। "আনন্দমঠ"-এ বর্ণিত একদল দেশপ্রেমিকের আত্মোৎসর্গের আদর্শ প্রচার করে বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষভাবে বিপ্লবী আদর্শের কথা প্রচার করেন।' এই ধরনের "দেশাত্মবোধক" সাহিত্য সমস্ত শ্রেণী আর ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ করতে তো পারেই নি, উপরন্তু কোনো-কোনো অংশে বিচ্ছিন্ন মানসিকতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। এইসব প্রশ্ন পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাদের ভাবিত করে তোলে নি। স্মরণে রাখা দরকার যে, মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ জাতীয় আন্দোলনের ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক নির্মোহ মূল্যায়ন প্রত্যাশা করেছে। বিভিন্ন ধারায় উত্থিত জাতীয় আন্দোলন, দেশেবিদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ('অরন্ধন', 'বন্দেমারতম্', ধ্বনিসহকারে গঙ্গাস্নান, 'রাখীবন্ধন' ইত্যাকার বিষয় স্মর্তব্য) আর 'সশস্ত্র বিপ্লববাদী' আন্দোলনে 'হিন্দুধর্মভিত্তিক কর্মপন্থা' থাকার ফলে এইসব আন্দোলন মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। এটি অবশ্যই বিশ্লেষণযোগ্য বিষয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমার্থক। তাঁরা 'আর্য আদর্শ' দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হন। বহু চরমপন্থী জাতীয়তাবাদকে হিন্দু পুনরুভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসেবেই মনে করেন। অরবিন্দ ঘোষ ভবানী বা শক্তিমাতার আরাধনা করে মৃত্যুভয় অগ্রাহ্য করার পরামর্শ দিতেন। এঁদের কাছে এই দেশ ছিল 'ভবানীভারতী' বা 'ভারতমাতা'। 'হিন্দু সিমবলস', 'থীমস', 'ইডিয়মস' মুসলমানদের ভীত করে তোলে। স্বভাবতই এই আন্দোলনের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে গান্ধীজীর ভূমিকা অনস্বীকার্য; কিন্তু 'রামরাজত্বের' প্রতি তাঁর অস্বাভাবিক ঝোঁক জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছিল, এটিও স্বীকার্য। খোলাখুলি বলা দরকার, পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতাবর্গ জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর আলোচনা আর মূল্যায়নে চিরাচরিত-রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা চালিত হয়েছেন। উপরন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিভিন্ন জাতিসত্তার ভূমিকাটি অনিরূপিত থেকে গেছে। বিশেষ-সম্প্রদায়ভুক্ত এক উচ্চ-শ্রেণীর ভূমিকা আর আবেদনের কথাই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। এটি কাম্য ছিল না। এই বিষয়ে পর্ষদের নির্দেশ যথেষ্ট পরিষ্কার নয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ ও আলিগড় আন্দোলন

ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে সংস্কার আন্দোলনে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর কার্যকরী ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকসমূহে আলোচিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার ও একজন সমাজসংস্কারক হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

জনৈক ঐতিহাসিকের মতে, রামমোহন রায়কে যদি হিন্দুসমাজের অগ্রগতির অগ্রদূত বলা যায়, তাহলে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ ছিলেন ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের নবজীবনদাতা। ১৮৭৫-এ আলিগড়ে 'মহমেডান অ্যাংলো-ওরিয়েনটাল কলেজ' স্থাপনের জন্য সৈয়দ আহমদ হিন্দু-মুসলিমনির্বিশেষে সকলের কাছ থেকে অর্থসাহায্য লাভ করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতির জন্য যে আন্দোলনটি তিনি পরিচালনা করেছিলেন, তা আধুনিক ইতিহাসে "আলিগড় আন্দোলন" নামে পরিচিত। রাজনৈতিক মতাদর্শে কংগ্রেসবিরোধী হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের একই মঞ্চে সমবেত করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ব্রিটিশ পার্লামেনটে পেশ করার ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। তিনি সব ধর্মের মূলগত ঐক্যে বিশ্বাস করতেন। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি আমরা উদ্ধৃত করতে পারি, 'হিন্দু ও মুসলমান সুন্দরী ভারতের দুইটি চক্ষুর ন্যায়; একটি আঘাত পাইলে অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।' কিন্তু তিনি কোনো-ক্রমেই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে আগ্রহী ছিলেন না, কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপিত হলে মুসলিম স্বার্থ পুরোপুরি উপেক্ষিত হবে। তাঁর এই রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য প্রায় প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা তাঁকে 'দ্বিজাতি-তত্ত্বে'র উদ্ভাবক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। "ভারতের ইতিবৃত্ত" নামক একটি পাঠ্যপুস্তকে অবশ্য বলা হয়েছে, কোনো-কোনো সূত্র থেকে স্যার সৈয়দ আহম্মদের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনা হয়েছে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকে তা মানতে রাজি নন।

মুসলিম রাজনীতির ধারা

ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও মুসলিম রাজনীতির ধারা (১৯২০-৩৪) [পর্ষদ এ প্রসঙ্গে একটি অধ্যায় বরাদ্দ করেছে এবং পরবর্তী কালে লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান গঠনের পটভূমি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থরচয়িতারা মুসলিম রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আর বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসঙ্গটিকে জোরেশোরে তুলে ধরেছেন। এর থেকে ছাত্রমনে এই ধারণা বদ্ধমূল হবে যে ভারতীয় মুসলমানরা মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এবং দেশ-ভাগ তারই অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু কী ধরনের সমাজ-আর্থ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুসলিম রাজনীতির গতিধারা এমন রূপ লাভ করেছিল, তার ব্যাখ্যা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা হয় নি। কিঞ্চিৎ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করা হয়েছে এমন একটি পাঠ্যপুস্তক থেকে একটি উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে, 'মহম্মদ আলি জিন্না যখন সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মুসলিম রাজনীতি গড়ে তুলতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় খ্যাতনামা মুসলিম উর্দু কবি ও দার্শনিক স্যার মহম্মদ ইকবাল (১৮৭৩-১৯৩৮) ইসলামের আদর্শের ভিত্তিতে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি ইসলাম ধর্মের ভিত্তিতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ গঠনের কথা ঘোষণা করেন।' 'মহম্মদ ইকবাল···তাঁর কবিতার মাধ্যমে মুসলিম ও হিন্দু যুব-সমাজে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মতো ইকবালও বিরামহীন কর্মের কথা প্রচার করেন। গতিশীল মনোভাব নিয়ে, বিশ্বকে পরিবর্তন করার ওপর তিনি সবিশেষ গুরুত্ব দেন। বাস্তবে তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। কোনো ধর্মীয় ও সামাজিক তত্ত্বকে বিচারবিশ্লেষণ না করে গ্রহণ করাকে তিনি পাপ বলে মনে করতেন। প্রথম জীবনে তিনি দেশ-প্রেমের বাণী প্রচার করেন, কিন্তু ক্রমে মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবল সমর্থক হয়ে ওঠেন।' 'ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় মুসলিম রাজনীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্না মুসলিম লীগের সভাপতি পদে

নির্বাচিত হন। এখানে মনে রাখা দরকার যে, রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে জিন্না জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের এক প্রবল প্রবক্তা। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি সাম্প্রদায়িক নেতা হিসাবে ভারতের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হন।' বাস্তবে মানবতাবাদী, ধর্মীয় গোঁড়ামি মুক্ত দেশপ্রেমী (স্মর্তব্য, "সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা ··") ইকবাল আর তুখোড় জাতীয়তাবাদী, হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রবলতম প্রবক্তা জিন্না মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবল সমর্থক হয়ে উঠলেন কেন, তার ব্যাখ্যা কি জরুরি ছিল না? আদতে বৃহদংশের মঙ্গলকে সামগ্রিক মঙ্গল হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং ধর্মের বিচারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি তাচ্ছিল্য আর অনীহা তাঁদের এই পথে নিয়ে এসেছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মারফত ভীতি আর সন্ত্রাস সৃষ্টি করে জিন্না 'পাকিস্তান' অর্জন করেন নি। এই বিষয়ে অন্তহীন নতুন গবেষণা বহু ভুল ধারণাকে উৎখাত করে দিয়েছে। 'দ্বিজাতিতত্ত্বের' সমর্থক শুধুমাত্র জিন্না নন, ১৯৩৭ সালে সাভারকারও ঘোষণা করেছিলেন, 'এদেশে প্রধানত দুটি জাতি হিন্দু ও মুসলমান।' সাভারকারের 'হিন্দুরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার প্রচার মুসলমানদের শঙ্কিত করে তোলে। গান্ধীজীও চাইছিলেন 'রাজনীতির অধ্যাত্মীকরণ'। অদ্বিতীয় রণকৌশলনির্ধারক ব্যক্তিত্ব জিন্না এই সুযোগে নিজেকে 'ইসলামের সেবক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইসব তথ্য নয়া প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা দরকার। [দেখুন, জিন্নাচর্চা : নয়া ভাবনা, "চতুরঙ্গ", নভেম্বর, ১৯৮৮]।

কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন

ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শিল্পপতিদের তৎপরতা, ভারতের রেলব্যবস্থা পত্তনের ফলাফল, অর্থনীতি সংক্রান্ত নতুন নীতি, আধুনিক শিল্পে ভারতীয় উদ্যোগহীনতার কারণ এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে পরবর্তী সময়ে দেশীয় উদ্যোগের নতুন সুযোগ এলেও এদেশে শিল্পবিপ্লবের অনুপস্থিতি ইত্যাকার বিষয় আলোচনায় পাঠ্যপুস্তকরচয়িতারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। ১৮৫৮-১৮৮৫ পর্বের কৃষক অসন্তোষ, নীল বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্যের কৃষকবিদ্রোহ সংক্রান্ত আলোচনাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। তবে ১৯২০-১৯৩৬ পর্বে কৃষক আন্দোলনের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ জরুরি ছিল। মালাবারের 'মোপলাবিদ্রোহ' (১৯২১)-কে ধর্মান্ধ মুসলমানদের আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন জনৈক বর্ষীয়ান পাঠ্যপুস্তকপ্রণেতা। এই প্রসঙ্গে বিপ্লবী এম. এন. রায়ের মূল্যায়নটি স্মর্তব্য : 'মোপলারা খুবই দরিদ্র। কৃষিই তাদের প্রধান জীবিকা। তারা সব সময় মহাজনদের হাতে নিপীড়িত হয়েছে যে মহাজনরা হল হিন্দু। দেশের ঐ বৃহৎ অঞ্চলের বৃহৎ ভূস্বামীদের অধিকাংশও হল হিন্দু। এই ··বিদ্রোহ হল সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে।' (M. N. Roy, India in Transition, p. 88)। এই পর্বে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহযোগী জমিদারশ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজ বারেবারে বিদ্রোহ করেছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছে কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ব্যাপক কোনো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে নি। কৃষকসমাজের সমস্যার প্রতিও দৃষ্টি দেয় নি। বস্তুত সমাজতন্ত্রবাদীরা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অল ইনডিয়া কিষাণসভা' প্রতিষ্ঠার মারফত কৃষকসমাজকে জাতীয় আন্দোলনের শরিক করে তোলে। স্বীকার্য যে দু-একটি পাঠ্যপুস্তক বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। '১৯২০ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত ভারতের শ্রমিক আন্দোলন' সম্পর্কিত অধ্যায়টি পাঠ্যগ্রন্থে চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিপানচন্দ্রের মতে, 'ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে শ্রমিক-দরদী ও ভারতীয় পুঁজিপতিদের ক্ষেত্রে শ্রমিক-বিরোধী এই পরস্পরবিরোধী

ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।' গান্ধীজী শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি এটিও জানতেন যে জওহরলাল নেহরুও শেষ পর্যন্ত শ্রেণীসংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলোতে কমিউনিস্টপার্টির অবদানের বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে। এই সুবাদেই এম. এন. রায়, পি. সি. যোশী, এস. এ. ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমদ, গোলাম হোসেন (লাহোর), এস. এস. সিরাজকার, শওকত ওসমানী, নলিনী গুপ্ত প্রমুখের নাম ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছে।

স্বাধীনতাসংগ্রামের শেষ পর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা এইভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, তিনি ভারত তথা এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে রচনা করেছিলেন সম্ভাবনাপূর্ণ এক নতুন অধ্যায়।

তথ্যগত ত্রুটি

আলোচনাশেষে সংশোধনযোগ্য দুটো তথ্যগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। ড. নিমাইসাধন বসু প্রণীত 'ভারত ইতিহাসের ধারা' নামক গ্রন্থে লেখা হয়েছে, 'এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমে আরবের মক্কা নগরীতে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের জন্ম হয় ৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সময়ে।' (পৃ ৯৯)। ইংরিজি ক্যালেণ্ডারে জন্মসাল ও তারিখ হল ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল। এটি তর্কাতীত সত্য। 'কোনো এক সময়ে'—এইরকম সন্দেহের কোনো ঐতিহাসিক কারণ নেই। 'ভারতের ইতিবৃত্ত' (কল্যাণ চৌধুরী) নামক গ্রন্থে মওলানা আবুল কালাম আজাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তিনি কায়রোতে অবস্থিত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-সমাপ্তির পরে স্থায়িভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে চলে আসেন।' (পৃ ১৪৬)। বস্তুত মওলানা আজাদ কস্মিনকালেও আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না। (দেখুন, "ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম', পৃ ৬, জানুয়ারি ১৯৫৯)। অসাধারণ এই গ্রন্থটি বেরুবার এত বছর বাদে এই ধরনের ভুল কাম্য নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. অমলেশ ত্রিপাঠী একটি বহুলপ্রচলিত সাপ্তাহিকে "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেস" নামক ধারাবাহিক রচনায় একই ভুল করেছেন। বিস্ময়ের কথা, সূত্র হিসেবে তিনি 'ইণ্ডিয়া উইনস ফ্রীডম'-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

উপসংহার

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যেতে পারে যে, ভারতের ইতিহাস আলোচনায় পাঠ্য-পুস্তক প্রণেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, ১. রক্ষণশীল বা সনাতনবাদী ধারা, ২. আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ধারা। স্পর্শকাতর বিষয়গুলোতে সনাতনবাদী ধারা কিঞ্চিৎ প্রাধান্য পেয়েছে। কিছু-কিছু ক্ষেত্রে রক্ষণশীল আর আধুনিক ধারার সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে সিদ্ধান্তে বৈপরীত্য এসেছে। ফলত, শিক্ষার্থীদের জটিলতায় ভোগার সম্ভাবনা পুরোদস্তুর রয়েছে। আশা করা যেতে পারে, আগামীতে পাঠ্য-পুস্তকের পরিমার্জিত সংস্করণগুলো দুর্বলতামুক্ত হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে এটিও ভেবে রাখা জরুরি যে ভারতীয় ইতিহাসের নির্মোহ মূল্যায়ন ব্যতিরেকে জাতীয় জীবনে সম্প্রতি ও সংহতি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হবে।

উলকি

তানিজাকি জুনিচিরো

অনুবাদ : সুপ্রিয়া দাশগুপ্ত

এই ঘটনাগুলো ঘটেছে সেই স্বর্ণযুগে, যখন চাপল্য, রঙ্গরস এক উন্নত ধরনের শিল্প বলে সমাদৃত হত। সে যুগে তখন একালের জীবনধারণের নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বও ছিল না। নীলরক্ত যুবক এবং জমিদার-পুত্রদের প্রফুল্ল আনন সর্বদাই নির্মেঘ ছিল। রাজদরবারে সম্ভ্রান্ত যুবতী আর বিখ্যাত গণিকাদের মুখে ছিল অম্লান হাসি। চা-খানার পেশাদার ভাঁড়দের রঙ্গকৌতুক যোগানোর কাজকে বেশ সম্মানের চক্ষেই দেখা হত। জীবনটা ছিল শান্ত। আনন্দের খোরাক ছিল প্রচুর। সে যুগের রঙ্গমঞ্চে, এমনকী সাহিত্যেও, সৌন্দর্যের সঙ্গে শক্তির সংযোগ অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখানো হত। দৈহিক সৌন্দর্য জীবনের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে ধরা হত তখন। দেহের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্য লোকে নিজের শরীর উলকি দিয়ে চর্চিত করার চরম পদ্ধতি ব্যবহার করত। তখনকার মানুষের শরীরে বর্ণাঢ্য সূক্ষ্ম রেখাচিত্র নাচের ছন্দে উন্মোচিত হত। গণিকালয়ে যাবার জন্য সেকালের বিত্তবানেরা এমন সব পালকি-বেহারাদের বেছে নিতেন যাদের শরীর সুদৃশ্য উলকিতে চিত্রিত। যোসিওয়ারা আর তাতসুমির বারবধূরা কেবল সেইসব গর্বিত পুরুষদেরই বাহুবন্ধনে ধরা দিত যাদের শরীর সুচারু উলকিতে কারুকার্য করা। সামান্য কর্মচারী থেকে বণিক, জুয়াড়ি, এমনকী সামুরাইরা পর্যন্ত এই উলকির কারুকার্যের সাহায্য নিতে পিছপা হতেন না। প্রায়ই উলকির প্রদর্শনী হত। যাঁরা এতে যোগ দিতেন, তাঁরা পরস্পরের শরীরে আঁকা উলকি-চিহ্ন স্পর্শ করে নকশার নিন্দা অথবা প্রশংসা করতেন।

সে সময়ে অসামান্য প্রতিভাবান এক যুবক উলকিকার ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে নিজের শরীরে উলকি নেওয়া বিলক্ষণ কেতাদুরস্ত চালিয়াতির ব্যাপার ছিল। তাঁর খ্যাতি পুরানো গুণী উলকিকার, যেমন 'আসাকুমা', 'চরিবার্ন' অথবা মাতসুমাতোর 'ইয়াকোহেই', এদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর শিল্পকলা যে-কোনো উলকি প্রদর্শনীতে বিশেষ সম্মানিত হত। কারুকার 'দারুসাকিন' তাঁর সূক্ষ্ম অঙ্কনপদ্ধতির জন্য সুখ্যাত ছিলেন এবং 'কারাকুমা যোশিবা' বিখ্যাত ছিলেন তাঁর সিঁদুরে উলকির জন্য। এই যুবক সেইকিচি তাঁর কারুকার্যের অভিনবত্ব এবং ইন্দ্রিয়চেতনার জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন।

সেইকিচি পূর্বে 'টয়কুনি' এবং 'কুমিসাড়া' ঘরানার শিল্পী হিসাবে সেই রীতি অনুসারে ছবি এঁকে নাম করেছিলেন। শিল্পী থেকে উলকিকার হওয়া—এক ধাপ নেমে আসা। তা সত্ত্বেও তিনি সত্য-সত্যই শিল্পী মেজাজের স্পর্শকাতরতা অটুট রেখেছিলেন। যাঁদের গায়ের চামড়া আর শরীরের গড়ন তাঁর পছন্দ হত না তিনি কখনো সেইসব লোকেদের শরীরে উলকি আঁকতে রাজি হতেন না। যেসব মক্কেলদের তাঁর কাছে আসবার সৌভাগ্য হত, তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সেইকিচির নিজের পছন্দমতো উলকি নিতে বাধ্য হতেন। তা ছাড়া, তাঁদের মাসাধিক কাল তাঁর ছুঁচের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে হত।

এই নবীন উলকি-আঁকিয়ের মনের গভীরে ছিল বিস্ময়কর কামনা-চরিতার্থতার উত্তেজনা। তাঁর ছুঁচের খোঁচায় তাঁর মক্কেলদের শরীর ফুলে উঠে গাঢ় লাল রঙ চুঁয়ে-চুঁয়ে পড়ত, আর বেচারিরা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করে উঠতেন। যতই তাঁদের আর্তনাদ বেড়ে যেত, শিল্পীর মন ততই এক অদ্ভুত উল্লাসে ভরে উঠত। তিনি সিঁদুরে-রঙ উলকি করতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করতেন। কারণ এই সিঁদুরে-উলকি শরীরে আঁকা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তাঁর মক্কেলরা পাঁচশ থেকে সাতশ ছুঁচের খোঁচা শরীরে নিয়ে উলকির রঙের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্য ফুটন্ত জলে স্নান করে প্রায়শই তাঁর পায়ের কাছে অর্ধমূর্ছিত হয়ে পড়তেন। সেইকিচি তখন তৃপ্ত হাসি হেসে বলতেন, 'উলকি তাহলে বেশ যন্ত্রণা দেয়, কী বলেন?'

যখন কোনো ভীতু খদ্দেরের দাঁতে-দাঁত লেগে যেত, অথবা সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠত, সেইকিচি বলে উঠতেন, 'আমি সত্যিই ভাবছিলাম আপনি কিয়োটোর অধিবাসী, কারণ তারা সাহসের জন্য বিখ্যাত। একটু ধৈর্য ধারণ করুন, আমার ছুঁচের খোঁচা ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক।' তারপর চোখের কোণ দিয়ে সেই চোখের জলে ভেজা মুখের দিকে চেয়ে নিরুদ্বিগ্ন মনে নিজের কাজ করে যেতেন। আর যদি তাঁর মক্কেল এই সুতীব্র যন্ত্রণায় অবিচলিত থাকতেন, তবে তিনি বলে উঠতেন, 'ওঃ, আপনার চেহারা যা বলে তার চেয়ে আপনি তো দেখছি অনেক সাহসী। আচ্ছা, একটু অপেক্ষা করুন, এরপর যা তীব্র যন্ত্রণা শুরু হবে, তা আপনি নীরবে সহ্য করতে পারবেনই না।' তারপর তিনি তাঁর সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে উঠতেন।

বহু বছর ধরে সেইকিচির মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তাঁর নিপুণ ছুঁচের মুখে যেন এক পরমা সুন্দরী কন্যার উজ্জ্বল কমনীয় দেহ উন্মোচিত হয়। তাঁর এই মানসী নারীকে বহু গুণের অধিকারী হতে হবে। কেবল সুন্দর মুখ আর মসৃণ চামড়া হলেই চলবে না। তিনি বৃথাই রূপোপজীবিনী মহলে তাঁর মানসীকে খুঁজে এসেছেন। এই মানসী-প্রতিমা তাঁর মনে সর্বদাই জাগ্রত রয়েছে। সেইকিচির এই অন্বেষণ গত তিন বছর ধরে চলেছে। তাঁর আকাঙ্ক্ষার উন্মত্ততা দিনে-দিনে বেড়েই চলেছে। একদিন গ্রীষ্ম-সন্ধ্যায় ফুকাগাওয়া প্রদেশে পায়ে হেঁটে বেড়াতে-বেড়াতে তিনি দেখলেন—শ্বেতমর্মরের মতো উজ্জ্বল, মসৃণ, শুভ্র পদযুগল পালকির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। মুখের মতো পা-ও অনেক ভাব ব্যক্ত করতে পারে, এবং সেই সুগোল পদযুগল সেইকিচির কাছে মহার্ঘ্য রত্নের মতো মনে হল। কন্যার অপরূপ গড়নের পায়ের আঙুল, বর্ণ-বিকাশী নখশোভা, সুগোল গোড়ালি আর ত্বক এমনি ভাস্বর, যেন মনে হয় কতকাল এক স্বচ্ছ পাহাড়ি নদীর জলে ধৌত হয়ে এসেছে। এইসব মিলিয়ে সেই নিখুঁত সৌন্দর্যময় পা-দুখানি সৃষ্টি হয়েছে যেন পুরুষের হৃদয়কে চঞ্চল অস্থির ক'রে, সেই হৃদয় নির্মমভাবে পদদলিত করে যাবার জন্যই।

সেইকিচি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলেন—এই-ই তাঁর মানসী রমণী, যাঁকে তিনি এতকাল ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আনন্দিত মনে তিনি সেই পালকিটিকে অনুসরণ করলেন—যদি এক লহমার জন্যেও পালকি আরোহিণীর মুখখানি দেখা যায়। বেশ কয়েকটি অলিগলি পালকির পিছন-পিছন চললেন। এরপর এক মোড় নেবার সময় পালকিটি আর খুঁজে পেলেন না। এরপর থেকেই সেইকিচির মনের সেই অস্পষ্ট কামনা পরিণত হল তীব্র আসঙ্গলিপ্সায়।

দীর্ঘ এক বছর পরে ফুকাগাওয়া প্রদেশে সেইকিচির বাড়িতে এক আগন্তুক এলেন। তিনি বললেন,

সেইকিচির এক বান্ধবী, তাতসুমি অঞ্চলের এক গেইসা তাকে পাঠিয়েছেন। ভীরুস্বরে মেয়েটি বলল, 'মহাশয়, আমার কর্ত্রীঠাকুরানি নিজহাতে আপনাকে এই অঙ্গবস্ত্র দিতে আজ্ঞা করেছেন। তাঁর অনুরোধ —আপনি যেন দয়া করে বস্ত্রটির আস্তরণে নকশা এঁকে দেন।' মেয়েটি তারপর সেইকিচির হাতে একটি চিঠি এবং একখানি রমণীয় পরিধেয় বস্ত্র দিল। পোশাকটি অভিনেতা ইওয়াই টোজাকুর ছবি-আঁকা কাগজে জড়ানো ছিল। চিঠিতে সেইকিচির বান্ধবী জানিয়েছেন—তরুণীটি তাঁর পালিতা। এই প্রথম রাজধানীর চা-খানার গেইসা রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। সেইকিচি যেন তরুণীকে যথাসাধ্য সাহায্য করে।

সেইকিচি মেয়েটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ করলেন। যদিও মেয়েটি বয়সে ষোড়শী কি সপ্তদশী হবে, কিন্তু তার মুখে যেন আশ্চর্য পরিপূর্ণতার ঐশ্বর্য। তাঁর চোখে সব সৌন্দর্যবান পুরুষের আর সব রূপবতী নারীর অলক্ষ্য স্বপ্নের ছায়া। এইসব পুরুষ বা নারী যে নগরে বাস করে, সেখানে পাপপুণ্য একাকার হয়ে একই লক্ষ্যবিন্দুর উদ্দেশ্যে চলেছে। তারপর সেইকিচির দৃষ্টি পড়ল কন্যার কোমল সুষম পা দুখানির দিকে, যা এখন সুদৃশ্য খড়ের পাদুকায় মোড়া।

সেইকিচি বিস্ময়ে বললেন, 'তুমিই কি গত বছর "হিরাসেই" চা-খানা থেকে পালকি করে ফিরছিলে?'

মেয়েটি এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে হেসে বলে, 'হ্যাঁ, আমিই সেই মেয়ে। তখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন। তিনিই আমাকে মাঝে-মাঝে "হিরাসেই" চা-খানায় নিয়ে যেতেন।'

সেইকিচি বললেন, 'আমি তোমার জন্য পাঁচবছর অপেক্ষা করছি। এই প্রথম আমি তোমার মুখ দেখলাম। কিন্তু তোমার পা দুখানি আমি চিনি। একটা জিনিস আমি তোমাকে দেখাতে চাই, দয়া করে ভেতরে এসো, ভয় পেয়ো না।' এই বলে তিনি অনিচ্ছুক তরুণীর হাত ধরে তাকে দোতলার এক ঘরে নিয়ে এলেন। সেই ঘর থেকে বিশাল নদী দেখা যায়। সেইকিচি দুখানি গোটানো পট এনে একখানি মেয়েটির সামনে খুলে ধরলেন।

ছবিখানি হচ্ছে অতীত যুগের চীনে সম্রাট 'নিষ্ঠুর চৌ'-এর প্রিয়তমা মহিষীর চিত্র। অলস ভঙ্গিমায় রানী 'মেসি' সিঁড়ির থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নীচে বাগানের-দিকে-নেমে-যাওয়া সিঁড়ির ধাপে-ধাপে তাঁর জমকালো কিংখাব ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর ছোটো মাথাটি গাঢ় নীল পাথর আর প্রবালখচিত মুকুটের ভার সইবার পক্ষে অতি সুকুমার। তাঁর ডান হাতে ঈষৎ নোয়ানো পেয়ালা, তিনি আলস্যভরে নীচের বাগানে আনীত এক বন্দীকে লক্ষ করছেন। খুঁটির সঙ্গে হাত-পা শক্ত করে বাঁধা কয়েদির চোখ বোজা, মাথা নত। এই দৃশ্যের চিত্র সাধারণত অমার্জিত আর অসংস্কৃতই হয়। কিন্তু এখানে রাজমহিষী এবং হতভাগ্য বধ্যের মনোভাব এত কৌশলে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে এই চিত্র অপরূপ এবং পরিপূর্ণ।

মেয়েটি স্থিরদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ এই অদ্ভুত চিত্রটির দিকে তাকিয়ে রইল। তরুণীর চেহারায় ধীরে-ধীরে সেই অতীত যুগের চীনের রাজরানীর সাদৃশ্য ফুটে উঠল।

মেয়েটি তার ম্লান কপোলে হাত রেখে বলল, 'কেন আপনি আমাকে এই বীভৎস চিত্র দেখালেন?'

সেইকিচি বললেন, 'ছবিতে যে রমণীকে আঁকা হয়েছে, সে তুমিই। তারই রক্ত তোমার ধমনীতে প্রবাহিত।'

তিনি তখন আরো একটি গোটানো চিত্র খুলে ধরলেন। এই চিত্রের নাম "বলি"। ছবির মধ্য-

দেশে চেরিগাছে হেলান দিয়ে এক যুবতী, আর তার পায়ের নীচে কয়েকটি পুরুষের শবদেহ পড়ে আছে। মেয়েটির রক্তহীন শ্বেত-আননে অহংকার এবং তৃপ্তির বিচিত্র সমন্বয়। শায়িত শবদেহগুলির উপর কয়েকটি ছোটো-ছোটো পাখি আনন্দে কিচমিচ করে খেলে বেড়াচ্ছে। বলা মুশকিল, শিল্পী ছবিতে কী দেখাতে চেয়েছেন—বসন্তের দিনের কুঞ্জকানন, না যুদ্ধক্ষেত্র? এই ছবির মেয়েটির সঙ্গে তাঁর অতিথির আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ করে সেইকিচি বললেন, 'এই তোমার ভবিষ্যতের প্রতীক। এই যে শায়িত পুরুষেরা, এরা তারাই—যারা তোমার জন্য প্রাণ দেবে।'

'দয়া করে চিত্রটি সরিয়ে ফেলুন'—সেই ভয়াল আকর্ষণের কাছ থেকে পালাবার জন্যই তরুণী পিছন ফিরে মাদুরের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তার সমগ্র শরীর শিউরে-শিউরে উঠল। ঠোঁট কাঁপতে লাগল। সে বলল, 'আমি স্বীকার করছি—আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, আমার মনের গোপনে এই রমণীর স্বভাবই নিদ্রিত রয়েছে। আমার প্রতি দয়া করুন, চিত্রটিকে শীঘ্র সরিয়ে ফেলুন।' উলকিকার বলল, 'ভীরুর মতো কথা বোলো না, বরং চিত্রটি তুমি ভালো করে নিরীক্ষণ করো। আরো যত্নসহকারে দেখো, তাহলে তুমি আর ভয় পাবে না।'

তরুণী কিন্তু কিছুতেই তার কিমনোর আস্তিনে ঢাকা মুখ খুলতে পারে না। সে মাটিতে মাদুরের ওপর লম্বা হয়ে শুয়েই রইল। আর বার-বার বলতে লাগল, 'আমায় বাড়ি ফিরে যেতে অনুমতি দিন, আপনার সান্নিধ্যে থাকতে আমার ভয় করছে।'

সেইকিচি রাজকীয় মেজাজে বললেন, 'তোমায় আরো কিছুক্ষণ থাকতে হবে। তোমাকে পরমা-সুন্দরী করবার ক্ষমতা আমারই হাতে।'

তারপর দেরাজের টানার ভেতর থেকে ওষুধের বোতল এবং ইনজেকশানের ছুঁচগুলোর মধ্য থেকে এক কড়া ঘুমের ওষুধ বেছে নিলেন।

নদীর ওপর সূর্য উজ্জ্বল হল আর রশ্মি সোনালি ঢেউয়ের মতো দরজার ওপর আর ঘুমন্ত তরুণীর মুখের ওপর খেলা করতে লাগল। সেইকিচি দরজা বন্ধ করে মেয়েটির পাশে বসলেন। এই প্রথম তিনি রমণীর আশ্চর্য সৌন্দর্যসুধা সম্পূর্ণ আস্বাদ করতে পারলেন। তাঁর মনে হল—তিনি বছরের পর বছর এই অচঞ্চল সৌন্দর্যপ্রতিমার নিখুঁত মুখখানি নিরীক্ষণ করতে পারেন।

কিন্তু অল্প সময় পার হতেই তাঁর প্রিয় নকশা শুরু করবার ইচ্ছা তাঁকে উত্তেজিত করে তুলল। সেইকিচি তাঁর উলকি আঁকবার সরনজাম জড়ো করে তরুণীর দেহ-আচ্ছাদন মুক্ত করে তুলিকা নিয়ে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। ডান হাতে তীক্ষ্ণধার সূচিকা নিয়ে তিনি আঁকা নকশা ধরে ফুটিয়ে যেতে লাগলেন। একদা মেমফিসবাসীরা যেমন পিরামিড আর স্ফিংস নির্মাণ করে সৌন্দর্যময় মিশরকে আরো সুশোভিত করেছিলেন, সেইকিচিও তেমনি মেয়েটির চিকন শুভ্র ত্বক তাঁর উলকি-কারুকার্য দিয়ে আরো অলংকৃত করে তুলছিলেন।

উলকিকারের আত্মা যেন সুদৃশ্য নকশার ভেতর প্রবেশ করছিল। আর তাঁর রক্তসূচিকার প্রত্যেকটি ফোঁড় যেন সেইকিচির নিজের শরীরের বিন্দু-বিন্দু রক্ত— যা তরুণীর শরীরে প্রবেশ করছে।

তাঁর সময়জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। দ্বিপ্রহর এল, গেল। ধীরে শান্ত বসন্তের দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা গাঢ় হল। সেইকিচির অক্লান্ত হাতখানি মেয়েটিকে একবারও না জাগিয়ে উলকির ফোঁড় তুলে যেতে লাগল। ক্রমে চাঁদ উঠল। তার স্বপ্নালু আলো বাড়ির ছাদে, নদীর ধারে বিস্তৃত হল। উলকির

অর্ধেকও এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। সেইকিচি কাজ থামিয়ে আলো জ্বালালেন, তারপর আবার ছুঁচ নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন।

এখন প্রত্যেকটি সূচিকামতো তাঁকে পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আঁকিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। যেন প্রতিটি সূচিকা তাঁকেই বিঁধছে। ধীরে-ধীরে এক বিরাট মাকড়শার প্রতিচ্ছবি দেখা গেল। প্রথম প্রভাতের আবছা আলো সেই ঘরে যখনি প্রবেশ করল, তখনি দানবীয় আকৃতির এক জন্তু আট পা নিয়ে মেয়েটির অনাবৃত পিঠে ফুটে উঠল।

বসন্তের রাত্রি প্রায় শেষ। এখনি নদীতে নৌকোর দাঁড়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মাছধরা নৌকোর পাল ভোরের হাওয়াতে ফুলে-ফুলে উঠছে। অবশেষে সেইকিচি তাঁর উলকির ছুঁচ সরিয়ে রাখলেন। একটু সরে দাঁড়িয়ে তিনি তরুণীর পিঠে উলকি-তোলা বিরাট মাদি মাকড়শার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাকিয়ে-তাকিয়ে উপলব্ধি করলেন—উলকির মধ্যেই তাঁর প্রাণনির্যাস। এই কাজ শেষ করবার পর সেইকিচি নিজের অন্তরে গভীর শূন্যতা অনুভব করলেন।

তিনি মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমায় অসীম সৌন্দর্য দান করবার জন্য আমি আমার আত্মা এই উলকির মধ্যে সমর্পণ করেছি—জান! এখন থেকে সমগ্র জাপানে তোমার রূপের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সাধ্য আর কোনো রমণীর থাকবে না। সংশয়, দ্বিধা আর তোমাকে স্পর্শ করবে না। সমস্ত পুরুষজাতি এবার তোমার বলি।'

মেয়েটি কি তাঁর কথা শুনতে পেল? মৃদু কাতরোক্তি শোনা গেল, তরুণীর শরীর নড়ে উঠল। ক্রমে-ক্রমে মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসছিল। তরুণী ঘন-ঘন নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে-সঙ্গে তার পিঠে আঁকা মাকড়শার পাগুলি যেন জীবন্ত হয়ে উঠছিল।

সেইকিচি বললেন, 'তোমার নিশ্চয় খুব কষ্ট হচ্ছে। কারণ মাকড়শাটি তোমাকে ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে বেঁধেছে।'

মেয়েটির চোখ আরো উন্মুক্ত হল। প্রথমে সে দৃষ্টিশূন্য, তারপর তার চোখের তারা জ্বলতে লাগল—সেইকিচি মুখের ওপর পড়া চাঁদের আলোর মতো।

মেয়েটি বলে, 'আমায় পিঠের উলকি দেখতে দিন, আপনি যদি আপনার আত্মা আমায় দিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমি সৌন্দর্য লাভ করেছি।'

সে যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছে, অথচ তার স্বরে আত্মপ্রত্যয় আর শক্তির আভাস।

সেইকিচি অত্যন্ত উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বরে বললেন, 'উলকির রঙ আরো উজ্জ্বল করবার জন্য প্রথমে উত্তপ্ত জলে স্নান করে নাও। এ অতি বেদনাদায়ক, তবু সাহস করে করো।'

মেয়েটি বলল, 'সৌন্দর্য লাভ করবার জন্য আমি সব কিছুই সহ্য করতে পারি।'

মেয়েটি কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে সেইকিচিকে অনুসরণ করে স্নানের ঘরে প্রবেশ করল। ফুটন্ত জলে অবগাহন করে যন্ত্রণায় তার চোখ ছলছল করে ওঠে। সে আর্তনাদ করে বলে, 'ওঃ, কী জ্বালা! দয়া করে আপনি স্নানঘর ত্যাগ করে ওপরে চলে যান। আমি তৈরি হয়ে আপনার কাছে যাব। আমার যন্ত্রণার দর্শক আমি চাই না।'

গরম জলের টব থেকে নঠবার পর তরুণী নিজেকে তোয়ালে দিয়ে শুষ্ক করবার ক্ষমতাও আর থাকে না। তবু সে সেইকিচির সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে-আসা হাত সজোরে সরিয়ে দিয়ে মেঝের

ওপর গড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে, লম্বা চুল মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। তরুণীর পশ্চাতের দর্পণে তার বর্ণালি শুক্তির মতো পদনখের ছায়া পড়ছিল।

সেইকিচি ওপরে চলে গিয়ে মেয়েটির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে যখন তরুণী উপস্থিত হল, তখন সে সযত্নে পোশাক পরেছে। তার ভিজে চুল আঁচড়ানো, কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। মেয়েটি কোমল ওষ্ঠ আর বঙ্কিম ভ্রূযুগল তার কঠিন যন্ত্রণার কোনো সাক্ষ্যই দিচ্ছে না। সে যখন নদীর দিকে তাকিয়ে রইল, তার চোখে তখন শীতল কঠিন দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছিল। বয়সে তরুণী হলেও তার আকৃতিতে ফুটে উঠল—চা-খানার এক অভিজ্ঞ গণিকার ভাব, যে বহু পুরুষকে জয় করেছে জীবনে।

পূর্বদিনের ভীরু বালিকার এই পরিবর্তন সেইকিচি বিস্ময়ে অনুধাবন করলেন। তারপর তিনি পাশের ঘরে গিয়ে গোটানো চিত্র দুটি এনে বললেন—'আমি তোমায় এই ছবি দুটি দিলাম, উলকিও তোমার, আমি তোমায় দিলাম।'

মেয়েটি বলে, 'নমস্য, আমার মনে ভয়ের লেশমাত্র নেই, আর আপনিই আমার প্রথম বলি।'

এই বলে তরুণী ধারালো তলোয়ারের ফলার মতো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিল্পীর দিকে তাকায়। এ সেই রাজরানী আর চেরিগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো রমণীর দৃষ্টি। জয়ের আনন্দে সেইকিচি শিহরিত হন, বলেন, 'তোমার উলকি আমাকে দেখাও।'

একটিও কথা না বলে মেয়েটি ঘাড় কাত করে সম্মতি জানায়। তারপর ধীরে পোশাক খুলে ফেলে। সকালের সূর্য মেয়েটির পিঠে এসে পড়ে, তার সোনালি আলোয় বিরাট মাকড়শা আগুনের মতো জ্বলতে থাকে।

লেখকের পরিচয় ঃ জুনিচিরো তানিজাকি ১৮৮৬ সালে জাপানে টোকিয়ো শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানি সাহিত্যের স্নাতক ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁর লেখায় বোদলেয়ার, তথা অসকার ওয়াইলড প্রমুখ ইউরোপীয় লেখকদের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

১৯২৩-এর ভূমিকম্পে যখন টোকিয়ো শহর প্রায় বিধ্বস্ত, তখন তিনি প্রাচীন জাপানি সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র কিয়োটো শহরে বাস করতে শুরু করেন। এই সময় থেকেই তাঁর লেখায় পরিবর্তন দেখা যায়। কিয়োটো শহরের পুরনো ঐতিহ্য তাঁকে মুগ্ধ করে; তিনি অতীতের জাপানি সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর মহৎ রচনাগুলি এই সময়েরই সৃষ্টি।

১৯৩০ সালে তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশিত হয়,—তিনি মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে তাঁকে সাহিত্যে রাজকীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

অস্বাভাবিকতার প্রতি সর্বগ্রাসী দুর্নিবার আকর্ষণ প্রায়ই তাঁর চরিত্রগুলিকে মানসিক বিকারের দরজায় পৌঁছে দেয়।

দৃষ্টিহীন নায়ক-নায়িকাদেরও তাঁর রচনায় বারে-বারে দেখতে পাওয়া যায়। মনে হয়, প্রেম এবং অন্ধকারের প্রতি তীব্র অনুভূতি তাঁর রচনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

"নিউ ইয়র্ক হেরালড ট্রিবিউন" পত্রিকায় তাঁর রচনা সম্বন্ধে বলা হয়েছিল : 'যদি কোনো জাপানি লেখক নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হন, তবে তানিজাকি তা পাবার সবচাইতে উপযুক্ত।'

তানিজাকি অবশ্য নোবেল পুরস্কার পান নি। অপর এক সার্থক জাপানি সাহিত্যিক ইয়াসুনারি কাওয়াওতা এই সম্মান লাভ করেন।

অল্প কয়েক বছর আগে তানিজাকির মৃত্যু হয়েছে।

মতামত

১

আপনাদের অভিজাত পত্রিকার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাটি লেখক-পাঠক সকলেরই অভিনন্দনযোগ্য। ভাষা-প্রয়োগ সম্পর্কে সকলকেই সচেতন ক'রে দিচ্ছেন ছোট-ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা-সঙ্কট তুলে ধরে। ৪৯ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় উদ্ধৃতিচিহ্নের ব্যবহার, বাঙলা বাংলা, সঙ্গে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এইরকম আরও কটির কথাই আপনাদের জানাই।

ও এবং আর, বা অথবা কিংবা, কিন্তু, অথচ—এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সকলেরই একটি নীতির অনুসরণ করা উচিত। দুটি শব্দযোজক হিসেবে 'ও'-কার দুটি বাক্যযোজকরূপে 'এবং' নির্দিষ্ট হওয়া সমীচীন। যেমন—এই বনে বাঘ 'ও' শিয়াল থাকে। এই বনে বাঘ থাকে 'এবং' শিয়াল থাকে। দুইয়ের মাঝে 'ও' থাকবে; কারো গাঁ ঘেঁষে নয়, ছাড়াছাড়িভাবে। গাঁ ঘেঁষে 'ও' বসবে ইংরিজি অল্‌সো বা টু-র সমার্থক প্রয়োগের ক্ষেত্রে। যেমন—আমি যাব, তুমিও যাবে। কিন্তু 'আর' ও-এবং দুইয়ের বদলেই বসতে পারে। যেমন—এই বনে বাঘ আর শিয়াল থাকে। এই বনে বাঘ থাকে আর শিয়াল থাকে। এমনি 'বা' 'অথবা'-র প্রয়োগেও ভিন্নতা থাকা চাই। বিকল্প বোঝাতে সমার্থক শব্দদ্বয়ের মাঝে 'বা' এবং ভিন্নার্থক শব্দদ্বয়ের মাঝে 'অথবা' ব্যবহার করা দরকার। যথা—ধ্বাঙ্ক্ষ 'বা' কাক (ধ্বাঙ্ক্ষ অর্থাৎ কাক); গোরু 'অথবা' ঘোড়া (গোরু কিংবা ঘোড়া)। 'কিন্তু' 'অথচ'-র প্রয়োগেও শৈথিল্য দেখা যায়। কাঁচা কিন্তু মিঠা। এস্থলে কাঁচা 'অথচ' মিঠা লেখাই সমীচীন। 'অথচ' শব্দসংযোজক এবং 'কিন্তু' বাক্যসংযোজক গণ্য করাই উচিত। যেমন—কাঁচামিঠা আম কাঁচা খেতে ভালো; 'কিন্তু' পাকা খেতে ভালো নয়।

খবরের কাগজে দেখি স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতির উদ্দেশ্যে, অসবর্ণ বিবাহ অস্ববর্ণ বিবাহ। কোন্‌টা ঠিক? 'স্মৃতির উদ্দেশে' সঠিক প্রয়োগ। তু বাহিরায় যবে নদী সাগর উদ্দেশে। বর্ণ যখন জাতি অর্থাৎ স্পিসিজ তখন বানান সবর্ণ। যেমন বিড়াল বাঘের সবর্ণ। চতুর্বর্ণের এক বর্ণ অন্তর্গত যারা তারা পরস্পর সবর্ণ। কিন্তু সঙ্কর বর্ণের ক্ষেত্রে কী হবে? বর্ণ তখন জাত অর্থাৎ কাস্ট বোঝায়। সে ক্ষেত্রে বানান স্ববর্ণ (স্বজাতি) হওয়া উচিত। নেশন অর্থে জাতি ব্যবহার করলে স্বজাতির অর্থ কমপ্যাট্রিয়ট বোঝাবে।

এই মুহূর্তে স্মৃতির ওপর নির্ভর করে এই তালিকা আর বাড়ানো গেল না।

পুনশ্চ :—অ্যাভিনউ না এভিনিউ। একারের দুই উচ্চারণ স্বীকৃত। তবে আর অবৈজ্ঞানিক অ্যা আশ্রয় করা কেন। ৎ ত দুটি স্থলে কেবল ত লেখাই উচিত। এতে করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানান ভুলও এড়ানো যাবে। যেমন—উচিৎ। কোলকাতা না কলকাতা? কলিকাতায় কো নেই কাজেই কলকাতাই বাঞ্ছিত। এইরকম আরও কত—হলো হল। কি কী অনেকেই ঠিক প্রয়োগ করতে পারে না। দ্ব্যর্থকতার ক্ষেত্রেই কেবল এই ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখলে ভালো হয়। তুমি কি খেয়েছ? তুমি কী খেয়েছ? নিম্ন অর্থে নীচ শব্দর প্রয়োগ সংস্কৃতেই আছে (গীতা ৩।১১) তবে আর নিচ কেন?

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
শিবপুর, নদীয়া

২

আপনার "চতুরঙ্গ"-পত্রিকায় (ফেবরুয়ারি ১৯৮৯) প্রকাশিত অধ্যাপক সুনীল সেন মহাশয়ের রচিত "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়, ১৯৪৫-৪৭" প্রবন্ধখানি আগ্রহের সঙ্গে পড়লাম। লেখাটি বেশ ভালো লাগল এবং এটি পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি। প্রবন্ধটি তথ্যসমৃদ্ধ। ভাষাও সরল আর সাবলীল। তিনি একজন ভালো প্রাবন্ধিক—তার পরিচয় পাওয়া যায় উক্ত প্রবন্ধে।

তাঁর এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে আমি সবিনয়ে দু-একটি সমালোচনামূলক কথা বলতে চাই।

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই ডঃ মজুমদারের একটি বাক্যের উদ্ধৃতি আছে কিন্তু তার রেফারেন্স নেই, থাকা উচিত ছিল। ডঃ মজুমদার 'History of the Freedom Movement of India' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন, ১৯৪৫-এর পর যেসব বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছিল, তাই-ই ব্রিটিশকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করলো। এই "Post-war Revolution"-এর জন্য দায়ী সুভাষচন্দ্র ও আই. এন. এ.; স্পষ্টত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৯৪৬-৪৭ অবধি চলেছিল। দেখা যাচ্ছে, এসব

কথার সঙ্গে অধ্যাপক সেনের উদ্ধৃত বাক্যটির সামঞ্জস্য হচ্ছে না।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রবন্ধকার লিখেছেন : 'মনে হয়, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক অবস্থার যে মৌল পরিবর্তন ঘটেছিল, ভারতের গণজাগরণ তার অঙ্গ।' এই কথাটি অনেকেই মেনে নিতে পারবেন না ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ভারতে গণজাগরণের কারণ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ। শাহনওয়াজ, ধীলন ও সাইগলের বিচারকে কেন্দ্র করে ভারতে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট উদ্দীপনা দেখা যায়,—দেখা যায় ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব। ছাত্র, শ্রমিক, পুলিশ ও সেনানীর মধ্যেও গভীর স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ দেখা দিল। এ সম্পর্কে প্রবন্ধকার পরে উল্লেখও করেন। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত কথার সঙ্গে পরের ঘটনাগুলির যোগ কোথায়? এই দুইয়ের মধ্যে লজিকাল কনসিসটেন্সি নেই বলে আমি মনে করছি।

তৃতীয়: 'সকল রাজনৈতিকদল এই আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিল' (তৃতীয় অনুচ্ছেদ)।

কিন্তু আমার যতদূর স্মরণ হয়, কমিউনিস্ট পার্টি এতে ছিলেন না। সুভাষ বসু সম্পর্কে এই পার্টির যে ধারণা, তা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের "জনযুদ্ধ" কাগজে। সে ধারণা ১৯৪৬ সালেও একই রূপ ছিল। আগস্ট আন্দোলনকে কমিউনিস্ট পার্টি স্বাগত তো জানান ই নি; অধিকন্তু, ব্রিটিশের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁরা যে এই আন্দোলন দমনে সাহায্য করেছিলেন তা সবার জানা; এটি ঐতিহাসিক সত্য। কমিউনিস্ট বন্ধুরা সেদিন স্বদেশপ্রেম দেখাতে পারেন নি। ব্রিটিশের অনুকূলে কার্য করায় তাঁরা তখন দেশে 'traitor' বলে পরিচিত হয়েছিলেন। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও নেতাজীর কার্যকলাপ প্রকাশ পেলে কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সেক্রেটারি পি. সি. যোশী মহাশয় যে বিবৃতি দেন তা দেশবাসী পছন্দ করেন নি, বরং এই বিবৃতির জন্য নিন্দিত হন। তাঁর বিবৃতিতে পরিষ্কার যে—সুভাষ বসু-গঠিত স্বাধীনতার সৈনিকদের অনুকূলে প্রচার করার প্রয়োজন বোধ করেন নি শ্রীযোশী মহাশয়।

আমার সমালোচনার মধ্যে ভুল থাকতে পারে। তা দেখিয়ে দিলে খুশি হব। মানুষ কেউ-ই নিখুঁত নন। সুতরাং ভুল-ত্রুটি মানুষের স্বাভাবিক।

হীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার
জগাছা, হাওড়া

৩

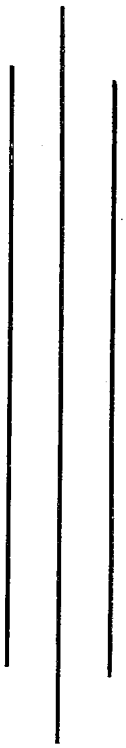
'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়' এর 'এক'-অংশে অধ্যাপক সুনীল সেন লিখেছেন, 'মহীয়সী মহিলা জ্যোতির্ময়ী ছাত্র-মিছিলের সঙ্গে যেতে-যেতে মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন।'

ধর্মতলা স্ট্রীটে সেই ছাত্রমিছিলে সেদিন আমিও ছিলাম। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ছাত্রমিছিলে ছিলেন না। তিনি মোটরে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একটি মিলিটারি জিপের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে তিনি নিহত হন। সেদিনকার সেই দুর্ঘটনা ব্রিটিশ মিলিটারির ইচ্ছাকৃত ও মতলবপ্রসূত ছিল।

আশাকরি, চতুরঙ্গে এটা প্রকাশ করে পাঠকদের প্রকৃত ঘটনা জানার সুযোগ দেবেন।

সুশান্ত মজুমদার
বিরাটী, কলিকাতা

With the compliments of



INDO-JAPAN STEELS LIMITED

11 GOVT. PLACE (EAST)

CALCUTTA-700 001

Telephone : 23-6461/6810

Postal Regd. No. WB/CC-435 Registered with the Registrar of Newspaper for India under R. N. No. 5480/57 প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা

রোজই দেখি দাড়ি কামানোর শেষে চড়চড়ে
মুখ, মাঝে মাঝে টুকটাক কেটে যাওয়ার দাগ।
রোজই ভাবি—ভাগ্যিস্ বোরোলীন আছে।

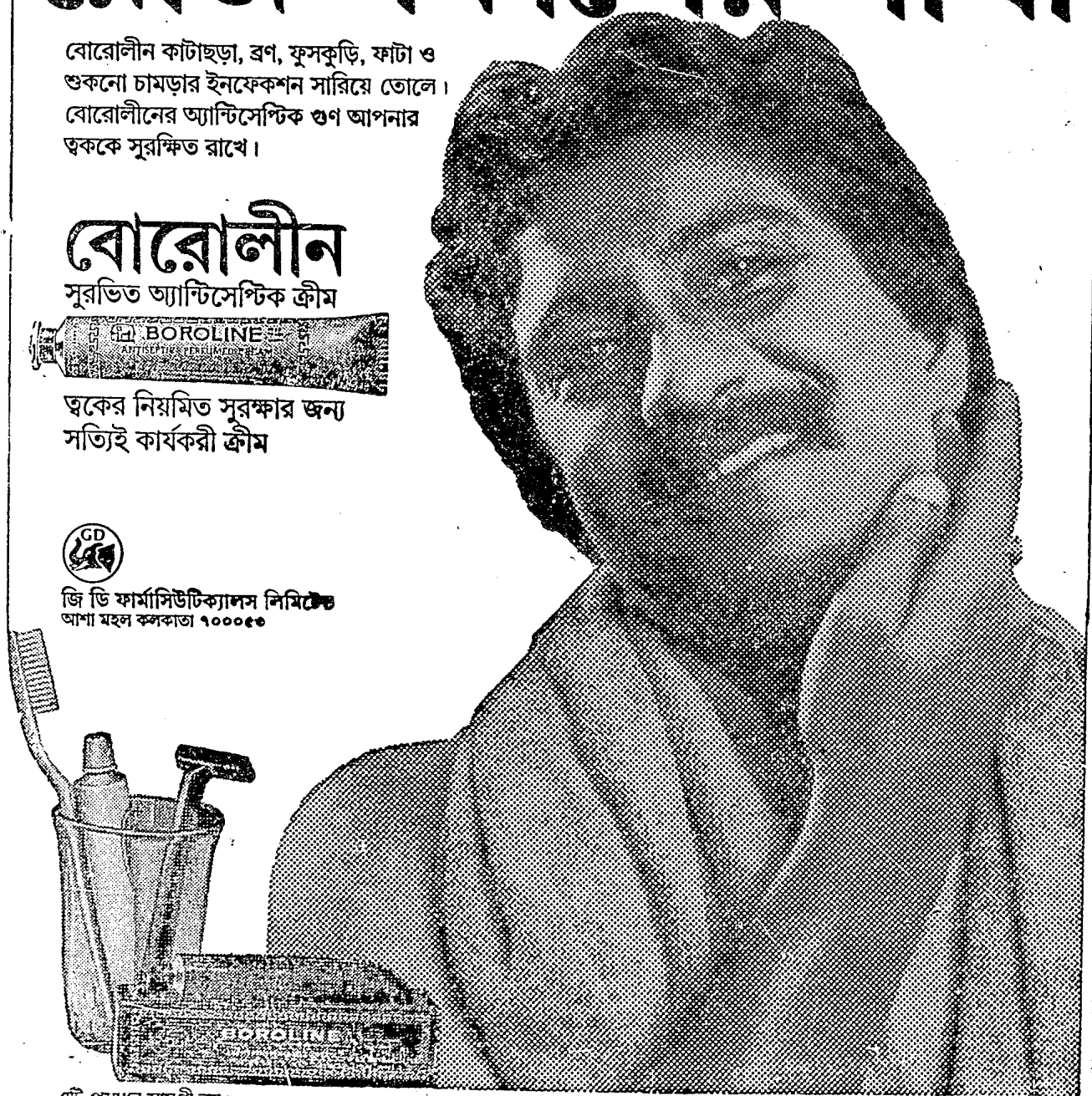
রোজ সকালের সাথী

বোরোলীন কাটাছড়া, ব্রণ, ফুসকুড়ি, ফাটা ও শুকনো চামড়ার ইনফেকশন সারিয়ে তোলে। বোরোলীনের অ্যান্টিসেপ্টিক গুণ আপনার ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

বোরোলীন
সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

ত্বকের নিয়মিত সুরক্ষার জন্য
সত্যিই কার্যকরী ক্রীম

GD
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড
আশা মহল কলকাতা ৭০০০৫৩



এটি প্রসাধন সামগ্রী নয়।

Response 1603



